ইসলামী শিক্ষা-দর্শনে নারীর অবস্থান ও তার বাস্তবায়ন : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ (১৯৭১-২০০৯ খৃস্টাব্দ)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন
প্রফেসর
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
মোহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ
রেজিস্ট্রেশন নম্বর ২১৮/২০১১-১২
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ
এপ্রিল ২০১৫

প্রত্যয়ন পত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পিএইচ.ডি গবেষক **জনাব মোহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ** কর্তৃক **'ইসলামী শিক্ষা-দর্শনে নারীর অবস্থান ও তার বাস্তবায়ন : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ(১৯৭১-২০০৯ খৃস্টাব্দ)'** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পাদিত হয়েছে। এটি সম্পূর্ণরূপে গবেষকের একক ও মৌলিক গবেষণা কর্ম। ইতোপূর্বে এ শিরোনামে পিএইচ. ডি বা অন্য কোন ডিগ্রী হয়নি। এ গবেষণা কর্মের আংশিক বা সম্পূর্ণ কোথাও প্রকাশের জন্য জমা দেয়া হয়নি।

অভিসন্দর্ভটির পাণ্ডুলিপি আমি আদ্যপান্ত দেখেছি এবং পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপনের অনুমোদন প্রদান করছি।

(ড. মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন)
প্রফেসর ও তত্ত্বাবধায়ক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি ঘোষণা করছি যে, **'ইসলামী শিক্ষা-দর্শনে নারীর অবস্থান ও তার বাস্তবায়ন : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ (১৯৭১-২০০৯ খৃস্টাব্দ)'** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণা কর্ম। আমার জানা মতে এ শিরোণামে ইতোপূর্বে কোথাও কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয় নি। পিএইচ. ডি ডিগ্রীর জন্য দাখিলকৃত এ অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণভাবে বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করিনি।

(মোহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ)
পিএইচ. ডি গবেষক
রেজি: ২১৮, সেশন : ২০১১-২০১২
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সর্বপ্রথম পরম করুণাময় অল্লাহ্ তা'আলার দরবারে জ্ঞাপণ করছি অসংখ্য শুকরিয়া, যার অসীম অনুগ্রহ ও অনুকম্পায় আমার এ গবেষণাকর্ম সমাপ্ত করা সম্ভব হয়েছে। দরূদ ও সালাম পেশ করছি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানব, নবীকুল শিরোমনি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি।

গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এ গবেষণা অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন স্যার এর প্রতি। তিনি পেশাগত ব্যস্ততা নিয়েও এ অভিসন্দর্ভ রচনায় আমাকে যে সহযোগিতা দান করেছেন তার তুলনা বিরল। তিনি আমার অভিসন্দর্ভের পাণ্ডুলিপিটি পাঠ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজন করেছেন। এর গুণগত মান বৃদ্ধিতে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করেছেন। আমি আমার গবেষণা কর্মের জন্য সময়ে অসময়ে বারংবার তাঁর নিকট এসেছি; তিনি কখনো বিরক্তবোধ করেন নি; বরং তিনি কর্ম জীবনের শত ব্যস্ততার মধ্যেও আমার প্রতি অকৃত্রিম হৃদ্যতা দেখিয়েছেন। আমার বহু অস্বচ্ছ ও অজ্ঞাত ধারণাকে সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ করে দিয়েছেন। তাঁর আন্তরিক সহযোগিতা ও দিক নির্দেশনা ছাড়া এ গবেষণা কর্ম সম্পাদন করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমি তাঁর প্রতি চির কৃতজ্ঞ।

অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপণ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের স্বনামধন্য শিক্ষক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আবদুল বাকী, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আবদুল লতিফ, সহ সকল শিক্ষক মণ্ডলীর প্রতি, যারা বিভিন্ন সময় আমাকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন এবং আমার এ গবেষণা কর্মের দুর্গম পথকে সুগম করেছেন।

বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপণ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের স্বনামধন্য শিক্ষক, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও গবেষক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শফিকুর রহমান স্যার এর প্রতি, যিনি আমার এ অভিসন্দর্ভ রচনায় সুচিন্তিত পরামর্শ দান করত অভিসন্দর্ভের পাণ্ডুলিপিটি পাঠ করে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিয়ে এর গুণগত মান বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করেছেন।

অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপণ করছি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক তাফসীর শাস্ত্রের পণ্ডিত, বিশিষ্ট ধর্মতত্ত্ববিদ, প্রাবন্ধিক, লেখক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের স্বনামধন্য শিক্ষক অধ্যাপক ড. মো: বেলাল হোসেন স্যারের এর প্রতি। যিনি বিভিন্ন সময়ে আমার এ গবেষণা কর্মের মান উন্নয়নে মূল্যবান দিক নির্দেশনা ও সহযোগিতা করেছেন।

গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপণ করছি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের স্বনামধন্য শিক্ষক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান স্যারের প্রতি। যিনি বিভিন্ন সময়ে আমার এ গবেষণা কর্মের মান উন্নয়নে মূল্যবান দিক-নির্দেশনা, তথ্য উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করেছেন।

অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও আকুণ্ঠচিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মু. শফিকুল ইসলাম স্যারের প্রতি। যিনি বিভিন্ন সময়ে আমার এ গবেষণা কর্মের মান উন্নয়নে মূল্যবান পরামর্শ দান করেছেন।

পরম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপণ করছি কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ নাসির উদ্দীন স্যারের প্রতি যিনি আমার এ অভিসন্দর্ভের মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দান করে সহযোগিতা করেছেন।

আমার এ গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের জন্য আমি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছে নানাভাবে ঋণী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ সেমিনার লাইব্রেরী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী (সুফিয়া কামাল কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগার), ইসলামিক ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, পাবনা অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরী, জেলা গণগ্রন্থাগার পাবনা, পাবনা ইসলামিক ফাউন্ডেশন পাঠাগার, ঢাকাস্থ আলবানী একাডেমী

Dhaka University Institutional Repository

প্রভৃতি থেকে আমি আমার গবেষণার তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। এ কাজে সহযোগিতার জন্য এ সমস্ত লাইব্রেরী ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ, মালিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপণ করছি।
আমি গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি, আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা জনাব মো: হাছেন আলী শেখ ও শিক্ষানুরাগী 'মা' রাজিয়া খাতুনের প্রতি যাদের চরম ত্যাগ-তীতিক্ষা, সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান ও প্রাণঢালা দু'য়া এ অভিসন্দর্ভ রচনায় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। আমি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে তাঁদের দু'জনের সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।
গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় বড় ভাই স্বনামধন্য ব্যাংক কর্মকর্তা জনাব মোঃ রেজাউল করিমের প্রতি, যার দ্বারা আমার শিক্ষা জীবনের হাতে খড়ি ও সকল সফলতায় অনুপ্রেরণার উৎস। আমি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে তাঁর সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার মেঝ ভাই জনাব মোঃ এনামুল হক ও ছোট ভাই রমজান আলীর প্রতি, তারা সর্বদা আমাকে এ গবেষণা কর্ম সম্পাদনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় আর্থিক ব্যয়ভার বহনসহ উৎসাহ উদ্দীপনা যুগিয়েছেন।
গভীর ও অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি, আমার সহধর্মীনী 'উম্মে সুলতানুল আরেফীন রেদওয়ান' ফাতিমা শরীফকে যিনি তার গুরুত্বপূর্ণ ব্যাংকিং পেশার দায়িত্ব ও গৃহকর্ত্রীর কর্তব্য পালনের পাশাপাশি সংসার জীবনে স্বামীর অনেক দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে আমাকে নির্বিঘ্নে এ গবেষণা কাজ চালিয়ে যাবার সুযোগ করে দিয়েছেন।
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপণ করছি বন্ধু আহসানুল্লাহর প্রতি যিনি আমাকে এ গবেষণা কাজে নানাভাবে সাহায্য করেছেন।
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার বন্ধুপ্রতিম ছোটভাই ইশতিয়াকুল আলম মামদূদ এর প্রতি যিনি আমাকে গবেষণা কর্মে নানাভাবে সাহায্য- সহযোগিতা করেছেন।
এছাড়া যারা এ গবেষণা কর্ম সম্পাদনে বিভিন্ন পর্যায়ে ভূমিকা রেখেছেন তাদের প্রতি রইল আমার কৃতজ্ঞতা।
পরিশেষে পরম করুণাময়ের দরবারে এ গবেষণা কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ কামনা করে শেষ করছি। আমীন!

গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত সূচী

(সা)	:	সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম
(রা)	:	রাযি আল্লাহু 'আনহু
(আ)	:	'আলাইহিস সালাম
(র.)	:	রাহমাতুল্লাহি 'আলাইহি
হি.	:	হিজরী
খৃ.	:	খৃস্টাব্দ
তা.বি	:	তারিখ বিহীন
খ.	:	খণ্ড
পৃ.	:	পৃষ্ঠা
সং	:	সংস্করণ
দ্র.	:	দ্রষ্টব্য
অনূ.	:	অনূদিত
অনু	:	অনুবাদ
কি. মি.	:	কিলোমিটার
মৃ.	:	মৃত্যু
p	:	Page
pp	:	pages
Vol	:	Volume
(sm.)	:	Sallallahu Alaihi Osallam.

Dhaka University Institutional Repository

সূচী পত্র

প্রত্যয়নপত্র....................অ
ঘোষণাপত্র....................আ
কৃতজ্ঞতা স্বীকার....................ই-ঈ
সংকেত....................উ
সূচীপত্র....................ঊ
ভূমিকা....................১-৩

প্রথম অধ্যায়

ইসলামী শিক্ষা-দর্শন প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ৫-৬৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের গুরুত্ব, নারীর অবস্থান ও তার বাস্তবায়ন, আধুনিক নারীবাদ ও ইসলাম ৭০-১০৩

তৃতীয় অধ্যায়

বিভিন্ন যুগে নারী ও ইসলামী শিক্ষায় নারীর অবস্থান ও বর্তমান প্রেক্ষাপটে তার বাস্তবায়ন ১০৫-১৫৪

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশে নারী শিক্ষা ও গবেষণা পরিস্থিতি ১৫৬-২১৭

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশের নারী উন্নয়ন : সমস্যা ও সম্ভাবনা ২১৯-২৬৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষায় নারীর অবস্থান এর উন্নয়নে করণীয় ২৬৬-৩৫৪

উপসংহার ৩৫৬-৩৬০
গ্রন্থপঞ্জী ৩৬২-৩৭২

Dhaka University Institutional Repository

f~wgKv

ভূমিকা

মানব সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে প্রতিনিয়ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার বিকাশ ও ক্রমসমৃদ্ধি সাধিত হচ্ছে। এ জ্ঞান-বিজ্ঞান এর শাখাসমূহ আল্লাহ্র সেরা সৃষ্টি মানুষকে ঘিরে আবর্তিত। মানব জাতির অর্ধেক নর আর অর্ধেক নারী। এর এক অংশের প্রতিনিধিত্ব করে নর অপর অংশের প্রতিনিধিত্ব করে নারী। কাজেই নারী ব্যতিরেকে পৃথিবীতে পরিপূর্ণ সফল কোন কর্মসূচি পালন করা সম্ভব নয়। পৃথিবীর সকল কীর্তি বিনির্মাণে নর-নারী সমানভাবে অংশীদার এবং সৃষ্টিগত মর্যাদার বিচারে তাদের মধ্যে কোন বৈষম্য নেই। আমাদের জীবনে ইসলামের মৌলিক জ্ঞান ইসলামী শিক্ষা-দর্শন, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার। ইসলামী শিক্ষা-দর্শনে নারীর অবস্থান ও তার বাস্তবায়ন এবং বাংলাদেশে নারীদের বর্তমান অবস্থান, ও বাস্তবায়ন বিষয়াদি সম্পর্কে গবেষণা ও অধ্যয়ন জরুরী। এ কারণেই **'ইসলামী শিক্ষা-দর্শনে নারীর অবস্থান ও তার বাস্তবায়ন : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ (১৯৭১-২০০৯ খৃস্টাব্দ)'** শীর্ষক শিরোনামে গবেষণা করতে প্রয়াস পেয়েছি।

আল্লাহ্ পাক মানুষকে পৃথিবীতে তাঁর খলিফা হিসেবে পাঠিয়েছেন। এরা নারী ও পুরুষ। নারী-পুরুষের যৌথ অবদানেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সুখী, সমৃদ্ধ ও শান্তিময় সমাজ। শরীরের অর্ধাংশ রুগ্ন থাকলে যেমন ব্যক্তি জীবনে শান্তি থাকে না তেমনি নারী সমাজকে নিগৃহীত রেখেও মানব সমাজে শান্তি আসতে পারে না। পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতা ও ধর্ম সমূহের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় এবং অতীত ইতিহাস এটাই সাক্ষ্য দেয় যে, যুগে যুগে মানব রচিত ধর্মগুলো নারী সমাজকে বিভিন্ন খারাপ আখ্যায় আখ্যায়িত করে রেখেছিল। প্রাচীন গ্রীক সমাজে নারীদেরকে শয়তানের প্রতিচ্ছায়া মনে করা হতো। আইনগতভাবে নারীরা সংসারের অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তির মতো ছিল, উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি লাভ করতো না। সারাজীবন তারা পুরুষের দাসী-বাঁদীর মতো জীবন কাটাত। পুরুষদের অনুমতি ব্যতীত নিজের সম্পত্তি ভোগ বা হস্তান্তর করতে পারত না।

খৃস্টীয় রোমান সমাজে নারীদের অবস্থা এতটাই করুণ ছিল যে, সে সময় তারা নারীর মানবসত্তাকে স্বীকার করত না, বরং তারা নারীকে মানুষ ও প্রাণীর মাঝামাঝি কোনো বিশেষ প্রজাতি মনে করতো। সপ্তম শতাব্দীতে রোমের পাদ্রীগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, নারীর আত্মা নেই। সুতরাং তারা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। ৫৮৭ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে আলোচ্য বিষয় ছিল নারীকে কী মানুষ বলে বিবেচনা করা হবে নাকি অমানুষ বলা হবে। সম্মেলনে স্থির হয়, নারী মানুষ, তবে তার সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরুষের সেবা করা। ভারতীয় সমাজে নারীদেরকে নৈতিক চরিত্র, পাপ এবং আধ্যাত্মিক ধ্বংসের মূল উৎস বলে বিবেচনা করা হতো। প্রাচীন ভারতে সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল সতীদাহ প্রথা। এছাড়া দেবদেবীর সন্তুষ্টি লাভের জন্য কৃষি ও ভালো ফসল ফলানোর উদ্দেশ্যে নারীকে বলী দেয়া হতো। বৌদ্ধ সমাজেও নারীর অবস্থা ছিল অত্যন্ত হীন। গৌতম বুদ্ধ স্বয়ং স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসী জীবন-যাপন করেন। তিনি নারীকে মানবাত্মার নির্বাণ লাভে বিঘ্ন মনে করতেন। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মের তুলনায় একমাত্র ইসলামে নারীর অবস্থা অধিক উন্নত।

ইসলাম-পূর্ব আরব সমাজে নারী ছিল অবহেলিত, অপমানিত, লাঞ্ছিত, ঘৃণিত-মানবেতর প্রাণীর চেয়েও নিকৃষ্ট। কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়া হতো, নারীকে পণ্যদ্রব্যের মতো বিক্রি করা হতো এবং পশুর বদলে বিনিময় করা হতো। ইসলামপূর্ব কোন ধর্ম, সমাজ ও সভ্যতায় নারীদের কোনো সম্মান, মর্যাদা, নিরাপত্তা ও পৈতৃক সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী অধিকার ছিল না। ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মে নারী স্বাধীনতা, মৌলিক অধিকার, নারীর জানমাল, ইজ্জতের নিরাপত্তা, মীরাছ, সামাজিক অধিকার, মতামত ব্যক্ত করার অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার ইত্যাদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। নারী কোথাও স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল না। ইসলামই প্রথম পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও স্বামীর সম্পত্তিতে নারীর মৌলিক অধিকার প্রদান এবং প্রাক-ইসলামী যুগের নারী-পুরুষের অবৈধ সম্পর্ককে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। হিন্দু সভ্যতার ভাষ্য মতে নারী জন্মগতভাবেই একটি

Dhaka University Institutional Repository

পাপিষ্ঠ সত্তা। বৌদ্ধ সভ্যতায় নারী সব অসৎ প্রলোভনের ফাঁদ। নারীর মধ্যে সকল মোহিনীশক্তি অঙ্গীভূত হয়ে আছে, যা সমগ্র বিশ্বের মনকে অন্ধ করে দেয়।

ইয়াহুদী সভ্যতায় নারী একটি অভিশপ্ত জীব। খৃস্ট সভ্যতায় নারীরাই পৃথিবীর সকল অশুভ কার্যের উৎস বলে বিবেচিত। চীন সভ্যতায় নারী হল দুঃখের প্রস্রবণ গ্রীক সভ্যতার অন্যতম রূপকার সক্রেটিসের মতে, নারী হল সব ভাঙ্গন ও বিশৃঙ্খলার উৎস। রোম সভ্যতায় নারী ক্রীতদাসীর ন্যায়। ইউরোপীয় সভ্যতায় নারী শয়তানের অঙ্গ। জাহেলী আরবে নারীদের কোন মর্যাদা ছিল না। যুদ্ধ, মদ ও নারীই ছিল জাহেলী আরবদের প্রধান উপজীব্য। জাহেলিয়াতের যুগে একজন পুরুষ তার সামর্থ অনুযায়ী অসংখ্য নারীকে বিবাহ করতে বা দাসী বানিয়ে রাখতে পারত। বিধবা নারীদের জীবন ছিল দুর্বিসহ। স্বামীর মৃত্যুর পর তারা পিত্রালয়েও যেতে পারত না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর আবির্ভাবের পর নারী সমাজের জন্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পূর্বে নারীদের সাথে জীবজন্তুর মত আচরণ করা হতো। এ পরিবর্তন এসেছে ইসলামের সুমহান বাণী জীবনাদর্শ হিসেবে অবতীর্ণের পর। আল্লাহ্ পাক প্রদত্ত ও রাসূল (সা) প্রদর্শিত জীবন বিধান ও শিক্ষা-দর্শন এর অনুসৃতি ও পরিপালনের ফলে নারী সমাজের পারিবারিক, সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ একটি মুসলিম দেশ। এদেশের মানুষের মধ্যে ইসলামী শিক্ষা-দর্শন এর ওপর ব্যাপকভিত্তিক গবেষণা, অধ্যয়ন ও ইসলামের বিধান বাস্তবায়ন প্রয়োজন। এ শিক্ষা-দর্শনে মানব সমাজের অর্ধাংশ নারী সমাজের অবস্থান ও তার বাস্তবায়নই বা কী, বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষায় নারীর অবস্থান এর উন্নয়নে করণীয়, এতদ্বসংক্রান্ত বিষয়েও বাস্তব ভিত্তিক জ্ঞানার্জন, সূক্ষ্ণাতিসুক্ষ্ণ আলোচনা, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের জানামতে এ কাজে তেমন কেউ এগিয়ে না আসায় বিষয়টির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে আমি আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক স্যারের পরামর্শে এ বিষয়ে গবেষণা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি এবং এ অভিসন্দর্ভটি সম্পাদন করি।

এ গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করতে গিয়ে আমাকে বেশ কিছু প্রতিকূলতা ও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। নারী সংশ্লিষ্ট বহুবিধ গ্রন্থ রচিত হলেও 'বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীর অবস্থান ও তার বাস্তবায়ন' বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অতীব সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছে। আমি অধিকাংশ তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করেছি কুর'আন হাদীস ইসলামী জীবন বিধানের প্রামাণ্য গ্রন্থাবলী থেকে। এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে ভূমিকা ও উপসংহার ছাড়া ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি এবং প্রত্যেক অধ্যায়ের অধীনে উপ শিরোনাম নির্ধারণ করেছি।

প্রথম অধ্যায়ে 'ইসলামী শিক্ষা-দর্শন : প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য' এ শিরোনামের অধীনে ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের পরিচয়, ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, রাসূল (সা) এর যুগ, খুলাফায়ে রাশিদার যুগে ইসলামী শিক্ষা দর্শনের বিকাশ, উমাইয়া ও আব্বাসীয় খিলাফতে ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের বিকাশ, ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, পরিধি ও শিক্ষার পরিধি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের গুরুত্ব, নারীর অবস্থান ও তার বাস্তবায়ন, আধুনিক নারীবাদ ও ইসলাম' এ শিরোনামের অধীনে ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের পরিচয়, গুরুত্ব, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও পরিধি, ইসলামী শিক্ষা-দর্শনে নারীর অবস্থান ও তার বাস্তবায়ন সম্পর্কে কুর'আন-হাদীস, শিক্ষা প্রচারের গুরুত্ব, শিক্ষাদান পদ্ধতি, আধুনিক নারীবাদ ও ইসলাম, গ্রীক সভ্যতায় নারী, পশ্চিমা সভ্যতায় নারী, বর্তমান প্রগতিশীল সমাজে নারী, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় নারী,নারীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার এবং নারীপুরুষ সমতা ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা উপস্থাপন করেছি।

তৃতীয় অধ্যায়ে 'বিভিন্ন সভ্যতায় ও ইসলামী শিক্ষায় নারীর অবস্থান এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে তার বাস্তবায়ন' শিরোনামের অধীনে ইসলাম-পূর্ব আরব সভ্যতায় নারী, চীনা সভ্যতায় নারী, গ্রীক সভ্যতায় নারী, রোম সভ্যতায় নারী, ইউরোপীয় বা পশ্চিমা সভ্যতায় নারী, ইসলাম বা মুহাম্মদ (সা) এর সমাজ ব্যবস্থায় নারী, সাহাবীগণের যুগে নারী শিক্ষা, বর্তমান প্রেক্ষাপটে নারীর অবস্থান ও তার মূল্যায়ন, ইসলামে নারী-পুরুষের অধিকার, মা

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে নারী, স্ত্রী হিসেবে নারী, কন্যা হিসেবে নারী, বিবাহের ক্ষেত্রে নারী, বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে নারী, শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চায় নারী, মত প্রকাশ ও পরামর্শ প্রদানে নারী, ভারতীয় উপমহাদেশে নারীর অবস্থা ইত্যাদি উপ শিরোনামের আলোচনা স্থান পেয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে 'বাংলাদেশে নারী শিক্ষা ও গবেষণা পরিস্থিতি' এ শিরোনামের অধীনে মানব সমাজের বিকাশের বিভিন্ন স্তরে নারীর অবস্থান (আদিম সাম্যবাদী সমাজ, দাস সমাজ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ, পুঁজিবাদী সমাজ, সমাজতান্ত্রিক সমাজ), পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যে নারীর অবস্থান, উইমিন্স্ স্টাডিজ ধারণার উৎপত্তি, উইমিন্স্ স্টাডিজের সংজ্ঞা, উইমিন্স্ স্টাডিজ- এর পরিধি, সামাজিক মর্যাদা ও নারী, পরিবার কাঠামো ও নারী, সামাজিক মর্যাদা ও নারী, মাতৃত্বের আরোপিত মূল্যবোধ ও নারী, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও নারী, মজুরী কাঠামো ও নারী, কর্মময় সময় ও নারী, সম্পত্তি ও নারী, দারিদ্র ও নারীর অবস্থান, নারীর ক্ষমতায়ন তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট, নারীর ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া, বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন, আইন ও বিচার বিভাগে নারী, প্রশাসনিক পর্যায়ে নারী, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারী, নারীর ক্ষমতায়ন ও জাতীয় সংসদে মহিলা আসন প্রসঙ্গ, বাংলাদেশের বর্তমান চিত্র, নারী সংগঠনসমূহের দাবি, নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা সন্নিবেশিত করেছি।

পঞ্চম অধ্যায়ে 'বাংলাদেশের নারী উন্নয়ন : সমস্যা ও সম্ভাবনা' এ শিরোনামের অধীনে

নারী মানবসম্পদ, রাজনীতি ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নারী, বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহিত বিভিন্ন পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি, নারীর সামাজিক নিরাপত্তা, নারী শিক্ষার অবস্থা, জাতীয় শিক্ষানীতিতে নারী শিক্ষা, বাংলাদেশের সংবিধানে নারী, রাজনীতিতে নারীর অবস্থান, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, সকল ক্ষেত্রে নারীর অধিকার প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেছি।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষায় নারীর অবস্থান এর উন্নয়নে করণীয় এ শিরোনামের অধীনে

বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষায় নারীর অবস্থান এর উন্নয়নে পারিবারিক কাঠামো গঠন, পরিবার কাঠামো ও নারী, মাতৃত্বের আরোপিত মূল্যবোধ ও নারী, পরিবারে দ্বীনি ইল্‌ম চর্চা, সালাত কায়েম, পরিবারে ইসলামী আদব আচারের পরিবেশ সৃষ্টি, পারিবারিক বৈঠক, ইসলামী আদর্শের বাস্তবায়ন, ইসলামী ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে সন্তান পরিপালন করা, সামাজিক কাঠামো গঠন, আদর্শ পরিবারের দায়িত্ব আদর্শ সমাজ কাঠামো গঠন, সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে ইসলামী চেতনার বিকাশ, কন্যা সন্তান ও পুত্র সন্তানের শিক্ষায় সমতা, সামাজিক ক্রিয়াকর্মে নারীর অংশগ্রহণের ব্যবস্থা, সমাজে ইসলামী মূল্যবোধ সৃষ্টি, ইসলামী শিক্ষায় সমাজিক পর্যায়ে নারীর অবস্থানের উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠন, শিক্ষার শুরু থেকেই ইসলামী শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ, মাদ্‌রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে 'ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা' পাঠ্যক্রমের বাস্তবায়ন, উচ্চতর পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক হিসেবে অন্তর্ভুক্তিকরন, শিক্ষার্থীদের মাঝে ইসলামী মূল্যবোধ ও নৈতিকতার প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহণ, জাতীয় কাঠামো গঠন, শিক্ষকতায় ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত নারীদের অগ্রাধিকার, বাংলাদেশে পেশাজীবি নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও মূল্যায়ন সমীক্ষা, নারীর পেশাগত উন্নয়নে ইসলামের বিধান, কর্মজীবি মহিলাদের জন্য মুসলিম সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য, বাংলাদেশের নারীর অবস্থার উন্নয়নে নারী উদ্যোক্তা প্রসঙ্গ, বর্তমান সময়ে বাংলাদেশে নারী উদ্যোক্তা, নারীর উত্তরাধিকারগত অবস্থান এর উন্নয়নে করণীয় প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেছি।

পরিশেষে সংক্ষিপ্ত উপসংহারের মাধ্যমে গবেষণা কর্মটির সার-নির্যাস তথা গবেষণা কর্মের ফলাফল বর্ণিত হয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

c_g Aa¨vq

Bmjvgx wk¶v-`kb : cKwZ I ˆewkó¨

প্রথম অধ্যায়
ইসলামী শিক্ষা-দর্শন : প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

ইসলামী শিক্ষা-দর্শন মানুষের জ্ঞান, আত্মা, বৈষয়িক ও নৈতিক বিষয়াদিসহ সর্বদিক অন্তর্ভুক্ত করে। আল্লাহ্ প্রদত্ত ও রাসূল (সা) প্রদর্শিত জীবন ব্যবস্থা ইসলাম। মুসলিম উম্মাহর একমাত্র ধর্ম ইসলাম[১]। ইসলাম ধর্মে প্রধান দর্শন হলো জ্ঞানার্জন। তাই আল্লাহ্র দেয়া বিধান অনুযায়ী সঠিক পথে মানুষ পরিচালিত হওয়ার জন্য ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। প্রথম মানুষ ও নবী হযরত আদম (আ) সর্বপ্রথম আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞানলাভে ধন্য হন। এ থেকেই শিক্ষার গুরুত্ব প্রমাণিত হয়। কুর'আনে ঘোষণা করা হয়েছে :

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم

"মানুষ যা জানত না তিনি তা শিখিয়েছেন।"[২] আল্লাহ্ পাক অন্যত্র ইরশাদ করেন :

---

[১] (اسلام: ইসলাম) পৃথিবীর সকল দেশের মুসলিম নিজেদের ধর্মকে ইসলাম নামে অভিহিত করে থাকেন। ইহা (س-ل-م) শব্দমূল হতে গঠিত। باب افعال- এর মাসদার (ক্রিয়ামূল)। ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পন করা। যেমন ইরশাদ হচ্ছে: إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (স্মরণ করুন!) যখন ইব্রাহীমকে তাঁর প্রতিপালক বললেন, আত্মসমর্পণ কর, ইব্রাহীম বললেন, 'আমি বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পন করলাম'। (আল কুর'আন, ২ : ১৩১)। আবার (اسلام: ইসলাম) অর্থ শান্তি বা শান্তির প্রস্তাব করা। যেমন ইরশাদ হচ্ছে : وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 'অবিশ্বাসীরা যদি আপনার সাথে সন্ধি করতে আগ্রহী হয়, তাহলে আপনিও সন্ধি করতে আগ্রহী হবেন, এবং আল্লাহ্র প্রতি নির্ভর করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু শোনেন ও জানেন।'(আল কুর'আন, ৮ : ৬১) আবার (اسلام: ইসলাম) অর্থ ইসলামী বিধান ও হুকুম-আহকাম; এ অর্থে বলা হয়েছে, ইরশাদ হচ্ছে: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً 'মুমিনগণ তোমরা পুরোপুরি ইসলাম গ্রহণ করো।' (আল কুর'আন, ২ : ২০৮)। ইসলাম অর্থ যুদ্ধ পরিহারের প্রস্তাব, যেমন আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন : فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا 'সুতরাং তারা যদি তোমাদের নিকট হতে সরে দাঁড়ায়, তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের নিকট শান্তি প্রস্তাব করে তবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের পথ রাখেন না।' (আল কুর'আন, ৪ : ৯০)। আবার (اسلام: ইসলাম) অর্থ শান্তি। যেমন ইরশাদ হচ্ছে : وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 'আর মহান আল্লাহ্ চিরস্থায়ী শান্তির বাসস্থানের দিকে তোমাদেরকে আহবান করেন এবং তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে সঠিক সরল পথে পরিচালিত করেন।' (আল কুর'আন, ১০ : ২৫)। (اسلام: ইসলাম) অর্থ বাহ্যিক আনুগত্য। যেমন ইরশাদ হচ্ছে : قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا 'বেদুইনরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আপনি বলুন তোমরা ঈমান আননি বরং তোমরা বলো, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি।' (আল কুর'আন, ৪৯ : ১৪)। এভাবে ইসলামের খ্যাতনামা বহু মনীষী যৌক্তিক ব্যাখ্যার আলোকে (اسلام: ইসলাম) শব্দের প্রভূত অর্থ তুলে ধরেছেন। [আল গাজালী, *এহইয়াউ-উলুমিদ্দীন*, ১ম খ. ভাষান্তরঃ মুহিউদ্দিন খান (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, ২০০৪ খৃস্টাব্দ), পৃ. ২৩৭; Sayed Amir Ali, *The Sprit of Islam* (Delhi: 1947), p.168; পারিভাষিক দিক থেকে ইসলামের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে এভাবে-'Islam is the Muslim Religion based on belief in one God and revealed through Mohammad as the prophet of Allah'. (*Advanced Learner's Dictionary of Current Englis,* (UK: Oxford University Press, 2002), p.689; Islam is not a mere creed. It is a life to be lived in the present, a religion of right doing, right thinking and right speaking, founded on divine love, Universal charity and the equality of man in the sight of the Lord. আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য ও তার বশ্যতা স্বীকার করে নেয়া যে ধর্মের লক্ষ্য তারই নাম ইসলাম, অপরদিকে আল্লাহ্র প্রেরীত দ্বীনকে ইসলাম বলা হয় এজন্য যে, সে অনুযায়ী মানুষের নিজের সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র নিকট সোপর্দ করে দিতে হয়; আল্লাহর নিরংকুশ আনুগত্যই নিজেদের জীবনের আদর্শ ও পন্থারূপে গ্রহণ করতে হয়। [*ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৫ম খ. (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮ খৃস্টাব্দ), পৃ. ২৯৫-৩৪২।]

[২] আল্ কুর'আন, ৯৬ : ৫।

Dhaka University Institutional Repository

قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ.

'তারা বলল, আপনি মহান, পবিত্র। আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের তো জ্ঞানই নেই। বস্তুত আপনি জ্ঞানময় ও প্রজ্ঞাময়।'[১] আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন :

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ .

'ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা তোমার প্রতি কখনও সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর। বল, আল্লাহ্র পথনির্দেশই প্রকৃত পথনির্দেশ।' জ্ঞান প্রাপ্তির পর তুমি যদি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ কর তবে আল্লাহ্র বিপক্ষে তোমার কোন অভিভাবক থাকবে না এবং কোন সাহায্যকারীও থাকবে না।'[২]

আল্লাহ্ পাক অন্যত্র ইরশাদ করেন :

وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ.

'যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তুমি যদি তাদের নিকট সমস্ত দলীল পেশ কর, তবুও তারা তোমার কিব্লার অনুসরণ করবে না; এবং তুমিও তাদের কিবলার অনুসারী নও, এবং তারাও পরস্পর কিবলার অনুসারী নয়। তোমার নিকট জ্ঞান আসবার পর তুমি যদি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ কর, নিশ্চয়ই তখন তুমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'[৩]

قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

'নবী বলল, আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তিনি তাকে জ্ঞানে ও দেহে সমৃদ্ধ করেছেন।' আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা স্বীয় রাজত্ব দান করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়।'[৪]

وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

'আর যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে, 'আমরা ইহা বিশ্বাস করি, সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে আগত'; এবং বোধশক্তি-সম্পন্নেরা ব্যতীত অপর কেহ শিক্ষা গ্রহণ করে না।'[৫]

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ.

'নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহ্র নিকট একমাত্র দ্বীন। যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তারা পরস্পর বিদ্বেষবশত তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর মতনৈক্য ঘটিয়েছিল। আর কেহ আল্লাহ্র নিদর্শনকে অস্বীকার করলে আল্লাহ্ তো হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।'[৬] সঠিক পন্থায় ইবাদাত করার একমাত্র উপায় হলো দ্বীনি শিক্ষা। ইসলামী শিক্ষা-দর্শন অর্জন না করলে মানব জীবনের সবকিছুই ভণ্ডুল হয়ে যায়। শিক্ষা-দর্শনের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূল (সা) এর নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ প্রণিধানযোগ্য; ইরশাদ করেছেন :

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي بِهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

---

[১] আল কুর'আন, ২ : ৩২।

[২] আল কুর'আন, ২ : ১২০।

[৩] আল কুর'আন, ২ : ১৪৫।

[৪] আল কুর'আন, ২ : ২৪৭।

[৫] আল কুর'আন, ৩ : ৭।

[৬] আল কুর'আন, ৩ : ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

'যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষনের জন্য কোন পথ অবলম্বন করে, মহান আল্লাহ্ তদ্বারা তার জন্য বেহেস্তের পথ সহজ করে দেন'[১]।

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

'বিদ্যার্জন করা প্রত্যেক মুসলিম জন্য ফরয।'[২]

قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ خَطِيبًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ (ص) يَقُولُ مَنْ يُرِدْ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِي وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللهِ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ.

'হুমাইদ ইব্ন 'আবদুর রহমান (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি মু'আবিয়াহ (রা)-কে খুতবায় বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি নবী (সা) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ যার মঙ্গল চান, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন। আমি তো বিতরণকারী মাত্র, (জ্ঞান) দাতা হলেন আল্লাহ্র এ উম্মাত ক্বিয়ামাত পর্যন্ত সর্বদা আল্লাহ্র হুকুমের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, বিরোধিরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।'[৩]

قَالَ النَّبِيُّ (ص) لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.

'নবী (সা) বলেছেন : দু' ব্যক্তি ছাড়া কারো সাথে হিংসা করা জায়িয নয়; (১) যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ সম্পদ দিয়েছেন, অতঃপর তাকে বৈধ পন্থায় অকাতরে ব্যয় করার ক্ষমতা দিয়েছেন; (২) যাকে আল্লাহ্ প্রজ্ঞা (হিকমাহ) দান করেছেন, অতঃপর সে এর মাধ্যমে বিচার ফায়সালা করে এবং তা অন্যকে শিক্ষা দেয়।'[৪]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ضَمَّنِي رَسُولُ اللهِ (ص) وَقَالَ اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ.

'ইব্ন 'আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) একবার আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'হে আল্লাহ্ আপনি তাকে কিতাবের (কুর'আনের) জ্ঞান দান করুন।'[৫]

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتْ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتْ الْكَلأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتْ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لاَ تُمْسِكُ مَاءً وَلاَ تُنْبِتُ كَلأً فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ قَالَ إِسْحَاقُ وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ قَيَّلَتْ الْمَاءَ قَاعٌ يَعْلُوهُ الْمَاءُ وَالصَّفْصَفُ الْمُسْتَوِي مِنَ الْأَرْضِ.

'আবূ মূসা (রা) হতে বর্ণিত যে, রাসূল (সা) বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে যে হিদায়াত ও 'ইল্‌ম দিয়ে পাঠিয়েছেন তার উদাহরণ হল যমীনের উপর পতিত প্রবল বর্ষণের মত। কোন কোন উর্বর ভূমি সেই পানি শুষে নিয়ে প্রচুর পরিমাণে ঘাস এবং সবুজ তরুলতা উৎপাদন করে। আর কোন কোন কঠিন ভূমি ঐ পানি আটকে রাখে। পরে আল্লাহ্ তা'আলা তা দিয়ে মানুষের উপকার করেন; তারা নিজেরা পান করে ও (পশুপালকে) পান করায় এবং তা দিয়ে চাষাবাদ করে। আবার কোন কোন ভূমি একেবারে মসৃণ ও সমতল; তা পানি আটকেও রাখে না এবং কোন ঘাসও উৎপাদন করে না। এ হল সে ব্যক্তির উপমা যে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে

---

১. আবূ বকর আহমদ ইবনুল হুসাইন *আল বায়হাকী*, *শু'আবুল ঈমান*, তাহকীক : ড. আব্দুল আলী আব্দুল হামিদ, ৩য় খ., বাবু তা'যিমুল কুর'আন (রিয়াদঃ মাকতাবাতুর রূশদ, প্রথম সংস্করণ ২০০৩ খৃস্টাব্দ) হাদীস নং-১৮২৩, পৃ. ৩৬৪।

২. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াজিদ ইব্ন মাযাহ, *সুনানু ইবন মাযাহ্*, তাহকীক ফুয়াদ আব্দুল বাকী, ১ম খ., বাবু ফাদলিল উলামা
ওয়াল হাছ্ছু 'আলা তালাবিল ইল্‌ম (বৈরুত: দারুল ফিকর, তা.বি), হাদীস নং-২২৪, পৃ. ৮১।

৩. ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল আল বুখারী, *সহীহুল বুখারী* (রিয়াদ : মাকতাবা দারুস সালাম, ২০১০ খৃস্টাব্দ.), হাদীস নং-৭১, পৃ. ১৯।

৪. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৭৩, পৃ. ১৯।

৫. *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৭৫, পৃ. ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

এবং আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে যা দিয়ে পাঠিয়েছেন তা দ্বারা সে উপকৃত হয়। ফলে সে নিজে শিক্ষা করে এবং অপরকে শিখায়। আর ঐ লোকেরও উপমা যে সেদিকে মাথা তুলে দেখে না এবং আল্লাহ্‌র যে হিদায়াত নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি, তা গ্রহণও করে না।'[১]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (ص) إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا.

'আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ক্বিয়ামাতের কিছু নিদর্শন হল : 'ইল্ম বিলুপ্ত হবে, মূর্খতা প্রসার পাবে, মদপান বৃদ্ধি পাবে এবং যেনা-ব্যভিচার বিস্তার লাভ করবে।'[২]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لاَ يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ (ص) يَقُولُ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ.

'আনাস (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করব যা আমার পরে তোমাদের কাছে কেউ বর্ণনা করবে না। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামাতের কিছু নিদর্শন হল : 'ইল্ম কমে যাবে, মূর্খতা বৃদ্ধি পাবে, ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে, নারীদের সংখ্যা বাড়বে এবং পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে, এমনকি প্রতি পঞ্চাশজন নারীর জন্য তত্ত্বাবধায়ক হবে মাত্র একজন পুরুষ।'[৩]

عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ (ص) قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ فِي أَظْفَارِي ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالُوا فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الْعِلْمَ.

'ইব্‌ন 'উমার (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) -কে বলতে শুনেছি, একদা আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। তখন (স্বপ্নে) আমার কাছে এক পিয়ালা দুধ নিয়ে আসা হল। আমি তা পান করলাম। এমনকি আমার মনে হচ্ছিল, সে পরিতৃপ্তি আমার নখ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। অতঃপর বাকীটুকু আমি 'উমার ইব্‌নুল খাত্তাবকে দিলাম। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি এ স্বপ্নের কী ব্যাখ্যা করেন? তিনি বললেন : তা হল 'ইল্ম।'[৪]

قَالَ رَسُولُ اللهِ (ص) ثَلاَثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ (ص) وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ

'রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : 'তিন ব্যক্তির জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব রয়েছে। এক. ঐ ব্যক্তি যে আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত নিজের নবীর (আ) উপর ঈমান এনেছে আবার মুহাম্মাদ (সা)-এর উপরও ঈমান এনেছে। দুই. ঐ ক্রীতদাস যে মহান আল্লাহ্‌র হক আদায় করার পাশাপাশি স্বীয় মুনিবের হকও আদায় করে। তিন. ঐ ব্যক্তি যার কোন ক্রীতদাসী রয়েছে। আর সে তাকে উত্তম আদব শিখিয়েছে এবং উত্তমরূপে ইল্ম শিক্ষা দিয়েছে, অতঃপর তাকে আযাদ করে বিয়ে করেছে, তার জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব রয়েছে।'[৫]

ইরশাদ হচ্ছে :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ(ص) يَقُولُ إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا.

'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌নুল 'আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের থেকে 'ইল্ম উঠিয়ে নেন না, কিন্তু আলিমদের উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমেই 'ইল্ম উঠিয়ে নেবেন। যখন কোন আলিম অবশিষ্ট

---

[১] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৭৯, পৃ. ২০।
[২] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৮০, পৃ. ২০।
[৩] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৮১, পৃ. ২০।
[৪] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৮২, পৃ. ২০।
[৫] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৯৭, পৃ. ২২।

Dhaka University Institutional Repository

থাকবে না তখন লোকেরা মূর্খদেরকেই নেতা বানিয়ে নিবে। ফলে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে এবং তারা না জেনেই ফাতাওয়াহ দিবে। এতে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে, এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।'[১]

عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الأَمِيرُ أُحَدِّثْكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ النَّبِيُّ (ص) الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلاَ يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ (ص) فِيهَا فَقُولُوا إِنَّ اللهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ وَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَقِيلَ لأَبِي شُرَيْحٍ مَا قَالَ عَمْرٌو قَالَ أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ لاَ يُعِيذُ عَاصِيًا وَلاَ فَارًّا بِدَمٍ وَلاَ فَارًّا بِخَرْبَةٍ.

'আবূ শুরায়হ্ (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি 'আম্র ইব্ন সাঈদ (মাদীনার গভর্নর)-কে বললেন, যখন তিনি মাক্কায় সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিলেন– 'হে আমাদের নেতা! আমাকে অনুমতি দিলে আপনাকে এমন একটি হাদীস শুনাতে পারি যা মক্কাহ বিজয়ের পরের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন। আমার দু' কান তা শুনেছে, আমার হৃদয় তা আয়ত্ত রেখেছে এবং আমার দু' চোখ তা দেখেছে। তিনি আল্লাহ্র হাম্দ ও সানা বর্ণনা করে বললেন : মক্কাহকে আল্লাহ্ হারাম করেছেন, কোন মানুষ তাকে হারাম করেনি। তাই যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান রাখে তার জন্য সেখানে রক্তপাত করা, সেখানকার গাছ কাটা বৈধ নয়। কেউ যদি আল্লাহ্র রাসূলের (সেখানকার) যুদ্ধকে দলীল হিসেবে পেশ করে তাহলে তোমরা বলে দাও, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলকে এর অনুমতি দিয়েছিলেন; কিন্তু তোমাদেরকে তা দেননি। আমাকেও সে দিনের কিছু সময়ের জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন। অতঃপর পূর্বের মত আজ পুনরায় একে তার নিষিদ্ধ হবার মর্যাদা ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। উপস্থিত ব্যক্তিরা যেন অনুপস্থিতদের কাছে (আমার এ বাণী বা ইল্ম) পৌঁছে দেয়।' অতঃপর আবূ শুরায়হ্ (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হল, 'আপনার এ হাদীস শুনে 'আম্র কী বললেন?' [আবূ শুরায়হ্ বলেন,] তিনি বললেন : 'হে আবূ শুরায়হ্! (এ সম্পর্কে) আমি তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত। মাক্কাহ কোন বিদ্রোহীকে, কোন খুনের পলাতক আসামীকে এবং কোন পলাতক চোরকে আশ্রয় দেয় না।'[২]

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ذُكِرَ النَّبِيُّ (ص) قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا أَلاَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ صَدَقَ رَسُولُ اللهِ (ص) كَانَ ذَلِكَ أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ مَرَّتَيْنِ.

'আবূ বাকরাহ (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) এর কথা উল্লেখ করে বলেন, তিনি বলেছেন : তোমাদের জীবন এবং তোমাদের সম্পদ বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ (র) বলেন, 'আমার মনে হয়, তিনি বলেছিলেন : এবং তোমাদের সম্মান (অন্য মুসলিমের জন্য) এ শহরে এ দিনের মতই মর্যাদা সম্পন্ন। শোন, তোমাদের মধ্যকার উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে (আমার এ বাণী) পৌঁছে দেয়। বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ (রহ.) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) সত্য বলেছেন, তা-ই হয়েছে। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) দু'বার করে বললেন, হে লোকেরা! 'আমি কি পৌঁছে দিয়েছি?'[৩] অত্র হাদীসে ইল্ম এর প্রচারের কথা বলা হয়েছে।

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ قَالَ لاَ إِلاَّ كِتَابُ اللهِ أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ قُلْتُ فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الأَسِيرِ وَلاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

'আবূ জুহাইফাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি 'আলী ইব্ন আবূ ত্বালিব (রা)-কে বললাম, আপনাদের কাছে কিছু লিপিবদ্ধ আছে কি? তিনি বললেন : 'না, তবে আল্লাহ্র কিতাব অথবা মুসলিম ব্যক্তিকে প্রদত্ত জ্ঞান অথবা এই সহীফার মধ্যে যা কিছু রয়েছে।' তিনি [আবূ জুহাইফাহ (রা)] বলেন, আমি বললাম, এ সহীফায় কী রয়েছে? তিনি বললেন, 'ক্ষতিপূরণ ও বন্দী মুক্তি সম্পর্কিত বিষয়, আর এ বিধান যে, 'মুসলিমকে কাফির হত্যার বিনিময়ে হত্যা করা যাবে না।'[৪]

---

[১] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১০০, পৃ. ২৩।
[২] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১০৪, পৃ. ২৩।
[৩] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১০৫, পৃ. ২৩।
[৪] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১১১, পৃ. ২৪।

Dhaka University Institutional Repository

عَنْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (ص) أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلاَ أَكْتُبُ

'আবূ হুরাইরাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাহাবীগণের মধ্যে 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আম্র (রা) ছাড়া কারো কাছে আমার চেয়ে অধিক হাদীস নেই (হাদীসের জ্ঞান/ইল্ম)। কারণ তিনি লিখে রাখতেন, আর আমি লিখতাম না।'[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَوْلاَ آيَتَانِ فِي كِتَابِ اللهِ مَا حَدَّثْتُ حَدِيثًا ثُمَّ يَتْلُو {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى} إِلَى قَوْلِهِ {الرَّحِيمُ} إِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمْ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ الْعَمَلُ فِي أَمْوَالِهِمْ وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزَمُ رَسُولَ اللهِ (ص) بِشِبَعِ بَطْنِهِ وَيَحْضُرُ مَا لاَ يَحْضُرُونَ وَيَحْفَظُ مَا لاَ يَحْفَظُونَ .

'আবূ হুরাইরাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : লোকেরা বলে, আবূ হুরাইরাহ (রা) অধিক হাদীস বর্ণনা করে। যদি আল্লাহ্র কিতাবে (এই) আয়াত দু'টি না থাকত, তবে আমি একটি হাদীসও বর্ণনা করতাম না। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন : "আমি সেসব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথ-নির্দেশ অবতীর্ণ করেছি মানুষের জন্য কিতাবে তা বিস্তারিত বর্ণনার পরও যারা তা গোপন করে আল্লাহ্ তাদেরকে অভিশাপ দেন এবং অভিশাপকারীগণও তাদেরকে অভিশাপ দেয় কিন্তু যারা তাওবাহ করে এবং নিজেদের সংশোধন করে এবং সত্যকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে, আমি তাদের তাওবাহ কবুল করি, বস্তুতঃ আমি অত্যধিক তাওবাহ কবুলকারী, পরম দয়ালু।" (সূরাহ্ আল-বাক্বারাহ ২/১৫৯-১৬০)। (প্রকৃত ঘটনা হল,) আমার মুহাজির ভাইয়েরা বাজারে কেনাবেচায় এবং আমার আনসার ভাইয়েরা আর্থিক কাজ-কারবারে (জমি-জমা নিয়ে) মশগুল থাকতেন। কিন্তু আবূ হুরাইরাহ (রা) পেট পূর্তি হলেই (সর্বদা) রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে লেগে থাকতেন। তাই তারা যখন উপস্থিত থাকতেন না, তখন তিনি উপস্থিত থাকতেন এবং তারা যা মুখস্ত করতেন না তিনি তা মুখস্ত করতেন।'[২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنْسَاهُ قَالَ ابْسُطْ رِدَاءَكَ فَبَسَطْتُهُ قَالَ فَغَرَفَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ ضُمَّهُ فَضَمَمْتُهُ فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدَهُ

'আবূ হুরাইরাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম : 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আপনার কাছ থেকে বহু হাদীস শুনি কিন্তু ভুলে যাই।' তিনি বললেন : তোমার চাদর মেলে ধর। আমি তা মেলে ধরলাম। তিনি দু'হাত খাবল করে তাতে কিছু ঢেলে দেয়ার মত করে বললেন : এটা তোমার বুকে চেপে ধর। আমি তা বুকে চেপে ধরলাম। এরপর আমি আর কিছুই ভুলে যাইনি।'[৩]

حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ نَوْفًا الْبَكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى لَيْسَ بِمُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّمَا هُوَ مُوسَى آخَرُ فَقَالَ كَذَبَ عَدُوُّ اللهِ حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ { قَامَ مُوسَى النَّبِيُّ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَقَالَ أَنَا أَعْلَمُ فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ أَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ يَا رَبِّ وَكَيْفَ بِهِ فَقِيلَ لَهُ احْمِلْ حُوتًا فِي مِكْتَلٍ فَإِذَا فَقَدْتَهُ فَهُوَ ثَمَّ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ بِفَتَاهُ يُوشَعَ بْنِ نُونٍ وَحَمَلاَ حُوتًا فِي مِكْتَلٍ حَتَّى كَانَا عِنْدَ الصَّخْرَةِ وَضَعَا رُءُوسَهُمَا وَنَامَا فَانْسَلَّ الْحُوتُ مِنَ الْمِكْتَلِ }فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا{ وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِهِمَا وَيَوْمَهُمَا فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ }آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا{ وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى مَسًّا مِنَ النَّصَبِ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ }أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ{ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلاَّ الشَّيْطَانُ قَالَ مُوسَى }ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا{ فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ إِذَا رَجُلٌ مُسَجًّى بِثَوْبٍ أَوْ قَالَ تَسَجَّى بِثَوْبِهِ فَسَلَّمَ مُوسَى فَقَالَ الْخَضِرُ وَأَنَّى بِأَرْضِكَ

---

[১] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১১৩, পৃ. ২৪।
[২] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১১৮, পৃ. ২৫।
[৩] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১১৯, পৃ. ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

السَّلاَمُ فَقَالَ أَنَا مُوسَى فَقَالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ نَعَمْ قَال}هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَدًا قَالَ {إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرً} يَا مُوسَى إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَنِيهِ لاَ تَعْلَمُهُ أَنْتَ وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ عَلَّمَكَهُ لاَ أَعْلَمُهُ قَالَ {سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِرًا وَلاَ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا} فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ لَيْسَ لَهُمَا سَفِينَةٌ فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا فَعُرِفَ الْخَضِرُ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ فَجَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ الْخَضِرُ يَا مُوسَى مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ إِلاَّ كَنَقْرَةِ هَذَا الْعُصْفُورِ فِي الْبَحْرِ فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْحٍ مِنَ الْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ مُوسَى قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا {قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا} قَالَ لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا فَكَانَتْ الْأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا فَانْطَلَقَا فَإِذَا غُلاَمٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ مِنْ أَعْلاَهُ فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ فَقَالَ مُوسَى {أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا} قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَهَذَا أَوْكَدُ {فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ} قَالَ الْخَضِرُ بِيَدِهِ فَأَقَامَهُ فَقَالَ لَهُ مُوسَ{لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِك } قَالَ النَّبِيُّ (ص) يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا.

‘সাঈদ ইব্‌নু জুবায়র (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা)-কে বললাম, নাওফ আল-বাকালী মনে করে যে, মূসা (আ) [যিনি খাযির (আ)-এর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন তিনি] বানী ইসরাঈলের মূসা নন বরং তিনি অন্য মূসা। ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা) বললেন : আল্লাহ্‌র দুশমন মিথ্যা বলেছে। উবাঈ ইব্‌নু কা'ব (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) হতে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন : একদা মূসা (আ) বানী ইসরাঈলের মাঝে বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, সবচেয়ে জ্ঞানী কে? তিনি জবাবে বললেন, ‘আমি সবচেয়ে জ্ঞানী।’ আল্লাহ্ তাঁকে সতর্ক করে দিলেন। কেননা তিনি জ্ঞানকে আল্লাহ্‌র দিকে সোপর্দ করেন নি। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর কাছে এ ওয়াহী পাঠালেন : দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে আমার বান্দাদের মধ্যে এক বান্দা রয়েছে, যে তোমার চেয়ে বেশি জ্ঞানী। তিনি বলেন, ‘হে আমার রব্ব! কীভাবে তার দেখা পাব?’ তখন তাঁকে বলা হল, থলের মধ্যে একটি মাছ নিয়ে নাও। তারপর যেখানে সেটি হারিয়ে ফেলবে সেখানেই তাকে পাবে। অতঃপর তিনি ইউশা ‘ইব্‌নু নূনকে সাথে নিয়ে যাত্রা করলেন। তাঁরা থলের মধ্যে একটি মাছ নিলেন। চলতে চলতে তাঁরা একটি বড় পাথরের কাছে এসে পৌঁছলেন এবং সেখানে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। মাছটি থলে হতে বেরিয়ে সুড়ঙ্গের মত পথ করে সমুদ্রে চলে গেল। এটি মূসা (আ) ও তাঁর খাদিম-এর জন্য ছিল আশচর্যের বিষয়। অতঃপর তাঁরা তাদের বাকী দিন ও রাতভর চলতে থাকলেন। পরে ভোরবেলা মূসা (আ) তাঁর খাদিমকে বললেন, ‘আমাদের নাস্তা নিয়ে এসো, আমরা আমাদের এ সফরে খুবই ক্লান্ত, আর মূসা (আ)-কে যে স্থানের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, সে স্থান অতিক্রমের পূর্বে তিনি ক্লান্তি অনুভব করেন নি। এরপর তাঁর সাথী তাঁকে বলল, ‘আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন পাথরের পাশে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম?’ মূসা (আ) বললেন, ‘আমরা তো সেই স্থানটিরই অনুসন্ধান করছিলাম।’ অতঃপর তাঁরা তাঁদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চললেন। তাঁরা সেই পাথরের কাছে পৌঁছে দেখলেন, এক ব্যক্তি (বর্ণনাকারী বলেন,) কাপড় মুড়ি দিয়ে আছেন। মূসা (আ) তাঁকে সালাম দিলেন। তখন খাযির বললেন, এ দেশে সালাম কোথা থেকে এলো! তিনি বললেন, ‘আমি মূসা।’ খাযির জিজ্ঞেস করলেন, ‘বানী ইসরাঈলের মূসা (আ)?’ তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ। তিনি আরো বললেন, “সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে, তা থেকে শিক্ষা নিতে আমি কি আপনাকে অনুসরণ করতে পারি?’ খাযির বললেন, “তুমি কিছুতেই আমার সাথে ধৈর্য্য ধরে থাকতে পারবে না। হে মূসা (আ)! আল-াহ্‌র ‘ইল্‌মের মধ্যে আমি এমন এক ‘ইল্‌ম নিয়ে আছি যা তিনি শুধুমাত্র আমাকেই শিখিয়েছেন, যা তুমি জান না। আর তুমি এমন ‘ইল্‌মের অধিকারী, যা আল্লাহ্ তোমাকেই শিখিয়েছেন, যা আমি জানি না।” ‘মূসা

Dhaka University Institutional Repository

(আ) বললেন, "আল্লাহ্ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্য্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার নির্দেশ অমান্য করব না। অতঃপর তাঁরা দু'জন সমুদ্র তীর দিয়ে চলতে লাগলেন, তাঁদের কোন নৌকা ছিল না। ইতোমধ্যে তাঁদের পাশ দিয়ে একটি নৌকা যাচ্ছিল। তাঁরা নৌকাওয়ালাদের সাথে তাদের তুলে নেয়ার কথা বললেন। তারা খাযিরকে চিনতে পেরে বিনা ভাড়ায় তাঁদের নৌকায় তুলে নিল। তখন একটি চড়ুই পাখি এসে নৌকার এক কিনারায় বসে একবার কি দু'বার সমুদ্রে তার ঠোঁট ডুবাল। খাযির বললেন, 'হে মূসা (আ)! আমার এবং তোমার জ্ঞান আল্লাহ্র জ্ঞানের তুলনায় চড়ুই পাখির ঠোঁটে যতটুকু পানি এসেছে তার চেয়েও কম।' অতঃপর খাযির নৌকাটির একটি তক্তা খুলে ফেললেন। মূসা (আ) বললেন, এরা আমাদের বিনা ভাড়ায় আরোহণ করিয়েছে, আর আপনি আরোহীদের ডুবিয়ে দিতে নৌকাটি ছিদ্র করলেন?' খাযির বললেন, "আমি কি বলিনি যে, তুমি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্য্য ধরে থাকতে পারবে না?" মূসা (আ) বললেন, 'আমার ভুলের জন্য আমাকে পাকড়াও করবেন না এবং আমার ব্যাপারে অধিক কঠোর হবেন না।' বর্ণনাকারী বলেন, এটা মূসা (আ)-এর প্রথমবারের ভুল। অতঃপর (নৌকা থেকে নেমে) তাঁরা দু'জন চলতে লাগলেন। (দেখলেন) একটি বালক অন্যান্য বালকের সাথে খেলা করছিল। খাযির তার মাথার উপর দিক ধরে নিজ হাতে তার মাথা ছিন্ন করে ফেললেন। মূসা (আ) বললেন, 'আপনি হত্যার অপরাধ ছাড়াই একটি নিরপরাধ প্রাণীকে হত্যা করলেন ?' খাযির বললেন "আমি কি তোমাকে বলিনি যে, তুমি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্য্য ধরতে পারবে না?" ইব্ন 'উয়ায়নাহ (র.) বলেন, এটা ছিল পূর্বের চেয়ে অধিক জোরালো। অতঃপর আবারো চলতে লাগলেন; চলতে চলতে তারা এক গ্রামের অধিবাসীদের কাছে পৌঁছে তাদের কাছে খাদ্য চাইলেন কিন্তু তারা তাঁদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। সেখানে তাঁরা দেখলেন, একটি প্রাচীর ধ্বসে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। খাযির তাঁর হাত দিয়ে সেটি দাঁড় করে দিলেন। মূসা (আ) বললেন, "আপনি ইচ্ছে করলে এ কাজের মজুরী নিতে পারতেন। তিনি বললেন, 'এখানেই তোমার ও আমার মাঝে সম্পর্কের অবসান।"(সূরা কাহ্ফ : ৭৭-৭৮) রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা মূসার উপর রহম করুন। আমাদের কতই না ভাল লাগত যদি তিনি ধৈর্য্য ধরতেন, তাহলে আমাদের কাছে তাঁদের আরো ঘটনাবলী বর্ণনা করা হতো।'[১]

ইরশাদ হচ্ছে :

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ (ص) فِي خَرِبِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيبٍ مَعَهُ فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَلُوهُ عَنْ الرُّوحِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ تَسْأَلُوهُ لاَ يَجِيءُ فِيهِ بِشَيْءٍ تَكْرَهُونَهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَنَسْأَلَنَّهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ مَا الرُّوحُ فَسَكَتَ فَقُلْتُ إِنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ فَقُمْتُ فَلَمَّا انْجَلَى عَنْهُ قَالَ : (وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً) . قَالَ الْأَعْمَشُ هَكَذَا فِي قِرَاءَتِنَا.

'আবদুল্লাহ্ ইবনু মাস'উদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা) এর সঙ্গে মাদীনার বসতিহীন এলাকা দিয়ে চলছিলাম। তিনি একটি খেজুর ডালে ভর দিয়ে একদল ইয়াহুদীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এ সময় তারা একে অন্যকে বলতে লাগল, 'তাঁকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন কর।' আরেকজন বলল, 'তাঁকে কোন প্রশ্ন করো না, হয়ত এমন উত্তর দিবেন যা তোমরা অপছন্দ করো।' আবার কেউ বলল, 'তাঁকে আমরা অবশ্যই প্রশ্ন করব।' অতঃপর তাদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, 'হে আবুল ক্বাসিম! রূহ কী?' রাসূলুল্লাহ (সা) চুপ করে রইলেন, আমি (মনে মনে) বললাম, তাঁর প্রতি ওয়াহী অবতীর্ণ হচ্ছে। কাজেই আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। অতঃপর ওয়াহীর অবস্থা কেটে গেলে তিনি বললেন : "তারা তোমাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলুন রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশ ঘটিত। এবং তাদেরকে অতি অল্পই জ্ঞান দেয়া হয়েছে।" (সূরাহ্ আল-ইসরা ১৭ : ৮৫)'[২]

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী :

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَا

---

[১] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১২২, পৃ. ২৫।

[২] *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১২৫, পৃ. ২৬।

Dhaka University Institutional Repository

'নিশ্চয় আমি তোমাকে পাঠ করাব, ফলে তুমি বিস্মৃত হবে না, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করবেন তা ব্যতীত।'[১]
এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন :

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

'পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন; সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট বাঁধা রক্তের এক পিণ্ড হতে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন; শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। অন্যত্র আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন :

الرَّحْمَنُ ﴿ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴿ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

'দয়াময় আল্লাহ্, তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুর'আন, তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তিনিই তাঁকে শিখিয়েছেন ভাব প্রকাশ করতে।'[২] অতঃপর আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন :

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

'যেমন আমি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি, যে আমার আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট তেলাওয়াত করে, তোমাদেরকে পবিত্র করে এবং কিতাব ও হিক্‌মত শিক্ষা দেয় এবং তোমরা যাহা জানিতে না তা শিক্ষা দেয়।'[৩] এভাবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা) এর পক্ষ থেকে ইল্‌ম অর্জন, চর্চা ও ইল্‌ম ফজিলত সম্পর্কে অসংখ্য আয়াত ও হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের পরিচয়

মানুষ মানবিক দায়িত্ব যথাযথরূপে পালনের জন্য দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক জ্ঞান ও গুণাবলীর প্রয়োজন। তা অর্জনের জন্য শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হয়, তা-ই হলো শিক্ষা-দর্শন। আর দ্বীনি শিক্ষা হলো হালাল-হারাম, ন্যায়-অন্যায়, আদেশ-নিষেধ, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের (সা) নির্দেশিত পথে জীবনাচারের শিক্ষা। এক কথায়, কুর'আন ও হাদীসের মাধ্যমে যে জ্ঞানার্জন করা হয় তা-ই ইসলামী শিক্ষা-দর্শন। ইহলৌকিক সুখ ও পারলৌকিক শান্তির জন্য ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। শিক্ষা-দর্শন মানব জীবনের এক অমূল্য সম্পদ। শিক্ষা-দর্শন মানুষের প্রাণশক্তি, জাতির মেরুদণ্ড, উত্থান-পতনের মানদণ্ড। জাতির উন্নতি-অবনতি শিক্ষা-দর্শনের মানদণ্ডেই বিবেচিত হয়ে আসছে। সুশিক্ষায় জাতি অগ্রগতির পথে অগ্রসর হয়, দুনিয়ায় আধিপত্য স্থাপনে সমর্থ হয়। শিক্ষা আর অশিক্ষার মধ্যে ব্যবধান দুস্তর। একজন শিক্ষিত আর একজন অশিক্ষিতের উপর দৃষ্টি নিবন্ধ করলেই এ প্রভেদ সম্যক উপলব্ধি করা যায়। জ্ঞান অর্জনই শিক্ষা-দর্শন; মানুষের সহজাত বর্ধনশীল সম্ভবনার বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন। যে সকল অন্তর্নিহিত শক্তি ক্রমশ পরিপক্ক হতে পারে সে সব বাঞ্ছিত রূপদানের জন্য পরিকল্পিত যে কোন প্রক্রিয়াই শিক্ষা-দর্শন।[৪] ব্যাপকার্থে পদ্ধতিগত জ্ঞান লাভের প্রক্রিয়াকেই শিক্ষা-দর্শন বলে । তবে তা হলো সম্ভবনার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের অব্যাহত অনুশীলন। অন্যভাবে বলা যায়, শিক্ষা-দর্শন হলো বিকশিত ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ প্রকাশ। বাংলা শিক্ষা শব্দটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ 'শাস' ধাতু থেকে, যার অর্থ হলো শাসন করা বা উপদেশ দান করা। আমরা শিক্ষা শব্দের পরিবর্তে অনেক সময় 'বিদ্যা' শব্দ ব্যবহার করে থাকি। এটিও সংস্কৃত 'বিদ' ধাতু হতে উদ্ভূত।[৫] যার অর্থ হলো জানা বা জ্ঞানার্জন করা। শিক্ষার ইংরেজী প্রতিশব্দ

---

[১] আল কুর'আন, ৮৭ : ৬-৮।

[২] আল কুর'আন, ১ : ১-৪।

[৩] আল কুর'আন, ২ : ১৫১।

[৪] মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী, *মেশকাত শরীফ*, ২য় খ. (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৮৭ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৩-৪।

[৫] সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলা বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খ. ১ম সংখ্যা (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৬ খৃস্টাব্দ) পৃ. ৪৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

Education[১] শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ `Educere' বা `Educatum' থেকে। যার অর্থ হলো শিক্ষাদান ও প্রতিপালন, শিক্ষাদান, শিক্ষা, প্রতিপালন করা, শিক্ষিত করে তোলা, শিক্ষা দেয়া, অভ্যাস করানো।[২] Educere'শব্দের অর্থ হলো to nourish, to bring up অর্থাৎ প্রতিপালন ও পরিচর্যা করা। Educatum' এর অর্থ "to lead" হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। ফলে এক্ষেত্রে কোন কিছু 'পরিচালিত করা' বা 'বের করা' বা 'প্রভাবিত করা'কে 'শিক্ষা' বলা হয়েছে। এসব শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থের দিক থেকে বলা চলে যে, ব্যক্তির সহজাত বুদ্ধি বা সম্ভাবনাকে বিকশিত ও পরিচালিত করাই হচ্ছে শিক্ষা। ব্যক্তির, বিশেষত শিশুর শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক বিকাশ সাধন করে তাকে প্রতিষ্ঠিত জীবনের দিকে পরিচালিত করাই শিক্ষার কাজ। মূল ল্যাটিন শব্দসমূহের ভিত্তিতে ইংরেজি "Education" শব্দটির ব্যাপক অর্থ করা যায়, "কোন জ্ঞান বা কৌশল আয়ত্ত করাই শিক্ষা। যেমন, আদিমকালে কেউ যখন তার পিতা বা মাতা অথবা সমাজের অন্যান্য বয়ঃপ্রাপ্তদের নিকট থেকে শিখেছিল কেমন করে পশু-পাখি শিকার করতে হয় বা ফল আহরণ করতে হয় অথবা কেমন করে কুটির তৈরি করতে হয়, সেটাকে শিক্ষা হিসেবে গণ্য করা হয়। আবার আধুনিককালে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান দিয়ে রোগ চিকিৎসা অথবা বিমান চালানোর কৌশলও শিক্ষা হিসেবে পরিগণিত।

বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে শিক্ষার অর্থ- অভ্যাস চর্চা প্রভৃতি দ্বারা আয়ত্বকরণ বিদ্যা চর্চা, অধ্যয়ন, এলেম, বিদ্যা বা জ্ঞান লাভ; উপদেশ নির্দেশ; অভিজ্ঞতা; আক্কেল; বুদ্ধি।[৩] সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করাও এর অর্থ।[৪] 'শিক্ষা' পৃথিবীর সকল দেশেই অতি পরিচিত একটি প্রত্যয়। তবে শিক্ষার বিশেষ কোন একটি 'ধারণা' কখনই সর্বজনগ্রাহ্যতা অর্জনে সক্ষম হয়নি। শিক্ষা চিন্তাবিদগণের দৃষ্টিভঙ্গি, অনুসন্ধান পদ্ধতি ও কৌশল এবং সিদ্ধান্ত গঠনে ভিন্নতার কারণে শিক্ষার ধারণা হয়ে ওঠেছে বহুমাত্রিক। 'শিক্ষা' বলতে কী বোঝায় অর্থাৎ শিক্ষার ধারণা বা সংজ্ঞার ক্ষেত্রে কখনই শিক্ষাচিন্তাবিদগণের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সমাজ ও কালভেদে যেমন তাতে পার্থক্য বিরাজমান, তেমনি একই সমাজ ও কালে রয়েছে দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা। তবে শিক্ষার 'ধারণা' ক্রমশ সামাজিক উপাদানসমূহের সাথে অধিকতর সম্পৃক্ততা লাভ করেছে।

সাধারণ ধারণা অনুযায়ী মানুষ বা ব্যক্তি যা কিছু শেখে তাকেই 'শিক্ষা' নামে অভিহিত করা হয়। এ থেকে মানুষের জৈবিক, মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের বিবর্তনধারার সাথে শিক্ষার বিবর্তন ও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কালক্রমে 'শিক্ষা' মানুষের মূল্যবোধসম্পৃক্ত প্রপঞ্চে রূপলাভ করেছে। এক্ষেত্রে সামাজিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত 'শিখন' অংশকে 'শিক্ষা' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। তবে কাল ও সমাজভেদে এই মূল্যবোধের ভিন্নতা ও বহুমাত্রিকতার কারণে শিক্ষার ধারণা এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যেও বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষার কিছু কিছু দিক সর্বজনীন হলেও বহুলাংশেই তা সমাজকেন্দ্রিক আপেক্ষিকতা ও ভিন্নতা লাভ করেছে। ইউরোপে যেমন ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষাকে অন্যান্য ভাষার মূল হিসেবে গণ্য করা হয় তেমনি উপমহাদেশের ভাষাসমূহের বিশেষত 'বাংলা' ভাষার ভিত্তি হিসেবে 'সংস্কৃত'কে ধরা হয়। 'সংস্কৃত' ভাষায় 'বিদ্যা' শব্দটির উদ্ভব ঘটেছে 'বিদ্' থেকে, যার অর্থ 'জানা'। বস্তুত, 'জ্ঞান লাভ করা' বা 'জ্ঞাত হওয়া' অর্থে 'জানা' বলতে 'শিক্ষা লাভ' বোঝায়। বাংলা 'শিক্ষা' শব্দটির উৎপত্তি ঘটেছে সংস্কৃত ধাতু 'শাস' থেকে, যার অর্থ 'শাসন, নিয়ন্ত্রণ, নির্দেশ বা উপদেশদান'। শাব্দিক

---

১. *Collier's Encyclopedia*, Vol-08 (United States of America: The Crowell- Collier Publishing company, 1965), pp. 558-621; *Encyclopedia Britannica*, Vol-vii, 9th edition (Edinburgh: Adam & Charls black, 1875), pp.670-680.

২. Sailendra Biswas, *Samsad English Bangla Dictionary*, 22nd edition (Calcata: 1988), p. 338.

৩. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০০ খৃস্টাব্দ) পৃ. ১০৭৯।

৪. Manish L. Narwani G. Balasubramanian, *Narwani Dictionary of Synonyms and Antonyms*, Manish L. Narwani for Educational Publisher, 17A, Ganga Prasad Mukharji Road, Kolkata 700025. p. 155.; শহীদ নাসিম, *শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি* (ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, ১৯৯৭ খৃস্টাব্দ) পৃ. ৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থে 'শাস্' ধাতু কঠোর কাঠামোগত পরিচালনমূলক উদ্দেশ্যের অধিকারী হলেও ব্যাপক অর্থে তা 'যথাযথ নির্দেশনার মাধ্যমে ব্যক্তির সুপ্ত সম্ভাবনার বিকাশ সাধন' অর্থে প্রয়োগ করা যায়।

এসব শাব্দিক ও বুৎপত্তিগত অর্থকে কেন্দ্র করে 'শিক্ষা-দর্শনের' সংজ্ঞা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, ধারা, প্রকৃতি ইত্যাদি নিয়ে প্রাচীনকাল থেকেই শিক্ষাচিন্তার সূত্রপাত ঘটেছে। ইসলাম এর আগমনের পর কালক্রমে তা বিভিন্ন ধর্মে[১] নানা ধারায় বিকশিত হয়েছে। দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, নীতিবিজ্ঞান ইত্যাদি বহুবিধ দৃষ্টিকোণ থেকে 'শিক্ষা-দর্শনের' স্বরূপ অন্বেষণ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এসবের কিছু দিকের প্রতি নিচে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো।

এ কথা আগেই বলা হয়েছে 'শিক্ষা-দর্শন' মানুষের জীবন ও সমাজসম্পৃক্ত একটি প্রক্রিয়া। সামাজিক বিবর্তন ধারার সাথে শিক্ষা-দর্শন অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। বলা যায়, এ বিবর্তন শিক্ষা প্রক্রিয়ারই ফল। আবার বিপরীত দিক থেকে বলা চলে, শিক্ষার গতি-প্রকৃতি সামাজিক বিবর্তনধারারই উৎপাদ। ফলে একটা স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া হিসেবে শিক্ষাকে সমাজ প্রক্রিয়া থেকে মূর্তভাবে আলাদা করা সম্ভব নয়। 'শিক্ষা-দর্শন'কে একটি বিশেষ সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে গণ্য করা হয়েছে; যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক কর্ম সাধিত হয়। শিখন প্রণালীর দিক থেকে শিক্ষার বিভিন্ন ধরন চিহ্নিত করা হয়েছে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা (formal education), উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

---

[১] বিশ্ব সমাজে শান্তি, কল্যাণ ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠার জন্য যতগুলো প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে ধর্ম তার অন্যতম। ধর্মের প্রভাব মানুষকে যতটা সম্মোহিত করে, ততোটা আর কোন নীতিই করে না। ধর্মকে বাদ দিয়ে বা ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানকে আলাদা করে দিয়ে সমাজ জীবনের কোন চিত্র উজ্জল করা সম্ভব নয়। (ড. মাযহার উদ্দিন সিদ্দিকী, *ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম*, অনুবাদঃ মাওলানা মুহাম্মদ হাসান রহমতী (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১ খৃস্টাব্দ), পৃ. ১৩; ধর্ম শব্দের আভিধানিক অর্থ 'মন যা পোষণ বা ধারণ করে'। (*বাংলা ব্যবহারিক অভিধান*, ড. মুহাম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০০৮ খৃস্টাব্দ), পৃ.৬৩৯; আর পারিভাষিক অর্থ: 'বিভিন্ন জাতির বা সম্প্রদায়ের সৃষ্টিকর্তা ও পাপ-পুণ্যাদি বিষয়ক বিশ্বাস এবং ইহলৌকিক শান্তি ও পারলৌকিক পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে অনুসৃত আচার-আচরণ, উপাসনা পদ্ধতি এবং সাংসারিক দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সম্পর্কিত কার্যাবলী। (*ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম*, প্রাগুক্ত, *পৃ.২০); কাজেই* ধর্ম হলো:মানুষ তার অন্তরের বিশ্বাসে যা ধারণ করে এবং তার চিন্তায়, চেতনায় ও কর্মে যার প্রতিফলন ঘটায়। যে আদর্শকে মানব সমাজ তার জীবনেরপ্রতিটি স্তরে ধরে রেখেছে, সেটাই ধর্ম। ড. আল্লামা ইকবাল (১৮৭৭ খৃস্টাব্দ মৃত্যু ১৯৩৮) পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯০৫ সালে উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিলেতে যান। জার্মানীর মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় হতে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন; এবং লন্ডনের লিকন ইন্স থেকে ব্যারিষ্টারী পাশ করেন। তিনি ছিলেন দার্শনিক , কবি, ও ইসলামী চিন্তাবিদ। (Editorial Board, *Bangladesh Islamic Directory, Muslim World*, (London: Al-Qur'an Academy , 2006), p. 8-9; ড. মোঃ আহসান হাবিব, *প্রারম্ভিক নৃবিজ্ঞান* (ঢাকাঃ গ্রন্থ কুটির, ২০০৯ খৃস্টাব্দ), পৃ.২৫৫। বলেন, Religion is not a departmental affair. It neither mere thought, Nor mere action. It is an expression of the whole man. 'ধর্ম কোন বিভাগীয় বিষয় নয়। তা শুধুমাত্র দর্শন চিন্তাও নয় অথবা শুধুমাত্র কিছু কার্যাবলীর নামও নয়, এটা মানুষের পূর্ণ জীবনের সুস্পষ্ট বিধানের সমষ্টি' E.B Tylor ধর্মের সংজ্ঞায় বলেন- Religion is the belief in the super natural beings. '*ধর্ম হলো অতি প্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস* (ড. মোঃ আহসান হাবিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬); ' Lord Boglan ধর্মের সংজ্ঞায় বলেন- A man's religion is the sum total of his belief and practices in respect of what we call the super natural 'অতি প্রাকৃত শক্তিকে কেন্দ্র করে যেসব বিশ্বাস এবং ক্রিয়াকল্পের উদ্ভব হয়েছে সেসব কিছুর সমষ্টি হলো ধর্ম' (ড. মোঃ আহসান হাবিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬); Dr. Helaluddin Khan Arefin ধর্মের সংজ্ঞায় বলেন- Religion is the manipulation of extra Human power. 'ধর্ম হলো মানব কল্যাণে (নিবেদিত) দক্ষতার সাথে পরিচালিত একটা আলাদা শক্তি' (ড. মোঃ আহসান হাবিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬); A.F.C Wallace ধর্মের সংজ্ঞায় বলেন- Religion as, beliefs and ritual concerned with super natural beings, power and force. 'ধর্ম হলো অতি প্রাকৃত শক্তির অস্তিত্বের বিশ্বাসে পরিচালিত প্রভাবশীল আচার-অনুষ্ঠানসমূহ'। (Anthony F.C Wallace, *Religion; an thropologica View* (London: Ramdom House, 1966), p.18.

Dhaka University Institutional Repository

(nonformal education) এবং অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা (informal education)-কে আধুনিককালে শিক্ষার প্রধান প্রধান ধরন হিসেবে গণ্য করা হয়।

শিক্ষা-দর্শনের ধারনার ক্রমবিকাশের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে 'আত্মবিশ্বাসী হওয়া', আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হওয়া' এবং 'মুক্তি' লাভের উপায় হিসেবে শিক্ষা-দর্শনকে দেখা হয়েছে। শিক্ষা সম্পর্কে ঋকবেদে বলা হয়েছে যে, শিক্ষা মানুষকে (নারী[১]-পুরুষকে) আত্মবিশ্বাসী করে তোলে এবং আত্ম-অভ্যাস ব্রতে

---

[১]. 'নারী' বাংলা শব্দ। এর ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো: Women, আরবী প্রতিশব্দ হলো: النساء 'নিসা' আল কুর'আনের একটি সূরার নাম। আভিধানিক অর্থ নারীগণ। ইহা امراة এর বহুবচন। অনেক বিধি-বিধান সম্বলিত এ সূরার অধিকাংশ বিষয় নারী সম্পর্কিত। নারী পুরুষের মতই আল্লাহ্ পাকের এক অপার সৃষ্টি। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে নারী-পুরুষে কোন ভেদাভেদ নেই। নারী-পুরুষের সম্মানের ক্ষেত্রে কেউ কারো অধস্তন নয়। ইসলামে নারীর মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীকে শান্তিময় স্বর্গ হিসেবে কল্পনা করতে গেলে নারী-পুরুষ উভয়ের সমুন্নত মর্যাদা থাকা প্রয়োজন। এজন্য আল্লাহ্ পাক নারীদের হক, অধিকার ও সম্মান-অবস্থান বিষয়ে আল কুর'আনে সূরা নাযিল করেছেন। এ সম্পর্কিত আল কুর'আনের সর্ববৃহৎ সূরা হলো 'সূরা আন নিসা'। কুফাবাসীদের মতে এ সূরাটির আয়াত সংখ্যা-১৭৬ অপরদিকে শামীদের মতে ১৭৭ এবং অন্যদের মতে ১৭৫। মুসলিম জীবনের অভ্যন্তরীণ ও বহির্গত বিভিন্নমূখী বিধিবিধানে ভরপুর এই সূরাটি। এর সূচনা পর্বে সকল অনুশাসনের মূল নিয়ামক তাকওয়া অর্থাৎ প্রকাশ্যেও গোপনে সর্বোতভাবে আল্লাহ্ পাক কে ভয় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 'নারী' আমাদের মা , নারী আমাদের কন্যা, নারী আমাদের বোন ও নারী আমাদের স্ত্রী। তাই নারীর মর্যাদা ইসরামে অতি উচ্চে। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় আল্লাহ্ পাক আল কুর'আনে সূরা ও আয়াত নাযিল করেছেন।

প্রথমত সূরা নিসাতে আল্লাাহ পাক ইরশাদ করেন :

وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا

'ইয়াতিমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ সমর্পন করবে এবং ভালোর সাথে মন্দ বদল করবেনা, তোমাদের সম্পদের সাথে তাদের সম্পদ মিশিয়ে গ্রাস করিও না; নিশ্চয় ইহা মহাপাপ। তেমরা যদি আশংকা কর যে, ইয়াতিম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবেনা, তবে বিয়ে করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভালো লাগে, দু, তিন অথবা চার; আর যদি আশংকা কর যে, সুবিচার করতে পাররে না তবে একজনকে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে। এতে পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর সম্ভবনা।'(আল কুর'আন, ৪ : ২-৩)।

আল্লাহ্ পাক ইয়াতিম নারীদের এমন অবস্থা বর্ণনার সাথে সাথে বিবাহ সম্পর্কিত অন্যান্য বিধান যথা মোহরানা ও অন্যান্য প্রদত্ত সামগ্রী ফেরৎ না নেয়ার বিধান বর্ণনা করেছেন। যেমন ইরশাদ হচ্ছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿﴾ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا

'হে ঈমানদার লোকেরা নারীদেরকে জবরদস্তি উত্তরাধিকার গণ্য করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ তা হতে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রেখ না, তোমরা যদি তাদেরকে অপছন্দ করো তবে এমন হতে পারে যে, আল্লাহ্ তাতে প্রভত কল্যাণ রেখেছেন তোমরা তাতেই অপছন্দ করছো। তোমরা যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চাও এবং তাদেও একজনকে অগাধ অর্থও দিয়ে থাক, তবুও উহা হতে কিছুই প্রতিগ্রহণ করবেনা তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ আর পাপাচারণ দ্বারা উহা গ্রহণ করবে?।'

এভাবে আল্লাহ্ পাক নারীদের কল্যাণে সকল বিষয়ে বিধান নাযিল করেছেন। আর ইসলাম পূর্ব অবহেলিত নারী সমাজ পেয়েছে ইসলামের সুমহান মর্যাদা। নারীদের পরিচয়, অধিকার, নারী সম্পর্কিত বিধি-বিধান ইত্যকার সকল বিষয়ে অসংখ্য আয়াত নাযিল করেছেন। যেমন : ১. সূরা আল বাকারা- ১৮৭, ২২২, ২২৩, ২২৬, ২৩১, ২৩২, ২৩৫, ২৩৬, ও ২৪৯ নং আয়াত। সূরা আলে ইমরান: ১৪, ৪২, ৬১। সূরা নিসা: ০১, ০৩, ০৪, ০৭, ১১, ১৫, ১৯, ২২, ২৩, ২৪, ৩২, ৩৪, ৪৩, ৭৫, ৯৮, ১২৮, ১২৯, ১৭২। সূরা মায়িদা: ০৬। সূরা আল আ'রাফ: ৮১, ১৪১, ১২৮। সূরা নূও : ৩১,৬০। সূরা নমল : ৫৫। সূরা আহ্যাব: ৩০, ৩২, ৫২, ৫৫, ৫৯। সূরা ফাত্হ : ২৫। সূরা হুজরাত: ১১। সূরা তালাক: ০১,০৪। সূরা ইব্রাহীম : ০৬। সূরা কাসাস: ০৪। সূরা গাফির: ২৫। সূরা মুযাদালা: ০২, ০৩।

Dhaka University Institutional Repository

উদ্বুদ্ধ করে। উপনিষদে বলা হয়েছে যে, শিক্ষা হল এমনই একটি প্রক্রিয়া যার চূড়ান্ত অর্থ 'মানুষের মুক্তি'। ভারতীয় দর্শনে শিক্ষাকে আত্ম-পরিতৃপ্তি লাভের উপায় হিসেবেও দেখা হয়েছে। দার্শনিক কণ্বাদ এ অর্থেই শিক্ষাকে বিবেচনা করেছেন। আবার ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য শিক্ষাকে মানুষের চরিত্র গঠন এবং পৃথিবী তথা সমাজ উপযোগী করার প্রক্রিয়া হিসেবে গণ্য করেছেন। চাণক্য বা কৌটিল্য শিক্ষাকে দেশসেবার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ লাভ ও জাতির প্রতি যথার্থ ভালবাসা প্রদর্শন হিসেবে বিবেচনা করেছেন। আর শঙ্কারাচার্যের মতে 'শিক্ষা হলো আত্মোপলব্ধির উপায়মাত্র'।[১]

প্রাচীনকালে ভারতের বাইরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দার্শনিক ও শিক্ষাচিন্তাবিদগণও শিক্ষা বলতে প্রধানত মানুষ ও সমাজের জন্য কল্যাণকর নৈতিক ও নান্দনিক জীবনবিকাশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। চীনা দার্শনিক কনফুসিয়াসের শিক্ষাতত্ত্বের মূল কথা হলো শিক্ষা নানাগুণে গুণান্বিত উন্নত চরিত্রের 'ভদ্রলোক' তৈরি করবে, 'যে' হীনতা জয় করে সত্য অনুসন্ধানে নিয়োজিত থাকবেন। তবে এক্ষেত্রে তিনি বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি পোষন করে শিক্ষাকে পেশা ও জীবন ধারণের প্রধান অবলম্বন করে তুলেন। প্রাচীন চীনের অপর দার্শনিক লাঁচা (কনফুসিয়াসের সমসাময়িক) প্রকৃতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে ছকবাধা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বদলে প্রকৃতির উদার পরিবেশে শিক্ষা লাভের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি শিক্ষার মাধ্যমে আত্মিক উন্নতি বিধানের কথা বলেছেন। প্রাচীন চীনের শিক্ষায় কনফুসিয়াসের মানবতাবাদী দর্শনের সঙ্গে লাঁচাঁর প্রকৃতিবাদী ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় ঘটেছিল।[২]

প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতার স্বর্ণ যুগের পর মধ্যযুগে ইউরোপের শিক্ষাক্ষেত্রে খ্রিস্ট ধর্মের প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিতত হয়। এ পর্যায়ে খ্রিস্ট ধর্মের নীতি ও আদর্শ সঞ্চালনই ইউরোপীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হয়। আর 'চার্চ' শিক্ষা পরিচালনার মূল দায়িত্ব পালন করতে থাকেপ্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় কালক্রমে সনাতন (হিন্দু)[৩] ধর্মের নীতি-প্রথা, আচাররীতি, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান প্রাধান্য বিস্তার করে। মধ্যযুগে হিন্দু

---

[১] আব্দুল মালেক মরিয়ম বেগম ফখরুল ইসলাম ও শেখ শাহবাজ রিয়াজ, *শিক্ষা বিজ্ঞান ও বাংলাদেশের শিক্ষা* (ঢাকা: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ১৮/১ ব্লক-ই, আগারগাঁও, ২০০৯ খৃস্টাব্দ), পৃ. ১-৩২।

[২] প্রাচীন গ্রীস ও রোমে শিক্ষা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের সমাজ-দার্শনিক মতবাদের বিকাশ ঘটেছিল। বিশেষ করে গ্রীসের শিক্ষাক্ষেত্রে সফিস্টদের মতবাদ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এ মতবাদে 'ব্যক্তিস্বাধীনতা'কে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এমনকি, সমাজের সব কিছুর ওপর মানুষকে স্থান দেওয়া হয়েছে। সফিস্টরা মানুষের বিকাশ ও উন্নতিকে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হিসেবে গণ্য করেছেন। সক্রেটিস ও প্লেটোর শিক্ষাদর্শনেও ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁরা শিক্ষাকে ব্যক্তির ভেতর সততা ও ন্যায়বোধ সঞ্চালনের অবলম্বন হিসেবে গণ্য করেছেন। শিক্ষা আদর্শ রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ব্যক্তিকে প্রস্তুত করবে এবং তার সমন্বিত ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করবে। এটিই ছিল শিক্ষা বিষয়ে প্লেটোর প্রধান বক্তব্য। এ বক্তব্যের সূত্র ধরে বলা যায়, প্লেটোর মূল লক্ষ্য ছিল এমন কতক ব্যক্তি সৃষ্টি করা, যারা রাষ্ট্র ও নাগরিকের কল্যাণসাধন ও ন্যায়বিচার বিধানে ব্রতী হবেন। এরিস্টটলীয় শিক্ষার লক্ষ্য ছিল ব্যক্তি তথা নাগরিককে তারা প্রজ্ঞা ও মেধা অনুশীলনের সাহায্যে বিবেকবান ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন করে তোলা, যার জীবন হবে একান্তভাবে বাস্তব চিন্তাসম্পৃক্ত। এরিস্টটল শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে 'প্রজ্ঞা' ও অভ্যাস উভয়েরই সমন্বিতভাবে ক্রিয়াশীল হওয়া আবশ্যক' বলে মন্তব্য করেছেন। অর্থাৎ প্লেটো ও এরিস্টটল ভিন্নমুখী দর্শনের প্রবক্তা হলেও শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তিসত্তার বিকাশ সাধনের ওপর উভয়ই গুরুত্বারোপ করেছেন। তবে রোমান দার্শনিকরা গ্রীকদের তুলনায় বেশি বাস্তববাদী ছিলেন। প্রাচীন রোমান শিক্ষাব্যবস্থায় এর প্রতিফলনও লক্ষ্য করা যায়। রোমানরা যুদ্ধপ্রিয়, কর্মনিপুণ, উচ্চাভিলাষী ও বলিষ্ঠ জাতি হিসেবে অতীত ও ভবিষ্যত অপেক্ষা বর্তমানকে প্রাধান্য দিতেন। এজন্য প্রাচীন রোমান শিক্ষাব্যবস্থায় ফলিতবিজ্ঞান ও কারিগরি শিল্প ইত্যাদির উপস্থিতি রয়েছে। আসলে বাস্তব প্রয়োজনে রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত ও নৈতিক গুণসম্পন্ন নাগরিক সৃষ্টি করাই ছিল রোমান শিক্ষার মূল লক্ষ্য। (*শিক্ষা বিজ্ঞান ও বাংলাদেশের শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১-৩২)।

[৩] 'হিন্দু' শব্দটি হিন্দ থেকে উৎকলিত। হিন্দ প্রাচীন পাহলবী ভাষার শব্দ। আরবী ভাষায়ও এ শব্দের উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। বাংলা একাডেমী আরবী-বাংলা অভিধানে আরবী 'হিন্দ' শব্দের অর্থ একশত বা তদুর্ধ উটের দল, মেয়ে লোকের নাম, ভারত বর্ষ ইত্যাদি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বহির্বিশ্বে 'হিন্দুস্থান' 'হিন্দিয়া' বা 'ইন্ডিয়া' নামে পরিচিত। খ্রিষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর পূর্বেকার মিশরীয় হায়রোগ্লিফিক লিপিতে সর্বপ্রথম হিন্দুস্থান নামের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। বহির্বিশ্বে ভারত হিসেবে কেউ এ অঞ্চলকে চিনেনা। প্রাচীন যুগে ভারত নামে এক কাল্পনিক রাজা এ দেশে বসবাস করতো। অনেক ঐতিহাসিকের মতে তাঁর নাম

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাব্যবস্থার এটিই ছিল প্রধান ধারা। উচ্চ বর্ণের হিন্দু শিশুরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সন্তানেরা (অবশ্যই ছেলে শিশু) এর ধারার শিক্ষার অংশ নিতে পড়তো। তবে পাঠশালা শিক্ষাব্যবস্থায় কিছু পার্থিব বিষয় শিক্ষা দেওয়া হতো। অব্রাহ্মণ সন্তানেরা পাঠশালায় পড়তো। কিছু কিছু মুসলমান ছাত্রও পড়তো। পঞ্চানন মণ্ডলের নিম্নোক্ত মন্তব্যে এর প্রমাণ মেলে- "পাঠশালায় শিক্ষা সাধারণতঃ ব্রাহ্মণেতর জাতির ছেলেরাই গ্রহণ করিত। মুসলমান ছেলেরাও এই পাঠাশায় পড়িতে যাইত।"। কিন্তু মধ্যযুগে সংস্কৃততে উচ্চশিক্ষার চর্চা শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে এ ধারাটির বিস্তার ঘটে। ফলে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য প্রসার লাভ করে। এতে শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্ম ও নন্দনচর্চা পাশাপাশি চলতে থাকে। পরবর্তীকালে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় বৌদ্ধ শাস্ত্র চর্চার সঙ্গে ব্যাকরণ, শব্দবিদ্যা, হেতুবিদ্যা, সংখ্য, মহাযান শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, যোগশাস্ত্র প্রভৃতিও চর্চা হতো। শুরু থেকেই ইসলাম ধর্ম বৈষম্যহীন সমাজের ভাবধারা প্রচার করে এবং শিক্ষাগ্রহণকে সকল মানুষের অবশ্য কর্তব্য কাজ বলে ঘোষণা করে। এই প্রসঙ্গে কবি গোলাম মোস্তফা তার বিখ্যাত 'বিশ্বনবী'তে উল্লেখ করেছেন-"যুগ যুগান্তর ধরিয়া যে মহাসত্যের জন্য ধরণী প্রতীক্ষা করিয়া আসিতেছিল, যে বাণী প্রেরণ করিবেন বলিয়া আল্লাহ্ বহুযুগ পূর্ব হইতেই প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিতেছিলেন, সেই বাণী আজ অবতীর্ণ হইল। যে বাণীর আরম্ভই হইল : পাঠ কর- অর্থাৎ জ্ঞান লাভ কর। সমগ্র কুরআনের সর্বপ্রথম বিষয়বস্তুই হইল জ্ঞান।"[১] মধ্যযুগের অনেক মুসলমান দার্শনিক জীবন ও জগত সম্পর্কে উচ্চস্তরের চিন্তার স্বাক্ষর রেখেছেন। শিক্ষাচিন্তাতেও তাঁদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের মধ্যে আবু ইবন্ রুশদ, আবু নাসের আল ফারাবী, ইবনে সিনা, ইমাম গাজ্জালী, শেখ সাদী, জালালউদ্দিন রুমি, আব্দুর রহমান ইবনে খালদুন প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু পরবর্তীকালে মুসলমান সমাজে শিক্ষাব্যবস্থা কঠোর ধর্মীয় রীতি-নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

এভাবে মধ্যযুগে শিক্ষা সাধারণ মানুষের বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তবে আধুনিক যুগে শিক্ষা সাধারণ মানুষের জীবনসম্পৃক্ত হতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে তাদের দুয়ারে পৌঁছাতে থাকে। পনের শতকে

অনুসারে এ এলাকার নামকরণ ভারত বর্ষ করা হয়েছে। (*Encyclopedia Britannica,* Vol-vii, 9th edition (Edinburgh: Adam & Charls black, 1875), p.674.; মুহাম্মদ আলাউদ্দীন আল আজহারী, (সংকলিত), *বাংলা একাডেমী আরবী-বাংলা অভিধান*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩ খৃস্টাব্দ), পৃ. ২৭১৫; হিন্দুধর্ম: প্রচলিত অর্থে যাকে হিন্দু ধর্ম বরা হয়, তা মূলত সনাতন ধর্ম। 'সনাতন' শব্দের অর্থ হলো শ্বাশত বা চিরন্তন; অর্থাৎ যা আগে ছিল, এখনো আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে তা-ই সনাতন। হিন্দু ধর্মেও নির্দিষ্ট কোন গুরু বা একক কোন প্রবর্তক নেই। যুগ যুগ ধরে মুনি-ঋষি এবং মহামনীষীরা জীবন, জগত ও জগতের স্রষ্টা সম্পর্কে যেসব চিন্তাভাবনা করেছেন, সেসবএরই সমন্বিত রূপ হিন্দু ধর্ম। তাদেও চিন্তা-ভাবনা প্রথমে বেদ আকারে প্রকাশ পায় এবং পরবর্তীকালে এ বেদেও উপর ভিত্তি করেই হিন্দুধর্মের বিকাশ ঘটে; তাই এ ধর্মের অপর নাম হয় বৈদিক ধর্ম। হিন্দরা বিশ্বাস করে যে, সনাতন ধর্মেও অভ্যুদয় মানব সৃষ্টির শুরুতেই এবং তা স্থায়ী হবে সৃষ্টির বিলয় পর্যন্ত। এ ধর্ম স্বয়ং ঈশ্বওে বিশ্বাস এবং এ বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় এ তিন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। (*বাংলাপেডিয়া,* ১০ম খ., পৃ.৪৬৯-৪৭০; RC Majumder, *The Cultural Heritage of India* (R.K Mission Institute of Culture, 1937), Vol. iv, p. 19-100; Al Basham, *The Origins and Development of Classical Hinduism* (Boston: Beacon Press, 1989), p. 58.

১. বাংলাদেশের অন্যতম দার্শনিক শিক্ষাবিদ, প্রফেসর সাইদুর রহমান তাঁর *'An Introduction to Islamic Culture and Philosophy'* গ্রন্থে ইসলাম ধর্মে শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেবার দৃষ্টান্ত দেখাতে গিয়ে বলেছেন– Though himself unlettered (ummi) Muhammad (sm) was the first to realise the necessity of literacy. He made the pursuit of knowledge incumbent upon all his followers, irrespective of sex and rank. He regarded the acquisition of knowledge as a religious necessity. "Seeking knowledge is obligatory for all Muslims, male and female" so goes the tradition. The following utterances of the prophet bear amble testimony to his encouragement of learning. "The ink of scholar is holier than the blood, of the martyr, "Pursue Knowledge though it is be in China." To listen to the words of the learned and instil into other the lessons of science (ilm) is better than religious practice.(*শিক্ষা বিজ্ঞান ও বাংলাদেশের শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১-৩২)।

Dhaka University Institutional Repository

ইউরোপে সংঘটিত রেনেসাঁসের মাধ্যমে এর সূত্রপাত ঘটে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও বিকাশ, উদারনৈতিক আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দর্শন প্রসার লাভের সাথে সাথে ব্যাপকভাবে শিক্ষার বিস্তারও ঘটতে থাকে। ইউরোপের প্রভাব ভারতবর্ষসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে সঞ্চালিত হয়। ফলে এসব অঞ্চলে আধুনিক শিক্ষার প্রচলন ঘটে এবং মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে নতুন চিন্তা ও চেতনার বিকাশ শুরু হয়। এ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন দেশে বিশেষত ভারতবর্ষে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তন সূচিত হয়। এ পর্যায়ে 'শিক্ষা'র ধারণা ধর্মতত্ত্ব ও বিশুদ্ধ দর্শনের বলয় থেকে ধীরে ধীরে "সমাজদর্শন"- এর রূপ পরিগ্রহ করে। কালক্রমে এর সাথে যুক্ত হয় মনোবৈজ্ঞানিক ধারণা ও তত্ত্ব। 'শিক্ষা' ধারণার বিকাশে এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পাশ্চাত্যের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ যোহান হেনরিকে পেস্তালৎসী, ফ্রেডারিক ফ্রোয়েবেল, জন ফ্রেডারিক হারবার্ট, মারিয়া মন্তেসরী প্রমুখ এক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছেন। এর ফলে 'শিক্ষা' সামাজিক মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। এ প্রেক্ষিতে 'শিক্ষা' বলতে ব্যক্তির আচরণের কাঙ্খিত পরিবর্তনকে বোঝায়। অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তির আচরণের যে পরিবর্তন হয় তাকে বলা হয় শিখন (Learning)। শিখন প্রকাশ পায় জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের মাধ্যমে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা হল জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রকাশিত আচরণের সেই পরিবর্তন যা ব্যক্তি ও সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য, কল্যাণকর এবং অপেক্ষাকৃত স্থায়ী।[১] আধুনিক সমাজবিজ্ঞানেও 'শিক্ষা' গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তুর মর্যাদা লাভে সক্ষম হয়েছে। এক্ষেত্রে ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী এমিল ডুর্খাইমের অবদান খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি 'শিক্ষা'কে সামাজিক বস্তু (social thing) এবং 'সামাজিক ঘটনা' (social fact) হিসেবে অভিহিত করেছেন। সাথে সাথে তিনি শিক্ষাকে সামাজিকীকরণের বাহন হিসেবে গণ্য করেছেন।[২] মানুষের সমাজ অতীত থেকে যতই ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, 'শিক্ষা' ততই সমাজকেন্দ্রিক হয়ে ওঠেছে। শিক্ষার 'ধারণা'ও এভাবে মানুষের বাস্তব জীবনের প্রস্তুতি ও জীবন যাপন প্রক্রিয়ার সঙ্গে অধিকতর সম্পৃক্ততা লাভ করেছে। শিক্ষা বিষয়ে এমনি একটি সংজ্ঞা বা ধারণা হলো "ব্যক্তির দেহ ও মনের সকল ক্ষমতা বিকশিত, বিবর্তিত, মার্জিত করে তাকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের উপযোগী সকল ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক জীবন-যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, নৈপুণ্য, অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী করে তোলার

---

১. অধ্যাপক রেমন্ট এর মতে, "Education means the process of development in' which Consists the passage of the human body from infancy to maturity, the process whereby he gradually adapts himself in various ways to the physical, social and spiritual environment" । অর্থাৎ 'শিক্ষা হল ক্রমবিকাশের এমন একটি প্রক্রিয়া যা মানুষের শৈশব থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত এবং এই প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যক্তি তার প্রাকৃতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক পরিবেশের সঙ্গে ক্রমশ সঙ্গতি স্থাপন করতে সক্ষম হয়।(*শিক্ষা বিজ্ঞান ও বাংলাদেশের শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১-৩২;)

২. "Education is the influence excercised by adult generation on those who are not yet ready for social life. Its object is to arouse and to develop in children those physical, intellectual and moral states which are required of them both by their society as a whole and by the milieu for which they are especially destined".। অনুরূপভাবে কার্ল ম্যানহাইম 'শিক্ষা'কে সমাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে সমাজপ্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে 'শিক্ষা'র ধারণা নির্মাণ এবং শিক্ষার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। আমেরিকার সমাজদার্শনিক জন ডিউই দর্শন, মনস্তত্ত্ব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষার একটি সমন্বিত 'ধারণা'র বিকাশ ঘটান। তাঁর ধারণা মতে "Education is not a preparation of life, rather it is living" 'শিক্ষা' শুধু জীবন প্রস্তুতের উপায় নয়, তা জীবন যাপন প্রণালীও বটে।' এ জন্য তিনি শিক্ষাকে জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেছেন এবং 'অভিজ্ঞতা' (experience)- কে শিক্ষা লাভের স্বাভাবিক কৌশল হিসেবে গণ্য করেছেন। তবে তিনি একথাও বলেন যে, "All human experience is ultimately social"। বস্তুত, 'শিক্ষা' ও শিক্ষা অর্জনের কৌশল যে সমাজভিত্তিক একটি প্রক্রিয়া সেটাই তাঁর উক্ত মন্তব্যে সুস্পষ্ট। 'বিদ্যালয়'কে তিনি আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রধান প্রতিষ্ঠান তথা সমাজের একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে গণ্য করেছেন। ঐ দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি শিক্ষাব্যবস্থাকে সমাজকাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলেও বিবেচনা করেছেন। (*শিক্ষা বিজ্ঞান ও বাংলাদেশের শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৩২)

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক ব্যবস্থাদির নাম শিক্ষা"।[১] বস্তুতঃ শিক্ষা একটি পরিবর্তনশীল প্রপঞ্চ। 'শিক্ষা' সংক্রান্ত কোন 'ধারণা'ই সর্বজনীন ও চিরস্থায়ী হতে পারে না। দিনে দিনে শিক্ষার 'সংজ্ঞা' বা 'ধারণা' বহুমাত্রিক রূপ লাভ করছে। পরিবর্তমান সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষের জীবনই এখানে প্রাধান্য পাচ্ছে।

ব্যাপক অর্থে শিক্ষা

ব্যাপক অর্থে শিক্ষা হল ব্যক্তির উপর পরিবেশের সার্বিক প্রভাব। অর্থাৎ শিক্ষা হল একটি উন্নতিমূলক পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া যার দ্বারা ব্যক্তি পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে সঙ্গতি বিধানে সমর্থ হয়। শিক্ষা মানেই জীবন আর জীবনই শিক্ষা। শিক্ষায় কখনও ছেদ পড়ে না, আর কেউ এ কথা বলতে পারেনা যে 'এখান থেকে শিক্ষার শুরু আর সেখানে শেষ।' শিশু ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে তার শিক্ষার শুরু হয়, আর তা চলতে থাকে জীবনে শেষ দিন পর্যন্ত। এ অর্থে প্রত্যেক ব্যক্তিই শিক্ষিত, 'অশিক্ষিত' ধারণাটি এখানে গ্রহণযোগ্য নয়। শিক্ষাকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করলে এর কতকগুলো বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যায়। এগুলো হচ্ছে-

- শিক্ষা হল জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া।
- শিক্ষা হল অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন ও পুনঃ সৃজন।
- শিক্ষা একটি মানবীয় প্রচেষ্ট।
- শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে মানব জীবনের বিকাশ সাধন।
- শিক্ষা হচ্ছে নির্দেশনা।
- শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া।

---

১. শিক্ষাকে সমাজ উন্নয়ন, মানব অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং গণতন্ত্রের ধারক হিসেবে কেউ কেউ গণ্য করেছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে, "Education is the single most critical element in combating poverty, empowering women, protecting children from hazardous and exploitive labour, sexual exploitation and promoting human right and democracy."। জাতিসংঘও শিক্ষার 'ধারণা'য় মানুষের জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে। শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক জাতিসংঘের সংস্থা ইউনেস্কো (UNESCO) শিক্ষাকে মানুষের সর্বজনীন গুণাবলী বিকাশ ও মানব উন্নয়নের উপায় হিসেবে গণ্য করে বলেছে, "Education is" the means for bringing about desired changes in behaviours, values and life styles, and for promoting public support for the continuing and fundamental changes that will be required if humanity is to alter its course Education, in short, is humanity's best hope and most effective means to the quest to achieve sustainable human development"। সাথে সাথে ইউনেস্কো জীবন যাপনের সকল কর্মকাণ্ডের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও উপলব্ধি অর্জনের নির্দেশনা হিসেবেও শিক্ষাকে গণ্য করেছে। এ প্রেক্ষিতে ইউনেস্কোর ভাষ্য হচ্ছে, Education is "Organized and sustained instruction designed to communicate a combination of knowledge, skills and understanding valuable or all the activities of life"। একুশ শতকের শিক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক কমিশন রিপোর্ট (১৯৯৭) বা দেলর কমিশন রিপোর্টে শিক্ষাকে মানব জীবন সম্পৃক্ত একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ব্যক্তির "জীবনব্যাপি শিখন" (Lifelong Learning)-এর উপর কমিশন রিপোর্টে সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এটিকে একুশ শতকের শিক্ষার প্রধানতম কৌশল হিসেবে গণ্য করে শিক্ষার চারটি স্তম্ভ (four pillars of education) নির্ধারণ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে- (ক) জানতে শেখা (Learning to know), (খ) করতে শেখা (Learning to do, (গ) মিলেমিশে বসবাস করতে শেখা (Learning to live together) এবং (ঘ) বিকশিত হওয়ার জন্য শেখা (Learning to be)। জীবনব্যাপী শিখন ধারণার তাৎপর্য প্রসঙ্গে আগারওয়াল মন্তব্য করেছেন, 'The concept of learning throughout life is the key that gives access to the twenty first century. It goes beyond the traditional distinctions between initial and continuing education. It links up with another concept, that of the learning society, in which every thing affords an opportunity for learning and fulfilling one's potential'. (*শিক্ষা বিজ্ঞান ও বাংলাদেশের শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১-৩২)।

Dhaka University Institutional Repository

- শিক্ষা হচ্ছে বাস্তব সমস্যার সমাধান।
- শিক্ষাই সঙ্গতি বিধান।
- শিক্ষাই সমাজ সংরক্ষণ।
- শিক্ষা একটি লক্ষ্যমুখী প্রক্রিয়া।

শিক্ষার ব্যাপক অর্থ সামনে রেখে বিভিন্ন যুগের অনেক শিক্ষাচিন্তাবিদ শিক্ষাকে নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। নিচে এরূপ কয়েকটি সংজ্ঞা তুলে ধরা হল :

বিশেষ অর্থে শিক্ষা

বাস্তব ক্ষেত্রে শিক্ষা কথাটি ব্যবহৃত হয় বিশেষ অর্থে। বিশেষ বা সীমিত অর্থে শিক্ষা হচ্ছে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কোন বিশেষ কৌশল বা জ্ঞান অর্জন। কোন বিশেষ ক্ষেত্রে যার জ্ঞান আয়ত্বে আছে তাকে 'শিক্ষিত' বলা হয়। আর যার এরূপ শিক্ষা নেই তাকে 'অশিক্ষিত' বলে গণ্য করা হয়। অর্থাৎ লেখা, পড়া এবং গণিতের সামান্য মাত্র পরিচয় হতে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী ব্যক্তি পর্যন্ত প্রত্যেকেই 'শিক্ষিত' বলে গণ্য হয়। আর যারা এরূপ জ্ঞান লাভ করার সুযোগ পায়নি বা বিশেষ কোন কৌশল অর্জন করতে পারেনি তারা এ অর্থে অশিক্ষিত বলে গণ্য হয়।[১] আরো স্পষ্টভাবে বলা যায়, বিশেষ বা সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা বলতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অর্জিত শিক্ষাকে বোঝায়। তাই আমরা যখন বলি আমাদের দেশের ৬৫% লোক শিক্ষিত তখন আমরা শিক্ষাকে সংকীর্ণ অর্থেই ব্যবহার করি।[২] এর ফলে যে কৃষক চাষ করেন, যে ধোপা কাপড় কাচেন, যে তাঁতী তাঁত বোনেন, যে ড্রাইভার গাড়ী চালান তাঁরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত দক্ষতার অধিকারী হলেও শুধু অক্ষর জ্ঞান না থাকার কারণে তারা অশিক্ষিত বলে গণ্য হন।[৩] সংকীর্ণ বা বিশেষ অর্থে শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে–

(ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্জিত জ্ঞান বা কৌশলই শিক্ষা।
(খ) শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক দাতা গ্রহীতার সম্পর্ক।
(গ) শিক্ষা একটি কাঠামোভিত্তিক প্রক্রিয়া।
(ঘ) শিক্ষা চাহিদা, আগ্রহ ও সামর্থ কেন্দ্রিক।
(ঙ) শিক্ষার লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যভিত্তিক।
(চ) শিক্ষা সংগঠিত প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক।

শিক্ষার ব্যাপক ও বিশেষ অর্থের তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য

শিক্ষার ব্যাপক অর্থ

ক) শিশুর সকল রকম সম্ভাবনাময় পরিপূর্ণ বিকাশ হল শিক্ষা।
খ) শিশুর দৈহিক, মানসিক, প্রক্ষোভিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক জীবনের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ সাধন করা হল শিক্ষা।
গ) শিক্ষা মানুষের জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া।
ঘ) তাত্ত্বিক জ্ঞানই শিক্ষা।
ঙ) শিক্ষা শিক্ষার্থীর জীবনের আদর্শ এবং তার বন্ধু ও সহায়ক।

শিক্ষার বিশেষ অর্থ

ক) জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জনই শিক্ষা।
খ) পুস্তককেন্দ্রিক জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে মানসিক ক্ষমতার উৎকর্ষ সাধনই শিক্ষা।
গ) বিদ্যালয় জীবনের মধ্যেই শিক্ষা সীমাবদ্ধ।
ঘ) কতগুলো নির্দিষ্ট সংখ্যক অপরিবর্তনীয় তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাই শিক্ষা।
ঙ) জ্ঞান ও দক্ষতা উলম্ব ধারায় বিকশিত হয়।
চ) নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কেন্দ্রিক শিক্ষা।
ছ) শুধু প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অর্জিত হয় বলে এটাকে

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩-১৮।
[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২-১১।
[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫-১৬।

Dhaka University Institutional Repository

চ) শিক্ষা শিক্ষার্থীর সক্রিয় ভূমিকা এবং চাহিদাভিত্তিক অভিজ্ঞতা।
ছ) শিক্ষা অনানুষ্ঠানিকভাবে বেশির ভাগ অর্জিত হয়, পরিবার ও সামাজিক মূল্যবোধ, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও কৃষ্টি ইত্যাদি এ শিক্ষার উপাদান।
জ) শিক্ষাক্রমের নির্দিষ্ট কোন পরিমণ্ডল নেই।
ঝ) কোন ব্যক্তি নিরক্ষর হলেও শিক্ষিত হতে পারেন।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বলা চলে।
জ) শিক্ষাক্রম সুনির্দিষ্ট।
ঝ) সাক্ষরতাই শিক্ষার মাপকাঠি। যিনি নিরক্ষর তাকে অশিক্ষিত বলা হয়।

শিক্ষার আরবী প্রতিশব্দ গুলোর মধ্যে ৫টি শব্দ বেশী ব্যবহার হয়। [১] যেমন তারবীয়াহ অর্থে Increase, to grow, to grow up, to raise, to educate, to teach. তা'লীম অর্থে Information, Advice, Instruction, Direction, teaching, training, Education. তা'দীব অর্থে Culture refinement, good breeding, good manners, social graces, Decorum. তাদরীব অর্থে Accustoming, practice; এবং তাদরীস অর্থে, To study, to learn, To teach, to instruct. অপরদিকে দর্শন সামগ্রিকভাবে জগত ও জীবনের স্বরূপ ব্যাখ্যা ও তার মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। জগত বিখ্যাত গ্রীক ভাববাদী দার্শনিক প্লেটো বলেছেন "বিস্ময় থেকে দর্শনের উৎপত্তি।"[২]

Aristotle এর মতে, "সত্তা স্বরূপত যা এবং এই স্বরূপের অঙ্গীভূত যে সব বৈশিষ্ট্য, তার অনুসন্ধান করে যে বিজ্ঞান তাই হলো দর্শন।"[৩] দার্শনিক Comte বলেন, "দর্শন হলো বিজ্ঞানের বিজ্ঞান।"[৪] জার্মান দার্শনিক Kant বলেন "দর্শন হলো জ্ঞান সম্পর্কীয় বিজ্ঞান এবং তার সমালোচনা।"[৫] Wundt বলেন, "বিভিন্ন বিজ্ঞানের লব্ধ জ্ঞানকে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সমগ্রতায় একীভূত করাই হলো দর্শন।"[৬] Marvin বলেন, "দর্শন হলো সত্রের প্রতি অনুরাগ, সব সত্য যার অন্তর্ভুক্ত এমন জ্ঞানের পূর্ণ ভাণ্ডার যাতে সব সত্য এক মহান অখণ্ডতার মাঝে সুবিন্যস্ত।" দর্শন সত্য ছাড়াও সুন্দর ও মঙ্গলের আরাধনায় নিয়োজিত।"[৭] Weber এর মতে, "দর্শন হলো প্রকৃতির বিষয়ে এক সামগ্রিক দৃষ্টিলাভের অনুসন্ধান, বস্তুর সার্বিক ব্যাখ্যা দানের প্রচেষ্টা।"[৮]

---

১. প্রাগুক্ত. পৃ. ৬৭।

২. মো. আব্দুল ওদুদ, *ধর্মদর্শন* (ঢাকা: মনন পাবলিকেশন, প্রথম সংস্করণ, মার্চ ২০০৭ খৃস্টাব্দ), পৃ. ২৬-২৭।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬-২৭।

৪. 'Education is the capacity to feel pleasure and pain in the right moment'- প্লেটো; 'Education is the creation of sound mind in a sound body'- এরিস্টটল; 'Education is natural, harmonious and progressive development of man's innate power'- জোহান হেনরিক পেস্তালৎসী; 'Education is the development of moral character'- জন ফেডারিক হারবার্ট; 'Education is the complete development of the individuality of child, so that he can make original contribution to human life according to the best of capacity'- পার্সি নান; The New Standard Encyclopedia and World Atlas (Bombay: The times of India, Jubalpur-Madras Publishers, no date.) pp. 429-430; *BANGLAPEDIA,* National Encyclopedia of Bangladesh, Asiatic Society of Bangladesh, 5 Old Secretareat Road, Nimtali, Dhaka 1000, Bangladesh, March 2003, pp. 61-71.

৫. ibid, pp. 61-71.

৬. ধর্মদর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬-২৭; ibid, pp. 61-71.

৭. ধর্মদর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬-২৭; ibid, pp. 61-71.

৮. ধর্মদর্শন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬-২৭; ibid, pp. 61-71.

Dhaka University Institutional Repository

অতএব আমরা এখানে বলতে পারি, দর্শন সমগ্র সত্তার প্রকাশ, স্বরূপ ও আদর্শ উপলব্ধির চেষ্টাকারি বিজ্ঞান। জীবন ও জগতের স্বরূপ অবহিত হয়ে তারই আলোকে মানুষের জীবন সংঘাতের কারণ স্বরূপ নানারূপ অনুদার মতবাদ ও অন্ধ কুসংস্কার হতে মুক্ত হয়ে জ্ঞান বা সত্যের অনুসন্ধানে ভাবাবেগের পরিবর্তে উদার দৃষ্টিভঙ্গি, অনুধ্যান, বিচার বিবেচনা, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের মাধ্যমে সত্তা, জগত ও জীবনের সাথে জড়িত বিভিন্ন সমস্যার সুষ্ঠু, যুক্তিসম্মত গুঢ় আলোচনা করার নামই দর্শন। জ্ঞান, কর্মদক্ষতা, চরিত্র ও মানসিক শক্তি বিকাশের প্রয়াসকে শিক্ষা-দর্শন বলে।[১] আলফ্রেডের মতে, "জ্ঞানার্জন এবং তা সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ ও ব্যবহারের কৌশলকে শিক্ষা-দর্শন বলে"। এরিস্টটল বলেছেন : "সুস্থ দেহে সুস্থ মন তৈরী করাই হলো শিক্ষা-দর্শন ।"[২] সক্রেটিসের মতে,"মিথ্যার অপনোদন এবং সত্যের আবিষ্কারই হল শিক্ষা-দর্শন ।"[৩]

আল্লামা ইকবাল বলেন "মানুষের খুদী বা রুহকে উন্নত করার প্রচেষ্টা করার নামই শিক্ষা-দর্শন।"[৪] সর্বজ্ঞানের আধার আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে জ্ঞান, বুদ্ধি, শক্তি, সামর্থ্য দান করেছেন। বুদ্ধি, কর্মদক্ষতা, চরিত্র ও মানসিক শক্তি বিকাশে যেমন শিক্ষা-দর্শন সহায়তা করে, তেমনি তা মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, রুচি, আচরণ ও চরিত্রকে পরিমার্জিত, পরিশীলিত ও উন্নত করে। শিক্ষা-দর্শন এর মাধ্যমে মানুষ অজানাকে জানে। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন :

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

"তিনি (আল্লাহ্) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।"[৫]

শিক্ষা-দর্শনই আলো, যা অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করে মানব হৃদয়কে জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করে। শিক্ষা-দর্শনই মানুষের জ্ঞান উজ্জীবিত করে, আল্লাহ্র দেওয়া শক্তি-সামর্থ্যকে সমৃদ্ধ করে তোলে। ইসলামী শিক্ষা-দর্শন জ্ঞান, বুদ্ধি, শক্তি, সামর্থ্য ইত্যাদির আলোকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করে মানুষকে আল্লাহ্র গুণে গুণান্বিত করে। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টির সেরা করে নিজের প্রতিনিধি বা খলীফা হিসেবে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। আর মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের চাবিকাঠি হল জ্ঞান ও শিক্ষা-দর্শন।

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন :

وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

---

১. World University Encyclopeadia তে Education এর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে" In a philosophical sense education in the natural inheritance of every individual.Since he is impressed and develop for good or evil by all with which he comes in contact , everything he sees, feels, hears and does in fluencing action and forming tendenies."[১] Education always being a social process by means of which a community, society, or nation has sought to transmit to the emergent generation those traditional aspects of its culture which it considered fundamental and vital for its own stability and survival the education which departs from traditional forms to train leaders for advancement of the group, for the development of new ideas, or for read judgement to a changing environment, although already anticipated in grace was a later and secondary development.(*World University Encyclopeadia* (New York : Book scine, 1945), vol. 9, p.1970) ; *BANGLAPEDIA,* National Encyclopedia of Bangladesh, Asiatic Society of Bangladesh, 5 Old Secretareat Road, Nimtali, Dhaka 1000, Bangladesh, March 2003, pp. 444- 446.)

২. ibid, pp. 61-71.

৩. এবিএম আব্দুল মান্নান মিয়া, *ইসলাম শিক্ষা*, প্রথম পত্র (ঢাকা: হাসান বুক হাউস, ২০০৩ খৃস্টাব্দ) পৃ. ১।

৪. মুহাম্মদ আব্দুর রব মিয়া আল বাগদাদী, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা : একটি পর্যালোচনা, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, সৈয়দ আশরাফ আলী কর্তৃক সম্পাদিত, ৪১ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, এপ্রিল জুন ২০০২ খৃস্টাব্দ), পৃ. ১৬১।

৫. আল্ কুর'আন, ৯৬ : ৫।

Dhaka University Institutional Repository

"যাদের জ্ঞানদান করা হয়েছে, তাদের প্রভূত সম্মান দান করা হয়েছে।"[১]

তিনি আদম (আ) কে যে সব জিনিসের গুণাগুণ ও ব্যবহারের শিক্ষা দিয়েছেন। সূরা 'আলাকের' ৫ম আয়াতেও তার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। তাই জ্ঞান মানুষের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার সর্বশ্রেষ্ঠ দান। আর এই জ্ঞানের সুষ্ঠু সফল বিকাশ ও প্রয়োগের জন্য শিক্ষা-দর্শনের প্রয়োজন। মানুষের জ্ঞান, শক্তি, সামর্থ্য ও দক্ষতাকে সামগ্রিক কল্যাণের পথে পরিচালিত করার জন্য ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজন। ইসলাম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করার শিক্ষাই হল ইসলামী শিক্ষা-দর্শন, এ শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে চিনে ও আল্লাহ্ তা'আলাকে চিনতে পারে।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এতে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যা কিছু প্রয়োজন তার সবকিছুর দিক নির্দেশনা ও সমাধান বিদ্যমান। এতে আছে চরিত্রগঠন ও চারিত্রিক উৎকর্ষের সব উপকরণ। ইসলামী-শিক্ষা-দর্শনে রয়েছে সুষ্ঠু সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থ ব্যবস্থা, রয়েছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা।[২]

ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের পরিধি

ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের পরিধি নির্ভর করে শিক্ষা বলতে আমরা কি বুঝি তার উপর। 'শিক্ষা' শব্দটি যদি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করি এবং শিক্ষা মানেই 'জীবন' বুঝি তাহলে মানব জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতাই শিক্ষা-দর্শনের আওতাভুক্ত। মানুষের বস্তুগত এবং কৃষ্টিগত পরিবেশ শিক্ষা-দর্শনের আওতায় চলে আসে। ধর্ম ও নীতিবোধও শিক্ষা-দর্শনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। বিদ্যালয়সহ শিক্ষাব্যবস্থার যাবতীয় দিক শিক্ষা-দর্শনের পরিধির মধ্যে পড়ে। দেশ, কাল আর সমাজ অনুযায়ী যখন শিক্ষার প্রকৃতি বদলায় তখন এগুলোর স্বরূপ নির্ণয় করাও শিক্ষা-দর্শনের অন্যতম কাজ বলে ধরা হয়। শিক্ষার্থীর মানসিক, দৈহিক ও আত্মিক বিকাশের স্তরও শিক্ষার পরিধির মধ্যে পড়ে।

শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব, স্মৃতিশক্তি, বিস্মরণ, সহজাত সামর্থ, বুদ্ধি, মনোযোগ প্রভৃতি শিক্ষার আওতাধীন। মানুষের জীবনের দুটি দিক আছে। একটা হল তার জৈবিক দিক আর একটা হল সমাজসত্ত্বার দিক। এ কারণে জৈবিক সামাজিক দু-ধরনের চাহিদাই মানুষের মধ্যে বর্তমান। জৈবিক চাহিদাকে চরিতার্থ করার জন্য আছে খাদ্য গ্রহণ, যৌন ক্রিয়া সাধন প্রভৃতি উপায়। এসব কৌশল শুধু মানুষ কেন, অন্যান্য প্রাণীদেরও আয়ত্তাধীন। কিন্তু সামাজিক বা সাংস্কৃতিক দিক থেকে সে প্রাণীকুলে একক। তার কাছে এই দুই ধরনের প্রয়োজনই সমান গুরুত্বপূর্ণ। জীবনের স্থায়িত্ব বজায় রাখার জন্যও সাংস্কৃতিক চাহিদার পরিতৃপ্তি তার নিকট একান্তই প্রয়োজন। তার এই সাংস্কৃতিক ক্ষুধা মেটাতে পারে একমাত্র শিক্ষা। শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষ পরিপূর্ণ জীবনের অধিকারী হয়।[৩] এই কারণেই শিক্ষা মানুষের সমাজব্যবস্থার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, শিক্ষার ইতিহাস, মানব সভ্যতার ইতিহাসেরই সমকালীন।

---

১. আল্ কুর'আন, ৫৮ : ১১।

২. Reports on Islamic Education and Madrasha education in Bengal গ্রন্থে ইসলামী শিক্ষা বিশ্লেষণ করে বলা হয় "Islamic Education, in the true sense of the term, is a system of education which unables a man to know the preceps of Islam and perform all activities of his life in conformity with the Qur`an and the sunnah; as such he can mould his life in accordance with doctrines and injunctions of Islam. And thus peace and prosperity may prevail in his own life as well as in the whole world.In Islamic system of Education the central Idea of the Text books in the physical, biological, and human sciences will be the concept of Allah and his creation."(Dr. Sekander Ali Ibrahimi, ibid. p.xxx. ; *BANGLAPEDIA,* National Encyclopedia of Bangladesh, Asiatic Society of Bangladesh, 5 Old Secretareat Road, Nimtali, Dhaka 1000, Bangladesh, March 2003, pp. 444-446.)

৩. এজন্য গোয়েটিং বলেছেন, "Just as there are certain vital processes of life in a biological sense, so education may be considered as a vital process in a social sense,"(*শিক্ষা বিজ্ঞান ও বাংলাদেশের শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৩২)

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের রূপকার মহান স্রষ্টা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা। সুতরাং এ শিক্ষা-দর্শন সৃষ্টিকুলের জন্য সার্বিক কল্যাণকর। মানব রচিত শিক্ষা যেমন পূর্ণাঙ্গ নয়, তেমনি তা সামগ্রিক কল্যাণকরও নয়। ইসলামী শিক্ষা-দর্শন অন্যান্য শিক্ষা-দর্শন ব্যবস্থা থেকে স্বতন্ত্র । আলো আর অন্ধকারের যেমন পার্থক্য, তেমনি পার্থক্য সুশিক্ষা আর অশিক্ষা কিংবা কুশিক্ষার মধ্যে। শিক্ষার্জন করে একজন হন জ্ঞানী, পণ্ডিত আর শিক্ষার অভাবে অন্যজন হয় অজ্ঞ, মূর্খ। মানুষের সহজাত বুদ্ধিবৃত্তি, চিন্তা ও মননশক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে শিক্ষার মাধ্যমে। এ জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা প্রশ্ন করেছেন :

الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

'যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে ?'[১] অন্য আয়াতেও প্রশ্ন করা হয়েছে :

هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ

'অন্ধ আর চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে ?'[২]

উপরোক্ত দুটি আয়াতে শিক্ষা ও অশিক্ষার মধ্যে যে ব্যাপক ব্যবধান তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। অশিক্ষা বা কুশিক্ষা কোনমতেই কাম্য হতে পারে না। শিক্ষা মানুষের দৃষ্টি শক্তির ন্যায় আর অশিক্ষা অন্ধত্বের শামিল। অর্থাৎ, দৃষ্টিশক্তি যেমন মানুষকে পথ চলতে সাহায্য করে, তেমনি শিক্ষা মানুষকে সঠিক জীবন-পথের নির্দেশ দেয়। মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয় হলো, সে আল্লাহ্র যমীনে আল্লাহ্র মনোনীত প্রতিনিধি। তাই আল্লাহ্র ইচ্ছা-অনিচ্ছার বাস্তবায়ন ও তাঁর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠাই হলো একজন মুসলিমের গুরুদায়িত্ব। কারণ, ইসলাম শব্দের অর্থই হচ্ছে আল্লাহ্র ইচ্ছা-অনিচ্ছার সম্মুখে সম্পূর্ণ আনুগত্যের শির নত করে দেওয়া ; আল্লাহ্র প্রত্যেকটি আদেশ তার পালনীয় আর প্রত্যেকটি নিষিদ্ধ বস্তু ও কাজ বর্জনীয়। ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের মৌল উদ্দেশ্য হলো মানুষের ব্যক্তিত্বের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ ও তার সর্বাঙ্গীন উন্নতিতে সহায়তা দান। অর্থাৎ, প্রকৃত মুসলিমরূপে জীবন-যাপন ও অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ্র নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করা, যাতে মানুষের জীবনের সব দিক ও বিভাগের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব হয়। সর্বোপরি আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন-বিধান এবং তাঁর রাসূল (সা)-এর জীবনাদর্শনের অনুসরণ দ্বারা ইহলৌকিক সুখ-সমৃদ্ধি ও শান্তি এবং পরকালীন মুক্তির পথ উন্মুক্ত করাই হলো ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য। মানুষকে শুধু প্রকৃতিস্থ, স্বাস্থ্যবান ও প্রয়োজনীয় শক্তিমত্তার অধিকারী করাই ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের উদ্দেশ্য নয়; বরং তার মধ্যে কল্যাণকর চেতনা এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উন্মেষ ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনে সাহায্য করাও এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।[৩] মুসলিম দার্শনিক, আইনবিদ ও শিক্ষাবিদ শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.)-এর মতে, ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, এ শিক্ষা-দর্শন মানুষকে আত্মপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সত্যিকারের উন্নতির পথে নিয়ে যায়, যা তার সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নতির দ্বারা এবং তার সামাজিক বৈশিষ্ট্য আদালত-এর পূর্ণতার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। আর ইসলামী শরী'আতের ভাষায় 'আদালত' হলো সর্ববিষয়ে ন্যায্যতা, মহানুভবতা, ন্যায়-নিষ্ঠতা, মহত্ত্ব, নৈতিক পবিত্রতা এবং আল্লাহ্ সম্পর্কে আধ্যাত্মিক গুণাবলীর সমন্বিত বিকাশ।[৪] ইসলামী শিক্ষা-দর্শন যে মানব মনে শুধু এসব গুণের বিকাশ ঘটায় তা-ই নয়; বরং মানুষের স্বাভাবিক উন্নতির পথে যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে পথ প্রদর্শন করে। এসব প্রতিবন্ধকতা সাধারণত শারীরিক ও জৈবিক শ্রেণীর-যা আবেগের তাড়নায়, বিকৃত বস্তুবাদী মানসিকতা এবং ভ্রান্ত শিক্ষার ফলেই জন্ম নিয়ে থাকে।

---

১. আল্ কুর'আন, ৩৯ : ৯।
২. আল্ কুর'আন, ১৩ : ১৬।
৩. ড. আব্দুল ওয়াহিদ, *বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি* (ঢাকা: ঝিঙেফুল প্রকাশনী, ২০০৭ খৃস্টাব্দ) পৃ. ১৬।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের উৎপত্তি রাসূল পাক (সা) এর সময় থেকেই। আরব একটি শুষ্ক, মরূময় উপদ্বীপ। ইসলাম পূর্ব আরবে সর্বত্র অত্যাচার, অনাচার, ব্যভিচার, লজ্জাহীনতা, চুরি, ডাকাতি, আত্মকলহ, খুন-খারাবি সংঘটিত হত। এ যুগে মানুষের মধ্যে কোন সভ্যতা বলতে কিছুই ছিল না। এ সময়কে ঐতিহাসিকগণ আইয়্যামে জাহেলিয়া বলে অভিহিত করেছেন। জাহেলিয়াত শব্দের অর্থ হলো অন্ধকারাচ্ছন্ন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, বা কোন কিছু সম্পর্কে অজ্ঞতা, মূর্খতা বা না জানা। এ যুগে কোন শিক্ষাব্যবস্থা ছিল বলে কেউ সঠিকভাবে বলতে পারেন না। তবে ঐতিহাসিকদের ধারণা মতে শিক্ষা সম্পর্কে জাহেলিয়াত যুগের তিন ধরনের অবস্থার কথা জানা যায়। কেউ কেউ বলেন যে, সে যুগে কোন শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল না। আবার কেউ মনে করেন যে, সে সময়ে তাদের চলার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন ছিল। আবার কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, জাহেলিয়াতের যুগে শিক্ষাব্যবস্থার যথেষ্ট উৎকর্ষতা বিরাজমান ছিল।[১]

---

[১] There are at least three opinions concerning the status of education on the Arabian peninsula prior to the advent of Islam. The first opinion assumes that the Arabs were an illiterate people, void of any knowledge of science or any other indicator of educational progress. It maintains argue that the Prophet (may Allah bless him and grant him peace), to whom the Qur'an was revealed, was himself illiterate, thus reflecting his society's educational state; and that those living in the pre-Islamic Arabian peninsula were steeped in ignorance and controlled by myths, superstitions, and the worship of idols.

The second opinion concerning the days of ignorance (the pre-Islamic period [*jahiliyyah*]) concentrates on the extent to which the Arabs acquired knowledge of those sciences that were necessary for their daily lives. For example, Mustafa Mutawali discusses the study of astronomy as an aid to traveling, the study of weather conditions (meteorology), and the study of traditional healing in medicine. The pre-Islamic Arabs also studied the science of tracking, genealogy, and poetry. While this line of historical research does not necessarily contradict the first, the issue is one of emphasis, with Mutawali and others demonstrating that the pre Islamic Arabs were not totally void of knowledge.

The third opinion focuses on the knowledge acquired by the upper strata of pre-Islamic Arab society. A very small minority of upper class individuals were well versed in the skills of reading, writing, mathematics, and business administration. Some scholars have asserted that only 17 people in Makkah could read and write when the Prophet Muhammad's mission began.

An examination of these three historical perspectives of education in pre-Islamic Arabia provides a good background from which to start a discussion of education in the Islamic society founded by the Prophet Muhammad. The people of Makkah had extensive trade relations with the societies of Rome, Abyssinia, Persia, and Byzantium, who were materially and educationally more advanced. The apparent sophisticated relations that Makkah had with these societies could not have been carried out by a people who were totally ignorant of the prevailing knowledge of their day. However, historians agree that the masses of people were overwhelmingly illiterate. At the Battle of Badr, the Prophet ordered that the nonbelievers, who were captured and could not pay for their release, should be freed if they taught ten Muslims to read and write. What this suggests is that there were among the Quraysh those who could read and write but who were not wealthy. This also indicates the status that education would have in the emerging Islamic society. [Salah Ahmed, *The Development of*

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল (সা) এর যুগ : মহনবী (সা) এর সময়কাল থেকে ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের সূচনা। মানব সৃষ্টির প্রথম থেকে আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টি রহস্য প্রকাশ করেছেন শিক্ষা-দর্শনের মাধ্যমে। তবে সকল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে তিনি মানব জাতির শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করেছেন। সাহাবীগণ ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপযুক্ত ছাত্র ,তাঁরা এ মহান শিক্ষক থেকে কুর'আনও সুন্নাহ্র সুশিক্ষা গ্রহণ করে জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে নৈতিকতা ও আদর্শে উন্নত চরিত্র ও ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় রাসূল (সা) কে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হিসেবে যেহেতু প্রেরণ করেছেন , সেহেতু পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান 'আল ইসলামে'র প্রচার প্রসারকরুপে তাঁকে বিশ্ববাসীর জন্য শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তাই ইতিহাস পাঠে দেখা যায় যে, রাসূল (সা) ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে আরববাসীদেরকে শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করাএবং শিক্ষার প্রচার ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তাঁর বয়স যখন চল্লিশ তখন আল্লাহ্ রমজানের এক রাত্রিতে[১] তাঁর নিকট পবিত্র কুর'আনের বাণী প্রথম প্রেরণ করেন। মক্কা নগরীর অদূরে হেরাগুহায় ধ্যানমগ্ন থাকাকালীন সময়ে ফেরেস্তা জিব্রাইল(আ)এর মাধ্যমে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এ ওহী[২] (ঐশী প্রত্যাদেশ) লাভ করেন।"পড়ুন আপনার প্রতিপালকের নামে যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন" আয়াত সমূহ প্রাপ্তহওয়ার পর থেকেই তিনি ইসলামের আনুষ্ঠানিক গুরু দায়িত্ব লাভ করেন। প্রকৃতপক্ষে এখান থেকেই ইসলামী শিক্ষার উৎপত্তি।

অতঃপর সূরা সূরা মুদ্দাস্সির[৩] এবং কিছুদিন পর সূরা আদ্দোহা অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূল (সা) পুরোদমে আল্লাহ্র একত্ববাদ ও তাঁকে প্রদত্ব নবুয়াত ও রেসালাতের প্রচার শুরু করেন এবং পবিত্র সহধর্মীনী হযরত খাদিজা বিনতে খুয়ায়লিদ প্রথম তাঁকে আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল ও নবী হিসেবে বিশ্বাস স্থাপন করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।[৪] ইব্ন হিশাম বলেন, "এরপর রাসূল (সা) অতি সংগোপনে তার নিকটতম লোকদের মধ্য হতে বিশ্বস্ত ও নির্ভর যোগ্য ব্যক্তিদের কাছে "দ্বীন" প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। আল্লাহ্ তাঁকে নবুয়ত দান করে তার ওপর ও সমগ্র মানব জাতির ওপর যে মহান অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন তাঁর কথা ব্যক্ত করতে লাগলেন।[৫] এর সাথে সাথে রাসূল (সা) নওমুসলিমদের মধ্যে ঐশী ও নৈতিক শিক্ষারও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। ঐতিহাসিকদের ভাষ্যমতে 'The first educator in Islam, the Prophet Muhammad, said, "Scholars carry the heritage of the prophets."[৬] The Prophet continually encouraged his companions to seek knowledge. His home was the first Islamic school, a place

---

Arab Thought (Cairo: Egypt Aalam Al Kutub, 1975). P.7-67.; Mustafa Mutawali, *History of Islamic Education* (Riyadh: Saudi Arabia Al Kharji Press, 1992). P. 9-77]

১. রমজানের শেষ দশকের বেজোড় সংখ্যার যে কোন রজনী। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর মতে, ২৭ রমজান শব ক্বদর রজনী। এ মতটিই অধিকাংশ মুসলিম পণ্ডিত গ্রহণ করেছেন।

২. ওহী শব্দের দু'টি মৌলিক অর্থ রয়েছে: ১. গোপনীয়তা, ২. দ্রুততা। এমন গোপন ও দ্রুত সংবাদ যা শুধু ঐ ব্যক্তিই জানেন, যার নিকট তা প্রেরণ করা হয়েছে। অন্যদের কাছে তা গোপন রেখে যায় 'দৃঢ়তার সাথে ব্যক্তির আপন অন্তরে কোন বিষয়ে আল্লাহ্র পক্ষ হতে জ্ঞান পাওয়া। সে জ্ঞান মাধ্যমের ভিত্তিতে হতে পারে অথবা মাধ্যম ছাড়াও হতে পারে তাকে ওহী বলে। (ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, *উলূমু'ল-কুর'আন*, ১ম খ. (রাজশাহী: আল-মাকতাবাতুশ্-শাফি'ঈয়াহ, ২০০১ খৃস্টাব্দ), পৃ. ২৫।

৩. ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴾ ﴿قُمْ فَأَنْذِرْ ﴾ ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴾ ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴾ ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾ ﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ﴾ ﴿وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴾ ﴿فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ﴾ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ। (আল কুর'আন, ১৪: ১-৮)

৪. ইবন ইসহাক, *সীরাতে রাসূল (সা)*, শহীদ আকন্দ কর্তৃক অনূ. (ঢাকা: বাতায়ন প্রকাশন, ২০০২ খৃস্টাব্দ), পৃ. ১৩৭; স্যার সৈয়দ আমীর আলী, *দ্য স্পিরিট অব ইসলাম*, ড. রশীদুল আলম অনূ. (কলিকাতা: মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৫ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৮৫।

৫. ইবনে হিশাম, *সীরাতে ইবনে হিশাম*, আকরাম ফারুক অনূ (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৮৮ খৃস্টাব্দ), দ্বাদশ সংস্করণ, পৃ. ৫৭।

৬. Nasir al-Din al-Albani, *Sahih Sunan al-Ti rmizi*, vol. 2, first edition, hadith no. 2159 (Riyadh: Saudi Arabia: Arab Bureau of Education for the Gulf States, 1988), p. 342.

Dhaka University Institutional Repository

where they learned about their *din* and their roles as Muslims. As the number of Muslims grew, the Prophet Muhammad moved his school to Dar al-Arqam Ibn Abi al-Arqam in Makkah. There, the Prophet taught his companions how to recite the Qur'an and interpret its meaning, and there he transmitted the Sunnah. Thus, Dar al-Arqam is considered by many Muslims to be the first Islamic school, a place where the first group of Muslims leaders and scholars were trained.'[১]
The Prophet's *hijrah* from Makkah to Madinah signaled a corresponding shift in the focus of Islamic education. Before the arrival of the Prophet and the *muhajirin*, Madinah had no history of widespread liter acy amongst its inhabitants. It was an agriculturally based society, isolated from the popular trade routes that characterized Makkah. In terms of institutions of learning, there was only a local Jewish home that served as a religious studies center.[২] Despite the lack of a literary tradition in both Makkah and Madinah, those who were educated were respected for their knowledge and accorded a high social status. Even the *kahanah* (those who specialized in sorcery) were respected because of their knowledge of certain scientific phenomena. Therefore, one of the first goals of the Prophet Muhammad was to spread knowledge among the Muslims. For this reason, Muhammad sent Mus'ab ibn 'Umayr to teach the people of Madinah the Qur'an, the Shari'ah, and other aspects of Islamic knowledge.

The early Muslims considered the acquisition of knowledge to be a religious obligation based on the Prophet's saying that "the seeking of knowledge is an obligation of every Muslim male and female."[৩] Regardless of race, sex, age, or social status, Muslims found that Islam gave them ample opportunity to seek knowledge. Islam also considers teaching to be a noble profession in that the Prophet himself said: "Verily, as for the scholar, Allah, His angels, the dwellers in the Heavens and on the Earth, even an ant in its hole and the fish (in the depth of the sea), invoke blessings on he who teaches people goodness."[8] His teaching guided the early Muslims on the Arabian Peninsula to unprecedented standards of civilization, morality, and justice.

---

১. Mutawali, *History of Islamic Education*; Abduilah Idris, *The Madinah Society During the Prophet's Time* (Riyadh: Saudi Arabia: King Saud University Press, 1992).pp. 5-56.

২. Salah al-Au, *The State in the Time of the Prophet* (Iraq: Al-Mujarna'a al-ilmy al-Iraqi Press, 1988). P. 11-80.

৩. Husayn Amin, *The Mustansiriyah School* (Baghdad: Iraq Shafeeq Press, 1960), p.9-54.; Nasir al-Din al-Albani *The Small Collection of Alahadith and Its Additions*, 2nd edition, hadith no. 3913 (Beirut: Lebanon al-Maktab al-lslami, 1986), p. 727. This hadith was narrated by Altabarani, Anas, Albihagi, Ibn Abbas and others.

8. Muhammad al-Tabrizi, *The Light of Lamps 1*, 3rd edition (Beirut: Lebanon al Maktab al-Islami, 1985), hadith no. 213, p. 74.

Dhaka University Institutional Repository

In the early years of the Islamic society, the focus of education was on enhancing literacy within the context of recitation and interpretation of the Qur'an. The *khulafa' rashidun* continued the tradition established by the Prophet. The Caliph 'Umar sent Muslim scholars and those who could read with the army that they might remain to teach in those areas that were brought under the rule of the Islamic state. Educational movements and schools were established in virtually every place these scholars settled.[১] Thus in the early years of the Islamic state (the era of the Prophet and the *khulafa' rashidun*), the scholars and the literate among the Muslims served as ambassadors to newly incorporated lands. As the Muslim nation grew, the focus of education continued to be the Qur'an, the Sunnah, and the Islamic sciences. However, with the advent of the Umawi Caliphate, greater attention was given to the teaching of the Arabic language. The mastery of Arabic was not only a tool for enhanced knowledge of Islam, but it also was essential for those who wished to work in the various administrative units (*dawawin*) of the Islamic state. For example, as Islam spread into the Persian empire, Arabic eventually organization process existed throughout the Islamic state, with Arabic becoming the official language of government administration throughout the Muslim nation.

কারণ ইসলামের প্রধান উৎস যেহেতু আল কুর'আন যার ব্যাপারে আল্লাহ্ নিজেই ঘোষণা করেছেন,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ

"হে মুহাম্মদ (সা) আমি আপনার ওপর কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে প্রত্যেক বিষয়ের সুস্পষ্টই বিবরণ রয়েছে।"[২]

রাসূল (সা)- এর আহ্বানে সর্ব প্রথম খুলাফায়ে রাশেদা সহ আট জন শীর্ষস্থানীয় সাহাবা ইসলাম কবূল করে রাসূল (সা)- এর সাথে ইসলামী শিক্ষা-দর্শন প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। আর তাদের এ প্রচারের মূলমন্ত্র ও হাতিয়ার ছিল ইসলামের সুমহান শিক্ষা ও জ্ঞানার্জন। রাসূল (সা) এই দলটি নিয়ে সাফা মারওয়া পাহারের পাদদেশে "দারুল আরকামে " সর্বপ্রথম ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পত্তন করেন। এটি ছিল প্রথম আনুষ্ঠানিক ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের কেন্দ্র।[৩]

---

১. Muhammad Na'im, "The Real Teacher and the First Prophetical Schools" (Cairo: *Al Azhar Magazine,* 1960), p. 8.

২. আল কুর'আন, ১৬ : ৮৯।

৩. The Prophet's mosque in Madinah was not only the first school in the Islamic state, it was the first public school on the Arabian peninsula. Here education was available free of charge with no discrimination or differentiation among the Muslims on the basis of race, age, color, or gender. The mosque offered lodging to students who were poor and to those who had traveled froni distant lands to acquire Islamic knowledge. Those who wished to live and work in Madinah were able to reside at the mosque until they found employment. As Badawi has noted: "The task of the masjid is an educational one which freed human beings from the stigma of ignorance, and provided them with knowledge and virtue." Na'im has commented that "the Prophet's masjid in Madinah was the first school in Islam where education with its

Dhaka University Institutional Repository

principles, values, behaviors and relations was found. (Then) the history of education in Islam was based on the masjid as a focus of relationships, an institute for teaching (education), a court of justice, a gathering point for the Army, a place for receiving ambassadors, and so on." In the beginning, the curriculum of the Prophet's mosque consisted of the religious subjects such as Qur'an, Sunnah, Hadith, and Shari'ah. Later, subjects such as language and literature were added to these transmitted sciences (*al-'ulum al naqliyah*). As the Islamic state expanded its boundaries and the Muslims increased their interactions with other cultures and civilizations, the curriculum was expanded to include what were known as the rational sciences (*al-'ulum al-aqliyah*), such as medicine and astronomy. The role of the Prophet's mosque as the first school in the Islamic state laid a strong foundation for the development of Muslim schools and universities in succeeding generations. It was a comprehensive institution that served as the center of Muslim social, political, economic, judicial, and educational life. During the caliphate of 'Umar Ibn al-Khattab, a number of schools (*katafib*) were established. In addition, over time the mosque lost its unique function as the only educational institution in the Islamic nation. The efforts of the caliphate to integrate diverse peoples into the ummah, along with advancements in the acquisition of scientific knowledge required the establishment of independent institutes, organized schools, literary councils, bookstores, and libraries. The initial period of the Islamic state saw education taking place independent of any central governing authority. The rapid growth of the Islamic nation, however, along with eventual ideological conflicts (e.g., Sunni vs. Shi'ah), created a situation that mandated government intervention. By the fourth century after the hijrah, during the Abbasid era, the central government was playing a major role in the establishment of new schools, the hiring of teachers, curriculum development, and policy formulation. The actual date of the establishment of this type of school is a matter of some dispute among scholars. Some authors have argued that *katatib* existed in Arabia before the advent of Islam. Others have suggested that *katatib* were not known until the early years of Islam. Those who support the latter view argue that only Islam could have inspired the kind of dedication to learning on the Arabian peninsula that resulted in the massive effort to memorize the Qur'an and render it into book form. The majority of scholars of this period, however, contend that the Caliph 'Umar was the first to order the establishment of these schools with the purpose of teaching children the Qur'an, reading, and writing. Prior to that time, the education of young children was confined primarily to attending *halqahs* in the mosque with their parents. Hasan 'Abdu al-'Al mentioned that *katatib* were established "after the masjid, in those areas in which Islam spread east and west during the time of Caliph 'Umar, a time when Muslims felt the need to expand the teaching of Islam and insure the memorization of the Qur'an by Muslim children." There were two types of *katatib*, one for the teaching of reading, writing, and basic math (here it was permissible for Muslim children to be taught by Christians and Jews), and one for teaching religious subjects and the Qur'an. Males were admitted to *katatib* from age 6 until the memorization of the Qur'an was completed or until approximately age 14. Females were accepted from age 6 and generally stayed until age 9. The school day started after *fajr* prayer and continued until '*asr* prayer, with a lunch break around *dhuhr* prayer. The school week ran from Saturday through Thursday. The administration of *katatib* was generally free from any intervention by the Islamic government, unless there were reports of innovations or distortions of Islam. Teachers generally owned the schools and established their own curricula. This type of

Dhaka University Institutional Repository

institution spread throughout the Muslim world, becoming very numerous by the end of the second century after the hijrah. *Katatib* contributed greatly in introducing basic reading and writing during the Umawi period. This was a period of extensive cultural interaction between Arabs and other peoples coming into the fold of Islam. The rapidly expanding Islamic state required an approach to education that taught not only the Qur'an and the religious subjects, but also met the needs of Muslims for basic literacy skills. *Katatib* continued to play a major educational role in the Abbasid era, during which other institutions—such as literary councils, bookstores, and libraries—began to play major roles in education. Also, increased political stability, growth in financial resources, a paper industry, and other elements of advanced civilization helped increase the accessibility of education to the masses of people. By the second half of the fifth century after the hijrah, the introduction of government-funded, public schools led to a decline in both the importance and necessity of *katatib*. There were a variety of educational institutions that reflected the development of education in Islamic civilization between the time of the Prophet and the establishment of what are known today as public schools, colleges, and universities. These include the palaces of various Caliphs, princes, and wealthy individuals; the houses of literary councils and scholars; and bookstores and libraries.

The palaces of the caliphs, the amirs, and the wealthy were regularly used as the location of scientific and literary lectures, symposia, and debates. Tutors were brought into the palace to provide instruction to the children residing in the palace. Tutors were generally seen as both respectable and influential people because of their access to the caliph, the amir, or the wealthy.

[Nabil al-Samaluti, School Organization and Educational Modernization (Jeddah: Saudi Arabia Dar Ashorooq Printing and Distribution, 1980), p. 9 -77; Mohamed Badawi, “Improving the role of the masjid to serve the religious cause,” Al-Manhal (1989) vol. 50, no. 467, p. 91; Na'im, “The Real Teacher and the First Prophetical Schools,” p. 447.; Sami al-Saqar, History of Muslim Education (Riyadh: Saudi Arabia Dar al Mareelth, 1980); Ahmed, The Development of Arab Thought; Abu al-hasan al-Nadawi, Education and Society (Damascus: Syria Dar al-Qalam, 1991); Mutawali, History of Islamic Education.; Egypt Dar al-Fikr al-Arabi, 1978), p.11-65.; Ahmed al-Ahwani, Education in Islam (Cairo: Egypt Dar al-Ma'arif, 1957). 5 - 70.; Ahmed Shalabi, *History of Islamic Education*. 2nd edition (Cairo: Egypt Egyptian Anglo Libraiy, 1960), 6 -72; Atif Abadhah, *“Islamic Schools,”* Al-Manhal (1989) vol. SO, no. 467; Naji al-Ansari, “*Al-Marina: Education from 622—1992*,” Al-Manhal (1992) vol. 54, no. 499; Hasan Mahmoud and Ahmed al-Sharif, *The Islamic World in the Abbasid's Era,* 4th edition (Cairo: Egypt: Dar al-Fakr al-Arabi, 1980), p.7-80.]

Dhaka University Institutional Repository

দারুল আরকাম : ইসলামের প্রথম আনুষ্ঠানিক শিক্ষা-দর্শনের কেন্দ্র 'দারুল আরকাম'[১]। হযরত আরকাম ইব্ন আবিল আরকাম (রা) প্রথম সারির মুসলিমদের একজন। মক্কার সাফা পাহাড়ের পাদদেশে তাঁর বাড়ি ছিল। ইসলামের ইতিহাসে এই বাড়ির গুরুত্ব অপরিসীম। এটি 'দারুল আরাকাম' নামে খ্যাত। নবুওয়তের পঞ্চম সনে বহু মুসলিম হাবশায় হিজরত করেছিলেন। যাঁরা মক্কায় ছিলেন, তারাও কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। নবুওয়াতের ষষ্ঠ সনে রাসূলুলল্লাহ্ (সা) সহ সাহাবীগণ দারুল আরকামে আশ্রয় নেন। এখানে অবস্থান করেই

---

১. Gatherings at the home or palace of the caliph were a regular feature of Islamic society from the time of the *khulafa' rashidin*. It was during these times that many of the affairs and problems of the ummah were discussed, often accompanied by lively debate. During the era of the *khulafa' rashidin* such gatherings were simple ones in which any Muslim could come and go at any time and participate in the discussion. Through the Umawi era, these kinds of meetings continued to take place at the palace of the caliph with few modifications but with some restrictions on who could attend. It was still, however, generally structured in a simple way. During the Abbasid era, the nature of the meetings became more organized, formal, restricted in terms of attendance, and scientific in subject matter. Primarily, they became settings for the elite elements of the society and those close to the caliph. Famous scholars in the various branches of knowledge were often invited. Meetings began at a certain time and were dismissed by a sign from the caliph himself. These gatherings made a great contribution to the cultural and scientific progress made by the ummah. The sophisticated nature of the subject matter and the status of the participants promoted an atmosphere of scholarly exchange that had few parallels throughout the world. By the ly educated man. The Caliph Al-Ma'mun, for example, established a research center called Bayt al-Hikmah (House of Wisdom) that housed an astronomical observatory, a bureau for translation, and a large library. The gatherings of the learned served greatly to enhance the status of education within the Muslim nation and to expand the frontiers of knowledge and science. The homes of scholars were used as places of study from the advent of Islam; e.g., Dar al-Arqam bin Abi al-Arqam and the Prophet's house in Makkah. Scholars' houses were particularly important as early Islamic educational institutions prior to the widespread establishment of schools in the Muslim world.[1] Al-Saqar has noted that "organized subjects were taught in their houses that were structurally designed for (educational) purposes."; এটি ছিল প্রথম নওমুসলিম আরকাম ইবন্ আবূল আরকামের বাড়ী, এই বাড়ীতেই রাসূল (সা) ইসলামী দাওয়াতের কাজ করতেন এবং সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী মুসলমানদের মধ্যে কুর'আন, নামায, নৈতিকতা শিক্ষা দিতেন। [Nabil al-Samaluti, *School Organization and Educational Modernization* (Jeddah: Saudi Arabia Dar Ashorooq Printing and Distribution, 1980), p. 9 -77; Mohamed Badawi, "*Improving the role of the masjid to serve the religious cause,"* Al-Manhal (1989) vol. 50, no. 467, p. 91; Na'im, "*The Real Teacher and the First Prophetical Schools,"* p. 447.; Sami al-Saqar, *History of Muslim Education* (Riyadh: Saudi Arabia Dar al Mareelth, 1980); Ahmed, The Development of Arab Thought; Abu al-hasan al-Nadawi, *Education and Society* (Damascus: Syria Dar al-Qalam, 1991); Mutawali, *History of Islamic Education*.; Egypt Dar al-Fikr al-Arabi, 1978), p.11-65.; Ahmed al-Ahwani, *Education in Islam* (Cairo: Egypt Dar al-Ma'arif, 1957). 5 - 70.; Naji al-Ansari, "Al-Marina: *Education from 622—1992,*" Al-Manhal (1992) vol. 54, no. 499; Hasan Mahmoud and Ahmed al-Sharif, *The Islamic World in the Abbasid's Era, 4th edition* (Cairo: Egypt: Dar al-Fakr al-Arabi, 1980), p.7-80.]

Dhaka University Institutional Repository

তাঁরা ইসলামী দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করতেন। তাবাকাতে ইবন সা'দ এবং মুসতাদরাকে হাকিমে আছে, রাসূলুল্লাহ্ গোড়ার দিকে এ বাড়িতে থাকতেন এবং এখান থেকেই মানুষকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাতেন। এখানে বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। দারুল আরকামে মুসলিমদের কুর'আন শিক্ষা দেওয়া হতো।

ইমাম আবুল ওলীদ আযরাকী লিখেছেন- এ বাড়িতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ একত্রিত হতেন এবং কুর'আন অধ্যয়ন করতেন। দাওয়াতের ফলে কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে কোন অবস্থাসম্পন্ন মুসলিমের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। তিনি সেখানে অবস্থান করতেন এবং পানাহার করতেন। দারুল আরকাম 'দারুল ইসলাম' এবং 'দারুল মুরতাবী' নামেও খ্যাত ছিল। এখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবীগণ প্রায় একমাস অবস্থান করেন এবং দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রাখেন। এটি ছিল একাধারে বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস। এখানে এসেই হযরত 'উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন। এতে মুসলিমদের শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং তারা কা'বায় নামায পড়তে আরম্ভ করেন।

বায়তে ফাতিমা বিনতুল খাত্তাব : ফাতিমা বিনতুল খাত্তাব ইব্ন নাফিল ছিলেন হযরত উমর (রা) এর বোন। তিনি এবং তাঁর স্বামী সাঈদ ইব্ন যায়দ গোড়ার দিকে ইসলাম গ্রহণ করেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই নিজ নিজ গৃহে হযরত খাব্বাব বিন আরাত (রা)-র কাছে কুর'আন শিক্ষা করতেন। হযরত 'উমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে উন্মুক্ত তরবারি হাতে বোনের বাড়ি গিয়ে তাঁর বোন ও ভগ্নিপতিকে কুর'আন পাঠরত অবস্থায় দেখতে পান। সীরাতে ইব্ন হিশামে আছে, এ সময় খাব্বাব ইব্ন আরাত উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের কাছে একখানা সহীফা ছিল। তাতে সূরা ত্বাহা লিখিত ছিল এবং তিনি তা তাঁদেরকে পড়াচ্ছিলেন। সীরাত ইব্ন হালবিয়ায় হযরত 'উমর (রা)-র সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার বোনের বাড়িতে দুজন মুসলিমের খাবার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। তাদের একজনের নাম খাব্বাব ইব্ন আরাত। অপরজনের নাম আমার জানা নেই। খাব্বাব ইব্ন আরাত আমার ভগ্নির বাড়িতে আসা-যাওয়া করতেন এবং তাদেরকে কুর'আন শিক্ষা দিতেন। সুতরাং বায়তে ফাতিমা বিনতুল খাত্তাবও তদানীন্তন মক্কার শিক্ষা-দর্শনের কেন্দ্র।

শিয়াবে আবু তালিব : শিয়াবে আবু তালিব নামক স্থানে একাধারে তিন বছর অবরুদ্ধ থাকাকালেও রাসূলুল্লাহ (সা) কুর'আন শিক্ষাদান অব্যাহত রেখেছিলেন। সেখানে আবু তালিব পরিবারের বাইরের লোকও অবস্থান নিয়েছিলেন।[১] কারণ কুর'আন এমন একটি গ্রন্থ যা মুসলমানরা কোথাও কোন সমস্যার মুখোমুখি হলে আল্লাহ্‌র সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে পাঠ করে থাকে। কুর'আন পাঠ একটি ইবাদত; এতে আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হয়। আল্লাহ্‌র নেক্কার বান্দাহ্‌গণ সর্বদা 'ইবাদত বন্দেগীর পাশাপাশি কুর'আন তেলাওয়াত করে থাকেন। এ তেলাওয়াত রাসূল (সা) এর-ই শিক্ষা-দর্শন।

মদীনায় শিক্ষা বিস্তার ও যুদ্ধবন্ধী কর্তৃক শিশুদের শিক্ষাদান ব্যবস্থা

নবুওয়াতের দশম সনে হজ্জের মৌসুমে মদীনায় খাজরাজ গোত্রের ছয়জন আনসার মক্কায় এসে ইসলাম কবুল করে মদীনায় ফিরে যান। পরবর্তী বছর অর্থাৎ নবুওয়াতের **১১শ** সনে মদীনায় আউস গোত্রের মোট **১২** জন আনসার মক্কায় এসে বিশ্বনবী (সা) কে জানান, মদীনায় ইসলামের দাওয়াতী কাজ চলছে। কিন্তু এ কাজ দ্রুত এগিয়ে নেয়ার জন্য এবং পবিত্র কুর'আন ও ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের নীতি-আদর্শ শিক্ষা দেয়ার জন্য তাঁদের একজন শিক্ষকের প্রয়োজন। তাঁদের এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত মুস'আব ইবন উমায়রকে মনোনীত করে প্রেরণ করেন।[২] মুস'আব ইবন উমায়র ছিলেন হাশিম ইব্ন আবদে মুনাফের প্রপৌত্র এবং একজন প্রথম সারির মুসলমান। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মনোনীত মদীনার প্রথম ধর্মীয় শিক্ষক। তিনি

[১]. *বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

[২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম বায়‘আতে আকাবার সদস্যগণের সাথে মদীনায় চলে আসেন এবং মদীনার তখনকার প্রথম ধনী ও সম্মানিত ব্যক্তি হযরত আসওয়াদ বিন জুরারাহ্ (রা)-এর গৃহে অবস্থান করেন।

এটা ছিল মদীনার প্রথম ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র। উল্লেখ্য, বর্তমান বিশ্বে যে ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এবং শিক্ষাদানের পদ্ধতি চালু হয়েছে, তৎকালীন যুগে এ ধরনের ব্যবস্থা ছিল না। হযরত মুস‘আব ইব্ন উমায়র (রা) প্রতিদিন নিয়মানুযায়ী আনসারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ইসলামের দাওয়াত পেশ করতেন এবং কুর’আন শরীফের বিভিন্ন আয়াত পাঠ করে শোনাতেন। কুর’আনের ভাষা তাদের মাতৃভাষা আরবীতে অবতীর্ণ হওয়ায় তাঁরা এর অর্থ ও মর্মবাণী অতি সহজেই অনুধাবন করতে পারতেন।[১] ফলে প্রতিদিন ২/৩ জন করে ইসলাম কবুল করতে থাকেন। এভাবে মদীনায় খুব অল্প সময়ে ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের প্রসার হয়েছিল। হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনার মসজিদে সাহাবীগণকে শিক্ষা প্রদান করতেন। যাঁরা প্রিয় নবী (সা) এর মুখ নিঃসৃত কুর’আনের পবিত্র বাণী লিখতেন, তাঁদের মধ্যে হযরত মুয়াবিআ (রা)-র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ওহী নাযিলের সাথে সাথে যে সব সাহাবা তা লিপিবদ্ধ করতেন তাঁদের সংখ্যা ছিল ৪২। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুর’আন শিক্ষা দেয়ার জন্য মদীনা থেকে বিভিন্ন স্থানে শিক্ষকও প্রেরণ করতেন।

তৎকালীন শিক্ষাসূচিতে কুর’আন, হাদীস, অংক, ফারাইয, বংশতালিকা ও তাজবীদ ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভূক্ত ছিল। যে শিক্ষক যে বিষয় অভিজ্ঞ ছিলেন, তিনি সে বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। শরীর চর্চা সম্পর্কেও তখন শিক্ষাদান করা হতো। শরীর চর্চার পাশাপাশি অশ্বারোহণ, তীরন্দাজী ও অভিযানমূলক কসরতও শেখানো হতো।মদীনায় হিজরতের পর নবী করীম (সা)-র প্রথম কাজ ছিল একখানা মসজিদ নির্মাণ। মদীনার কুবায় পৌছার পরপরই তিনি সেখানে একখানা মসজিদ নির্মাণ করেন। এই কুবা আওস গোত্রের নিকটতম এলাকা। কুবা ছেড়ে তিনি নাজ্জার (খাজরায গোত্রের শাখা) এলাকায় গমন করেন এবং কিছু দিন পূর্বে স্থাপিত মসজিদের সম্প্রসারণ করেন। মসজিদের সঙ্গেই ছিল নবীজীর আবাসস্থল। মসজিদের এক অংশকে লেখাপড়ার স্থান হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। মসজিদ-ই-নবূবী সংলগ্ন এ শিক্ষালয়কেই ‘মাদরাসা-ই-সুফ্‌ফা’ বলা হয়। সুফ্‌ফা অর্থ প্ল্যাটফরম। দিনের বেলা এটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহৃত হতো। আর যে সব ছাত্রের অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা ছিল না, তাঁরা এখানেই রাত যাপন করতেন। সুফ্‌ফায় স্থানীয় গরীব ছাত্র এবং বহিরাগত ছাত্রদের আবাসিক বন্দোবস্ত ছিল। বস্তুত এটাই ছিল ইসলামের প্রথম আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।[২] আবাসিক সুযোগ-সুবিধার জন্য ভর্তুকিও দেয়া হতো। ভর্তুকির অর্থ আসতো রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ ও ব্যক্তিগত অনুদান থেকে। এ ছাড়া, জনগণ এতে পূর্ণ সহযোগিতা করতেন। যেমন-ফসল কাটার সময় প্রত্যেক আনসার সাহাবী এক কাঁদি খেজুর দান করতেন। সুফ্‌ফার একটি উঁচু স্থানে এগুলো ঝুলিয়ে রাখা হতো। খেজুর পাকলে এবং নিচে ঝরে পড়লে সুফ্‌ফায় বসবাসকারী ছাত্ররা এগুলো কুড়িয়ে খেতো। খেজুরের কাঁদিগুলো পাহারা দেয়ার জন্য একজন লোকও নিয়োগ করা হয়েছিল। মু‘আজ ইব্ন জাবাল (রা)-এ দায়িত্ব পালন করতেন। সুফ্‌ফায় সার্বক্ষণিক ও সাময়িক এ দু’ধরনের ছাত্র ছিলেন। এমন কিছু ছাত্র যাঁরা আশ্রয়হীন হওয়ার কারণে বাধ্য হয়ে সাময়িকভাবে এখানে থাকতেন। এদের সংখ্যা কখনো কমে যেতো; কখনো আবার বেড়ে যেতো। খলীফা ‘উমর (রা)-এর পুত্র ‘আবদুল্লাহ (রা) ও ছিলেন একজন ছাত্র। সুফ্‌ফায় ছাত্রগণ অধ্যয়নের পাশাপাশি উপার্জনমূলক কাজও করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা) এ শিক্ষাও সবাইকে দেন। অধ্যয়নের সাথে সাথে নিজের প্রয়োজনীয় আর্থিক খরচ মোটানোর

---

[১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

[২]. Nabil al-Samaluti, *School Organization and Educational Modernization* (Jeddah: Saudi Arabia Dar Ashorooq Printing and Distribution, 1980), pp. 9 -77; ড. আব্দুল ওয়াহিদ, *বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি* (ঢাকা: ঝিঙেফুল প্রকাশনী, ২০০৭ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৩৬; Mohamed Badawi, *“Improving the role of the masjid to serve the religious cause,”* Al-Manhal (1989) vol. 50, no. 467, p. 91.

Dhaka University Institutional Repository

জন্য উপার্জনও করতে হবে এ দর্শনের প্রেরণা দানের জন্য তিনি বলেছেন, ফরয ইবাদতের পর হালাল জীবিকা অন্বেষণ করা আরেকটি ফরয। আধুনিক বিশ্বে কর্মমুখী শিক্ষা-দর্শন নামে যে শিক্ষা বহুলভাবে প্রচলিত রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার প্রতি খুবই উৎসাহ প্রদান করেছিলেন সেই দেড় হাজার বছর পূর্বেই।[১] সুফ্ফায় কুর'আন, হাদীস ও মাস'আলা-মাসায়িল শিক্ষা দেয়া হতো। বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দানের দায়িত্ব বিভিন্ন শিক্ষকের উপর ন্যস্ত করা ছিল। কারো কারো দায়িত্ব ছিলো ছাত্রদের পড়া-লেখা শেখানো। যাঁদের পড়া-লেখার কৌশল শেখা হয়ে যেতো, তাঁদের বলা হতো অন্যদের ইতোমধ্যে নাযিলকৃত কুর'আনের আয়াতসমূহ শেখাতে। কাউকে কাউকে ইসলামের বিধিবিধান-সুন্নাত, সালাত, ইবাদত-বন্দেগী প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার জন্যও বলা হতো।[২] রাসূল (সা) মাঝে মধ্যে দু-একটি ক্লাস নিতেন। সময় পেলেই চলে আসতেন সুফ্ফায়।

বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত সাহাবীগণও তখন ছুটে যেতেন সেখানে এবং গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করতেন।[৩] জিহাদের মধ্যে অত্যন্ত ব্যস্ত থেকেও সাহাবীগণ জ্ঞান চর্চায় সর্বদা নিমগ্ন থাকতেন। তাদের মধ্যে যিনি যে শিক্ষা অর্জন করতেন তা প্রচার করা এবং এর প্রতি লোকের মন আকৃষ্ট করা স্বীয় প্রধান দায়িত্ব-কর্তব্য মনে করতেন। হাদীসে এসেছে, নবী করীম (সা) তাঁর ব্যক্তিগত নিবাস থেকে মসজিদে এলেন। সেখানে দুটো দল দেখতে পেলেন। এক দল তাস্‌বীহ পড়ছেন, অন্য দল বিদ্যাচর্চা করছেন। নবীজী (সা) বললেন, দুটি দলই বন্দেগীতে মশগুল রয়েছে। তবে যে দল বিদ্যা চর্চায় মগ্ন, সেটাই উত্তম। একথা বলে নবীজীও সে দলে যোগ দিলেন।[৪] হযরত আবু হুরায়রা, হযরত মু'আয ইব্‌ন জাবাল, হযরত আবূ যর গিফারী (রা) প্রমুখ বিদ্যোৎসাহী সাহাবা ছিলেন এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শীর্ষস্থানীয় ছাত্র। দূর-দূরান্ত থেকে ছাত্ররা এখানে এসে শিক্ষা লাভ করতেন এবং পুনরায় দেশে ফিরে যেতেন। নও মুসলিমদের মধ্যে অনেকেই বসবাস করতেন মদীনার বাইরে। তারা মাঝে-মধ্যেই মদীনায় আসতেন। তাঁদের প্রশিক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো। এভাবে সুফ্ফা মদীনার কেন্দ্রিয় শিক্ষায়তন হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। শিক্ষা সমাপ্তির পর এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা হতো এবং তারা বিভিন্ন এলাকা ও গোত্রে গিয়ে দ্বীনিয়াত ও কুর'আন শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন। বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা সুফ্ফায় পড়া-লেখা করার জন্য তাদের অঞ্চল থেকে প্রতিনিধিও প্রেরণ করতেন। তারা এখান থেকে শিক্ষা লাভ করে গোত্রের লোকদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকে পড়া-লেখা শিখাতেন।[৫]

সুফ্ফা চালু হওয়ার পরপরই নবীজী (সা) আরও ক'টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বালাযুরী উল্লেখ করেছেন নবীজীর আমলে মদীনায় নয়খানা মসজিদ ছিল। এগুলো একই সাথে শিক্ষায়তন হিসেবেও ব্যবহৃত হতো। সুফ্ফার সন্নিকটে অপর এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। ইব্‌ন হাম্বল তাঁর মুসনাদে হযরত আনাস (রা) থেকে একখানা হাদীস উদ্ধৃত করেছেন সেখনি বলা হয়েছে সুফ্ফার ছাত্রদের থেকে সত্তরজন ছাত্র মদীনার বিভিন্ন শিক্ষায়তনে পড়াশোনা করাতেন এবং তারা সেখানে সকাল পর্যন্ত থাকতেন। ইব্‌ন সা'দ মদীনার দারুল কুররায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ থেকে ঘোষণা প্রদান করেন, তোমরা স্থানীয়রা মসজিদে যাবে এবং প্রতিবেশীদের নিকট পড়া-লেখা শিখবে। তোমাদের ব্যাপক হারে কেন্দ্রিয় মসজিদে আসা অনাবশ্যক। সম্ভবত সুফ্ফার ছাত্রসংখ্যা ব্যাপক

---

১. Sami al-Saqar, *History of Muslim Education* (Riyadh: Saudi Arabia Dar al Mareelth, 1980); Ahmed, The Development of Arab Thought; Abu al-hasan al-Nadawi, Education and Society (Damascus: Syria Dar al-Qalam, 1991); প্রগুক্ত, পৃ. ৩৬।

২. Hasan 'Abdu al-'Al, *Islamic Education in the Fourth Hijra Century* (Cairo: Egypt Dar al-Fikr al-Arabi, 1978), pp.11-65; প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

হারে বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তিনি এরূপ বলেছিলেন। কারণ, এর ফলে তাদের প্রত্যেকের পড়া-লেখা বিঘ্নিত হবে। এর সঙ্গে পরিবহন ও যোগাযোগ সমস্যা যুক্ত হয়েছিল।[১]

বদর যুদ্ধে ৭০ জন মুশরিককে বন্দী করা হয়। নবী করীম (সা) শিক্ষিত বন্দীদের নিকট থেকে মুক্তিপণ দাবী করেননি। বরং মুক্তিপণের পরিবর্তে তাদের প্রত্যেককে দশজন করে মুসলমান শিশুকে পড়া-লেখা শেখানোর শর্ত আরোপ করেন। শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে এটা এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। এতে প্রতীয়মান হয়, অমুসলিমদের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করা বিধিসম্মত এবং ইসলামী বিধান মতে, একজন মুসলমানের জ্ঞান অর্জনে কোনো কিছুই বাধা নয়। এটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অবিস্মরণীয় নজির।[২]

ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা প্রথম দিকে মদীনায় সীমাবদ্ধ থাকলেও রাসূল (সা)-এর ইন্তিকাল পর্যন্ত আঠার-উনিশ লাখ বর্গমাইল পর্যন্ত এর সীমানা বৃদ্ধি পায়। আয়তন বৃদ্ধির সংগে সংগে ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের প্রচার-প্রসারও দ্রুত বাড়তে থাকে। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ও নিয়ম-নীতির উন্নতি সাধন কল্পে বিশাল ভূখণ্ডকে বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেকটি প্রদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর পাশাপাশি শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। ইয়ামনের গভর্নর আমর ইব্ন হাযমের নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে দীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন তা আজও ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত রয়েছে। পত্রে লোকদেরকে কুর'আন, হাদীস, ফিকহ্, দ্বীনিয়াত, ইসলামী জ্ঞান ও চারিত্রিক বিষয়াবলী শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রাদেশিক গভর্নরদের প্রতিও শিক্ষা-দর্শন প্রসারে আত্মনিয়োগ করার; অমুসমিলদের জন্য যে স্বতন্ত্র শিক্ষা ব্যবস্থা নবী করীম (সা) চালু করেছিলেন সেখানে অমুসলিমরা পূর্ণ স্বাধিকার ভোগ করত। একজন খ্রীস্টান ছাত্র একটি বিদ্যালয়ে কুর'আন শেখার জন্য একজন ভালো শিক্ষক পেত। কিন্তু বাইবেল শেখার জন্য একজন ভালো শিক্ষক হয়তো পেত না। সে কারণে অমুসলিমদের স্বার্থেই তাদের স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কখনো কখনো ইয়াহুদীরা নবীজীর কাছে এসে ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনায় লিপ্ত হতো। এ ধরনের আলোচনা মাঝে-মধ্যে প্রকৃত অর্থেই ফলপ্রসূ হতো। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগেই শিশু ও বয়স্ক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। শিশুদেরকে কোন বিষয়ে এবং কোন সময়ে শিক্ষা দেয়া হবে তা হাদীস শরীফে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ রয়েছে। সে যুগে লক্ষ্যস্থল নির্ধারণ ও সাঁতার বিদ্যা বিশেষত বাল্যবস্থায় শিক্ষা দেয়া হতো। নামাযের পদ্ধতি শিক্ষাদান ও নামাযে অভ্যস্ত করার প্রতিও বাল্যকাল থেকেই নজর রাখা হতো। সাত বছর থেকে নামায পড়ার নির্দেশ ছিলো। বালকদের খেলাধুলা ও চিত্তাকর্ষণের প্রতিও নজর দেয়া হতো। শিক্ষা ক্ষেত্রে শিশু মানসিকতার প্রতি ও গভীর মনোযোগ দেয়া হতো।

হিজরত পরবর্তী কাছাকাছি সময়ে মদীনার বাইরের যেসব লোক ইসলামে বায়'আত হতেন তাদের সংখ্যা কম হলে তাদেরকে মদীনায় এসে বসতি স্থাপন করার জন্য বলা হতো। উদ্দেশ্য ছিল অমুসলিমদের অত্যাচার থেকে তাদেরকে রক্ষা করা এবং তাদের পড়া-লেখা সু-বন্দোবস্ত করা। কেননা, দু-একজন মানুষের জন্য শিক্ষক প্রেরণ সম্ভব হতো না। সংখ্যায় বেশি হলে তাদের শিক্ষা-দীক্ষায় জন্য রাসূল (সা) শিক্ষক পাঠিয়ে দিতেন। মদীনায় নও-মুসলিমদের বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করার পেছনে আরো যুক্তি ছিল এই যে তাদের সুশিক্ষিত করার পাশাপাশি ইসলামী আন্দোলনে মুজাহিদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে শিক্ষার যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তাতে নারী শিক্ষারও ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। বহু মুসলিম নারী আলিম, কবি, লেখিকা, সাহিত্যিক, হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। হযরত আয়িশা (রা) এবং উচ্চশিক্ষিত মহিলারা শুধু নারীদেরই নয় বরং অনেক পুরুষেরও শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। সাহাবী তাবে'ঈ এবং অনেক পণ্ডিতগণও তাঁদের নিকট হাদীস, তাফসীর ও ফিক্‌হ শিক্ষা করতেন।[৩] রাসূলুল্লাহ্ (সা) নারীদের শিক্ষার অধিকার

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

৩. অধ্যক্ষ মুহাম্মদ শামসুল হুদা, *নারীর অধিকার ও মর্যাদা* (ঢাকাঃ আশরাফিয়া বই ঘর, ১৯৯৫ খৃস্টাব্দ) পৃ. ৪৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

দিয়েছেন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে। নারীকে আত্মিক ও নৈতিক গুণাবলীর চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে দৈহিক সত্তার বিকাশের পাশাপাশি তার বিবেক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের উপরও অতীব গুরুত্ব প্রদান করেছেন। হাদীসে এসেছে : "জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয বা অপরিহার্য।"[১] এ বাণীতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নারী-পুরুষকে সমানভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। পুরুষদের শিক্ষার পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ্ (সা) নারী শিক্ষারও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি সপ্তাহের একটি বিশেষ দিনে নারীদের সামনে বক্তৃতা করতেন এবং তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন। সম্ভ্রান্ত মহিলাদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করেছেন। আর ইল্‌ম শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বণ করতেও বলা হয়েছে যাতে অপাত্রে জ্ঞান দান করা না হয়; ইরশাদ হচ্ছে "যে ব্যক্তি কোন অনুপযুক্ত লোকের কাছে 'ইল্‌ম উপস্থাপন করে সে যেন শূকুরের গলায় মণিমুক্তা এবং স্বর্ণের মালা ঝুলায়"।[২] অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে "ইলম এর আপদ হলো ভুলে যাওয়া, আর অনুপযুক্ত ব্যক্তির কাছে ইলমের কথা বলা হচ্ছে ইল্‌ম ধ্বংস করা"।[৩] উপরোক্ত হাদীস গুলো দ্বারা শিক্ষিত মহিলা সাহাবীদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিশেষজ্ঞ তৈরী করা হতো। বিভিন্ন জন বিভিন্ন বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতেন। রাসূল (সা) এর যুগেই মুসলমানরা প্রস্তর নিক্ষেপণ যন্ত্রসহ বেশ কিছু কারিগরি বিষয় আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। যুদ্ধের জন্য প্রস্তর নিক্ষেপণ যন্ত্র নির্মাণ করেছিলেন হযরত সালমান ফারসী (রা)। রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বয়ং উচ্চস্তরের প্রকৌশল জানতেন। কা'বা ঘর নির্মাণের সময় তাঁর প্রস্তর স্থাপন এবং বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে মক্কার দিকে কা'বা পরিবর্তন সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে চিন্তা করলে এক বড় দার্শনিক ও প্রকৌশলী বলেই তাঁকে মনে হয়। খন্দকের যুদ্ধে পরিমাপ করে পরিখা খননের কাজ তিনি আরম্ভ করেছিলেন। বর্তমানে আধুনিক যুদ্ধ বিদ্যায় টেঞ্চ করার যে পদ্ধতি তার মূল উদ্ভাবক ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)। সামরিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে মুসলমানদের নিত্য-নতুন কৌশলের জুড়ি নেই। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সহচরদেরকে এ সম্পর্কিত যাবতীয় হিকমত শিক্ষা দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সময়ে শিক্ষকদের নির্ধারিত বেতন ছিল কি-না, তা অস্পষ্ট। উমাইয়া এবং আব্বাসীয় যুগে শিক্ষকদের বেতন সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। জানা যায়, সেকালে শিক্ষকদের জন্য নির্ধারিত কোনো বেতন ছিল না। আবূ দাউদ শরীফে 'উবাদা বিন সামিত থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়, তিনি সুফ্‌ফার শিক্ষক ছিলেন এবং তিনি কুর'আন-হাদীসের লিখন পদ্ধতি শিক্ষা দিতেন। এ জন্য একজন ছাত্র তাকে একটি ধনুক উপহার দিয়েছিলেন। গোল্ডজিহার মন্তব্য করেন, যেহেতু তৎকালে পড়া-লেখা কোনো পার্থিব উন্নতির জন্য করা হতো না, তাই বেতনের প্রশ্নই উঠতো না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে সার্টিফিকেট প্রদান সম্পর্কে কিছু জানা যায় নি। জাহিলিয়া যুগে যারা মক্তবে পড়া-লেখা শেষ করতো তাদেরকে 'কামিল' বলা হতো। রাফি বিন মালিককে কামিল বলা হতো; কিন্তু এটা তাদের কোনো সার্টিফিকেট ছিল না; উপাধি ছিল মাত্র। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সময়ে যারা পড়া-লেখা শিখতেন তাদের পার্থিব লাভের আশা ছিল না; বরং তারা পারলৌকিক পরিত্রাণের আশায় পড়া-লেখা শিখতেন। সুতরাং সার্টিফিকেট পাওয়ার প্রশ্নও উঠতো না। পরবর্তী যুগে শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্য পার্থিব স্বার্থসংশ্লিষ্ট হয়ে উঠলে সার্টিফিকেটের প্রয়োজন দেখা দেয় বলে মনে করা হয়। কিন্তু বর্তমান পার্থিব স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা থাকলেও ইসলাম এটাকে উৎসাহিত করেছে। কারণ যুগ ও সময়ের ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে, যোগ্য নাগরিক ও নেতৃত্ব তৈরীতে প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার যথাযথ মূল্যায়ন করতে ইসলাম এ সনদ পদ্ধতির প্রবর্তন করেছে।

---

[১] *সুনানু ইবনে মাযাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১।

[২] ইমাম বুখারী, *আল আদাবুল মুফরাদ*, ৩য় সংস্করণ (বৈরুতঃ দারুল বাশায়েরিল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৮৯ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৪৪৭ ।

[৩] *সহীহুল বুখারী*, দারুস-সালাম, ২য় সংস্করণ (রিয়াদঃ ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খৃস্টাব্দ), কিতাবুন-নিকাহ, বাবু ইত্তিখাযিস-সারারিয়্যি ওয়ামান 'আতাকা জারিয়াতান ছুম্মা তাযাওয়াযাহা , হাদীস নং- ৫০৮৩, পৃ. ৯০৯।

Dhaka University Institutional Repository

খুলাফায়ে রাশিদার যুগে ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের বিকাশ

৬৩২-৬৬১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কাল ইসলামের ইতিহাসে খুলাফায়ে রাশেদার যুগ বলা হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ যুগ সম্পর্কে ভবিষ্যত বাণী করে বলেছিলেন "খেলাফত মাত্র ত্রিশ বছর থাকবে এরপর সালতানাতের অধীনে মুসলিম বিশ্ব শাসিত হবে।"[১] এ যুগের চার খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা) (৬৩২-৬৩৪ খৃষ্টাব্দ) , হযরত ওমর ফারুক (রা) (৬৩৪-৬৪৪ খৃষ্টাব্দ) হযরত ওসমান গণি (রা) (৬৪৪-৬৫৬ খৃষ্টাব্দ), ও হযরত আলী (রা) (৬৫৬-৬৬১খ্রী:) নিশ্চিতভাবে শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন এবং চার খলীফাই ইসলামের ইতিহাসে নিষ্ঠাবান (আল রাশেদুন) হিসেবে পরিচিত ছিলেন।[২] ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা, শিক্ষা-দর্শন ও সাংস্কৃতিক জীবনে খলীফা চতুষ্ঠয় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আদর্শকে সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করেছিলেন। অনুগত খুলাফায়ে রাশেদীন রাসূল (সা) এর "বাল্লেগু আন্নি ওলাও আয়া" এ নির্দেশ পেয়ে আর্থ সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ের সাথে শিক্ষা-দর্শনকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিকশিত করার প্রয়াসে লিপ্ত হন। হযরত আবূ বকর (রা)-এর সময় তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শিক্ষা-দর্শনকে অনুসরন করার পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও গড়ে তোলেন। শিক্ষার শাখা-প্রশাখাগুলো ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়। এ সময় ইসলামের আহ্বাণ ও মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তার আরবের সীমা অতিক্রম করে পারস্য ও রোম পর্যন্ত সম্প্রসারিত হলে আরব বহির্ভূত অঞ্চলের নও মুসলমানদের সুবিধার্থে ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের মূল উৎস আল কুর'আনকে সুবিন্যস্তভাবে সংকলন করে এর কপি বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করা হয়।

একইভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীসগুলো সংগ্রহ করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ইজতিহাদের মাধ্যমে ইজমার ভিত্তিতে রচিত হয় ফিকহ্শাস্ত্র, কালামশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, অলংকারশাস্ত্র, ইতিহাস, দর্শন, গণিত, জ্যামিতি, জ্যোতিষবিদ্যা, ফারায়েজ, আরবী, ফারসী সাহিত্য, ব্যবসা শিক্ষা। এ সময় বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিদ্যার ব্যাপক উন্নয়ন হয়। ঐতিহাসিকগণ এ সময়কে শিক্ষা ক্ষেত্রে ইসলামের স্বর্ণ যুগ হিসেবে আখ্যায়িত করেন।[৩] তবে ইসলামী বিশ্বকোষে হযরত ওমর (রা)-এর সময়ের শিক্ষা ব্যবস্থার যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তাঁর সার সংক্ষেপ হলো:

১.কুর'আন, হাদীস ও ফিকহ্ বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হত;
২.আল কুর'আন ব্যতীত অন্যান্য বিষয়াদী মুখস্ত পড়ানো হত;
৩.শিক্ষকগণ কোন বেতন গ্রহণ করতেন না;
৪.কুর'আন-হাদীস ও ফিক্হ ব্যতীত সাধারণ জ্ঞানের বিষয় হিসেবে অন্য কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হত না ;
৫.ইলম হাসিল করার জন্য সফর করা জরুরী ছিল; এবং
৬.মসজিদ সমূহ ও সাহাবায়ে কেরামের আবাস ভূমি (খানকাহ) শিক্ষায়তন হিসেবে ব্যবহার করা হত।

তবে ঐতিহাসিকগণ এমত গ্রহণ করেন নি। তারা বলেছেন, অন্যান্য সব বিষয়ের শিক্ষা সেখানে দেয়া হত। জানা যায়, হযরত ওসমান (রা)-এর সময় (৬৪৪-৬৫৬) আরব অঞ্চল সমূহ হতে বিজিত শিক্ষার্থীগণ দলে দলে মদীনায় আসতেন, এবং হযরত ওসমান এদের জন্য সম্মেলনের ব্যবস্থা করতেন। চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা) ছিলেন রাসূল (সা)-এর ভাষায় জ্ঞানের দ্বার এবং বাস্তব শিক্ষার প্রতি হযরত আলী (রা) এর অনুরাগ সুপ্রতিষ্ঠিত। এ সময় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষা-দর্শনের ব্যাপক সম্প্রসারণের কথা জানা যায়। ব্যক্তিগত জীবনে হযরত আলী (রা) ছিলেন জ্ঞান তাপস। তাঁর শিক্ষার ব্যাপারে রাসূল (সা) যে প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করেন, হযরত আলী (রা) তা লালন করে ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের জয়যাত্রাকে প্রাণবন্ত করতে সমর্থ হন। ইতিহাস পাঠে

---

[১] আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র), *তারিখুল খুলাফা*, উর্দূ অনূদিত (দিল্লি: ইতেকাদ পাবলিকেশন্স হাউস, ১৯৮৭ খৃস্টাব্দ) পৃ. ১৫৬।

[২] খলীফা চতুষ্ঠয় রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর আদর্শকে সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করেছিলেন।

[৩] *তারিখুল খুলাফা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

Dhaka University Institutional Repository

জানা যায়, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সময়কালে অমুসলিমদের সাথে যত সন্ধি চুক্তি হয়েছে এবং মদীনার বাইরে বিদেশী রাষ্ট্র সমূহের সাথে দূতের মাধ্যমে যত চিঠিপত্র আদান-প্রদান হত তার প্রায় সবগুলো হযরত আলী (রা)-এর লেখা, সাম্প্রতিক সময়ে তার এ চিঠিপত্র নিয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ গুলোতে উচ্চতর গবেষণা হচ্ছে। আরব থেকে হযরত আলী (রা)-এর চিঠি সমূহের সংকলিত গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া শিক্ষা-দর্শন সংক্রান্ত হযরত আলী (রা)-এর উপদেশ সমূহ প্রণিধান যোগ্য।[১]

১.বিত্তের চেয়ে বিদ্যা ভাল, বিত্তকে তুমি পাহারা দাও। বিদ্যা তোমাকে পাহারা দিবে। বিত্ত খরচ করলে কমে যায়। কিন্তু বিদ্যা খরচ করলে বেড়ে যায়।
২.বিত্তের চেয়ে শিক্ষা অন্বেষণকালে যে মৃত্যু বরণ করে সে অমরত্ব লাভ করবে।
৩.বিত্তের চেয়ে শিক্ষা মানব জীবনের অলংকার স্বরূপ।
৪.বিত্তের চেয়ে বিজ্ঞান বিষয়ে পারদর্শী মানুষ সমাজে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত।[২] খুলাফায়ে রাশিদার সময় ইসলামের বিস্তৃতির সাথে সাথে আরব ও অনারবের নব দিক্ষিত মুসলমানদের শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন অঞ্চল বা রাজ্য থেকে আগত মুসলমানদের থেকে একদলকে 'সুফ্ফার' বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে বিভিন্ন এলাকায় পাঠানো হতো।[৩] তারা নওমুসলমানদেরকে ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি, বিধি-বিধান শিক্ষা দিত।

উমাইয়া ও আব্বাসীয় খিলাফতে ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের বিকাশ

ইসলামের ইতিহাসে খুলাফায়ে রাশিদার খিলাফত (৬৩২-৬৬১ খৃষ্টাব্দ) পরবর্তী সুদীর্ঘ সময়কাল ধরে আরবের ঐতিহ্যময় কুরাইশ শাখায় দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বি বংশ উমাইয়া ও হাশেমীয় শাখা খিলাফত নামে মুসলিম সম্রাজ্যকে শাসন করে।[৪] এদের একটি উমাইয়া(৬৬১-৭৫০খ্রী:)অপরটি আব্বাসীয়(৭৫০-১২৫৮ খৃষ্টাব্দ) খিলাফত নামে পরিচিত। খিলাফত দুটির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উক্ত খিলাফত দুটির প্রধানত বৈশিষ্ট্য ছিল রাজ্য বিস্তার (উমাইয়া খিলাফত), ও শিক্ষা-দর্শনের উৎকর্ষ সাধন (আব্বাসীয় খিলাফত)।

উমাইয়া খিলাফত : এ খিলাফতের খলীফাগণ রাজ্য বিস্তারে নিয়োজিত ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উমাইয়া খিলাফত শুরু থেকে কিছু বিতর্কিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কারণ তারা ইসলামী খিলাফতের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি পরিহার করে উত্তরাধিকারী মনোনয়নের মাধ্যমে রাজতান্ত্রিক ধারায় মোট ১৪ জন শাসক প্রায় ৯০ বছর মুসলিম সম্রাজ্যকে শাসন করেন। তাদের মধ্যে খলীফা মুয়াবিয়া বিন আবূ সুফিয়ান (৬৬১-৬৮০ খ্রী:), মালিক ইব্ন মারওয়ান (৬৮৫-৭৫৫ খ্রী:) এবং তাঁর পূর্বাঞ্চলীয় শাসন কর্তা হাজ্জাজ্ বিন ইউসূফ ও পঞ্চম খলীফা খ্যাত ওমর বিন আব্দুল আযীয (৭০৫-৭১৫ খ্রী:) শিক্ষা-দর্শন ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। স্যার সৈয়দ আমীর আলী বলেন-" দ্বিতীয় ওমরের সময় আইনজ্ঞরা সম্মান ও সমাদর পেয়েছিলেন এবং সাধারণ ভাবে বিদ্যান লোকেরাও করেছিলেন পৃষ্ঠপোষক।"[৫] তাদের শাসনামলে খুলাফায়ে রাশেদীনের গৃহীত ব্যবস্থাবলীর মধ্যে আল-কুর'আনের তাফসীর, হাদীস সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, মসজিদ-মাদ্রাসা-মক্তব প্রতিষ্ঠা অব্যাহত ছিল।[৬] ফিলিপ কে হিট্রি বলেন , "তখনকার প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী যদি কেউ শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইত তাকে প্রথমে মসজিদে যেতে হত। মসজিদে কুর'আন ও হাদীসের ওপর ক্লাস হতো। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরাই কুর'আন-হাদীসের ওপর ক্লাস নিতেন।"[৭]এ সময় কূফা বসরা ও পারস্যের বিভিন্ন অঞ্চলে স্কুল বা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়।[১] কূফায় আল-

---

১. ড. মোঃ আব্দুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।
৩. ড. মোঃ আব্দুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।
৪. ড. মোঃ আব্দুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।
৫. *এ শর্ট হিস্ট্রি অব স্যারাসিনস*, স্যার সৈয়দ আমীর আলী (কলিকাতা: মল্লিক ব্রাদার্স, ২০০০ খৃস্টাব্দ), পৃ. ২০০-২০৯।
৬. ড. মোঃ আব্দুস সাত্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।
৭. p.k. Hitti, ibid, p. 253.

Dhaka University Institutional Repository

যাহ্হাক ইব্‌ন মুজাহিমা (মৃত: ৭২৩ খ্রী:)একশটি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা- প্রতিষ্ঠা পরিচালনা করতেন বলে জানা যায়। তাছাড়া সমগ্র উমাইয়া বংশে হযরত ইমাম জাফর সাদিক (র) ও তাঁর শীষ্য বিখ্যাত দার্শনিক ইমাম হাসান আল বসরী (র) (মৃত:৭২৮ খ্রী:) এর নাম চির স্মরণীয়। তাছাড়া মু'তাযিলা মতবাদের প্রবক্তা ওয়াসিল ইব্‌ন আতা (মৃত: ৭৪৯ খ্রী) ইসলামে যুক্তি নির্ভর ও বুদ্ধি ভিত্তিক দর্শনের সূচনা করেছিলেন।[২] খালিদ বিন ইয়াজিদ এ সময়ের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা ও রসায়ন বিজ্ঞানী ছিলেন।[৩]

আব্বাসীয় খিলাফত : আব্বাসীয় খিলাফতকে (৭৫০-১২৫৮) বলা হয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষের যুগ। এ যুগে রাজ্য বিস্তার ও ধর্ম প্রচরের পাশাপাশি 'শিক্ষা-দর্শন' সম্প্রসারণের বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছিল। অব্বাসীয় খিলাফতের ৫০৮ বছর সময়ে ৩৭ জন খলীফা ও তিনটি প্রসিদ্ধ বংশের[৪] শ্রেষ্ঠ আমীরগণ, একই সময়ে স্পেন, উত্তর আফ্রিকা ও মিশরের প্রতিষ্ঠিত উমাইয়া আমীর ও ফাতেমীয় খিলাফতের খলীফাগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন তাতে ইসলামের উদার নৈতিক মতাদর্শ পৃথিবীতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। সৈয়দ আমীর আলী ঐতিহাসিক ডিউট্স এর উদ্ধৃতি দিয়ে 'দ্য স্পিরিট অব ইসলাম' গ্রন্থে যে মন্তব্যটি করেন তা এখানে প্রণিধান যোগ্য, "যখন দশদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল তখন তারাই হেলেনীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের মৃত অবস্থা থেকে পুণরুজ্জীবিত করেছিল, প্রাচ্যের মত প্রতিচ্যকেও দর্শন, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও সঙ্গীতের সোনালী শিল্পকলা শিক্ষা দিয়েছিল এবং আধুনিক বিজ্ঞানের ধাত্রীপনা করেছিল। আর গ্রানাডার পতনকালে সেই উজ্জল দিনগুলোর জন্য চিরকাল কাঁদতে আমাদেরকে বিলম্বিত উত্তরসূরী বানিয়ে গিয়েছিল।"[৫] এভাবেই পরবর্তীতে ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের প্রসার লাভ করতে থাকে। মূলত আব্বাসীয় খেলাফতে বুদ্ধিবৃত্তির জাগরণ ও চিন্তাধারা বিকাশের যে বিপ্লব শুরু হয়েছিল, তাতে প্রকৃত অর্থে ইসলামী সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল এবং তা অতিদ্রুত বিস্তার লাভ করেছিল। হিট্টি আব্বাসীয়দের 'বুদ্ধিবৃত্তির' জাগরণে মুগ্ধ হয়ে 'তাদেরকে প্রাচীন সভ্যজাতির সংস্কৃতির ধারক-বাহক ও উত্তরাধিকারী বলে মন্তব্য করেন। তাঁর ভাষায় আব্বাসীয় খলীফা আল মনসুর জ্ঞান চর্চা, বুদ্ধিবৃত্তি, কৃষ্টি সভ্যতার যে বীজ বপন করেন তা তার উত্তরসূরী হারুনুর রশীদের(৭৮৬-৮০৯) দ্বারা অঙ্কুরিত হয়ে বৃদ্ধি পায় এবং পরিশেষে মামুনের (৮১৩-৮৩৩) রাজত্বে সুবৃহৎ মহীরুপে পরিণত হয়।[৬] এভাবেই ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের বিকাশ ঘটতে ঘটতে যুগে যুগে পরিমার্জন হয়ে আধুনিক শিক্ষা-দর্শনে রূপান্তরিত হয়।

ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা 'শিক্ষা-দর্শন' কে আশ্রয় করে আবর্তিত। সৃষ্টির শুরু থেকেই মহান আল্লাহ্ শিক্ষার মাধ্যমেই সৃষ্টি রহস্য প্রকাশ করেছেন। আবার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ (সা) কে তিনি মানব জাতির শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজেই বলতেন, "আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে পাঠিয়েছেন একজন শিক্ষক হিসেবে।"[৭] একটি জাতির শিক্ষার স্বরূপ সে জাতির জীবনাদর্শের উপর নির্ভরশীল। সংশ্লিষ্ট জাতির জীবনবোধ, জীবনাচার, জীবনের বিকাশ ও পরিণতির মধ্যবর্তী জীবন কেমন তার উপর ভিত্তি করেই শিক্ষা-ব্যবস্থার অবকাঠামো তৈরী হয়। আধুনিককালের শিক্ষাবিদদের কেউ কেউ মনে করেন যে, ধর্মীয় তথা ইসলামী শিক্ষা-দর্শন সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার একটি শাখা বিশেষ। এই শ্রেণীর শিক্ষাবিদদের মতে, এ শিক্ষা-দর্শন ব্যক্তি জীবনের একটি অংশের সাথেই সম্পৃক্ত, ব্যক্তির গোটা জীবন এই শিক্ষা-দর্শনের আওতায় আসে না।

---

১. p.k. Hitti, ibid, p. 254.
২. p.k. Hitti, ibid, p. 255.
৩. p.k. Hitti, ibid, p. 254.
৪. বার্মাকী, বুয়াহিদ ও সেলজুক।
৫. স্যার সৈয়দ আমীর আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১।
৬. p.k. Hitti, ibid, p. 406.
৭. ড. মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ, *ইসলাম পরিচয়* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

বলাবাহুল্য যে, ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের এ ধরনের ধারণা প্রাক-ইসলামী যুগের একটি বিশেষ চিন্তা থেকেই উৎসারিত। আর তা হচ্ছে জীবন লোকায়ত ও ধর্ম নিরপেক্ষ। তাই শিক্ষার অধিকাংশ পর্যায়ই ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষার সাথে সম্পর্ক যুক্ত। ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের সঙ্গে এর সামান্য অংশই সম্পর্ক যুক্ত। শিক্ষা-দর্শন সম্পর্কিত এ ধরনের অভিমত ইসলাম সমর্থন করে না। ইরশাদ হচ্ছে :

تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ

'হে মুহাম্মদ (সা)! আমি আপনার উপর কিতাব নাযিল করেছি, যা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বিবরণ।'[১]

এখানে আল্লাহ্ প্রত্যেক বস্তুর কথা উল্লেখ করেছেন, কোন বিষয়কেই বাদ দেন নি। কারণ, ইসলাম একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন বিধান। মানব জীবনের সর্বদিক সম্পর্কে ইসলামের একটি নিজস্ব দিক-নির্দেশনা রয়েছে। ইসলাম সর্বকালের সর্বযুগের, সর্বশ্রেণীর মানুষের জীবন-সমস্যার সমাধান দিতে পারে। এ জন্য এই বিধান স্বয়ং সম্পূর্ণ,পরিপূর্ণ ও সর্বজনীন। ইসলাম মানব সৃষ্টি ও মানব প্রকৃতির বিকাশ সম্পর্কে একটি নির্ভেজাল স্বকীয় যুগোপযোগী দর্শন প্রদান করে। বিশ্ব স্রষ্টা মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টির সেরা মানব জাতিকে সৃষ্টি করে তাদেরকে 'আশরাফুল মাখলুকাত' বা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করেছেন। ইসলামী শিক্ষা-দর্শন গ্রহণে ইহকালে যেমন সম্মান সফলতা ও সমৃদ্ধি রয়েছে, ঠিক তেমনি পরকালেও তা মুক্তির সোপান।
ইরশাদ হচ্ছে : হযরত আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত নিশ্চয়ই রাসূল (সা) বলেছেন :

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"যখন মানুষ ইন্তেকাল করে তখন তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিনটি কাজ যার প্রতিদান (ইন্তেকালের পরেও) পেতে থাকে; এমন সাদকা যার কল্যাণকারিতা চলতে থাকে, এমন জ্ঞান যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় এবং এমন সৎকর্মশীল সন্তান যে তার পিতা মাতার জন্য দু'আ করে।"[২]

মানুষ কেবল আশরাফুল মাখলুকাতই নয়;বরং সে এই পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র নির্বাচিত প্রতিনিধি। মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছা-অনিচ্ছা তথা আদেশ-নির্দেশের বাস্তবায়নই হলো মানবতার ধর্ম। মানুষ এই দায়িত্ব পালনে যদি কৃতকার্য হয়, সফলতা লাভ করে; তা হলেই তার জীবন স্বার্থক। আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ একটি জটিল সৃষ্টিও বটে। তিনি মানবের মাঝে অনন্ত সুপ্ত প্রতিভা লুকিয়ে রেখেছেন। সেই প্রতিভার বিকাশ ও প্রকাশে শিক্ষা শিক্ষা-দশনের প্রয়োজন অবশ্যই রয়েছে। সে জন্য প্রয়োজন সঠিক পথ-নির্দেশনা সম্বলিত বিধি-বিধানের। মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্ তা'আলা আদি পিতা হযরত আদম (আ) থেকে আরম্ভ করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত এক বা দুই লক্ষাধিক নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন মানুষকে সঠিক পথ-নির্দেশ করার জন্য। তাদেরকে দেয়া হয়েছিল ১০৪ খানা কিতাব ও সহীফা। এগুলো ছিলো ঐশী সংবিধান। এর আদলেই বনী আদমের জীবন পরিচালনা অপরিহার্য ছিলো, আছে, থাকবে। দুনিয়াতে আদি মানব থেকে নবী-রাসূল প্রেরণের মাধ্যমে শিক্ষাদান চলে আসছিলো। হযরত আদম (আ) থেকে ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের প্রচলন ও হযরত নূহ (আ) এর সময়ে এর বাস্তবায়নও ব্যাপ্তি হলেও সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী-রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা) এর মাধ্যমে এর পূর্ণতা সাধিত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা দীর্ঘ তেইশ বছরে তাঁর হাবীবের উপর নাযিল করেন সর্বশেষ সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশী গ্রন্থ আল-কুর'আন।

এই গ্রন্থকেই তিনি মানব জাতির জন্য জীবন বিধান হিসেবে নির্দিষ্ট করেছেন। আর ইসলামকে করেছেন মনোনীত সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন-দর্শন পদ্ধতি। কুর'আন হচ্ছে সেই জীবন-দর্শনের প্রধান উৎস। সুতরাং ধর্ম, জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইসলাম ব্যতীত জীবন সুন্দর ও সমুজ্জ্বল হতে পারে না। জীবন ও ইসলাম এ দুটোর

---

১. আল্ কুর'আন, ১৬ : ৮৯।

২. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশাইরী, *সহীহ মুসলিম*, দারু ইব্ন হাজম, ৩য় খ., তাহকীক ফুয়াদ আব্দুল বাকী (বৈরূত: দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, তা.বি.), হাদীস নং-১৬৩১, পৃ. ১২৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

একটিকে অন্যটি থেকে পৃথক করা যায় না। মুসলমানের জীবন কুর'আন হাদীসের বর্ণিত বিধি ব্যবস্থার দ্বারা পরিচালিত হবে; আমৃত্যু মানব জীবন ইসলামী অনুশাসনের অধীন। দৈনন্দিন জীবন যাপন পদ্ধতি থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় এক কথায় জীবনের সব দিকই ইসলামী জীবন দর্শনের অধীনে পরিচালিত হওয়াই আল্লাহ্‌র ফরমান।

দুনিয়াতে মানুষ কর্মশীল। কাজই মানুষের জীবন। তাই, জীবন ধারণের জন্য প্রত্যেকেরই একটা না একটা অবলম্বন রয়েছে। সে অবলম্বন বা বৃত্তি মানব জীবনের সঙ্গে সংযোজিত। এটা জীবনের এক অঙ্গ। সুতরাং মানব জীবন কেমন হবে, কীভাবে পরিচালিত হবে, মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই বা কী, মানুষের দাবিই বা কিসে পূরণ হতে পারে, মানুষের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তিই বা কীভাবে অর্জিত হতে পারে, এমন সব প্রশ্নের জবাব দানই হলো দ্বীনি শিক্ষা তথা ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের স্বরূপ।

মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতিকে দুনিয়ায় তার খলীফা হিসেবে এ জন্য পাঠিয়েছেন যে, তারা দুনিয়াতে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার বাস্তবায়ন করবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে, অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে। এই গুরুদায়িত্ব পালন করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে প্রয়োজনীয় বুদ্ধি-বিবেচনা এবং জ্ঞান ও শক্তি-সামর্থ্য দান করেছেন। প্রকৃতিগত এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণেই মানুষ অন্যান্য জীব থেকে শ্রেষ্ঠ ও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। জ্ঞান মানুষের অমূল্য সম্পদ। এর মাধমেই আদি মানব হযরত আদম (আ) ফেরেশতা কুলের মুকাবিলায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব যথারীতি বজায় রাখতে সমর্থ হন। সে জন্য আল্লাহ্ তা'আলা শিক্ষালাভ ও জ্ঞান আহরণের জন্য সব পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। একমাত্র যথার্থ জ্ঞানের আলোকেই মানুষ ন্যায়-অন্যায় ও ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে।

আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বের পূর্ণ মর্যাদা অর্জনে জ্ঞানার্জন অপরিহার্য। বস্তুত জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ মহান স্রষ্টার সাথে নিজের ও অন্যের সম্পর্ক অনুধাবন করতে সক্ষম হয়।আল্লাহ্‌র যতো নিয়ামত মানুষের উপর বর্ষিত তার মধ্যে জ্ঞান অন্যতম। এর দ্বারাই হযরত আদম (আ) আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বের স্বীকৃতি লাভ করেন। আর মানবগোষ্ঠীর অস্তিত্ব লাভের গোড়ার কথাই হলো বিদ্যার্জন।
কুর'আনে ঘোষিত হয়েছে :

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا

'আর আল্লাহ্ আদমকে সবকিছুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন।'[১]

জ্ঞানার্জন সাধারণত পড়াশোনার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। তাই, জ্ঞানার্জনের শর্তই হলো 'পড়'। পড়ার সঙ্গে জ্ঞানার্জনের সম্পর্ক সেই আদিকাল থেকেই স্বীকৃত। এ জন্য আল্লাহ্ পাক তার হাবীবের নিকট প্রেরিত প্রথম ওহীতেই ঘোষণা প্রদান করেন :

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۞ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۞ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۞ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۞ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم

'(হে নবী!) পড়ুন আপনার প্রভুর নামে, যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্তপিণ্ড থেকে। পড়ুন এবং আপনার রব মহাসম্মানিত, যিনি কলম দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে তা-ই শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানতো না।'[২]

উপরে উদ্ধৃত আয়াতে আল্লাহ্ পাক মানুষের সৃষ্টি রহস্যের প্রতিও ইঙ্গিত দিয়েছেন। মানুষ প্রথম কোনো অস্তিত্ব সম্পন্ন জীব ছিল না। অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকেই সে অস্তিত্ব লাভ করে পূর্ণাঙ্গ মানুষের রূপ লাভ করেছে। তাই, নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে তাকেই প্রথম জ্ঞান আহরণ করতে হবে। স্বীয় অস্তিত্বের জ্ঞান কারো অর্জিত হলে সে মানুষ কোনো অবস্থাতেই অন্যায়-অত্যাচার-অবিচার দ্বারা স্বীয় মনুষ্যত্বকে কলুষিত করতে পারে না। আর

[১] আল্ কুর'আন, ২ : ৩১।
[২] আল্ কুর'আন, ৯৬ : ১-৫।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো নৈতিক শিক্ষাদান এবং এই শিক্ষার মাধ্যমে স্রষ্টা ও শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা। অতএব, নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞান দ্বারাই এই যোগসূত্র স্থাপন সম্ভব। এর জন্য মানুষকে অবশ্যই আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান সূত্রেরই শরণাপন্ন হতে হবে। সৃষ্ট জগত আল্লাহ্র মহাকুদরতও জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ।

গোটা সৃষ্টি জগতই সীমাহীন রহস্যের ভাণ্ডার। ক্ষুদ্র-বৃহৎ সর্বপ্রকার সৃষ্টিই গভীর রহস্যের জালে আবৃত। অনেক কিছুই মানুষের অজানা কিছু জ্ঞান আছে যা চেষ্টার মাধ্যমে অর্জন করা যায়। আর কিছু জ্ঞান আছে যা মানুষের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়, সেগুলো স্রষ্টা কর্তৃক প্রদত্ত হয়। এই দর্শনের প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ্ ঘোষণা করেন : 'আল্লাহ্ মানুষকে তা-ই শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানতো না।' এতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃত অর্থেই মানুষের জন্য কল্যাণকর জ্ঞানের নির্ভরযোগ্য সূত্র একমাত্র আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান। জ্ঞানের মাধ্যমেই মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ লাভ সম্ভব। যথার্থ শিক্ষা লাভ করা ছাড়া জ্ঞানের পরিপক্বতা, পরিপূর্ণতা আসে না। তাই কুর'আন ও হাদীসের অনেকাংশেই বিদ্যার্জনের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তাকিদ দেয়া হয়েছে। হাদীসে বর্ণিত 'ফরয' শব্দটি ইসলামী শরী'আতে দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে : ১. ফরযে আইন ২. ফরযে কিফায়াহ। অর্থাৎ, ব্যক্তিগত অপরিহার্য করণীয় ও সমষ্টিগত অপরিহার্য করণীয়। ফরযে আইনের অন্তর্গত হলো নর-নারীর নির্বিশেষে প্রত্যেকের প্রাত্যহিক জীবনের জন্য জরুরী সর্ববিধ বিষয়ের জ্ঞানার্জন। যেমন- নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ, পবিত্রতা অর্জন, হালাল-হারাম, চারিত্রিক গুণাবলী ও বান্দার হক এবং ইসলামী শরী'আতের মৌলিক 'আকীদা ও ঈমানের বিষয়াবলী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা। বলা যায়, পার্থিব জীবনের যে সব বিষয় সম্পর্কে মানুষকে পরকালে আল্লাহ্র দরবারে জবাবদিহি করতে হবে, সেগুলো সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা ফরযে আইন।

ইসলামে ঈমান,'আকাঈদ, 'ইবাদত, পারস্পরিক লেন-দেন, সামাজিক লেন-দেন, তাফসীর, হাদীস, ফিক্হ, উসূলে ফিক্হ দেশ ও জাতির উন্নয়ন বিষয়ক অর্থনৈতিক, শিল্প সংক্রান্ত, কারিগরি, কৃষি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে উচ্চতর জ্ঞান লাভ করা হলো ফরযে কিফায়ার অন্তর্গত। এটা সবার উপর সমভাবে ফরয নয়; বরং সমাজের কিছু সংখ্যক লোক এসব উচ্চতর জ্ঞান অর্জন করলেই অন্যরা এসব জ্ঞানার্জনের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে থাকে। বিদ্যার্জন সম্পূর্ণরূপে ইসলামী শরী'আত সম্মত পন্থায় হতে হবে এবং অর্জিত জ্ঞান হবে শরী'য়তের জ্ঞান সম্বলিত অথবা মানুষের ইহজাগতিক ও পারলৌকিক। কোনো জীবনের জন্যই প্রয়োজনীয় নয়-এমন জ্ঞান অর্জনে সময় ব্যয়, মূল্যবান সময়ের অপচয় মাত্র। তদুপরি ইসলামী শরী'য়ত সম্মত পন্থায় জ্ঞানার্জনের চেষ্টা করা না হলে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। দ্বীনি ইলমই হোক আর পার্থিব ইলমই হোক, তা অর্জনের পদ্ধতি শরী'আত সম্মত হতে হবে। দ্বীনি ইলম শিক্ষার উপর এর স্থায়িত্ব কল্যাণ ও উন্নতি নির্ভরশীল। তাই দ্বীনি ইলম অর্জনেও মানুষকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ইলম অর্জনে দ্বীনি আলিমের দ্বারস্থ হতে হবে। এ প্রসঙ্গে মুহাম্মদ ইব্‌ন সিরীন[১] বলেন : 'নিশ্চয়ই এ জ্ঞানই হলো দ্বীন, সুতরাং কার কাছ থেকে তোমরা দ্বীন গ্রহণ করছো, চিন্তা-ভাবনা করো'।[২]

---

১. **মুহাম্মাদ ইবন সীরীন :** বিখ্যাত তাবিঈ ও সমকালীন যুগের একজন খ্যাতনামা ইমাম । তিনি একাধারে মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস, ফকীহ্ ও মু'আব্বির ছিলেন। জন্ম ৩৩ হিজরী মুতাবিক ৬৫৩ খ্রিস্টাব্দে বসরায়। উপনাম ছিল আবূ বকর আল-আনসারী। তিনি শায়খুল ইসলাম উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য তিনি বিশেষভাবে প্রসৃদ্ধি লাভ করেছিলেন। এ ব্যাপারে তার রচিত গ্রন্থের মধ্যে *তা'বীরুর রু'য়া* ও *মুনতাখাবুল কালাম ফী তাফসীরিল আহলাম* অন্যতম। তিনি আবূ হুরায়রাহ, ইব্‌ন আব্বাস, ইব্‌ন 'উমারসহ অসংখ্য সাহাবীর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। ১১০ হিজরী মুতাবিক ৭২৯ খ্রিষ্টাব্দে বসরায় তিনি ইন্তিকাল করেন। (যিরাকলা, *আল-আ'লাম*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৫৪; *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ৪র্থ খণ্ড, তাহকীক: শুয়াইব আরনাউত (বৈরত: মুয়াস্‌সাতুর রিসালাহ, তা.বি), পৃ. ৬০৪; 'উমার রিযা কাহালা, *মু'জামুল মুয়াল্লিফীন*, ১০ খ. (বৈরুত : দারু ইহইয়াউত তুরাছ আল-আরাবী, তা.বি), পৃ. ৫৯।

২. মূল ইবারত : إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ [মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, ১ম খ. (বৈরুতঃ দারু ইহইয়াউত্ তুরাসিল আরাবী, তা.বি), পৃ. ১৪ ।]

Dhaka University Institutional Repository

যে-সব 'ইলমের সঙ্গে বিষয়ের কোনো সম্পর্কে নেই এবং যেগুলো নিছক দুনিয়াবী 'ইলম, সে সম্পর্কে এই হাদীসের নির্দেশ প্রযোজ্য নয়। বিশেষত দ্বীনের 'আকাঈদ, 'ইলম ও মূলনীতি বিষয়ক জ্ঞানের কথা এ হাদীসে বলা হয়েছে। অন্যান্য বৈষয়িক ইলমের ক্ষেত্রে এটা শর্ত নয়।

কুর'আনের ঘোষণা :

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

'আল্লাহ্‌র প্রকৃত বান্দাদের মধ্য থেকে আলিমরাই তাকে বেশি ভয় করেন।'[১]

ব্যক্তিগত জীবনে দ্বীনি ইলম শিক্ষা করলেই কারো দায়িত্ব শেষ হয় না। নিজে শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা দানের মধ্যেই দেশ-জাতির অশেষ কল্যাণ নিহিত রয়েছে। কারণ, এ পন্থা ছাড়া দ্বীনি 'ইলমের প্রচার, প্রসার ও স্থায়িত্ব লাভের বিকল্প কার্যকর কোনো পন্থা নেই। বিদ্যার্জনের প্রতি আরও উৎসাহ দানের উদ্দেশ্য অন্য এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে 'তোমরা দোলনা হতে কবর পর্যন্ত জ্ঞানান্বেষণ কর।' অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত যে জ্ঞানান্বেষণে কোনো ধরনের বিরতি না পড়ে; বরং অবিচ্ছিন্ন ধারায় এ মহৎ কর্মটি চালিয়ে যেতে হবে। এর মাধ্যমেই সাফল্য আশা করা যেতে পারে। বিদ্যা তথা দ্বীন-দুনিয়ার 'ইলম ব্যতীত কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জাতিই উন্নতি লাভ করতে পারে না। আর সীমিত জ্ঞান দ্বারা ও আশানুরূপে ফল লাভ হয় না। তাই আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর প্রিয় নবীকে 'ইলম বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা শিখিয়েছেন এভাবে :

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

('হে নবী! আপনি বলুন !) হে প্রভু, আপনি আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।'[২]

মানুষকে সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয় দ্বীনি 'ইলম এবং পরবর্তীতে দুনিয়াবী 'ইলম অর্জন করে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে, যাতে কোনো দিকই উপেক্ষিত না হয়। আর দুনিয়ার জীবন পরকালীন জীবনের প্রস্তুতির ক্ষেত্র হিসেবে বিশ্বাস করলে মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে সফলতা লাভ করা সম্ভব। আর সে সম্পর্কে পথ-নির্দেশ দানই হলো ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের প্রকৃত স্বরূপ। বলা বাহুল্য, ইসলামী শিক্ষা-দর্শন অর্জনের মাধ্যমে মানুষ মহৎ লক্ষ্য অর্জনে সফল হতে পারে।

মহান আল্লাহ্ পাক নির্বাচিত বাণী বাহকদের মাধ্যমে তার প্রতিনিধিদের নিকট ওহী (বাণী) নামক বার্তা প্রেরণ করেন। ফিরিশতা জিবরাঈল আল্লাহ্‌র সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট এসব বাণী মৌলিক বিশুদ্ধতা সহকারে বয়ে আনতেন। আর সর্বোচ্চ এবং সঠিক জ্ঞান (ইলম) আহরণের ভিত্তিই হচ্ছে ওহী। এখানে ইসলামী শিক্ষার ভিত্তি সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো :

১.আল-কুর'আন : কুর'আন ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের একটি অসাধারণ ও অনন্য উৎস। বিশ্বস্রষ্টা স্বয়ং এর মাধ্যমে মানুষের শিক্ষা ও জীবন বিধানের মৌলিক কাঠামো তুলে ধরেছেন। এছাড়া মানুষের করণীয় ও বর্জনীয় সব বিষয় ও শিক্ষা-দর্শনের নির্দেশ রয়েছে আল-কুর'আনে। মৌলিক বিধানের পরিপন্থী কোনো শিক্ষানীতি বা শিক্ষামূলক ক্রিয়া-কর্ম কোনক্রমেই ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত নয়। কুর'আনে ঘোষিত মূলনীতির উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা।[৩]

২.আস্-সুন্নাহ : ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের দ্বিতীয় মূলনীতি হলো আস্-সুন্নাহ[৪]। রাসূল (সা)-এর বাণী, আদেশ ও নিয়ম-নীতি ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের ভিত রচনা করে। হাদীসের মৌলিক নীতিমালার পরিপন্থী কোনো শিক্ষাই

---

[১] আল- কুর'আন, ৩৫ : ২৮।

[২] আল্ কুর'আন, ২০ : ১১৪।

[৩] ড. আব্দুল ওয়াহিদ, *বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি* (ঢাকা: ঝিঙেফুল প্রকাশনী, ২০০৭ খৃস্টাব্দ), পৃ. ২৫।

[৪] ইসলামী শরী'আত ও ফিক্‌হ-ই-ইসলামীর দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে সুন্নাহ। সুন্নাহ শব্দটি এক বচন, বহু বচনে সুনানুন। শাব্দিক অর্থ পন্থা-পদ্ধতি, রীতি-নীতি, নিয়ম প্রক্রিয়া; জীবন-চরিত, স্বভাব-চরিত্র। পরিভাষায়: ইসলামী শরী'আতের দৃষ্টিতে সুন্নাহ্ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পবিত্র মুখনিসৃত বাণী কার্যাবলী এবং তাঁর মৌন সম্মতি। (ইব্‌ন মানযুর, *লিসানুল 'আরব*, ৬ষ্ঠ খ. (বৈরুত:

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী শিক্ষা-দর্শন নয়। হাদীসে শিক্ষা সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে, যা ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। শিক্ষানীতি ও আদর্শ স্থাপনে শেষ নবী ও খুলাফায়ে রাশেদীন অনেক নমুনা রেখে গেছেন। মুসলিম সমাজের শিক্ষা কাঠামো সংগঠনে এসব অশেষ নির্দেশনাও প্রেরণা যোগাতে পারে। রাসূল (সা)-এর জীবনের আদর্শ ছিল কুর'আনের নির্দেশিত প্রতিটি কর্ম সঠিক ভাবে বাস্তবায়ন করা। তাই তার পূতঃপবিত্র চারিত্রিক গুণ ও নৈতিকতাকে শিক্ষা জীবনের আদর্শ হিসেবে ধরে নিতে হবে। অতীতে তাঁর কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক শিক্ষা-দর্শনের সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে কাজ করেছে এবং ভবিষ্যতে তা পথ-নির্দেশনা দেবে। তাঁর পরিবারের মহান সদস্যগণের পারস্পরিক নির্দেশনা মুসলিম পরিবারের জন্য নিয়ামক হিসেবে কাজ করবে। জীবনে দায়িত্ববোধ সৃষ্টির ক্ষেত্রে রাসূল (সা) ও সাহাবীদের কাজ শিক্ষা-দর্শনের মৌলিক নির্দেশনা যোগাবে। রাসূলুল্লাহ্র সামাজিক নির্দেশনা ও কর্মকান্ড ইসলামী শিক্ষা-দর্শন সমাজ সংগঠনমূলক শিক্ষা-দর্শন ও আদর্শের মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। অতীতে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার স্বর্ণযুগের সূচনাকালে হযরতের অনুসৃত বিধিবিধান তাঁর শিক্ষা-দর্শনের আদর্শ ও উৎস হিসেবে কাজ করে। বদরের যুদ্ধে বন্দীদেরকে মুক্তিপণ হিসেবে শিক্ষাদানে নিয়োগ তার শিক্ষা-দর্শনের একটি অনন্য ও অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

রাসূলুল্লাহ্র জাতীয় শিক্ষানীতি কুর'আন নির্দেশিত পথে পরিচালিত। শিক্ষা-দর্শনকে তখন পৃথক করে দেখা হতো না। শাসন কার্যের সাথে শিক্ষা-দর্শন ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। প্রতিটি প্রশাসক বা সেনাপতি ছিলেন নামাযের ইমাম বা পরিচালক। মসজিদেও ইমাম নিযুক্ত থাকতো। নামাযে নেতৃত্ব দেয়া ছাড়া ও তার একটি প্রধান কাজ ছিল শিক্ষাদান। কারণ, শিক্ষা ব্যতীত নামায হতো না। প্রত্যেককেই শিখতে হতো। প্রথমেই কেউ কুর'আন পড়তে যেতো না। তার পূর্বে প্রাথমিক শিক্ষাদান চলত বহু সময় ধরে। অক্ষর, শব্দ ও ভাষায় দখল এলেই কুর'আন পড়া হতো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জীবিত থাকাকালীন সময়ে শিক্ষা-দর্শনের প্রতি গুরুত্ব দেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের লক্ষ্য বহুমুখী। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মানুষকে আল্লাহ্র বান্দাহ্ রূপে গড়ে তোলা। আল্লাহ্ মানুষকে তাঁর বন্দেগী, আনুগত্য ও দাসত্ব করার লক্ষ্যে সৃষ্টি করেছেন। তাই ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের উদ্দেশ্য হচ্ছে- একজন মানুষকে আল্লাহ্র খাঁটি বান্দাহ্ রুপে তৈরী করা ও উত্তম চারিত্রিক গুণে গুণান্বিত করা। আল কুর'আনের ভাষ্য মতে, মানুষের গুমরাহ হওয়ার মূল কারণ তিনটি। প্রথম : আল্লাহ্র আইন ত্যাগ করে নিজের প্রবৃত্তির গোলাম হওয়া ; দ্বিতীয় : আল্লাহ্র আইনের মোকাবিলায় নিজের বংশের রসম-রেওয়াজ ও বাপ-দাদার পথ অনুসরণ করা এবং তৃতীয় : আল্লাহ্ ও তাঁর নবী (সা) যে পথ নির্দেশ করেছেন, তাকে দূরে নিক্ষেপ করে পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষের আনুগত্য করা। এ সকল পথ থেকে নিষ্কৃতি পেতে ইসলামী শিক্ষা-দর্শন গ্রহণ করে সে অনুযায়ী চলা অপরিহার্য। উত্তম চরিত্র গঠন ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। অর্থাৎ মহৎ চরিত্রের অধিকারী হওয়া। কাজেই নৈতিক চরিত্র গঠন, সুন্দর ও মহৎ জীবন গড়ে তোলা ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

৩. তাকওয়া সৃষ্টি

শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হতে হবে যাতে করে মানুষ আল্লাহ্র সঠিক পরিচয় লাভ করে তাঁকে ভয় করতে শিখে। মহান আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব-বড়ত্ব যেন মানুষ গভীরভাবে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পারে। কাজেই তাকওয়া অর্জন ও আল্লাহ্ ভীতি সৃষ্টি ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

দারু ইয়াহইয়া আত্-তুরাসিল 'আরাবী, ৩য় সংস্করণ, ১৪১৩ হি./১৯৯৩ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৩৯৯ ; সাইয়্যেদ মুশতাক আলী শাহ্, *তা'রুফে ফিক্হ*, ৩য় খ. (লাহোর: মাকতাবায়ে হানাফিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ৪৭ ; F .A. Kleim, *The Religion of Islam*, New Delhi: Cosmo Publications,1978, p. 24 ; A.S Tritton, *Islam belief and practices,* London: Hutchinson House, 1951, P.111.)

Dhaka University Institutional Repository

৪. দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ সাধন

ইসলাম মানুষকে দুনিয়া ও পরকালের কল্যাণের শিক্ষা দিয়েছে। কাজেই শিক্ষাব্যবস্থা এমন হতে হবে যার মাধমে মানুষ উভয় জগতের কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম হয়। এ সবই দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য। জ্ঞানের এ সকল শাখায় ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হতে হবে যাতে করে এর মাধ্যমে একটি আদর্শ ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন এবং পরিচালনার উপযুক্ত কর্মীরূপে গড়ে তোলা যায়।

৫. সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান-গবেষণা ও উন্নত প্রযুক্তি অর্জন

শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে সৃষ্টিজগত তথা প্রাকৃতিক জগত সম্পর্কে গবেষণা করা। আল্লাহ্ পাক বলেছেন :

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

"তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে আর একটি এই যে, তিনি তোমাদেরকে বিদ্যুৎ দেখিয়ে থাকেন, যাতে ভয়ও থাকে আবার আশাও থাকে। আর তিনি আসমান হতে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর এর দ্বারা যমীনকে মৃত্যুর পর সজীব করেন। এতে ঐসব লোকদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।"[১]

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

"মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্টি রহস্যসমূহের মধ্যে একটি হলো আসমান ও যমীন সৃষ্টি এবং তোমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞান-সাধকদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।"[২]

فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

"ঐ তো তাদের ঘরবাড়ি সবই বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে আছে। এ হলো তাদের জুল্‌মের পরিণাম। নিঃসন্দেহে এতে এক বড় নিদর্শন রয়েছে ঐ সম্প্রদায়ের জন্য যারা জ্ঞান-সাধনা করে।"[৩]

আল্লাহ্ পাক অন্যত্র ইরশাদ করেন :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

'তিনি সূর্যকে তেজস্কর এবং চন্দ্রকে আলোকময় করেছেন এবং তার কক্ষপথ নির্ধারিত করেছেন, যাতে তোমরা বছর গণনা ও সময় নির্ণয়ের জ্ঞান লাভ করতে পার। আল্লাহ্ এ সব অনর্থক সৃষ্টি করেন নি। এ সকল নিদর্শন আল্লাহ্ ঐ সম্প্রদায়ের জন্য বিশদভাবে বর্ণনা করেন যারা জ্ঞানচর্চা করেন।'[৪]

মহান আল্লাহ্ উল্লেখিত আয়াতসমূহে বিদ্যা শিক্ষার গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা এবং অপরিহার্যতা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। জ্ঞান অন্বেষণের জন্য নানাভাবে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করার পর মানুষকে তিনি জ্ঞান লাভের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করারও দর্শন দান করেছেন। আল্লাহ্ পাক অন্যত্র ইরশাদ করেন :

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

"তুমি বল, হে পরোয়ারদেগার! আপনি (মেহেরবানী করে) আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।"[৫]

কোন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করার পর অনেক শিক্ষার্থী গবেষণাকর্মে আত্মনিয়োগ করে। এ শ্রেণীর গবেষক-শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

---

[১] আল কুর'আন, ৩০ : ২৪।
[২] আল কুর'আন, ৩০ : ২২।
[৩] আল কুর'আন, ২৭ : ৫২।
[৪] আল কুর'আন, ১০ : ৫।
[৫] আল কুর'আন, ২০ : ১১৪।

Dhaka University Institutional Repository

"আর আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্য হতেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাদের কাছে গিয়ে শান্তি লাভ করতে পার। আর তিনি তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া-মায়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এতে সেই সম্প্রদায়ের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে যারা চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করে।"[১]

মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ্‌ তাঁর অপূর্ব সৃষ্টি কৌশল ও শিল্প নৈপুণ্যের প্রতি গবেষণায় লিপ্ত বিদ্যার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে কুর'আন মজীদে আরও ইরশাদ করেন :

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّر

"তারা কী উটের দিকে লক্ষ্য করে না যে, কী বিচিত্ররূপে তা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর আসমানের দিকে যে, কেমন করে তা উঁচু করা হয়েছে? আর পর্বতমালার দিকে যে, কিরূপে তাকে দাঁড় করানো হয়েছে। আর যমীনের দিকে যে, কীভাবে যমীনকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে?।"[২]

অন্যত্র আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ করেন :

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا ﴿ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ﴿ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴿ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ﴿ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ﴿ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا

"আমি কী যমীনকে বিছানারূপে এবং পবর্তসমূহকে পেরেকস্বরূপ নির্মাণ করি নি? আমি তোমাদেরকে নর-নারীরূপে জোড়ায়-জোড়ায় সৃষ্টি করেছি। আর আমিই তোমাদের নিদ্রাকে আরামের উপকরণ করেছি। আর রাত্রিকে আবরণের বস্তু বানিয়েছি এবং দিনকে জীবিকা অর্জনের সময় করে দিয়েছি। আর তোমাদর উপর সাতটি মজবুত আসমান তৈরী করেছি। আর সূর্যকে এক উজ্জ্বল প্রদীপরূপে প্রস্তুত করেছি। আর আমিই পানিভরা মেঘমালা হতে প্রচুর বৃষ্টিপাত করেছি। সে পানি দ্বারাই আমি শস্য, শাক-সবজী, বৃক্ষ-তরুলতা এবং ঘন উদ্যানসমূহ উৎপন্ন করে থাকি।"[৩]

কুর'আন মজীদ এবং অন্যান্য আসমানী কিতাবসমূহে তাওহীদ বা মহান আল্লাহ্‌র একত্ব সম্পর্কে যে শাহাদাতে কুবরা বা সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য বর্ণিত হয়েছে, তাতে আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন নিজেই তার একত্বের সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। ফেরেশতামণ্ডলী এ সাক্ষ্য দিয়েছেন। সাথে সাথে সর্বকালের জ্ঞানীগণও সত্যনিষ্ঠভাবে এ সাক্ষ্য প্রদানে শরীক হয়েছেন।[৪]

এ মর্মে মহান আল্লাহ্‌ ইরশাদ করেন :

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"আল্লাহ্‌ পাক সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। আর ফেরেশতামণ্ডলী এবং জ্ঞানীগণও ন্যায়নিষ্ঠার সাথে একই সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্‌ নেই, তিনি পরাক্রমশালী-মহাজ্ঞানী।"[৫]

মানব জীবনে ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের গুরুত্ব অপরিসীম। নর ও নারী উভয়ের উপর এ শিক্ষা-দর্শন অর্জন করা ফরয। ইহলোক ও পরলোকের কাজকর্ম ইল্‌মের উপর নির্ভর করে। এ সম্পর্কে জ্ঞানদানের জন্যেই আল্লাহ্‌ পাক নবী রাসূল ও কিতাব পাঠিয়েছেন। 'ইল্‌ম ব্যতীত ইবাদত করা যায় না। অতএব, 'ইল্‌ম ইবাদাত অপেক্ষা উত্তম।

১. আল কুর'আন, ৩০ : ২১।

২. আল কুর'আন, ৮৮ : ১৭-২০।

৩. আল কুর'আন, ৭৮ : ৬-১৬।

৪. মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুর'আন*, সংক্ষিপ্ত সংস্করণ (মদীনা মোনাওয়ারা: ১৪১৩ হি.), পৃ. ১৬৮।

৫. আল কুর'আন, ৩ : ১৮।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু বান্দাহ্র ইবাদাত ছাড়া কোন গতি নেই। আর আমল ব্যতীত ‘ইল্মেরও কোন মূল্য নেই। আর এ সকল ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের জন্য ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের সমান গুরুত্ব বিদ্যমান এবং নারীর অবস্থান ইসলামে খুবই সুসংহত। ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের নারীর অবস্থান বলতে আল্-কুর’আন ও হাদীসে যে শিক্ষা-দর্শন বর্ণিত হয়েছে সে শিক্ষা দর্শনে নারীর শিক্ষা, পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার অবস্থান কী তার আলোচনা পর্যালোচনাই অন্তর্ভুক্ত।

ইল্ম দুই প্রকারে লাভ হতে পারে। প্রথম প্রকার চর্চা বা শিক্ষার দ্বারা লাভ করা যায়। একে ইলমে হুসুলী বা ইলমে কসবী বলা হয়। আর দ্বিতীয় প্রকার ইলম আল্লাহ্র পক্ষ হতে সরাসরি প্রাপ্ত হওয়া যায়।[১] একে ‘ইল্মী ওয়াহ্বী বলে। ইলমে ওয়াহ্বী আবার দু‘ভাবে হাসিল হতে পারে। প্রথমত, ফেরেশ্তা মারফত ওহী দ্বারা, একে ‘ইলমে নবূবী বা ‘ইলমে নবূয়ত বলে। আর দ্বিতীয়ত ইল্হাম দ্বারা। এর নাম ইলমে লাদুন্নী। ‘ইলমে লাদুন্নী নবী ও ওলী উভয়েই লাভ করতে পারেন। ওহীর ‘ইলম নিঃসন্দেহে পরিস্ফুট কিন্তু ইলহামের ‘ইলম তদ্রুপ নয়। নবীর ইল্হাম ব্যতীত অন্য কারো ইল্হাম দলীল হতে পারে না। শরী‘আতে ‘ইলম চার প্রকার। ফরয, মুস্তাহাব, মুবাহ এবং হারাম। ফরযে আইন ও ফরযে কিফায়া। যা নর ও নারী উভয়ের জন্য অপরিহার্যরূপে ফরয তাই ফরযে আইন। যেমন ঈমান-নামায-রোজা ইত্যাদির ‘ইল্ম। বালেগ হওয়ার পরই প্রত্যেকের জন্য কালেমা ও ঈমান সম্পর্কীয় জরুরী বিষয় গুলোর ‘ইল্ম অর্জন করা ফরয। অতঃপর যখনই দ্বীনের যে বিষয়ের ইলম দরকার হবে তখন তা অর্জন করা ফরয। আর যে ‘ইল্ম সকলের মধ্যে কতক লোক লাভ করলেই চলে তাকে বলে ফরযে কিফায়া। যেমন কুর’আন ও হাদীস হতে আহ্কামসমূহ বের করার জ্ঞান। এছাড়া মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যে জ্ঞান প্রয়োজন তা অর্জন করাও ফরযে কিফায়া। যেমন চিকিৎসা বিদ্যা, শিল্প বিদ্যা, ব্যবসা বিদ্যা ইত্যাদি। আবার ভবিষ্যতে প্রয়োজন হবে, সময় সুযোগ ও সুবিধা থাকলে আবশ্যকতা দেখা দেয়ার পূর্বেই সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা মুস্তাহাব। আর যে বিদ্যার মধ্যে ভাল দিকও নেই মন্দ দিকও নেই তা অর্জন করা মুবাহ। আর যে সব বিদ্যা মানুষকে আল্লাহ্ হতে দূরে সরিয়ে রাখে এবং অন্যায় করতে প্রলুব্ধ করে তা অর্জন করা হারাম। যেমন যাদু বিদ্যা ভোজ বাজিবিদ্যা ইত্যাদি। ইসলাম সম্পর্কে জরুরী ‘ইল্ম অর্জন না করলে কোন লোকই সঠিকভাবে ইসলাম পালন করতে পারে না। ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী জীবন-যাপন করা সম্ভব হয় না।[২] নবীগণ যে দ্বীন বা বিধান নিয়ে এসেছিলেন সেই সম্পর্কীয় বিদ্যা শিক্ষা করা ফরয। তাঁরা ঈমান ও আখলাক, মু‘আমালা সম্পর্কীয় বিষয়াদি শিক্ষা দেয়ার জন্য এসেছিলেন। তাঁরা আল্লাহ্র পক্ষ হতে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁরা নিজ হতে কোন কিছু বলতেন না। তাঁদের শিক্ষা-দর্শন সাধারণত বুদ্ধিমত্তার স্তরের ঊর্ধ্বে অর্থাৎ এ শিক্ষা-দর্শন সর্ব সাধারণের বুদ্ধিমত্তার গণ্ডীর বহির্ভূত।[৩] তাওহীদ, ফেরেশ্তা, বেহেস্ত, দোযখ, কিয়ামত এবং নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, হালাল-হারাম ইত্যাদির ‘ইল্ম সাধারণ আকলের গণ্ডীর বাইরে। এ গুলো আকল দ্বারা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এসব বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র নবীদের মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব।[৪] নর-নারী নির্বিশেষে সকল মানুষেরই সর্বপ্রথম কর্তব্য হলো শরী‘আতের জাহেরী ইল্ম অর্থাৎ ওযু, গোসল, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি শিক্ষা করা। যাহেরী ইবাদাতের সাথে সাথে বাতেনী ইবাদাত অত্যাবশ্যক, যে সকল আমল দিলের সাথে সম্পর্কিত তাই বাতেনী ইবাদাত। যেমন তাওয়াক্কুল, সবর, শোকর, আল্লাহ্র রিযা, মুহব্বত, কানা‘আত, তসলীম, তওবা, ইখলাস, তাকওয়া প্রভৃতি অর্জন করা এবং কাম ক্রোধ, লোভ, মোহ, হাসাদ, রিয়া, অহঙ্কার ইত্যাদি বর্জন করা। সুতরাং বাতেনী ইবাদত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করাও প্রত্যেক মু‘মিনের কর্তব্য। কেননা যাহেরী ও বাতেনী উভয়

---

১. মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী, *মেশকাত শরীফ*, ২য় খ. (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৮৭ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৩-৪।

২. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *হাদীস শরীফ*, ১ম খ. (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩ খৃস্টাব্দ), পৃ. ১৯৭।

৩. ড. মাহবুবা রহমান, *কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭।

৪. *কুর’আন ও হাদীসের আলোকে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকারের ইবাদতই ইল্‌ম ছাড়া সম্ভব নয়।[১] যমীন আবাদযোগ্য হয় এবং এর ফলে মানুষের মধ্যে উদ্ভাবন পদ্ধতি, আবিষ্কার ও অনুসন্ধানী চেতনা সৃষ্টি হয়। কাজেই চিন্তা-গবেষণা ও উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহার জানা শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য।

৬. জাতীয় স্বকীয়তাবোধ, দেশপ্রেম ও সুনাগরিক তৈরী : জাতীয় স্বকীয়তাবোধ, দেশপ্রেম ও সুনাগরিক তৈরী ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের অন্যতম লক্ষ্য । স্বীয় দেশ-যা ইসলামের আবাসভূমিকে ভালোবাসা ও নিজকে দেশের একজন সুনাগরিকরুপে তৈরী করা এবং মুসলিম চেতনা বোধ জাগ্রত করাও শিক্ষা-দর্শনের লক্ষ্য।

৭. মানবতাবোধ ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি : ইসলাম সত্যিকার মানবতাবাদী আদর্শ। ইসলামের দৃষ্টিতে গোটা মানবজাতি এক আদম ও হাওয়া থেকে সৃষ্টি। মানব জাতির বিভিন্ন গোত্র, জাতি-গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটেছে শুধু পচিয়ের সুবিধার জন্য। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব বা নিকৃষ্টত্বের কিছুই নেই। ইসলামে গোত্রবাদ, বর্ণবাদ, জাতি বিদ্বেষ বা সাম্প্রদায়িকতার কোনো সুযোগ নেই। ইসলাম বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ ও মানবতাবোধ দর্শনের শিক্ষা দেয়। তাই ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে মানবতাবোধ জাগ্রত করা, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করা।

৮. বিশেষজ্ঞ তৈরী : উচ্চশিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে দ্বীন ও সমাজের জন্য কল্যাণকর বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তৈরী করা। কুর'আন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস সহ সমসাময়িক সকল বিষয়ে জ্ঞান অর্জন ও বিশেষজ্ঞ তৈরী শিক্ষা-দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য। উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের লক্ষ্যকে এভাবে সারসংক্ষেপ করা যায় :

১. ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিরূপে তৈরী ও প্রশিক্ষিত করা। সমাজে ভালো (মারুফকে)-কে উৎসাহিত ও মন্দের (মুনকার) ধ্বংস নিশ্চিত করা;

২. একজন মানুষের সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের সুষম বৃদ্ধি নিশ্চিত করা;

৩. শিশুদেরকে তাদের বায়োঃপ্রাপ্ত জীবনে দায়-দায়িত্ব, অভিজ্ঞতা অর্জন ও সুযোগের সদ্ব্যবহারের জন্য আত্মিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক, শারীরিক, মানবিক ও বাস্তবগত চিন্তাধারার উন্নতি সাধন;

৪. মানুষের সব প্রচ্ছন্ন ধারণার উন্নতি সাধন করা;

৫. আখিরাতের দায়-দায়িত্ব ও হিসাবের প্রতি পূর্ণ সচেতনতা ও বাস্তব জীবনের বিভিন্ন অবস্থার মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মদক্ষতার উন্নতি সাধন করা;

৬. মানুষকে সমাজের অর্থনৈতিক ও বস্তুগত উন্নতির জন্য মানব জাতির ঐক্য ও সম্পদের পক্ষপাতহীন সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে কাজ করে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করে তোলা;

৭. সম্পদের দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষয়-ক্ষতি রোধ করা, পরিবেশগত ক্ষতি রোধ করা ও প্রত্যেকটি জীবের ভালোর রক্ষাকবচ হিসেবে সামাজিক দায়-দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে যাওয়ার ধারণাগত উন্নতি সাধন করা;

৮. জনগণ ও সমাজে বৃহত্তর কল্যাণে সকল ভালো কাজের প্রতিযোগিতায় উৎসাহ যোগানো;

৯. শিশুরা সুযোগ-সুবিধায় যাতে সমভাগী হয় এবং ভালোবাসা, যত্ন, স্নেহ, স্বার্থহীনতা, সততা, বিনয়, ন্যায়পরায়ণতা ও কঠিন নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে যেন বড় হয়-এর নিশ্চয়তা বিধান করা;

১০. জীবন ও জগত সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের অন্যতম লক্ষ্য;

১১. জড় ও আত্মার সঠিক সমন্বয় সাধনের মাধমে যমীনে আল্লাহ্‌র খিলাফতের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা সৃষ্টি ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের উদ্দেশ্য;

১২. ব্যক্তি প্রতিভার স্ফুরণ ও বিকাশ সাধন সামষ্টিক জীবন ধারাকে কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র বিধান মুতাবিক পরিচালনার যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের অন্যতম লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত;

---

[১]. প্রফেসর মাওলানা আব্দুল খালেক, *সিরাজুস সালেকীন*, (ঢাকা: সেবা প্রিন্টিং প্রেস, মহাখালী, বাংলা সন ১৩৯০), পৃ. ১০।

Dhaka University Institutional Repository

১৩. সৃষ্টি জগতের সকল বস্তু, প্রাণি, পদার্থ, প্রাকৃতিক শক্তি ও সম্পদকে মানব কল্যাণের জন্য ব্যবহারের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন এর লক্ষ্য;

১৪. মানুষের পার্থিব ও পরকালীন জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি, কল্যাণ ও সাফল্যের লক্ষ্যে বাস্তবধর্মী উৎপাদন ও উন্নয়নমুখী বিষয়ে সঠিক জ্ঞান অর্জন ও বিশ্ব প্রকৃতির সকল সৃষ্টির কল্যাণের লক্ষ্যে জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে ইসলামী অনুশাসন মুতাবিক পরিচালনার প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান লাভের উপযোগী সমাজ গঠন ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের লক্ষ্য;

১৫. ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সৃষ্টিকর্তার প্রতি আনুগত্য, নিজের প্রতি, পরিবার-পরিজনের প্রতি, প্রতিবেশি ও সমাজের প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞানদান ও কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধকরণ;

১৬. ইসলামী আইন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞানদান;

১৭. ধর্মীয় বিধান পালনের নিয়ম-নীতির সাথে পরিচিত করা;

১৮. সঠিক পদ্ধতিতে জীবিকা উপার্জনের পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করা এবং সে পদ্ধতি অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করা;

১৯. স্ত্রী-পুরুষের আচার-আচরণ ও দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ করে তোলা;

২০. চারিত্রিক ও মানবিক গুণাবলী অর্জন ও সে অনুযায়ী জীবন গঠনে মূল্যবোধ সৃষ্টি;

২১. ইসলামী বিধান অনুযায়ী সম্পদ অর্জন, অংশীদারিত্বের বিষয় অর্থাৎ নিজ, প্রতিবেশী ও দরিদ্রের হক সম্পর্কে সচেতন করা;

২২. আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে কর্তব্য পালনে উৎসাহিত করা;

২৩. ইসলামের গতিশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তনশীল বিশ্বে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে দক্ষতা অর্জন করা;

২৪. নবী করীম (সা)-এর শিক্ষা ও কর্মকান্ডকে জীবনাদর্শের মূল নিয়ামকরূপে গ্রহণের মন-মানসিকতা সৃষ্টি করা;

২৫. সৃষ্টি রহস্য ও আল্লাহ্‌র কুদরতের উপর গবেষণা করার যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম করে তোলা;

২৬. মানব কল্যাণের উপাত্ত ও উপকরণ সম্পর্কে ধারণা লাভ করে যথাযথ মানব কল্যাণের পথে ধাবিত হওয়ার যোগ্য করে তোলা এবং

২৭. ইসলামী তাহযীব ও তমদ্দুন প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজ-সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ইসলামের চাহিদার বাস্তবায়নে সহায়তা করা।

ইসলামী শিক্ষা-দর্শনে শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

রাসূলুল্লাহ্ হযরত মুহাম্মদ (সা) যে শিক্ষা-দর্শন প্রবর্তন করেন তার প্রধান উৎস আল কুর'আন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস। ইজমা ও কিয়াসকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর ভাষায় 'ফরিযাতুন আদেলা' আর হাদীসের বিবরণে বলা হয়েছে 'আওমা আযেলা ফাহুয়া ফযলুন'। এটা এমন এক শিক্ষা-দর্শনের নাম যার মধ্যে 'ফিক্হ' 'আকাইদ, ইবাদাতের পদ্ধতি, ইলমুল কালাম, চিকিৎসা বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, জীব বিদ্যা, পরিবেশ ও প্রকৃতি বিদ্যা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, বৈদেশিক ও জনসংযোগবিদ্যা, অর্থনীতি, ইসলামী আইন, ইসলামী ঐতিহ্য, দর্শন, সৌরবিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা, প্রকৌশল বিদ্যা ও সামরিক বিদ্যা অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১] ইসলামী শিক্ষা-দর্শন তাওহীদ ভিত্তিক।[২] তাওহীদ বা আল্লাহ্‌র একত্ববাদকে কেন্দ্র করেই ইসলামী শিক্ষা-দর্শন আবর্তিত। এতে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকে স্রষ্টা ও মাবুদ হিসেবে বিশ্বাস ও স্বীকার করা হয়। এ শিক্ষা-দর্শন মানব রচিত নয়। এ শিক্ষা-দর্শনের প্রধান উৎস কুর'আন ও সুন্নাহ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

---

[১] এ সময় বিভিন্ন ব্যবহারিক শিক্ষাও প্রদান করা হত বলে জানা যায়। [মুহাম্মদ মুসা, *রাসূলুল্লাহ্‌র (স:) আমলে শিক্ষা ব্যবস্থা* (ঢাকা: ইমদাদিয়া কুতুবখানা, ১৯৭৮ খৃস্টাব্দ), পৃ. ২৪।]

[২] ড. আব্দুল ওয়াহিদ, *বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি* (ঢাকা: ঝিঙেফুল প্রকাশনী, ২০০৭ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৩০।

Dhaka University Institutional Repository

"অতঃপর যে আমার প্রদত্ত হিদায়াত অনুসরণ করবে, তার কোন ভয় ও চিন্তা থাকবে না।"[১]

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ। তাওহীদ তথা আল্লাহ্‌র একত্ববাদের চিন্তা-চেতনার ভিত্তিতেই শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। ইসলাম যে শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলে তা নিছক আধ্যাত্মবাদী ও ধর্মীয় নয়, আবার বস্তুতান্ত্রিকও নয়,বরং তা আধ্যাত্মবাদ ও বস্তুবাদের সমন্বয়। ইসলাম দেহ ও আত্মার উভয়ের কল্যাণের কথা বলেছে। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এতে উভয় জগতের কল্যাণের দিকটি সামনে রেখে উভয়ের মধ্যে সমন্বয় করা হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে মানব জীবন অখণ্ড ও অবিভাজ্য। পরস্পর সম্পর্কহীন মানব জীবনের ভাগ বিভক্তি তা সমর্থন করে না। তাই শিক্ষা ব্যবস্থা অখণ্ড জীবনের প্রয়োজন ও চাহিদাকে সামনে রেখেই প্রণীত। ইসলামী শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজের সমন্বয় । এ শিক্ষা ব্যবস্থা একদিকে যেমন ব্যক্তির নৈতিক, আধ্যাত্মিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, দৈহিক বিকাশ ও কল্যাণের প্রয়াসী, তেমনি সমাজের কল্যাণের উপরও জোর দেয়। ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণের সমন্বয় সাধন ইসলামী শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য।

ইসলামী শিক্ষা জীবনমুখী । তা জীবনমুখী ব্যবস্থার কথা বলে। এতে বৈরাগ্যবাদের কোন স্থান নেই। জীবন ও সমাজ বিচ্ছিন্ন কোন শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামে নেই। সমাজের সদস্য হিসেবে ব্যক্তিকে ইসলাম গড়ে তুলতে চায়। অর্থাৎ ইসলাম জীবনাশ্রয়ী ও জীবনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবক্তা। ইসলামী শিক্ষার মূল ভিত্তি ওহী। সাথে সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা ও বিকাশ ইসলামী শিক্ষার অঙ্গ, তাই এ শিক্ষা ওহী ও বুদ্ধিবৃত্তিক সমন্বয়। ইসলামী শিক্ষায় পরীক্ষণ পদ্ধতির প্রাধান্য বেশী। এটা ওহীভিত্তিক হলেও বৈষয়িক ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইত্যাদির উপর জোর দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের কোন স্থান নেই। বস্তুগত পরীক্ষা বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যুক্তি প্রয়োগ ইসলামী শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ইসলামী শিক্ষা-দর্শন সর্বজনীন ও গণমুখী শিক্ষা। এতে সকলের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সর্বজনীন ও বৈষম্যহীন এ শিক্ষা-দর্শন ব্যবস্থার প্রবক্তা ইসলাম। তা নির্দিষ্ট কোন গোষ্ঠীর জন্য সীমাবদ্ধ নয় বরং সবার জন্য উন্মুক্ত। এ শিক্ষা-দর্শন কল্যাণকর জ্ঞান ভান্ডারের সমন্বয়। ইসলামী শিক্ষার পরিধি ব্যাপক। সেক্ষেত্রে ইসলাম কোন প্রকার সংকীর্ণতার প্রশ্রয় দেয়নি। যেখানেই প্রকৃত ও কল্যাণকর জ্ঞানের সন্ধান মিলে, সেখান থেকে তা আত্মস্থ করতে অনুপ্রাণিত করেছে।

ইসলামী শিক্ষা -দর্শন জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়। ইসলাম শুধু নিছক জ্ঞানের কথা বলে না বরং তা বাস্তবে অনুশীলনের কথা বলে। ইসলামী শিক্ষা-দর্শন ব্যবস্থা এমন হতে হবে যাতে শিক্ষা বাস্তবায়ন ও অনুশীলন একসাথে সম্পন্ন হয়। শিক্ষাবিহীন আমল আর আমলবিহীন শিক্ষা ইসলামে গ্রহণীয় নয়। তাই এ শিক্ষা-দর্শন জীবন গঠনের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা। সমাজের সার্বিক চাহিদা পূরণ ও সমগ্র মানবিক গুণাবলী ও বৃত্তির বিকাশের সুযোগ এ শিক্ষা-দর্শনে রয়েছে। এ শিক্ষা-দর্শন ছাড়া কোন শিক্ষা ব্যবস্থাই পূর্ণাঙ্গ নয়, হতে পারে না।

ইসলামী শিক্ষা-দর্শন ব্যবস্থা একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা। ইসলাম যেমন জীবনের দ্বৈততা বিভাজ্যতা স্বীকার করে না, তেমনি ধর্মীয় ও সেক্যুলার শিক্ষার নামে দ্বিমুখী কোন শিক্ষার স্থানও এতে নেই। একই শিক্ষা কাঠামোতেই ধর্মীয় ও বৈষয়িক সব ধরনের শিক্ষার সুযোগ এ শিক্ষা-দর্শন ব্যবস্থায় রয়েছে। এ শিক্ষা-দর্শন যুগোপযোগী ও গতিশীল। ইসলামী শিক্ষা-দর্শন কোন স্থবির বা সেকেলে ব্যবস্থা নয়। এটি এমন এক শিক্ষা-দর্শন যা সকলের জন্য আদর্শ, যুগের সার্বিক ও বাস্তব প্রয়োজন ও চাহিদা মেটাতে সক্ষম। এ হচ্ছে শাশ্বত আদর্শ ও সমকালীন প্রয়োজন ও বাস্তবতার সমন্বিত শিক্ষা-দর্শন ।

---

[১] আল্ কুর'আন, ০২ : ৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যাবলী

শিক্ষা-দর্শনের 'ধারণা'র ন্যায় শিক্ষা-দর্শনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমাজ পরিক্রমায় বিভিন্ন রূপ ও মাত্রা লাভ করেছে। কিন্তু শিক্ষার একক কোন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সর্বজনীন ও চিরস্থায়ী হয়ে ওঠেনি। বস্তুত, সেটা হওয়াও সম্ভব নয়। শিক্ষা-দর্শনের 'ধারণা'র মধ্যেই শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মর্মকথা নিহিত রয়েছে। কাল, সমাজবাস্তবতা এবং ভবিষ্যত সমাজ নির্মাণ অথবা পুনর্গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শামসুল হকের নিম্নোক্ত মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য "মানুষ সভ্যতা, তার জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-দর্শন, সমাজব্যবস্থা, রুচি-পরিবেশ, এমনকি প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা প্রণালী সবই মানুষের শিক্ষার ফল, তার আকাঙ্খা ও অধ্যবসায়ের ফসল। অপরপক্ষে, কোন সমাজের শিক্ষাব্যবস্থা সে সমাজের সামগ্রিক জীবনযাত্রা গুণাবলী ও আদর্শের প্রতিচ্ছবি। ব্যক্তি ও সমাজের প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষার লক্ষ্য, কাঠামো ও মান নির্ণীত হয়। শিক্ষাই সুন্দরতর, উন্নততর জীবন ও সমাজ গঠনের প্রধান হাতিয়ার একথা সত্য। একথাও সত্য যে, যে সমাজ যত উন্নত সে সমাজের শিক্ষাব্যবস্থা তত জটিল।"[১] একটা শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠা ও পরিচালনার মূলে থাকে শিক্ষার এক বা একাধিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের তাগিদ। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যহীনভাবে কোন শিক্ষাব্যবস্থাই টিকে থাকে না। মানুষের জীবন ও সমাজচাহিদার নিরিখে শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়, নতুন নতুন চাহিদার প্রেক্ষিতে তা আবার পরিবর্তিত হয়। শামসুল হক এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "সকল যুগে সকল দেশে সকল সমাজে জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ এক থাকেনি। যুগে যুগে দেশে দেশে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ ও প্রয়োজনের সম্মুখীন হয়েছে। পরিবর্তিত পরিবেশ ও প্রয়োজনের তাগিদে মানুষকে নিজ জীবনাদর্শের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হয়েছে। কালপ্রবাহের অনিবার্য ধারায়, বিচিত্র পটভূমিতে মানুষের শিক্ষার লক্ষ্য যুগে যুগে দেশে দেশে রূপান্তরিত, বিবর্তিত হয়েছে" । যেমন সমসাময়িক কালে একদেশে যখন শিক্ষার লক্ষ্য ছিল যোদ্ধা তৈরি করা তখন অন্য দেশে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল দক্ষ রাজকর্মচারী সৃষ্টি করা। অন্যকোন দেশে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল উপাসনার আনুষ্ঠানিকতা চর্চা করা। আবার একই দেশে এককালে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল নীতিজ্ঞান-সম্পন্ন ভদ্রলোক সৃষ্টি করা এবং অন্যকালে সেদেশের শিক্ষার লক্ষ্য হয়েছে কুশলী কর্মী সৃষ্টি করা। এভাবে প্রয়োজনের তাগিদে শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে পরিবর্তিত হয়।[২]

---

১. *শিক্ষা বিজ্ঞান ও বাংলাদেশের শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১-৩২।

২. At the First World Conference on Muslim Education, Muslim scholars agreed on the following definition of the aims of education: Education should aim at the balanced growth of the total personality of Man through the training of Man's spirit, intellect, his rational self, feelings and bodily senses. Education should cater therefore for the growth of Man in all its aspects: spiritual, intellectual, imaginative, physical, scientific, linguistic, both individually and collectively and motivate all aspects towards goodness and the attainment of perfection. *The ultimate aim of Muslim education lies in the realization of complete submission to Allah on the level of the individual, the community and humanity at large*. There is nothing in this definaition that suggests that Muslim education is not dynamically open or that it is restricted to creedal fundamentalism. The above definition gives a comprehensive view of the aims of education that takes into consideration the whole human being and seeks to cultivate all his/her faculties into a well-integrated personality under the sovereignty of God. Moreover, it is a definition that does not negate any of the disciplines. It includes all branches of knowledge: the humanities, the social sciences, the natural sciences, etc. This definition of the aims of education presupposes a methodology that will cultivate individuals for the best and the worse of all possible scenarios within empirical existence and for the attainment of the "supreme good," namely, perfection through submission to God. Immediately, we see that Muslim education is much more than the production of informed human beings. The

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে 'শিক্ষা' সমাজবিকাশের মাত্রা ও গতির ধারায় বিকশিত হয় এর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যেও এ ধারায় নির্ধারিত ও পুনঃনির্ধারিত হয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগে শিক্ষার সুনির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল না। পিতা-মাতা, আত্মীয়স্বজন এবং অন্যান্যদের কাছ থেকে অনানুষ্ঠানিক ধারায় শিক্ষা প্রজন্ম পরম্পরায় সঞ্চালিত হতো। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অগ্রসর সভ্য সমাজে শিক্ষা একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। অগ্রসর সমাজের শিক্ষাব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণই আনুষ্ঠানিক। সাধারণত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা এক বা একাধিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে পরিচালিত হয়। প্রাচীন সভ্যতা থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রতিটি সমাজ বা রাষ্ট্রে শিক্ষাব্যবস্থা কোন না কোন লক্ষ্য সামনে রেখে তার কার্যাবলী সম্পন্ন করে। সমাজবিজ্ঞানী গিডিংস সমাজ ও সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাব্যবস্থার বিকাশকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। এগুলো হচ্ছে (ক) আদিম সমাজের অনুষ্ঠান-নিরপেক্ষ প্রত্যক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা, (খ) প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা এবং (গ) আধুনিক ধর্ম-নিরপেক্ষ পার্থিক শিক্ষাব্যবস্থা। বস্তুত, আদিম সমাজের শিক্ষাব্যবস্থা ব্যতীত অন্যগুলোর প্রতিটি সুনির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য সামনে রেখে পরিচালিত হতো। আদিম সমাজে মানুষ স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনানুষ্ঠানিক ধারায় প্রকৃতি ও সমাজজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা লাভ করতো। কিন্তু সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে তথা সামাজিক স্তরবিভক্ত সমাজ থেকেই শিক্ষা বিশেষ বিশেষ সামাজিক গোষ্ঠী বা শ্রেণীকেন্দ্রিক হয়ে পড়ায় তা নির্ধারিত লক্ষ্যকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। গোটা প্রাচীন ও মধ্যযুগে সমাজের মুষ্টিমেয় মানুষের লক্ষ্যে শিক্ষা পরিচালিত হতো। তখনকার দিনে শিক্ষা ছিল প্রধানত ব্যক্তিগত ব্যাপার। শিক্ষায় মুষ্টিমেয় অভিজাত ও ধনী লোকের ছিল একচেটিয়া অধিকার। প্রাচীন মিসরীয়, হিব্রু, গ্রীক ও রোমানদের শিক্ষা ব্যবস্থা এর কিছুটা ব্যতিক্রম লক্ষ করা গেলেও মূলগতভাবে সাধারণ মানুষের জন্য শিক্ষার সুযোগ আদৌ ছিল না। এসব প্রাচীন সমাজব্যবস্থায় শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্যে তথা শিক্ষার লক্ষ্যের বিভিন্নতা প্রসঙ্গে স্যামুয়েল কোনিগ মন্তব্য করেছেন, "শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য সভ্যসমাজে একরূপ ছিল না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যেমন- প্রাচীন মিসর ও রোমে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল প্রধানত বিদ্যার্থীদের চরিত্র গঠন

---

informed individual is commended but, according to the Islamic aim of education, he or she is not necessarily fully educated. There is an existential challenge in Muslim education which seeks to lead the individual beyond the stage of "knowing" to the stage of "being." Muslim education, therefore, poses an existential challenge with an ontological goal, when the state of comprehensive and total well- being completes the process of knowing. This is the ultimate state of the ultimate transformation of life, and as the *summum bonum* of Muslim education, its value transcends the scientific and technological. At this stage, to grasp the uniqueness of the Muslim aim of education, some understanding of the Islamic view of man will be helpful. (।[Nabil al-Samaluti, *School Organization and Educational Modernization* (Jeddah: Saudi Arabia Dar Ashorooq Printing and Distribution, 1980), p. 9 -77; Mohamed Badawi, "*Improving the role of the masjid to serve the religious cause,"* Al-Manhal (1989) vol. 50, no. 467, p. 91; Na'im, "*The Real Teacher and the First Prophetical Schools,"* p. 447.; Sami al-Saqar, *History of Muslim Education* (Riyadh: Saudi Arabia Dar al Mareelth, 1980); Ahmed, The Development of Arab Thought; Abu al-hasan al-Nadawi, *Education and Society* (Damascus: Syria Dar al-Qalam, 1991); Mutawali, *History of Islamic Education*.; Egypt Dar al-Fikr al-Arabi, 1978), p.11-65.; Ahmed al-Ahwani, *Education in Islam* (Cairo: Egypt Dar al-Ma'arif, 1957). 5 - 70. Ahmed Shalabi, *History of Islamic Education*. 2nd edition (Cairn: Egypt Egyptian Anglo Libraiy, 1960), 6 -72; Atif Abadhah, "*Islamic Schools,"* Al-Manhal (1989) vol. SO, no. 467; Naji al-Ansari, "Al-Marina: *Education from 622—1992*," Al-Manhal (1992) vol. 54, no. 499; Hasan Mahmoud and Ahmed al-Sharif, *The Islamic World in the Abbasid's Era, 4th edition* (Cairo: Egypt: Dar al-Fakr al-Arabi, 1980), p.7-80.]

Dhaka University Institutional Repository

ও ঈশ্বরের কৃপা ও অনুগ্রহ লাভ। কিন্তু প্রাচীন চীন ও ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল আধা-ধর্মীয় ও আধা-পার্থিব। পক্ষান্তরে, হিব্রুদের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল পুরোপুরি ধর্মকেন্দ্রিক"। সংস্কৃতির বিভিন্নতাকেই এসব পার্থক্যের প্রধান কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে সমাজের উচ্চতর শ্রেণীর মানুষের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাঠামোভিত্তিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও সাধারণ মানুষের জন্য সে সুযোগ ছিল না। পরিবারই সাধরণ মানুষের শিক্ষা লাভের প্রধান প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভূমিকা পালন করতো। ফলে সাধারণ মানুষের জন্য শিক্ষার সুসংবদ্ধ লক্ষ্য মধ্যযুগ পর্যন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে গড়ে ওঠেনি। কোনিগের মতে, মধ্যযুগে আরবদের মধ্যে প্রথম পার্থিব শিক্ষার বীজ রোপিত হয়। ইউরোপের কিছু অংশ এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। কালক্রমে ইউরোপে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং সামাজিক বিভিন্ন আন্দোলন ও সংস্কারের মাধ্যমে পার্থিব শিক্ষা বিস্তার লাভ করে।[১] বস্তুত, এধারার শিক্ষায় পরিবারের বদলে প্রতিষ্ঠান তথা বিদ্যালয়ের ভূমিকা জোরদার হয় এবং সাধারণ মানুষের জন্য শিক্ষা লাভের সুযোগ বাড়তে থাকে। পনের শতকে ইউরোপে রেনেসাঁসের প্রভাবে ধর্মের কঠোর আওতা থেকে শিক্ষা ক্রমশ মুক্ত হতে শুরু করে। তবুও উনিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত তা উল্লেখযোগ্যভাবে মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হয়নি। কোন কোন দেশে বিশেষত ইউরোপে উনিশ শতকে গোড়ার দিকে বাধ্যতামূলক জনশিক্ষা চালু হলেও বিশ শতকের পূর্বে তা পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে বিশেষত এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার ঔপনিবেশিক শাসনাধীন দেশগুলোতে বিশ শতকের শেষার্ধে জনশিক্ষা প্রসার লাভ করে। বর্তমানে এসব দেশে জনশিক্ষা সর্বজনীন করার লক্ষ্যে 'সবার জন্য শিক্ষা', 'বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা', 'অব্যাহত শিক্ষা', 'মানসম্মত শিক্ষা' প্রভৃতি শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ধারার সাথে সাথে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমেও এসব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জোর প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি উভয় উদ্যোগের ওপরই সমান গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এসবের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পরিবর্তন আনা হচ্ছে এবং তা লাভ করছে নতুন নতুন মাত্রা।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের গতিধারা এবং বিভিন্ন মাত্রার একটি সারসংক্ষেপ নিচে তুলে ধরা হলো। শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করে। লক্ষ্য ব্যতিরেকে

---

১. এ প্রসঙ্গে কোনিগ উল্লেখ করেছেন, "ধর্ম নিরপেক্ষ ও পার্থিব শিক্ষার বিকাশ আমরা প্রথমে আরবদের মধ্যে দেখতে পাই। ইউরোপের স্পেন আরবদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল। সেখানে অংকশাস্ত্র, প্রকৃতি বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিদ্যার বিকাশের জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া, শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশ, রেনেসাঁ বা নবযুগের ভাবধারার প্রসার, প্রোটেস্টান্ট সংস্কার আন্দোলন এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ইউরোপে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল"। [Nabil al-Samaluti, *School Organization and Educational Modernization* (Jeddah: Saudi Arabia Dar Ashorooq Printing and Distribution, 1980), p. 9 -77; Mohamed Badawi, "*Improving the role of the masjid to serve the religious cause,"* Al-Manhal (1989) vol. 50, no. 467, p. 91; Na'im, "*The Real Teacher and the First Prophetical Schools,"* p. 447.; Sami al-Saqar, *History of Muslim Education* (Riyadh: Saudi Arabia Dar al Mareelth, 1980); Ahmed, The Development of Arab Thought; Abu al-hasan al-Nadawi, *Education and Society* (Damascus: Syria Dar al-Qalam, 1991); Mutawali, *History of Islamic Education*.; Egypt Dar al-Fikr al-Arabi, 1978), p.11-65.; Ahmed al-Ahwani, *Education in Islam* (Cairo: Egypt Dar al-Ma'arif, 1957). 5 - 70. ; *History of Islamic Education,ibid*, p.6 -72; Atif Abadhah, "*Islamic Schools,"* Al-Manhal (1989) vol. SO, no. 467; Naji al-Ansari, "Al-Marina: *Education from 622—1992*," Al-Manhal (1992) vol. 54, no. 499; Hasan Mahmoud and Ahmed al-Sharif, *The Islamic World in the Abbasid's Era, 4th edition* (Cairo: Egypt: Dar al-Fakr al-Arabi, 1980), p.7-80. ; *শিক্ষা বিজ্ঞান ও বাংলাদেশের শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১-৩২।]

Dhaka University Institutional Repository

যেকোন শিক্ষাব্যস্থা হালহীন নৌকায় পরিণত হয়। শিক্ষার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, শিক্ষার লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষা মতবাদ গড়ে ওঠেছে। এগুলোর মধ্যে কতক মিল থাকলেও এক্ষেত্রে ভিন্নতাই বেশি লক্ষণীয়। যেমন, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের আইন প্রণেতা মনু ব্যক্তির 'বুদ্ধিবৃত্তিক' (intellectual) ও 'আত্মিক' (ipritual) বিকাশ সাধনকে শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে গণ্য করেছেন। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো 'ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ সাধন'কে শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। আর্যযুগে 'আত্মিকবাদ' (ipritualism) ভারতের শিক্ষার প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হয়। প্রাচীন গ্রীক নগর রাষ্ট্র স্পার্টার শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ছিল সামরিক জীবনের জন্য ব্যক্তিকে প্রস্তুত করা। সেজন্য স্পার্টার শিক্ষাব্যবস্থায় দৈহিক শক্তি, শৃঙ্খলা ও আনুগত্য প্রদর্শনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অন্যদিকে, এথেন্সে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল স্পার্টার বিপরীত। প্রাচীন গ্রীসের উক্ত প্রভাবশালী নগর রাষ্ট্র জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও ন্যায়ের বিকাশ সাধন করাই ছিল শিক্ষার মূল লক্ষ্য। সেজন্য সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থায় দেহের সাথে মনের সুষ্ঠু উন্নয়নের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এসব বিষয়কে কেন্দ্র করেই প্রাচীন ভারতবর্ষ ও গ্রীসের শিক্ষাচিন্তার প্রধান ধারাসমূহ সৃষ্টি হয়। যেমন, সেখানে 'আদর্শবাদী' (idealistic) এবং 'বাস্তববাদী' (realistic) - এই দুই ধারায় শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আদর্শবাদী ধারায় উচ্চতর আদর্শ জীবনযাপনকে সামনে রেখে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক ফলাফলের পরিবর্তে দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল কেন্দ্রিক সাধারণ কিছু লক্ষ্য নির্ণয় করা হয়। এ ধরনের শিক্ষার প্রধান লক্ষ্যই হল ব্যক্তির চরিত্র গঠন এবং তার মানসিক উন্নতি সাধন। শিক্ষা এক্ষেত্রে "বহুলাংশে জ্ঞানের জন্য জ্ঞান অর্জন"- এ পর্যবসিত হয়। অন্তর্নিহিত দিক থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে বাস্তবজীবনকে অবহেলা না করলেও, 'পরিপূর্ণ জীবনযাপন' (complete living) - এর জন্য ন্যায়বোধসম্পন্ন আদর্শ ও চরিত্রবান মানুষ সৃষ্টি করাই হচ্ছে এখানে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। অন্যদিকে, সমাজের বিদ্যমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তববাদী ধারায় শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারিত হয়।

এক্ষেত্রে বিরাজমান জীবনদর্শন, রাজনৈতিক আদর্শ, সামাজিক সমস্যাবলী, অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণে প্রধান বিবেচ্য বিষয়ে পরিণত হয়।[১]

---

১. শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণে রাজনৈতিক মতাদর্শও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বস্তুত, শাসক শ্রেণী এবং শক্তিশালী রাজনৈতিক দলসমূহের মতাদর্শ প্রত্যেক দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ওপর সব সময় প্রভাব বিস্তার করে। গণতান্ত্রিক সরকার, স্বৈরতান্ত্রিক সরকার, সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রত্যেকটিই নিজস্ব রাজনৈতিক মতাদর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রের শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করে থাকে। সাধারণত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নমনীয় বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হয়। মানুষের বাস্তব চাহিদার সঙ্গে সবসময় তা সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখার চেষ্টা করা হয়। ব্যক্তির চাহিদা ও আশা-আকাঙ্খা অনুযায়ী শিক্ষার ধরন ও প্রকৃতি নির্ধারণ এবং তা বাস্তবায়নে বহুমাত্রিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার সুযোগ প্রদান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্যে পরিণত হয়। স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের প্রয়োজন অনুযায়ী নাগরিক সৃষ্টির জন্য শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী মানুষ সৃষ্টির জন্য শিক্ষার লক্ষ্য নিরূপণ করা হয়। [Nabil al-Samaluti, *School Organization and Educational Modernization* (Jeddah: Saudi Arabia Dar Ashorooq Printing and Distribution, 1980), p. 9 -77; Mohamed Badawi, "*Improving the role of the masjid to serve the religious cause,"* Al-Manhal (1989) vol. 50, no. 467, p. 91; Na'im, "*The Real Teacher and the First Prophetical Schools,"* p. 447.; Sami al-Saqar, *History of Muslim Education* (Riyadh: Saudi Arabia Dar al Mareelth, 1980); Ahmed, The Development of Arab Thought; Abu al-hasan al-Nadawi, *Education and Society* (Damascus: Syria Dar al-Qalam, 1991); Mutawali, *History of Islamic Education*.; Egypt Dar al-Fikr al-Arabi, 1978), p.11-65.; Ahmed al-Ahwani, *Education in Islam* (Cairo: Egypt Dar al-Ma'arif, 1957). 5 - 70. ; Naji al-Ansari, "Al-Marina: *Education from 622—1992*," Al-Manhal (1992) vol. 54, no. 499; Hasan Mahmoud and Ahmed al-Sharif, *The Islamic World in the Abbasid's Era, 4th edition* (Cairo: Egypt: Dar al-Fakr al-Arabi, 1980), p.7-80.; *শিক্ষা বিজ্ঞান ও বাংলাদেশের শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১-৩২।]

Dhaka University Institutional Repository

ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, মুসোলিনির আমলে ইতালীর স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় উল্লিখিত তিন ধরনের শিক্ষার লক্ষ্যের রূপায়ন ঘটে। এভাবে অন্যান্য সকল ধারার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রধান রাজনৈতিক মতাদর্শ শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কোন কোন সময় সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধাণের প্রভাব বিস্তার করে। মানুষকে সময়ের চাহিদাভিত্তিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা মোকাবেলায় সক্ষম করার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় তদানুযায়ী শিক্ষাক্রম সংযুক্ত করতে হয়। এক্ষেত্রে দেশের বাস্তব আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম এবং তার প্রয়োজনীয় উন্নয়ন সাধনযোগ্য নাগরিক সৃষ্টি করা শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। যেমন- ভারতের হিন্দু সমাজ অসংখ্য বর্ণ, উপ-বর্ণে বিভক্ত। বর্ণভিত্তিক কঠোর সামাজিক স্তরবিন্যাস এ সমাজের বড় একটি সমস্যা। এ সমস্যা মোকাবেলা ও দূরীভূত করা ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় অন্যতম লক্ষ্য। অনুরূপভাবে বলা যায়, গত শতকের মধ্যভাগে যখন ডেনমার্কে তীব্র অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয় তখন কাজের সুযোগ ক্রমশ সীমিত হয়ে পড়ে। মানুষের আয় দ্রুত গতিতে হ্রাস পায়। কিন্তু দেশটি শিল্পায়ন ও প্রাকৃতিক সম্পদে, বিশেষত খনিজ সম্পদে তেমন সমৃদ্ধ ছিল না। জরিপ করে দেখা যায় যে, দেশটিতে দুগ্ধ সম্পদ বৃদ্ধির প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে দুগ্ধশিল্প বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করে ডেনমার্কের শিক্ষার লক্ষ্য পুনঃনির্ধারণ করা হয়। দুগ্ধ শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টিই ডেনমার্কের শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হয়। এর সুফল শীঘ্রই পাওয়া যায়। ফলে ডেনমার্কে উত্তরোত্তর মাথাপিছু আয় বাড়তে থাকে এবং জাতীয় আয় কাঙ্খিত মাত্রায় পৌঁছে। বাংলাদেশসহ অনুন্নত দেশগুলোতে অর্থনৈতিক সমস্যা অত্যন্ত প্রকট। এসব দেশের নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের প্রয়োজনীয় দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি করাই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে আধুনিককালে শিক্ষার যেসব লক্ষ্য সাধারণত নির্ধারণ করা হয় নিচে তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১. বৃত্তিমূলক লক্ষ্য

খাদ্য, বাসস্থান এবং বস্ত্র মানুষের মৌলিক চাহিদা। আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য হলো এসব মৌলিক চাহিদা মেটানোর প্রয়োজনে কর্ম বা বৃত্তি লাভের উপযোগী দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি করা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের ধারায় শিল্পায়নের প্রয়োজনীয়তা শিক্ষার বৃত্তিমূলক লক্ষ্যকে জোরদার করেছে। কখনও কখনও এটিকে 'শিক্ষার রুটি ও মাখন লক্ষ্য' (bread and butter aim of education) বলা হয়। বস্তুত, এটি হচ্ছে শিক্ষার উপযোগবাদী (utilitarian) লক্ষ্য। আজকের শিশু আগামী দিনের প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিক তথা সমাজের দায়িত্ববান সদস্য। ফলে তাকে জীবিকা নির্বাহের উপযুক্ত করে গড়ে তোলাই শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য হওয়া যুক্তিযুক্ত। অন্যথায় সমাজে পরজীবী হিসেবে জীবনযাপন করা ছাড়া তার উপায় থাকে না। মানুষের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ব্যতিরেকে নাগরিক ও সামাজিক যোগ্যতারও বিকাশ ঘটতে পারে না। সক্রেটিসের মধ্যে "Knowledge is power by which things are done"। এজন্য অনেকেই জ্ঞানার্জনকে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হিসেবে গণ্য করেছেন। তাঁরা মনে করেন জ্ঞানে অগ্রগতি একদিকে যেমন ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ সাধন করে অর্থাৎ বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ঘটায়, অন্যদিকে মানসিক উন্নয়নও সাধিত হয়। তাঁদের মতে জ্ঞান লাভের মধ্য দিয়েই সভ্যতা এগিয়ে চলেছে। জ্ঞান মানুষের চিন্তা শক্তির বিকাশ সাধন করে। মানুষের বিশালত্ব তার চিন্তা ক্ষমতা দিয়েই পরিমাপ করা হয়। সক্রেটিসের মতো বেকন ও কমেনিয়াসও জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে শিক্ষা লাভের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর জীবনের বস্তুগত, সামাজিক, নৈতিক, আত্মিক ও অর্থনৈতিক সকল 'জ্ঞান'কে অপরিহার্য (sine qua non) বলে বিবেচনা করেছেন।

'জ্ঞান'কে নিছক 'জ্ঞানের জন্য জ্ঞান' হিসেবে না দেখে 'প্রকৃত জ্ঞান' (True knowledge) রূপে দেখার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সেজন্যেই সক্রেটিস বলেন, "One who had true knowledge could not be other than virtuous" সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত ধারণাকে সাধারণত প্রকৃত জ্ঞান হিসেবে আখ্যায়িত করা

Dhaka University Institutional Repository

হয়। এ জ্ঞান অবশ্যই 'কার্যধর্মী' (functional)। নিষ্ক্রিয় ধারণা অর্জনকে 'জ্ঞান' হিসেবে অভিহিত করা চলে না। সক্রিয় ধারণা, যা ব্যক্তির চিন্তাকে উদ্দীপ্ত করে এবং আচরণ ধারার ওপর প্রভাব বিস্তার করে- তাই 'জ্ঞান'। এ মতের অনুসারীরা 'তথ্য ব্যবসায়'কে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন হিসেবে স্বীকৃতি দেন না। যেমন- এডামস মন্তব্য করেছেন যে, বিদ্যালয়কে কখনই 'জ্ঞানের দোকান'-এ পরিণত করা এবং শিক্ষককে 'তথ্য-ব্যবসায়ী' হওয়া সমীচীন নয়। তবে 'জ্ঞান'কে অবশ্যই বাস্তবজীবন সংশ্লিষ্ট হতে হবে। 'জ্ঞান অর্জন'কে শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে প্রাধান্য প্রদানকারীগণ এ ধারণাও পোষণ করেছেন যে, এ জাতীয় শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন, নাগরিক গুণাবলী অর্জন, অর্থনৈতিক যোগ্যতা বৃদ্ধি করে পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ জীবন গড়ে তুলতে পারে। এ ধরনের শিক্ষা মানুষকে সুখী হতে এবং তার মানবতাবোধ জাগ্রত করতে যথার্থ ভূমিকা পালন করে।

২. সাংস্কৃতিক লক্ষ্য

শিক্ষার সাংস্কৃতিক লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীকে মার্জিত ও রুচিশীল করা এবং সুন্দর ও সত্যের অনুরাগী করা। নিউম্যানের মতে সাংস্কৃতিক লক্ষ্যমুখীন শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা স্বাধীনতাবোধ, সাম্যভাব, শান্তস্বভাব, মার্জিত আচরণ এবং প্রজ্ঞার অধিকারী হয়। তাঁর মতে, এধরনের শিক্ষার অধিকারী ব্যক্তির জীবন যাত্রার প্রতিটি পদক্ষেপ হয় সুন্দর ও রুচিশীল। মহাত্মা গান্ধী সাংস্কৃতিক লক্ষ্যে সমন্বিত শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[১] বস্তুত, সংস্কৃতি একটি ব্যাপক অর্থবহনকারী সামাজিক প্রপঞ্চ। জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ, নৈতিকতা ইত্যাদি দিকও সংস্কৃতির অন্তর্গত। সংস্কৃতি- লক্ষ্যমুখীন শিক্ষার প্রবক্তারা ব্যক্তির মধ্যে এসব গুণের বিকাশ সাধন করা এবং তার আচরণে এ গুণের প্রকাশ ঘটানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাদের মতে সংস্কৃতিবান মানুষ কখনই নিজের গুণাবলী জাহির করেন না, একদেশদর্শী ও উগ্রমেজাজী হন না। ধৈর্যশীল ও মার্জিত স্বভাবের হন এবং পরিমিত স্বরে ও ভাষায় কথা বলেন। সংস্কৃতিবান মানুষ কখনই চিন্তাহীন, অর্থহীন ও অসার মন্তব্য করেন না। হোয়াইটহেড ও শিক্ষার সংস্কৃতিমূলক উদ্দেশ্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[২]

---

১. "Culture is the foundation, the primary thing It should show itself in the smallest detail of your conduct and personal behaviour, how you sit, how you walk, how you dress, etc. Inner culture must be reflected in your speech, the way in which you treat visitors and guests, and behave towards one another and towards your teachers and elders." (*শিক্ষা বিজ্ঞান ও বাংলাদেশের শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৩২; [Nabil al-Samaluti, *School Organization and Educational Modernization* (Jeddah: Saudi Arabia Dar Ashorooq Printing and Distribution, 1980), p. 9 -77; Mohamed Badawi, "*Improving the role of the masjid to serve the religious cause,"* Al-Manhal (1989) vol. 50, no. 467, p. 91; Na'im, "*The Real Teacher and the First Prophetical Schools,"* p. 447.; Sami al-Saqar, *History of Muslim Education* (Riyadh: Saudi Arabia Dar al Mareelth, 1980); Ahmed, The Development of Arab Thought; Abu al-hasan al-Nadawi, *Education and Society* (Damascus: Syria Dar al-Qalam, 1991); Mutawali, *History of Islamic Education.*; Egypt Dar al-Fikr al-Arabi, 1978), p.11-65.; Ahmed al-Ahwani, *Education in Islam* (Cairo: Egypt Dar al-Ma'arif, 1957). 5 - 70.; Ahmed Shalabi, *History of Islamic Education*. 2nd edition (Cairn: Egypt Egyptian Anglo Libraiy, 1960), 6 -72; Atif Abadhah, "*Islamic Schools,"* Al-Manhal (1989) vol. SO, no. 467; Naji al-Ansari, "Al-Marina: *Education from 622—1992*," Al-Manhal (1992) vol. 54, no. 499; Hasan Mahmoud and Ahmed al-Sharif, *The Islamic World in the Abbasid's Era, 4th edition* (Cairo: Egypt: Dar al-Fakr al-Arabi, 1980), p.7-80.]

২. Milton Mayer, "To Know and to Do," in Arthur A. Cohen (ed.), *Humanistic Education and Western Civilization* (New York: Holt, Reinhart and Winston, 1964), p. 208.; In the Western world, there are many who take the word jihad as meaning licence for Muslims to wage war. If this were the case, then there would be an inher ent contradiction in the term Islam itself

Dhaka University Institutional Repository

৩. নৈতিক চরিত্র গঠনমূলক লক্ষ্য

অনেক শিক্ষাবিদই মনে করেন শিক্ষার্থীর নৈতিক চরিত্র গঠনই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য চরিত্রবান শাসক ও বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের সুশিক্ষার কথা বলেছেন, যার মূল লক্ষ্য হলো চরিত্র গঠন। আধুনিককালের অনেক দার্শনিক চরিত্র গঠনে শিক্ষার ভূমিকার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। চরিত্রের বিষয়টি মূল্যবোধযুক্ত প্রপঞ্চ হওয়ায় দেশে দেশে চরিত্র গঠনের আদর্শ সম্পর্কে নানা মত রয়েছে। এরিস্টটল মানুষের আচরণের প্রধান দু'টি প্রবণতা চিহ্নিত করেছেন। একটি হলো 'প্রবৃত্তিতাড়িত ও বর্বরতা' এবং অন্যটি হলো 'বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানবতা'। তাঁর মতে শেষোক্তটি হলো নৈতিক চরিত্রের ভিত্তি এবং এর বিকাশসাধন করাই হচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য। জার্মান শিক্ষাবিদ জোহান ফ্রিডারিক হার্বার্টের (১৭৭৬-১৮৪১ খ্রিস্টাব্দ) মতে, শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠন হচ্ছে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। তিনি "Aesthetic Presentation" শীর্ষক তাঁর গবেষণা কর্মে উল্লেখ করেছেন, "The one and the whole work of education may be summed up in the concept-morality" তাঁর মতে আদিম ও নিচু প্রকৃতি অবদমন এবং উন্নত মানসিকতার উৎকর্ষ সাধনই হচ্ছে নৈতিকতা। এভাবে বিভিন্ন চিন্তাবিদ চরিত্রের ধারণা প্রদান করেছেন। তবে এক্ষেত্রে সর্বজনস্বীকৃত কোন ধারণা অথবা সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়নি। সাধারণভাবে মানব আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির কতকগুলো দিককে নৈতিক চরিত্রের অন্তর্গত করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে (ক) জীবনে উচ্চ মূল্যবোধের উপলব্ধি ও চর্চা (realization and practice of higher values in life), (খ) মনের প্রশিক্ষণ বা ইচ্ছাশক্তি (training of mind or will-power), (গ) সুশৃঙ্খল সহজাত প্রবৃত্তি (discipline of instincts) এবং (ঘ) সহজাত প্রবৃত্তিমূলক আচরণকে নৈতিক আচরণে রূপান্তরিত

---

and in the whole tradition. Islam is peace, seeking neither division nor war but the return of mankind from its diverse ways of cor ruption and polytheism to the confession of One God, whose unity and divinity are exclusive, and Who has neither partners nor associates. The aim of jihad is not, as many Westerners have come to believe, war for the conversion of nonbelievers by force. The Qur'an declares: "Fight in the way of Allah against those who fight against you, but not in hostilities. Lo! Allah loveth not aggressors" (2:190). And again, "There is no compulsion in religion. The right direction is henceforth distinct from error. And he who rejecteth false deities and believeth in Allah hath grasped a firm handhold which will never break. Allah is Hearer and Knower" (2:256). It is clear that there should be no violence in religion. In giving sanction to jihad, Islam specifies its main objectives which are, briefly stated, to protect the faith, one's family, oneself, and one's country (4:75) and to protect and defend helpless and oppressed believers (8:72). "Thus, war is not renewed or perpetuated except against a tyrant who insists on acts of tyranny, compelling people to abandon their religion. Persecution, forced conversion, and the deprivation of religious freedom are more distasteful to God than the taking of life"; from 'Abd al-Rahaman 'Azzam, The Eternal Message of Muhammed (Toronto: The New American Library of Canada, 1964), p. 130; see also 2:190—193 and 2:216—217. For a more detailed study of jihad, see Rudolph Peters, *Jihad in Medieval and Modern Islam* (Leiden: E. J. Brill, 1977), pp. 9—79.; Syed All Ashraf, *New Horizons in Muslim Education* (Chippenham: Hodder & Stroughton, 1985), p. 5.; For a detailed study of the human being in Islam, see Annemarie Schimmel, *Deciphering the Signs of God: A Phenomenological Approach to Islam* (Albany: State University of New York Press, 1994), pp. 178—215.

১. তাঁর মতে শিক্ষা এমন মানুষ সৃষ্টি করবে, "Who possess both culture and expert knowledge. Their expert knowledge will give the children the ground to start from and culture will lead them as deep as philosophy and as high as art". ibid, p. 3-18.

Dhaka University Institutional Repository

করা changing instinctive behaviour into moral behaviour। পূর্বোক্ত শিক্ষাবিদগণ শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে এসব দিকের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরো করেছেন।

৪. নৈতিক চরিত্র গঠনমূলক লক্ষ্য

অনেক শিক্ষাচিন্তাবিদ ব্যক্তির সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য দৈহিক, মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিকাশ সাধনকে শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে গণ্য করেছেন। তাঁদের মতে এটিই হচ্ছে শিক্ষার 'পূর্ণাঙ্গ জীবন যাপনমূলক লক্ষ্য'। সামাজিক ডারউইন বলে পরিচিত ব্রিটিশ সমাজবিজ্ঞানী হার্বার্ট স্পেন্সারই হচ্ছেন শিক্ষার এ লক্ষ্যে প্রধান প্রবক্তা। তাঁর মতে প্রতিটি ব্যক্তিকেই বহুবিধ গুণের অধিকারী হতে হয়। পরিবার, কর্মক্ষেত্র, রাষ্ট্র, সমাজ প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাকে ভূমিকা পালন করতে হয়। ব্যক্তিকে সকল ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা পালনের উপযোগী করে গড়ে তোলাই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত। স্পেন্সর শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য বিচিত্র পরিস্থিতি মোকাবেলা করার কলা-কৌশল আয়ত্তের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[১] বস্তুত, স্পেন্সারের মতে, শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ জীবনযাপনের পথ ও পদ্ধতির পথের সন্ধান লাভ করে; সে তার শক্তিসামর্থ্য ও সম্ভাবনাগুলোর সুষম বিকাশের মধ্য দিয়ে জীবনের সার্থকতা খুঁজে পায়। তিনি পূর্ণাঙ্গ জীবনযাপনের জন্য ব্যক্তির প্রস্তুতি গ্রহণের উপায় হিসেবে শিক্ষাকে গণ্য করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি পাঁচটি বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয়েরও উল্লেখ করেছেন। এগুলো হচ্ছে- (ক) প্রত্যক্ষ জীবন ধারণের উপযোগী কর্মকান্ড; (খ) জীবনের অস্তিত্বকে সংকটহীন করে তোলার উপযোগী ক্রিয়াকলাপ; (গ) সন্তান-সন্ততিকে সঠিকভাবে লালন-পালনের মাধ্যমে সুখী পারিবারিক জীবনযাপনের অত্যাবশ্যকীয় কার্যকলাপ; (ঘ) সুনাগরিকতাবোধ বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কর্ম তৎপরতা; এবং (ঙ) মানুষের জীবনকে সুখী, সমৃদ্ধ ও সর্বাঙ্গীনভাবে সুস্থ করে তোলার জন্য অবসর বিনোদনমূলক ও সৃষ্টিধর্মী সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড।

এভাবে দেখা যায়, বিভিন্ন চিন্তাবিদ মানব জীবনের বিশেষ বিশেষ দিকের ওপর গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ জীবনযাপনমূলক লক্ষ্য নির্ধারণের প্রয়াস চালিয়েছেন। মানব সমাজ প্রতিনিয়ত বিকশিত হচ্ছে এবং বহুমুখি বৈশিষ্ট্য লাভ করছে, এক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তির জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে গণ্য করা বাস্তবে কতখানি সম্ভবপর সে প্রশ্ন সহজেই করা চলে।

৫. অবকাশ যাপনের জন্য শিক্ষা

কোন কোন শিক্ষাবিদ 'অবকাশ যাপন'কে শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তাঁরা 'অবকাশকে' (Leisure) মুক্ত ও ব্যস্ততাহীন সময়' (free and unoccupied time) বলে গণ্য করার মাধ্যমে এর সদ্ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এসব শিক্ষাচিন্তাবিদের মতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির ফলে ক্রমেই মানুষের দৈহিক শ্রম সময় কমে আসছে। তদুপরি, যন্ত্রের মাধ্যমে দ্রুত কর্মসম্পাদনের কারণে দৈনন্দিন কর্মঘন্টাও হ্রাস পাচ্ছে। এতে যেমন প্রতিদিন তেমনি প্রতি সপ্তাহে মানুষের অবসর বিনোদনের জন্য প্রচুর সময় থাকছে। এসময়টি অলস হয়ে না কাটিয়ে ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণে অর্থবহভাবে অতিবাহিত করা প্রয়োজন। অন্যথায় ব্যক্তি নানাবিধ অর্থহীন কাজে নিয়োজিত হয়ে পড়তে পারে এবং তাতে স্বাভাবিক সমাজ

---

১. "Education must tell us in what way to treat the bodj in what way to treat the mind, what way to manage our affairs, in what way to bring up our family, in that way to behave as a citizen, in what way to utilize those sources, of happiness which nature supplies-how to use all faculties to the greatest advantage of ourselves and others. This complete living and for this it is necessary to have knowledge about life, interest in life, and ideals life".[Husayn Amin, *The Mustansiriyah School* (Baghdad: Iraq Shafeeq Press, 1960), p. 9-54.; Nasir al-Din al-Albani *The Small Collection of Alahadith and Its Additions*, 2nd edition, hadith no. 3913 (Beirut: Lebanon al-Maktab al-lslami, 1986), p. 727.]

Dhaka University Institutional Repository

জীবন বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা থাকে।[১] এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পড়ার অভ্যাস বাড়াতে হবে এবং তাঁদেরকে পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীল করে তুলতে হবে। জীবনে যেসব বিষয়ের প্রত্যক্ষ তাৎপর্য রয়েছে যেমন-সমাজবিদ্যা, সাধারণ বিজ্ঞান, গণিত ইত্যাদির ওপর বেশি জোর দিতে হবে। সঙ্গীতের ওপরও গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। খেলাধূলা, শরীরচর্চা, বিতর্ক, ভ্রমণ, নাটক প্রভৃতি সহশিক্ষাক্রমিক (co-curricular) কর্মকাণ্ডের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের দেহ ও মনের সুষম বিকাশ ঘটবে।

৬. আত্মিক উন্নয়নে শিক্ষা

বস্তুগত বা যান্ত্রিক সভ্যতার অগ্রগতি মানব সমাজে রাজনৈতিক টানাপোড়ন, অর্থনৈতিক চাপ এবং সামাজিক সমস্যা বাড়াচ্ছে। ফলে সমাজ জীবন ক্রমেই অস্থির ও অশান্ত হয়ে উঠেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে অনেক দার্শনিক শিক্ষার মাধ্যমে আত্মিক উন্নয়ন সাধনের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। এক্ষেত্রে ভারতীয় ঋষি ও চিন্তাবিদদের ধারণার কথা বলা যায়। এঁদের মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য, কৃষ্ণ, শংকর, রামানুজ, নানক, দয়ানন্দ, অরবিন্দ, বিবেকানন্দ এবং মহাত্মা গান্ধীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এমনকি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাধাকৃষ্ণান প্রমুখ আধুনিককালের

---

[১] 'অবকাশ যাপনের লক্ষ্যকেন্দ্রিক শিক্ষা'র পরিকল্পনায় শিক্ষাবিদদের সুপারিশ হলো, "the school should undertake (i) to set up standards and develop tastes which will help to determine the choice of proper forms of recreation and pleasure, (ii) to develop habits which will continue to give enjoyment and recreations in leisure hours in mature life".(Milton Mayer, "To Know and to Do," in Arthur A. Cohen (ed.), *Humanistic Education and Western Civilization* (New York: Holt, Reinhart and Winston, 1964), p. 208.; In the Western world, there are many who take the word jihad as meaning licence for Muslims to wage war. If this were the case, then there would be an inher ent contradiction in the term Islam itself and in the whole tradition. Islam is peace, seeking neither division nor war but the return of mankind from its diverse ways of cor ruption and polytheism to the confession of One God, whose unity and divinity are exclusive, and Who has neither partners nor associates. The aim of jihad is not, as many Westerners have come to believe, war for the conversion of nonbelievers by force. The Qur'an declares: "Fight in the way of Allah against those who fight against you, but not in hostilities. Lo! Allah loveth not aggressors" (2:190). And again, "There is no compulsion in religion. The right direction is henceforth distinct from error. And he who rejecteth false deities and believeth in Allah hath grasped a firm handhold which will never break. Allah is Hearer and Knower" (2:256). It is clear that there should be no violence in religion. In giving sanction to jihad, Islam specifies its main objectives which are, briefly stated, to protect the faith, one's family, oneself, and one's country (4:75) and to protect and defend helpless and oppressed believers (8:72). "Thus, war is not renewed or perpetuated except against a tyrant who insists on acts of tyranny, compelling people to abandon their religion. Persecution, forced conversion, and the deprivation of religious freedom are more distasteful to God than the taking of life"; from 'Abd al-Rahaman 'Azzam, *The Eternal Message of Muhammed* (Toronto: The New American Library of Canada, 1964), p. 130; see also 2:190—193 and 2:216—217. For a more detailed study of jihad, see Rudolph Peters, *Jihad in Medieval and Modern Islam* (Leiden: E. J. Brill, 1977), pp. 9—79.; For a detailed study of the human being in Islam, see Annemarie Schimmel, *Deciphering the Signs of God: A Phenomenological Approach to Islam* (Albany: State University of New York Press, 1994), pp. 178—215.; It is no surprise, therefore, that Islam places great value on the centrality of th; *শিক্ষা বিজ্ঞান ও বাংলাদেশের শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১-৩২)

Dhaka University Institutional Repository

মনীষীগণও শিক্ষার এদিকটির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[১] 'বস্তু' ও 'আত্মা'র মিথস্ক্রিয়া সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণানের গবেষণা ও চিন্তাপ্রসূত সিদ্ধান্ত হল এই যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে সর্বত্র বস্তুর প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।[২] এ কারণে তিনি শিক্ষার মাধ্যমে আত্মিক শক্তিতে শিক্ষার্থীদের উজ্জীবিত করার ওপর এতই জোর দিয়েছেন যে, বস্তুগত জগত যেন কখনই মানুষ, মানবতা ও বস্তুবহিঃর্ভূত চিরায়ত বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ না করতে পারে। বস্তগত সংস্কৃতি অভাবনীয় অগ্রতির ফলে সমাজের অবস্তুগত ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্য দেখা দেয়। মানুষের জীবনও তাতে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে।[৩] বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তাতেও আত্মিক উন্নতির প্রসঙ্গটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। তিনি শিক্ষা বলতে অন্তরের বিকাশকে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে, "অশেষ জ্ঞান ও অনন্ত শক্তির আকর ব্রহ্ম প্রত্যেক নরনারীর অভ্যন্তরে সুপ্তের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন, সেই ব্রহ্মকে জাগরিত করাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য"। বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য সমাজের কোন কোন দিককে মেনে নিলেও, জড়বাদের প্রাধান্যকে সে সমাজের অন্যতম দুর্বলতা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে পাশ্চাত্যে মানুষে মানুষে সম্পর্ক নিতান্তই যান্ত্রিক, তথা আত্মিক ও উপলব্ধিবোদের অভাব খুবই তীব্র। এজন্য তিনি পাশ্চাত্যের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর আত্মিক উন্নয়নবিষয়ক লক্ষ্যের অনুপস্থিতিকে দায়ী করেছেন। ভারতবর্ষের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যেও তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাই তিনি উক্ত শিক্ষাব্যবস্থায় জাগতিক বিষয়ের সাথে আধ্যাত্মিক বিষয়কে যুক্ত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন, "আমাদের দেশের আধ্যাত্মিক ও ঐতিহ্যিক সকল প্রকার শিক্ষা আমাদের আয়ত্তাধীনে আনিতে হইবে এবং সে শিক্ষায় ভারতীয় শিক্ষার সনাতন গতি বজায় রাখিতে হইবে এবং যথাসম্ভব সনাতন প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে"।

অরবিন্দ 'জ্ঞান'কে সার্বিক বাস্তবতার অংশ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তাঁর মতে এই জ্ঞান 'আত্মিক' ও 'অশেষ'। জ্ঞান কখনই নতুন করে সৃষ্টি করা যায় না; তাকে কেবল আবিষ্কারই করা যায়। প্রত্যক্ষণের পরিবর্তে আত্মিক অনুভূতির মাধ্যমে জ্ঞানার্জন তথা শিক্ষা লাভের ওপর তিনি গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এ জন্য তিনি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে আত্মিক যোগাযোগকে শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে গণ্য করেছেন। তিনি মানব প্রকৃতিকে আধ্যাত্মিকতার মাত্রায় বিচার করার পক্ষপাতী। তাঁর মতে, মানুষ পরিপূর্ণভাবে একটি প্রাণী ও সামাজিক সত্তার কোনটিই নয়।[৪] অপর পক্ষে, কোন কোন শিক্ষাচিন্তাবিদের মতে শিক্ষায় 'আত্মা' বা 'আত্মিকতা'র প্রাধান্য

---

১. রাধাকৃষ্ণান শিক্ষার মাধ্যমে আত্মিক উন্নয়নের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, "The aim of educaiton is neither national efficiency nor world solidarity, but making the individual feel that he has within himself something deeper than intellect, call it spirit, if you like"(*শিক্ষা বিজ্ঞান ও বাংলাদেশের শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১-২১)

২. এটিকে তিনি মানুষের জন্য অশুভ হিসেবে গণ্য করেছেন। কারণ তাঁর মতে, "Man is essentially a spiritual being. It is this spiritual element of man which is responsible for all the great achievements in this world".(*শিক্ষা বিজ্ঞান ও বাংলাদেশের শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৩২)

৩. এজন্য রাধাকৃষ্ণান আত্মিক উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকার ওপর জোর দিয়ে বলেছেন, "The prime task of education, is to awaken the spiritual needs in the children in order to enable them to adopt and adjust themselves to the changing patterns of the society. Lack of spiritual qualities will not only make them ill-adjusted but will plunge the wbrlcl into chaos and disorder. Sooner the importance of spiritual education is realised, better will be for the world and its dynamic continuance". তাঁর উক্তি থেকে এটা স্পষ্ট যে, শিক্ষার এ লক্ষ্য শাব্দিক অর্থে শুধু 'আধ্যাত্মিকতা' (spiritualism) নয়, মানব জীবনের সর্বজনীন উপলব্ধি এবং পরিবর্তনশীল সমাজের সাথে আত্মিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করাই শিক্ষার মূল লক্ষ্য।(*শিক্ষা বিজ্ঞান ও বাংলাদেশের শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১-৩২)

৪. এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি মন্তব্য করেছেন, "He is the expression of Divine in the individual form. This divinity has to be manifested through, education".(।[Nabil al-Samaluti, *School Organization and Educational Modernization* (Jeddah: Saudi Arabia Dar Ashorooq Printing and

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার্থীদের জাগতিক বিষয়াদির প্রতি নিরাসক্ত করে তোলে। এর ফলে তারা নিজেদেরকে সমাজ জীবন থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে কর্মবিমুখ হয়ে পড়তে পারে। তবে এরূপ ধারণাও সর্ব অর্থে সঠিক নয়। কারণ প্রকৃত আত্মিকতাবোধই মানুষের মধ্যে আন্তরিক বন্ধন সুদৃঢ় করে সমাজ জীবনকে সুসংহত করে তোলে।[১]

৭. ব্যক্তির বিকাশে শিক্ষা

আধুনিক শিক্ষা দর্শনে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিসত্ত্বা বিকাশের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ জাগ্রত করা এবং তাকে আত্মসত্তায় আস্থাবান করে তোলাই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।[২] যে সকল শিক্ষাবিদ মানুষের ব্যক্তিসত্তার বিকাশকে শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারণ করেছেন তাঁরা শিক্ষার্থীর দৈহিক, আবেগিক এবং আত্মিক উন্নয়ন সাধনের ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তাঁদের মতে, দেহের সুষ্ঠু বিকাশ ব্যতীত সমৃদ্ধ ও পরিপূর্ণ জীবন গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। সুস্থ দেহ ছাড়া সুস্থ মন সৃষ্টি হয় না। বিকশিত মনের

Distribution, 1980), p. 9 -77; Mohamed Badawi, "*Improving the role of the masjid to serve the religious cause,"* Al-Manhal (1989) vol. 50, no. 467, p. 91; Na'im, "*The Real Teacher and the First Prophetical Schools,"* p. 447.; Sami al-Saqar, *History of Muslim Education* (Riyadh: Saudi Arabia Dar al Mareelth, 1980); Ahmed, The Development of Arab Thought; Abu al-hasan al-Nadawi, *Education and Society* (Damascus: Syria Dar al-Qalam, 1991); Mutawali, *History of Islamic Education*.; Egypt Dar al-Fikr al-Arabi, 1978), p.11-65.; Ahmed al-Ahwani, *Education in Islam* (Cairo: Egypt Dar al-Ma'arif, 1957). 5 - 70.; Naji al-Ansari, "Al-Marina: *Education from 622-1992*," Al-Manhal (1992) vol. 54, no. 499; Hasan Mahmoud and Ahmed al-Sharif, *The Islamic World in the Abbasid's Era, 4th edition* (Cairo: Egypt: Dar al-Fakr al-Arabi, 1980), p.7-80. ; *শিক্ষা বিজ্ঞান ও বাংলাদেশের শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১-৩২)]

১. সেজন্য শিক্ষায় আত্মিকতাবাদের গুরুত্ব উল্লেখ করে বলা হয়েছে, "Material progr is a good thing; social and political reforms are even more valuable, both to the race and the individual; their final worth lies in the aid they afford to spiritual life".[Hasan Mahmoud and Ahmed al-Sharif, *The Islamic World in the Abbasid's Era, 4th edition* (Cairo: Egypt: Dar al-Fakr al-Arabi, 1980), p.7-80. ; *শিক্ষা বিজ্ঞান ও বাংলাদেশের শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১-৩২)]

২. স্যার পারসি নান-এর মতে, "Individuality is the ideal of life and a scheme of education is ultimately to be valued by its success in fostering the highest degree ol individual excellence". তিনি শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে ব্যক্তির বিকাশকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, "nothing good enters into the human world except in and through the free activities of individual man and woman and that educational practice must be shaped to accord with that truth". 'ব্যক্তি নিজেই তার ভাগ্য গড়ার স্থপতি'-এবিশ্বাস থেকেই তিনি উপরের মন্তব্যটি করেছেন।(।[Nabil al-Samaluti, *School Organization and Educational Modernization* (Jeddah: Saudi Arabia Dar Ashorooq Printing and Distribution, 1980), p. 9 -77; Mohamed Badawi, "*Improving the role of the masjid to serve the religious cause,"* Al-Manhal (1989) vol. 50, no. 467, p. 91; Na'im, "*The Real Teacher and the First Prophetical Schools,"* p. 447.; Sami al-Saqar, *History of Muslim Education* (Riyadh: Saudi Arabia Dar al Mareelth, 1980); Ahmed, The Development of Arab Thought; Abu al-hasan al-Nadawi, *Education and Society* (Damascus: Syria Dar al-Qalam, 1991); Mutawali, *History of Islamic Education*.; Egypt Dar al-Fikr al-Arabi, 1978), p.11-65.; Ahmed al-Ahwani, *Education in Islam* (Cairo: Egypt Dar al-Ma'arif, 1957). 5 - 70.; Ahmed Shalabi, *History of Islamic Education*. 2nd edition (Cairn: Egypt Egyptian Anglo Libraiy, 1960), 6 -72; Atif Abadhah, "*Islamic Schools,"* Al-Manhal (1989) vol. SO, no. 467; Naji al-Ansari, "Al-Marina: *Education from 622-1992*," Al-Manhal (1992) vol. 54, no. 499; Hasan Mahmoud and Ahmed al-Sharif, *The Islamic World in the Abbasid's Era, 4th edition* (Cairo: Egypt: Dar al-Fakr al-Arabi, 1980), p.7-80. ; *শিক্ষা বিজ্ঞান ও বাংলাদেশের শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১-৩২]

Dhaka University Institutional Repository

অধিকারীরাই বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম। শুধু আবেগ অনুভূতির বিকাশ ঋণাত্মক ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করে। আর আত্মিক বিকাশ উচ্চ আদর্শ জাগ্রত করে। তাঁদের মতে আত্ম-উপলব্ধি ও আত্ম-প্রকাশ এ দুই প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধিত হয়। আত্ম-উপলব্ধির জন্য শিক্ষার কাজ হলো শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ও সম্ভাবনা বিকশিত করা, নিজেকে জানতে সাহায্য করা এবং আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলা। বস্তুত, আত্ম-উপলব্ধি তখনই অর্থবহ হয় যখন ব্যক্তি নিজেকে প্রকাশের স্বাধীনতা অর্জন করে। এজন্য তাকে অবশ্যই চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা দিতে হবে। তবে তাঁদের মতে, এ চিন্তা ও কর্ম অবশ্যই সামাজিক প্রথা ও নৈতিক বিধি-বিধানসম্মত হতে হবে। কারণ লাগামহীন স্বাধীনতা সমাজ জীবনকে ব্যাহত করতে পারে।

৮. সামাজিক দক্ষতার জন্য শিক্ষা

সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত-নিরপেক্ষ আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ এর ফলে ব্যক্তি স্বার্থপর হয়, সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার আশংকা থাকে। এজন্য অনেকের মতে সমাজের যথোপোযুক্ত সদস্য সৃষ্টি করাই শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত। বিভিন্ন ক্ষেত্রে 'সামাজিক দক্ষতা' অর্জন করার ব্যবস্থা রাখাই শিক্ষার প্রধান কাজ। সামাজিক সচেতনতা, অর্থনৈতিক সামর্থ্য, এবং সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মান বৃদ্ধির সমষ্টিই হচ্ছে সামাজিক দক্ষতা। শিক্ষার্থীরা মুক্ত মনের অধিকারী হয়ে যাতে বিরাজমান সামাজিক পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হয় সেজন্য তাদেরকে সচেতন করে তুলতে হবে। কর্মদক্ষতা তাকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে। আত্মবিশ্বাসী মানুষই সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আর সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মানের উৎকর্ষতা তাকে সমাজসেবার মনোভাবাপন্ন মার্জিত আচরণের অধিকারী মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে।

শিক্ষার্থীর সামাজিক দক্ষতা বিকাশের বিষয়টি আবার দু'ধরনের ধারণার সাথে যুক্ত। 'সমাজের উন্নতির জন্য ব্যক্তির সামাজিক দক্ষতার বিকাশ' বনাম 'ব্যক্তির আত্মবিকাশে সামাজিক দক্ষতা অর্জন' নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। সমাজের জন্য ব্যক্তির সামাজিক দক্ষতার ধারণাটি সমাজের স্বার্থে ব্যক্তি-জীবন উৎসর্গের সমার্থক। এক্ষেত্রে শিক্ষার লক্ষ্য হবে সমাজের কল্যাণে ব্যক্তিকে আত্মদানে উদ্বুদ্ধ করা। এ ধারণাটি পরিপূর্ণ রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাব্যবস্থা সমর্থন করে।[১] উল্লেখ্য, 'ব্যক্তির বিকাশে সামাজিক দক্ষতা অর্জন'কে শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে

---

১. এ প্রসঙ্গে শিক্ষা বিজ্ঞানী কে.এম.এস. রস-এর নিম্লোক্ত মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য "Society has absolute control over the lives and destinies of its individual members. It moulds men to a pattern which makes for its own preservation and enhancement. It sees education as the most powerful means of achieving this end, and devices and enforces a rigid system of state education. It is supreme to dictate what shall be taught and how it shall be taught. In curriculum and method the watch-words are always discipline, organisation, a willing acceptance of authority, a damping down of. উক্তিটির মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, সমাজের চাহিদার আলোকেই শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারিত হওয়া উচিত। (;*শিক্ষা বিজ্ঞান ও বাংলাদেশের শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১-৩২।[Nabil al-Samaluti, *School Organization and Educational Modernization* (Jeddah: Saudi Arabia Dar Ashorooq Printing and Distribution, 1980), p. 9 -77; Mohamed Badawi, "*Improving the role of the masjid to serve the religious cause,"* Al-Manhal (1989) vol. 50, no. 467, p. 91; Na'im, "*The Real Teacher and the First Prophetical Schools,"* p. 447.; Sami al-Saqar, *History of Muslim Education* (Riyadh: Saudi Arabia Dar al Mareelth, 1980); Ahmed, The Development of Arab Thought; Abu al-hasan al-Nadawi, *Education and Society* (Damascus: Syria Dar al-Qalam, 1991); Mutawali, *History of Islamic Education*.; Egypt Dar al-Fikr al-Arabi, 1978), p.11-65.; Ahmed al-Ahwani, *Education in Islam* (Cairo: Egypt Dar al-Ma'arif, 1957). 5 - 70.; Syed Sajjad Husain and Syed All Ashraf, Crisis in Muslim Education (Kent: Hodder & Stoughton, 1979), p. ix. ; Kenneth Cragg and R. Marston Speight, The House of Islam (Belmont: Wadsworth

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিককালের অধিকাংশ শিক্ষাচিন্তাবিদ সমর্থন করেন। সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বকীয়তা অর্জন এবং বৈশিষ্ট্য ভূমিকা পালনের জন্য প্রস্তুত করাই হচ্ছে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র বা সমাজের সেবা ব্যক্তির উদ্দেশ্য হলেও তার ইচ্ছা ও পছন্দের স্বাধীনতাকে মূল্য দেওয়া হয়। এটি আসলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার শিক্ষাদর্শন। কারণ নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধে উদ্দীপ্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন সমাজের সদস্য সৃষ্টি করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা-সমাজ দার্শনিক জন ডিউই এ ধারার দক্ষতা বিকাশের ওপর জোর দিয়েছেন।

৯. বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টির জন্য শিক্ষা

একুশ শতকে তথ্য প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতির ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জাতির মানুষের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ ব্যবস্থা সুগম হয়েছে। তাই পৃথিবীকে এখন 'বিশ্বগ্রাম' (global village) হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। বিশ্বায়নের যুগে শিক্ষার লক্ষ্যকে শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে সুনাগরিক সৃষ্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সমীচীন নয়। বিভিন্ন দেশ ও সমাজের মানুষের মধ্যে সহমর্মিতা ও সমঝোতার মনোভাব জাগ্রত করার মাধ্যমে দ্বন্দ্ব-সংঘাত যথাসম্ভব হ্রাস করে বিশ্বে অধিকতর শান্তিময় পরিবেশ সৃষ্টিই এখন শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া অধিকতর যুক্তিযুক্ত। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে কতকগুলো বিশেষ দিক জানতে ও উপলব্ধি করাতে শিক্ষা ভূমিকা পালন করে। এগুলো হচ্ছে (১) নিজের দেশের মানুষের জীবন ধারা; (২) বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশে মানবতার সর্বজনীনতা; (৩) নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা বিঘ্নিত না করার বিশ্বপরিবেশ; (৪) বিশ্বজনীন বিষয়াদির প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি; (৫) বিশ্বের সমস্যাদি অনুধাবন ও নিরসনে যথাযথ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন; (৬) বিশ্বনাগরিকতাবোধ এবং সর্বজনীন মানবসংস্কৃতির প্রতি বিশ্বস্ত থাকা; (৭) বিশ্ব সমস্যার প্রতি সচেতন থেকে নিজের দেশের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করা; (৮) পরস্পর নির্ভরশীল বিশ্বজাতি গঠনে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানের গুরুত্ব উপলব্ধি করা; (৯) ব্যক্তির সম অধিকার ও সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে তাকে সমাজের জন্য সমৃদ্ধ করে তোলা; (১০) বিশ্বকে সামাজিক একক হিসেবে গণ্য করা; (১১) সর্বজনীন সত্যের প্রতি একনিষ্ঠ ও আস্থাবান থাকা; (১২) বিশ্ব সমাজের অভিন্ন মূল্যবোধ ও লক্ষ্যের প্রতি আগ্রহ রাখা; (১৩) যুদ্ধ জয়ের চেয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার ওপর অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া; এবং (১৪) আন্তর্জাতিক কল্যাণে সংকীর্ণ জাতিগত স্বার্থ ত্যাগ করা। বর্তমান বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে আন্তর্জাতিকতাবোধ গুরুত্ব পেলেও এর বিরোধী মনোভাবও বিদ্যমান। কারণ এ প্রক্রিয়ায় পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলো বিশেষ সুবিধা লাভ করায় দরিদ্র দেশসমূহের অবস্থার কাঙ্খিত উন্নতি হচ্ছে না। তদুপরি, এর ফলে দুর্বল সমাজ ও জাতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে।

'শিক্ষা' অনুশীলনে (study of 'Education') শিক্ষার এ লক্ষ্যগুলো বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। তবে কোন্ লক্ষ্যটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সে সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। কোন একটি বিশেষ লক্ষ্যকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠাও সমীচীন নয়। আসলে কোন দেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় এ সকল লক্ষ্যের সমন্বিত রূপ যত বেশি প্রতিফলিত এবং বাস্তবায়িত হবে ততই তা ব্যক্তি ও সমাজের জন্য অধিকতর কল্যাণ বয়ে আনবে।[১] শিক্ষাবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার লক্ষ্যসমূহ ভালভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

Publishing Company, 1988), p. 125. ; For a detailed study of the human being in Islam, see Annemarie Schimmel, Deciphering the Signs of God: A Phenomenological Approach to Islam (Albany: State University of New York Press, 1994), pp. 178—215.

১. 'এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী হ্যাক্সলির (Huxley) নিচের মন্তব্যটি অনুধাবনযোগ্য: "That man has had a liberal education who has been so trained that his body is the ready servant of his will and does with ease and pleasure all the work that it is capable of; whose intellect is clear; whose mind is stored with the knowledge of the great and fundamental truths of nature and of the laws of

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার্থীদেরকে এই বিশ্বজগতের সর্বশক্তিমান স্রষ্টা, প্রতিপালক, পরিচালক, মালিক, মনিব, শাসক, মা'বুদ, সার্বভৌম ও সর্বময় কর্তৃত্বশীল মহান আল্লাহ্র প্রতি ঈমানদার, আস্থাশীল, অনুগত ও বিনীত করে তোলা ও নৈতিকতা সম্পন্ন যোগ্য এবং শিক্ষিত নাগরিক তৈরীর মাধ্যমে আধুনিক-উন্নত মানব সম্পদ গড়ে তোলাই ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের উদ্দেশ্য। আর এজন্যই রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীগণের মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে ইসলামী শিক্ষা-দর্শন বিস্তার ও বিকাশে ব্যাপক প্রশিক্ষণ মূলক উদ্যোগ গ্রহণ করেন।[১] জনগোষ্ঠীকে রিসালতে বিশ্বাসী করে তোলা তাদের মাঝে মুহাম্মদ (সা) কে সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসেবে স্বীকৃতি দান ও তাঁকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার মানসিকতা সৃষ্টি করা।

জনগোষ্ঠীকে পারলৌকিক জীবনের প্রতি বিশ্বাসী করে তোলা, তাদের মধ্যে পরকালের সাফল্য-ব্যর্থতাকেই প্রকৃত সাফল্য ও ব্যর্থতা হিসেবে গ্রহণ করার স্বচ্ছ জ্ঞান ও ধারণা সৃষ্টি করা এবং তাদের মধ্যে পরকালের মুক্তির আকাঙ্খা ও উদ্বেগ সৃষ্টি করা। আল্লাহ্ প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে মুসলমানদের দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক বিকাশে জোরদার করা। প্রতিনিধি হিসেবে মুসলমানদেরকে দায়িত্বশীল হওয়ার প্রেরণা ও যোগ্যতা সৃষ্টি করা। ইরশাদ হচ্ছে :

وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

"আল্লাহ্, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা দুনিয়া ও আখেরাতে; শাসন কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব কেবলমাত্র তারই এবং তোমরা তারই কাছে ফিরে যাবে।"[২]

মুসলমানদের মধ্যে তীব্র বিবেকবোধ ও বলিষ্ঠ নৈতিক চেতনা জাগ্রত করা। মুসলমানদের মধ্যে আত্মচেতনা, আত্মোপলব্ধি, আত্মসম্মানবোধ ও আত্মপর্যালোচনার ভাবধারা সৃষ্টি করা। সময় ও সমাজ চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষ, জীবন ও কর্মমুখী, সৎ, চরিত্রবান, ন্যায়পরায়ণ, বিশ্বস্ত, উদ্যমী ও সাহসী মানুষ সৃষ্টি করা। শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবতাবোধ সৃষ্টি করা ও তাদেরকে মানবতার কল্যাণে উদ্বুদ্ধ করা। জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করা। যুগোপযোগী দক্ষ ও যোগ্য গবেষক, আবিষ্কারক, চিন্তাবিদ, লেখক, বিচারক, শিক্ষক, সৈনিক, সমাজকর্মী, প্রশাসক, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, চিকিৎসক, প্রকৌশলীসহ সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার

---

her operations and one who, is full of life and fire, whose passions are trained to come to heels by vigorous will; who has learnt to love all beauty, to hate all violence and to respect others as himself. Such a person is as complete as a man can be". [Nabil al-Samaluti, *School Organization and Educational Modernization* (Jeddah: Saudi Arabia Dar Ashorooq Printing and Distribution, 1980), p. 9 -77; Mohamed Badawi, "*Improving the role of the masjid to serve the religious cause,"* Al-Manhal (1989) vol. 50, no. 467, p. 91; Na'im, "*The Real Teacher and the First Prophetical Schools,"* p. 447.; Sami al-Saqar, *History of Muslim Education* (Riyadh: Saudi Arabia Dar al Mareelth, 1980); Ahmed, The Development of Arab Thought; Abu al-hasan al-Nadawi, *Education and Society* (Damascus: Syria Dar al-Qalam, 1991); Mutawali, *History of Islamic Education*.; Egypt Dar al-Fikr al-Arabi, 1978), p.11-65.; Ahmed al-Ahwani, *Education in Islam* (Cairo: Egypt Dar al-Ma'arif, 1957). 5 - 70.; Naji al-Ansari, "Al-Marina: *Education from 622—1992*," Al-Manhal (1992) vol. 54, no. 499; Hasan Mahmoud and Ahmed al-Sharif, *The Islamic World in the Abbasid's Era, 4th edition* (Cairo: Egypt: Dar al-Fakr al-Arabi, 1980), p.7-80. ; *শিক্ষা বিজ্ঞান ও বাংলাদেশের শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১-৩২]

[১] ঐতিহাসিকদের ভাষায় " Before hijra prophet (sm.) sent ummi Maktum and Mas`ab Ibn umayir to teach the new muslims of Yasthrib(later on madina) the holy Qur`an and train them in Islamic Instructions and prohibitions" (ড. আব্দুল ওয়াহিদ, *বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি*, প্রাগুক্ত পৃ. ৪০)।

[২] আল-কুর'আন, ২৮ : ৭০।

Dhaka University Institutional Repository

উপযুক্ত লোক তৈরী করা। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীর মেধা বিকাশের পূর্ণ সুযোগ নিশ্চিত করা। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকশিত করা। তাদের মধ্যে ইজতিহাদী যোগ্যতা সৃষ্টি করা। সৎ চরিত্রবান, নীতিবান, ধার্মিক ও বিবেকবোধ সম্পন্ন নাগরিক তৈরী করা। উৎপাদন ও কর্মমুখী দক্ষ জনশক্তি তৈরী করা। আল্লাহ্ প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে জীবন, জগত ও পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে এসবের সমন্বয় সাধনের যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে জীবনের চূড়ান্ত সাফল্য অর্জনে প্রয়াস চালানো এবং নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে জানা, তা সংরক্ষণ ও বিকাশের যোগ্যতা ও প্রেরণা লাভ করাই হবে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য।

শিক্ষার প্রকারভেদ

পৃথিবীতে যত রকম শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ার দিক থেকে শিক্ষার প্রধান তিনটি ধরন বা প্রকার রয়েছে। এগুলো হচ্ছে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা। নিচে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা (Informal Education)

যে শিক্ষা নিয়ম কানুন বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ নয় এমন শিক্ষা ব্যবস্থাকে অনানুষ্ঠনিক শিক্ষা (Informal Education) বলা হয়। অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে বিধি বা শৃংখল বহির্ভূত শিক্ষাও বলা হয়। তবে মানুষের জীবনে শিক্ষার সূত্রপাত হয় অনানুষ্ঠানিক ধারাতেই এবং এই প্রক্রিয়া আমৃত্যু অব্যাহত থাকে। এ জন্য এ শিক্ষাকে জীবনব্যাপী শিক্ষা ব্যবস্থা বলা হয়। ইসলামে দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞানের সন্ধানে ফিরতে বলা হয়েছে। এটা প্রকৃত অর্থে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে বোঝানো হয়েছে। শিক্ষাবিদগণ অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা প্রদানের চেষ্টা করেছেন।[১] অধ্যাপক আবু হামিদ লতিফ বলেছেন "জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে জীবনব্যাপি দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে মানুষ শুনে, দেখে অনুকরণ করে এবং ঠেকে যা শিখে তাই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা"। মানব জীবনের যতটুকু অর্জন তার বেশির ভাগ অংশই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত হয়। অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার নির্দিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠান নেই। এ শিক্ষার পাঠশালা হচ্ছে পরিবার, সমাজ, প্রকৃতি, লোকাচার, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, ধর্মীয় ও সামাজিক বিশ্বাস ইত্যাদি। অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার বাহন হিসেবে চিহ্নিত করা যায় মা, বাবা, ভাইবোন, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, পত্র-পত্রিকা, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, খেলাধূলা, গণমাধ্যম ইত্যাদি। অন্যদিকে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জনে কৌশল হিসেবে আমরা চিহ্নিত করতে পারি-দেখা, শোনা, অনুকরণ ও

---

১. অধ্যাপক ছিদ্দিকুর রহমান অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে অভিহিত করেছেন, "The process by which an individual imbibes attitudes, cultivates values, develops skills and acquires knowledge without there being any organization or system about it". চন্দ্র ও শর্মার মতে "Informal education is a gradual process, for people learn a few things after years of experience". (।[Nabil al-Samaluti, *School Organization and Educational Modernization* (Jeddah: Saudi Arabia Dar Ashorooq Printing and Distribution, 1980), p. 9 -77; Mohamed Badawi, "*Improving the role of the masjid to serve the religious cause,"* Al-Manhal (1989) vol. 50, no. 467, p. 91; Na'im, "*The Real Teacher and the First Prophetical Schools,"* p. 447.; Sami al-Saqar, *History of Muslim Education* (Riyadh: Saudi Arabia Dar al Mareelth, 1980); Ahmed, The Development of Arab Thought; Abu al-hasan al-Nadawi, *Education and Society* (Damascus: Syria Dar al-Qalam, 1991); Mutawali, *History of Islamic Education*.; Egypt Dar al-Fikr al-Arabi, 1978), p.11-65.; Ahmed al-Ahwani, *Education in Islam* (Cairo: Egypt Dar al-Ma'arif, 1957). 5 - 70. ; Ahmed Shalabi, *History of Islamic Education*. 2nd edition (Cairn: Egypt Egyptian Anglo Libraiy, 1960), 6 -72; Atif Abadhah, "*Islamic Schools,"* Al-Manhal (1989) vol. SO, no. 467; Naji al-Ansari, "Al-Marina: *Education from 622—1992*," Al-Manhal (1992) vol. 54, no. 499; Hasan Mahmoud and Ahmed al-Sharif, *The Islamic World in the Abbasid's Era, 4th edition* (Cairo: Egypt: Dar al-Fakr al-Arabi, 1980), p.7-80. ; *শিক্ষা বিজ্ঞান ও বাংলাদেশের শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১-৩২।]

Dhaka University Institutional Repository

অভিজ্ঞতাকে। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বলতে যা বোঝায় তারও অর্জন এবং বিকাশ ঘটে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা (Formal Education)

অনানুষ্ঠনিক শিক্ষার বিপরীত বৈশিষ্ট্যমন্ডিত শিক্ষা ধারাটি হচ্ছে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা। সুনির্দিষ্ট কাঠামোগত ব্যবস্থা ও নিয়মনীতি এ শিক্ষা ধারার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য।[১] শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যে শিক্ষার ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায় মক্তব, 'স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ধারাবাহিক এবং ক্রম উচ্চ স্তরে বিন্যস্ত শিক্ষাব্যবস্থাকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বলে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো থাকে। শিক্ষার্থী একটি নির্দিষ্ট বয়সে আনুষ্ঠানিক উপায়ে শিক্ষা অর্জন শুরু করে এবং ধারাবাহিকভাবে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে থাকে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এগুলো হচ্ছে-

ক) আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শ্রেণীভিত্তিক;
খ) আনুষ্ঠানিক শিক্ষা স্তরভিত্তিক;
গ) এ শিক্ষা পূর্ণকালীন;
ঘ) এটি সংগঠিত এবং সুনিয়ন্ত্রিত শিক্ষাব্যবস্থা;
ঙ) এটি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা;
চ) সুনির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম ও পূর্ব নির্ধারিত পাঠ্যবিষয় ভিত্তিক;
ছ) এ শিক্ষা সার্টিফিকেটমুখীন;
জ) আইন কানুন, রীতিনীতি ও বিধি নিষেধ দ্বারা এ শিক্ষাব্যবস্থা শৃঙ্খলিত;
ঝ) শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অপরিহার্য;
ঞ) এ শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান উপাদান হচ্ছে শিক্ষক;
ট) শিক্ষা কাঠামো অনমনীয়;
ঠ) শিক্ষা কর্মসূচি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত;
ড) আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রধানত শিক্ষককেন্দ্রিক, অর্থাৎ শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত, শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা সীমিত; এবং

---

[১] এ পরিপ্রেক্ষিতে আইভান ইলিচ মন্তব্য করেছেন, "Formal education means the education gained m structured school setting school's defined as the age specific, teacher related process requiring full time attendence at an obligatory curriculum.". কোমস ও আহমদের মতে, "Formal education refers to the highly institutionalized, choronologically graded and inerarchically structured education system spanning lower primary school and the upper reaches of the university". আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বলতে চন্দ্র ও শর্মা উল্লেখ করেছেন, "The formal comprehands education as it is provided in educational institutions according to a particular pattern". (*শিক্ষা বিজ্ঞান ও বাংলাদেশের শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১-৩২; [Ahmed, The Development of Arab Thought; Abu al-hasan al-Nadawi, *Education and Society* (Damascus: Syria Dar al-Qalam, 1991); Mutawali, *History of Islamic Education*.; Egypt Dar al-Fikr al-Arabi, 1978), p.11-65.; Ahmed al-Ahwani, *Education in Islam* (Cairo: Egypt Dar al-Ma'arif, 1957). 5 - 70.; Ahmed Shalabi, *History of Islamic Education*. 2nd edition (Cairn: Egypt Egyptian Anglo Libraiy, 1960), 6 -72; Atif Abadhah, "*Islamic Schools,*" Al-Manhal (1989) vol. SO, no. 467; Naji al-Ansari, "Al-Marina: *Education from 622—1992*," Al-Manhal (1992) vol. 54, no. 499; Hasan Mahmoud and Ahmed al-Sharif, *The Islamic World in the Abbasid's Era, 4th edition* (Cairo: Egypt: Dar al-Fakr al-Arabi, 1980), p.7-80.]

Dhaka University Institutional Repository

ঢ) অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ শিক্ষা সাধারণধর্মী।

মানব সমাজে জ্ঞান সংরক্ষণ, বিতরণ ও উৎকর্ষ সাধনের জন্য এবং অর্থনৈতিক সামাজিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিশেষ ও পারদর্শী লোক সরবরাহ করার জন্য মানব সমাজ কর্তৃক উদ্ভাবিত শিক্ষা অর্জনের সর্বশেষ শিক্ষার ধারা হচ্ছে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা (Non Formal Education)

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা হচ্ছে এমন নমনীয় শিক্ষাব্যবস্থা যা কোন বিশেষ শিক্ষার্থীদলের প্রয়োজন ও চাহিদা মেটানোর জন্য গড়ে ওঠা। অন্যভাবে বলা যায়, আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অনমনীয় বাধ্যবাধকতা ও নিয়মনীতির বাইরে নির্দিষ্ট একদল শিক্ষার্থীর জন্য বিশেষ উদ্দেশ্যে সংগঠিত শিক্ষামূলক কার্যক্রমই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা। বিশ শতকের শেষের দিক থেকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ধারার গুরুত্ব একাডেমিক অঙ্গনে প্রসার লাভ করে। তখন থেকে শিক্ষাবিজ্ঞানীগণ এ শিক্ষা ধারার ধারণা গঠনে তৎপর হন।[১] অধ্যাপক আবু হামিদ লতিফের মতে, "আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত নির্দিষ্ট শিক্ষার্থী দলের জন্য বিশেষ উদ্দেশ্যে সংগঠিত শিক্ষামূলক কার্যক্রমই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা।"[২] শিক্ষা লাভের নির্দিষ্ট বয়সে যারা বিভিন্ন কারণে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত হতে পারেনি বা যুক্ত হয়েও বিভিন্ন সমস্যার জন্য স্কুল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে তাদের জন্যই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাধারা উদ্ভূত। মূলতঃ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সম্পূরক ও পরিপূরক শিক্ষাধারা হিসেবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার বিকাশ ঘটে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার কতকগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যায়। এগুলো হচ্ছে-

ক) এ শিক্ষাব্যবস্থা উদ্দেশ্য, সময়, শিক্ষাক্রম ও ব্যবস্থাপনার দিক থেকে নমনীয়;
খ) এ শিক্ষা প্রধানত : ব্যবহারিক, কর্মভিত্তিক, চাহিদাভিত্তিক ও প্রায়োগিক;
গ) এ শিক্ষা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মত সার্টিফিকেটমুখী নয়;
ঘ) এ শিক্ষা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মত দীর্ঘমেয়াদী নয়, স্বল্প মেয়াদী; এবং
ঙ) এ শিক্ষা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মত পূর্ণকালীন নয়, খন্দকালীন।

---

১. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোঝাতে ১৯৭৪ সালে কোমস ও আহমেদ বলেছেন, "Any organized, systematic educational activity carried on outside the framework of the formal system to provide selected types of learning to particular sub-groups in the population, adults as well as children" অধ্যাপক ছিদ্দিকুর রহমান মন্তব্য করেছেন "Non-formal education denotes any deliberately organized systematic educational activity outside the graded age specific and certificate oriented, time-bounded formal system".[Mutawali, *History of Islamic Education*. (Egypt Dar al-Fikr al-Arabi, 1978), p.11-65.; Ahmed al-Ahwani, *Education in Islam* (Cairo: Egypt Dar al-Ma'arif, 1957). 5 - 70.; Ahmed Shalabi, *History of Islamic Education*. 2nd edition (Cairn: Egypt Egyptian Anglo Libraiy, 1960), 6-72; Atif Abadhah, "*Islamic Schools,"* Al-Manhal (1989) vol. SO, no. 467; Naji al-Ansari, "Al-Marina: *Education from 622—1992*," Al-Manhal (1992) vol. 54, no. 499; Hasan Mahmoud and Ahmed al-Sharif, *The Islamic World in the Abbasid's Era, 4th edition* (Cairo: Egypt: Dar al-Fakr al-Arabi, 1980), p.7-80.; *শিক্ষা বিজ্ঞান ও বাংলাদেশের শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১-৩২]

২. *শিক্ষা বিজ্ঞান ও বাংলাদেশের শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১-৩২।

Dhaka University Institutional Repository

wØZxq Aa¨vq

Bmjvgx wkÿv-`k‡bi ¸iæZ, bvixi Ae¯vb I Zvi ev¯evqb, AvawbK bvixev` I Bmjvg

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের গুরুত্ব, নারীর অবস্থান ও তার বাস্তবায়ন, আধুনিক নারীবাদ ও ইসলাম

ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের গুরুত্ব: ইসলামী শিক্ষা-দর্শন আল্লাহ্ প্রদত্ত ও রাসূল (সা) প্রদর্শিত। তা মানুষের মধ্যে উচ্চস্তরের নৈতিক ও মানসিক গুণাবলী সঞ্চার করে। এর প্রধান দর্শন হলো মানুষের মধ্যে পবিত্র গুণাবলীর সৃষ্টি করা, যা মানুষকে দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী করে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত গুণাবলী প্রদর্শনক্ষম করে তোলে। তাওহীদ বা আল্লাহ্র একত্ববাদের মূল কথা হলো-মানুষের মাঝে ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্য গুণ সৃষ্টি করা। আর সেই সঙ্গে মানুষের মধ্যে স্বাধীনতা, স্বাধিকারের চেতনা জাগ্রত করে মানুষকে শ্রেণী, বর্ণ, জাতি, গোত্র ও গোষ্ঠী সম্পর্কীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে তুলে ধরে বিশ্বজনীন জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সহায়তা করা। এছাড়া ইসলামের মৌল আদর্শসমূহ প্রতিপালনের মধ্যে সামাজিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক কারণও নিহিত রয়েছে। এ জন্য মুসলিম মনীষী শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ (র) নামাযকে বহুবিধ যৌগিক বলবর্ধক ঔষধ বলে বিবেচনা করেছেন। নামাযের মত ইসলামের অন্যান্য মৌলিক আদর্শের মধ্যে মানুষের সার্বিক গুণাবলীকে উজ্জীবিত করে তোলার মতো শক্তি রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ইসলামী শিক্ষা-দর্শনে কুর'আন অধ্যয়ন মানুষের ভাবাবেগকে বিশুদ্ধকরণ ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন ছাড়াও তার বুদ্ধিবৃত্তি গঠন সহ অন্যান্য গুণাবলীর উৎকষ সাধনে সহায়তা করে। অবশ্য কুর'আনে চিন্তা-গবেষণার বিষয়ে সুচিন্তিত অভিমতের উপর গুরুত্বারোপ করে অহমিকাহীন বিনয়ভাব সহকারে আল্লাহ্র সৃষ্টি সম্বন্ধে উৎসুক মনোভাব নিয়ে প্রকৃতি সম্বন্ধে গবেষণা করেতেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইসলামী শিক্ষা-দর্শন যে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ, মৌলিকতা ও সৃজনশীলতার ক্ষমতা দান করে তা-ই নয়, বরং আধ্যাত্মিক বিকাশ এবং আল্লাহ্র সঙ্গে তার সম্পর্কের উন্নয়নও ঘটায়।

ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের কিছু মৌলিক দর্শন রয়েছে। ইসলাম একমাত্র পরিপূর্ণ জীবনবিধান। জীবনের প্রত্যেক দিকের পথ-নির্দেশই এ জীবনবিধানে রয়েছে। মানুষের অন্তর্নিহিত সর্ববিধ ও সুসমন্বিত সার্বিক বিকাশ সাধন দ্বারা ইহকালীন সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি এবং পরকালীন মুক্তির পথ উন্মুক্ত করাই ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের মূল দর্শন। এ জন্যই মুহাম্মদ (সা) নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার উপর এ শিক্ষা ফরয করেছেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন : "জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয বা অপরিহার্য"[১] তাই সর্বজনীন শিক্ষার মাধ্যমে মনুষত্ব্যের বিকাশ সাধন করতে হবে। কারণ, মনুষত্ব্যের যথার্থ বিকাশই সমাজ-সংস্কৃতির উৎকর্ষ লাভের প্রথম সোপান। মানুষের সীমিত পার্থিব জীবনকে অনন্ত জীবনের সেতুবন্ধন হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ, পবিত্র কুর'আন মজীদের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দৈহিক ও আত্মিক উন্নতি, বিশ্বপ্রকৃতির প্রতিটি বস্তুকে মানবকল্যাণে প্রয়োগ করে নিজের বিকাশ সাধন ও অন্যকে বিকাশে অনুপ্রেরণা দানই ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের মূল মন্ত্র। ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের ক্ষেত্রে শর'ঈ নির্দেশনা নিম্নরূপ-

---

[১] আবূ আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াজীদ ইব্‌ন মাযাহ, *সুনানু ইব্‌ন মাযাহ*, ১ম খ., কিতাবুল ইল্‌ম (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা. বি.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১।

Dhaka University Institutional Repository

কুর'আন-সুন্নাহ্ই সকল জ্ঞানের আধার ও কল্যাণের উৎস। তাই কুর'আন-সুন্নাহ্র জ্ঞান লাভে সক্ষম করে তোলা ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের অন্যতম উদ্দেশ্য। রাসূল (সা) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে, তার চিন্তা ভাবনার জন্য আল্লাহ্-ই যথেষ্ট। আর আল্লাহ্ তাকে এরূপ স্থান থেকে রিযিক দান করবেন যা সে ধারণাও করতে পারবে না।"[১] ইসলাম আল্লাহ্ পাকের মনোনীত দ্বীন তথা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা।
আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

"ইসলামই আল্লাহ্ মনোনীত একমাত্র দ্বীন।"[২]

ইসলাম মানুষকে সত্যের সন্ধান দেয়, মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলাকে চিনতে সহায়তা করে, সঠিক ও সাফল্যের পথে চলতে সাহায্য করে। নিজেকে দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য যা যা দরকার তার সবকিছুর ব্যবস্থাই ইসলামে বিদ্যমান। একজন মুসলিমকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার আলোকেই জীবন-যাপন করতে হয়। ইসলামী শিক্ষা-দর্শনে আছে সুষ্ঠু সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থ ব্যবস্থা। এতে রয়েছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা। সুন্দর, সুষ্ঠু ও আদর্শ সমাজ গঠনের যাবতীয় উপাদান এতে বিদ্যমান। অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইসলামে অর্থ উপার্জন, ব্যয়, ভোগ ও বণ্টনের এমন সব ব্যবস্থা আছে, যা সমাজের সকল মানুষকে কল্যাণ দান করে। কিছু সংখ্যক লোকের কল্যাণ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নয়। ইসলামের রাজনৈতিক নীতিমালায় আছে এমন সব লক্ষ্য-উদ্দেশ্য যাতে দুনিয়ায় শান্তি, ন্যায়-বিচার ও সুখের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আইন ও বিচারের ক্ষেত্রে ইসলাম ন্যায় বিচার ও সকলের অধিকার প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা দেয়। মোট কথা- মানব জীবন ও চরিত্রের উৎকর্ষসাধন, সুবিচার ও ন্যায়-নীতি ভিত্তিক শান্তি শৃঙ্খলাপূর্ণ প্রগতিশীল সমাজ গঠন ও সংরক্ষণে ইসলামের বিকল্প নেই।
মহান আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করার মত ভয় কর এবং পুরোপুরি মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।"[৩]

একজন খাঁটি মুসলিম হিসেবে জীবন-যাপন করতে হলে ইসলামের শিক্ষা অনুসরণ করে বিশ্বভ্রাতৃত্ব, ঐক্য, সাম্য, উদার মানবতা বোধ, পরমত সহিষ্ণুতা, ইসলামী সংস্কৃতি[৪] ও ন্যায় নীতির ভিত্তিতে মানুষকে চলতে হয়।

---

১. ইমাম আবূ হানীফা, *মুসনাদ*, ১ম খ., অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল হক (ঢাকা: শান্তিধারা প্রকাশনী, ১৯৯১ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৫৫।

২. আল্ কুর'আন, ৩ : ১৯।

৩. আল্ কুর'আন, ৩ : ১০২।

৪. শান্তি সুন্দর ও মানবতাবাদী আদর্শ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের রয়েছে স্বতন্ত্র সংস্কৃতি। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামের মূল বিশ্বাসের আলোকে যত নিয়ম-নীতি, বিধি-নিষেধ পালন করতে হয়, তা সবই ইসলামী সংস্কৃতি। আরও স্পষ্ট করে বলা যায় ইসলামী জীবন দর্শন ও জীবন বিধান অনুশীলনের ফলে মানুষের ব্যবহারিক জীবন ও পরিবেশে যে সংস্কৃতি ফলিত হয়, তাই ইসলামী সংস্কৃতি, [মো: মাসুদ আলম, ইসলামী সংস্কৃতির রুপ রেখা: একটি পর্যালোচনা, *ইসলামিক স্টাডিজ গবেষণা পত্রিকা*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২য় সংখ্যা, ২য় বর্ষ, ২০০৭-২০০৮, পৃ.১৮৩। ভিত্তিগতভাবে ইসলামী সংস্কৃতি আল্লাহ্, জগৎ, জীবনও মানুষ সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধিকেই বুঝায়। প্রফেসর ড. আহমদ মুহাম্মদ জামাল, *মুহাদারাতুন ফীছ ছাকাফাতিল-ইসলামিয়্যাহ*

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী চলতে হলে, ইসলাম বিষয়ক জ্ঞানার্জন এবং ইসলাম শিক্ষা বিষয় অধ্যয়ন করা প্রত্যেক মুসলমানের একান্ত আবশ্যক। সর্বপ্রথম নবী হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত মানুষের হিদায়েতের জন্য যত নবী-রাসূল এসেছেন, তাঁরা সবাই ইসলামের সুন্দর ও শাশ্বত শিক্ষা প্রচার করেছেন। ইসলামের মৌলিক ও প্রাথমিক বিষয়গুলো জানা এবং সে অনুযায়ী চলা ফরযে আইন। বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করা ফরযে কিফায়া। ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিম্নে বিশ্লেষণ করা হল :

আকীদা, বিশ্বাস এবং ইবাদত করতে ন্যুনতম যতটুকু জ্ঞান প্রয়োজন ততটুকু অর্জন করা, ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের মৌলিক ও প্রাথমিক বিষয়গুলো জানা ফরযে আইন। আর এর মৌলিক ও প্রাথমিক বিষয়গুলো জানার পর, আনুষঙ্গিক বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করা এবং বিশেষজ্ঞ হওয়া ফরযে কিফায়া। যেমন চিকিৎসা, কৃষি প্রভৃতি বিষয়ের ওপর জ্ঞানার্জন করা ফরযে কিফায়া। অর্থাৎ সমাজের কিছু সংখ্যক লোকের ওপর ফরয।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ

'তোমাদের সমাজ থেকে এক একটি দল কেন বেরিয়ে আসে না, এই উদ্দেশ্যে যে, তারা দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করবে এবং প্রত্যাবর্তন করে নিজেদের লোকদের সেই জ্ঞান দ্বারা সতর্ক করে তোলবে।'[১]

ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস বা আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয় লাভ করা। আল্লাহ্কে চিনতে হলে এবং সঠিকভাবে তাঁর প্রতি বিশ্বাস করতে হলে আল্লাহ্র যাত ও সিফাত অর্থাৎ আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলী সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা একান্ত আবশ্যক। আত্মপরিচয় ও সৃষ্টি জগতকে পর্যালোচনার মাধ্যমে আল্লাহ্কে জানা যায়। আর এই জানার মাধ্যমেই প্রত্যয় জন্মে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

"আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাকে ভয় করে।"[২]

আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর প্রতি প্রথম ওহীতেই জ্ঞানার্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। এ নির্দেশনা সূরা আলাকের প্রথম ৫টি আয়াতেই উল্লেখ করা হয়েছে। এর মাধ্যমেই জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারি। আল্লাহ্ পাক নির্ধারিত দ্বীনের প্রচার, প্রতিষ্ঠা, সমুন্নত ও অক্ষুণ্ন রাখার জন্য ইসলামী শিক্ষা-দর্শন অপরিহার্য। ইসলামী শিক্ষা-দর্শন ছাড়া দ্বীনের প্রচার, প্রতিষ্ঠা ও উজ্জীবন সম্ভব নয়। পূর্বে নবীর পরে অন্য নবী আসতেন, সুতরাং দ্বীন প্রচারে উম্মতের তেমন দায়িত্ব ছিল না, কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা) সর্বশেষ নবী। তারপরে কোন নবী আসবেন না। সুতরাং দ্বীন প্রচার, প্রতিষ্ঠা ও উজ্জীবনের দায়িত্ব তাঁর উম্মতের। আর এই দায়িত্ব পালন করার জন্য ইসলামী শিক্ষা-দর্শন একান্ত প্রয়োজন। হাদীসে আছে, "জ্ঞানীরাই হচ্ছেন নবীগণের উত্তরাধিকারী। তবে নবীগণ

(জেদ্দাঃ জামি'তুল মালিক আব্দুল আজিজ, তা.বি.), পৃ. ১৪; Islamic culture is an interpretation of the will of God as conveyed to humanity through the agency of the prophets starting with Adam (a.s) and culmination in Mohammad (sm). Dr. Abdur Rauf, *Renaissance of Islamic culture and civilization in Pakistan* (Lahor: M.Asrafi Baz, 1956, p.3

১. আল্ কুর'আন, ৯ : ১২২।

২. আল্ কুর'আন, ৩৫ : ২৮।

Dhaka University Institutional Repository

তো ধন-দৌলতের কোন উত্তরাধিকারী রেখে যান নি। বরং উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন 'ইলম বা ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের, যে ব্যক্তিই তা গ্রহণ করল, সেই একটি পূর্ণাঙ্গ সম্পদ প্রাপ্ত হল।"[১] সত্য-মিথ্যা, ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য ইসলামী জ্ঞানের একান্ত আবশ্যক। জ্ঞান ছাড়া এই পার্থক্য করা অসম্ভব। ইসলামে জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব এত বেশি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একে নফল ইবাদতের চেয়েও বেশি গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, "রাতে এক ঘন্টা জ্ঞান চর্চা করা সারা রাতের ইবাদতের চেয়েও উত্তম।"[২] মানুষের মেধা, মননশীলতা শিক্ষা-দর্শনের মাধ্যমে বিকশিত হয়। এর মাধ্যমে আত্মার উন্নতি হয়। মানুষের মধ্যে দয়া, মায়া স্নেহ-মমতা ইত্যাদি মানবীয় গুণাবলি উৎকর্ষিত ও বিকশিত হয়। আচার আচরণ পরিশীলিত ও পরিমার্জিত হয়, এতে চারিত্রিক উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়, মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটে। মানবতা সমুন্নত হয়। শিক্ষা-দর্শনই সম্মান ও মর্যাদার মাপকাঠি। আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ) কে ফেরেশ্তাদের ওপরেও মর্যাদা দিয়েছিলেন এবং তার মানদন্ড ছিল শিক্ষা। কুর'আন মাজীদে এসেছে :

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا

"এবং তিনি আদম (আ) কে সব জিনিসের নাম শিখিয়েছেন।"[৩]

ফেরেশতারা আদম (আ)-এর জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব দেখে, তার প্রতি শ্রদ্ধাবনত হয়েছিল। কুর'আন মাজীদে আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন :

الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"জ্ঞানী আর মূর্খরা কি কখনও সমান হতে পারে?।"[৪]

রাসূল (সা) বলেছেন, ফরয কর্তব্যগুলো পালন কর এবং কুর'আন শিক্ষা কর এবং লোকদের শিক্ষা দাও, কেননা আমি মৃত্যুও অধীন।"[৫] এ নির্দেশ ইসলামী শিক্ষা-দর্শন গ্রহণ ও পরিপালনের। হালাল উপার্জনে সহায়তা এবং আত্ম কর্মসংস্থানে সক্ষম করে তোলার উদ্দেশ্যে ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের প্রয়োজন। হালাল উপার্জন করতে হলে, হালাল-হারাম সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। কোন্ কোন্ উপায়ে হালাল উপার্জন করা যায় তা-ও জানা প্রয়োজন। জ্ঞানান্বেষণ কারীর প্রতি খুশি হয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তার পূর্ববর্তী পাপ মোচন করে দেন, এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন- "যে ব্যক্তি জ্ঞানান্বেষণ করে, তার অতীতের পাপ মোচন হয়ে যায়।"[৬] আমরা জ্ঞানান্বেষণে ব্রতী হব এবং জ্ঞান চর্চায় সাধ্যমত অবদান রাখব।

আল্লাহ্র কাছে মু'মিনের প্রার্থনা : "হে আমাদের রব! আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দাও।"[৭]

---

১. আবূ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ ইবন্ আব্দুর রহমান আদ দারেমী, *সুনানুদ্ দারেমী*, ১ম খ. (করাচীঃ কাদেমী কুতুবখানা, তা. বি), পৃ. ১৫৭।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭।

৩. আল্ কুর'আন, ২ : ৩১।

৪. আল্ কুর'আন, ৩৯ : ৯।

৫. তিরমিযী, *জামিউত তিরমিযী*, ২য় খ., আবওবুল ফারায়িয, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯, *দারা কুতনী, সুনান*, ৪র্থ খ. (বৈরুত দারুল মা'রিফা, ১৯৬৬ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৮১, বুখারী, *সহীহুল বুখারী* ,৩য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭৫।

৬. তিরমিযী, *জামিউত তিরমিযী*, ২য় খ., আবওবুল ইল্ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩।

৭. আল্ কুর'আন, ২ : ২০১।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতির সাথে পরিচিত করা। সব রকম অপসংস্কৃতি সম্বন্ধে সতর্ক করা। সব রকম অপসংস্কৃতি থেকে দূরে রাখা। ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য মনুষ্যত্ব ও মানবতার বিকাশ সাধন। মানব প্রকৃতির প্রতিভাকে শিক্ষা-দর্শনের মাধ্যমে জাগরিত ও বিকশিত করা। মানুষের মধ্যে মননশীলতা, কর্মকুশলতা, দক্ষতা শিক্ষা-দর্শনের মাধ্যমে বিকশিত হয়। ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের মাধ্যমে আত্মার উন্নতি হয়। দয়া, মায়া, স্নেহ মমতা ইত্যাদি মানবীয় গুণাবলি উৎকর্ষিত ও বিকশিত হয়। মানবীয় গুণাবলি বিবর্জিত মানুষ পশুর চেয়েও অধম।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

"তারা পশুর মত; বরং তাদের চেয়েও অধম।"[১]

এ শিক্ষা-দর্শন ব্যক্তি চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও কর্তব্যবোধ জাগ্রতকরণের মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনকে সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও শান্তিময় করে তুলতে সহায়তা করে। ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের শিক্ষিত ব্যক্তিই কেবল দ্বীনকে উজ্জীবিত ও প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার খলীফা। মানুষকে এই খিলাফতের দায়িত্ব পালনে সক্ষম করে তোলা ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

আল্লাহ্ পাক বলেন :

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ

"আল্লাহ্ ঐ মহান সত্তা যিনি তোমাদের পৃথিবীতে খলীফা বানিয়েছেন।"[২]

ইসলামী সমাজে পরস্পরের কার কী অধিকার ও কর্তব্য সে সম্বন্ধে অবহিত করা এবং কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ করা ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের উদ্দেশ্য। শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশ্ব সভ্যতায় মুসলমানদের গৌরবময় অতীত ও ঐতিহ্য আছে। সেই ঐতিহ্যের সাথে তরুণ শিক্ষার্থীদের পরিচিত করা এবং হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে অনুপ্রাণিত করাই ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য। ন্যায় নীতিভিত্তিক আদর্শ রাষ্ট্র ও বিশ্ব সমাজ গঠনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ব, সাম্য, উদার মানবতাবোধ ও ন্যায়নীতি ভিত্তিক আন্তর্জাতিক নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের অন্যতম উদ্দেশ্য। শিক্ষার্থীদের হালাল উপার্জনে উৎসাহিত করা এবং আত্ম কর্মসংস্থানে সক্ষম করে তোলা ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের অন্যতম উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ তা'আলা যেমন সালাত, সাওম আদায় করতে বলেছেন, তেমনি তিনি জীবিকা অন্বেষণেরও নির্দেশ দিয়েছেন।

এ বিষয়ে আল্লাহ্ পাক বলেন :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ

"সালাত সমাপ্ত হলে, পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ (রুজি) অন্বেষণ কর।"[৩] ইসলাম অলসতা, কর্ম-বিমুখতা ও কুড়েমি আদৌ-সমর্থন করে না। ইসলাম কায়িক পরিশ্রমকে উৎসাহিত করেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)

---

১. আল্ কুর'আন, ৭ : ১৭৯।

২. আল্ কুর'আন, ৩৫ : ৩৯।

৩. আল্ কুর'আন, ৬২ : ১০।

Dhaka University Institutional Repository

বলেছেন "দু'হাতের উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কেউ কোন দিন খায়নি।"[১] নিশ্চয় আল্লাহ্র নবী দাউদ (আ) নিজ হাতের উপার্জিত খাদ্যের দ্বারাই আহার করতেন।[২] রাসূলুল্লাহ্ (সা) জীবিকা উপার্জনে শুধু উৎসাহিতই করেন নি বরং একে ফরয ঘোষণা করেছেন।
এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

"তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি, মানুষের কল্যাণের জন্যই তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, তোমরা সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে।"[৩] রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র দাওয়াত ও তাবলীগের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যেমন ইরশাদ হচ্ছে :

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

"আর সেই ব্যক্তির কথা অপেক্ষা অধিক ভাল কথা আর কার হতে পারে? যে মানুষকে আল্লাহ্র দিকে ডাকে, নেক আমল করে এবং বলে আমি মুসলমান।"[৪]
মানব জীবনের প্রধান ভূষণ ও সম্পদ হলো চরিত্র। ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের উদ্দেশ্য মানুষকে পূতঃপবিত্র চরিত্রের অধিকারী হতে সাহায্য করা। তা পরিবেশ প্রতিবেশে প্রাপ্ত বস্তু নিয়ে নিজের ও জগতের অন্যান্য কল্যাণে প্রয়োগের নির্দেশনা দেয়। মানুষের বিবেক-বুদ্ধির বিকাশ ও বিস্তৃতি ঘটায় জ্ঞান। জ্ঞান ছাড়া মানবতার কল্যাণ সাধন সম্ভব নয়। তাই, অধিকতর জ্ঞানার্জনে উদ্বুদ্ধ করাই ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের লক্ষ্য। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন : "জ্ঞান অনুসন্ধানকারীর পূর্ববর্তী সব গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। আর বিদ্যার্জনকালের মৃত্যু শাহাদত লাভের সমান।"[৫] রাসূল (সা) অন্যত্র বলেন : "জ্ঞানপূর্ণ কথা জ্ঞানীর হারানো ধন, অতএব সে যেখানেই তা পাবে, তা গ্রহণ করার জন্য তার পূর্ণ অধিকার রয়েছে।"[৬] মানব জীবন সদা পরিবর্তনশীল, আরো বেশি পরিবর্তনশীল মানুষের পরিবেশ ও প্রতিবেশ। এগুলোর সঙ্গে মানব জীবনের সামঞ্জস্য বিধান সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের একটি অপরিহার্য লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের মৌল বিশ্বাসের পরিপন্থী এবং এর সঙ্গে সংঘাতশীল যে কোনো ধরনের শিক্ষা বর্জনীয়। তাই জ্ঞানার্জন, জ্ঞানের প্রসার ও প্রভাবকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং পরিবেশ প্রতিবেশে প্রাপ্ত প্রতিটি বস্তুকে মানব জীবনের কল্যাণ ও উন্নতি বিধানের কাজে লাগাতে হবে। প্রকৃতিতে প্রাপ্ত বস্তুসমূহের মধ্যেও মানব কল্যাণ ও উন্নতির অনেক উপাদান বর্তমান।

---

১. মূল ইবারত: مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ [*সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল ব'য়ু, ২য় খ. ৩য় সংস্করণ, তাহ্কীক মুস্তফা দীব, দারু ইব্ন কাছীর (বৈরূত: ১৯৮৭ খৃস্টাব্দ), হাদীস নং-১৯৬৬।]

২. আবূ 'আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন্ ইসমাঈল আল বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, কেনা বেচা অধ্যায়, হাদীস নং-১৯৩০।

৩. আল্ কুর'আন, ৩ : ১১০।

৪. আল কুর'আন ,৪১ : ৩৩।

৫. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন্ ঈসা আত্ তিরমিযী, *জামিউত্ তিরমিযী*, ২য় খ., আবওবুল ইলম (দিল্লীঃ মাকতাবা রাশীদিয়া, তা. বি), পৃ. ৯৩।

৬. *জামিউত তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

তাই, মানুষের নিকট ও দূরের বস্তুসমূহ সম্পর্কে জ্ঞানীদেরকে গবেষণা করতে হবে যে, বস্তু ও শক্তিসমূহের কোনটিকে কীভাবে মানব কল্যাণে কাজে লাগানো যায়। প্রকৃত পক্ষে এ নির্দেশনা থেকেই বর্তমান প্রকৌশল বিদ্যার উৎপত্তি। আর এই জ্ঞানার্জনের নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ্র। অন্য কথায় বলা যেতে পারে যে, মানুষের কল্যাণার্থে বিজ্ঞান সাধনাও ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের অন্যতম লক্ষ্য।

সমাজ জীবনে ইসলামকে জীবন বিধান হিসেবে পুনর্জীবন দানও ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের আরেকটি উদ্দেশ্য। সমাজ জীবনে এর গুরুত্ব অপরিসীম। জীবন বিধান হিসেবে ইসলামকে সমাজ জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারলে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ হতে পারে। ইসলামী শিক্ষা-দর্শনে শিক্ষিত হয়ে অন্যকে শিক্ষাদান করা মুসলমানের নৈতিক দায়িত্ব। যে শিক্ষার দ্বারা দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধিত হয় না, সে শিক্ষা যেমন মূল্যহীন তেমনি কোন বিজ্ঞজনের শিক্ষা-দীক্ষা দ্বারা যদি দেশ জাতি উপকৃত না হয়; কোনো প্রকার কল্যাণ লাভ না করে, তবে সে ব্যক্তিরও কোনো মূল্য নেই। তাই ইসলামী শিক্ষা-দর্শনে শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে দ্বীনের অপূর্ণতা দেখা দিলে তার পূণর্জীবনকল্পে বিরামহীন প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তবেই দেশ ও জাতি তার বিদ্যা শিক্ষা হতে উপকৃত হবে এবং তার শিক্ষার্জন সার্থক বলে পরিগণিত হবে। দ্বীনের পূণর্জীবনের জন্য প্রত্যেকেরই চেষ্টা করা ওয়াজীব।

পার্থিব জীবনে সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। আর সমাজ জীবনে সব মানুষই সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন-যাপন করতে চায়। শিক্ষা ও জ্ঞান মানুষকে সুখী ও সমৃদ্ধ জীবনের নিশ্চয়তা বিধান করে। মানুষ নিজ নিজ বিদ্যা-শিক্ষা ও জ্ঞানবলে আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রাকৃতিক সম্পদরাজি কাজে লাগিয়ে নিত্য-নব আবিষ্কারের মাধ্যমে নিজ দেশ ও জাতির জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদন করে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে পারে। দেশবাসীর জন্য জীবিকা অর্জনের বহুমুখী পন্থা উদ্ভাবন করে দেশ থেকে বেকারত্বের অবসান ঘটিয়ে অর্থনৈতিক সমস্যার মূলোৎপাটন করতে পারে। এক্ষেত্রে নৈতিক শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। আর নৈতিক শিক্ষা মূলত ইসলামী শিক্ষা-দর্শনেরই সার নির্যাস। ইসলামী শিক্ষার প্রকৃত দর্শনই হলো পার্থিব সুখ-শান্তি লাভ। এজন্য দরকার হালাল উপার্জন ও রুজি -রোজগার। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"হে মানব মন্ডলী ! তোমরা হালাল ও পবিত্র বস্তুর মধ্যে হতে ভক্ষণ কর ! আর তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"[১] ইরশাদ হচ্ছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"হে ঈমানদারগণ ! আমি তোমাদেরকে যে সকল পবিত্র জিনিস জীবিকারূপে দান করেছি, তা হতে ভক্ষণ করো এবং আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। যদি তোমরা একান্ত তারই ইবাদত করো।"[২]

অন্যত্র আল্লাহ্ ইরশাদ করেন :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

[১] আল কুর'আন, ২ : ১৬৮।
[২] আল কুর'আন, ২ : ১৭২।

Dhaka University Institutional Repository

"তিনি তোমাদের উপর মৃত জন্তু, রক্ত, শুকরের গোশত্ এবং আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারো নামে যবেহকৃত প্রাণী হারাম করেছেন। অবশ্য যে ব্যক্তি অন্যোপায় হয়েছে সে সীমালঙ্ঘনকারী বা অভ্যস্থ নয়, তবে তার জন্য তা ভক্ষণে গুনাহ্ নাই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াবান।"[১]

জ্ঞানার্জনের চূড়ান্ত লক্ষ্য সম্পর্কে রাসূলল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন : 'প্রথম জ্ঞান আল্লাহ্কে জানা এবং শেষ জ্ঞান তার কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করা'। আল্লাহ্র অপার শক্তি, কুদরত, সৃষ্টিকৌশল তথা আল্লাহ্র গুণাবলী সম্পর্কে জেনে এবং তার সৃষ্টির পরিচয় লাভ করে তার কাছে পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করার নামই হলো ইসলাম। এটা বিদ্যার্জন ব্যতীত আদৌ আশা করা ঠিক নয়। অতএব, সৃষ্টির সেরা মানব জাতি জ্ঞানলাভ করবে, মহান স্রষ্টা সম্পর্কে জানবে এবং তার সৃষ্ট বিশ্ব প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে তারই কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করবে এটাই স্বাভাবিক। শিক্ষা দ্বারা মানুষের মধ্যে উচ্চস্তরের নৈতিকতা ও মানসিক গুণাবলীর উন্মেষ এবং পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনসহ মানুষকে দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী করে তোলাই ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য। একটি আদর্শ ইসলামী শিক্ষা-দর্শনে অপরিহার্যভাবে তিনটি বৈশিষ্ট্য যুগপৎভাবে বিদ্যমান থাকা চাই। যেমন :

১. একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম হিসেবে জীবন-যাপনের জন্য যতটুকু মৌলিক ইসলামী জ্ঞানের আবশ্যক, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক ভাবে সে জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা করা;

২. মুসলমানদের মধ্যে যারা ইসলামী শিক্ষা ও সভ্যতার কোন স্তরে উচ্চতর শিক্ষা লাভ ও মৌলিক অবদান রাখতে চায় বা রাখার যোগ্যতা অর্জন করতে চায়, তাদের জন্য এর যথাযথ সুযোগ রাখা;এবং

৩. মুসলমানদের মধ্যে যারা সাহিত্য, কলা, সমাজ বিজ্ঞান ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি বিদ্যায় উচ্চতর জ্ঞান লাভে ইচ্ছুক তাদের জন্য এর পথ উন্মুক্ত রাখা। সরকার রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, ইন্টারনেট, প্রযুক্তিগত, সিনেমা, অডিও, গণসংযোগ সামাজিক মাধ্যমগুলোকে অপব্যবহার ও অপচয়ের হাত থেকে রক্ষা করে গণশিক্ষার সহায়ক হিসেবেও ব্যবহার করতে পারে।

ইসলামী শিক্ষা-দর্শনে নারীর অবস্থান সম্পর্কে কুর'আন-হাদীস ও তার বাস্তবায়ন

কুর'আনের পাশাপাশি হাদীসেও নারী শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নারীদেরকে শিক্ষার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। যেমন- হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন, "জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয বা অপরিহার্য।"[২] হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন, "যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের জন্য কোন পথ অবলম্বন করে, মহান আল্লাহ্ তাদ্বারা তার জন্য বেহেস্তের পথ সহজ করে দেন।"[৩] হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছি যে, মহান আল্লাহ্ পাক ওহী যোগে আমাকে জানিয়েছেন, "যে ব্যক্তি বিদ্যা শিক্ষার জন্য কোন পথ ধরে আমি আল্লাহ্ তার জন্য বেহেস্তের পথ সুগম করে দেই।"[৪] কাসীর ইব্ন কায়েস বলেন, হযরত আবূদ্দারদা (রা) বলেছেন যে, আমি রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জন এর জন্য কোন পথ গ্রহণ করে মহান আল্লাহ্ পাক তাকে

---

১. আল কুর'আন, ২ : ১৭৩।

২. ইবনে মাযাহ, *সুনান*, ১ম খ., কিতাবুল ইলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১।

৩. আবূ বকর আহমদ ইবনুল হুসাইন আল বায়হাকী, *আল বায়হাকী*, শু'আবুল ঈমান, ২য় খ., বাবু ফি তারাবিল ইলম (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯০ খৃস্টাব্দ), পৃ. ২৬২।

৪. *বায়হাকী*, শু'আবুল ঈমান, ৫ম খ., প্রগুক্ত, পৃ. ৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

জান্নাতের একটি পথে পরিচালিত করেন।"[১] হযরত ওয়াসিয়া ইবনে আসফা (রা) বলেন, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন, "যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণ করে এবং পেয়ে যায়, তার পুরস্কার দ্বিগুন। আর যদি তা না ও পায় তবুও সে একগুণ পুরস্কার পাবে।"[২] হযরত মাখবারা আজাদী (রা) বলেন, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন, "যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণ করে ,তার অতীতের গুনাহ রাশি মাফ হয়ে যায়।"[৩] হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, "জ্ঞানপূর্ণ কথা জ্ঞানীর হারানো ধন অতএব, সে যেখানেই তা পাবে, তা গ্রহণ করার জন্য তার পূর্ণ অধিকার রয়েছে।"[৪] হযরত মুয়াবিয়া (রা) বলেন, রাসূল করীম (সা) বলেছেন, "যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণ করার জন্য ঘর থেকে বের হয় সে আল্লাহ্‌র পথেই চলতে থাকে, যতক্ষন না ফিরে আসে।"[৫] হযরত আলী (রা) বলেন, ধর্ম বিষয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি কতই না উত্তম! যদি কেউ তার শরণাপন্ন হয়, তিনি তার উপকার করেন, আর কেহ তার সাহায্য না চাইলেও তিনি নিজেই তো কল্যাণ প্রাপ্ত হয়ে থাকেন।[৬] 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন হারেস (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে, তার চিন্তা ভাবনার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। আর আল্লাহ্ তাকে এরূপ জায়গা থেকে রিযিক দান করবেন যা সে ধারণাও করতে পারে নি।"[৭] উপরোক্ত হাদীস গুলোতে দেখা যায় বিদ্যার্জন ফরয হিসেবে সাব্যস্ত করে তা অর্জনের জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে বিদ্যা অন্বেষণকারী অতি সহজে বেহেস্তে প্রবেশ করবে। আবার কোন কোন হাদীসে দেখা যায় বিদ্যা অন্বেষণকারী দ্বিগুণ পুরুস্কার লাভ করবে। আবার কোন কোন হাদীসে দেখা যায় তাকে অতীতের গুণাহ মাফ এবং উত্তম রিযিকের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। বিদ্যার্জনের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জীবনের কল্যাণ সাধিত হওয়ার কথাই বলা হয়েছে। এতেই বুঝা যায় শিক্ষার গুরুত্ব কত বেশী।

নর-নারী নির্বিশেষে সকল মানুষেরই সর্বপ্রথম কর্তব্য হলো শরী'আতের জাহিরী 'ইল্‌ম অর্থাৎ ওযূ, গোসল, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি শিক্ষা করা। জাহিরী 'ইবাদতের সাথে সাথে বাতিনী 'ইবাদতও আবশ্যক। যে সকল আমল দিলের সাথে সম্পর্কযুক্ত তাকেই বাতেনী 'ইবাদত বলা হয়। যেমন তাওয়াক্কুল, সবর, শোকর, আল্লাহ্‌র রিযা, মুহব্বত, কানা'আত, তসলীম, তওবা, ইখলাস, তাকওয়া প্রভৃতি অর্জন করা এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, হাসাদ, রিয়া, অহঙ্কার ইত্যাদি বর্জন করা। সুতরাং বাতিনী 'ইবাদত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করাও প্রত্যেক মু'মিনের কর্তব্য। কেননা যাহিরী এবং বাতিনী উভয় প্রকারের 'ইবাদতই ইল্‌ম ছাড়া সম্ভব নয়।[৮] ইসলামে শিক্ষা-দর্শনে শিক্ষার স্থান অতি উচু। কুর'আনের প্রথম আদেশই 'পড়'। পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত হতে এবং শিখিয়েছেন তাকে কলমের ব্যাবহার। এ নির্দেশ

---

১. *বায়হাকী*, শু'আবুল ঈমান, ২য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২।
২. *দারেমী*, সুনান ১ম খ., ভূমিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।
৩. তিরমিযী, *জামিউত তিরমিযী*, ২য় খ., আবওবুল ইলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।
৫. তিরমিযী, *জামিউত তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, ৯৩।
৬. আদ-দায়লামী, *আল ফিরদাউস*, ৪র্থ খ., বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১৯৮৬, পৃ. ২৫১।
৭. ইমাম আবূ হানীফা, *মুসনাদ, ১ম খ.*, অনুবাদ মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল হক, (ঢাকা: শান্তি ধারা প্রকাশনী, ১৯৯১ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৫৫।
৮. প্রফেসর মাওলানা আবদুল খালেক, *সিরাজুস্ সালিকীন* (ঢাকা: সেবা প্রিন্টিং প্রেস, মহাখালী, বাংলা সন ১৩৯০), পৃ. ৩-১০।

Dhaka University Institutional Repository

থেকেও বুঝা যায় লেখাপড়ার গুরুত্ব কত বেশী। পড়া-লেখা ছাড়া শিখবার জিনিস অনেক আছে; কিন্তু পড়া-লেখা ছাড়া কোন শিক্ষাই স্থায়ী হয় না। সব শিক্ষার প্রসার ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে পড়া-লেখার উপরে। উদ্ভাবনী শক্তি সকলের থাকে না। যদি কেউ তার উদ্ভাবন লিপিবদ্ধ করে যায়, তবেই তা অনায়াসে অপরের পক্ষে আয়ত্ব করা সম্ভব হয়। এর উপর ভিত্তি করেই নতুন উদ্ভাবনও সম্ভব হয়।[১] ইসলামী শিক্ষা-দর্শনে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক-ত্রিবিধ শিক্ষার উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মনের শান্তি নির্ভর করে শরীরের সুস্থতার উপর। আবার আধ্যাত্মিক চিন্তার জন্য প্রয়োজন শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য। নবী করীম (সা) নিজে কায়িক পরিশ্রম করতেন, অপরকেও এর জন্য উৎসাহিত করতেন। ইবাদতেও কায়িক পরিশ্রমের আবশ্যকতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন নামায ও হজ্জ কায়িক শ্রমের সমন্বয়। অনেকের ধারণা, ইসলামে খেলাধুলার স্থান নেই। কিন্তু তা সত্য নয়। ইসলাম অলসতার বিরোধী। যে সমস্ত খেলায় মানুষকে অলসভাবে বসে থাকতে হয়, ইসলামে তা হারাম। যেমন তাস,পাশা ইত্যাদি। কিন্তু যে সকল ক্রীড়ায় গতি, শক্তি ও সাহসের প্রয়োজন, সেগুলো শুধু হালালই নয় বরং প্রশংসনীয়। যেমন অশ্বারোহণ, সন্তরণ বা সাতার কাটা ইত্যাদি।

ইসলাম প্রকৃতির ধর্ম। কেউ কারো প্রতি অত্যাচার করুক ইসলাম তা বলে না। ইসলাম অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে বলে। এ জন্যে আত্মরক্ষা মানুষের অবশ্য কর্তব্য ও সেজন্য সামরিক শিক্ষাও তার জন্য অপরিহার্য। ইসলামে মানবিক শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে। জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রভাবেই মানুষ সমগ্র সৃষ্টির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে। ইসলামী শিক্ষা-দর্শনে আধ্যাত্মিক শিক্ষার স্থান সকল শিক্ষার উপরে। বস্তুত সকল শিক্ষার উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র সাথে সংযোগ স্থাপন। কথায়, কাজে ও চিন্তায় আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা এবং তাঁর বিধি-নিষেধ মেনে চলাই আত্মার শিক্ষা। এর অভাবে মানসিক শিক্ষার জগতে কল্যাণপ্রসূ প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। আত্মিক শিক্ষার ভিত্তি আল্লাহ্‌র ভয়। আল্লাহ্ জগতের স্রষ্টা, পালনকর্তা ও সংহারকর্তা। তিনি সৃষ্টির প্রতি স্নেহশীল ও করুণাময়। তিনি পরকালে মানুষকে সৎকার্যের পুরস্কার ও মন্দকাজের শাস্তি দিবেন। এই বিশ্বাসের উপরই নির্ভর করে আত্মিক শিক্ষা। কিন্তু এ বিশ্বাস সহজ নয়। কেননা, আমরা আল্লাহ্‌কে দেখি না; পরকালের কোন ধারণা পেতে পারি না। শৈশব হতে এ বিশ্বাসের সৃষ্টি না হলে, ভবিষ্যতে যুক্তিতর্কের সাহায্যে এ বিশ্বাসে উপনীত হওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।[২]

মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষা মানুষের আত্মবিকাশ ও কল্যাণ সাধন করে। কুর'আনে মানুষকে জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করার অনুপ্রেরণা দেয়া হয়েছে। তাই জ্ঞানান্বেষণ বা বিদ্যার্জনকে বলা হয় ইসলামের মেরুদণ্ড। মেরুদণ্ডহীন মানুষ যেমন অর্থ ও অকর্মণ্য হয়ে থাকে, বিদ্যার্জন না করে প্রকৃত মুসলমান হওয়াও তেমনি অসম্ভব। তাই আল্লাহ্ জ্ঞানের সাথে মানুষের নিবিড় সম্পর্কের কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে মানুষকে জ্ঞান দান করে তাকে আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা আসন প্রদান করেছেন। আল্লাহ্ পাক আরো বলেছেন : "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মু'মিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকেই একজন নবী পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের কাছে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তাদেরকে

---

১. ড. মাহবুবা রহমান, *কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী*, পৃ. ১৫৯।

২. খান বাহাদুর আবদুর রহমান খাঁ, *কুর'আন শরীফ, ভূমিকা* (ঢাকা: প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ১ম সংরস্করণ, ১৯৫২ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৭১-৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশোধিত করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেন, যদিও তারা পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট ছিল।"[১] রাসূলে করীম (সা) এর শুভাগমনের প্রকৃত কারণই ছিল অন্ধকারে নিমজ্জিত একটি জাতিকে শিক্ষা ও জ্ঞান দ্বারা আলোর রাজ্যে প্রবেশ করানো। তাই হযরত মুহাম্মদ (সা) মানুষের মাঝে জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে উদ্যোগী হলেন। তখন এর একমাত্র উদ্দেশ্য শুধু কুর'আন তিলাওয়াতেই ছিল না, বরং কুর'আনের গভীর তাৎপর্য অনুধাবনকেও উৎসাহিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) চেয়েছিলেন, প্রতিটি মুসলমান জ্ঞান-বিজ্ঞানে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে পরিগণিত হোক। তিনি বলেছিলেন যে, একটি সর্বজনীন ধর্ম ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে পরিপূর্ণ শিক্ষা ও সকল সমস্যার সার্বিক সমাধান একমাত্র ইসলামই দিতে সক্ষম। জ্ঞানার্জনের কোন বিকল্প ইসলামে নেই। সুতরাং ইসলামের অনুপ্রেরণার প্রভাবে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে জ্ঞানচর্চার যে প্রবাহ শুরু হয়, নারীরাও সেখানে যুক্ত হয়েছিল। পরবর্তীতে আব্বাসীয় ও উমাইয়া যুগে নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে।[২] ইসলামী শিক্ষা-দর্শনে নারী-পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য না করে উভয়কে সমভাবে জ্ঞানার্জনের আদেশ দিয়েছে।

শিক্ষার নির্দেশ সমভাবে প্রযোজ্য

কুর'আন-হাদীসে শুধু নারীশিক্ষার কথা পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয় নি। শিক্ষা সম্পর্কে যে কথাই বলা হয়েছে, তা নর-নারী উভয়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। নর-নারীর জন্য আলাদাভাবে কোন আলোচনা করা হয় নি। আরও একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, কুর'আন-হাদীসে শিক্ষা প্রসঙ্গে যে নির্দেশনাগুলো দেয়া হয়েছে, তাকে সাধারণত পুরুষবাচক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন কুর'আন মজীদে বলা হয়েছে তুমি পাঠ কর তোমার প্রভুর নামে। আর হাদীস শরীফে বলা হয়েছে তোমরা বিদ্যা অন্বেষণ কর । কিন্তু এই নির্দেশ কেবল পুরুষের জন্য নয়, বরং নর-নারী উভয়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রেই নয়, প্রায় সকল বিষয়েই কুর'আন- হাদীসে সাধারণ নির্দেশগুলো এভাবে পুরুষবাচক ক্রিয়াপদ দ্বারা বর্ণনা করে নর-নারী উভয়কেই সমভাবে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়,তোমরা নামায পড় এবং যাকাত দাও। এখানে দু'টি ক্রিয়াপদই পুরুষবাচক। বরং নর ও নারী উভয়কেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা নামায পড়া ও যাকাত দেয়া নর-নারী উভয়ের জন্য ফরয।

হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন : "জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয বা অপরিহার্য।"[৩] হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন "যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের জন্য কোন পথ অবলম্বন করে, মহান আল্লাহ্ তাদ্বারা তার জন্য বেহেশতের পথ সহজ করে দেন।"[৪] হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বলতে শুনেছি যে, মহান আল্লাহ্ ওহীযোগে আমাকে জানিয়েছেন- "যে ব্যক্তি বিদ্যাশিক্ষার জন্য কোন পথ ধরে, আমি তার জন্য বেহেস্তের পথ সুগম করে দেই।"[৫] কাসীর ইব্‌নে কায়েস

---

১. আল কুর'আন, ৩ : ১৬৪।

২. ফাতেমা আলী, *ইসলামে নারী* (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৩৫-৪১।

৩. ইবনে মাজাহ, *সুনান*, ১ম খ., কিতাবুল ইল্‌ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১।

৪. আবূ বকর আহমেদ ইবনুল হুসাইন, *আল বায়হাকী, শুআবুল ঈমান*, ২য় খ., বাবু কী তালাবিল ইলম (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ১৯৯০ খৃস্টাব্দ), পৃ. ২৬২।

৫. বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, ৫ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

বলেন, হযরত আবুদ্দারদা (রা) বলেছেন যে, আমি রাসূলে করীম (সা) কে বলতে শুনেছি : "যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য কোন পথ গ্রহণ করে, মহান আল্লাহ্ তাকে জান্নাতের একটি পথে পরিচালিত করেন।"[১] হযরত ওয়াছিয়া ইব্‌নে আসফা (রা) বলেন, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন : "যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণ করে এবং তা পেয়ে যায়, তার পুরস্কার দ্বিগুণ। আর যদি তা নাও পায়, তবুও সে একগুণ পুরস্কার পাবে।"[২] হযরত মাখবারা আযদী (রা) বলেন, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন : "যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণ করে, তার অতীতের গুনাহরাশি মাফ হয়ে যায়।"[৩] হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন : "জ্ঞানপূর্ণ কথা জ্ঞানীর হারানো ধন অতএব, সে যেখানেই তা পাবে, তা গ্রহণ করার জন্য তার পূর্ণ অধিকার রয়েছে।"[৪] হযরত মুয়াবিয়া (রা) বলেন, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন : "মহান আল্লাহ্ যার মঙ্গল চান, তিনি তাকে দীনী 'ইল্‌ম দান করেন।"[৫] হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন : "যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণ করার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়, সে আল্লাহ্‌র পথেই চলতে থাকে, যতক্ষণ না ফিরে আসে।"[৬] হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন : "ধর্ম বিষয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি কতই না উত্তম! যদি কেউ তাঁর শরণাপন্ন হয়, তিনি তার উপকার করেন। আর কেউ তাঁর সাহায্য না চাইলেও তিনি নিজেই তো কল্যাণপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন।"[৭] 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে হারেস (রা)বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে, তার চিন্তা-ভাবনার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। আর আল্লাহ্ তাকে এরূপ স্থান থেকে রিযিক দান করবেন যা সে ধারণাও করতে পারবে না।"[৮] আল্লাহ্ মানুষকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং মানব জীবনের উদ্দেশ্যই হলো আল্লাহ্‌র ইবাদত করা। এই ইবাদত বিশুদ্ধভাবে করার জন্য ইল্‌ম বা জ্ঞান অপরিহার্য। কেননা ইল্‌ম ব্যতীত ইবাদত করা সম্ভব নয়। তাই হাদীস শরীফে ইবাদতের উপর ইল্‌মের প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলেন : "রাত্রিতে এক ঘন্টা ইল্‌ম চর্চা করা সারা রাত্রি জেগে ইবাদত করার চেয়ে উত্তম।"[৯] হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন : "একজন ফিকহবিদ আলিম শয়তানের বিরুদ্ধাচরণে এক হাজার আবিদের চেয়েও বেশী শক্তিশালী।"[১০] হযরত আবুদ্দারদা (রা) বলেন, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন : "পূর্ণিমার রাতে নক্ষত্রমালার উপর পূর্ণ চন্দ্রের যেরূপ মর্যাদা, আবিদের উপর আলিমের মর্যাদা ঠিক তদ্রূপ।"[১১] হযরত আবূ উমামা (রা) বলেন, রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট দু'ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। তাদের একজন আলিম এবং অপরজন আবিদ। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন :

---

১. বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, ২য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২।
২. দারেমী, *সুনান*, ১ম খ., ভূমিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।
৩. তিরমিযী, *জামিউত তিরমিযী*, ২য় খ., আবওয়াবুল ইল্‌ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩।
৪. তদেব, পৃ. ৯৮।
৫. *সহীহুল বুখারী*, ১ম খ., কিতাবুল ইলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।
৬. তিরমিযী, *জামিউত তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩।
৭. আদ-দায়লামী, *আল-ফিরদাউস*, ৪র্থ খ. (বৈরুতঃ দারূল কুতুব ইলমিয়া, ১৯৮৬ খৃস্টাব্দ), পৃ. ২৫১।
৮. ইমাম আবূ হানিফা, *মুসনাদ*, ১ম খ., অনুবাদঃ মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল হক, (ঢাকা : শান্তিধারা প্রকাশনী, ১৯৯১ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৫৫।
৯. দারেমী, *সুনান, ১ম* খ., ভূমিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭।
১০. তিরমিযী, *জামিউত তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

"তোমাদের সাধারণ মানুষের উপর আমার মর্যাদা যেরূপ, আলিমের মর্যাদাও আবিদের উপর ঠিক তদ্রূপ।"[১] হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, রাসূলে করীম (সা)এর কাছে বনী ইসরাঈলের দু'ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তাদের একজন ছিলেন আলিম। তিনি ফরয ইবাদত করার পর লোকদিগকে শিক্ষা দানরত থাকতেন। আর অপরজন ছিলেন একজন আবিদ। তিনি দিনে রোযা রাখতেন এবং সারারাত ইবাদত করতেন। রাসূলে করীম (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো এ দু'জনের মধ্যে কে বেশী উত্তম? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন :

"এই যে আলিম ব্যক্তি, যিনি ফরয ইবাদত করার পর বসে যান এবং লোকদিগকে সুশিক্ষাদানে ব্যস্ত থাকেন, তার মর্যাদা ঐ আবিদ ব্যক্তির উপর যিনি দিনে রোযা রাখেন এবং সারারাত্রি নফল ইবাদত করেন, ঠিক তদ্রূপ যেরূপ তোমাদের সাধারণ লোকদের উপর আমার মর্যাদা।"[২]

শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো দীন ইসলামকে প্রাণবন্ত রাখা, ইবাদাতের নিয়ম-কানুন জানা এবং সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধন করা। ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ উদ্ধার করা, নিজের বাহাদুরী প্রকাশ করা এবং অপরকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য বিদ্যা শিক্ষা বৈধ নয়। হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, রাসুলে করীম (সা) বলেছেন "যে ব্যক্তি দীন ইসলামকে জিন্দা করার উদ্দেশ্যে বিদ্যা শিক্ষা করে এবং এ অবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়, বেহেশতে তার এবং নবীগণের মধ্যে মাত্র একটি ধাপের ব্যবধান থাকবে।"[৩] হযরত কা'ব ইব্‌নে মালিক (রা) বলেন, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন : "যে ব্যক্তি এ উদ্দেশ্যে জ্ঞান অন্বেষণ করে যে, আলিমদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, অথবা বোকা ও মূর্খ লোকদের সাথে বিতর্ক করবে এবং লোকদের দৃষ্টি তার দিকে আকৃষ্ট করবে, আল্লাহ্ পাক তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।"[৪] হযরত আবুদ্দারদা (রা) বলেন : "কিয়ামতের দিন মর্যাদার দিক দিয়ে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি বলে সাব্যস্ত হবে সেই আলিম, যার ইলমের দ্বারা কোন কল্যাণ সাধিত হয় না।"[৫]

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন : "বিদ্যা দু'প্রকার। একটি হলো হৃদয়ের বিদ্যা, এটাই উপকারী বিদ্যা। আর অপরটি মৌখিক বিদ্যা, এটা হচ্ছে মানব জাতির জন্য আল্লাহ্‌র দলীল।"[৬]

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আমর (রা) বলেন, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন :

"বিদ্যা তিন প্রকার। এক : আয়াতে মুহকামাহ অর্থাৎ কুর'আনের সুস্পষ্ট বিধানবলী। দুই : সুন্নাতে কায়েমাহ অর্থাৎ সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত সুন্নাত। তিন : ফরীযায়ে আদিলাহ অর্থাৎ কুর'আন ও হাদীসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বিষয়াদি। এছাড়া আর যা কিছু তা অতিরিক্ত।"[৭]

যে 'ইল্‌মের দ্বারা দীন ও সমাজের কল্যাণ হয়, তাই প্রকৃত ইল্‌ম, আর যে আলিম তার ইল্‌ম মোতাবেক আমল করে, তিনি হলেন প্রকৃত আলিম।

---

১. তদেব, পৃ. ৯৮।

২. দারেমী, *সুনান*, ১ম খ., ভূমিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০।

৩. তদেব, পৃ. ১১২।

৪. তিরমিযী, *জামিউত তিরমিযী*, ২য় খ., আবওয়াবুল ইলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪; মুফতী ফয়জুল্লাহ্, *ফয়জুল কালাম* (চিটাগাং: কুতুবখানায়ে ফয়জিয়া হাটহাজারী, ১৩৯৯ হি.) পৃ. ১৬২।

৫. দারেমী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।

৬. তদেব, পৃ. ১১৪।

৭. আবূ দাউদ, *সুনান*, ৩য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেছেন : "যে ইলমের দ্বারা কোন কল্যাণ সাধিত হয় না তার দৃষ্টান্ত হলো ঐ ধনভাণ্ডার যা থেকে আল্লাহ্‌র পথে কিছুই খরচ হয় না।"[১] হযরত সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, হযরত উমর (রা) হযরত কা'ব আহবার (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন : "প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী আলিম কারা? উত্তরে তিনি বললেন, যারা নিজেদের ইল্‌ম মোতাবেক আমল করেন। হযরত উমর (রা) আরও জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ জিনিস আলিমদের দিল হতে জ্ঞান বের করে দেয়? উত্তরে তিনি বললেন, লোভ-লালসা।"[২] আহওয়াস ইব্‌নে হাকীমের পিতা বলেন : "এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন যে, সবচেয়ে খারাপ মানুষ কে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমরা আমাকে খারাপ লোক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না, বরং ভাল লোক সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর। এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর তিনি বললেন, আলিমদের মধ্যে যারা খারাপ তারাই হলো সবচেয়ে খারাপ মানুষ। আর আলিমদের মধ্যে যারা ভালা, তারাই সবচেয়ে ভালা মানুষ।"[৩]

রাসূলুল্লাহ্ (সা) শিক্ষা করা ও অপরকে শিক্ষা দানের প্রতি সমান গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আমিও মরণশীল। এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া থেকে আমাকেও একদিন বিদায় নিতে হবে। তোমরাও সকলেই মরণশীল। সুতরাং তোমরা বিদ্যা শিক্ষা কর এবং অপরকেও শিক্ষা দান কর। কেননা একমাত্র এ প্রক্রিয়াতেই বিদ্যা শিক্ষা কিয়ামত পর্যন্ত চালু রাখা সম্ভব। সাথে সাথে তিনি কোথা হতে, কার কাছে থেকে এবং কী কী বিষয় শিক্ষা করতে হবে সে সম্পর্কেও সুস্পষ্ট নির্দেশ দান করেছেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন : "তোমরা ফরয আমল ও কুর'আন শিক্ষা কর এবং অপর লোকদেরকে তা শিক্ষা দাও। কেননা আমি মরণশীল।"[৪] হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রা) বলেন, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন : "তোমরা বিদ্যা শিক্ষা কর এবং মানুষকে তা শিক্ষা দাও; তোমরা অবশ্য করণীয় ফরয কাজ ও বিষয়গুলো শিক্ষা কর এবং মানুষকে তা শিক্ষা দাও। আর তোমরা কুর'আন শিক্ষা কর ও মানুষকে তা শিক্ষা দাও। কেননা, আমি তো মরণশীল। আমার পর শীঘ্রই ইল্‌ম বিলীন হতে থাকবে এবং তখন ফিতনা-ফাসাদও প্রকাশ পাবে।"[৫]

হযরত উসমান (রা) বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেছেন : "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে, কুর'আন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।"[৬] হযরত ইব্‌ন সিরীন (র) বলেন :

"প্রকৃতপক্ষে ইল্‌মই হলো দীন। অতএব তোমরা লক্ষ্য রাখবে যে, কার নিকট হতে দীন গ্রহণ করতেছ।[৭] হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন : "জ্ঞানপূর্ণ কথা জ্ঞানীর হারানো ধনস্বরূপ। অতএব, সে যেখানেই এটা পাবে, তা গ্রহণ করার জন্য তার পূর্ণ অধিকার রয়েছে।"[৮] হযরত ইবনে মাসঊদ (রা) বলেন, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন : "দুই ব্যক্তি ছাড়া আর কারও প্রতি হিংসা করা সঙ্গত নয়। একজন সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং তা সত্য পথে খরচ করার জন্য তাকে তওফীক দিয়েছেন। আর

---

১. দারেমী, *সুনান*, ১ম খ., ভূমিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮।
২. তদেব, পৃ. ১৫২।
৩. তদেব, পৃ. ১১৬।
৪. তিরমিযী, *জামিউত তিরমিযী*, ২য় খ., আবওয়াবুল ফারায়িয, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।
৫. দারা কুতনী, *সুনান*, ৪র্থ খ. (বৈরুত: দারুল মা'রিফা, ১৯৯৬ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৮১।
৬. বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, ২য় খ., কিতাবু ফাযাইলিল কুরআন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫২।
৭. মুসলিম, *সহীহ্ মুসলিম*, ১ম খ. (বৈরুত: দারু ইহইয়াউত্ তুরাসিল আরাবী, তা. বি.), পৃ. ১৪।
৮. তিরমিযী, *জামিউত তিরমিযী*, ২য় খ., আওয়াবুল ইলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

অপরজন সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্ দীন সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছেন ,সে তদানুযায়ী বিচার-আচার করে এবং লোকদেরকে তা শিক্ষা দেয়।"[১]

নবী করীম (সা) শিক্ষা প্রচারের জন্য জোর তাকীদ দিয়েছেন। কেননা, অনেক সময় এরূপ দেখা যায় যে, যার কাছে শিক্ষণীয় বিষয় প্রচার করা হয়, সে ব্যক্তি প্রচারকের চেয়ে অধিকতর গুরুত্বের সাথে তা সংরক্ষণ করে থাকে।হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) বলেন, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন : "তোমরা আমার পক্ষ হতে একটি আয়াত হলেও অপরের কাছে তা পৌঁছে দাও।"[২] হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন : "আল্লাহ্ তা'আলা সেই ব্যক্তির মুখ সজীব ও উজ্জ্বল করেন, যে আমাদের নিকট হতে কোন কিছু শুনলো এবং যেভাবে শুনলো ঠিক সেভাবেই তা অন্য লোকের কাছে পৌঁছে দিল। কেননা, অনেক ক্ষেত্রেই প্রথম শ্রোতার চেয়ে পরে যার কাছে তা পৌঁছান হয়, সে-ই এর বেশি সংরক্ষণকারী হয়ে থাকে।"[৩] হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন :

"কোন ব্যক্তি এমন কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হল যা সে জানে, কিন্তু সে তা গোপন করলো। কিয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেয়া হবে।"[৪] হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন :"কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার ইল্‌ম ও নেক আমল হতে যা কিছু তার নিকট পৌঁছায় তার মধ্যে একটি হলো ঐ ইল্‌ম যা সে শিক্ষা করেছিল এবং অপরের কাছে তা প্রচার করেছিল।"[৫]

শিক্ষাদান কালে সর্বপ্রথম শিক্ষার্থীর মেধা ও বোধশক্তির প্রতি লক্ষ্য রেখে তার সামনে শিক্ষণীয় বিষয় যথাসম্ভব সহজ-সরল ভাষায় উপস্থাপন করতে হবে। যার বোঝার ক্ষমতা নেই, এরূপ অনুপযুক্ত ব্যক্তির কাছে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পেশ করা উচিত নয়। শিক্ষার্থীর নিকট প্রত্যেকটি বিষয় তিনবার করে পুনরাবৃত্তি করবে। তাহলে তার পক্ষে তা হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হবে। প্রতি সপ্তাহে তিনবারের বেশী শিক্ষাদান করা বাঞ্ছনীয় নয়। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিরক্তি সৃষ্টি হতে পারে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন : "তোমরা শিক্ষাদান কর এবং এতে সহজ পন্থা অবলম্বন কর। এ কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন।"[৬] হযরত আনাস (রা) বলেন : "নবী করীম (সা) যখন কোন কথা বলতেন, তিনি তা তিনবার করে পুণরাবৃত্তি করতেন, যাতে তাঁর কথা ভালভাবে বোঝা যেত।"[৭] হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন : "যে ব্যক্তি কোন অনুপযুক্ত লোকের কাছে ইল্‌ম উপস্থাপন করে, সে যেন শূকুরের গলায় মণিমুক্তা এবং স্বর্ণের মালা ঝুলায়।"[৮]

---

[১] *বুখারী সহীহ*, ১ম খ., কিতাবুল ইল্‌ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।
[২] বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, ৩য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭৫।
[৩] তিরমিযী, *জামিউত তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।
[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩।
[৫] বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, ৩য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮।
[৬] ইমাম বুখারী, *আল আদাবুল মুফরাদ*, ৩য় খ. (বৈরুতঃ দারুল বাশায়েরিল ইসলামিয়া, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৯ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৪৪৭।
[৭] বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, ১ম খ., কিতাবুল ইল্‌ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।
[৮] ইবনে মাজাহ, *সুনান*, ১ম খ., কিতাবুল ইল্‌ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আ'মাশ (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন : "ইল্‌মের আপদ হলো ভুলে যাওয়া, আর অনুপযুক্ত ব্যক্তির কাছে ইল্‌মের কথা বলা হচ্ছে ইল্‌ম ধ্বংস করা।"[১] হযরত ইকরামা (রা) বলেন, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন : "লোকদেরকে সপ্তাহে একবার নসীহত কর। এতে তৃপ্ত না হলে দু'বার কর। যদি আরও বেশী করতে চাও, তাহলে তিনবার পর্যন্ত করতে পার। সাবধান, এ কুরআনের দ্বারা লোকদেরকে বিরক্ত করো না।" কুর'আন সকলকেই আদেশ করছে পড়তে, আবৃত্তি করতে, চিন্তা করতে, অনুধাবন করতে, এমনকি বিশ্ব প্রকৃতির মাঝে লুক্কায়িত বিভিন্ন নিদর্শন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে। এ দর্শন স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকেই জ্ঞানার্জনের প্রতি অনুপ্রাণিত করেছে। সুতরাং জ্ঞানার্জন শুধুমাত্র পুরুষের জন্য সীমাবদ্ধ করা হয়নি, পুরুষের মত নারীকেও জ্ঞানার্জনের পূর্ণ অধিকার দেয়া হয়েছে। আর এজন্যেই শরী'আত জ্ঞানার্জনের জন্য নারীকেও সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে বলেছে, যাতে তারা নিজেরাও উপকৃত হতে পারে এবং সমাজেরও উপকার করতে সক্ষম হয়। ইসলামের প্রথম যুগে শিক্ষার যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তাতে নারী শিক্ষারও ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। বহু মুসলিম নারী আলিম, কবি, লেখিকা এবং শিক্ষিকা হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ইসলামে পার্থিব শিক্ষা লাভের জন্য নারীকে শুধু অনুমতিই দেয়া হয় নি; বরং পুরুষের শিক্ষা-দীক্ষা যেমন প্রয়োজন মনে করা হয়েছে, নারীদের শিক্ষা-দীক্ষাও তদ্রূপ মনে করা হয়েছে। হযরত আয়েশা (রা) এবং অন্যান্য উচ্চ শিক্ষিতা মহিলারা শুধু নারীদের নয়, পুরুষদেরও শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। সাহাবী, তাবে'য়ী এবং প্রসিদ্ধ পণ্ডিত তাঁদের নিকট হাদীস, তাফসীর ও ফিক্‌হ শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন। অতএব, শিক্ষা ক্ষেত্রে ইসলাম নারী-পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য করে নি। উভয়ের অধিকার সমান।[২] ইসলামে ধর্মীয় ও পার্থিব শিক্ষা লাভ করার জন্য নারীকে শুধু অনুমতিই দেয়নি; বরং পুরুষের পাশাপাশি নারীদের শিক্ষা-দীক্ষার গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। নবী করীম (সা) হতে নারী পুরুষগণ দ্বীনি ও নৈতিক শিক্ষা লাভ করতেন, নির্ধারিত সময়ে তারা নবী (সা) এর নিকট হতে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হতেন। নবী (সা) এর সহধর্মিণীগণ, বিশেষ করে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) শুধু নারীদের নয় পুরুষদেরও শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। তাঁর নিকট হতে বড় বড় সাহাবী ও তাবে'য়ীগণ হাদীস তাফসীর ও ফিক্‌হ শিক্ষা করতেন। সম্ভ্রান্ত লোকদের তো কথাই নেই, দাস-দাসীদের পর্যন্ত শিক্ষা দান করার জন্য নবী করীম (সা) আদেশ করেছেন। অতএব, মূল শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর প্রকৃত শিক্ষা এই যে, তাদ্দ্বারা তাকে আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ মাতা এবং আদর্শ গৃহিনীরূপে গড়ে তোলা যেহেতু তার প্রধান কর্মক্ষেত্র গৃহ, সেহেতু তাকে এমন শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন যা এই ক্ষেত্রে তাকে অধিকতর উপযোগী করে তুলতে পারে। এছাড়া তার জন্য ঐ সকল বিদ্যা-শিক্ষারও প্রয়োজন যা মানুষকে প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে তুলতে, তার চরিত্র গঠন করতে এবং তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রশস্ত করতে পারে। এই ধরনের শিক্ষা-দীক্ষা প্রত্যেক নারীর জন্য অপরিহার্য। এরপর কোন নারী যদি অসাধারণ প্রজ্ঞা ও মানসিক যোগ্যতার অধিকারিণী হয় এবং এ সকল মৌলিক শিক্ষা-দীক্ষার পরও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে চায়, ইসলামী শিক্ষা-দর্শন তার পথে প্রতিবন্ধক নয়। তবে শর্ত এই যে, কোন অবস্থায়ই সে

---

[১] দারিমী, *সুনান*, ১ম খ., ভূমিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮।

[২] অধ্যক্ষ মুহাম্মদ শামসুল হুদা, *নারীর অধিকার ও মর্যাদা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩-৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

শরী'আতে নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করা যাবে না। শরী'আতের গণ্ডির মধ্যে থেকে তাকে উচ্চ শিক্ষালাভের ব্রতী হতে হবে।[১]

ইসলাম যেভাবে পুরুষের উপর শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জন ফরয করে দিয়েছে, ঠিক তেমনি এটা ফরয করে দিয়েছে নারীদের উপর। নবী করীম (সা) আলিমদেরকে তাঁর উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করেছেনে। এ ঘোষণায় তিনি পুরুষ বা মহিলা কাউকেও বিশেষভাবে চিহ্নিত করেন নি। তিনি জ্ঞানার্জনে উৎসাহিত করতে গিয়ে করা কোথাও নর ও নারীর মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি। নবী করীম (সা) এর ঐ বাণী সূচক অনুপ্রেরণা সে যুগে এমনি নজিরবিহীন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, যে যুগে পৃথিবীর কোথাও নারীর কোন রকম ইয্যত-সম্মান ছিল না, তথাকথিত উন্নত জাতির লোকেরাও নারীদেরকে মানবের স্তর হতে বহিষ্কার করে জীব-জন্তুর স্তরে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। তিনি নারীদেরকেও সঠিক মানবতা ও মর্যাদার উঁচু চূড়ায় পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। ইসলাম পূর্ব যুগে ক্রীতদাস-দাসীদের মান-ইয্যত বলতে কিছুই ছিল না। কিন্তু ইসলামের শিক্ষার মাধ্যমে তারাও এত উচ্চ আসনে আসীন হয়েছেন যে, অনেক সম্মানিত ব্যক্তিরাও তাঁদের নিকট হতে দ্বীনী শিক্ষা গ্রহণে মুখাপেক্ষী হয়েছেন। ইসলামের শিক্ষার আলোকে পুরুষদের মধ্য হতে যেমনি হযরত আবূ বকর, হযরত উমার, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত ইব্ন আব্বাস, হযরত ইব্নে মাসউদ, হযরত ইব্নে উমার (রা) এবং হাসান বসরী, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম রাযী, ইমাম গায্যালী (র)-এর মত মহাপুরুষগণের আবির্ভাব ঘটেছিল, ঠিক তেমনি হযরত আয়েশা, হযরত হাফসা, হযরত শিফা বিন্তে আবদুল্লাহ্, হযরত কারীমা বিন্তে মিকদাদ, হযরত উম্মে কুলসুম (রা) এবং হযরত রাবে'য়া বসরী (র)-এর মত মহিয়ষী নারীও আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। মোটকথা ইসলামের নির্ধারিত সীমা ও গণ্ডির মধ্যে অবস্থান করেই সে যুগের মহিলাগণ আত্মসংশোধন এবং জাতির খিদমতের উদ্দেশ্যে দীনী-শিক্ষা লাভ করতেন এবং নিজ সন্তানদেরকে এমন আদর্শবান করে গড়ে তুলতেন, যাতে তাঁরা নিজেদের যুগের পথিকৃৎরূপে জাতির মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন।[২] শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করার জন্য নারী জাতিকে রাসূলে করীম (সা) বহু হাদীসে তাকীদ দিয়েছেন। বুখারী শরীফে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন : "যার নিকট কোন দাসী আসে এবং সে তাকে শিক্ষা দান করে, ভালভাবে সুশিক্ষার ব্যবস্থা করে, ভদ্রতা ও শালীনতা শিক্ষা দেয়, এবং এটা খুব সুন্দররূপে আঞ্জাম দেয় অতঃপর তাকে মুক্ত করে এবং বিয়ে করে স্ত্রীর পূর্ণ মর্যাদা দান করে, তার জন্যে রয়েছে দ্বিগুণ প্রতিদান।" পুরুষ সাহাবী এর পাশাপাশি মহিলা সাহাবীগণও নিঃসংকোচে ফিক্হ ফীদ্দীন অর্জন করতেন। সুতরাং সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যেমন পুরুষ মুফ্তী ছিলেন, তেমনি ছিলেন মহিলা মুফ্তী। হযরত উমর, হযরত আলী, হয়রত যায়েদ ইব্নে সাবিত, হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্নে মাসউদ, হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্নে আব্বাস, হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্নে উমর (রা) প্রমুখ পুরুষ সাহাবীদের ন্যায় হযরত আয়েশা সিদ্দীকা, হযরত উম্মে সালামা, হযরত হাফসা (রা) প্রমুখ মহিলা সাহাবীগণও ফতোয়ার গুরুদায়িত্ব পালন করতেন। মর্যাদাসম্পন্ন বহু পুরুষ সাহাবী তাঁদের নিকট ফতোয়া জিজ্ঞেস করতেন এবং তাঁদের ফতোয়া মেনে নিতেন। তিরমিযী শরীফে হযরত আবূ মূসা (রা)-এর সূত্রে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, "আমাদের মাঝে যখনই কোন হাদীসের বিষয় নিয়ে সমস্যা

---

১. সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী, *পর্দা ও ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪-৭৫।

২. মাওলানা আমীরুল ইসলাম ফরদাবাদী, *নবী (সা)-এর পারিবারিক জীবন ও নারী স্বাধীনতা* (নারায়ণগঞ্জ: ফরদাবাদী মহল, ১৯৯৫ খৃস্টাব্দ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯-৮১।

Dhaka University Institutional Repository

দেখা দিত, আমরা তখনই হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলে তার সমাধান পেয়ে যেতাম।"[১]

জ্ঞান আলো; আর অজ্ঞতা অন্ধকার। জ্ঞানের আলো মানুষের হৃদয় হতে অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করে সত্যের আলোকে আলোকিত করে। জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ হালাল ও হারাম, সত্য ও মিথ্যা, ন্যায় ও অন্যায় এবং ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। জ্ঞানের কারণেই মানুষ আল্লাহ্‌র খলীফা এবং নিখিল সৃষ্টি তার অধীন। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করে তাঁকে সমগ্র সৃষ্টি রাজ্যের সবকিছু সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান দান করেছিলেন। তাঁর হৃদয়ের মধ্যে এই মৌলিক জ্ঞানের বীজ রোপণ করেছিলেন। সুতরাং সর্বকালের সকল আদম সন্তানই বংশানুক্রমে তাদের আদি পিতা আদম (আ)-এর হৃদয়ে রোপিত মৌলিক জ্ঞান উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে থাকে। এই মৌলিক জ্ঞানই বিকশিত হয় বিদ্যা ও শিক্ষার মাধ্যমে। এর বিকল্প আর কোন উপায় নেই। কাজেই নর-নারী নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্যই বিদ্যাশিক্ষা করা ফরয, জ্ঞান অর্জন করা অপরিহার্য। বিদ্যাশিক্ষার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হলো মানবাত্মার মধ্যে সুপ্ত ও লুক্কায়িত মৌলিক জ্ঞানকে বিকশিত করা। ইসলাম নারী জাতিকে জ্ঞানার্জনের জন্য শুধু সুযোগই দেয় নি বরং ফরয করে দিয়েছে। ইমাম বুখারী (র) তাঁর সহীহ্ বুখারী গ্রন্থে মহিলা শিক্ষা সম্পর্কে পৃথক একটি শিরোনামও দিয়েছেন। যার বিশ্লেষণের দ্বারা নারী শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থারই গুরুত্ব বোঝা যায়। সাহাবা এবং তাবে'য়ীনের যুগেও বিকল্প পন্থায় মহিলাদের ইসলামী শিক্ষার প্রচলন ছিল। সে যুগে মহিলাদের মধ্যে বড় বড় বিদূষী, বিজ্ঞানী এবং হাদীসবেত্তা বিদ্যমান ছিলেন। হযরত আয়েশা, হযরত আসমা, হযরত উম্মে দারদা, হযরত ফাতেমা বিন্‌তে কায়েস (রা) প্রমুখ মহিলা সাহাবীগণের 'ইলমী যোগ্যতা ও ইসলামী আইন বিদ্যা সম্পর্কে তাবাকাতে ইব্‌নে সা'দ এবং মুসনাদে আহমদে বিবরণ রয়েছে। হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট হতে অনেক সাহাবী ও তাবে'য়ী দীনের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ করতেন। নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম যে নিজে কুর'আন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।" এ হাদীসে কুর'আনের 'ইল্‌ম শিক্ষা করার জন্য বলা হয়েছে। আর এ শিক্ষা পুরুষদের ন্যায় মহিলাদের জন্য সমভাবে প্রয়োজনীয়। শুধু নামায-রোযার আহকাম, কুর'আন তিলাওয়াত সামান্য তাসবীহ-তাহলীল জানলেই ইসলামী জ্ঞানার্জন হয় না, বরং ইসলামী আকাইদ ইবাদত ব্যবহারিক জীবন ও সামাজিক জীবনের বিধি-বিধানের 'ইল্‌ম অর্জন করা এবং অপর মুসলমানকে শরী'আতের অনুসরণে সংশোধন করা পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্যই জরুরী। দ্বীনের শিক্ষা ছাড়া বিধি-বিধানের সংস্কার সম্ভব নয়। হযরত অমিয়া বাগদাদী নাম্নী জনৈকা মহিলা মদীনাতে ইমাম মালিক (র) এর নিকট 'ইল্‌মে হাদীস এবং ইমাম শাফে'য়ী (র) এর নিকট 'ইল্‌মে ফিক্‌হ শিক্ষা লাভ করেন। এমনিভাবে ইসলামের প্রথম যুগে মহিলারা হাদীস, তাফসীর, ফিকহ্ ও তাসাউফের বিশদ জ্ঞান অর্জন করে দ্বীনের প্রচারণার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। আর এ শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রচারণা পর্দাহীনভাবে হয় নি। বরং পর্দার মাধ্যমেই হয়েছে। "মাদখাল" নামক কিতাবে বর্ণিত আছে যে, অতীতে মুসলিম মনীষীদের পত্নীগণ ইসলাম শরী'আতের বিষয়াদি লিখে মহিলাদের নিকট ব্যাপকভাবে শিক্ষাদানের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। যার ফালে তাঁদেরই গর্ভে বড় বড় উলামা, আউলিয়া ও ইমামের জন্ম হয়। যাদের দৃষ্টান্ত বর্তমান বিশ্বে দুর্লভ। পুরুষদের শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে যে সকল সুযোগ-সুবিধা আছে পর্দাজনিত কারণে

---

১. মাওলানা নো'মান আহমদ, *ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার*, (ঢাকা: শিবলী প্রকাশনী, ১৯৯৬ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

মহিলাদের ক্ষেত্রে তা নেই। স্বাভাবিকভাবেই তাদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সীমিত। কাজেই পুরুষদের মত মহিলাদেরও বিকল্প শিক্ষা পদ্ধতি থাকা দরকার। মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র) বলেন : "এ সকল ফিতনা বা অসুবিধার জন্য শিক্ষা দায়ী নয়, বরং শিক্ষা পদ্ধতি অথবা পাঠ্যক্রম কিংবা ক্রটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা একমাত্র দায়ী।" সুতরাং বর্তমানে প্রচলিত ইসলাম বিরোধী তথা মানবতা বিরোধী সহশিক্ষার বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে মুসলিম মহিলা শিক্ষার ব্যবস্থা ব্যাপক করা এবং মহিলাদের চরিত্র গঠনসহকারে শরীয়তের নীতি অনুসারে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র মুসলিম মহিলা বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালানো একান্ত দরকার।[১]

সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শালীনতার সমস্যা

বাংলাদেশে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হওয়ার সময় থেকেই সহশিক্ষা রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহশিক্ষার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্য সকল বিশ্ববিদ্যালয়েও একই অবস্থা। কলেজ ও স্কুল পর্যায়ে অবস্থা কিছুটা ভিন্ন। অধিকাংশ স্কুল-কলেজে সহশিক্ষা চালু থাকলেও ছাত্রীদের জন্য আলাদা স্কুল ও কলেজ খুবই কম। তবে যেখানে মেয়েদের পৃথক স্কুল ও কলেজ নেই সেখানে সহশিক্ষার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত স্কুল ও কলেজগুলোই তাদের ভরসা। মাদ্‌রাসাগুলোতে সহশিক্ষা নেই বললেই চলে। পূর্বে মেয়েদের জন্য মাদ্‌রাসা না থাকলেও বর্তমানে মেয়েদের জন্য মাদ্‌রাসা হচ্ছে। যেখানে মেয়েদের মাদ্‌রাসা নেই সেখানে কিছু কিছু মাদ্‌রাসায় বিশেষ ব্যবস্থায় ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের পড়ার সুযোগ রয়েছে।

অতীতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীরা সংখ্যায় কম ছিল বিধায় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে গভীর মেলামেশা (Free mixing) করার সুযোগ ছিল না বললেই চলে। এর ফলে তেমন কোন সমস্যাও পূর্বে দেখা দেয় নি। বর্তমানে ছাত্রী সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় ও বিশ্বায়নের যুগে অপসংস্কৃতির মাধ্যমে পরিবেশের উপর প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলো সহশিক্ষার উপর ভিত্তিশীল মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের মেলামেশা বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেই একত্রে বসে পর্দাহীনভাবে গল্প করতে দেখা যায় যেখানে সব ধরনের হাসিঠাট্টা চলে। কিছু ছাত্র-ছাত্রী আরো এগিয়ে যায়। হাত ধরাধরি করে চলে, একত্রে রিকসায় চড়ে। এর কোনটিই ইসলাম অনুমোদিত নয়।

এতে নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে, এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবৈধ সম্পর্কে পৌঁছে যাচ্ছে। এ সম্পর্কে বাংলাদেশ অবজারভার পত্রিকায় ডাঃ সাবরিনা কিউ রশীদ লিখেন- "পূর্বে কখনো আমরা ডাক্তাররা এত অধিক সংখ্যক অবিবাহিত অল্পবয়স্কা (inteens) মেয়েকে গর্ভবতী হতে দেখি নি।" তিনি এ মন্তব্য সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেয়েদের সম্পর্কে করেন। ডাঃ সাবরিনা রশীদ তাঁর প্রবন্ধে বলেন, যে ছাত্র-ছাত্রীদের পারস্পরিক কথাবার্তা শেষ পর্যন্ত সৎ (innocent) থাকে না। এগুলো পরবর্তীতে স্পর্শ পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এ বয়সের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যৌন হরমোনের নিঃসরণ হওয়ায় যে কোন স্পর্শ শরীর ও মনে আগুন ধরিয়ে দেয়। এটি ছেলেদের ক্ষেত্রে বেশি ঘটে। কেননা মেয়েরা একটু ঠাণ্ডা (Cool) হলেও ছেলেরা অনেক বেশি আবেগপ্রবণ। সুতরাং মেয়েরা ছেলেদের বন্ধু হিসেবে নিতে চাইলেও ছেলেরা তার চেয়ে অনেক বেশি ভাবে। সেজন্য উক্ত লেখিকা সহশিক্ষার উপর ভিত্তিশীল প্রতিষ্ঠানের মেয়েদের ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা না করতে বলেছেন এবং

---

[১]. মাওলানা আতাউর রহমান কাসেমী, *উৎকৃষ্ট নারী জীবন ও পর্দাতত্ত্ব* (ঢাকা: আজিজিয়া কুতুবখানা, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪১৩ হি.), পৃ. ৩৪-৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

নিরাপদ দূরত্ব (Safe distance) বজায় রেখে চলতে বলেছেন। তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ যুক্তিযুক্ত। সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেলেমেয়েদের সম্পর্ক হাসিঠাট্টার (informal) হওয়া উচিত নয়। তাদের সম্পর্ক অত্যন্ত সতর্ক এবং ফর্মাল ধরনের হওয়া উচিত। একটি অফিসে গেলে অথবা অন্যস্থানে গেলে যেভাবে লোকজনের সাথে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে কথা বলা হয়, ব্যবহার করা হয়, এটাই হচ্ছে ফর্মাল (Formal) ধরনের ব্যবহার। ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়ার প্রয়োজনেও শিক্ষকদের সঙ্গে বা ছাত্রীরা ছাত্রীদের ভাল ক্লাসমেটদের সঙ্গে এবং ছাত্ররা তাদের ভাল ক্লাসমেটদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে এটাই স্বাভাবিক। অন্যরকম হলে শেষ পর্যন্ত (কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া) পরিস্থিতি ঐদিক চলে যেতে পারে যা ইসলাম অনুমোদন করে না। প্রাইভেট বা টিউশনির ক্ষেত্রেও একই সতর্কতা প্রয়োজন। কিশোরী মেয়েদের যুবকদের কাছে একা নিভৃতে পড়া বা পড়তে দেয়া সঙ্গত নয়। কিশোরীদের ছাত্রীদের কাছেই পড়া উচিত। এ বিষয়ে অবশ্য অনেক চিন্তাশীল লোক অন্যরকম সমাধানের কথা ভাবেন। তারা মনে করেন যে, উচ্চ পর্যায়ে সহশিক্ষা তুলে দিয়ে মেয়েদের জন্য আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় বা আলাদা ক্যাম্পাস করাই ভাল। অবশ্যই এ ধরনের পদক্ষেপ নেয়া সময়ের ব্যাপার। এ সব সহজে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। তবে কয়েকটি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় বা মেডিক্যাল কলেজ তো অবশ্যই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। মালয়েশিয়া ও পাকিস্তানের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্য সহশিক্ষাই বহাল রেখেছে। কিন্তু তারা সুন্দর পোশাক বিধি (dress code) এবং অন্যান্য নির্দেশাবলী চালু করেছে যা পরিস্থিতিকে শালীন রাখে। বাংলাদেশে এ ধরনের দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া বর্তমান পরিস্থিতিতে সম্ভব না হতে পারে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছেলেমেয়েদের সে পথই অবলম্বন করা উচিত যা ডাঃ সাবরিনা রশীদ সুপারিশ করেছেন। আমরা দেশের সরকার, সকল শিক্ষাবিদ, সমাজতত্ত্ববিদ, ইসলামী চিন্তাবিদ, অন্যান্য ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এবং নৈতিকতায় বিশ্বাসী ছাত্র-ছাত্রীদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছি।[১]

আধুনিক নারীবাদ ও ইসলাম

আধুনিক নারীবাদ ইসলামে কোন নতুন বিষয় নয়। নারীর আধুনিকায়ন, মর্যাদা, সম্মান, অধিকার সকল কল্যাণই ইসলামের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। এর বাস্তবতা বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারী অবস্থা আলোচনা করতে গিয়ে আমরা প্রমাণ পেয়েছি। তার কতিপয় নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হলো-

উইমিন্‌স্ স্টাডিজের পথিকৃৎ ইসলাম। বহু পতন, অভ্যুদয়, বন্ধুর পথ অতিক্রম করে নারী যে আজকের অবস্থায় এসে পৌঁছেছে তার পেছনে অবদান ইসলামের। বন্ধুর পথ অতিক্রম করতে মহিলাদের বিস্তর বাধা ও বিপত্তির মুখোমুখি হতে হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম বাঙালী মুসলমান নারীবাদী মহিয়সী বেগম রোকেয়া[২]। জাতি-ধর্ম

---

[১] 'সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শালীনতার সমস্যা' *দৈনিক ইনকিলাব* (ঢাকা: শুক্রবার, ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৯৯ খৃস্টাব্দ), পৃ. ১১।

[২] রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামের এক জমিদার পরিবারে ১৯৮০ সালে বেগম রোকেয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল জহির উদ্দীন মুহাম্মদ আবূ আলী সাবির। তিনি ছিলেন আরবী ও ফার্সি ভাষায় শিক্ষিত এক রক্ষণশীল মুসলিম। তাঁর মাতার নাম ছিল রাহাতুন্নেসা সাবেরা চৌধুরী। তাঁর পিতা নারী শিক্ষার ঘোর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ভাই ইব্রাহিম রোকেয়াকে শিক্ষিত করতে ব্রত ছিলেন। বড় বোন কারিমুন্নেসাও তাঁকে শিক্ষায় উৎসাহিত করেন। ১৮৯৮ সালে বেগম রোকেয়া ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট খান বাহাদুর সাখাওয়াত হোসেনের সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। স্বামীর প্রেরণায় তিনি সাহিত্য চর্চা ও শিক্ষা বিস্তারে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োগ করেন। নারী শিক্ষায় তিনি প্রভূত অবদান রাখেন। উনবিংশ শতাব্দীর যুগসন্ধিক্ষণের এক কঠিন সময়ে মুসলিম নারীদের অন্ধকার থেকে আলোর পথে আসার আহ্বাণ জানিয়ে তিনি নারী মুক্তির প্রথম দিশারী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর এ মহৎপ্রাণ ব্যক্তির তিরোধান ঘটে কলিকাতায়। (মোবারক কারিম, *এশিয়ায় সেরা নারী*

Dhaka University Institutional Repository

নির্বিশেষে এ দেশের আবালবৃদ্ধবণিতা তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। তাঁর নামে স্কুল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; সড়কের নামকরণ হয়েছে; প্রতি বছর তাঁর জন্মদিন শ্রদ্ধাভরে পালিত হয়। তিনি প্রথম মুসলিম বাঙালী নারী যিনি নারী-পুরুষে সমতা ঘোষণা করেন "সকলে সমস্বরে বল, আমরা মানুষ"[১] "সমান সুযোগ পাইলে আমরাও কি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিতাম না?"[২] "একবার জ্ঞানচর্চা করে দেখিত, এ অনুর্বর মস্তিষ্ক সুতীক্ষ্ণ হয় কি না।"[৩] তিনিই প্রথম নারী সমাজকে জাগরণের ডাক দিয়ে বলেছেন- "আমাদের অবস্থা আমরা চিন্তা না করলে আর কেউ আমাদের জন্য ভাববে না।"[৪] তিনি প্রথম জেণ্ডার কর্ম বিভাজনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন– "তাই বলিয়া জীবনটাকে রান্না ঘরেই সীমাবদ্ধ করা উচিত নয়",[৫] "যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব।"[৬] বেগম রোকেয়ার এ শিক্ষা ইসলামের শিক্ষা। তিনি ইসলামের সুমহান শিক্ষা গ্রহণ করেই এ আন্দোলনের ডাক দেন। নারীর মধ্যে শিক্ষার অভাবকে নারীর দুরবস্থার কারণবলে চিহ্নিত করা যায়। যথার্থ শিক্ষার মাধ্যমে নারী মুক্তি সম্ভব। মানবিক সম্ভাবনার পরিপূর্ণ স্ফূরণ ও বিচারবুদ্ধি এবং নৈতিক শক্তি বিকাশের সহায়ক শিক্ষা প্রদান করলে নারীর অসম্পূর্ণতা দূর হবে; নারী বিচারবুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ হবে। প্রকৃত শিক্ষা লাভ করে ভাবপ্রবণ পরাধীন নারী,স্বাধীন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন নারীতে রূপান্তরিত হবে এবং "অনুগত কন্যা" (observant daughters), "স্নেহময় ভগ্নী" (affectionate sisters), "প্রভুভক্ত স্ত্রী" (faithful wives) ও "যুক্তিপরায়ণ মাতা" (reasonable mothers) হিসেবে সঠিক ভূমিকা পালনে সমর্থ হবে।[৭] শিক্ষিত নারী গৃহের কাজ ও সন্তান পালনের দায়িত্ব সুচারু রুপে সম্পাদন করে সমাজের কল্যাণে অবদান রাখবে, এটি ইসলামের দাবী।

তবে আধুনিক নারীবাদের অন্যতম প্রবক্তা উদারনীতিতে বিশ্বাসী মেরী নারী-পুরুষের অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থার উপর জোর দিয়েছেন। বালক-বালিকাকে অভিন্ন শিক্ষা দিতে হবে। কারণ বিচারবুদ্ধি ও নৈতিক শক্তি বিকাশের জন্য নারী-পুরুষের তথা সকল মানব সন্তানের সমান সুযোগ অপরিহার্য যাতে তারা পরিপূর্ণ ব্যক্তিসত্তা অর্জন করতে পারে। মেরী নারীর ব্যক্তিসত্তা বিকাশের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছেন। নারী-পুরুষের "খেলনা, ঝুমঝুমি" (toy of man, his ratte) নয়; যখন পুরুষ চাইবে তখন বিচারবুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে নারী তার কানের কাছে ঝুন ঝুন রুন রুন বাজাবে (Must jingle in his ears whenever, dismissing reason, he chooses to be amused.) এ ধরনের প্রবণতা অনুমোদন করা যায় না। মেরী বলেন, নারী কেবল উদ্দেশ্য

(ঢাকা: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৯ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৩৮; ফোরকান বেগম, *নারীর প্রগতি ও ক্ষমতায়নে বেগম রোকেয়ার সংগ্রাম ও সাধনার বহুমাতৃকতা,* বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন স্মারকগ্রন্থ, সম্পাদক সেলিনা বাহার জামান, ১৯৯৮, পৃ. ১৫০-১৬২।)

১. মোবারক কারিম, *এশিয়ায় সেরা নারী* (ঢাকা: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৯ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৩৮; ফোরকান বেগম, *নারীর প্রগতি ও ক্ষমতায়নে বেগম রোকেয়ার সংগ্রাম ও সাধনার বহুমাতৃকতা,* বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন স্মারকগ্রন্থ, সম্পাদক সেলিনা বাহার জামান, ১৯৯৮, পৃ. ১৫০-১৬২।

২. মোবারক কারিম, *এশিয়ায় সেরা নারী* (ঢাকা: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৯ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৩৮।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

সাধনের নিমিত্ত (mere means) নয়; প্রত্যেক নারীর জীবনে নিজ নিজ উদ্দেশ্য আছে; নিজ নিজ স্বতন্ত্রতা (autonomy)-র মধ্যে তার মানবিক মর্যাদা নিহিত। একজন মানব সন্তানকে নিমিত্ত গণ্য করলে, সে মানুষ থাকে না, তার নিজস্ব অস্তিত্ব থাকে না; সে অপরের আনুষঙ্গিক (appendage) হয়ে পড়ে। স্বামী যদি স্ত্রীকে গৃহের সৌন্দর্যবর্ধক গুল্ম মনে করে, তবে ঐ স্ত্রী স্বামীর মনোতুষ্টির জন্য লালিত বস্তুতে পরিণত হয়। অপরপক্ষে, যে স্ত্রী নিজেকে গুল্ম হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেয়, মানব হিসেবে তার ব্যক্তিসত্তা লোপ পায়; নিজের বিকাশ এবং নিজেকে মহীরূহে পরিণত করার সম্ভাবনা কাজে লাগানোর পরিবর্তে সে তার স্বতন্ত্রতা বিসর্জন দিয়ে একটি প্রতিবন্ধি ক্ষীণজীবী লজ্জাবতী লতায় পর্যবসিত হয়। মেরী দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন যে, কোনো নারী কখনও নিজেকে এমন নির্যাতিত হতে দিতে পারে না এ হলো আধুনিক নারীবাদীদের দর্শন। নারীবাদীদের এ মত নিয়ে, মতবাদ নিয়ে চড়াই উৎড়াই করার কোন প্রয়োজনই ছিল না; যদি তারা ইসলামের বিধান অনুসরন করতেন। ইসলাম নারী উন্নয়নে যে পন্থা নির্দেশ করেছে ও যে ঐতিহ্য রেখে গিয়েছে তার তুলনা বিরল। ইসলাম নারীকে বিভিন্নভাবে সম্মানিত করেছে। পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ইসলাম তাকে সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ স্থান প্রদান করেছে। নারীর রাজনৈতিক অধিকার পবিত্র কুর'আন ও সুন্নাহ্-য় অলজ্ঘনীয় অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনায় এর সত্যতা পাওয়া যায়। রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে নারীর ঘরের বাইরে যাবার অধিকার, ভোট দেয়ার অধিকার ও নির্বাচিত হওয়ার অধিকার এবং রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হওয়ার অধিকার অন্তর্ভুক্ত। অনেক পণ্ডিত ও আইন বিশারদ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, নারীরা বিচারকের দায়িত্ব পালন ও রায় প্রদান করতে পারে।[১]

ইসলাম পূর্ব যুগ হলো জাহেলিয়াতের যুগ। ইসলাম পূর্ব আরবে নারীদের অবস্থা ছিল করুণ ও শোচনীয়। কন্যা সন্তান জন্মকে আরবেরা কুলক্ষণ ও অপমানজনক মনে করত। তাই নবজাত কন্যাকে জীবন্ত হত্যা ও প্রোথিত করার রীতি বহুলভাবে প্রচলিত ছিল।

তাদের এ রীতির প্রসঙ্গ তুলে ধরে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন :

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ۞ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

"যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল।"[২]

আরব সমাজের এই নিকৃষ্ট অপসংস্কৃতি মহান আল্লাহ্ এভাবে বর্ণনা করেছেন :

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۞ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

[১]. *ইসলামে নারী অধিকার ও ন্যায় বিচার*, প্রশিক্ষণ সহায়িকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস (ঢাকা: প্রকাশনায় এশিয়া ফাউন্ডেশন, অক্টোবর ২০১০ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৫৭।

[২]. আল কুর'আন, ৮১ : ৮-৯।

Dhaka University Institutional Repository

"তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ প্রদান করা হয়, তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সুসংবাদ প্রদান দেয়া হল তার লজ্জায় সে নিজের লোকদের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ায়; সে চিন্তা করে অপমান সহ্য করেও তাকে জীবিত রেখে দিবে, নাকি মাটির নিচে পুঁতে ফেলবে? জেনে রেখ, কত নিকৃষ্ট তাদের সিদ্ধান্ত।"[১]

কায়েস বিন আছেম নামক জৈনক ব্যক্তি জাহেলী যুগে স্বীয় ঔরসজাত আট-দশটি কন্যা সন্তানকে গোর(জীবন্ত কবর) দিয়েছিল।[২] খ্রীষ্টীয় রোমান সমাজে নারীদের অবস্থা এতই করুণ ছিল যে, সে সময় তারা নারীর মানবসত্তাকে স্বীকার করত না, বরং তারা নারীকে মানুষ ও প্রাণীর মাঝামাঝি কোনো বিশেষ প্রজাতি মনে করতো। সপ্তম শতাব্দীতে রোমের পাদ্রীগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, নারীর আত্মা নেই। সুতরাং তারা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।[৩]

৫৮৭ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে আলোচ্য বিষয় ছিল নারীকে কি মানুষ বলে বিবেচনা করা হবে নাকি অমানুষ বলা হবে। সম্মেলনে স্থির হয়, নারী মানুষ, তবে তার সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরুষের সেবা করা।[৪]

চীনা সভ্যতায় নারীকে Water of woe (দুঃখের প্রস্রবণ) বলা হতো নারীরা সর্ব নিকৃষ্ট প্রাণি হিসেবে বিবেচিত হত। ভারতীয় সমাজে নারীদের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয় ও করুণ। ভারতীয় সমাজে নারীদেরকে নৈতিক চরিত্র, পাপ এবং আধ্যাত্মিক ধ্বংসের মূল উৎস বলে বিবেচনা করা হতো। প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল সতীদাহ প্রথা। এছাড়া দেবদেবীর সন্তুষ্টি লাভের জন্য কৃষি ও ভালো ফসল ফলানোর উদ্দেশ্যে নারীদেরকে বলী দেয়া হতো।[৫]

বৌদ্ধ সমাজেও নারীর অবস্থা ছিল অত্যন্ত হীন। গৌতম বুদ্ধ স্বয়ং স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস জীবন যাপন করেন। তিনি নারীকে মানবাত্মার নির্বাণ লাভে বিঘ্ন মনে করতেন।[৬] ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মের তুলনায় একমাত্র ইসলামে নারীর অবস্থা অধিক উন্নত ছিল। [৭] হিন্দু সভ্যতায় নারী

---

১. আল কুর'আন, ১৬ : ৫৮-৫৯।
২. ইবনে কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আজীম*, ৪র্থ খ. (বৈরূতঃ দারুল ফিকর, তা. বি.) পৃ. ৪৭৭-৪৭৮।
৩. Dr. Jamal A. Badawi, *Status of Women in Islam,* IPCI, U.K., p. 5.
৪. ibid, p. 6.
৫. আব্দুল খালেক, *নারী* (ঢাকা: দীন পাবলিকেশন্স, ১৯৯৮ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৫।
৬. ড. মুস্তাফা আস সিবায়ী, *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী*, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৭ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৫।
৭. 'ইসলামপূর্ব কোন ধর্মে, সমাজে ও সভ্যতায় নারীদের কোনো সম্মান, মর্যাদা, নিরাপত্তা ও উত্তরাধিকার ছিল না। ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মে নারী স্বাধীনতা, মৌলিক অধিকার, নারীর জানমাল, ইজ্জতের নিরাপত্তা, মীরাছ, সামাজিক অধিকার, মতামত ব্যক্ত করার অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার ইত্যাদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। নারী কোথাও স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল না। ইসলামই প্রথম উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও স্বামীর সম্পত্তিতে নারীর মৌলিক অধিকার প্রদান এবং প্রাক-ইসলামী যুগের নারী-পুরুষের অবৈধ সম্পর্ককে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ইসলাম সভ্যতা এবং ধ্যানধারণা বিকাশের সাথে সাথে নারীর জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় এবং সমাজের প্রতিটি স্তরে তার প্রভাব বিস্তার লাভ করে। পরবর্তীকালে দেখা যায় যে, পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও সম্মুখ সমরে অংশগ্রহণ করেছেন (Philip K. Hitti, *History of The Arabs,* Saint Martin Press, (London: 1951), p. 28.

Dhaka University Institutional Repository

জন্মগতভাবেই একটি পাপিষ্ঠ সত্তা।[১] মনু'র মতে নারী জন্মগতভাবেই দুশ্চরিত্রা ও লম্পট।[২] বৌদ্ধ সভ্যতায় নারী সকল অসৎ প্রলোভনের ফাঁদ। মানুষের জন্য প্রলোভন যতগুলো ফাঁদ বিস্তার করে রেখেছে, তন্মধ্যে নারীরাই সর্বাপেক্ষা বিপদজনক। নারীর মধ্যে সকল মোহিনীশক্তি অঙ্গিভূত হয়ে আছে, যা সমস্ত বিশ্বের মনকে অন্ধ করে দেয়।[৩] ইয়াহুদী সভ্যতায় নারী একটি অভিশপ্ত জীব। পিতা বা স্বামীর সম্পত্তিতে তার অধিকার নেই। এমনকি মানবীয় মর্যাদাও নেই। ফলে বিবাহ ছিল তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। এজন্য রাষ্ট্র ও ধর্মের অনুমতির প্রয়োজন ছিল না।[৪] খৃষ্ট সভ্যতায় নারীরাই পৃথিবীর সকল অশুভ কার্যের উৎস।[৫]

গ্রীক সভ্যতার অন্যতম রূপকার সক্রেটিসের মতে নারী হল সকল ভাঙ্গন ও বিশৃঙ্খলার উৎস।[৬] রোম সভ্যতায় নারী কৃতদাসীর ন্যায়। তার কোনরূপ অধিকার স্বীকৃত ছিল না।[৭] ইউরোপীয় সভ্যতায় নারী 'শয়তানের অঙ্গ' (She is the organ of the devil)।[৮] জাহেলী আরবে নারীদের কোন মর্যাদা ছিল না। যুদ্ধ, মদ ও নারীই ছিল জাহেলী আরবদের প্রধান উপজীব্য।এভাবে বিশ্ব সভ্যতায় কোথাও নারীর যথাযথ উচ্চ অবস্থান প্রতিষ্ঠিত হয়নি।[৯] কেবলমাত্র ইসলামে নারীর সকল অধিকার ও মর্যাদা সংরক্ষণের উপাদান রয়েছে। নারী নির্যাতন বন্ধের পন্থা ও নারীকে পুরুষের সম-মর্যাদা দানের দিক নির্দেশনা।

বর্তমান প্রগতিশীল সমাজে নারী

প্রগতি [১০] ও নারী স্বাধীনতার দাবী পাশ্চাত্যজগতসহ পৃথিবীর অনেক দেশের নারীদের স্বাভাবিক জীবন-যাপনকে দূর্লভ করে দিয়েছে। মানসিক, আত্মিক, জাগতিক, শারীরিক, বেশ-ভূষায়, চাল-চলন ও কার্যক্ষেত্রে পুরুষের

---

১. আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ* (ঢাকা : দীনী পাবলিকেশন্স, ৯৩ মতিঝিল, দ্বিতীয় প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৪।

২. বিখ্যাত ঐতিহাসিক ওয়েস্টার মার্ক (Westermark) বলেন : Women are of all the snares which the tempter has spread for men, the most dangerous; in women are embodied all the powers of infatuation which build the mind of the world." (Syed Ameer Ali : *The spirit of Islam,* Calcutta : B.I. Publication, 1978, P. 30; Ramesh Chandra Mazumdar; *Idel and position of Indian Woman in domestic life,* Great women of India (ed) Swamei and Mazumdar, P. 19.)

৩. Nazhat Afza and Khurshid Ahmed, *The Position of Women in Islam,* Kuwait : Islamic Book Publishers, 1982, P. 12-13

৪. Report of the commission, *Marriage, Divorce and the Church* (London Print 1971), P. 80.

৫. *Bible : Gensis,* 3 : 16, New York 1973, P. 3.

৬. *Bible : Gensis,* 3 : 16, New York 1973, P. 3.

৭. আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, পৃ. ২।

৮. Said Abdullah Seif Al-Hatimy, *Women in Islam,* Islamic Publications Ltd. (Lahor, Pakistan, Oct. 1979), PP. 3-4.

৯. *মাসিক মদীনা*, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭ খৃস্টাব্দ, পৃ. ২৫; Fida Hussain Malik : *Wives of Prophet (SM),* Pakistan : Lahor Asharaf Publication, 1983, BC, PP. 12-15.

১০. কোন কিছুর প্রকৃত হীন অবস্থা থেকে উন্নয়ন সাধিত হয়ে গ্রহণযোগ্যতা ও মূল্যায়নই প্রগতি। উন্নয়ন সাধন প্রগতির মূল বিবেচ্য বিষয়। তবে সর্বদা পরিবর্তনশীল উন্নয়ন প্রগতি হলেও সকল পরিবর্তনের রূপরেখাই প্রগতি নয়। প্রগতির ধারণা, মর্মকথা মূলত নৈতিকতার পরিচায়ক। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন মানবীয় গুণের প্রয়াসে ইতিবাচক পরিবর্তনই প্রগতি। প্রগতি সভ্যতায় নারী জাতির উন্নয়নে এর জন্য 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' 'নারী মুক্তি আন্দোলন' 'নারী স্বাধীনতা' ইত্যাদি নামে ১৯৫৭ইং থেকে আন্দোলন চলে আসছে। (কহিনুর খাতুন কলি, *মিস রূপসি বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা*, (ঢাকা: মাসিক মদিনা, ৩৪ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, আগষ্ট ১৯৯৮ খৃস্টাব্দ), পৃ. ২৩)।

Dhaka University Institutional Repository

সমপর্যায়ে উপনীত হতে গিয়ে সমতা আদায়ের সকল দাবীই নারীর অনিবার্য ধ্বংস এবং নারীত্বের মর্যাদা বিদূরিত করে চরম দুর্দশা বয়ে এনেছে। এ প্রসঙ্গে ডরথি টমসন বলেন- "Woman put on precisely the same level as man has been dewomanised." পুরুষের সমপর্যায়ে অবস্থান করে নারী তার নারীত্ব হারিয়ে ফেলেছে।[১] প্রগতি সভ্যতা মানব জাতিকে নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে নিমজ্জিত করে। পাশ্চাত্যের যুবক-যুবতীদের অবৈধ যৌন সম্পর্ক এর বাস্তব প্রমাণ। এ মর্মে ড. মুহাম্মদ আব্দুর রউফ বলেন :

The so-called romantic love has become the major factor in making the choice of sponses these days in the west. The couple is first acquainted, then they date; the relaitionship blooms and grows steadily in warmth; then experimention is made with no restriction involving necking, foreplay and even love-making. After a period of verying length, the couple may decide to get married, often after the accident of conception.[২]

আজকাল পাশ্চাত্য জগতে পতি-পত্নী নির্বাচনে প্রেমের খেলাই প্রধান উপকরণ হয়ে পড়েছে। যুবক-যুবতীরা প্রথমে পরস্পর পরিচিত হয়। তারপর তারা মিলনের জন্য সময় ও স্থান নিরূপণ করে। সম্পর্ক পূর্ণতা লাভ করে এবং ক্রমশ উষ্ণতর হতে থাকে। অতঃপর অবাধ যাচাই-নিরীক্ষণ শুরু হয়। এতে তাকে প্রণয়ভরে গলাগলি, সম্ভোগের পূর্বে কামোদ্দীপক কার্যাবলী ও প্রণয়পাশে আবদ্ধ হওয়ার হওয়ার সুযোগ করে দেয়। এরূপে দীর্ঘকাল একত্রে বসবাস করার পর অপ্রত্যাশিতভাবে গর্ভসঞ্চার হয়ে পড়লে হয়ত এই যুবক-যুবতী বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেও পারে। প্রগতি সভ্যতায় নৈতিক অধঃপতনের ভয়াবহতা লক্ষ্য করে গভীর দুঃখের সাথে ড. এলেক্সিস ক্যারেল (Dr. Alexis Carrel) তাঁর Man the unknown গ্রন্থে যে বক্তব্য উপস্থাপন করেন তার ভাবার্থ হচ্ছে :

Moral sense is almost completely ignored by modern society. We lave, in fact, suppressed its manifestations. All are imbeded with irresponsibility. Those who disarm good and evil, those who are industrious and provident remain poor and are looked upon as bacward. The women who has several children, deovotes herself to their education instead of her won career, is considered weak-minded... Robbers enjoy prosperity in peace gangsters are protected by politicians and respected by judges... Homosexuality flourishes, sexual morals have been cast aside (and thus) despite the marvels of scientific civilization, human personality tends to dissolve.[৩]

---

১. নারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০।

২. Dr. Abdur Rouf, *Islamic view of Women and family.* Robert Speller and Sons publishers Inc (NewYourk: 10010, Second Edition 1979), PP. 53-54.

৩. Thomas j. Cottle : *The sexual revoulation and the young,* The New Yourk Time Magazine, (NewYourk: 10010 November, 26, 1972), PP.1-10.

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান সমাজে নৈতিক মূল্যবোধ প্রায় সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয়েছে। বস্তুত এর বহিঃপ্রকাশ সমাজে রুদ্ধ হয়ে গেছে। সকলেই দায়িত্ব জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। যারা ভাল-মন্দ পার্থক্য করে, যারা অধ্যবসায়ী ও বিচক্ষণ, তারা দরিদ্র অনুন্নত বলে পরিগণিত হয়। যে মহিলার কয়েকটি সন্তান আছে, সে যদি স্বীয় জীবনের সুখ-সম্ভোগ পরিত্যাগ করে তাদের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করে, তবে তাকে দুর্বলচিত্ত বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। দস্যুরা পরম শান্তিতে সম্পদ ভোগ করে চলছে।

রাজনীতিবিদগণ দুর্বৃত্তদেরকে প্রতিপালন করেন এবং বিচারক তাদেরকে সম্মান করেন। সমকাম জাঁকালোভাবে চলছে। যৌন সংক্রান্ত নৈতিক বিধি-বিধান বর্জিত হয়েছে। এরূপ বৈজ্ঞানিক সভ্যতার চাকচিক্য বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও মানবতার অবসান ঘটছে। নারী প্রগতির বদৌলতে পাশ্চাত্য জগতে বিবাহিত জীবন একেবারে দুর্লভ হয়ে পড়েছে। জারজ সন্তানের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফ্রান্সে প্রতি বছর সাতাত্তর হাজার জারজ সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে Diocesan Conference-এ উপস্থাপিত রিপোর্টে ইংল্যান্ড সম্পর্কে বলা হয় :

At lest in every eight children from England and Wales one is conceived outside wedlock, one hundred thousand women in England and Wales are becoming pregnant outside of marriage every year. Of all the girls who marry under twenty years of age no less than 40 percent are already pregnant on their wedding day.[১]

অর্থাৎ ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে যে সব সন্তান জন্মগ্রহণ করে, বিবাহ বন্ধনের পূর্বে তাদের প্রতি আটজনের মধ্যে একজনের গর্ভবাস হয়ে থাকে। প্রতি বছর ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের এক লক্ষ নারী বিবাহের পূর্বে গর্ভবতী হয়। বিশ বছরের কম বয়সে যে সব বালিকার বিয়ে হয়, তন্মধ্যে বিয়ের দিন যারা গর্ভবতী হয়, তাদের সংখ্যা শতকরা চল্লিশের নিচে।

আজকাল গর্ভনিরোধের এত যন্ত্রপাতি ও বটিকা পাশ্চাত্যে ব্যবহৃত হওয়া ও এ বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা প্রদান করা সত্ত্বেও গর্ভসঞ্চার হওয়া একমাত্র Accident বা দৈব্য দুর্বিপাক ছাড়া আর কি হতে পারে? এমতাবস্থায় যারা বিয়ের দিনে গর্ভবতী ছিল না, তাদেরকে কি আমরা সেদিন পর্যন্ত সতী-সাধ্বী কুমারী বলে ধরে নিতে পারি? কিন্‌সে রিপোর্টে (Kinsey) প্রকাশ, আমেরিকার পুরুষ অধিবাসীদের শতকরা পঁচানব্বই জন প্রচলিত নৈতিকমান অনুসারে নৈতিক দোষে দুষ্ট। চার-পাঁচ বছরের শিশুদেরকেও যৌন অপরাধে লিপ্ত পাওয়া যায়। বিবাহের পূর্বে যৌন মিলন দৈনন্দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ডাক্তারগণ বলেন :

Among he males going to college about 67 percent have such experience before marriage. Among those who go to a high school, about 84 percent have such intercourses and among the boys who do not beyond the grade school, the accumulative evidence is 98 percet.

---

[১] ড. মাহবুবা রহমান, *কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০১০ খৃস্টাব্দ), পৃ. ১২২; আব্দুল খালেক, *নারী*, পৃ. ৯১-৯২।

Dhaka University Institutional Repository

'কলেজগামী পুরুষদের শতকরা ৬৭ বিবাহের পূর্বে যৌন সম্ভোগ করে থাকে। হাই স্কুলগামীদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৮৪ জন এরূপ সম্ভোগ লাভ করে। যে সকল বালক গ্রেড স্কুল ছেড়ে যায় না তাদের সংখ্যা শতকরা ৯৮ জন।'[১] বৈবাহিক জীবনের বিশ্বস্ততা ভঙ্গ করা আমেরিকাবাসীদের জীবনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হয়ে পড়েছে। শতকরা প্রায় পঞ্চাশজন পুরুষ এই দোষে দুষ্ট। সমকাম দিন দিনই বেড়ে চলেছে এবং তিনজন পুরুষের একজন এ অপরাধে অপরাধী। এমনকি, পশুর সাথে যৌনকর্মও ব্যাপক হয়ে পড়েছে ও প্রতি বারজন পুরুষের মধ্যে একজন এই নোংরা কর্মে লিপ্ত রয়েছে। ডাক্তারগণের অভিমত এই : আমেরিকার শতকরা পঁচানব্বইজন পুরুষ কারারুদ্ধ হওয়া দরকার। কারণ কোন না কোন পথে তারা দেশের প্রচলিত আইন ভঙ্গ করে থাকে।[২]

আমেরিকার নারী জনসংখ্যা সম্পর্কে কিন্‌সে এক রিপোর্টে বলেন : আমেরিকার নারীদের শতকরা পঞ্চাশজন বিয়ের পূর্বে সতীত্ব নষ্ট করে। শতকরা পঁচিশজনেরও বেশী বিবাহিত অবস্থায় ভিন্ন পুরুষের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে এবং বিশ্বাস ভঙ্গের জন্য তাদের স্বামীদের নিকট দুঃখও প্রকাশ করে না। শতকরা বিশজন সমকাম করে, শতকরা ৬২ জন হস্তমৈথুন করে এবং শতকরা ৯৫ জন আদরে বশীভূত হয়ে পড়ে। যৌন অপরাধ ও অন্যায় প্রবণতা কলেজের ছাত্রী ও শিক্ষিত নারীদের মধ্যেই বেশি দেখা যায়।

ড. কিন্‌সের রিপোর্টের উপর মন্তব্য প্রসঙ্গে ইংরেজ মনোবিজ্ঞানী নোয়েল ব্রেইন (Noel Brain) বলেন :

In fact the thing that really stands out of Dr. Kinsey's reports both outlet American male and American female is that all of them are living in a Corrupt and frustrating society.[৩]

বস্তুত আমেরিকার পুরুষ ও মহিলা উভয়ের সম্পর্ক ড. কিন্‌সের রিপোর্ট হতে নিঃসন্দেহরূপে যা প্রতিপন্ন হয়, তা এই যে, তারা সকলে পাপ-পঙ্কিলতা পূর্ণ নৈরাশ্যজনক এক সমাজে বসবাস করছে। যারা আমেরিকার রীতি-নীতি ও চাল-চলন ইংলান্ডে আমদানী করতে আগ্রহী তাদেরকে সম্বোধন করে তিনি বলেন :

Never the less, the picture he (Dr. Kinsey) Presents is enough to show once more how far the American way of life is from being a civilization we want either to import to emulate. Dr. Kinsey's girls and boys are deeply to be pitied for what they have done to themselves. But we don't want them over here till the American people find a cure.[৪]

আমেরিকাবাসীদের জীবন যাপন পদ্ধতি সভ্যতা হতে কত দূরে ড. কিন্‌সের রিপোর্টে তা পুনরায় প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও তাদের রীতি-নীতি চাল-চলন আমদানী করতে বা তাদের সমান হতে আমরা ইচ্ছা করছি। কতিপয় মুসলিম রাষ্ট্রও পাশ্চাত্যের রীতি-নীতি এবং চাল-চলন নিজেদের দেশে আমদানি করতে সচেষ্ট রয়েছে। ড. কিন্‌সের রিপোর্ট মানব জাতিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে সে বর্তমান বিশ্বে নৈতিক মূল্যবোধ অত্যন্ত প্রয়োজন। আর এর প্রয়োজনীয়তা এখনকার মত অতীতে এত তীব্রভাবে আর কখনও অনুভূত হয়নি। নারীদের

---

১. ড. মাহবুবা রহমান, *কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী*, পৃ. ১২৩; *Sexual Behaviour in Human Male.* P. 552.

২. Nazhat Afza and Khurshid Ahmed, *The Position of Women in Islam,* P. 30.

৩. আব্দুল খালেক, *নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩-৯৪।

৪. Nazhat Afza and Khurshid Ahmed, *The Position of Women in Islam,* P. 31.

Dhaka University Institutional Repository

এ অবনতির বিষয়ে বাংলাদেশের পরিস্থিতিও এর ব্যতিত্রক্রম নয়। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বাংলাদেশের এক নির্মম ঘটনা যা একটি পত্রিকার সম্পাদকীয় হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। শিরোণাম : "প্যারেড গ্রাউন্ডে ভুলুণ্ঠিত নারীত্বের অহংকার!" ঘটনাটি এরূপ : "বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে গৌরবান্বিত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার জন্য সরকারী উদ্যোগে ২৬ শে মার্চ জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে আড়াই লক্ষাধিক জনতার সম্মিলিত কণ্ঠে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার অভূতপূর্ব আয়োজন করা হয়। যা এক্ষেত্রে সারাবিশ্বে বাংলাদেশকে অনন্য উচ্চতায় পরিচিত করেছে। এতবড় বিশাল আয়োজনে বর্ণাঢ্য আঙ্গিকে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল। যুবক-বয়োবৃদ্ধ ও প্রবীন-নবীন সবার স্বতঃস্ফুর্ত অংশ গ্রহণ ছিলো চোখে পড়ার মত। কিন্তু এরূপ একটি জাতীয় আয়োজনে কী ঘটেছিল; নারী প্রগতির সফলতাই বা কী তা প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন মাধ্যমে।[১] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল গবেষণার ছাত্রী রোকসানা কানন ঘটনার ভয়াবহতার কথা স্মরণ করে কেঁদে ফেলেন। তিনি সেখানকার পৈশাচিক ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বলেন,"বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বাধ্যতামূলক করায় ডিউটি হিসেবেই হলের ৩৪ মেয়ে নিয়ে বাসে করে জাতীয় সংগীত গাইতে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানকার করুণ অবস্থা দেখে সহ্য করতে পারছিলাম না। জাতীয় প্যারেড স্কোয়াডের প্রবেশ এবং বাহির দরজায় শত শত মেয়েকে লাঞ্চিত হতে দেখে ভয়ে কুঁকড়ে গিয়েছিলাম। যেকোন বয়সের মেয়ে বা নারী তাদের এ পৈশাচিকতা থেকে রক্ষা পায়নি। মুখ, চোখ, দাঁত ও জিভ এর কি অদ্ভূত কুরুচিপূর্ণ প্রদর্শন। স্কুল, কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, তরুণ, যুবক, মাঝ বয়সী বা ২/৪ সন্তানের জনক সব পুরুষ মেতেছিল অযাচিত ধাক্কা দেয়ার প্রতিযোগিতায়, আর কে কত অশ্লীল কথা মেয়েদের বলতে পারে। মুখে পানি নিয়ে মেয়েদের মুখে, বুকে অথবা পিছনে কুলি করেছে ইচ্ছা মত। কত মেয়ে যে কাকুতি-মিনতি করেছে ভাই! চাপ দিয়েন না, কিন্তু নিবৃত্ত হয়নি তারা। মেয়েদের নিয়ে অনেক কষ্টে ফিরেছি। কিন্তু মেয়েগুলোকে সুস্থ বলতে পারছিনা। হাউমাউ করে কাঁদছে একেক জন যে, তারা অল্পের জন্য ধর্ষিত হয় নি অথবা প্রাণে বেঁচে গেছে।"[২] ওদিকে একই ঘটনার শিকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হলের ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আ আ স ম আরেফিন সিদ্দিকের কার্যালয়ে এ ব্যাপারে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন, এবং এ ব্যাপারে কৈফিয়ত চান। এ সময় প্রায় সারে তিন শ' বিক্ষুব্ধ ছাত্রী রাত ১১টা থেকে রাত পৌনে ১টা পর্যন্ত উপাচার্যের সাথে বৈঠক করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর আমজাদ আলী, বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হলের প্রাধ্যক্ষ ফরিদা বেগম ও আবাসিক শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন। ছাত্রীদের অভিযোগ, হলের আবাসিক শিক্ষকদের তত্বাবধানে তাদেরকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে তারা হয়রানির শিকার হয়। সেনা সদস্য ও পুলিশের উপস্থিতিতেই তাদের উত্যক্ত করা হয়। কিন্তু এব্যাপারে তারা কোন পদক্ষেপ নেয় নি। [৩]

কী কারণে সেদিন ঘটেছিল এ ন্যাক্কারজনক ঘটনা, তার নেপথ্যে কারণ অনুসন্ধান প্রয়োজন। এমন ঐতিহাসিক জাতীয় সম্মেলনে তা নিঃসন্দেহে অনভিপ্রেত। সেখানে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার চতুর্মুখী ব্যুহ রচনা করা হয়েছিল।

---

১. http://dhakareport24.com/study/2014/03/28/18061; মাসিক আদর্শ নারী, সংখ্যা ২১৯, (২০ তম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা) সম্পাদকীয়, এপ্রিল ২০১৪।

২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার ফেসবুক পেজ থেকে সংগৃহীত।

৩. http://dhakareport24.com/study/2014/03/28/18061; *মাসিক আদর্শ নারী*, সংখ্যা ২১৯, (২০ তম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা) সম্পাদকীয়, এপ্রিল ২০১৪।

Dhaka University Institutional Repository

সম্মিলিত বাহিনী কঠোরভাবে দায়িত্ব পালন করেছে। সেখানে রাতের ঘোর আঁধার ছিল না কিংবা কোনরূপ অন্তরালের পরিবাধা ছিল না। তথাপি অগণিত নারী সেদিন লক্ষ লোকচক্ষুর গোচরেই করুণভাবে যৌন নিগ্রহের শিকার হয়েছে। কোন কিছুই সেদিন কুপুরুষদের পশুত্ববৃত্তিকে দমাতে পারে নি। এ ঘটনা শুধু পবিত্র কুর'আনের এ আয়াতকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। ইরশাদ হচ্ছে :

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوف

নারীরা যদি আত্মরক্ষা চাও, তাহলে পুরুষদের সাথে (পর্দার আড়াল থেকেও) মোলায়েম স্বরে কথা বলো না। তা না হলে যে সকল পুরুষের হৃদতন্ত্রিতে পশুত্ববৃত্তির মড়ক আছে, তারা কুলালসা চরিতার্থ করবে।'[১]

কুর'আনের এ আয়াত মানুষের স্বভাবজাত আচরণ ও তার পরিণামের ব্যাপারে বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ লক্ষ্যনীয় । দূরাচার কুপুরুষদের খপ্পর থেকে নারীদের রক্ষার জন্য এ আয়াতে সাযুজ্যপূর্ণ কৌশল অবলম্বন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এখানে মৌলনীতির কথা হলো, বাঘের সামনে তো যাবেই না, যাতে সে দেখে প্রলুব্ধ না হয়; তেমনি আড়াল থেকেও তার কাছে ঘষবে না, যাতে সে ঘ্রাণ পেয়ে দিশা না হারায়। এর সার কথাই হলো নারীদের জন্য ইসলামের রক্ষণশীল পর্দা ব্যবস্থা-যা তাদের ইজ্জত সম্ভ্রমের রক্ষা কবচ।[২] কিন্তু বর্তমান প্রগতির নামে একশ্রেণির উচ্চাভিলাষী নারী নিজেদের তথাকথিত উদারপন্থি আধুনিক পরিচয় দিয়ে উপরিউক্ত অবস্থার শিকার হচ্ছে।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় নারী

ইরশাদ হচ্ছে :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"হে নবী! ঈমানদার মহিলারা যখন আপনার কাছে বাইয়াতের জন্য আসে যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, নিজেদের হাত ও পায়ের মধ্যবর্তী স্থানের কোন অপবাদ গড়বে না এবং কোন ভাল কাজে আপনার অবাধ্য হবে না, তাহলে আপনি তাদের বাইয়াত গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল এবং দয়াবান।"[৩] এই আয়াতে মহিলাদের নিকট থেকে যেসব বিষয়ে প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে তার মধ্যে একটি হলো তারা তারা কোন সৎকাজে রাসূলে করীম (সা)-এর অবাধ্য হবে না। এ কথাটি দ্বারা তাদের উপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পণ করা হয়েছে। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে তাদেরকে রাসূলের আনুগত্যের জন্য বাধ্য করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে নারী সমাজের মধ্যে ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে অবগত হওয়ার এমন অদম্য আকাঙ্ক্ষা উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিল যে, তারা দিনরাত সবসময় তা অর্জনে ব্যস্ত থাকতো। জ্ঞান আহরণের

---

[১]. আল কুর'আন, ৩৩ : ৩২।

[২]. *মাসিক আদর্শ নারী*, সংখ্যা ২১৯, (২০ তম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা) সম্পাদকীয়, এপ্রিল ২০১৪।

[৩]. আল কুর'আন, ৬০ : ১২।

Dhaka University Institutional Repository

পথে কোন বাধা ও প্রতিবন্ধকতা তাদেরকে হতাশ করতে পারতো না। আনসারী মহিলাদের সম্পর্কে হযরত আয়শা (রা) বলেন : "আনসারী মহিলারা কতই না ভাল। দীনের বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে লজ্জা-শরমও তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে নি।"[১] ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে সে যুগের মহিলারা কত গভীর ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিয়ে অধ্যয়ন করতেন হযরত আয়েশা (রা)-এর নিম্নের উক্তি হতেই তা বোঝায় যায়।

"নবী করীম (সা)-এর যুগে কুর'আন মজীদের কোন আয়াত নাযিল হলে, আমরা তার শব্দগুলো হুবহু মুখস্ত না করলেও তার হালাল-হারাম এবং আদেশ-নিষেধগুলো স্মৃতিপটে গেঁথে নিতাম।"[২] "জুম'আর দিনে আমি নবী (সা)-এর খুতবা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে শুনতে পেতাম। অথচ আমি মেয়েদের সর্বশেষ কাতারে থাকতাম।"[৩] হারিসা ইব্‌নে নু'মানের এক কন্যা বর্ণনা করেছেন : "আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখ থেকে শুনেই সূরা কাফ মুখস্ত করেছিলাম। তিনি প্রত্যেক জুমু'আর খুতবাতে এটি পড়তেন।"[৪] মেয়েদের উপদেশ ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নবী করীম (সা) নিজেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। যদি কোন সময় তিনি বুঝতে পারতেন যে, মেয়েরা তার বক্তব্য ঠিকমত শুনতে পায় নি, তাহলে তিনি তাদের কাছে গিয়ে পুনরায় তা বলে দিতেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) এক ঈদের দিনের কথা উল্লেখ করে বলেছেন : "তিনি মনে করলেন যে, তাঁর কথা মেয়েদের কাছে পৌঁছাতে পারেন নি। তাই পুনরায় তিনি তাদেরকে নসীহত করলেন। তাদের সাদকা দেয়ার জন্য আদেশ দিলেন।"[৫] ইসলাম জ্ঞানান্বেষণের জন্য নারীদের মনে অত্যন্ত গভীর আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল। তাদের এই জ্ঞান-পিপাসা নিবারণের জন্য নবী করীম (সা) সাধারণ ব্যবস্থা ছাড়াও মাঝে মধ্যে তাদের জন্য অতিরিক্ত সুযোগ করে দিতেন। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, কোন কোন সময় নবী করীম (সা) মহিলাদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্য নিজের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে তাদের কাছে পাঠাতেন। হযরত উম্মে আতিয়া (রা) বলেন, মদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মহিলাদেরকে একটি ঘরে একত্র করে নসীহত করার জন্য হযরত উমর (রা)-কে পাঠালেন। তারপর তিনি এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে সালাম দিলেন। আমরাও তাঁর সালামের জবাব দিলাম। এরপর তিনি বললেন: "আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতিনিধি হিসেবে আপনাদের কাছে এসেছি। অতঃপর তিনি আমাদের যুবতী এমনকি ঋতুবতী মেয়েদেরকেও দু' ঈদের দিন ঈদগাহে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। আরও বললেন যে, আমাদের জন্য জুম'আর নামায ফরয নয়। আর তিনি আমাদেরকে জানাযার সাথে যেতে নিষেধ করলেন।"[৬]

মহিলাদের প্রাথমিক শিক্ষাগার ও প্রশিক্ষণ স্থান হলো গৃহ। তাই পিতামাতা যাতে কন্যাদেরকে, স্বামী যাতে স্ত্রীকে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে শেখায় ও ক্রটি-বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেদিকে ইসলাম তাদের দৃষ্টি দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

কুর'আন মজীদে বলা হয়েছে :

---

১. মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১।

২. ইব্‌ন আবদি রাব্বিহি, *আল-ইকদুল ফরীদ*, ১ম খ., কায়রো: মাতবা'আতু লাজনাতিত্ তা'লীক, ১৯৬৫, পৃ. ২৭৬।

৩. ইব্‌ন সা'দ, *আত্ তাবাকাত*, ৮ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭।

৪. মুসলিম, *সহীহ্ মুসলিম*, ২য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৫।

৫. বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, ১ম খ., কিতাবুল ইলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০; মুহাম্মদ জামালুদ্দীন, *মুসলিম নারীর পোশাক ও কর্ম* (ঢাকা: এশা রাহনুমা, সাইনস্ ল্যাবরেটরী, ১৯৯৮ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৭২-৭৬।

৬. জালালুদ্দীন উমরী, *ইসলামী সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও।"[১] এ আয়াতের অর্থ হযরত আলী (রা) এভাবে করেছেন : "তোমরা নিজে শেখ এবং পরিবারবর্গকে সব কল্যাণময় রীতি-নীতি শেখাও। তাদের আদব শিক্ষা দাও ও এসব কাজে অভ্যস্ত করে তোল।"[২]

মালিক ইব্‌নে হুয়াইরিস (রা) বলেন, আমরা কয়েকজন যুবক দীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য নবী (সা)-এর কাছে বিশ দিন পর্যন্ত অবস্থান করলাম। যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, আমরা বাড়ি ফেরার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছি, তখন তিনি বললেন : "তোমরা তোমাদের স্ত্রী-পুত্রের কছে ফিরে যাও এবং তাদের কাছেই অবস্থান কর। তাদেরকে দীন সম্পর্কে শিক্ষা দাও এবং তা মেনে চলার নির্দেশ দাও।"[৩]

বর্তমানে প্রচলিত সহশিক্ষার কুফল

বর্তমান বিশ্বে সহ শিক্ষার সহশিক্ষার স্বরূপ হচ্ছে একই প্রতিষ্ঠানে একই শ্রেণীতে ছেলে-মেয়েদের পর্দাহীন ভাবে অবাধ মেলামেশা ও সহ অবস্থানের সুযোগ করে দেয়। পর্দাহীন অবাধ মেলামেশা ও সহ অবস্থানের সুযোগের কারণে সহশিক্ষা কল্যাণের বদলে অকল্যাণ বয়ে আনছে। বর্তমানে সহশিক্ষার কুফল অনেক। বর্তমান সহশিক্ষা ব্যবস্থা গোটা মানবজাতিকে যে অকল্যাণ, অবক্ষয় এবং অশান্তি দান করেছে তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেও মানুষ এ থেকে মুক্তির কোন পথ খুঁজে পাচ্ছে না। কারণ, মানব রচিত আইন ও চিন্তাধারায় এ সমস্যার কোন সমাধান নেই, আছে শুধু সমস্যা বৃদ্ধির অসংখ্য উপায়। প্রচলিত সহশিক্ষা ব্যবস্থা মানব জাতির যে ভয়াবহ ও অপূরণীয় ক্ষতি করেছে তন্মধ্যে নৈতিক চরিত্রের অবনতি, দাম্পত্য জীবনে চরম কলহ, অসামাজিক ক্রিয়াকর্ম, যৌতুক প্রথা, তালাক, নারী ধর্ষণ, নারী হত্যা, মাদকদ্রব্যের অবাধ ব্যবহার, অযোগ্য সন্তানের প্রাদুর্ভাব, সামাজিক বিশৃংখলা ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।বর্তমান সমাজে ধর্মীয় অনুশাসন ও ছাত্র-ছাত্রীদের উপর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ না থাকায় সহশিক্ষা ব্যবস্থা বিষময় হয়ে উঠেছে। যার ফলে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছেলে-মেয়েরা অবাধ পর্দাহীন ভাবে মেলামেশার সুযোগ পায় যা অতীতে এরূপ ছিল না। অতএব সহশিক্ষার কুফল কী হতে পারে তা আর ব্যাখ্যা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। বর্তমান প্রচলিত সহশিক্ষার কারণে নৈতিক চরিত্রের যে অবনতি ও অবক্ষয় হয়েছে তা বর্ণনাতীত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেলেমেয়েরা অবাধ মেলামেশার ফলে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে। ধর্ম, আদর্শ ও নৈতিকতাহীনসহ শিক্ষা ব্যবস্থা তাদের চারিত্রিক অবনতি ঘটায়। তারা জীবনের লক্ষ্যকেই তারা ভুলে যায়। সমাজ ও দেশের উন্নতি ও কল্যাণের কথা তাদের মন ও মগজে স্থানই পায় না। তারা সব সময় কুচিন্তায় মশগুল থাকে। কোন মতে দুই চারটি সনদপত্র লাভ করতে পারলেও তারা প্রকৃত মানুষ হতে পারে না। তাদের দিয়ে কাংখিত সমাজ গড়ে ওঠে না। সমাজে সুখ-শান্তি, সম্প্রীতি ও ইনসাফের নামগন্ধও থাকে না। সব দিক দিয়েই অশান্তির আগুন জ্বলতে থাকে।

বর্তমান সহশিক্ষা ব্যবস্থায় তরুণ-তরুণী বিপথগামী হওয়ার সুযোগ পায় বেশী। তারা মানব জাতির সবচেয়ে বড় যে ক্ষতি করে তাহলো কুসন্তানের প্রাদুর্ভাব। মানব সন্তান উৎপাদনের জন্য মহান আল্লাহ্‌র জান্নাতী কারখানা

---

[১]. আল কুর'আন, ৬৬ : ৬।

[২]. আল্লামা শাওকানী, *ফাতহুল কাদীর*, ৫ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬।

[৩]. বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, ১ম খ., কিতাবুল আযান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

হলো মায়ের উদর। এ কারখানা হতে সুসন্তান পেতে হলে কারখানার মালিকা মাকে হতে হবে পূতপবিত্র ও ক্রুটিহীন। তার মন সুন্দর আর চরিত্র হবে নির্দোষ। কোন মহিলা যেনা, বদনজর ও বদচিন্তার ভার মাথায় নিয়ে সে কোন সুসন্তান জন্মদান করতে পারে না। এহেন নারীর গর্ভজাত সন্তান আকারে মানুষ হলেও প্রকার ও বৈশিষ্ট্যে সে হয় পশুশাবক তুল্য। সব শিক্ষাই মানুষকে মহৎ করে না। মানুষকে মহৎ করে সুশিক্ষা ও আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা। অতএব, সহশিক্ষা ব্যবস্থা বন্ধ করে নর ও নারী উভয়ের জন্য পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা অপরিহার্য অথবা সহশিক্ষা ব্যবস্থায় ছেলে-মেয়েদের উপর প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ অতীব জরুরী। সহশিক্ষার আর একটি কুফল হলো দাম্পত্য জীবনে কলহ ও অশান্তি। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রত্যেক ছেলে ও মেয়ে বহু ছেলেমেয়ের সাথে অবাধে কথা বলার এবং যথেচ্ছা মেলামেশা করার সুযোগ পায়। এ অভ্যাসের কারণে সহপাঠী ও সহপাঠিনী ছাড়াও বাইরের ছেলেমেয়েদের সাথে তাদের অবাধ মেলামেশা চলে। এদের মধ্যে যার সাথে তথাকথিত প্রেম জমে ওঠে, তার সাথে বিয়ে না হলে, বিবাহিত জীবনে স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে মেনে নিতে পারে না। সারা জীবন চলে পরস্পরের মধ্যে ভুল বোঝাবোঝি। কেউ কাউকে বরদাশত করতে পারে না। আবার প্রেমের বিয়ে হলে উভয়েই নিজ নিজ মর্যাদা অধিকার ও মূল্যমান বহাল রাখতে সচেষ্ট হয়। ফলে পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণের চেয়ে বিকর্ষণই ঘটে বেশি। এভাবেই সৃষ্টি হয় গরমিল আর পরিণামে ঘটে মর্মান্তিক ঘটনা-তালাক। ইসলাম তালাক জায়েয রাখলেও একে সবচেয়ে ঘৃণ্য কাজ বলে অভিহিত করেছে। বর্তমান প্রচলিত সহশিক্ষার বদৌলতে মেলামেশার কারণে একই সময়ে একজন যুবক কিংবা যুবতী অনেকের সাথে সম্পর্ক গড়ার সুযোগ পায়। একই নারী বা পুরুষকে নিয়ে চলে প্রতিযোগিতা। কেউ আবার একজনের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পর তাকে বাদ দিয়ে অপর একজনকে পেতে চায়। এর ফলে শুরু হয় রেষারেষি, এসিড নিক্ষেপ, খুন-খারাবি ইত্যাদি। অতএব, গোটা জাতিকে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি, অপূরণীয় ক্ষতি, ধ্বংস এবং বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার জন্য কালবিলম্ব না করে সহশিক্ষার বিলোপ সাধন করে ছেলে ও মেয়ের জন্য সর্বস্তরে পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন অথবা সহশিক্ষা ব্যবস্থাকে অতীতের মত নৈতিকমানে উন্নীত করা জাতীয় কর্তব্য যাতে করে ছাত্র-ছাত্রীদের উপর শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ থাকে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়।[১]

বিভিন্ন নারীবাদ ও ইসলাম

নির্যাতন বন্ধ করে নারীকে পুরুষের সমান অধিকার প্রদানের জন্য অতীত থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত কতিপয় তত্ত্বের উদ্ভব ঘটেছে এগুলোর মধ্যে ১. উদারপন্থী নারীবাদ ২. প্রগতিবাদী নারীবাদ ৩. মার্কসীয় নারীবাদ ৪. সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ ৫. আধুনিকতা উত্তর নারীবাদ অন্যতম। এদের অভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করে নারীকে পুরুষের সমান অধিকার প্রদানের ব্যবস্থা করা। তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অভিন্ন হলেও নারী-পুরুষের মধ্যে সাম্য আনয়ণের পন্থা নিয়ে তাদের মধ্যে বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। এমনকি নারী পুরুষের সমতা অর্থ নারীর দৈহিক বৈশিষ্ট্য মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতা ও মানুষিক যোগ্যতা হুবহু পুরুষের অনুরূপ এবং অভিন্ন কর্মক্ষেত্রে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বি স্বরূপ এ চিন্তাধারাই তাদের অনেকের দর্শনে প্রতিফলিত হয়। তবে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় এ ধরনের সমতার ভাবনা একেবারেই অবাস্তব ও অগ্রহণযোগ্য। আর যদি নারী পুরুষের

---

১. মোসাম্মত কবিতা সুলতানা, *ধন্য আমি নারী* (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, ৩য় সংস্করণ, ১৯৯৫ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৭৫-৮০।

Dhaka University Institutional Repository

সমতার অর্থ যদি নারীকে সম্মানজনক অবস্থানে উন্নীত করা হয় এবং তার জন্য এমন এক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা হয় যাতে পুরুষের পাশাপাশি নারীরও এ সুযোগ ঘটে যে সে তার মানবিক আধ্যাত্মিক ও শারীরিক যোগ্যতাকে কাজে লাগাতে পারে এবং সমাজের উন্নয়নে স্বীয় বৈধ কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে। তাহরে বুদ্ধিমান কোন ব্যক্তিরই এ ধরনের সমতায আপত্তি থাকতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের দৃষ্টিতে সমতা হচ্ছে পুরুষ বা নারী তার উপর অর্পিত দায়িত্ব কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করা এবং যৌথ কাজে অংশ গ্রহণ করা। একজন পুরুষ যদি তার সন্তান সন্ততির লালন-পালন, সেবা যত্ন শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্বে অংশগ্রহণ না করে তখন একজন নারী পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে অথবা গৃহের বাইরের কাজগুলো করতে উৎসাহিত হবে না এটাই চিরন্তন সত্য কথা। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়ের উপরই প্রকৃতিগতভাবে যৌথ কাজ সম্পাদন করার দায়িত্ব অর্পণ করেছে। একজন নারী সন্তানের লালন পালন, শিক্ষা-দীক্ষা, সেবা-সহযোগিতা করা এবং পরিবার পরিচালনার দায়িত্বে দায়িত্ববান। অপরদিকে একজন পুরুষের দায়িত্ব হচ্ছে ঘর-বাড়ী, ভিটে-মাটি, মৌলিক অধিকার এবং নারী ও সন্তানের খোর-পোষ প্রদান করা কাজ ও দায়িত্ব সমূহ ভাগাভাগি করাই সাম্য। এ ধরনের ব্যবস্থাপনায় নারী পুরুষ সমান এবং একজন অপর জনের অধীনে এ ধরনের প্রশ্ন অবাস্তব। আর এ বিষয়টিকে কুর'আনে অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

এ সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে :

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

'তারা নারীগণ তোমাদের ভূষণ এবং তোমরাও স্বামীগণ তাদের (স্ত্রীদের) ভূষণ'।[১]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

'স্ত্রীদের উপর যেমন স্বামীদের অধিকার আছে, তেমনি স্বামীদের উপরও স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে'।[২]

সুতরাং এ আয়াত গুলো দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে নারী ও পুরুষের একজনের অপরজনের উপর সমান অধিকার বিদ্যমান। আর সমান অধিকার সাব্যস্ত হয় সমান দায়িত্ব কর্তব্য পালনের মাধ্যমে। তাই বলা যায় বিভিন্ন নারীবাদী দর্শনের বদৌলতে নারী সমাজ কোন কল্যাণ লাভ করতে পারেনি। যতটুকু সমৃদ্ধি নারী সমাজ লাভ করেছে তা শুধুমাত্র ইসলামের কল্যাণেই। যেমন ধন সম্পদের উত্তরাধিকার কোন ধর্মই এটা দেয় নি; কিন্তু ইসলাম ধন সম্পদের উত্তরাধিকার আইন 'মিরাস' প্রতিষ্ঠা করে নারী জাতির ভাগ্যের আমূল পরিবর্তন করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দৃঢ় অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ওমর ফারুক (রা) জাহেলী যুগের নারীদের সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন : "আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, আমরা জাহেলী যুগে নারীদের কোন মর্যাদাই দিতাম না। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বিভিন্ন হেদায়েত নাযিল করেন এবং তাদের জন্য মিরাছী সত্ত্বে একটি অংশ নির্ধারণ করেন।"[৩] নারী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। নারী-পুরুষ একে অপরের সম্পূরক। নারী পুরুষের

---

১. আল কুর'আন, ২ : ১৮৭।

২. আল কুর'আন, ২ : ২২৮।

৩. মাওলানা মুস্তফা আল-গালায়ীনী বলেন: 'ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে পুরুষের অধিকৃত বিষয়-সম্পদের মধ্যে নারীর সাথে পশুর ন্যায় ব্যবহার করা হত। নারীর মর্যাদা এত নিম্ন পর্যায়ের ছিল যে, তাদের তুলনায় পশুদের প্রতি অধিকতর সুনজর দেয়া হত।

Dhaka University Institutional Repository

জীবনযুদ্ধের প্রেরণা। সংসারের সুখ-শান্তিরমূলে নারীর অবদান অনস্বীকার্য। সমাজ সৌধের ভিত্তি হচ্ছে নারী। আদর্শ পরিবার, সুশৃঙ্খল-শান্তিপূর্ণ সমাজ, সন্ত্রাস-দুর্নীতিমুক্ত স্বনির্ভর দেশ ও অনুপম সুষম বিশ্ব গড়ার ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা অপরিসীম। নারীকে জীবন থেকে আলাদা করার সুযোগ নেই। অথচ বিশ্ব সভ্যতাসমূহে যুগে যুগে নারীদের অধিকার ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত নারীদের ব্যাপারে ইতিহাসে বহুবিধ দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রীক সমাজে নারীদেরকে শয়তানের প্রতিচ্ছায়া মনে করা হতো।[১] আইনগতভাবে নারীরা সংসারের অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তির মতো ছিল;উত্তরাধিকার বলতে কিছু ছিল না। সারাজীবন তারা পুরুষের দাসী-বাঁদীর মতো জীবন কাটাত।[২] পুরুষদের অনুমতি ব্যতীত নিজের সম্পত্তি ভোগ বা হস্তান্তর করতে পারত না। Encyclopedia-তে উল্লেখ কর হয়েছে, Women's status had degenerated to that of childbearing slaves. Wives were secluded in their homes, had no education and few rights, and were considered by their husbands on better than cattle.[৩]

সে এমন নিদারুণ অবস্থায় নিপতিত ছিল যে, দুনিয়ার অপর কোন জাতিই আরবের ন্যায় নারীদেরকে এত অধিক অপমান ও নির্যাতন করত না। আরববাসী তার বৈমাত্রেয় বোন বিমাতা এমনকি তার বিধবা পুত্রবধূকেও বিবাহ করত।[৩] আরব সমাজে অন্যান্য নিয়মের মত বিবাহ ক্ষেত্রেও 'জোর যার মুল্লুক তার' প্রথা চালু ছিল। তাই একজন পুরুষ কয়জন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে সরকারী আইন, সামাজিক রীতি-নীতি ও ধর্মের বিধানে এর কোন সীমাবদ্ধতা ছিল না। যতই ইচ্ছে ততোটি নারীকেই বিবাহ করতে পারত। আবু দাউদ ও তিরমিযীর ভাষ্যমতে, 'ওহ্হাব আসাদী (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তখন তার বিবাহধীনে ছিল দশজন স্ত্রী। এমনিভাবে গায়লা ছাক্বাফী (রা) মুসলমান হবার সময় তার বিবাহধীনে দশজন স্ত্রী ছিল' (*ইসলামী রাষ্ট্রে নারীর অধিকার*, পৃ. ১৫)।

১. মাও. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *নারী* (ঢাকা: ২০০৮ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৯।

২. মোল্লা মাজদুদ্দীন, *সীরাতে মোস্তফা* (দিল্লী: মাকতাবা উসমানিয়া, ১৯৫৭ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৭৬।

৩. *Encyclopedia Britannica*, Corporation Encyclopedia Britannica, Canada, 1974, Vol-19, p. 909.

Dhaka University Institutional Repository

ZZxq Aa¨vq

wewfbœ mf¨Zvq I Bmjvgx wkÿvq bvixi Ae¯'vb

Ges eZ©gvb †cÖÿvc‡U Zvi ev¯Íevqb

তৃতীয় অধ্যায়

বিভিন্ন সভ্যতায় ও ইসলামী শিক্ষায় নারীর অবস্থান এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে তার বাস্তবায়ন

নারীর সমস্যা আধুনিক ও প্রাচীন যুগের সমাজেরই সমস্যা। কেননা সংখ্যার দিক থেকে নারী হচ্ছে সমাজের অর্ধেক, স্নেহ ভালোবাসা ও আবেগের দিক দিয়ে সমাজের উৎকৃষ্টতম এবং সমস্যার বিচারে সমাজের জটিলতম সমস্যা। এ কারণে সকল যুগের চিন্তাবিদগণ নারীর সমস্যাকে গোটা সমাজের সমস্যা হিসাবে দেখেছেন ও তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন। তবে অধিকাংশ পুরুষ নারীকে পুরুষের একটি পরিপূরক ও সৌন্দর্যবর্দ্ধক জুড়ি বলে মনে করে থাকে। ইসলামের অভ্যুদয়ের যুগে প্রাচীন মানব সমাজগুলোতে এবং ইসলামের অভ্যুদ্বয়ের পওে মধ্যযুগীয় ইউরোপে ও আধুনিক ইউরোপে নারীর আইনগত ও সামাজিক মর্যাদা কিরূপ ছিল ও আছে, সর্বপ্রথম তার ঐতিহাসিক পর্যালোচনা করা জরুরী। নারীর এই আইনগত ও সামাজিক অবস্থা ন্যায়নিষ্ঠভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে নারীর প্রতি সদয় অথবা নিষ্ঠুর আচরণে এক জাতির সাথে আরেক জাতির এক আইনের সাথে আরেক আইনের যতই পার্থক্য ও বৈপরিত্য থাকুক না কেন, ইসলামের অভ্যুদ্বয়ের পূর্বে নারী কখনো কোন সমাজে তার যথাযোগ্য সামাজিক ও আইনগত মর্যাদা লাভ করেনি। এ সম্পর্কে নিম্নে বিস্তরিত আলোচনা করা হলো।

ইসলাম-পূর্ব আরব সভ্যতায় নারীর মর্যাদাগত অবস্থান

ইসলাম পূর্ব যুগ হলো জাহেলিয়াতের যুগ। ইসলাম পূর্ব আরবে নারীদের অবস্থা ছিল করুণ ও শোচনীয়। পুত্র সন্তান জন্ম হলে তারা নিজেদেরকে সুখী ও গৌরবান্বিত মনে করত। কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে তাদের মান-সম্মান ও গৌরবের মস্তকটি অবনমিত হয়ে যেত। দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা ও দুঃখ-দুর্দশার পয়গাম এনে দিত তাদের জীবনধারায়। কন্যা সন্তান জন্মকে আরবেরা কুলক্ষণ ও অপমানজনক মনে করত। তাই নবজাত কন্যাকে জীবন্ত হত্যা ও প্রোথিত করার রীতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। ইতিহাস উপস্থাপন করতে গিয়ে আল্লাহ্ পাক বলেন :

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ﴿ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

"যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল।"[১]

আরব সমাজের এই নিকৃষ্ট সভ্যতা মহান আল্লাহ্ এভাবে বর্ণনা করেছেন :

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

"তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ প্রদান করা হয় তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সুসংবাদ দেয়া হল তার লজ্জায় সে নিজের লোকদের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ায়; সে চিন্তা করে অপমান সহ্য করেও তাকে জীবিত রেখে দিবে, নাকি মাটির নিচে পুঁতে ফেলবে? জেনে রেখ, কত নিকৃষ্ট তাদের সিদ্ধান্ত।"[২] কায়েস বিন আছেম নামক জৈনক ব্যক্তি জাহেলী যুগে স্বীয় ঔরসজাত আট-দশটি কন্যা সন্তানকে কবর দিয়েছিল।[৩]

---

১. আল-কুর'আন, ৮১ : ৮-৯।

২. আল-কুর'আন, ১৬ : ৫৮-৫৯।

৩. ইবনে কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আজীম* ৪র্থ খ. (বৈরূত: দারুল ফিকর, তা. বি), পৃ. ৪৭৭-৪৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মুস্তফা আল-গালায়ীনী বলেন : 'ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে পুরুষের অধিকৃত বিষয়-সম্পদের মধ্যে নারীর সাথে পশুর ন্যায় ব্যবহার করা হত। নারীর মর্যাদা এত নিম্ন পর্যায়ের ছিল যে, তাদের তুলনায় পশুদের প্রতি অধিকতর সুনজর দেয়া হত। সে এমন নিদারুণ অবস্থায় নিপতিত ছিল যে, দুনিয়ার অপর কোন জাতিই আরবের ন্যায় নারীদেরকে এত অধিক অপমান ও নির্যাতন করত না।'[১] আরববাসী তার বৈমাত্রেয় বোন, বিমাতা এমনকি তার বিধবা পুত্রবধূকেও বিবাহ করত।[২] আরব সমাজে অন্যান্য নিয়মের মত বিবাহ ক্ষেত্রেও 'জোর যার মুল্লুক তার' প্রথা চালু ছিল। তাই একজন পুরুষ কয়জন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে সরকারী আইন, সামাজিক রীতি-নীতি ও ধর্মের বিধানে এর কোন সীমাবদ্ধতা ছিল না। যত ইচ্ছে ততো নারীকেই বিবাহ করতে পারত। আবু দাঊদ ও তিরমিযীর ভাষ্যমতে, 'ওহ্হাব আসাদী (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তখন তার বিবাহধীনে ছিল দশজন স্ত্রী। এমনিভাবে গায়লা ছাক্কাফী (রা) মুসলমান হবার সময় তার বিবাহধীনে দশজন স্ত্রী ছিল।[৩]

ওমর ফারুক (রা) জাহেলী যুগের নারীদের সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, "আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলছি, আমরা জাহেলী যুগে নারীদের কোন মর্যাদাই দিতাম না। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বিভিন্ন হেদায়েত নাযিল করেন এবং তাদের জন্য মিরাছী সত্ত্বে একটি অংশ নির্ধারণ করেন।"[৪] নারী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। নারী-পুরুষ একে অপরের পরিপূরক। নারী পুরুষের জীবনযুদ্ধের প্রেরণা। সংসারের সুখ-শান্তিরমূলে নারীর অবদান অনস্বীকার্য। সমাজ সৌধের ভিত্তি হচ্ছে নারী। আদর্শ পরিবার, সুশৃঙ্খল-শান্তিপূর্ণ সমাজ, সন্ত্রাস-দুর্নীতিমুক্ত স্বনির্ভর দেশ ও অনুপম সুষম বিশ্ব গড়ার ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা অপরিসীম। নারীকে জীবন থেকে আলাদা করার সুযোগ নেই। অথচ বিশ্ব সভ্যতাসমূহে যুগে যুগে নারীদের অধিকার ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত নারীদের ব্যাপারে ইতিহাসে বহুবিধ দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রীক সমাজে নারীদেরকে শয়তানের প্রতিচ্ছায়া মনে করা হতো।[৫] আইনগতভাবে নারীরা সংসারের অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তির মতো ছিল, উত্তরাধিকার বলতে কিছু ছিল না। সারাজীবন তারা পুরুষের দাসী-বাঁদীর মতো জীবন কাটাত।[৬] পুরুষদের অনুমতি ব্যতীত নিজের সম্পত্তি ভোগ বা হস্তান্তর করতে পারত না। Encyclopedia-তে উল্লেখ কর হয়েছে, Women's status had degenerated to that of childbearing slaves. Wives were secluded in their homes, had no education and few rights, and were considered by their husbands on better than cattle.[৭]

খ্রিষ্টীয় রোমান সমাজে নারীদের অবস্থা এতই করুণ ছিল যে, সে সময় তারা নারীর মানবসত্তাকে স্বীকার করত না, বরং তারা নারীকে মানুষ ও প্রাণীর মাঝামাঝি কোনো বিশেষ প্রজাতি মনে করতো। সপ্তম শতাব্দীতে রোমের পাদ্রীগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, নারীর আত্মা নেই। সুতরাং তারা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে

---

[১]. নারী, পৃ. ১৫।

[২]. *Woman in Islam,* P. 15.

[৩]. *ইসলামী রাষ্ট্রে নারীর অধিকার*, পৃ. ১৬।

[৪]. *ইসলামী রাষ্ট্রে নারীর অধিকার*, পৃ. ১৫।

[৫]. মাও. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *নারী*, ঢাকা: ২০০৮, পৃ. ৯।

[৬]. মোল্লা মাজদুদ্দীন, *সীরাতে মোস্তফা* (দিল্লী: মাকতাবা উসমানিয়া, ১৯৫৭ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৭৬।

[৭]. *Encyclopedia Britannica*, Vol-19 (Canada: Corporation Encyclopedia Britannica, 1974) p. 909.

Dhaka University Institutional Repository

না।[১] ৫৮৭ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে আলোচ্য বিষয় ছিল নারীকে কি মানুষ বলে বিবেচনা করা হবে নাকি অমানুষ বলা হবে। সম্মেলনে স্থির হয়, নারী মানুষ, তবে তার সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরুষের সেবা করা।[২] বর্তমান ইউরোপে এক শতাব্দীকাল পূর্বেও নারীরা পুরুষের অত্যাচার, যুল্ম ও উৎপীড়নের শিকার ছিল। পুরুষের নির্মম অত্যাচার থেকে রেহাই পাবার মত সুদৃঢ় কোন আইনগত বিধান ছিল না। তৎকালে নারীরা কোন ধরনের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে স্বাধীন ছিলো না। মেয়েদেরকে পিতা-মাতার সম্পদ মনে করা হতো। বিয়ের নামে পিতা-মাতা মেয়েদেরকে বিক্রি করতো।[৩] চীনা সভ্যতায় নারীকে Water of woe (দুঃখের প্রস্রবণ) বলা হতো। ভারতীয় সমাজে নারীদের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয় ও করুণ। ভারতীয় সমাজে নারীদেরকে নৈতিক চরিত্র, পাপ এবং আধ্যাত্মিক ধ্বংসের মূল উৎস বলে বিবেচনা করা হতো। প্রাচীন ভারতে সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল সতীদাহ প্রথা। এছাড়া দেবদেবীর সন্তুষ্টি লাভের জন্য কৃষি ও ভালো ফসল ফলানোর উদ্দেশ্যে নারীকে বলী দেয়া হতো।[৪] বৌদ্ধ সমাজেও নারীর অবস্থা ছিল অত্যন্ত হীন। গৌতম বুদ্ধ স্বয়ং স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসী জীবন যাপন করেন। তিনি নারীকে মানবাত্মার নির্বাণ লাভে বিঘ্ন মনে করতেন।[৫] ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মের তুলনায় একমাত্র ইসলামে নারীর অবস্থা অধিক উন্নত ছিল। কিন্তু ইসলাম-পূর্ব আরব সমাজে নারী ছিল অবহেলিত, অপমানিত, লাঞ্ছিত, ঘৃণিত-মানবেতর প্রাণীর চেয়েও নিকৃষ্ট। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে পুরুষের অধিকৃত বিষয়-সম্পদের মধ্যে নারীর সাথে পশুর ন্যায় ব্যবহার করা হতো। নারীর মর্যাদা এত নিচু ছিল যে, তাদের তুলনায় পশুদের প্রতি সুনজর দেয়া হতো। কন্যা সন্তানের জন্মকে আরবরা কুলক্ষণ ও অপমানজনক মনে করতো। নবজাত কন্যা সন্তান হত্যার নীতি বহুলভাবে প্রচলিত ছিল। কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়া হতো, পণ্যদ্রব্যের মতো বিক্রি করা হতো এবং পশুর বদলে বিনিময় করা হতো।[৬] সুতরাং দেখা যায়, ইসলামপূর্ব কোন ধর্ম, সমাজ ও সভ্যতায় নারীদের কোনো সম্মান, মর্যাদা, নিরাপত্তা ও উত্তরাধিকার ছিল না। ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মে নারী স্বাধীনতা, মৌলিক অধিকার, নারীর জানমাল, ইজ্জতের নিরাপত্তা, মীরাছ, সামাজিক অধিকার, মতামত ব্যক্ত করার অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার ইত্যাদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। নারী কোথাও স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল না। ইসলামই প্রথম উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও স্বামীর সম্পত্তিতে নারীর মৌলিক অধিকার প্রদান এবং প্রাক-ইসলামী যুগের নারী-পুরুষের অবৈধ সম্পর্ককে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ইসলামে সভ্যতার ধ্যানধারণা বিকাশের সাথে সাথে নারীর জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় এবং সমাজের প্রতিটি স্তরে তার প্রভাব বিস্তার লাভ করে। পরবর্তীকালে দেখা যায় যে, পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও সম্মুখ সমরে অংশগ্রহণ করেছেন।[৭] হিন্দু সভ্যতায় নারী

---

১. Dr. Jamal A. Badawi, *Status of Women in Islam,* IPCI, U.K, p. 5.

২. ibid, p. 6.

৩. ড. (ক্যাপ্টেন) আব্দুল বাছেত, *নারীর মর্যাদা : ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মে* (ঢাকা: দৈনিক ইনকিলাব, ১১ এপ্রিল, ২০০৫ খৃস্টাব্দ), পৃ. ১৩।

৪. আব্দুল খালেক, *নারী* (ঢাকা: দীনী পাবলিকেশন্স, ৯৩ মতিঝিল, দ্বিতীয় প্রকাশ: ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৫।

৫. ড. মুস্তাফা আস সিবায়ী, *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৭ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৫।

৬. Nazhat Afza & Khurshid Ahmed, *The Position of Women in Islam* (Kuwiet : Islamic Book Publishers, , 1982), p. 12.

৭. Philip K. Hitti, *History of The Arabs* (London : Saint Martin Press 1951), p. 28

Dhaka University Institutional Repository

জন্মগতভাবেই একটি পাপিষ্ঠ সত্তা।[১] মনু'র মতে নারী জন্মগতভাবেই দুশ্চরিত্রা ও লম্পট।[২] বৌদ্ধ সভ্যতায় নারী সব অসৎ প্রলোভনের ফাঁদ। এর বর্ণনা দিতে গিয়ে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ওয়েস্টার মার্ক (Westermark) বলেন : "Women are of all the snares which the tempter has spread for men, the most dangerous; in women are embodied all the powers of infatuation which build the mind of the world." মানুষের জন্য প্রলোভন যতগুলো ফাঁদ বিস্তার করে রেখেছে, তন্মধ্যে নারীরাই সর্বাপেক্ষা বিপদজনক। নারীর মধ্যে সকল মোহিনীশক্তি অঙ্গীভূত হয়ে আছে, যা সমগ্র বিশ্বের মনকে অন্ধ করে দেয়।[৩] ইয়াহুদী সভ্যতায় নারী একটি অভিশপ্ত জীব। তাই পিতা বা স্বামীর সম্পত্তিতে তার অধিকার নেই। তাছাড়া বিবাহ ছিল তাদের নিকট ব্যক্তিগত ব্যাপার। এইজন্য রাষ্ট্র ও ধর্মের অনুমতির প্রয়োজন ছিল না।[৪] খৃষ্ট সভ্যতায় নারীরাই পৃথিবীর সকল অশুভ কার্যের উৎস বলে বিবেচিত।[৫] চীন সভ্যতায় নারী সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রাণী বিবেচিত হত।[৬] গ্রীক সভ্যতার অন্যতম রূপকার সক্রেটিসের মতে, নারী হল সব ভাঙ্গন ও বিশৃঙ্খলার উৎস।[৭] রোম সভ্যতায় নারী কৃতদাসীর ন্যায়। তার কোনরূপ অধিকার স্বীকৃত ছিল না।[৮] ইউরোপীয় সভ্যতায় নারী শয়তানের অঙ্গ (She is the organ of the devil)।[৯] যুদ্ধ, মদ ও নারীই ছিল জাহেলী আরবদের প্রধান উপজীব্য। এভাবে বিশ্ব সভ্যতায় কোথাও নারীর যথাযথ উচ্চ অবস্থান প্রতিষ্ঠিত হয়নি।[১০] কেবলমাত্র ইসলামী সভ্যতায় সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রদান করে নারীকে মহিমান্বিত করেছে। কিন্তু ইসলাম ব্যতিত অন্যান্য সভ্যতায় নারীর যে করুণ অবস্থা ও পরিণতি ছিল তা আমরা নিম্নোক্ত আলোচনার মাধ্যমে জানতে পারি।

১. চীনা সভ্যতায় নারী

পৃথিবীতে চীন দেশেও নারীদের মর্যাদা অধিক নিকৃষ্ট ছিল। চীনের ধর্ম গ্রন্থে নারীকে Water of Woe বা 'দুঃখের প্রস্রবণ' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা সকল সৌভাগ্য ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আবদুল খালেক স্বীয় গ্রন্থ 'নারী ও সমাজ' এ চীন দেশের নারীদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন- 'মানব

---

১. আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ* (ঢাকা: দীনী পাবলিকেশন্স, ৯৩ মতিঝিল, দ্বিতীয় প্রকাশ: ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৪।

২. Syed Ameer Ali : *The spirit of Islam,* Calcutta : B. I. Publication, 1978, P. 30; Ramesh Chandra Mazumdar, *Idel and position of Indian Woman in domestic life,* Great women of India (ed) Swamei and Mazumdar, P. 19.

৩. Nazhat Afza and Khurshid Ahmed, *The Position of Women in Isla* (Kuwait : Islamic Book Publishers, 1982), PP. 12-13.

৪. Report of the commission, *Marriage, Divorce and the Church* (London : Print 1971), P. 80.

৫. *Bible : Gensis,* 3 : 16 (New York, 1973), P. 3.

৬. আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ,* পৃ. ৫।

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২।

৮. Said Abdullah Seif Al-Hatimy, *Women in Isla,* (Lahor : Islamic Publications Ltd., Oct. 1979), PP. 3-4.

৯. *মাসিক মদীনা*, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭ খৃস্টাব্দ, পৃ. ২৫।

১০. Fida Hussain Malik : *Wives of Prophet (SM)* (Pakistan : Lahor Asharaf Publication, 1983, BC), PP. 12-15.

Dhaka University Institutional Repository

সমাজে নারীদের স্থানই সর্বনিম্নে। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! নারী সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য প্রাণী। পৃথিবীতে নারীর মত নিকৃষ্ট আর কিছুই নেই।[১] এ সভ্যতায় নারীদের প্রতি অবজ্ঞা, অবহেলা আর নির্মম অত্যাচার করা হয়েছে। তাদেরকে নির্মম শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। নানা অত্যাচারে এদের জীবনকে করা হয়েছে বিভীষিকাময়। জনৈক ঐতিহাসিক বলেন : 'চীনে নারীর জীবন পদ্ধতি ছিল অমানবিক। সেখানে নারীদের দ্বারা লাঙ্গল টানানো হত, বোঝা বহন করানো হত, আর সামান্য কিছু ক্রুটি হলে উপহার পেত মনিব কর্তৃক চাবুকের আঘাত। নারীর ঘাড়ে চড়ে অভিজাত লোকেরা ভ্রমণ করত। বাজারে গোশতের অভাব হলে তারা মেয়ে মানুষ কিনে এনে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রান্না করে নিজেরা খেত আর মেহমানদের খাওয়াতো।[২] জন্মগত সূত্রেই যে বালক-বালিকার মধ্যে ব্যবধান ছিল বিস্তর ও গ্রহণযোগ্যতা ছিল ভিন্নতর। সে দেশে বালকের দরজার সামনে এমনভাবে দাঁড়াত, যেন তারা স্বর্গ থেকে আগত দেবতা। স্ত্রী কন্যা প্রসব করছে সংবাদে কোন পিতাই আনন্দিত হত না। বয়ঃপ্রাপ্ত বালিকা তার উপর যেন কারও দৃষ্টি না পড়ে এ জন্যে সে স্বীয় প্রকোষ্টে লুকিয়ে থাকত। সে মৃত্যুবরণ করলে কেউই তার জন্য রোদন করত না।[৩] সামাজিক কোন দোষ-ক্রুটি করার কারণেও অনেক সময় নারীদেরকে পরিবার ও সমাজচ্যুত করা হত। এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, ব্যভিচারের অপরাধে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে পারত। ফলে তার মাতা-পিতা তাকে গ্রহণ করতে সম্মত হলে সে তাদের নিকট চলে যেত। অন্যথায় তাকে রাস্তায় বের করে দেওয়া হত।[৪]'

২. গ্রীক সভ্যতায় নারী

গ্রীক সভ্যতায় সংস্কৃতি, তাহযীব-তমুদ্দুন, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার উন্নয়ন ঘটলেও নারীর সামাজিক অবস্থান ছিল খুবই নিম্ন। নারীকে মানবতার কলঙ্ক টিকা মনে করা হত। বিশ্বখ্যাত গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস বলেন : "Woman is the greatest source of chaose and disurption in the world. She is like the Dafali Tree which outwardly looks very beautiful, but if sparrows it they dil without dail."

'নারী জগতে বিশৃঙ্খল ও ভাঙ্গনের সর্বশ্রেষ্ট উৎস। সে দাফালি বৃক্ষের ন্যায়, যা বাহ্যত দেখতে খুব সুন্দর। কিন্তু চড়ুই পাখি এটা ভক্ষণ করলে মৃত্যু অনিবার্য।[৫] গ্রীক সমাজের লোকেরা যুক্তিবাদী হওয়া সত্ত্বেও নারীদের বেলায় ছিল স্বার্থপর, বিদ্বেষপরায়ণ ও ঘোর মানবতা বিরোধী। একজন গ্রীক সাহিত্যিক বলেন : দু'টি স্থানে নারী পুরুষের জন্য খুশির কারণ হয়, তার একটি হচ্ছে বিয়ের দিন। অপরটি হচ্ছে মরণের দিন।[৬] লিকোয়ী 'ইউরোপীয় নৈতিক ইতিহাস' বইয়ে লিখেছেন, 'সামগ্রিক দিক দিয়ে গ্রীক সমাজে সতী-সাধ্বী নারীদের সামাজিক অবস্থান নেহায়েত

---

১. আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ: এপ্রিল ২০০৪ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৫।

২. অধ্যাপক মোঃ ফকির হোসেন, ইসলামে নারীর মর্যাদা, *মাসিক মদীনা*, (ঢাকা: সেপ্টম্বর, ১৯৯৭ খৃস্টাব্দ), পৃ. ১৮।

৩. আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।

৪. Said Abdullah Seif Al-Hatimy, *Women in Islam,* (Islamic Publications Ltd. Lahor, Pakistan: Oct. 1979), PP. 2-3.

৫. আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২।

৬. সাইয়্যেদ জালালুদ্দীন আনসারী ওমর, অনু. মালানা কারামত আলী নিজামী, *ইসলামী রাষ্ট্রে নারীর অধিকার* (ঢাকা: সালাউদ্দিন বইঘর, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারী ১৯৯৮ খৃস্টাব্দ), পৃ. ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্ন পর্যায়ের ছিল। তাদের সমগ্র জীবনটাই দাসত্বের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে অতিবাহিত হত।[১] গ্রীক সভ্যতার নারীদের অবস্থান ব্যক্ত করতে গিয়ে এণ্ডারস্‌কি (Anderoskey) বলেন : "Cure is possible of fireburns and snake-bite; but it is impossible to arrest women's charms." 'অগ্নিদগ্ধ ও সর্পদংশিত ব্যক্তির আরোগ্য লাভ সম্ভব। কিন্তু নারীর জাদু প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়।[২] এ সভ্যতায় বিয়ের ক্ষেত্রে নারীর মতামত ও আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের সুযোগ ছিল না। মাতা-পিতার ইচ্ছানুসারে তাকে বিয়েতে বাধ্য হতে হত। মাতা-পিতার নির্দেশে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ব্যক্তিকে স্বামী ও প্রভুরূপে বরণ করে নিতে হত। নারীদেরকে অত্যন্ত তুচ্ছ বলে গণ্য করা হত এবং সর্বদা পুরুষ আত্মীয়-স্বজন, পিতা, ভ্রাতা, চাচা, মামা ও খালুকে তাদের মেনে চলতে হত।[৩]

৩. রোম সভ্যতায় নারী

ঐতিহাসিকদের ভাষ্যমতে, রোমানগণ স্ত্রী তথা নারীদেরকে অপ্রাপ্ত বয়স্কা শিশু বলে গণ্য করত। সুতরাং নারীকে সর্বদা পুরুষের তত্ত্বাবধানে থাকতে হত। রোমান আইন-কানুন দীর্ঘকাল পর্যন্ত নারীদের মর্যাদাকে হেয় ও নীচু করে রেখেছিল। পরিবারের নেতা ও পরিচালক পিতা বা স্বামী নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের উপর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব করার অধিকার ভোগ করতো। যখন ইচ্ছে তখনই নারীকে ঘর থেকে বের করে দিত।[৪] রোমান সমাজে দাস-দাসীদের ন্যায় সেবা-শুশ্রূষা করা-ই নারীদের একমাত্র কাজ মনে করা হত। নারীদের থেকে চাকরাণীর কাজ নেয়ার জন্যই পুরুষগণ তাদেরকে বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ করে দাসত্বের জগদ্দল পাথর বুকের উপর চাপিয়ে দিত। বিয়ের পর সব সম্পত্তি স্বামীর অধীনে চলে যেত। স্ত্রীর উপর স্বামীর সর্বপ্রকার অধিকার ছিল। স্ত্রী কোন অপরাধ করলে তার বিচারের সম্পূর্ণ অধিকার স্বামীর ছিল। এমনকি স্বামী স্ত্রীর মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দিতে পারত'।[৫] রোমান সমাজের নারীদের প্রকৃতি, ব্যক্তিত্ব, যোগ্যতা ও তাদের প্রতি নির্মম নির্যাতনের বিবরণ দিয়ে সাঈদ 'আব্দুল্লাহ সাইফ আল-হাতেমী বলেন : 'রোমান স্ত্রী স্বামীর খরিদকৃত সম্পত্তির ন্যায় ছিল। স্বামীর কল্যাণের জন্য তাকে দাসীর মতই থাকতে হত। সামাজিক কোন অনুষ্ঠানে সে যোগদান করতে পারত না; সে কোন আমানত রাখতে পারত না এবং কোন কিছুর জামিন, সাক্ষী ও শিক্ষক হতে পারত না। সে পুরুষের গৃহ সজ্জিত করার প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর তার উপর তার পুত্র বা দেবর-ভাসুরদের আইনানুগ অধিকার জন্মাত।'[৬]

৪. ইউরোপীয় বা পশ্চিমা সভ্যতায় নারী

বর্তমান যুগে নারীর সমানাধিকারের সবচেয়ে বড় দাবিদার হচ্ছে ইউরোপীয় দেশগুলো। অথচ এই সব দেশে এক শতাব্দীর কিছু পূর্বে নারীগণ পুরুষের যুল্‌ম, নির্যাতনের শিকারে পরিণত হল। এমন কোন আইনগত বিধান ছিল

---

১. প্রাগুক্ত।

২. Nazhat Afza and Khurshid Ahmed, *The Position of Women in Isla,* (Kuwait: Islamic Book Publishers, 1982), pp. 9-10.

৩. আব্দুল খালেক, *নারী ও সমাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

৪. *ইসলামী রাষ্ট্রে নারীর অধিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

৫. Said Abdullah Seif Al-Hatimy, *Women in Islam.* ibid, pp. 3- 4.

৬. ibid, pp. 3-4.

Dhaka University Institutional Repository

না, যা নারীগণকে পুরুষের নির্মম অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই দিতে পারত। নারী স্বাধীনতার বিশ্ববিখ্যাত নিশান বরদার মিইল তাঁর 'শাসিত নারী' গ্রন্থে নারীদের অবস্থা এভাবে বর্ণনা করেছেন, 'ইউরোপীয় প্রাচীন ইতিহাসের পাতা উল্টালে আপনি জানতে পারবেন যে, পিতা-মাতা তার মেয়েদেরকে যে বিক্রয় করে ফেলত, তা বেশি দিনের কথা নয়। তারা মেয়েদের ইচ্ছা ও মর্জির কোন তোয়াক্কাই করত না। ইচ্ছে হলে বিক্রয় করত, ইচ্ছে হলে অপাত্রে বিয়ে দিত। যা খুশী তাই করতে পারত। তাদের মতামত ও ইচ্ছার কোন মূল্যই দেয়া হত না।'[১] ইউরোপীয় সমাজে নারীর অবস্থান, ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন সম্বন্ধে অধ্যাপক জাকির হোসেন বলেন : 'আজ আধুনিক, সভ্য (?) আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশগুলোর বর্তমান ও বিগত ইতিহাস, নথিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজ তালাশ করে দেখা গেছে যে, সেখানেই নারী জাতির প্রতি চরম অবমাননা করা হয়েছে। নারীর কোন অধিকার সেখানে ছিল না। নারীর প্রতি তারা কটূক্তি আরোপ করেছে। তারা নারীকে শয়তানের অঙ্গ (She is the organ of the devil), দংশনের নিমিত্ত সদা প্রস্তুত বৃশ্চিক (A Scorpion ever ready to sting), বিষক্তা বোলতা (Poisonous Wasp) বলে আখ্যায়িত করেছে।

৫. ভারতীয় উপমহাদেশে নারী

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার সেই দু'টি চরণ- "এ বিশ্বে যত ফুটিয়াসে ফুল,ফলিয়াসে যত ফল,নারী দিল তাহে রুপ-রস-মধু-গন্ধ-সুনির্মল।তাজমহলের পাথর দেখিয়াছ দেখিয়াছ তার প্রাণ? অন্তরে তার মমতাজ নারী। বাইরেতে শা-জাহান।"[২] পৃথিবীর মোট জনগোষ্ঠীর অর্ধেকই নারী। নারীর অধিকার ,ক্ষমতা,মর্যাদা নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে চলছে নানা আন্দোলন আর সংগ্রাম। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে নারীরা উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। নারীর মাধ্যমে কেউ উত্তরাধিকার লাভ করতে পারতো না। মুসলিম শরী'আ আইনে কন্যা সন্তান পিতার যে পরিমান সম্পদের অধিকারী হয় পুত্র সন্তান অধিকারী হয় তার দ্বিগুন সম্পদের। বাংলাদেশ সরকার নারীর সম্পত্তির অধিকার বিষয়ে একটি খসরা তৈরী করে নীতি জারি করেছে। ২০১১ সালে ৭ মার্চ নারী ও শিশু মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা রাত ১০টা পর্যন্ত কাজ করেন। সরকারের লক্ষ্য ছিল ২০১১ সালের ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শতবর্ষ উপলক্ষে নারীর অধিকার, মর্যাদা, ক্ষমতায়ন বিষয়ে বিশাল কিছু উপহার দেয়া। সে উপলক্ষে ঐ খসড়া যথারীতি পরের দিন ৮ মার্চ পেশ করা হলো। বর্তমান ২০১৪ সালেও তা ফাইলবন্দী পড়ে আছে। কিন্তু এই খসড়া নীতি উপলক্ষে এক শ্রেণীর নারী সমাজ জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আনন্দ মিছিল করে, মিষ্টি বিতরণ করেছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মহিলা পরিষদ নানা কর্মসূচী পালন করেছে। কিন্তু হাস্যকর বিষয় হলো যে নীতি তিন বছর ধরে ফাইলবন্দী তা নিয়ে এত মাতামাতি করে কি হলো?। কাজের কাজ কিছুই হয়নি। সরকার এটা করে নিজেদের কৃতিত্ব প্রচার করেছে। কিন্তু উন্নত বিশ্বে কি ঘটছে? তারা নারীকে উন্নত মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। দেশ গঠনে তারা পুরুষের সাথে সমান তালে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশে বাসে সিট বরাদ্ধ দিয়ে শুরু হলো নারী অধিকার। বাসে প্রথম কয়েকটি বা ১০টা সিট নারীর জন্য বরাদ্ধ হলো ফলাফল দাড়াল এই যে, ১০ জনের বেশী নারী বাসে উঠলে আর মহিলা সিট খালি না থাকলে তারা

---

১. *ইসলামী রাষ্ট্রে নারীর অধিকার*, পৃ. ১৮।

২. অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন, *ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর সম্মান ও মর্যাদা* (ঢাকা: বাংলাদেশ হাদীস সোসাইটি, এপ্রিল ২০১৪ খৃস্টাব্দ), পৃ. ২৬।

Dhaka University Institutional Repository

দাড়িয়েই থাকবেন। এর পূর্ববর্তী সময়ের চিত্র কি ছিল তা আমাদের সবার জানা। মেয়েরা বাসে উঠলে ছেলেরা সিট ছেড়ে দাড়িয়ে মেয়েদের বসতে দিতেন। আজ আর সে চিত্র দেখা যায় না। বরং ছেলেরা বলে যেহেতু সমধিকার তাহলে আর ১০টি ছেলের মত তারাও দাড়িয়ে যাবে।

বাংলাদেশ নারীর ক্ষমতায়নে এগিয়েছে দৃশ্যত সত্য, কারণ প্রধান দুই দলের সর্বোচ্চ আসনে রয়েছেন দুই নারী। বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের এ ক্ষমতায়নকে প্রকৃত ক্ষমতায়ন বলা যায় না কারণ এ ক্ষমতায়নকে অনেকটা রাজতান্ত্রিক বলা চলে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজনৈতিক সাফল্য তার পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের মাধ্যমে আবার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার সাফল্য তাঁর স্বামী প্রয়াত শহীদ প্রেসিডেন্ট শহীদ জিয়াউর রহমানের মাধ্যমে। তবুও এদেশে নারীর অধিকারের কথা বলার লোক বেড়েছে কিন্তু নারী পেয়েছে কতটুকু সেটাই বিবেচ্য বিষয়। নারীদের ক্ষমতায়ন যেন এক কঠিন কাচের দেয়ালে বন্দী।[১] বাংলাদেশে নারীর জন্য আইন আছে আদালত নেই। পুরুষ সমাজ অবৈধ যৌতুক আদায়ে স্ত্রীর উপর চাপ সৃষ্টি করে, নির্যাতন করে কিন্তু তারা মোহরানা প্রদানে উদাসীন। বোনকে প্রাপ্য সম্পত্তি দিতে নারাজ কিন্তু স্ত্রীর প্রাপ্য সম্পদ ভোগ করতে মরিয়া। আমাদের দেশে না আছে ইসলামী শরীআ আইনের যথার্থ প্রয়োগ না আছে রাষ্ট্রীয় আইনের প্রয়োগ। আর নারীর সম-অধিকারের জন্য যে শ্লোগান ওঠে এসেছে পক্ষান্তরে নারীর বেঁচে থাকার অধিকার দিতে তেমন শ্লোগান ওঠে আসছে না। প্রতিনিয়ত নারী নির্যাতিত হচ্ছে। নারী তার ধর্মীয় ও মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তখন নারীর অধিকারের কথা বলার লোক খুজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে যায়। সন্তানের উপর মায়ের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত। এটা নারীর সমাজের জন্য বিরাট পাওয়া। কিন্তু পুরুষের নিকট সে অধিকারের মূল্যায়ন কতটুকু সেটাই দেখার বিষয়। নারী অধিকার সম্পর্কে ইসলাম যা বলেছে এবং যে নির্দেশ দিয়েছে তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আইনের খাঁচায় বন্দী। বাংলাদেশ ৯০ ভাগ মুসলিম জনগোষ্ঠীর দেশ। তা সত্বেও আমরা পার্শ্ববর্তী দেশের কৃষ্টি-কালচারের সাথে তাল মিলাতে গিয়ে নিজেদের মূল সত্তা থেকে দূরে সরে গিয়েছি এবং না হতে পারছি তাদের মত, না হতে পারছি ইসলামের বিধিবিধান পরিপালন করতে। ফলে আমরা মাঝ নদীতে কুল কিনারা হীন ব্যর্থ ও হতাশ জনপদে পরিণত হয়েছি। এতে কোন সময় আমাদের নারীরা খুজে ফিরে ধর্মের বাণীতে আবার কখনো নারীর নতুন খসড়া নীতির দিকে। কোনটি যে তাদের নিকট সঠিক তারা তা নিজেও জানে না; ফলে প্রকৃত পক্ষে তারা কোন কিছুই পাচ্ছে না। এতে তারা বিভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত।

বর্তমান বিশ্বে বহুল প্রচলিত শব্দের মধ্যে 'নারী অধিকার' শব্দটি অন্যতম। শব্দটি সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, বেতার, টেলিভিশন, লিফলেট এমনকি মানববন্ধন ও প্রতিবাদে জোরছে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। অবাক হওয়ার বিষয় হলো এতকিছুর পরও পত্রপত্রিকার পাতায় কিংবা সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ফেসবুক, টুইটার ও ইন্টারনেটের পেজে চোখ রাখলেই দেখা যায় নারী জীবনের করুণ কাহিনী। নারী নির্যাতন, ধর্ষন, অপহরণ, ইভটিজিং, শ্লীলতাহানি শব্দগুলো যেন আজ নারীর গুণবাচক শব্দে পরিণত হয়েছে। ইসলাম নারীদের জন্য পরিপূর্ণ মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করলেও মুসলিমরা এর বাস্তব রুপ দিতে ব্যর্থ হওয়ায় তা আজ অনেকের কাছে সংকীর্ণ বলে মনে হয়। তবে এ ধারণা নিতান্তই অজ্ঞতার ফসল। কারণ ইসলামের ভাষ্যমতে নারী শুধু

[১]. *ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর সম্মান ও মর্যাদা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

Dhaka University Institutional Repository

পুরুষের অর্ধাঙ্গিনীই নয়; বরং পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠিও।[১] নারীকে শৈশবে মাতৃদুগ্ধপান, সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালিত হওয়া, সুশিক্ষা গ্রহণ ও ভালো পাত্রস্থ হওয়ার অধিকার দিয়েছে ইসলাম। একজন নারী শৈশবে মাতা-পিতা ও ভাইদের কাছে চোখের প্রশান্তি ও কলিজার টুকরা, কৈশরে সম্মান ও মর্যাদার পাত্রী। আর বৈবাহিক জীবনে স্বামীর ঘরে নিবির ভালবাসার সাথী হিসেবে বিবেচিত।[২] এ জন্যই বিয়ের আগে একজন নারীর প্রতি তার অভিভাবকের দৃষ্টি থাকে সুদূর প্রসারিত। ফলে সে থাকে সদা সুরক্ষিত। তার ওপর কোন প্রকার নির্যাতন অথবা খারাপ দৃষ্টি পড়ুক অভিবাবক তা কামনা করেন না। আর বিয়ের পর সে স্বামীর কাছ থেকে পেয়ে থাকে যথাযথ মর্যাদা, সহানুভূতি ও মৌলিক চাহিদা। ইসলামের এ সুমহান ব্যবস্থাপনায় একজন নারীর জীবন হয়ে ওঠে সুন্দর, সুশিক্ষিত, নির্মল ও আনন্দময়। নারীর প্রতি ইসলামের সবচেয়ে বড় অবদান হলো, ইসলাম নারীকে সম্পদের অধিকারী বানিয়েছে।

পিতামাতার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে ছেলে ও মেয়ের অংশ নির্ধারণ প্রসঙ্গে ইরশাদ হচ্ছে :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ

"পিতামাতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি ছেলেমেয়ের মধ্যে বণ্টন সংক্রান্ত আল্লাহ্‌র নির্দেশ হচ্ছে : এক ছেলের অংশ দুই মেয়ের সমপরিমাণ। কিন্তু মৃতব্যক্তির দুই এর অধিক মেয়ের ক্ষেত্রে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ এবং একমাত্র মেয়ের ক্ষেত্রে সেই হবে অর্ধেক সম্পদের মালিক।"[৩] এভাবেই ইসলাম নারীদেরকে সম্পদের অধিকারী বানিয়েছে। ইসলাম সর্বজনীন জীবন ব্যবস্থা। ইসলামী আইনে সম্পদের উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের তুলনায় অর্ধেক দিয়ে পূর্ণ ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেছে বলে আমরা মনে করি। অবশ্য অনেক নির্বোধ এটিকে অবিচার ও যুল্‌ম বলে মনে করে। নারী হলো সমাজের অর্ধেক যারা আর অর্ধেককে প্রতিপালন করে। নারী সে পুরুষের মা, বোন, স্ত্রী, ভালোবাসার উৎস, জীবনের অনুভূতি।[৪] মহান আল্লাহ্ মাকে সম্মান করা ও তার সাথে সদাচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। কুর'আনের একটি সূরার নাম আন নিসা বা (নারী)। যেখানে বিশ্বের দূর্বল শ্রেণী বিশেষ করে নারীর প্রতি ন্যায় বিচার,সদাচরণ ও দয়া করার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা মায়ের সাথে উত্তম আচরণ করাকে জান্নাতে প্রবেশের অন্যতম উপায় হিসেবে উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হন নি। বরং তিনি তার আনুগত্য করার পাশাপাশি মা-বাবার অনুগত হওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন।

ইরশাদ হচ্ছে :

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۞ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

"আর তোমার প্রতিপালক বিধান জারি করেছেন যে, তাকে ছাড়া তোমরা অন্য কারো উপাসনা করবে না। আর মাতাপিতার প্রতি সদাচরণ করবে। তাদের একজন বা তাদের উভয়ে যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত

---

১. *ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর সম্মান ও মর্যাদা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

৩. আল কুর'আন, ৪ : ১১।

৪. *ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর সম্মান ও মর্যাদা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

Dhaka University Institutional Repository

হয়, তবে তাদেরকে বিরক্তি বা অবজ্ঞাসূচক কথা বলো না। আর তাদেরকে ভর্ৎসনা করো না। তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো। তাদের জন্য সদয়ভাবে নম্রতার বাহু প্রসারিত করে দাও। আর বলো 'হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করো যেমনিভাবে তারা আমাকে শৈশবে লালন পালন করেছেন।"[১] হাদীসে মাকে সম্মান করা ও মায়ের যত্ন নেয়ার ব্যাপারে তাগিদ দেয়া হয়েছে। এক ব্যক্তি মহানবী (সা) কে জিজ্ঞাসা করলো :মানুষের মধ্যে আমার উত্তম সাহচর্য পাওয়ার অধিকার রাখেন কে? রাসূল (সা) বললেন 'তোমার মা'। লোকটি বললো অতঃপর কে? তিনি (সা) বললেন 'তোমার মা'। লোকটি বললো অতঃপর কে? তিনি (সা) বললেন 'তোমার মা'। লোকটি বললো অতঃপর কে? তিনি (সা) বললেন 'তোমার বাবা' [২] এভাবে ইসলাম নারীকে বানিয়েছে সম্মানের শ্রেষ্ঠ পাত্রী। সম্পদে করেছে ন্যায্য অধিকারিণী। আর এ জন্য আজ বিশ্ববিবেক এক বাক্যে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, একমাত্র ইসলামই নারী জীবনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, উপযুক্ত, চিরকল্যাণকর, বিজ্ঞান সম্মত ও যুক্তিসঙ্গত বিধান দিয়ে নারীর পূর্ণ মর্যাদা ও যথার্থ অধিকার প্রদান করেছে।

কিন্তু এ সম্মান অধিকারী নারী সমাজ পাশ্চাত্য ও প্রতিবেশী দেশের সংস্কৃতির আগ্রাসনে প্রভাবিত হয়ে নিজেদেরকে প্রগতির নামে পদদলিত ও ধ্বংসের দাঢ়প্রান্তে নিয়ে গিয়েছে। যার দৃষ্টান্ত বর্তমান সভ্যতায় দেখা যায়। ভারতীয় উপমহাদেশে নারীর অবস্থা অনেকটাই আশাব্যঞ্জক। মুসলিম বিশ্বে সর্বপ্রথম যে মহিলা একটি দেশের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হন তিনি হচ্ছেন বেনজীর ভুট্টো। বেনজীর ভুট্টো পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর কন্যা। জুলফিকার আলী ভুট্টোর মৃত্যুদণ্ডের পর তাঁর স্ত্রী নুসরাত ভুট্টো পাকিস্তানের পিপলস পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে বেনজীর ভুট্টো পিতার এই দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৮৮ সালে পার্লামেন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করে পিপিপি নেত্রী ভুট্টো তনয়া বেনজীর ভুট্টো প্রধনমন্ত্রী হিসেবে সরকার গঠন করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধিবাসীর বাস এই বাংলাদেশে। এমন একটি দেশে আশির দশক থেকে ক্ষমতার শীর্ষে ক্রমান্বয়ে অধিষ্ঠিত হতে থাকে নারী নেতৃত্ব। মূলত নেতৃত্ব ও শাসনক্ষমতা পরিচালনা পুরুষেরই দায়িত্ব। প্রকৃতিগতভাবে এটাই নির্ধারিত। এমতাবস্থায় নারী নেতৃত্ব কেবল তখনই প্রতিষ্ঠিত হয়, যখন পুরুষ নেতৃত্বে দুর্বলতা দেখা দেয়। অতএব এটা নারী নেতৃত্বের কোন অপরাধ নয় বরং জাতির নেতৃত্বের দুর্বলতারই পরিচায়ক। তবে এই উপমহাদেশে নারী নেতৃত্বের পিছনে সবচেয়ে বড় এবং প্রধান যে কারণ কাজ করেছে তাহলো এক জনপ্রিয় নেতার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নেতৃত্ব।[৩] বাংলাদেশের রাজনৈতিক বড় দুই দলের দুই নেত্রী উত্তরাধিকার সূত্রে দলের প্রয়োজনেই দলের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা কর হয়। বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা সে সময় বিদেশে ছিল। ১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শেখ হাসিনা দেশে ফিরে আসেন এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গ্রহণ করেন। অন্যদিকে ১৯৮১ সালে ৩০ মে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে হত্যা করা হয়। পরবর্তীতে

---

১. আল কুর'আন, ১৭ : ২৩-২৪।

২. *রিয়াযুস স্বা-লিহীন*, হাদীস নং-৩১৪।

৩. সৈয়দ বুরহান কবীর, *শেখ হাসিনা নেত্রী থেকে রাষ্ট্রনায়ক* (ঢাকা: ভাষা চিত্র টিমওয়ার্ক সহযোগী প্রকাশনা, আজিজ মার্কেট ৩য় তলা, শাহবাগ, ২০০৯ খৃস্টাব্দ), পৃ. ১১৪-১২৪; নূর হোসেন মজিদী, *নারী নেতৃত্ব যুগে যুগে* (ঢাকা: কনফিডেন্ট পাকলিকেশন্স প্রাঃ লিঃ, ১ম প্রকাশ, মে-১৯৯৯ খৃস্টাব্দ), পৃ. ১৪৭-১৪৮; জাওয়াদুল করীম, *শেক হাসিনা সরকারের অগ্রগতির চার বছর* (ঢাকা: এস. আর প্রিন্টিং প্রেস, ২০০০ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৬৩-২৭৩; ড. *মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী*, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বহুমাত্রিক মূল্যায়ণ* (ঢাকা: অনিন্দ্য প্রকাশ, ২০০৯ খৃস্টাব্দ), পৃ. ২১-৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

দলের প্রয়োজনে ১৯৮২ সালের ৩ জানুয়ারি বেগম খালেদা জিয়া বি.এন.পি'তে যোগদান করে রাজনীতিতে যুক্ত হন। যা বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ভাঙ্গন রোধে এবং ঐক্য স্থাপনে কার্যকরি ভূমিকা পালন করেছিল।[১]

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বেনজীর ভুট্টো ছিলেন মুসলিম বিশ্বের সর্বপ্রথম নির্বাচিত মহিলা প্রধানমন্ত্রী। তিনি দু'বার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। কিন্তু দু'বারই মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে ক্ষমতা হারান। বেনজীর ভুট্টোর পিতা জুলফিকার আলী ভুট্টো সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ১৯৭৭ সালে ক্ষমতাচ্যুত হন এবং ১৯৭৯ সালে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। জুলফিকার আলী ভুট্টোর মৃত্যুদণ্ডের পর, তাঁর স্ত্রী নুসরাত ভুট্টো পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পি পি পি) নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং কন্যা বেনজীর ভুট্টোকে ভবিষ্যত নেত্রী হিসেবে গড়ে তোলেন। বেনজীর ছাত্রজীবন থেকেই পিতার রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত তিনি গৃহবন্দী ছিলেন। সামরিক শাসন প্রত্যাহারের পর ১৯৮৮ সালের পার্লামেন্ট নির্বাচনে পি.পি.পি. জয়লাভ করে এবং বেনজীর ভুট্টো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সরকার গঠন করেন। মাত্র দু'বছর পর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট গোলাম ইসহাক খান অযোগ্যতা ও দুর্নীতির দায়ে বেনজীর ভুট্টোর সরকারকে বরখাস্ত করেন ও নতুন নির্বাচনের ঘোষণা দেন। নির্বাচনে পি.পি.পি. পরাজিত হয়। মুসলীম লীগের নওয়াজ শরীফ সরকার গঠন করেন। দু'বছরের মধ্যেই প্রেসিডেন্ট গোলাম ইসহাক খান আবার সরকারের সাথে বিরোধে জড়িয়ে পড়েন।

১৯৯৩ সালে নওয়াজ শরীফ ও গোলাম ইসহাক খান উভয়েই পদত্যাগ করেন। বেনজীর ভুট্টো দ্বিতীয় দফা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। কিন্তু পরিবারে উত্তরাধিকার নিয়ে ভাই মুর্তাজা ভুট্টো ও মা নুসরাত ভুট্টোর সাথে শুরু হয় বিবাদ। কিছুদিনের মধ্যেই পুলিশের গুলিতে মুর্তাজা ভুট্টো নিহত হন। ইতোঃমধ্যে প্রেসিডেন্ট ফারুক লেঘারীর সাথে বেনজীর ভুট্টোর ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এ বিরোধের শেষ পরিণতিতে ১৯৯৬ এর শেষ দিকে প্রেসিডেন্ট ফারুক লেঘারী দুর্নীতি, অযোগ্যতা ও ক্ষমতার অপব্যবহারের দায়ে বেনজীর ভুট্টোর সরকারকে বরখাস্ত করেন।[২] মুর্তাজা ভুট্টোর স্ত্রী গিনওয়া ভুট্টো স্বামী হত্যাকাণ্ডের জন্য বেনজীরকে দায়ী করেন। অপরদিকে বেনজীর ভুট্টো এ হত্যাকাণ্ডের জন্য প্রেসিডেন্ট ফারুক লেঘারীকে দায়ী করেন। মা নুসরাত ভুট্টো মুর্তাজার পক্ষ অবলম্বন করায় বেনজির তাঁকে পার্টি প্রধানের পদ থেকে অপসারণ করেন। এতে বেনজীরের ব্যক্তিগত ইমেজ দারুণভাবে হ্রাস পায়। ফলে ১৯৯৭-এর ফেব্রুয়ারিতে পরবর্তী পার্লামেন্ট নির্বাচনে বেনজীর ভুট্টোর পি. পি. পি. শোচনীয় পরাজয়ের সম্মুখীন হয় এবং ক্ষমতা হারান।

শেখ হাসিনা

বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও প্রাক্তন বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা সাবেক প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা। ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট এক সেনা অভ্যুত্থানে শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা

---

১. দীপক চৌধুরী, *বাংলাদেশের রাজনীতিতে জননেত্রীর প্রতিকৃতি বঙ্গকন্যা শেখ হাসিনা* (ঢাকা: মম প্রকাশ, ১৯৯৫ খৃস্টাব্দ) পৃ. ৮-৯৫; সৈয়দ আবদাল আহমদ, *নন্দিত নেত্রী খালেদা জিয়া* (ঢাকা: দিব্য প্রকাশ, তৃতীয় প্রকাশ, জানুয়ারী- ২০০২ খৃস্টাব্দ, পৃ. ৪৫; এম. আনিসুজ্জামান, *ক্রান্তিকালের নেত্রী শেখ হাসিনা* (ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী-১৯৯৭ খৃস্টাব্দ), পৃ. ১১।

২. নূর হোসেন মজিদী, *নারী নেতৃত্ব যুগে যুগে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭-১৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

হয়।[১] একই বছর (১৯৭৫) সিপাহী জনতার অভ্যুত্থানের পর জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসেন। তিনি ১৯৭৬ সালে বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তন করলে সৈয়দা জোহরা তাজুদ্দীন নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ পুনর্জীবিত হয়। অবশ্য দলের প্রথম কাউন্সিল অধিবেশনে মালেক উকিল সভাপতি নির্বাচিত হন। এ সময় আওয়ামীলীগের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন মিজানুর রহমান চৌধুরী। বেগম সাজেদা চৌধুরী, ড. কামাল হোসেন, আবদুস সামাদ আজাদ, জোহরা তাজউদ্দীন, আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ, মহিউদ্দীন আহমেদ প্রমুখ। শেখ হাসিনা তাঁর পিতা নিহত হওয়ার পূর্ব থেকেই দেশের বাইরে ছিলেন। ১৯৮১ সালে আওয়ামীলীগের দ্বিতীয় কাউন্সিল অধিবেশনের সময়ও তিনি দেশের বাইরে ছিলেন।[২] দলের সভাপতি ও সাধারণত সম্পাদক পদ নিয়ে দলের শীর্ষ পর্যায়ে আপোষহীন লড়াই শুরু হলে দলে ভাঙ্গনের উপক্রম হয়। এমতাবস্থায় শেখ মুজিবুর রহমানের উত্তরসূরী, যার সাথে দলের একটি আবেগ জড়িয়ে আছে সেই শেখ হাসিনার নাম দলীয় সভানেত্রী হিসেবে প্রস্তাব করা হলে বিরোধের অবসান ঘটে। দল ভাঙ্গন থেকে রক্ষা পায়। শেখ হাসিনা ১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দেশে ফিরে আসার সাথে সাথে আওয়ামীলীগের নেত্রীত্ব গ্রহণ করেন।[৩] ১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রামে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে হত্যা করা হয়। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ জনগণের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে অস্ত্রের জোরে ক্ষমতাচ্যুত করে সামরিক শাসন জারি করেন লে. জে. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ। পিতার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত থেকে শিক্ষা নিয়েছিলেন শেখ হাসিনা। কাছ থেকে দেখেছেন বাবা শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক কর্মকৌশল, বিভিন্ন পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ। তাই সরাসরি আওয়ামীলীগের সাথে সম্পৃক্ত না থাকলেও শেখ মুজিবের সাথে আওয়ামীলীগের কর্মী বাহিনীর ভাবাবেগের সম্পর্কের কারণে উত্তরাধিকার হিসেবে শেখ হাসিনা নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।[৪] পরবর্তীকালে মহীউদ্দীন আহমেদ ও আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে দলের একটি অংশ বেরিয়ে গিয়ে বাকশাল নামে দল গঠন করলেও পরে তাঁরা আওয়ামীলীগে ফিরে আসতে বাধ্য হন। এছাড়াও ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে একটি অংশ বেরিয়ে যায়। তবে সাংগঠনিকভাবে ঐ দল মজবুতি অর্জন করতে পারেনি।

পিতা হত্যার পর ১৯৮১ সালে এই প্রথম দেশে ফিরে তিনি সমগ্র বাংলাদেশে সফর করেন এবং আওয়ামীলীগকে পুনর্গঠিত ও শক্তিশালী করে গড়ে তোলেন। শেখ হাসিনার সাহসী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে পার্টির সকল স্তরে শেখ হাসিনার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫] ১৯৮২ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে হত্যার কিছুদিন পর সামরিক আইন জারি করা হয়। লে. জে. হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ ছিলেন সামরিক শাসক। জনগণের নির্বাচিত পার্লামেন্ট বাতিল ও জাতীয় সংবিধান স্থগিত করে সামরিক শাসনের আবরণে রাজনৈতিক অচলাবস্থা সৃষ্টি করা

---

১. শেখ হাসিনা, *বাংলাদেশে স্বৈরতন্ত্রের জন্ম* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩ খৃস্টাব্দ), ৯-৮৮; মাহমুদ শফিক, *খালেদা জিয়ার উত্থান* (ঢাকা: সূচীপত্র প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি-২০০২ খৃস্টাব্দ), পৃ. ২৬।

২. নূর হোসেন মজিদী, *নারী নেতৃত্ব যুগে যুগে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮।

৩. কাউছার ইকবাল, *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন জিয়া থেকে খালেদা জিয়া* (ঢাকা: দীপ্তি প্রকাশনী, ৩৮/২খ, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০, ২০০৩ খ্রি), পৃ. ১৩-১০০; রুহুল আমিন, *বেগম খালেদা জিয়া: স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন ও মূলধারার নেতৃত্ব* (ঢাকা: হীরা বুক মার্ট, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর-১৯৯৩ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৭।

৪. *নারী নেতৃত্ব যুগে যুগে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮-১৫৯।

৫. এম নজরুল ইসলাম, *সংবাদ অ্যালবাম জেলখানায় শেখ হাসিনা* (ঢাকা: জ্যোতস্না পাবলিশার্স, ২০০৮ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৯-২৫১; *ক্রান্তিকালের নেত্রী শেখ হাসিনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০-১১।

Dhaka University Institutional Repository

হয়। সামরিক শাসন জারির এক বছর সাতদিন পর ১ এপ্রিল ১৯৮৩ ঘরোয়া রাজনীতি করার অনুমতি দেয়া হয়। ১৯৮৩ সালে সামরিক শাসক মেজর জেনারেল এরশাদের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ এক দীর্ঘমেয়াদী আন্দোলন গড়ে তুলেন এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের কঠিন ব্রত গ্রহণ করেন।[১] শেখ হাসিনার সাহসী ও বলিষ্ঠ নেত্রীত্ব শুধু আওয়ামীলীগ পুনর্গঠিত হয়নি। একই সাথে আওয়ামীলীগের পতাকাতলে সর্বস্তরের জনগণকে সংঘবদ্ধ করে এক দুর্বার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনাও তিনি করেছেন। একই সাথে স্বৈরশাসন বিরাধী আন্দোলন করেন বি.এন.পি. ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ। জাতীয় দাবি এরশাদের পতন আন্দোলন চলে দীর্ঘ সাড়ে তিন বছর। ৩০৬ দিন পর ১ জানুয়ারি ৮৬, দেশে প্রকাশ্য রাজনীতি শুরু হয়। দেশব্যাপী নেতৃত্ব দেওয়াকালীন সময়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ হঠাৎ করে এরশাদ ঘোষিত নির্বাচনে অংশগ্রহণের ঘোষণা দেয়।[২] ৭ মে ৮৬ জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ ৭৬টি আসন লাভ করে। ব্যাপক কারচুপি, সহিংস ঘটনার মধ্য দিয়ে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনী হাঙ্গামায় কমপক্ষে ৫০ জন নিহত ও পাঁচ শতাধিক আহত হয়। শেখ হাসিনা ঐ দিনই সাংবাদিক সম্মেলনে ব্যাপক কারচুপী হয়েছে বলে অভিযোগ করেন এবং ৫০টি আসন পুনঃ নির্বাচনের দাবি করেন। মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে ১০ অক্টোবর ১৯৮৬ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ হরতাল আহ্বান করে এবং এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। বি.এন.পির সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে আপোষহীনভাবে আন্দোলন করে। অবশেষে সকল রাজনৈতিক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কাছে এরশাদ সরকারের পতন হয়। পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।[৩] শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ ১৯৯১-এর সংসদ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হন। এ নির্বাচনে খালেদা জিয়া ও তাঁর দল ১৪৪টি এবং আওয়ামীলীগ ৮৪টি আসন লাভ করেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ১৯৯১ সালে সংসদ নির্বাচনে আওয়ামীলীগ ৮৪টি আসন লাভ করে এবং জাতীয় সংসদে শেখ হাসিনা বিরোধী দলীয় নেত্রীর আসন অলংকৃত করেন।[৪] ১৯৯১ সালের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হয়ে আওয়ামীলীগ ১৯৯৪ শুরুর দিক থেকে বি.এন.পি. সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত এ আন্দোলনের ফলে বি.এন.পি. তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে সংবিধানভুক্ত করে ক্ষমতা থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হন।[৫] জামায়াতে ইসলামীর উদ্ভাবিত ফর্মুলা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করে বিল পাস করা হয়। ১৯৯৬-এর ১২ই জুনে অনুষ্ঠিত সপ্তম সংসদ নির্বাচনে আওয়ামীলীগ ৩০০ আসনের মধ্যে ১৪৬টি আসনে জয়লাভ করে এবং জাতীয় পার্টি ও জাসদের সহায়তায় সরকার গঠন করেন। দীর্ঘ পাঁচ বছর পূর্ণ মেয়াদে বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনা সরকারি দায়িত্ব পালন করেন।[৬] ২৩শে জুন ১৯৯৬ বিকেল ৫টায় শেখ

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

২. রুহুল আমিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩।

৩. কাউছার ইকবাল, *বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও বেগম খালেদা জিয়া* (ঢাকা: হাসি প্রকাশনী, নর্থব্রুক হল রোড, ২০০৩ খৃস্টাব্দ), পৃ. ১১-৯২; সৈয়দ আবদাল আহমদ, *নন্দিত নেত্রী খালেদা জিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।

৪. মহিউদ্দীন খান মোহন, (সংকলক) *প্রিয় দেশবাসী নির্বাচিত ভাষণ ১৯৯১-১৯৯৬ খালেদা জিয়া* (ঢাকা: মৌলি প্রকাশনী, ২০০৬ খৃস্টাব্দ), পৃ. ১৯-৫২৭; সৈয়দ আবদাল আহমদ, *নন্দিত নেত্রী খালেদা জিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।

৫. নূর হোসেন মজিদী, *নারী নেতৃত্ব যুগে যুগে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯।

৬. সৈয়দ আবদাল আহমদ, *নন্দিত নেত্রী খালেদা জিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।

Dhaka University Institutional Repository

হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ সরকার গঠন করে। ১৯৯৬ সালের ১২ জুন সপ্তম সংসদের নির্বাচনে বি.এন.পি. ১১৬টি আসন পেয়ে বাংলাদেশের সংসদীয় ইতিহাসে বৃহত্তম বিরোধীদল হিসেবে আবির্ভূত হয়। দীর্ঘ একুশ বছর পর আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় গিয়ে ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস এবং সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন। এছাড়াও দেশী-বিদেশী বহু চুক্তি স্বাক্ষর করেন।[১] এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি, পার্বত্য শান্তি চুক্তি, জননিরাপত্তা আইন পাস এবং ইনডেমনিটি আইন বাতিল করেন। বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের নেতা প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনা তাঁর রাজনৈতিক জীবনের দীর্ঘ পাঁচ বছরের প্রধানমন্ত্রীত্ব শেষ করে সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় অবশেষে ২০০১, ১৫ই জুলাই বিচারপতি লতিফুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ১ অক্টোবর অষ্টম সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করেন। ০১ অক্টোবর ২০০১ এর নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ ৬৩টি আসন লাভ করে।[২] ০১ অক্টোবর ২০০১ এর সংসদ নির্বাচনে আওয়ামীলীগের বিপক্ষে চারদলীয় জোট ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। ফলে বি.এন.পি. ও চারদলীয় জোট ২১৩টি আসনে বিজয়ী হন। আওয়ামীলীগ নেত্রী শেখ হাসিনা অষ্টম সংসদের বিরোধী দলের নেত্রীর আসন অলংকৃত করেন। ২০০৮ সালের ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামীলীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সরকার গঠন করে এবং শেখ হাসিনা প্রধনমন্ত্রী হন।

বেগম খালেদা জিয়া

তিনি কোন রাজনৈতিক পরিবারের সদস্য ছিলেন না। রাজনীতিতে বেগম খালেদা জিয়ার আবির্ভাব এক বিস্ময়। অনেকটা আকস্মিকভাবেই রাজনীতিতে এসেছিলেন খালেদা জিয়া। রাজনীতিতে আসার তাঁর কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না। জিয়ার সংসারে গৃহবধূ হিসেবেই তিনি নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। প্রেসিডেন্ট জিয়ার মৃত্যুর পর বেগম খালেদা জিয়াকে তাঁকে রাজনীতিতে আসার কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়।[৩] ১৯৮১ সালের ৩০ মে এক ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিহত হন। এ সময় জাতি এক মহা সংকটের মধ্যে নিপতিত হয়। উপরাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৮১ সালের ১৫ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিচারপতি আব্দুস সাত্তার রাষ্ট্রপতি হিসেবে বিপুল ভোটে বিজয়ী হন।

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ জেনারেল এরশাদ নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি সাত্তারকে ক্ষমতাচ্যুত করে রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন। তিনি সংসদ বাতিল করেন, সংবিধান স্থগিত করেন, সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। খালেদা জিয়ার স্বামী প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের গড়ে তোলা দল বি.এন.পিকে রক্ষা করা ও এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের মাধ্যমেই বেগম খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত। আশির দশকের শুরুতে দেশ ও জাতির এক সংকটময় মুহূর্তে তিনি রাজনীতি শুরু করেন। বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী দলের প্রতিষ্ঠাতা এবং তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাহাদত বরণ এবং জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে দেশে নেমে আসে এই সংকট। স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, সংবিধান

---

১. *নারী নেতৃত্ব যুগে যুগে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০।

২. ড. শাহাদত হোসেন মন্ডল, জিয়া বাংলাদেশের অহংকার (ঢাকা: রায়হানা বুকস, ৩৮ বাংলা বাজার, ২০০০ খৃস্টাব্দ), পৃ. ১৭২-১৭৮; সৈয়দ আবদাল আহমদ, *নন্দিত নেত্রী খালেদা জিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯।

৩. মাহমুদ শফিক, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া (ঢাকা: সেতু প্রকাশন, বাংলা বাজার, ২০০৩ খৃস্টাব্দ), পৃ.৭-১৫৪; মাহমুদ শফিক, *খালেদা জিয়ার উত্থান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

Dhaka University Institutional Repository

সবকিছুই তখন ছিল বিপন্ন। জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা গ্রহণের পর বি.এন.পি'কে ধ্বংস করার জন্য শুধুমাত্র বি.এন.পি'রই তিন হাজার নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে সামরিক আদালতে প্রহসনমূলক বিচার করা হলো। সামরিক সরকারের একমাত্র টার্গেটে পরিণত হলো বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বি.এন.পি। এ সংকটজনক পরিস্থিতিতে যখন দেশব্যাপী সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন আরো তীব্র ও শক্তিশালী করা জরুরি ছিল, তখন বি.এন.পির নেতৃত্বের অবস্থা ছিল নাজুক।[১]

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নানা মতের লোকদের নিয়ে এ দলটি গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর উপস্থিতিতে কোনো ধরনের সংকট এ দলে সৃষ্টি হয়নি কিন্তু তাঁর অবর্তমানে নেমে এলো সংকট। দলের চেয়ারম্যান সদ্য ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাত্তার অসুস্থ। অনেক নেতা-কর্মী কারাগারে বন্দি, অনেকে মাথায় হুলিয়া নিয়ে পলাতক জীবন কাটাচ্ছিল। বেশ কিছু নেত-কর্মী সামরিক শাসনের ভয়ে চলে গেছেন নির্বাসনে। অন্যদিকে জেনারেল এরশাদ কোটি টাকার লোভ দেখিয়ে মন্ত্রী বানিয়ে একের পর এক নেতাকে বি.এন.পি. থেকে ভাগিয়ে নেয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেন। জেনারেল এরশাদ প্রশাসন পরিচালনার জন্য নতুন দল গঠন এবং বি.এন.পিকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে একের পর এক নেতাকে ভাগিয়ে নেয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেন। বি.এন.পির প্রথম ভাঙ্গনের নেতৃত্ব শামসুল হুদা চৌধুরী ও প্রফেসর এম. এ. মতিন। দলের দ্বিতীয় ভাঙনের সৃষ্টি করেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, এ. কে. এম. মাঈদুল ইসলাম, আব্দুল আলীম এবং ব্যারিস্টার সুলতান আহমদ চৌধুরী।[২]

বেগম জিয়া রাজনীতিতে পদার্পণের পর জেনারেল এরশাদের সাথে এ সকল নেতাদের যোগাযোগ উপলব্ধি করে ১৯৮৫ সালে ২৫ জনকে দল থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেন। এদের মধ্যে জাফর ইমাম, মওদুদ আহমদ, সুলতান আহমদ চৌধুরী, মাঈদুল ইসলাম এক এক করে এরশাদের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন। কাজী জাফর, সিরাজুল হোসেন খান, আতাউর রহমান খানও সরকারে যোগদান করেন। দলের তৃতীয় ভাঙন হয় মহাসচিব কে. এম. ওবায়দুর রহমান, ভাইস চেয়ারম্যান জামাল উদ্দিন আহমদ, ব্যারিস্টার আবুল হাসনাতের নেতৃত্বে।[৩] ১৯৮৮ সালের ২১ জুন এরশাদের সাথে যোগাযোগের সূত্র ধরে দলের চেয়ারম্যান হিসেবে দলের নির্বাহী ও স্থায়ী কমিটি বাতিল করেন এবং দলের মহাসচিব করেন ব্যারিস্টার সালাম তালুকদারকে। বি.এন.পির সাংগঠনিক বিশৃঙ্খলা এবং নেতৃত্বের এই সংকটকে সামনে রেখে গৃহবধূ থেকে প্রেসিডেন্ট জিয়ার ২১ বছরের জীবন সাথী বেগম খালেদা জিয়া তারই উত্তরসূরী হিসেবে দল ও দেশের স্বার্থে ১৯৮২ সালের ৩ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট জিয়ার ভক্তদের অনুরোধে রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।

১৯৮২ সালের ৮ জানুয়ারি বেগম খালেদা জিয়া সংবাদপত্রে এক দীর্ঘ বিবৃতির মাধ্যমে রাজনীতিতে পদার্পণের তাঁর সিদ্ধান্তের কথা দেশবাসীকে জানান।[৪] বেগম জিয়া দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত এই বিবৃতিতে উল্লেখ করেন,

---

১. সৈয়দ আবদাল আহমদ, *নন্দিত নেত্রী খালেদা জিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫-৬৮।

২. ড. শাহাদত হোসেন মন্ডল, জিয়া বাংলাদেশের অহংকার (ঢাকা: রায়হানা বুকস, ৩৮ বাংলা বাজার, ২০০০ খৃস্টাব্দ), পৃ. ১৭২-১৭৮; সৈয়দ আবদাল আহমদ, *নন্দিত নেত্রী খালেদা জিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

৩. সৈয়দ আবদাল আহমদ, *নন্দিত নেত্রী খালেদা জিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।

৪. রুহুল আমিন, *বেগম খালেদা জিয়া স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন ও মূলধারার নেতৃত্ব* (ঢাকা : হীরা বুক মার্ট, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর-১৯৯৩ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৩৫; সৈয়দ আবদাল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

"বিগত কিছুকাল যাবৎ আমি বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী দলের কার্যকলাপ গভীরভাবে অবলোকন করে আসছি। আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, দলের ভিতর বিভিন্ন বিষয়ে একটা ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে, যা দলীয় ঐক্য ও সংহতি বিপন্ন করতে পারে। তাই দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে এবং দলীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষার্থে বিভিন্ন মহলের অনুরোধে সকল দিক বিবেচনা করে দলের বৃহত্তর স্বার্থে আমি বি.এন.পি'তে যোগ দিয়েছি। দলের সর্বস্তরের নেতাকর্মী যেন নিঃস্বার্থভাবে শহীদ জিয়ার কর্মসূচী বাস্তবায়নে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। আমি তাঁদের সঙ্গে সবসময় থাকবো।"

১৯৮২ সালের ২১ জানুয়ারি বি.এন.পির চেয়ারম্যান নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়। তরুণ নেতাদের চাপের মুখে বেগম জিয়া ৫ জানুয়ারি রাত ৮টা ৪৫ মিনিটে মনোনয়নপত্র জমা দেন। বিচারপতি সাত্তারও মনোনয়নপত্র জমা দেন। বিচারপতি সাত্তার বেগম জিয়ার সাথে দেখা করেন এবং প্রেসিডেন্ট জিয়ার ১৯ দফা বাস্তবায়ন ও দলের ঐক্য সংহতি বজায় রাখার আশ্বাস দেন। বিচারপতি সাত্তারের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর বেগম জিয়া চেয়ারম্যান পদ থেকে তাঁর প্রার্থীতা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেন। পরবর্তীতে দেশের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট এবং দলের চেয়ারম্যান বিচারপতি আব্দুর সাত্তার দেশ পরিচালনা করার সময় জেনারেল এরশাদ আইন শৃঙ্খলার অজুহাত দেখিয়ে অতর্কিতে ক্ষমতা দখল করেন। বি.এন.পির এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে যে কয়জন সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার তারাও সংগঠিত হতে পারছেন না।

এই অবস্থায় ১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারির পর এরশাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত জনতার সংগ্রামী মিছিলে শরিক হলেন শহীদ জিয়ার যোগ্য সহধর্মিনী বেগম খালেদা জিয়া। মাত্র কয়েকদিন পরেই তিনি মনোনীত হলেন দলের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান। সামরিক শাসনের একবছর সাতদিন পর ১ এপ্রিল ৮৩ তে ঘরোয়া রাজনীতি করার অনুমতি দিলেন জেনারেল এরশাদ। দলের চেয়ারম্যান বিচারপতি সাত্তার ১ এপ্রিল ১৯৮৩ দলের বর্ধিত সভা আহ্বান করলেন।[১] ইতিমধ্যে শামসুল হুদা ও প্রফেসর মতিন বেগম জিয়াকে সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান মনোনয়নের বিরোধিতা করলেন। তাদের মাধ্যমে এরশাদ বেগম জিয়াকে রাজনৈতিক জীবনে পদার্পণে বাঁধা সৃষ্টি করতে চাইলেন। তারা আলাদাভাবে বৈঠক আহ্বান করলেন এবং পরবর্তীতে তাঁরাই জেনারেল এরশাদের দলে যোগ দেন।

নয়াবাজার ইউসুফ মার্কেট কার্যালয়ের এই বর্ধিত সভায় ভাষণ দেন দলের সদ্য মনোনীত সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান বেগম খালেদা জিয়া।[২] ১ এপ্রিল ১৯৮৩ এর বর্ধিত সভায় ২৫১ জন সাবেক এমপির মধ্যে ১৮২ জন এবং জাতীয় কমিটির ১৮০ জনের মধ্যে ১৪৮ জন উপস্থিত ছিলেন। বর্ধিত সভায় ঐ দিন প্রফেসর বদরুদ্দোজা চৌধুরী, মীর্জা গোলাম হাফিজ, জমির উদ্দিন সরকার, মুস্তাফিজুর রহমান, এল কে সিদ্দিকী, রফিকুল ইসলাম মিয়া, ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। দলীয় নেতা ও কর্মীদের উদ্দেশ্যে এটাই তাঁর প্রথম আনুষ্ঠানিক বক্তৃতা। বর্ধিত সভার পর বিচারপতি সাত্তার সক্রিয় রাজনীতি থেকে অসুস্থতাজনিত কারণে নীরব রইলেন। বি.এন.পির চেয়ারম্যান তিনি রইলেন কিন্তু দলের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে মূলত খালেদা জিয়াই নেতৃত্ব দিতে থাকলেন। এই সময় বেগম জিয়া এরশাদ বিরোধ আন্দোলনকে সক্রিয় করার লক্ষ্যে ব্যাপক

---

[১]. মাহমুদ শফিক, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া (ঢাকা: সেতু প্রকাশন, বাংলা বাজার, ২০০৩ খৃস্টাব্দ), পৃ.৭-১৫৪; মাহমুদ শফিক, *খালেদা জিয়ার উত্থান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯; সৈয়দ আবদাল আহমদ, *নন্দিত নেত্রী খালেদা জিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।

[২]. *নন্দিত নেত্রী খালেদা জিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

যোগাযোগ, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমমনা দল নিয়ে গঠন করেন সাত দলীয় ঐকজোট। ১৯৮৩ সালের ৪ ও ৫ সেপ্টেম্বর সাতদলীয় ঐক্যজোট ও পনের দলীয় ঐক্যজোটের মধ্যে বৈঠক বসে। বৈঠকে এরশাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ৫ দফা প্রণীত হয়। এবার বেগম জিয়া শুধু বি.এন.পির নেত্রীই নয়। সাত দলের নেত্রী হিসেবে আবির্ভূত হলেন বেগম খালেদা জিয়া।[১]

সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে ১ নভেম্বর ৮৩ প্রথম অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়। ২৮ নভেম্বর সচিবালয় ঘেরাও আন্দোলনেও তিনি সাহসীকতার সাথে নেতৃত্ব দেন। ১৯৮৪ সালের আগষ্ট মাসে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সর্বসম্মত নেত্রী ১৯৮৪ সালের ১০ মে বেগম খালেদা জিয়া বি.এন.পির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৮৩ সালের ২৭ নভেম্বর শামসুল হুদা ও প্রফেসর মতিন জেনারেল এরশাদের দলে যোগ দেন এবং দলের উর্দ্ধতন নেতাদের হারিয়ে আপোষহীন লোভশূন্য সংগ্রামের ধারায় বেগম খালেদা জিয়া এক বিশাল নবীন জেনারেশন গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। সততা, নিষ্টা, লোভ-লালসার উর্ধ্বে সংগ্রামে অনমনীয় মনোভাব দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞায় এবং সর্বোপরি শহীদ জিয়ার স্ত্রী হিসেবে সহজেই তিনি মানুষের হৃদয় আন্দোলিত করেছিলেন। একদিকে এরশাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে নিরলস ও আপোষহীন সংগ্রাম অন্যদিকে পার্টির বিরুদ্ধে পরিচালিত একের পর এক চক্রান্তের মোকাবেলা করে বেগম খালেদা জিয়া প্রমাণ করেছেন তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা।

বেগম খালেদা জিয়ার দীর্ঘ আট বছরের নিরলস ও আপোষহীন সংগ্রামের সফল পরিণতি হল নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান। প্রবল গণজোয়ারের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় অভ্যুত্থান এবং স্বৈরশাসনের পতন ঘটে। অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। দীর্ঘ নয় বছর পর বেগম জিয়া নির্বাচনে অংশগ্রহণের ঘোষণা দিলেন। ১৯৯১ সনের নির্বাচনে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বি.এন.পি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে বিজয়ী হন এবং জামায়াতে ইসলামীর সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করেন। ১৯৯১ সালের ২০ মার্চ বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বেগম খালেদা জিয়া শপথ গ্রহণ করেন। বেগম জিয়া পাঁচ বছর সরকার প্রধান ছিলেন কিন্তু তিন বছর যেতেই তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়।[২] বি.এন.পি সরকারের পতন ঘটানোর লক্ষ্যে বিরোধী দল আন্দোলন শুরু করলে তাঁর দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ আন্দোলনের পরিকল্পনা ও প্রকৃত লক্ষ্য এবং তার সহজ সমাধান সম্পর্কে বেগম খালেদা জিয়াকে দিক-নির্দেশনা দিতে ব্যর্থ হন। এক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধন করে নির্বাচন কমিশন ও বিচারবিভাগকে শতকরা একশভাগ স্বাধীন করে দিয়ে অথবা অবিলম্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থা সম্বলিত সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটানো যেত। কিন্তু যথাসময়ে পদক্ষেপের অভাবে বি.এন.পি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বেগম খালেদা জিয়ার শেষ আড়াই বছর ছিল রাজনৈতিক সংঘাতে জর্জরিত। এ সময়ের মধ্যে সংঘটিত হয় অনেকগুলো সংঘর্ষ। পালিত হয় হরতাল ধর্মঘট ও অসহযোগ কর্মসূচী। ১৯৯৬ সালের ২৫ মার্চ ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী পাসের মাধ্যমে সকল সাধারণ নির্বাচন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বাংলাদেশের ইতিহাসে

---

১. *নন্দিত নেত্রী খালেদা জিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬-৬৭।

২. *জিয়া বাংলাদেশের অহংকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১-১৭৮; *নারী নেতৃত্ব যুগে যুগে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২;

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমবারের মতো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়।[১] ১৯৯৬ সালের ৩০ মার্চ সাবেক প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমান তত্ত্বধায়ক সরকারের প্রধান নিযুক্ত হন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯৬ সালের ১২ জুন সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বেগম জিয়ার দল সংসদে ১১৬টি আসন পেয়ে বাংলাদেশের সংসদীয় ইতিহাসে বৃহত্তম বিরোধী দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। বেগম জিয়া বিরোধী দলীয় নেত্রী হিসেবে তাঁর দলসহ সংসদে যোগদান করেন। কিন্তু বেগম জিয়া ও তাঁর দল গঠনমূলক কোন ভূমিকা পালন করতে পারেননি সরকারী দল আওয়ামীলীগের কারণে।[২] তত্ত্বধায়ক সরকারের অধীনে ১২ জুন ১৯৯৬ আওয়ামীলীগ বিজয়ী হয়ে জাতীয় পার্টির সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করেন। দীর্ঘ পাঁচ বছর শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ দেশ শাসনকালে বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের উপর অত্যাচার, নির্যাতন, গ্রেফতার চলতে থাকে।

আওয়ামীলীগের শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন বেগম জিয়া। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশব্যাপী সভাসমাবেশ, লংমার্চ, মিছিল, গণঅনশন, গণমিছিল করে তিনি আওয়ামী শাসনের প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। ১৯৯৯ সালের ৩০ নভেম্বর চার দলীয় ঐক্যজোট গঠন করা হয় এবং ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত হয়।[৩] চার দলীয় ঐক্যজোটে ছিলেন– বি.এন.পি. জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, জাতীয় পার্টি (নাজিউর) এবং ইসলামী ঐক্যজোট। অবশেষে পাঁচ বছর মেয়াদ শেষে ১৫ জুলাই আওয়ামীলীগ বিচারপতি লতিফুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। বিচারপতি লতিফুর রহমানের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১ অক্টোবর ২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক ভোটার ১ অক্টোবরের নির্বাচনে ভোট প্রদান করে। টানা ৯ ঘন্টা বিরতীহীনভাবে ভোট চলে।

১ অক্টোবর ২০০১ সোমবার অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মোট ২৯৮টি আসনের ফলাফল ঘোষিত হয়। এর মধ্যে চারদলীয় ঐক্যজোট ২১৩টি আসনে বিজয়ী হন।[৪] চারদলীয় জোটের বি.এন.পি. ১৯০টি, জামায়াতে ইসলামী ১৭টি, জাতীয় পার্টি (নাজি) ৪টি ও ইসলামী ঐক্যজোট ২টি আসন পায়। সংগঠিত তৃণমূল পর্যায়ের সংগঠন আওয়ামীলীগের মোকাবেলায় ১৯ বছর বি.এন.পি কে বেগম খালেদা জিয়া নেতৃত্ব দিয়েছেন। মোকাবেলা করেছেন নানা ষড়যন্ত্রের, ঘাত-প্রতিঘাতের পাঁচ বছর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশ পরিচালনা এটাই বেগম খালেদা জিয়ার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। ১ অক্টোবরের নির্বাচনের ভোট বিপ্লবে দুই-তৃতীয়াংশ আসনে বিজয়ী চারদলীয় ঐক্যজোটের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ১০ অক্টোবর ২০০১ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। বেগম জিয়ার নেতৃত্বে একই দিনে ৬০ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রী পরিষদও শপথ গ্রহণ করেন। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার মধ্য দিয়ে চারদলীয় ঐক্যজোটের সরকার যাত্রা শুরু করে। বেগম জিয়া বি.এন.পির নেতৃত্বে এসেছিলেন দলের ভাঙন রোধের জন্য। তিনি ভাঙন রোধ করে দলকে সংগঠিত করেছেন। প্রেসিডেন্ট

---

[১] মাহমুদ শফিক, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া (ঢাকা: সেতু প্রকাশন, বাংলা বাজার, ২০০৩ খৃস্টাব্দ), পৃ.৭-১৫৪; মাহমুদ শফিক, *খালেদা জিয়ার উত্থান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯; *খালেদা জিয়ার উত্থান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০;

[২] *নন্দিত নেত্রী খালেদা জিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬;

[৩] *খালেদা জিয়ার উত্থান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২;

[৪] *নন্দিত নেত্রী খালেদা জিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯;

Dhaka University Institutional Repository

জিয়াউর রহমানের বিশাল ব্যক্তিত্বকে ধারণ করে বিরোধী অবস্থান থেকে বি.এন.পিকে নিয়ে যান জনপ্রিয়তার শীর্ষে। এসবই সম্ভব হয়েছে বেগম খালেদা জিয়ার ধৈর্য, প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার কারণে।[১]

৬. ইসলামে নারী-পুরুষের অধিকার

পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতা নারী জাতিকে হেয় প্রতিপন্ন করে পাপ ও অপবিত্রতার যে কলঙ্ক লেপন করেছে, ইসলাম তা মোচন করে তাদেরকে অভূতপূর্ব মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। ইসলাম ঘোষণা করে, নারী-পুরুষে একই উৎস হতে সৃষ্ট।

নারী-পুরুষের সাম্য ঘোষণা করে পবিত্র কুর'আনে মহান আল্লাহ্ বলেন :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ এবং এক নারী হতে সৃষ্টি করেছ। পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী।"[২]

জন্মগতভাবে নারীর চেয়ে পুরুষকে আলাদা মর্যাদা দেওয়া হয়নি; বরং কর্মের মাধ্যমেই নারী-পুরুষ আল্লাহ্ কর্তৃক শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"মু'মিন নর ও মু'মিন নারী একে অপরের বন্ধু, তারা সৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে, সালাত কায়িম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে; এদেরকে আল্লাহ্ কৃপা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[৩] নারী-পুরুষ একে অপরের সম্পূরক। যে যতটুকু ভাল কাজ করবে, সে ততটুকুই প্রতিদান পাবে। এ ব্যাপারে কোন কমবেশী হবে না।

ইরশাদ হচ্ছে :

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ

'অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন : আমি তোমাদের মধ্যে কর্মে নিষ্ঠ কোন নর বা নারীর কর্ম বিফল করি না; তোমরা একে অপরের অংশ।'[৪] নারী-পুরুষের সাম্য এবং কর্মের প্রতিফল ঘোষণা করে আল্লাহ্ পাক বলেন :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"মু'মিন হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎ কাজ করবে তাকে আমি নিশ্চয়ই পবিত্র জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব।"[১]

---

[১]. সৈয়দ আবদাল আহমদ, *নন্দিত নেত্রী খালেদা জিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯।

[২]. আল-কুর'আন, ৪৯ : ১৩।

[৩]. আল-কুর'আন, ৯ : ৭১।

[৪]. আল-কুর'আন, ৩ : ১৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম ও সভ্যতায় নারী কোন কিছু উপার্জন করলে সে তার অধিকারী হতে পারত না, স্বামী কিংবা আত্মীয়ের অধিকারে চলে যেত। এ ব্যাপারে প্রতিবাদ ঘোষণা করে আল্লাহ্ বলেন :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ

পুরুষ যা অর্জন করে, তা তার প্রাপ্য অংশ, নারী যা অর্জন করে, তা তার প্রাপ্য।'[২]

উল্লেখিত দলীলসমূহে এ কথা সুস্পষ্ট যে, সমতা, অধিকার ও মর্যাদার দিক দিয়ে পুরুষকে একচ্ছত্র মর্যাদা দেয়া হয়নি; বরং নারী-পুরুষ উভয়কে সমমর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছে। 'উম্মে সালমা (রা) একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট প্রশ্ন করেন : পবিত্র কুর'আনে কেন শুধু পুরুষকে সম্বোধন করা হয়েছে? অথচ মহিলাকে সম্বোধন করা হয়নি? এর পরিপ্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ সমতা, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক গুণাবলীর পুরুষ-মহিলাকে সম্বোধন করে আল্লাহ্ বলেন

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

"অবশ্য আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সাওম পালনকারী পুরুষ ও সাওম পালনকারী নারী, যৌন অংগ হিফাযতকারী পুরুষ ও যৌন অংগ হিফাযতকারী নারী, আল্লাহ্কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী-এদের জন্য আল্লাহ্ রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।"[৩] এই আয়াতের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেট্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা লায়লা আহমাদ বলেন :

"Balancing virtues and ethical qualities, as well as concomitant rewards, in one sex with the precisely identical virtues and qualities in the other, the passage makes a clear statement about the absolute identy of the human moral condition and the common and identical spiritual and moral obligations placed on all individuals regardless of sex."[8]

অন্যায়ভাবে কাউকে অত্যাচার করা, হত্যা করে জীবন নাশ করার ক্ষেত্রেও নারীর সম-অধিকার রয়েছে। কোন পুরুষ নারীকে হত্যা করলে বিনিময়ে সেও ইসলাম আইনে হত্যাযোগ্য অপরাধী হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى

---

১. আল-কুর'আন, ১৬ : ৯৭।
২. আল-কুর'আন, ৪ : ৩২।
৩. আল-কুর'আন, ৩৩ : ৩৫।
৪. Ahmed Leik, *Women and Gender in Islam,* PP. 64-65.

Dhaka University Institutional Repository

"হে মু'মিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী।"[১]

মা হিসেবে নারী

ইসলাম মা হিসেবে নারীকে যে সুমহান মর্যাদা দিয়েছে, তার তুলণা পৃথিবীর অন্যকোন সভ্যতায় নেই। মা-কে মুসলিম সমাজ বা রাষ্ট্র সর্বোচ্চ সম্মানিত ব্যক্তিত্ব হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে। পবিত্র কুর'আনে মহান আল্লাহ্ বলেন :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

"আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে। তার মা তাকে গর্ভে ধারণ করেছে কষ্টের সাথে এবং তাকে প্রসব করেছে কষ্টের সাথে, তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও স্তন্য ছাড়াতে ত্রিশ মাস সময় লেগেছে।"[২] আল্লাহ্ পাক অন্যত্র ইরশাদ করেন

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

"আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। মাতা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে। আর দুধ ছাড়াতে লেগেছে পূর্ণ দু'বছর।"[৩] মহান আল্লাহ্ পাক আরো বলেন :

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

"তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে।"[৪] সদ্ব্যবহার পাবার ক্ষেত্রে পিতার চেয়েও মাতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে- আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন, 'একদিন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! আমার সাহচর্যে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিকারী কে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, তারপর কে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমার মা। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলো, তারপর কে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমার মা। লোকটি আবারও বলল, তারপর কে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, তোমার বাবা।'[৫] এ মর্মে আবু দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে নয়টি বিষয়ে অছিহত করেছেন। তন্মধ্যে চতুর্থটি হচ্ছে : "তোমার মাতা-পিতার আনুগত্য কর। যদি তাঁরা তোমাকে তোমার দুনিয়ার

---

১. আল-কুর'আন, ২ : ১৭৮।
২. আল-কুর'আন, ৪৬ : ১৫।
৩. আল-কুর'আন, ৩১ : ১৪।
৪. আল-কুর'আন, ১৭ : ২৩।
৫. মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল, *আল আদাবুল মুফরাদ, তাহকীক*: মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দিন (সৌদী: মাকতাবাতুল দলীল, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৯৭ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৩৪-৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

(যাবতীয় কাজ) থেকে বের হয়ে যেতে বলে তার নির্দেশ পালনার্থে তাই করবে।”[১] আল্লামা মুহাম্মদ নাছিরুদ্দীন আলবানী বলেন : হাদীসটি সহীহ্।[২]

স্ত্রী হিসেবে নারী

ইসলাম স্ত্রী হিসেবে নারীদেরকে সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে। স্ত্রীদের সুখ-শান্তি, সীমাহীন আনন্দ, ভালবাসা, পুষ্পের সৌন্দর্য্য, মনোহর স্নিগ্ধ ইত্যাদি সুন্দির গুণাবলীতে আখ্যায়িত করেছে।

এ সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

‘মানবকুলকে মোহগ্রস্থ করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রোপী, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেত-খামারের মত আকর্ষণীয় বস্তু সামগ্রী। এ সবই পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আল্লাহ্‌রইনকটই উত্তম আশ্রয়।’[৩]

স্ত্রীদের প্রতি সদাচরণ করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ্ বলেন :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“তোমরা স্ত্রীদের সঙ্গে সৎভাবে জীবন যাপন কর।”[৪]

আল্লাহ্‌পাক অন্যত্র ইরশাদ করেন :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“আর তাঁর নিদের্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্যে হতে তোমাদের সংগিনীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।”[৫]

সালাহুদ্দীন মাকবুল স্ত্রী হিসেবে নারীর মর্যাদা সম্পর্কে বলেন : “দুনিয়ার মধ্যে কতিপয় উপভোগ্য ও কমনীয় সামগ্রী যা মানুষের জন্য লোভনীয় করে দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ্ পাক তন্মধ্যে স্ত্রীকে সূচনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।’[৬]

হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত রাসূল পাক (সা) ইরশাদ করেন :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِى

---

১. *আল আদাবুল মুফরাদ*, পৃ. ৩৮।

২. মুহাম্মদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, *ইরওয়াউল গালীল*, হাদীস নং ৮৩৭।

৩. আল-কুর'আন, ৩ : ১৪।

৪. আল-কুর'আন, ৪ : ১৯।

৫. আল-কুর'আন, ৩০ : ২১।

৬. *আল-মারআতু বাইনা হিদায়াতিল ইসলাম ওয়া গাওয়াইতিল ই'লাম*, প্রথম সংস্করণ (কুয়েত:দারুল ইসলাফিত-দাওলিয়্যাহ লিন-নাশরি ওয়াত-তাওযী' ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর নিকট উত্তম সেই প্রকৃত ভাল। আমি তোমাদের মধ্যে আমার পরিবারের জন্য অধিক উত্তম।"[১] স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অধিকার এই যে, স্বামী তার খাবার, পোষাক পরিচ্ছদ, বাসস্থান এবং আনুষঙ্গিক জিনিষপত্র সঠিকভাবে সরবরাহ করবে। এ সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

'স্ত্রীলোকদের খোরপোশ এবং পরিধেয়বস্ত্র উত্তমভাবে সরবরাহ করা তাদের উপর অবশ্য কর্তব্য।'[২]

কন্যা হিসেবে নারী

সৃষ্টিগতভাবে কন্যা সন্তান পিতার নিকট পুত্র সন্তানের চেয়েও অধিক স্নেহের হয়ে থাকে। সম্ভবত এর কারণ হলো, কন্যারা বিবাহের পরে পিতা থেকে দূরে চলে যায়। কন্যা সম্পর্কে অসংখ্য আয়াত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যা ইসলামে তার মর্যাদাকে সমুন্নত করেছে। জাহেলী যুগে কন্যারা ছিল মজলুম শ্রেণী। তাদের বেচে থাকারও অধিকার ছিল না। কিন্তু সন্তান দান করার মালিক একমাত্র আল্লাহ্। তা পুত্র হোক বা কন্যা হোক, এ মর্মে তিনি বলেন :

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴿ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহ্‌রই। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছে কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছে পুত্র সন্তান দান করেন : অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছে বন্ধ্যা করে দেন।"[৩] ইসলাম পুত্র সন্তানকে কন্যা সন্তানের উপর কোন প্রাধান্য দেয়নি; বরং পুত্র সন্তানের মত কন্যা সন্তানকে যত্নের সাথে প্রতিপালন করতে বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "যে ব্যক্তির একটি কন্যা সন্তান রয়েছে এবং সে তাকে জীবন্ত কবর দিল না, অবজ্ঞা বা তাচ্ছিল্যের ভাব দেখাল না এবং ছেলে সন্তানকে কন্যা সন্তানের চেয়ে বেশি স্নেহ প্রদর্শন বা পক্ষপাতিত্ব করল না, এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ বেহেশ্‌তে প্রবেশ করাবেন।"[৪] এ সম্পর্কে রাসূল (সা) অন্যত্র ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি দু'টি কন্যা সন্তানকে বালিগা হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করে, কিয়ামত দিবসে সে ও আমি এমন অবস্থায় আসব, এই বলে তিনি তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলো একত্রে করলেন।"[৫] ইসলাম পুত্র সন্তানকে কন্যা সন্তানের ওপর কোন প্রাধান্য দেয় না, বরং পুত্র সন্তানের মত কন্যা সন্তানকে যত্নের সাথে প্রতিপালনের কথা বলা হয়েছে। ইসলাম নারী জাতির উন্নয়নে কন্যা সন্তানের জন্মকে লজ্জা, অপমান ও লাঞ্ছনা রেথকে মুক্ত করে তাদেরকে সঠিক মর্যাদায় সমাসীন করেছে। কন্যা সন্তানকে সঠিকভাবে প্রতিপালন করতে পারলে আল্লাহ্ তাকে জান্নাত প্রদান করবেন বলে রাসূল (সা) ইরশাদ করেছেন।

---

[১]. জামিউত তিরমিযি, কিতাবুল মানাকিব, বাবু ফদিলি আযওয়াযিন-নাবিয়্যি (সা), হাদীস নং- ৩৮৯৫, পৃ. ১০৭৮; (ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে ইসলামের ভূমিকা (ঢাকা: *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৫২ বর্ষ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০১৩ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৪৫)।

[২]. আল-কুর'আন, ২ : ২৩৩।

[৩]. আল-কুর'আন, ৪২ : ৪৯-৫০।

[৪]. আহমদ, *আল মুসনাদ*, ৪র্থ খ., হাদীস নং- ১৯৫৭।

[৫]. *সহীহ মুসলিম*, কিতাবুল বিররি ওয়াস-সিলাত ওয়াল আদাব, বাবু ফাদলির ইহসানি ইলাল বানাত, হাদীস নং-২৬৩১(১৪৯), পৃ. ১১৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

সর্বজনীন ইসলাম কন্যাদের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ-প্রীতি ও সম্মানজনক আচরণ করতে এবং তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি সুদৃষ্টি রাখতে নির্দেশ দেয়। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে ইসলাম কন্যা সন্তানকে কত মর্যাদা দান করেছে।[১]

বিবাহের ক্ষেত্রে নারী

ইসলাম নারীকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ইখতিয়ার প্রদান করেছে। এমনকি বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর তার অনুমতি ব্যতীত তার বিবাহ বিশুদ্ধ হবে না। হাদীস শরীফে এসেছে রাসূল (সা) ইরশাদ করেন বয়ঃপ্রাপ্ত নারীর অনুমতি ব্যতীত তাকে বিবাহ দেয়া যাবে না। এবং কুমারী নারীর বিবাহের ক্ষেত্রে তার অনুমতি নিতে হবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তার অনুমতি কি হবে? তিনি বললেন, অনুমতি চাওয়া হলে সে যদি নিশ্চুপ থাকে তবে এটাই তার অনুমতি।[২] বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন। সমাজ জীবনে মানব-মানবীর সুখ-শান্তি, মানসিক তৃপ্তি লাভ, আবেগ-অনুভূতি, কামনা-বাসনা, প্রেম-প্রীতির ফলাফল, মানব বংশের স্থায়িত্ব ও সভ্যতা এর উপরই নির্ভরশীল।

আল্লাহ্‌ পাক বলেন : وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

"এবং তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে; অতঃপর তিনি তার বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান।"[৩]

একটি সুখময়, সুন্দর পরিবার ও সমাজ গড়ার লক্ষ্যে স্বামী নির্বাচনে ইসলাম স্ত্রীকে যে অধিকার এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা দান করেছে, বিশ্বের ইতিহাসে তা এক দুর্লভ উপহার। সাইয়্যেদ সাবিক বলেন, "বিবাহের পূর্বে নারীর সম্মতি গ্রহণের মাধ্যমে (বিবাহ কার্য) শুরু করা অভিভাবকের জন্য ওয়াজিব। অভিবাবক 'আকদ' এর পূর্বে তার সম্মতি জেনে নিবেন। কুমারী হোক বা সাইয়্যেবা হোক তাদের সম্মতি ব্যতীত বিবাহ শুদ্ধ হবে না।"[৪]

বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে নারী

সময় ও পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে স্বামী যেমন স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে, তেমনই অধিকার স্ত্রীর রয়েছে। তবে স্বামী তালাক প্রাপ্তির ব্যাপারটি একটু স্বতন্ত্র। আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের যা কিছু দিয়েছ তা থেকে কোন কিছু গ্রহণ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। অবশ্য যদি তাদের উভয়ের আশংকা হয় যে, তারা আল্লাহ্‌র সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না এবং তোমরা যদি আশংকা কর যে, তারা আল্লাহ্‌র সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না, তাহলে সে ক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে

---

১. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে ইসলামের ভূমিকা (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৫২ বর্ষ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০১৩ খৃষ্টাব্দ), পৃ. ৪৬)।

২. *সহীহুল বুখারী*, ৪র্থ খ., (বৈরূত : আল-মাকতাবাতুল 'আসরিয়্যাহ, ১৪১১ হি./১৯৯১ খৃস্টাব্দ, কিতাবুন নিকাহ, বাবু লা ইউযুনকিহুল আবু ওয়া গায়রুহুল-বিকরা ওয়াস সাইয়্যেবা ইল্লা বি রিদাহুমা, ৪র্থ খ., হাদীস নং-৫১৩৬), পৃ. ১৬৫৪। (ড.

৩. আল-কুর'আন, ২৫ : ৫৪।

৪. সায়্যিদ সাবিক, *ফিকহুস সুন্নাহ*, ২য় খ. (কায়রো: শিরকাতু মানার আদ্-দুওয়ালিয়্যাহ, ১৪১৬ হি./ ১৯৯৫ খৃস্টাব্দ), পৃ. ২৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

নিষ্কৃতি পেতে চায়, তাতে তাদের কোন অপরাধ নেই।'[১] তবে সাম্প্রতিক কালে এ অধিকার অপসংস্কৃতির আর ভ্রান্ত নারীবাদের প্রভাবে কলুষিত হয়ে দাম্পত্য জীবনে চরম হতাশা ও বিপর্যয় নেমে এসেছে এ ক্ষেত্রে নারী অপরাধই প্রধানত দায়ী। আর এ সকল নারী অপরাধীদের বয়স অধিকাংশ ক্ষেত্রে ১৮-২৮ এবং ২৮-৩৮ বছর পর্যন্ত। যদিও অপরাধের ধরনভেদে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।[২]

মত প্রকাশ ও পরামর্শ প্রদানে নারী

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় সমাজ ও পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন ব্যাপারে মহিলাদের অভিমত ও হৃদয়াবেগ প্রকাশের অবাধ অধিকার সর্বতোভাবে স্বীকৃত। তারা এটা মৌখিকভাবে অথবা লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারে। নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে এই মত প্রকাশের অধিকার তাদের রয়েছে। হযরত হাসান বসরী বলেছেন : নবী করীম (সা) মেয়েদের সাথেও পরামর্শ করতেন এবং কোন কোন সময় তাদের অভিমত গ্রহণ করতেন।[৩] হুদায়বিয়ার সন্ধির একটি শর্ত ছিল যে, এই বছর মুসলমানরা ইহরাম না করেই ফিরে যাবে। তাই রাসূলে করীম (সা) সাহাবায়ে কিরাম (রা) কে হুদায়বিয়াতেই ইহরাম খুলে ফেলা ও সঙ্গে করে নিয়ে আসা পশুগুলো জবাই করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু সাহাবীগণ এই সন্ধি ও সন্ধির শর্তসমূহ দেখে বিশেষভাবে মর্মাহত হয়েছিলেন, সে কারণে তাঁরা কেউ রাসূলে করীম (সা) এর এই নির্দেশ পালনে কোন তৎপরতাই দেখালেন না। এইরূপ অবস্থা দেখে রাসূল (সা) তার স্ত্রী হযরত উম্মে সালমা (রা) এর নিকট দুঃখ প্রকাশ করলেন। তিনি সাহাবাদের মনস্তত্ব লক্ষ্য করে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা সহকারে পরামর্শ দিলেন যে; আপনি এরপর কাউকে আর কিছুই না বলে যা কিছু করার নিজেই অগ্রসর হয়ে করে ফেলুন। দেখবেন, সকলেই আপনার দেখাদেখি সবাই কাজ করবেন। তখন আর কেউ আপনার আদেশ পালনে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হবে না। রাসূলে করীম (সা) এই পরামর্শ সানন্দে গ্রহণ করলেন এবং যখনই তিনি করণীয় সবকাজ করলেন, সাহাবায়ে কিরামও (রা) তাঁরা অনুসরণ শুরু করে দিলেন। ফলে উপস্থিত অচলাবস্থা দূর হল এবং বাস্তবভাবে প্রমাণ হল যে, মহিলাদের পরামর্শ জাতীয় জীবনে অনেক সমস্যারই সমাধান করতে সক্ষম।[৪]

রাসূলে করীম (সা) এর পর খুলাফায়ে রাশেদীনও তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে মহিলাদের দেয়া পরামর্শ গ্রহণ করতেন। একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে : হযরত উমর (রা) সামষ্টিক বিষয়াদিতে মত দিতে সক্ষম লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। এমনকি এই ধরনের ব্যাপারে বিবেক বুদ্ধির অধিকারী কোন মহিলা হলেও তার সাথে পরামর্শ করতেন। তার দেয়া পরামর্শে কল্যাণের কোন দিক দেখতে পেলে তা তিনি নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতেন।[৫] মোটকথা বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক ব্যাপারে মহিলাদের বিবেক বুদ্ধি প্রসূত পরামর্শ গ্রহণ করে ইসলামী সমাজ বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছে। ইসলামী সমাজ গঠনে তাদের যোগ্যতা ও প্রতিভাকে বাস্তবভাবে কাজে লাগানো

---

১. আল-কুর'আন, ২ : ২২৯।

২. তাহমিনা আক্তার এবং মুহাম্মদ ওমর ফারুক, পরিবার ও কিশোরী অপরাধ: একটি বিশ্লেষণ *(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সংখ্যা-৮৭, ফেব্রুয়ারী ২০০৭ খৃস্টাব্দ), পৃ. ১১৭-৩৫; Media Chesney-Lind, Girls' Crime and Woman's Place: Toward a Feminist Model of Female Delinquency, *CRIME & DELINQUENCY*, Vol-35, No-1(January), 1989, p.5-29.

৩. ইব্‌ন কুতাইবা, *উয়ূনুল আখবার*, ১ম খ. (বৈরূত: দারুল কুতুবিল আরবী, ১৯৯৬ খৃস্টাব্দ), পৃ. ২৭।

৪. *সহীহ বুখারী*, ১ম খ., কিতাবুশ শুরুত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮০।

৫. আল বায়হাকী, *সুনানুল কুবরা*, ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩।

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। অতএব বলা যায় ইসলাম শাশ্বত অভ্রান্ত জীবন ব্যবস্থা। এটি চিরজয়ী অহী সভ্যতা। এ সভ্যতায় বাস্তবিকভাবে নারীদের অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে। পক্ষান্তরে চীন, ইউরোপীয়, রোম ও ইসলাম-পূর্ব আরব সভ্যতা ও প্রগতি সভ্যতায় নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ইসলামের রয়েছে বিবাহ বিধান। এতে রয়েছে মহাশক্তি ও যৌন উন্মাদনা ও উচ্ছৃঙ্খলতা নিরসনের বিজ্ঞানসম্মত পন্থা। বিবাহ বিধান সভ্য সমাজ গঠনের মৌলিক উপাদান।[১]

অর্থাৎ এই দীর্ঘ আলোচনায় আমি মানব প্রকৃতির সেই সকল সত্যে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেছি, যার উপর মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তি স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। আমি বিশ্বাস করি যে, মৌল বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা আবশ্যক, তা হল প্রথমত, মানুষের জটিল প্রকৃতি। তবে দেহ, আত্মা ও তেজ-বীর্য রয়েছে এবং এগুলোর কোনটির দাবিই সে সরলতার সাথে অস্বীকার করতে পারে না। দ্বিতীয়ত, সমগ্র মানবতার ঐক্য ও সংহতি। এই কারণেই কারো পক্ষে নৈতিকতাবোধকে তার একান্ত নিজস্ব ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে ধারণা করা এবং এই ধারণার বশীভূত হয়ে স্বেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করা একেবারে নিরর্থক হয়ে পড়ে। মানব জাতির এই সংহতির কারণেই বিয়ে সর্বকালেই সামাজিক ব্যাপারে পরিগণিত। আইন দ্বারা এটা স্বীকৃত হতে হবে, সামাজিকভাবে বিয়ে উৎসব উদ্‌যাপন করতে হবে এবং আইনানুগ চুক্তি দ্বারা এর সংরক্ষণ করতেই হবে।

প্রগতি সভ্যতার লাগামহীন যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা দূরীকরণে এই মহিয়সী মহিলার উপদেশ কত চমৎকার ও প্রাকৃতিক বিধানসম্মত। এই উপদেশ মেনে চললে বিবাহপূর্ব যৌনমিলন, পরীক্ষামূলক বিবাহ, গর্ভনিরোধ, ভ্রূণ-হত্যা এবং যাবতীয় যৌন অনাচার বিদূরীত হয় ও পারিবারিক শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসে। যৌন অনাচারের কারণে প্রিয় স্বদেশের সভ্যতা একেবারে ধ্বংসের মুখে নিপতিত। সুতরাং এই ধ্বংসের কবল হতে রক্ষার দিক-নির্দেশনা প্রদানে গভীর পরিতাপের সাথে তিনি আরও বলেন : Now when our civilization is indeed on the verge of collapse, we see that infact the last decades have been marked by a choice of licenses for both sexes rather than discipline, the result has been an enormous waste of creative power, prostitution and promiscuity, combined with the prevention of conception and not combined with any kind of creative results whatever, homosexuality on both sexes and various forms of abnormality,

---

[১]. তাই পাশ্চাত্যের যৌন অপরাধ বন্ধকরণে পাশ্চাত্যের স্বনামধন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানী মিসেস হাডসন শ’ (Mrs. Hudson Shaw) যথার্থ বলেছেন : In all this argument, I have tried to reach those realities of human nature on which human morality must be based. I believe that the fundamental things which we must take into account are, first the spirit to reckon with neglect anyone of these without insecurity and secondly, the solidarity of the human race which makes it futile to act as though the ‘morals’ of any one of us could be his personal affair alone. It is because of this solidarity that marriage has always been regarded as a matter of public interest to be recognised by law, celebrated by some public ceremony and protected by legal contract.Hudson Shaw, *Sex and Commonsense*. P. 49; ড. মাহবুবা রহমান, *কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস, জুলাই ২০০৫ খৃস্টাব্দ), পৃ. ১৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

represent to us the unwholesome swamp into which the water of energy have flowed. Is this a symptom or a cause of our collaps? Both think.[১]
'বর্তমানে আমাদের সভ্যতা ধ্বংসের মুখে দোদুল্যমান। আমরা প্রত্যক্ষ করছি, গত কয়েক দশক ধরে আমাদের নর-নারীর মধ্যে চরম যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা চলে আসছে এবং এত কোন বাধা-বিঘ্নই নেই। ফলে প্রচুর সৃজনী শক্তি বিনষ্ট হচ্ছে। পতিতা বৃত্তি, অবৈধ যৌনকর্ম ও তৎসহ গর্ভনিরোধ, নারীতে-নারীতে এবং পুরুষে-পুরুষে সমকাম যাতে সন্তান উৎপাদনের কোন আশাই থাকে না এবং আরও বহুবিধ অস্বাভাবিক রতিকর্মে শক্তির নির্যাস অযথা অপচয় হচ্ছে। এই সবই আমাদের সম্মুখে উদ্ভাতি হয়ে উঠেছে। এটা কি আমাদের ধ্বংসের লক্ষণ বা কারণ নয়? আমার মনে হয় উভয়ই। ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সমাজ সংস্কারক, সাংবাদিক নির্বিশেষে সকল চিন্তাশীল ব্যক্তি পাশ্চাত্য নারীর দুঃখজনক জীবন সম্পর্কে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। তাঁদের মতে বর্তমান পাশ্চাত্য সমাজ বসবাসের অনুপযোগী ও ভয়ংকর হয়ে পড়েছে।

ইসলাম শান্তির ধর্ম। সমাজে বিশৃংখলা দূরীভূত করে শান্তি সৌহার্দ স্থাপনই এর লক্ষ্য। ছেলে-মেয়ের পবিত্রতম বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমেই ইসলামের পারিবারিক জীবনের সূত্রপাত হয়। এতে নর-নারীর মধ্যে কোন যৌন উচ্ছৃংখলতা নেই। নেই কোন যৌন সংশ্লিষ্ট বাড়াবাড়ি। যৌন উচ্ছৃংখলতা ও যৌন সংশ্লিষ্ট বাড়াবাড়ি যাতে না হয় সে জন্য এতে রয়েছে প্রতিরক্ষা। এতে রয়েছে পর্দা প্রথার ন্যায় বিভিন্ন অনুশাসন। এ অনুশাসন ইসলামকে গৌরাবান্বিত করেছে। ইসলামের এ অনুশাসনের প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে মুগ্ধ হয়ে বিশ্ববিখ্যাত মনীষী, রাষ্ট্রপ্রধান, কবি, খেলোয়াড়, কর্মকর্তা, চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, গায়ক-গায়িকা, ধনকুবের, সাংবাদিক, জমিদার, লেখক, পাদ্রী, বিজ্ঞানী ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে দলে দলে আশ্রয় গ্রহণ করছেন। তানজানিয়ার প্রেসিডেন্ট জুলিয়াস নায়ারের (তাঞ্জানিয়া), বিশ্বখ্যাত পপ সংগীত তারকা ক্যাটস স্টিভেনস (ইংল্যান্ড), আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দার্শনিক ড. রোজার গারোদী (ফ্রান্স), শীর্ষস্থানীয় হিন্দু ধর্মগুরু ড. শিবশক্তিস্বরূপজী (ভারত), সুইডিস রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ কুনুত (সুইডেন), শীর্ষস্থানীয় ইলেকট্রনিক বিজ্ঞানী ড. আর্থার জে. এলিসন (ব্রিটেন), প্রখ্যাত কূটনীতিবিদ ও জার্মান রাষ্ট্রদূত ড. ওলফ্রেড হফম্যান (জার্মানি), আমেরিকান বিশেষজ্ঞ ডা. যায়েদ ভ্যানকভ (আমেরিকা), কর্ণেল এলবার্ট মেস এলসি (ব্রিটেন), জেনারেল আনাতোলি আন্দ্রোপভা (রাশিয়া), আল-কুরআনের প্রখ্যাত অনুবাদক মার্মাডিউক পিকথল, উচ্চ শিক্ষিত গোঁড়া ক্যাথলিক জে.এল.সি. ভান বীটেম (হল্যান্ড), গবেষক ও ধর্মপ্রচারক গ্যারী মিলার (কানাডা), প্রাক্তন হিন্দু পণ্ডিত হানওয়ালী লাল (পাঞ্জাব), মার্কিন মহাশূন্য বিজ্ঞানী জেম্স আরউইন (আমেরিকা), যৌন রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. জন এলিসন, ক্যাথলিক পাদ্রী মাইকেল লেলং (ফ্রান্স), প্রভাবশালী পাদ্রী ইলাম কার্কিস (ইরিত্রিয়া), প্রখ্যাত বাস্কেটবল খেলোয়াড় ক্রিস জ্যাকসন (আমেরিকা), লর্ড হেডলী স্যার রোল্যান্ড জর্জ অ্যালানসন (ইংল্যান্ড), প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ড. মরিস বুকাইল (ফ্রান্স), বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও গ্রন্থকার ড. হামিদ মার্কাস (জর্মানী), ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ও গ্রন্থকার ড. কোতাকী (জাপান), সমাজবিজ্ঞানী উইস ল জেজিরস্কি (পোল্যান্ড), নৃতত্ত্বের অধ্যাপক ড. রউফ ফ্রিহারগণ ইরেনফেল (অস্ট্রিয়া), ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর মেয়র আব্দুল্লাহ বেটারসবি (ইংল্যান্ড), টেক্সাসের মেয়র চার্লস এডোয়ার্ড জেনকীনস

[১] Hudson Sahw, ibid. P. 49; ড. মাহবুবা রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

(আমেরিকা), বিশ্ব হেভিওয়েট রেসলিং চ্যাম্পিয়ন এনটনি এনোকী (জাপান), প্রখ্যাত পাদ্রী ড. দীলু সানতোষ (ফিলিপাইন), ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত ওলাদ্যো লর্জ ওয়েলসন (ডেনমার্ক), অধ্যাপক ড. আইয়ূব খান ওমায়া (আমেরিকা), প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ সাংবাদিক ও গ্রন্থকার লিওপোল্ড উইস (পোল্যান্ড), প্রখ্যাত খ্রিষ্টধর্ম প্রচারক ফাদার মার্টিন জন মাইপ পল (তাঞ্জানিয়া), প্রখ্যাত সমাজকর্মী টমাস ইরভিং (কানাডা), হিন্দু জমিদার শ্রী প্রতাপ চন্দ্র সেন (বাংলাদেশ), প্রখ্যাত দাওয়াতকর্মী জিয়ন ডাকলিন (কোরিয়া), বিশিষ্ট ধর্মপ্রচারক লি হোচা (চীন), প্রখ্যাত ইংরেজ লেখক এ. কেইন (ইংল্যান্ড), ইংলিশ মুসলিম মিশনের প্রেসিডেন্ট জন ওয়েবষ্টর (ইংল্যান্ড), বিখ্যাত কবি ও গ্রন্থকার রোল্যান্ড স্লোলিং (আমেরিকা), বিপ্লবী কবি লেয়ন জেমস (নিউ জার্সি), বিশিষ্ট পাদ্রী ও গোত্রপতি মিঃ আবু বকর কোশা (নাইজেরিয়া), প্রাক্তন খ্রিষ্টধর্ম প্রচারক রেভালেণ্ড পল (উগান্ডা), প্রখ্যাত গ্রন্থকার ও সংগঠন সুদর্শন ভট্টাচার্য (বাংলাদেশ), বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার সুরেন্দ্রনাথ রায় (বাংলাদেশ), আমেরিকান রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডর রাসেল ওয়েব (আমরিকা), শব্দবিজ্ঞানী প্রফেসর হারুন মোস্তফা লিয়ন (ইংল্যান্ড), প্রফেসর রেভারেন্ড ডেভিড বেঞ্জামিন কেলদানী (ইরান), প্রখ্যাত সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও নাট্যকার আব্দুল্লাহ আদিয়ার (ভারত), অধ্যাপক মাখনলাল ধর (বাংলাদেশ), বিখ্যাত গ্রন্থকার উইলিয়াম বার্চেল পিকার্ড (ইংল্যান্ড), বিশিষ্ট কূটনীতিবিদ ও ধর্মপ্রচারক মোহাম্মদ আমান হবম (জার্মানী), মানব জাতিতত্ত্ব বিশারদ মোহাম্মদি সুলাইমান তাকীউচী (জাপান), রাষ্ট্রনায়ক স্যার জালালউদ্দীন লডার ব্রুনটন (ইংল্যান্ড), অধ্যাপক ড. আর. এল. মেল্লামা (হল্যান্ড), অধ্যাপিকা ড. বারবারা নেলসন (ইংল্যান্ড), অধ্যাপক ড. যিয়াউর রহমান আযমী পি.এইচ (ভারত), প্রিন্সেস জাবিদ এস. বানু (ভারত), অধ্যাপক ব্ল্যাঙ্কিন শিপ (আমেরিকা), ডা. মীর্জা দেহলীন (আমেরিকা), ধনকুবের লর্ড ওয়ার্সলে (লন্ডন), প্রফেসর ইয়াকুব জাকী (ব্রিটেন), ড. হিরু ফুজী মাসু (জাপান), কনসালটিং ইঞ্জিনিয়ার ডেভিড মার্ক প্যাডকক (ব্রিটেন), ডাঃ শওকী ফুতাবী (জাপান), ডাক ও তার মন্ত্রী জোশিরো কুমিয়ামা (জাপান), মনোবিজ্ঞানী ইব্রাহীম জোরার্ড (আমেরিকা), বিশ্ব হেভিওয়েট মুষ্টিযোদ্ধা চ্যাম্পিয়ন ড. ক্যাসিয়াস ক্লে (আমেরিকা), ওকীং স্পিরিচুয়ালিষ্ট চার্চের প্রেসিডেন্ট জর্জ ফাউসার (ইংল্যান্ড), এডভেকেট কে. এল. গউবা বার এট. ল (ভারত), কর্ণেল ডোনাল্ড এস. রকওয়েল (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), ড. মালিক রাম (ভারত), প্রখ্যাত ধর্মপ্রাচারক শায়খ আহমদ দীদাত (দক্ষিণ আফ্রিকা), শীর্ষস্থানীয় সাংবাদিক শ্রী দুর্গাপ্রসাদ দেশমুখ (ভারত), রাজকুমার শ্রী বিশ্বেশ্বর রায় চৌধুরী (বাংলাদেশ), বিশ্ব হেভিওয়েট মুষ্টিযোদ্ধা চ্যাম্পিয়ন মাইক টাইসন (আমেরিকা), প্রখ্যাত কৃষ্ণাঙ্গ নেতা ম্যালকম এক্স (আমেরিকা), ব্ল্যাক পান্তার পার্টির নেত এইচ র‍্যাপ ব্রাউন (আমেরিকা), আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়া খ্রিস্টান মিশনারী সংস্থার প্রধান পাদ্রী ইসহাক, আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্টের জ্যেষ্ঠ পুত্র কার্নস মুনএম (আর্জেন্টিনা), প্রখ্যাত আর্চ-বিশপ হাজী আবুবকর (তানজানিয়া), লেবার পার্টির বিশিষ্ট নেতা জন স্ট্রাস্কাট (ইংল্যান্ড), ডা. মারিয়া (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), পাঁচটি ভাষার পারদর্শী সাংবাদিক মিত্রসূতারো ইয়ামাওকা (জাপান), বিখ্যাত ব্যবসায়ী বুম্পাচিরো আরিজা (জাপান), উচ্চ শিক্ষিত ইংরেজ মিসেস সানথা (গ্রেট ব্রিটেন), মার্কিন যুবতী বার্টন ক্যালী (আমেরিকা), মঁসিয়ে ফ্রেডারিন ডোলামার্ক (দক্ষিণ আফ্রিকা), রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ইসা ম্যানুয়েল ম্যাকলালেদ (ফিলিপাইন), শীর্ষস্থানীয় খ্রিস্টান পাদ্রী ইসা (বুলগেরিয়া), সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা মার্ক এ্যন্টিনিও ওটার্স (আমেরিকা), সাবেক খ্রিস্টান, ধর্মযাজক মিঃ সাইফ ফাকাদ

Dhaka University Institutional Repository

(ইথিওপিয়া), উচ্চ শিক্ষিত খ্রিস্টধর্ম প্রচারক সালেহ আল সুলায়মান (ম্যানিলা), সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা অধ্যাপক হেনরী স্প্রোগ (ফ্রান্স) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এমনিভাবে পৃথিবীর বহু দেশে ইসলামী সভ্যতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সে যে ধর্মেরই হোক, যে সভ্যতারই কলকাঠিতে প্রতিপালিত হোক, এক সময় ইসলাম সম্বন্ধে চরম বিদ্বেষ থাকা সত্ত্বেও মহান মুক্তিকামী এ ধর্মে দীক্ষিত হচ্ছে হাজার হাজার নারী-পুরুষ। ইউক্রেনীয় বংশোদ্ভূত সভেনি কোভালেংকো ১৯৯৫ সালের রামাযান মাসে মস্কোস্থ ইরানী দূতাবাসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর ২৫ বছর বয়স্কা এই মহিলাকে প্রশ্ন করা হয়, 'একটি ধর্মহীন কমিউনিষ্ট সমাজে জন্মলাভ করে কীভাবে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হলেন? এর উত্তরে তিনি বলেন : 'খৃষ্ট ও অন্যান্য ধর্মের উপর অধ্যয়নসহ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতেও যোগদান করেছি। কিন্তু এসব ধর্মকে আমার কাছে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার নিকটবর্তী মনে হয়নি এবং তা জীবন দর্শনের কাছাকাছি নয়। তিনি আরো বলেন : ইসলাম ধর্মের নীতি, শিক্ষা ও আদর্শ এবং মুসলমানদের চালচলন, আচরণ, সভ্যতা ও বিশ্বাসে মুগ্ধ হয়ে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন।[১] ইংল্যান্ডের জগতবিখ্যাত দার্শনিক জর্জ বার্নাড শ' ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছিলেন "I Have Prophesied about the faith of Muhammad that it would be acceptable to the Europ of tomorrow as it is begnning to be accepted to the Europ." 'আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি যে, মুহাম্মদ (সা)-এর ধর্ম ইসলাম আগামী দিনের ইউরোপবাসীদের কাছে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে। ইতিমধ্যেই আজকের ইউরোপবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করেছে।'[২]

বর্তমান বিশ্ব, বিশেষত খৃষ্টাব্দের প্রাণকেন্দ্র ইউরোপ ও আমেরিকার দিকে তাকালে আমরা বার্নাড শ' এর এই ভবিষ্যৎ বাণীর বাস্তবতা দেখতে পাই। সত্য আর শান্তি অন্বেষায় পাগল পারা হয়ে মানুষ আজ ছুটে আসছে ইসলামের দিকে, আশ্রয় নিচ্ছে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে। জার্মানী ও ফ্রান্সের মত ইসলাম বিদ্বেষী দেশে আজ মুসলমানরা দ্বিতীয় বৃহত্তর জাতি। খোদ আমেরিকায় মুসলিম জনসংখ্যা আজ এক কোটির উপরে।[৩] USA Today পত্রিকার ২৭শে জানুয়ারী ১৯৯৪ইং সংখ্যার ভাষ্য : ইসলাম আমেরিকানদের জোয়ারের টানের মত প্রবল শক্তিতে কাছে টেনে নিচ্ছে। আমেরিকানরা এই সর্বজনীন বিশ্বধর্মের প্রতি ক্রমশই ঝুঁকে পড়ছে।[৪] লন্ডন টাইমস লিখেছে, পাশ্চাত্য প্রচার মাধ্যমগুলি যদিও মুসলমানদের ব্যাপারে বরাবরই নেতিবাচক চিত্র তুলে ধরে, তা সত্ত্বেও বৃটিশ অধিবাসীদের মাঝে ইসলাম গ্রহণের মাত্রা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। আরও মজার ব্যাপার হল এই যে, এসব বৃটিশ নও মুসলিমদের বেশির ভাগই মহিলা। পত্র-পত্রিকার খবর অনুসারে মার্কিন নও-মুসলিমদের মধ্যেও পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের সংখ্যা চার গুণ বেশি। "It is even more ironic that most British converts should be women, given the widespread view in the west that Islam treats

---

১. *মাসিক দ্বীন-দুনিয়া*, (ঢাকা: মে ১৯৯৫ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৭।

২. *Genuine Islam,* vol. 1. 1936; *কেন ইসলাম গ্রহণ করছে পশ্চিমারা*, ড. জাকির নায়েক, অনুবাদ, হামিদুল ইসলাম সোহেল, (ঢাকা: পিস পাবলিকেশন, দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০০৯ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৬৩।

৩. *কেন মুসলমান হলাম*, সংকলনে : মাওলানা আবুল বাশার জিহাদী, ২য় খ. (ঢাকা: ইশাআতে ইসলাম কুতুবখানা, মীরপুর, ১৪১৭ হি:/১৯৯৬ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৪।

৪. *USA Today*, ২৭শে জানুয়ারী, ১৯৯৪ খৃ. পৃ.৮।

Dhaka University Institutional Repository

women poorly" "এটা আরও দুঃখজনক বিষয় যে, অধিকাংশ বৃটিশ নও-মুসলিমই মহিলা। অথচ এ মতবাদ গোটা পাশ্চাত্যে বিস্তৃত যে, ইসলাম মহিলাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে।"[১] পাশ্চাত্যের নারী আন্দোলন (FEMINISM) প্রকৃতপক্ষে মহিলাদের মাঝে বিদ্রোহেরই নামান্তর ছিল। 'নারী স্বাধীনতা আন্দোলন' সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে যে সব মহিলা বলেন ; এর উদ্দেশ্য এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, "Women coping men and exercise in which womenhood has no intrinsic value" 'মহিলাদের জন্যে পুরুষদের অনুকরণ এমনই কাজ যাতে নারীত্বের নিজেস্ব কোন মর্যাদাই অবশিষ্ট থাকে না।'[২] অতএব, নারী মুক্তির জন্যে ইসলামী সভ্যতার বিকল্প নেই।

শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চায় নারী

শিক্ষার মর্যাদা সর্বজন স্বীকৃত। শিক্ষা মানুষকে মর্যাদার আসনে সমাসীন করে।

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন :

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ্ তাদের মর্যাদা উন্নত করবেন।'[৩] ইসলামে নারী শিক্ষার প্রতি মোটেও বৈষম্য নেই বরং উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। মহানবী (সা)-এর মাধ্যমে সর্বপ্রথম বাণী 'ইক্বরা' দ্বারা সমগ্র মানব-মানবীকে সম্বোধন করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে :

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

"পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।"[৪]

সায়্যিদ রশীদ রিযা বলেন, "সকল আলিম ঐক্যমত পোষণ করে বলেন, আল্লাহ্ পাক তাঁর বান্দাদের উপর যেসব বিষয় ফরয করেছেন এবং যেসব বিষয় তাদের অবহিত করেছেন সে সব বিষয়ে নারী-পুরুষ উভয়ে সমান।[৫] এমনকি দাসীর ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। রাসূল (সা) বলেন, "যার নিকট একটি দাসী রয়েছে, যাকে সে শিক্ষাদান করলো এবং উত্তম শিক্ষা দিল। তাকে সে শিষ্টাচার শিক্ষা দিল এবং উত্তমভাবে শিষ্টাচার শিক্ষা দিল এরপর তাকে দাসত্ব মুক্ত করে বিবাহ করলো, তাকে দ্বিগুণ বিনিময় প্রদান করা হবে।"[৬]

৭. বর্তমান প্রেক্ষাপটে নারীর মর্যাদাগত অবস্থান ও মূল্যায়ন

(ক). ১৯৫১ সালে লন্ডনে প্রথম অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতা।[৭] এরপর ইউরোপ, আমরিকা ও এশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে পর্যায়ক্রমে এই সুন্দরী প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে শেষ ছোবল হেনেছে সংখ্যাগরিষ্ঠ

---

[১] টাইমস, *ব্রিটিশ মহিলারা ইসলাম গ্রহণ করছে কেন* (লন্ডন : ৯ নভেম্বর ১৯৯৩ খৃস্টাব্দ), *কেন মুসলমান হলাম*, পৃ. ৪।

[২] *কেন মুসলমান হলাম*, পৃ. ২২৩-২২৪।

[৩] আল-কুর'আন, ৫৮ : ১১।

[৪] আল-কুর'আন, ৯৬ : ১।

[৫] ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে ইসলামের ভূমিকা, ৫২ বর্ষ সংখ্যা (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল-জুন ২০১৩ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৪৮; মুহাম্মদ রশীদ রিযা, হুকুকুন নিসা, পৃ. ১১৮।

[৬] *সহীহুল বুখারী*, দারুস সালাম, ২য় সংস্করণ, রিয়াদ ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খৃস্টাব্দ, কিতাবুন নিকাহ্, বাবু ইত্তিখাযিস-সারারিয়্যি ওয়ামান 'আতাকা জারিয়াতান ছুম্মা তাযাওয়াযাহা, হাদসি নং- ৫০৮৩, পৃ. ৯০৯।

[৭] সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, *নারী নির্যাতনের রকমফের*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪-২৫০।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম দেশ বাংলাদেশে। বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতার বিশেষত্ব হল-তিন সপ্তাহ ধরে এক ঝাঁক দেহবতী নারীর অঙ্গশোভা প্রদর্শন। পরবর্তীতে ফাইনাল প্রতিযোগিতায় সুন্দরীদের শারীরিক মাপজোক শুরু হয়। যা অত্যন্ত গর্হিত, নৈতিকতা, শালীনতা ও বিবেকবর্জিত, চরিত্র হননকারী, যুব সমাজ ধ্বংসকারী। এই নগ্নদেহ প্রদর্শনীর মাধ্যমে দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্রের যুবক সম্প্রদায়ের চরিত্র ধ্বংস করা হচ্ছে। এক সময় বাংলাদেশে গান, কবিতায় এদেশের ললনাদের রূপ-লাবন্যের বর্ণনা সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে যাত্রা নাটকে মেয়েরা অংশগ্রহণ করত। কিন্তু সুন্দরী প্রতিযোগিতায় মেয়েরা অংগ্রহণ করত না। অথচ গত কয়েক বছর ধরে পাশ্চাত্যের অনুকরণে বিভিন্ন আঙ্গিকে তথাকথিত প্রগতিবাদীরা নারীর রূপ-সৌন্দর্য প্রদর্শনের আয়োজন করছে। আমাদের দেশেও বিভিন্নভাবে কয়েকবছর ধরে সুন্দরী প্রতিযোগিতা আয়োজনের মহড়া চলছে। এক শ্রেণীর যুবতী কন্যারা নিজের রূপ-সৌন্দর্য প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা শুরু করেছে; বিলিয়ে দিচ্ছে মুসলিম ঐতিহ্য এবং চারিত্রিক পবিত্রতা। তথাকথিত সুনাম, সুখ্যাতি, ঘৃণ্য পন্থায় অর্থ উপার্জন এবং সৌন্দর্য প্রদর্শনের জন্য বর্তমানে তরুণী সমাজ যেন মরিয়া হয়ে ঘৃণ্য প্রতিযোগিতায় নেমেছে। ফলে এ নগ্ন দেহ প্রদর্শনী প্রত্যক্ষ করে চরিত্র নষ্ট হচ্ছে যুব সমাজের। যার কারণে প্রতিনিয়ত ধর্ষন ও যৌন নিপীড়নের মত অপরাধ বাড়ছে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা মেয়েদের সৌন্দর্যকে পোশাক ও সতরের সীমারেখা দ্বারা ঢেকে রাখতে বলেছেন।

ইরশাদ হচ্ছে :

وَقَرْنَ فِي بُيُوذكُنَّ وَلَا ذبَرَّجْنَ ذبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآذينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْذِ وَيُطَهِّرَكُمْذطْهِيرًا

'তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে-মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না। নামায় কায়িম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ। আল্লাহ্ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পুত-পবিত্র রাখতে।'[১]

সাংস্কৃতিক প্রভাবকের ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম। চলচ্চিত্র এমন একটি মাধ্যম যা সর্বসাধারণের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে। এর প্রভাব সুদূর প্রসারী। চলচ্চিত্র হচ্ছে নাটক, সাহিত্য সর্বোপরি মানব সংস্কৃতির একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া। অশ্লীল চলচ্চিত্র বর্তমানে চলচ্চিত্র শিল্পকে ধ্বংস করে দিয়েছে। সৃজনশীল ছবি তৈরির পরিবর্তে আশির দশক থেকে বাংলাদেশে তৈরি করা হয় অশ্লীল নাচ, গানসহ বিদেশী ছবির অনুকরণে নৈতিকতা বিবর্জিত অশ্লীল ছায়াছবি। এসব ছবি দেখার ফলে সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা, ধর্ষণ, অপহরণ, পরকীয়া প্রেম, অবৈধ গর্ভপাতের আধিক্য সহ চাঁদাবাজি, ছিনতাই, মাদকাসক্তির মত নানা চরিত্র হননকারী কর্ম সমগ্র দেশে ছেয়ে যাচ্ছে।[২] বাংলাদেশের প্রায় প্রত্যেকটি প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হয় অপসংস্কৃতিতে ভরপুর কুৎসিত বিষয়বস্তু সম্বলিত অশ্লীল ছায়াছবি। এই সব ছায়াছবি বিজ্ঞাপন, বিপণন, প্রদর্শনসহ সর্বক্ষেত্রে অশ্লীলতায় ভরপুর এবং এসব ছবির ৯০ ভাগ দর্শক আমাদের কিশোর ও যুব সমাজ। এই চলচ্চিত্রের ব্যবসার নামে মানুষের চিন্তা, চেতনা ও মূল্যবোধ ধ্বংসকারী আগুনের লেলিহান শিখা সমগ্র দেশে ছড়িয়ে দিয়েছে। এই সব অশ্লীল ছায়াছবির অনুসরণ করছে বাংলাদেশের তরুণ-তরুণীরা। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, অবাধ প্রেম, অশালীন লেবাস-

---

১. আল কুর'আন, ৩৩ : ৩৩।

২. সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, *নারী নির্যাতনের রকমফের*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬-২৬৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

পোশাক এসবই অপসংস্কৃতির প্রফিলন।[১] অশ্লীল এই সংস্কৃতির ফলে পৃথিবীর তথাকথিত উন্নত দেশের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিলে আমরা দেখতে পাই- যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ৪৫ সেকেন্ডে একজন মহিলা ধর্ষণের শিকার হয়। প্রতিবছর ৩০ লাখ থেকে ৪০ লাখ নির্যাতিত হয়। প্রতি ১৮ সেকেন্ডে ১ জন মহিলা নির্যাতনের শিকার। প্রতি ৪ জন মহিলার মধ্যে ৩ জন মহিলা অবশ্যই জীবনে অন্তত একবার গুরুতর অপরাধের শিকার হয়। প্রতিবছর ১০ লক্ষাধিক মহিলা তাঁদের দেহে নির্যাতনের আঘাতের চিকিৎসা করায়। যুক্তরাষ্ট্রে ধর্ষণের হার ব্রিটেনের চেয়ে ১৩ গুণ, জার্মানির চেয়ে ৪ গুণ, জাপানের চেয়ে ২ গুণ। চলচ্চিত্রের অভিনেতা অভিনেত্রীদের প্রভাবের কারণে তাদের চারিত্রিক প্রভাব পড়েছে আমাদের সমাজে।[২] সাংস্কৃতিক এই আগ্রাসন আমাদের নারী নির্যাতনের অন্যতম কারণ।[৩] স্যাটেলাইট টেলিভিশনের চ্যানেলগুলো এবং বিদেশি অশ্লীল চলচ্চিত্রগুলো সে রকম আগ্রাসন চালিয়ে আমাদের দেশের যুগ যুগ ধরে নির্মিত সভ্যতা, লালিত স্বপ্নের দেশকে ধূলিসাৎ করে দিচ্ছে। কেননা একটি জাতির ভবিষ্যৎ হচ্ছে যুব সমাজ। সেই যুব সমাজ যদি চরিত্রহীন, নৈতিকতাহীন হয় তাহলে ঐ জাতি বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না। কাজেই চলচ্চিত্রের মাধ্যমে যে জাতিকে সুশিক্ষার পাঠ দেয়া যায়; ঠিক তেমনি অপব্যবহারের মাধ্যমেও কুশিক্ষার পাঠও দেয়া যায়। আশির দশকের পর এ বাংলাদেশে আসে ভিসিআর, ভিভিডি ও অন্যান্য আধুনিক যন্ত্র। এ আধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে বিদেশী অশ্লীল ভায়োলেন্স সমৃদ্ধ মারদাঙ্গা ছবির অনুকরণে এদেশে শুরু হয়েছে একই রকম অশ্লীল ছবি তৈরি। ফলে শুরু হয়েছে নারী নির্যাতন, পরিবারে ভাঙ্গন, নারী নিরাপত্তাহীন জীবন। এ কারণে ঐ সব পরিবারের সন্তানরাও হচ্ছে সীমালংঘনকারী, সন্ত্রাসী, বাবা মায়ের অবাধ্য, চরিত্রহীন, মাদকাসক্ত।[৪] অশ্লীল চলচ্চিত্র নারীর ঘর ভাঙ্গছে, স্ত্রীকে করছে স্বামীহারা। এসব যন্ত্র তাই সন্তানকে করছে চরিত্রহীন বিপথগামী। যুব সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতার কারণেই নারী, যুবতী থেকে এখন ছয় বছরে শিশু পর্যন্ত ধর্ষিত হচ্ছে। কলেজ ভার্সিটিতে এখন পরিচ্ছন্ন পরিবেশের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অরাজকতার পরিবেশ। সৃজনশীলতার স্থান দখল করেছে এখন অশ্লীলতা-বেহায়াপনা। এভাবে চলচিত্র শান্তিপূর্ণ সুশীল সমাজ তৈরির পরিবর্তে অশ্লীলতা, নগ্নতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, বাবা মায়ের অবাধ্য হতে শিক্ষা দিচ্ছে।[৫]

---

১. জহুরী, *অপসংস্কৃতির বিভীষিকা*, (ঢাকা: উতলু প্রকাশন, চতুর্থ প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৪১।

২. জন্মগতভাবেই প্রতিটি মানুষ অনুকরণ প্রিয়। প্রত্যেকেই তাঁর সামনে একজনকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। স্বয়ং আল্লাহ পাক এ কারণেই আল্লাহ্‌র নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্র মানব জাতির জন্য দৃষ্টান্ত বা মডেল হিসেবে পেশ করেছেন। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে যুব সমাজের সামনে এই সকল অশ্লীলতাকে মডেল হিসেবে পেশ করা হচ্ছে এবং তাদের আচরণকে পোশাককে যুবক যুবতীরা অনুকরণ করছে। (খাদিজা আকতার রেজায়ী, *মুসলিম নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭)।

৩. আগ্রাসন শব্দটার অর্থ পররাজ্য আক্রমণ বা গ্রাস করা। কিন্তু সাংস্কৃতিক আগ্রাসন হলো আর এক ধরনের পন্থা যার দ্বারা অন্যদেশের
মানুষের দেহ, মন, আত্মার ইতিহাস ঐতিহ্যের উৎকর্ষ সাধন প্রক্রিয়াকে আক্রমন করে দেশটিকে গ্রাস করে ফেলা হয়। (সরকার শাহাবুদ্দীন আহমদ, *নারী নির্যাতনের রকমফের*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬)।

৪. ঔপন্যাসিক বনফুল মন্তব্য করেছিলেন- পূর্বে খাইবার পাশ দিয়ে বহি:শত্রুরা এসে এ দেশ জয় করেছিল। এখন তারা আসছে যন্ত্রের
ভেতর দিয়ে। মানুষ পশুকে জয় করতে পারে মানুষকে পারে না। (*নারী নির্যাতনের রকমফের*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩-২৭৪)

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য সমাজের দর্পন। সাহিত্য মানুষের আদর্শের বাণী শেখায়, সুস্থ সমাজ গঠনের শিক্ষা দেয়। সাহিত্য একটি জাতিকে সম্মোহনী শক্তি সৃষ্টিতে উৎসাহ যোগায়; উদ্বুদ্ধ করে জাতি গঠনমূলক কাজে। সাহিত্যে সমাজের চলচ্চিত্র, রীতিনীতি, বিবি-বিধানের বাস্তব চিত্রই ফুটে ওঠে। ধর্মীয় ও সামজিক জীবনে যা বলা যায় না, সাহিত্যেও তা শোভা পায় না। যদি তা করা হয় তাকে সামাজিকভাবে অশ্লীল বলে আখ্যায়িত করা হয়। সাহিত্যের এসব অশ্লীলতা একটি সুস্থ সমাজকে অসুস্থ করে পাপ পঙ্কিলতার দিকে একটি জাতিকে ঠেলে দেয়।[১] কিন্তু আমাদের সাহিত্য অশ্লীলতার উপাদান সরবরাহ করছে। ব্রিটেন ও আমেরিকার ধারায় আমাদের দেশেও সাহিত্য- কবিতায় অবাধ যৌনাচার নগ্নভাবে উপস্থাপনার মাধ্যমে সমাজকে ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে। আধুনিক কবিতার নামে সৃষ্ট বিকৃত সাহিত্য আমাদের তরুণ প্রতিভাকে বিপথগামী করছে। সাহিত্যে সমাজেরই বাস্তব চিত্র অংকিত হয়ে থাকে। স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশে অশ্লীল পত্র-পত্রিকা, সাহিত্য, বিদেশ থেকে এনে গোপনে এদেশে বিক্রি হত। অশ্লীল সাহিত্যের বিস্তার ছিল কম। ক্রমান্বয়ে খোদ বাংলাদেশেরই এক শ্রেণীর কবি তরুণ সমাজকে আকৃষ্ট করার জন্য আধুনিকতার নামে অশ্লীলভাবে নারীর উপস্থাপন, অশ্লীল প্রেমের কাহিনী লিখে আমাদের সন্তানদের চরিত্র হননের কাজটি সুকৌশলে করে যাচ্ছেন। সাথে সাথে অশ্লীল পত্রিকা চোরাই পথে এনে বর্তমানে প্রকাশ্য গ্রামে-গঞ্জে বিক্রি হচ্ছে। যুব সমাজের নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন ঘটাতে এসব পত্র-পত্রিকা অশ্লীল প্রেমকাহিনী ব্যাপকভাবে সহায়তা করছে। মাছি যেমন নর্দমা, ময়লা আবর্জনা থেকে জীবাণু বয়ে এনে খাবারে বিষ ছড়ায়, ঠিক সমাজেও তেমনি এসব অশ্লীল পত্র-পত্রিকা সুস্থ সামাজিক পরিবেশকে বিনষ্ট করার জন্য সমাজে বিষ ছড়াচ্ছে। বাংলাদেশে একশ্রেণীর অসাধু বিবেকহীন ব্যবসায়ী বিদেশী পত্রিকার আদলে এদেশেও বিভিন্ন নগ্ন অর্ধনগ্ন ছবি সম্বলিত সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক মাসিক পত্রিকা বের করেছে।[২] উন্নত দেশে সাহিত্য ও অপসংস্কৃতির প্রভাব আরো সুদূর প্রসারী।

বস্তুবাদী জগতের চরম উন্নত দেশ নিউইয়র্ক নগরীতে কয়েক মিনিট বিদ্যুৎ না থাকার সুযোগে হাজার হাজার ধর্ষণ, ডাকাতি, লুটপাট ও ছিনতাইয়ের মত ঘটনা সংঘটিত হয়। অসংখ্য কুৎসিত যৌন ব্যধি পাশ্চাত্যের মত বাংলাদেশে আসতে শুরু করেছে। এইডস এর মত ভয়াবহ রোগ থেকেও আমরা নিরাপদ থাকতে পারছি না। আমাদের ধর্মীয় আদর্শ ও মূল্যবোধকে ধ্বংস করে স্বাগত জানাচ্ছে এক শ্রেণীর লেখক ও বুদ্ধিজীবী। আমাদের দেশের বর্তমান নারী নির্যাতন ও অপরাধ প্রবণতা এই ময়লারই ফল। আমাদের বর্তমান ধর্মহীন নৈতিকতা বিবর্জিত শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ, সরকারি প্রচার মাধ্যম, গল্প উপন্যাস, পত্র পত্রিকা প্রভৃতি যেমন মানসিকতার সৃষ্টি করছে তার অনিবার্য পরিণতি নারী ধর্ষণ, হত্যা এসিড নিক্ষেপ, বিবাহ বিচ্ছেদ মানসিক প্রতিবন্ধী সন্তান প্রসব যা পাশ্চাত্য সমাজের আমদানি।[৩] একটি জাতির সাহিত্য সংস্কৃতি গতিধারা যে মুখী হয় সে জাতিও অবেশেষে সে মুখীই হয়ে পড়ে। আমাদের দেশের গত দু'দশকে সাহিত্যের গতিধারা পর্যালোচনা করলে

---

[১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪।

[২]. সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, *নারী নির্যাতনের রকমফের*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১।

[৩]. শামসুন্নাহার নিজামী, *নারী নির্যাতনের কারণ ও প্রতিকার* (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, রমযান- ১৪২২, নভেম্বর-২০০২ খৃস্টাব্দ), পৃ. ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

দেখা যাবে এর লক্ষ্য যৌনতা ছাড়া আর কিছুই নয়। দেশের শ্রেষ্ঠ কথা সাহিত্যিকদের উপন্যাস ও গল্পগুলো পাঠ করলে দেখা যায় তাতে অবাধ মেলামেশা, ব্যভিচার, ধর্ষণ, অবাধ অবৈধ প্রেম প্রভৃতিকে সুকৌশলে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।[১] এ ধরণের গল্প-উপন্যাস, সাহিত্য প্রাক ইসলামী যুগের ইমরুল কায়েসের মত কবি-সাহিত্যকদের যৌন চর্চাকে হার মানায়। বিভিন্ন সংস্কৃতি চর্চার প্রতিষ্ঠানে অবাধ মেলামেশা, অবাধ অবৈধ প্রেমের প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। ধর্মীয় শ্রদ্ধাবোধ নষ্ট করার জন্য ধার্মিক লোকেদের দিয়ে অনৈতিকতামূলক কাজ করানো হয়। ধর্ম ও নৈতিকতা বিধ্বংসী এসব সাহিত্য সংস্কৃতির অংগনে পাশ্চাত্যের অনুসরণে যে বিকৃত মানসিকতা গড়ে তুলেছে তারই উত্তর ফল আজকের নারী নির্যাতন, নারীর অধিকার হরণ এবং বিভৎস ধরণের যৌন অপরাধসমূহ।[২]

ফ্যাশন শো এর মাধ্যমে যুবক শ্রেণীর সামনে যুবতীদের দেহ প্রদর্শনী হয়। তার ফলে নারী ধর্ষণ এসিড নিক্ষেপ, গণধর্ষণ অতঃপর হত্যার মত বহু ঘটনা ঘটে। এ সব উৎস বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত মায়ের জাতের অবমাননা বন্ধ হবে না। নারী দেহ প্রদর্শনীর আরেক প্রক্রিয়া ফ্যাশন শো ধীরলয়ে এদেশে প্রবেশ করেছে। বর্তমান রাজধানীর অভিজাত হোটেল-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে "ফ্যাশন শো" এর আয়োজন করা হচ্ছে। এসব ফ্যাশন শোতে শুধু ঘোড়শী তরুণীদেরই ব্যবহার করা হচ্ছে না বরং স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরও এর সাথে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। শত শত পুরুষের সম্মুখে নানা প্রকার অর্ধউলঙ্গ পোশাক পরে আধ আলোতে যাত্রা ও নৃত্যের তালে তালে পশ্চিমা বা হিন্দি গানের প্রদর্শনী চলতে থাকে।[৩] সম্প্রতি দেশে পাশ্চাত্যের স্টাইলে চলতে কনসার্টের আয়োজনের হিড়িক। অভিজাত হোটেল এলাকায় একশ্রেণীর নারীবাদীরা এসব কনসার্টের উদ্যোক্তা।[৪] সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলে কখনো কখনো এসব উৎসব। এসব কনসার্টে চলে তরুণ-তরুণীদের অবাধ মেলামেশা ও উদ্দাম নৃত্য।[৫] এ সব কনসার্ট স্থলে, বের হবার পথে, গেটে, লাঞ্ছিত হয় তরুণীরা। সারাদিন আর সন্ধ্যার পর যে অভিজাত উচ্চবিত্ত তরুণীরা অশ্লীল আনন্দ প্রকাশ করে কনসার্ট শেষে তারাই অশ্লীলতার শিকার হয়। বাংলাদেশের মানুষের বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং বাঙালী সংস্কৃতির আদৌ কোনো যোগসূত্র নেই এসবের সাথে। পাশ্চাত্যের অশ্লীল বিকৃত ও রুচিহীন অনুষ্ঠানের দ্বারা সেদেশের নারীরা কী মর্যাদা পেয়েছে, সেকথা আমাদের ভাবতে হবে। এভাবেই তরুণ-তরুণীরা লাঞ্ছিত নিগৃহীত হয়। সুতরাং সমাজে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে হলে, নারী নির্যাতন বন্ধ করতে হলে পাশ্চাত্য আদর্শ অনুসরণের সর্বনাশা প্রবণতা রুখতে হবে।

আলকাতরা, ঢেউটিন থেকে শুরু করে রড-সিমেন্টের বিজ্ঞাপনেও নারীর দেহ অঙ্গভঙ্গি জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। নারী দেহকে আল্লাহ্ ঢেকে রাখতে বলেছে। তবে সেই নারীর দেহকে যদি উলঙ্গ করে প্রচার-প্রদর্শন করা হয় তাহলে সে সমাজে নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের কালচার বাড়বেই। বিজ্ঞাপনে নারী ব্যবহার এতই ব্যাপক হয়েছে যে, ব্লেড এর বিজ্ঞাপনেও নারীকে ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্তমানে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী তাদের পণ্য বিপণনের

---

[১]. *দৈনিক ইনকিলাব*, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯ খ্রি:, পৃ.৮ ।

[২]. শামসুন্নাহার নিজামী, *নারী নির্যাতনের কারণ ও প্রতিকার*, প্রাগুক্ত পৃ. ১৪।

[৩]. *নারী নির্যাতনের রকমফের*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪।

[৪]. এসব কনসার্টে থাকে বিদেশী যন্ত্রের কানফাটা উচ্চ আওয়াজে বিকৃত সুরে বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজী গানের আওয়াজ, যন্ত্রের ঝংকারে গানের সুরে রং বেরংয়ের আলোর ঝলকানিতে তরুণ তরুণীদের উদ্দাম নৃত্য। (সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, *নারী নির্যাতনের রকমফের*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩)।

[৫]. সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, *নারী নির্যাতনের রকমফের*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭।

Dhaka University Institutional Repository

উদ্দেশ্যে নারী দেহকে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে অশালীন এবং অশ্লীল ভঙ্গিতে উপস্থাপন করছেন, যা আমাদের নারী সমাজের মর্যাদার জন্য হানিকর এবং যা মুসলিম সংস্কৃতি ও সভ্যতার পরিপন্থী। টেলিভিশন-পত্র-পত্রিকায় নারী জাতিকে ভোগ্যপণ্য ও আপত্তিকর অঙ্গভঙ্গি সহকারে প্রচার করা হচ্ছে। নারীর উলঙ্গ দেহকে বাংলাদেশের বিজ্ঞাপনের মডেল হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।[১] পয়সার বিনিময়ে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের হাতের পুতুল হয়ে যা বলছে মিডিয়া তাই করে চলছে। নারী তার দেহকে বাইরের কদর্যতা থেকে আড়াল করে রাখবে এটাই শাশ্বত বিধান। বর্তমানে প্রকৃতির সেই বিধি লংঘন করে নারীরা বিপর্যয়ের শিকার হচ্ছে। একদিন যে নারীকে মানুষ মায়ের জাত বলে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করত, এখন তাদেরকে পণ্যদ্রব্যের মত সাধারণ বাজারী বস্তু মনে করা হয়। এ অবস্থার জন্য এক শ্রেণীর যুবতীদের উচ্চাভিলাস, উচ্ছৃঙ্খলতা ও বেহায়াপনাই দায়ী। [২]

বাংলাদেশে পতিতাদের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলছে। ১৯৮১ সালে সরকারি হিসাবে দেখা যায় যে, গোটা বাংলাদেশে মোট ৪৩টি পতিতালয় আছে। এগুলোতে ৬ হাজার ৪২ জন পতিতা রয়েছে। এরা সবাই লাইসেন্সধারী। ১৯৮৫ সালে এ সংখ্যা বেড়ে হয় ৭ হাজার। ১৯৮৮ সালে রাজধানীতে পতিতার সংখ্যা হলো ২০ হাজার এবং সারা দেশে কয়েক লক্ষ হবে। এছাড়াও সমাজে ভাসমান লাইসেন্সবিহীন পতিতার সংখ্যাও অনেক। নারী নির্যাতনের প্রথম নাম্বারের শিকার এ দেশে পতিতা পেশা। মানবতার দৃষ্টিতে এটি একটি জঘন্যতম পেশা। কেউ কখনো স্বেচ্ছায় এ পথে আসে না। অসহায় মহিলারা জীবিকার সন্ধানে দিশেহারা হয়ে কুচক্রী মহলের চক্রান্তে পরিস্থিতির শিকার হয়ে এ পেশায় জড়িয়ে পড়ে। এই পতিতাবৃত্তি পেশার অন্তরালে একটি কুচক্রী সমাজ রয়েছে। ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়ে মাতৃজাতিকে এ ঘৃণিত পেশায় নিয়োজিত করে।[৩] সরকার এদেরকে লাইসেন্স দিয়ে থাকে। চরিত্রহীন ও দায়দায়িত্বহীন দিন মজুর, রিকসাওয়ালা এবং নিম্নবিত্ত কর্মজীবী পুরুষদের অবাধ স্ত্রী বদলের ফলে অসংখ্য নারী বাঁচার তাগিদে শহরের বস্তি এলাকায় এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এদের অনেকের সাথেই এক বা একাধিক নাবালক শিশু সন্তান বোঝা হিসেবে থেকে যায়। এদের শতকরা ৯৯ জনেরই জান, মাল, ইজ্জতের কোন নিরাপত্তা নেই।[৪] নিম্নবিত্তদের সাথে সাথে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেও এ সমস্যা আছে বলেই পত্র-পত্রিকায় নানা প্রকার সংবাদ শিরোনামে দেখতে পাওয়া যায়। বিলাসবহুল হোটেলগুলোতেও নারীদের দিয়ে পতিতাবৃত্তি চালু রয়েছে।[৫] আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে রাজধানীসহ বড় বড় শহরগুলোতে পাশ্চাত্য স্টাইলে ব্যাঙের ছাতার মত ম্যাসেজ পারলার বা বিউটি পারলার গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা সূত্রে জানা যায়, এসব বিউটি পারলারে প্রায় ১০ হাজার বিউটিশিয়ান কাম ম্যাসেজম্যান, কাম পতিতা দিয়ে দিনরাত কেন্দ্রগুলোতে আসা

---

১. শামসুন্নাহার নিজামী, *নারী নির্যাতনের কারণ ও প্রতিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১।

২. খাদিজা আখতার রেজমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-৩০।

৩. শামসুন্নাহার নিজামী, *নারী নির্যাতনের কারণ ও প্রতিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০-১১।

৪. এই শ্রেণীর মহিলারা বাধ্য হয়ে নিজেরা নরক জালা ভোগ করছে; পাপ আর রোগ ছড়াচ্ছে। পতিতালয়ের পতিতাদের স্বাস্থ্যগত জরিপ করা হয়েছে, তাতে দেখা গেছে যে, শতকরা ৯৮ জন পতিতাই সিফিলিস ও গণোরিয়ায় আক্রান্ত, দুর্বৃত্ত, দুস্কৃতিকারী এবং দাগী আসামীদের কেন্দ্রস্থল ও আশ্রয়স্থল হল পতিতালয়। (শামসুন্নাহার নিজামী, *নারী নির্যাতনের কারণ ও প্রতিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮)।

৫. অর্থ রোজগারের জন্য এক শ্রেণীর মানুষ হোটেলগুলোতে দেহ ব্যবসা করে থাকে এবং টাকার বিনিময়ে কৃত যৌন লালসা মেটাবার
জন্যে এখানে নারীদের ব্যবহার করা হয়। (শামসুন্নাহার নিজামী, *নারী নির্যাতনের কারণ ও প্রতিকার*, প্রাগুক্ত. পৃ. ১০-১১)।

Dhaka University Institutional Repository

খদ্দেরদের মনোরঞ্জনের জন্য অসামাজিক যৌন ক্রিয়ায় লিপ্ত হয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে থাকে। নৈতিক অধঃপতনের এই ভয়াবহ চিত্র বর্তমান বাংলাদেশের, যা আমাদের নারী নির্যাতনের অন্যতম কারণ।

এককালের পাশ্চাত্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এখন উন্মুক্ত, অবাধ, অপসংস্কৃতরি চর্চা কেন্দ্র। উৎসবের নামে করে নববর্ষ, বর্ষবরণের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বিজাতীয় অশ্লীল অনুষ্ঠানাদি পালন করা হয়। বাঙালিত্বের নামে হিন্দু সংস্কৃতির মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান উদ্বোধন হয়। রাত বারটার পর গাড়ি নিয়ে রাস্তায় উচ্চশব্দে হর্ণ বাজাতে বাজাতে গাড়ি মিছিল দিয়ে শুরু হয় নববর্ষের সূচনা। বাঘ, ঘোড়া, হাতি, শিয়াল, পেচাঁ বানরের মুখোশ পরে ঢাক, উলুধ্বনি, শাঁখ কাসার ঘন্টার সহযোগে বের হয় মিছিল। রমনা পার্কে ঘটা করে পান্তা ভাত আর পিঠাপুলির আয়োজন।[১] রমনা পার্কে, পয়লা বৈশাখের সকালে এসব ধনীর দুলালী একদিনের বাঙালি সেজেছেন এবং খদ্দের ভেদে ২০ টাকা থেকে ১০০ টাকা প্রতি শানকি পান্তা ভাত খেয়ে ভ্যানিটি ব্যাগ ভারি করে। বুদ্ধিজীবীরা গলা ফাটিয়ে বলেছেন, নতুন শতাব্দী হবে মানবতার জয়গানের শতাব্দী। তাদের মানবতার জয়গানে জাতি শংকিত। তাদের মানবতা মানে যুবক-যুবতীর কণ্ঠলগ্ন নৃত্য, আদিম জংলী কায়দার জঙ্গল নিশি উদ্‌যাপন, টোটেম সমাজের মতো মুখোশি নাচ, উলঙ্গ নৃত্য প্রভৃতি। তাদের মানবতা বিবাহ বন্ধন মানে না; কন্যার কুমারীত্ব নিয়ে মাথা ঘামায় না।

পাশ্চাত্য সমাজের আদর্শে বিয়ে ছাড়াই সহবাস, গর্ভধারণ ও দেহের প্রদর্শনীকে এরা নারী স্বাধীনতা মনে করে। বাহু কণ্ঠলগ্না নারীকেই এরা আধুনিক আখ্যা দেয়। এ অবস্থার কারণেই নির্যাতিত নিগৃহীত হচ্ছে নারীরা রাস্তা ঘাটে; বিবস্ত্র হচ্ছে বাঁধনএর মত নারী, হামলার শিকার হচ্ছে তরুণীরা, নিহত তরুণীর লাশ পাওয়া যাচ্ছে রমনার লেকে। মানবতার এটাই জয়ধ্বনি।[২] টোপর পরা তরুণী স্মিতহাস্যে মেলায় আগত তরুণের মুখে পান্তা খাইয়ে দিচ্ছে। বর্ষবরণের নামে চারুকলা ইনস্টিটিউট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তরুণ-তরুণীরা পরস্পরের মাথায় সিঁদুর, মুখে চন্দনের তিলক পরিয়ে, হাতে বুকে উল্কি ্একে নানা রঙে সেজে রাস্তায় বাদ্য বাজনাসহ নৃত্য পরিবেশন করে। আধুনিকতার নামে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে চলছে এ ধরনের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন; যা আমাদের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের সুনাম নষ্ট করছে। মেধাবী প্রতিভাবান ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা বিকাশের পথে বাঁধার সৃষ্টি করেছে। এ সব কারণে অকালেই ঝড়ে যাচ্ছে, বিপথগামী হচ্ছে, আমাদের তরুণ সমাজ। আত্মবিক্রিত মানুষের পরিণতি সম্বন্ধে আল্লাহ্ পাক কু'আনে সাবধান করেছেন

فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيث سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ

"যারা কুর'আনকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের ছেড়ে দাও আমার হাতে, আমি তাদের এমনভাবে ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাব যে, তারা জানতেও পারবে না। আমি তাদের সময় দিয়ে থাকি, আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।"[৩]

---

১. আয়ার দানিশ, *দৈনিক ইনকিলাব* ২৩ বৈশাখ ১৪০০, পৃ. ৮।

২. *দৈনিক ইনকিলাব*, ২৩ বৈশাখ ১৪০০, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

৩. আল কুর'আন, ৬৮ : ৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

তথাকথিত প্রগতিবাদী যে উন্নত জাতির অনুসরণ-অনুকরণ করে বর্তমানে মুসলিমরা তাদের সংস্কৃতির দাসত্ব করছে সে পাশ্চাত্য জাতি কী নারীর মর্যাদা দিতে পেরেছে। শুধু যৌন স্বাধীনতাই সম্মানের মাপকাঠি নয়। যদি তা-ই হত তাহলে মার্কিন মুলুক সন্ত্রাস, সহিংস ঘটনা, উচ্ছৃঙ্খল যৌন অপরাধ, যৌন রোগ নিরাময়ে অপারগ হত না। বর্তমানে তারা পরিবার ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য 'ফ্যামিলি ডে' 'মা দিবস', 'বাবা দিবস', ও নারী অধিকার দিবস পালন করছে। নিম্নের পরিসংখ্যান প্রমাণ করে তারা অশ্লীলতা উচ্ছৃঙ্খলতা দ্বারা শান্তিতে নেই। তবে আমরা কেন তাদের অনুসরণ করছি? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ১৮ সেকেন্ড একটি সহিংস অপরাধ ঘটে নারী ঘটিত কারণে। গড়ে প্রতিদিন এই মার্কিন মুলুকে বাষট্টি জন বুলেট বিদ্ধ হয় নারী ঘটিত কারণে; আমেরিকার প্রতি ছয়জনের একজন জারজ সন্তান। ১৯৭৯ সালে ৫ লাখ ৯৭ হাজার অবৈধ সন্তানের জন্ম হয়েছে। এই দেশে ১৯৭০ সালের তুলনায় ৫০ ভাগ অবৈধ সন্তান বৃদ্ধি পায়। দেশব্যাপী শ্বেতাঙ্গ কুমারীদের এক তৃতীয়াংশ এবং কৃষ্ণাঙ্গ কুমারীদের আর্থিক ও দৈহিক চাপ আর ঝামেলা যারা সহ্য করতে পারে না শুধু তারাই সন্তান প্রসব করে থাকে। বর্তমান কুমারী জননীরা ১৩ লাখ শিশু লালন পালন করছে। মার্কিন সরকার প্রতি বছর ৭০ কোটি ডলারের অধিক অর্থ ব্যয় করে থাকে অবৈধ সন্তান পালনের জন্য। ১৯৮০ সালের এক তথ্যে জানা যায়, ভারতে ২০ লাখ নারী ধর্ষিতা হয় প্রতি বছরে।

১৯৭৭ সালে নিউইয়র্কে কিছুক্ষণ বিদ্যুৎ না থাকার সুযোগে নারী স্বাধীনতার পৃষ্টপোষক "মহান এদেশের" এই মহানগরীতে কয়েকহাজার মহিলা আলোহীন কিছুক্ষণে ধর্ষণের শিকার হন। এরকম হাজার হাজার পরিসংখ্যান রয়েছে। পাশ্চাত্যের রংবাজ আর বর্বর আচার-অনুষ্ঠান এবং যৌন জীবনধারা এভাবে অনুসরণ করলে অচিরেই আমরা তাদের পিছনে ফেলে যেতে পারব। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্যান্য উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও ছাত্রী শ্লীলতাহানি, ছাত্রীদের সম্ভ্রমহানি, ইত্যকার ঘটনা পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে, ছাত্রীরা এর প্রতিবাদ করে মিটিং-মিছিলও করছে। নারীদের ওপর নির্যাতন ও ধর্ষণের অভিযোগে ছাত্রীরা অনশন ধর্মঘট পালন করছে। শতকরা ৮৭ ভাগ মুসলমান অধ্যুষিত এই বাংলাদেশের সমাজ ও শিক্ষাঙ্গনের এই চিত্র। বাংলাদেশে ধর্মীয় আইনের প্রতি বিশ্বাসের কারণে একসময় অন্যান্য বিধর্মীয় দেশের তুলণায় যৌন অপরাধ ছিল সবচেয়ে কম। ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার আচরণের কারণেই পারিবারিক বন্ধন অত্যন্ত সুদৃঢ় ছিল।[১] কিন্তু বর্তমানে প্রগতি ও তথাকথিত সভ্যতার নামে ঐতিহ্যবাহী পরিবারিক বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। ফলে ভঙ্গুর পরিবারের সন্তানরা আদর্শ বাবা মায়ের স্নেহ ছায়ায় আদর্শ সন্তান হিসেবে গড়ে উঠতে পারছে না। বিপথগামী চরিত্রহীন যুব সমাজের কারণে সমাজ ও শিক্ষাঙ্গনে নারীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। সম্মানিত নারী জাতি যত্রতত্র নিজেকে বিকিয়ে দিচ্ছে; বিকৃত মানসিকতার শিকার হয়ে ভূল পথে পা বাড়াচ্ছে। বর্তমানে অবাধ ব্যভিচারের পথ ব্যাপক হওয়ায় বিয়ে ব্যবস্থা কঠিন হয়ে পড়েছে। যৌতুক প্রথার যাতাকলে হিন্দুদের মত মুসলিম পরিবারও নিষ্পেষিত হচ্ছে। যৌন অনাচারে ছড়াছড়ির কারণে এসিড নিক্ষেপ, বিবাহ বিচ্ছেদ, পতিতাবৃত্তি, ধর্ষণ, হত্যা আত্মহত্যার সংখ্যা আশংকাজনক হারে বেড়েই চলছে। ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থা, নৈতিকতা ও শালীনতা বর্জিত লেবাস, আচার-আচরণ, বল্গাহীন নিয়ন্ত্রণবিহীন উচ্ছৃঙ্খল অশ্লীল সিনেমা, নাটক, নাচ, গান, সাহিত্য এবং নানা

[১]. জহুরা, *অপসংস্কৃতির বিভীষিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩-১৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

পথ ও প্রক্রিয়ায় সাংস্কৃতিক আগ্রাসনই হচ্ছে নারীর নিরাপত্তহীনতা, অধিকারহীনতা, সম্মানহীনতা এবং নির্যাতনের অন্যতম কারণ। নারী প্রগতির নামে বিংশ শতব্দীতে নারীর এই ভয়াবহ অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলিম রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও এ দেশে কালচার প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারছে না ।

(খ) রাসূল (সা) ও রাসূল পরবর্তী সময়ে নারীর শিক্ষাগত অবস্থা

মহানবী (সা) যখন একটি আদর্শ সমাজ গঠনে ব্যস্ত, তখন মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশ হলো যে, কোন মহিলা যদি এ সমাজের সদস্য হিসেবে গণ্য হতে চায়, তাহলে তার নিকট হতে নিম্নে বর্ণিত নীতিমালা ও আইনের আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"হে নবী! ঈমানদার মহিলারা যখন আপনার কাছে বাইয়াতের জন্য আসে যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, নিজেদের হাত ও পায়ের মধ্যবর্তী স্থানের কোন অপবাদ গড়বে না এবং কোন ভাল কাজে আপনার অবাধ্য হবে না, তাহলে আপনি তাদের বাইয়াত গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।"[১] এই আয়াতে মহিলাদের নিকট থেকে যেসব বিষয়ে প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে তার মধ্যে একটি হলো তারা কোন সৎকাজে রাসূলে করীম (সা)-এর অবাধ্য হবে না। এ কথাটি দ্বারা তাদের উপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পণ করা হয়েছে। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে তাদেরকে রাসূলের (সা) আনুগত্যের জন্য দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে নারী সমাজের মধ্যে ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে অবগত হওয়ার এমন অদম্য আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছিল যে, সেজন্য তারা দিনরাত সবসময় ব্যতিব্যস্ত থাকতো। জ্ঞান আহরণের পথে কোন বাধা ও প্রতিবন্ধকতা তাদেরকে নিরাশ করতে পারতো না। আনসারী মহিলাদের সম্পর্কে হযরত আয়শা (রা) বলেন :

"আনসারী মহিলারা কতই না ভাল। দ্বীনের বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে লজ্জা-শরমও তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে নি।"[২] ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে সে যুগের মহিলারা কত গভীর ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিয়ে অধ্যয়ন করতেন তা হযরত আয়েশা (রা)-এর নিম্নের উক্তি হতেই বোঝা যায়। "নবী করীম (সা)-এর যুগে কুর'আন মজীদের কোন আয়াত নাযিল হলে, আমরা তার শব্দগুলো হুবহু মুখস্ত না করলেও তার হালাল-হারাম এবং আদেশ-নিষেধগুলো স্মৃতিপটে গেঁথে নিতাম।"[৩] ইবাদত এবং জ্ঞান চর্চার মজলিসে নারীরা বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণ করতো। খাওলা বিন্‌তে কায়েস আল-জাহনিয়া (রা) নবী করীম (সা)-এর সুউচ্চ কণ্ঠের উল্লেখ করে বলেছেন : "জুম'আর দিনে আমি নবী (সা)-এর খুতবা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে শুনতে পেতাম।

---

[১] আল কুর'আন, ৬০ : ১২।

[২] মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১।

[৩] ইব্‌ন আবদি রাব্বিহি, *আল-ইকদুল ফরীদ*, ১ম খ., কায়রো: মাতবা'আতু লাজনাতিত্ তা'লীক, ১৯৬৫, পৃ. ২৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

অথচ আমি মেয়েদের সর্বশেষ কাতারে থাকতাম।"[১] হারিসা ইব্নে নু'মানের এক কন্যা বর্ণনা করেছেন : "আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখ থেকে শুনেই সূরা কা'ফ মুখস্ত করেছিলাম। তিনি প্রত্যেক জুমু'আর খুতবাতে এটি পড়তেন।"[২] মেয়েদের উপদেশ ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নবী করীম (সা) নিজেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। যদি কোন সময় তিনি বুঝতে পারতেন যে, মেয়েরা তার বক্তব্য ঠিকমত শুনতে পায় নি, তাহলে তিনি তাদের কাছে গিয়ে পুনরায় তা বলে দিতেন। হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আব্বাস (রা) এক ঈদের দিনের কথা উল্লেখ করে বলেছেন : "তিনি মনে করলেন যে, তিনি তাঁর কথা মেয়েদের কাছে পৌঁছাতে পারেন নি। তাই পুনরায় তিনি তাদেরকে নসীহত করলেন। তাদের সাদকা দেয়ার জন্য আদেশ দিলেন।"[৩]

ইসলাম জ্ঞানান্বেষণের জন্য নারীদের মনে অত্যন্ত গভীর আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল। তাদের এই জ্ঞান-পিপাসা নিবারণের জন্য নবী করীম (সা) সাধারণ ব্যবস্থা ছাড়াও মাঝে মধ্যে তাদের জন্য অতিরিক্ত সুযোগ করে দিতেন। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে : "মহিলারা নবী করীম (সা)-কে বললো, আপনার কাছে পুরুষরা এত ভিড় লাগিয়ে থাকে যে, অনেক সময় আমাদের পক্ষে আপনার কথা শুনা সম্ভবই হয় না। অতএব, আমাদের জন্য আপনি আলাদা একটি দিন ধার্য করে দিন। একথা শুনে নবী (সা) তাদের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিলেন। সেই দিন তিনি তাদের কাছে গিয়ে উপদেশ দিতেন এবং সৎকাজের নির্দেশ দিতেন।"[৪] কোন কোন সময় নবী করীম (সা) মহিলাদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্য নিজের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে তাদের কাছে পাঠাতেন। হযরত উম্মে আতিয়া (রা) বলেন, মদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মহিলাদেরকে একটি ঘরে একত্র করে নসীহত করার জন্য হযরত উমর (রা)-কে পাঠালেন। তারপর তিনি এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে সালাম দিলেন। আমরাও তাঁর সালামের জবাব দিলাম। এরপর তিনি বললেন : "আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতিনিধি হিসেবে আপনাদের কাছে এসেছি। অতঃপর তিনি আমাদের যুবতী এমনকি ঋতুবতী মেয়েদেরকেও দু' ঈদের দিন ঈদগাহে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। আরও বললেন যে, আমাদের জন্য জুম'আর নামায ফরয নয়। আর তিনি আমাদেরকে জানাযার সাথে যেতে নিষেধ করলেন।"[৫] মহিলাদের প্রাথমিক শিক্ষাগার ও প্রশিক্ষণ স্থান হলো গৃহ। তাই পিতামাতা যাতে কন্যাদেরকে এবং স্বামী যাতে স্ত্রীকে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে শেখায় এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে, ইসলাম সেদিকে তাদের দৃষ্টি দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে। কুর'আন মজীদে বলা হয়েছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

---

৪. ইব্ন সা'দ, *আত্ তাবাকাত*, ৮ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭।

১. মুসলিম, *সহীহ্ মুসলিম*, ২য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৫।

২. বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, ১ম খ., কিতাবুল ইলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০; মুহাম্মদ জামালুদ্দীন, *মুসলিম নারীর পোশাক ও কর্ম* (ঢাকা: এশা রাহনুমা, সাইনস্ ল্যাবরেটরী, ১৯৯৮ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৭২-৭৬।

৩. বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

৪. জালালুদ্দীন উমরী, *ইসলামী সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও।"[১] এ আয়াতের অর্থ হযরত আলী (রা) এভাবে করেছেন : "তোমরা নিজেরা শেখ এবং পরিবারবর্গকে শেখাও সব কল্যাণময় রীতি-নীতি এবং তাদের আদব শিক্ষা দাও ও এসব কাজে অভ্যস্ত করে তোল।"[২] মালিক ইব্নে হুয়াইরিস (রা) বলেন, আমরা কয়েকজন যুবক দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য নবী (সা)-এর কাছে বিশ দিন পর্যন্ত অবস্থান করলাম। যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, আমরা বাড়ি ফেরার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছি, তখন তিনি বললেন : "তোমরা তোমাদের স্ত্রী-পুত্রের কছে ফিরে যাও এবং তাদের কাছেই অবস্থান কর। তাদেরকে দীন সম্পর্কে শিক্ষা দাও এবং তা মেনে চলার নির্দেশ দাও।"[৩]

(গ). সাহাবীদের যুগে নারী শিক্ষা

নবী করীম (সা)-এর পরবর্তীকালে সাহাবীগণ ব্যক্তিগতভাবে নারীদের চিন্তা ও কর্মের সংশোধনের জন্য ব্যাপক চেষ্টা সাধনা করেছেন। একইভাবে তাঁরা সমাজ সংস্কারের যে চেষ্টা-সাধনা করতেন তাতেও পুরুষদের সাথে নারীরাও অন্তর্ভুক্ত থাকতো। আয়েযা নাম্নী এক মহিলা সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর বক্তৃতার উল্লেখ করে বলেছেন : "আমি আবদুল্লাহ্ ইব্নে মাসঊদ (রা)-কে নারী ও পুরুষের উদ্দেশ্যে এই বলে নসীহত করতে দেখেছি যে, নারী পুরুষ নির্বিশেষে তোমাদের মধ্যে থেকে যেই ফিতনার যুগের মুখোমুখী হবে সে যেন নবী (সা)-এর সাহাবীগণের কর্মপন্থা দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করে।"[৪]

ফলে পূর্বে যে নারীরা জ্ঞান ও সংস্কৃতির সাথে একেবারেই অপরিচিত ছিল এখন তারা তার রক্ষক হয়ে দাঁড়ালো। চিন্তা ও সাহিত্যের জগতে যাদের কোন অস্তিত্বই অনুভূত হতো না, এখন তারা জ্ঞান ও হিদায়াতের প্রদীপরূপে আত্মপ্রকাশ করলো। হযরত আয়েশা (রা)-এর বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক জ্ঞান সম্পর্কে তাঁর ছাত্র উরওয়া ইব্ন যুবায়র (রা) বলেছেন : "আমি কুর'আন, ইসলামের ফরযসমূহ, হালাল ও হারাম, কাব্য ও সাহিত্য, আরবদের ইতিহাস ও নসবনামা বিষয়ক জ্ঞানের ক্ষেত্রে হযরত আয়েশা (রা)-এর চেয়ে অধিক জ্ঞানী লোক আর দেখি নি।"[৫]

আরবী কাব্য ও কবিতায় উরওয়া ইব্ন যুবায়র (রা)-এর বেশ দখল ছিল। এ ক্ষেত্রে তাঁর প্রশংসা করা হলে তিনি বলতেন, কাব্য বিষয়ে হযরত আয়েশা (রা)-এর জ্ঞানের সাথে আমার জ্ঞানের কোন তুলনাই চলে না। তিনি তো কথায় কথায় কবিতা থেকে প্রমাণ পেশ করতেন।[৬] মূসা ইব্ন তালহা বলেন : "আমি হযরত আয়েশা (রা)-এর চেয়ে অধিক বাগ্মী ও শুদ্ধভাষী আর কাউকে দেখি নি।"[৭]

লোকেরা হযরত আয়েশা (রা)-এর কাব্য ও সাহিত্য বিষয়ে জ্ঞানের তুলনায় চিকিৎসা বিষয়ক অধিক জ্ঞান দেখে বিস্মিত হয়। ইব্ন আবী মুলায়কা হযরত আয়েশা (রা)-কে বললেন, আমরা আপনার কবিত্ব ও বাগ্মীতা দেখে

---

[৫] আল কুর'আন, ৬৬ : ৬।
[১] আল্লামা শাওকানী, *ফাতহুল কাদীর*, ৫ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬।
[২] বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, ১ম খ., কিতাবুল আযান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।
[৩] দারেমী, *সুনান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।
[৪] হাফিজ যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ*, ১ম খ. (বৈরুত : দারু ইহইয়ায়িত্ তুরাসিল আরাবী, তা. বি.), পৃ. ২৭।
[৫] জালালুদ্দীন উমরী, *ইসলামী সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩।
[৬] ইব্ন হাজার আল আসকালানী, *আল ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা*, ৪র্থ খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০।

Dhaka University Institutional Repository

চমৎকৃত হই না। কারণ, আপনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর কন্যা। আর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর বাগ্মীতা সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু আপনি চিকিৎসা বিদ্যা কীভাবে শিখেছেন? হয়রত আয়েশা (রা) বললেন : নবী (সা) অসুস্থ হয়ে পড়লে বাইরে থেকে আগত প্রতিনিধিদল তাঁর চিকিৎসা করতো। আমি সেগুলো মনে রাখতাম।[১] এ সকল বক্তব্য দ্বারা সে সময়েও যে সকল বিষয়েই জ্ঞান অর্জনের সুযোগ ছিল সেটাই বুঝানো হয়েছে। মীরাস শাস্ত্রে তিনি এমন জ্ঞানের অধিকারিণী ছিলেন যে, বড় বড় সাহাবীগণ পর্যন্ত উত্তরাধিকার বিষয়ক মাস‘আলা-মাসায়িল তাঁর নিকট থেকে জেনে নিতেন।[২] ‘আমরা বিন্‌তে ‘আবদুর রহমানও হযরত আয়েশা (রা)-এর একজন ছাত্রী ছিলেন। ইব্‌ন ইমাদ হাম্বলী নিম্নোক্ত ভাষায় তার কথা উল্লেখ করেছেন ‘আমরা বিন্‌তে ‘আবদুর রহমান আনসারী বিজ্ঞ ফিক্‌হবিদ ছিলেন। তিনি হযরত আয়েশা (রা)-এর কোলে লালিত-পালিত হয়েছিলেন। অতএব, তাঁর নিকট থেকে তিনি সর্বাপেক্ষা বেশি সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি নির্ভরযোগ্য এবং মজবুত স্মৃতিশক্তি সম্পূর্ণ ছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহ সর্বদা গ্রহণযোগ্যতা পেত।”[৩] ইব্‌ন হাব্বান (র) তাঁর সম্পর্কে লিখছেন -

“তিনি হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত ছিলেন।”[৪] তাবে‘য়ীদের যুগে বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ্‌ কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইমাম যুহরীকে বললেন : আমি তোমার মধ্যে জ্ঞান পিপাসা লক্ষ্য করছি। আমি কি তোমাকে জ্ঞানে পরিপূর্ণ একটি পাত্র দেখিয়ে দেব না? যুহরী বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। তিনি বললেন, ‘আমরা বিন্‌তে আবদুর রহমানের মজলিস কখনো ছেড়ে থেকো না। কারণ, তিনি হযরত আয়েশা (রা)’-এর কোলে লালিত-পালিত। অতএব, তিনি তাঁর জ্ঞানের পূর্ণ উত্তরাধিকারিণী। ইমাম যুহরী (র) বললেন, তাঁর পরামর্শ অনুসারে আমি ‘আমরা বিন্‌তে ‘আবদুর রহমানের খিদমতে হাজির হলে জানতে পারলাম, প্রকৃতই তিনি জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার।[৫] হাফিজ ইব্‌ন হাজার আসকালানী (র) উম্মে সালমা (রা) সম্পর্কে লিখেছেন - “উম্মে সালামা (রা) পরমা সুন্দরী হওয়ার সাথে সাথে পরিপক্ক বুদ্ধি ও সঠিক সিদ্ধান্তের অধিকারিণী ছিলেন।”[৬] হযরত উম্মে সালামা (রা)-এর কন্যা যায়নাব (রা) সম্পর্কে ইব্‌ন আবদুল বার (র) বলেন : “তিনি তাঁর যুগের সর্বাপেক্ষা বড় ফকীহ্‌দের অন্যতম ছিলেন।”[৭] আবূ রাফে‘সায়িদ (র) বলেন - “যখনই আমি ফিক্‌হ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ মদীনার কোন মহিলার কথা স্মরণ করি, তখনই যায়নাব বিন্‌তে আবূ সালামার কথা মনে পড়ে যায়।”[৮] উম্মুল হাসান নামে উম্মে সালামার একজন দাসী ছিলেন। তিনি এতই যোগ্যতার অধিকারিণী ছিলেন যে, মেয়েদের মধ্যে নিয়মিত তাবলীগ ও ওয়াজ-নসীহত করতেন।[৯] উম্মুল মু‘মিনীন হযরত সাফিয়া (রা) সম্পর্কে ইমাম নববী (র) বলেন : “তিনি

---

[১]. হাকেম, *মুসতাদরাক*, ৪র্থ খ., প্রগুক্ত, পৃ. ১১।

[২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

[৩]. ইব্‌ন ইমাদ হাম্বলী, *শাজারাতুয্‌ যাহাব*, ১ম খ. (বৈরুতঃ আল মাকতাবাতুত্‌ তিজারী, তা. বি.), পৃ. ১১৪।

[৪]. ইব্‌ন হাজার আল আসকালানী, *তাহযীবুত্‌ তাহযীব*, ১২শ খ.(বৈরুতঃ দারু ইহইয়ায়িত্‌ তুরাসিল আরাবী, তা. বি.), পৃ. ১২৯।

[৫]. হাফিজ যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফাফাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬।

[৬]. ইব্‌ন হাজার আল আসকালানী, *আল ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা*, ৪র্থ খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯।

[৭]. ইব্‌ন আবদুল বার, *আল ইসতিয়াব ফী আসমাইল আসহাব, তাযকিরাত যায়নাব বিন্‌তে আবূ সালামা*; ৪র্থ খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫৫।

[৮]. ইব্‌ন হাজার আল আসকালানী, *আল ইসাবা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭।

[৯]. ইব্‌ন সা‘দ, *আত তাবাকাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫০।

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানবতী ও বুদ্ধি বিবেচনার অধিকারিণী মহিলাদের একজন।"[১] হযরত আবুদ্দারদা (রা)-এর স্ত্রী উম্মুদ্দারদা (রা)-এর জ্ঞান ও মর্যাদা এত উচ্চ পর্যায়ের ছিল যে, ইমাম বুখারী (র) তাঁর আমলকে সহীহ্ বুখারী গ্রন্থে প্রমাণ ও উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন : "উম্মুদ্দারদা (রা) একজন ফকীহ্ মহিলা ছিলেন। তিনি নামাযে পুরুষের মত করে বসতেন। তাঁর এই আমল দলীল হিসেবে গণ্য।"[২] "তিনি বিবেক-বুদ্ধি, মর্যাদা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার অধিকারিণী মহিলাদের মধ্যে গণ্য হতেন। এছাড়া তিনি ছিলেন ইবাদতগুজার এবং মুত্তাকী।"[৩] ইমাম নবূবী (র) তাঁর জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার ব্যাপারে সবাই একমত বলে উল্লেখ করেছেন : "তাঁর জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধিমত্তা ও মর্যাদা সম্পর্কে সবাই একমত।"[৪] ফাতিমা বিন্তে কায়স (রা) অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারিণী ছিলেন। একটি ফিক্হী মাস'আলার ব্যাপারে তিনি দীর্ঘদিন পর্যন্ত হযরত 'উমর এবং হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে বিতর্ক চালিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা তাঁর মতের পরিবর্তন ঘটাতে পারেন নি। এ কারণেই মুসলিম উম্মাহ্র অনেক বড় বড় ইমাম তাঁর সিদ্ধান্তকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম নবূবী (র) লিখেছেন : "তিনি প্রথম যুগে হিজরতকারিণীদের একজন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও পূর্ণতার অধিকারিণী ছিলেন।"[৫] হযরত আনাস (রা)-এর মা উম্মে সুলাইম (রা) ছিলেন অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন একজন মহিলা সাহাবী। হাফিজ ইব্ন হাজার (র) তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে বলেন :"তাঁর মর্যাদা ওগুণাবলী অনেক এবং সর্বজনবিদিত।"[৬] তাঁর সম্পর্কে ইমাম নবূবী (র) বলেন : "তিনি ছিলেন জ্ঞান ও মর্যাদার অধিকারিণী মহিলা সাহাবীগণের একজন।"[৭] হযরত উম্মে আতিয়া (রা) উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন একজন মহিলা সাহাবী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে ইমাম নবূবী (র) লিখেছেন "তিনি উচ্চ মর্যাদা ও জ্ঞানের অধিকারিণী মহিলা সাহাবীগণের একজন। তিনি রাসূলে করীম (সা)-এর সাথে জিহাদেও শরীক হয়েছেন।"[৮] হাফসা বিনতে সিরীন উম্মে আতিয়া (রা)-এর একজন ছাত্রী ছিলেন। বার বছর বয়সেই তিনি কুর'আন মজীদ শিক্ষা করেন। তিনি বসরার বাসিন্দা ছিলেন। বসরার বিখ্যাত কাযী ও ফকীহ ইয়াস ইব্ন মু'আবিয়া তাঁর সম্পর্কে বলেন - "আমি এমন কোন লোক দেখি নি, যাকে হাফসা বিন্তে সিরীনের উপর মর্যাদা দিতে পারি।"[৯] তাবি'য়ীদের ইমাম সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যেব তাঁর এক ছাত্রের সাথে নিজের মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিলেন। বিয়ের পরদিনই তিনি তাঁর উস্তাদ ইমাম সাঈদের মজলিসে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতেছিলেন। তখন তাঁর স্ত্রী ইমাম সাঈদের কন্যা বললেন - "আপনি বসুন। ইমাম সাঈদ আপনাকে যা শিখাবেন তা আমিই আপনাকে শিখিয়ে দিব।"[১০] ইমাম মালিক (র)-এর নিকট তাঁর ছাত্ররা মুয়াত্তা অধ্যয়নকালে কোথাও কোন ভুল করে ফেললে ইমাম সাহেবের কন্যা ঘরের ভেতর থেকে দরজায় করাঘাত করতেন। নিজের কন্যা সম্পর্কে ইমাম মালিক (র)-এর এতটা আস্থা ছিল যে, দরজায় তাঁর করাঘাত শুনলেই

---

১০. ইমাম নববী, *তাহযীবুল আসমা ওয়াস সিফাত*, ২য় খ. (মিশরঃ ইদারাতুত্ তারআতিল মুনীরিয়াহ, তা. বি.), পৃ. ৩৪৯।

১. বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, ১ম খ., কিতাবুল আযান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪।

২. ইব্ন আবদুল বার, *আল ইসতিয়াব ফী আসমাইল আসহাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩৫।

৩. ইমাম নবূবী, *তাহযীবুল আসমা ওয়াস সিফাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৩।

৫. ইব্নে হাজার আল আসকালানী, *তাহযীবুত্ তাহযীব*, ১২শ খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭২।

৬. ইমাম নবূবী, *তাহযীবুল আসমা ওয়াস সিফাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৩।

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৪।

৮. ইবনে হাজার আল আসকালানী, *তাহযীবুত্ তাহযীব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৯-৪১০।

৯. ইবনুল হাজ্জ, *আল মাদখাল*, ১ম খ. (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, তা. বি.), পৃ. ২১৫।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ছাত্রকে বলতেন : "তুমি আবার পড়। তোমার কোথাও ভুল হয়েছে।"[১] একবার হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) একটি মাস'আলা বর্ণনা করলেন। তখন উম্মে ইয়াকূব নাম্নী বনী আসাদ গোত্রের এক মহিলা তাঁর কাছে এসে বললেন : "আমি পূর্ণ কুর'আন মজীদ পড়েছি। কিন্তু আপনি যে মাস'আলা বর্ণনা করলেন তা কোথাও পাই নি।"[২]

মহিলা সাহাবীগণ তাঁদের যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা, উপলব্ধি ও দূরদৃষ্টি বলেই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষদের পাশাপাশি মুসলিম জাতিকে দিক নির্দেশনা দেয়ার দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁদের মধ্যে আবার সাতজনের ফতোয়ার সংখ্যা এত বেশী যে, আল্লামা ইব্ন হাযমের মতে, তাদের ফতোয়াগুলো পৃথকভাবে একত্র করলে প্রত্যেকেরই একটি করে বিরাট গ্রন্থ হয়ে যাবে। এই সাতজনের মধ্যে হযরত 'উমর (রা), হযরত আলী (রা) এবং হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর মত ব্যক্তিত্বের সাথে হযরত আয়েশা (রা)ও অন্তর্ভুক্ত আছেন। ফতোয়া দানকারী সাহাবীগণের দ্বিতীয় সারিতে হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উসমান (রা)-এর সাথে হযরত উম্মে সালামা (রা)-এর মত মহিলা সাহাবীও রয়েছেন। ফতোয়া দানকারী তৃতীয় স্তরে আরও একদল সাহাবী আছেন। তাঁদের ফতোয়ার সংখ্যা খুব কম। এসব সাহাবীগণের মধ্যে হযরত হাসান (রা), হযরত হুসাইন (রা), হযরত আবূ যার (রা), হযরত আবূ উবায়দা (রা) প্রমুখের মত ব্যক্তিত্ব রয়েছেন। এই দলের মধ্যে হযরত উম্মে আতিয়া (রা), হযরত হাফসা (রা), হযরত উম্মে হাবীবা (রা), হযরত সাফিয়া (রা), লায়লা বিন্তে কায়স (রা), আসমা বিন্তে আবূ বকর (রা), উম্মে শরীফ (রা), খাওলা বিন্তে তাওয়ীত (রা), উম্মে দারদা (রা), হযরত মায়মূনা (রা), হযরত ফাতিমা (রা), ফাতেমা বিন্তে কায়স (রা), যায়নাব বিন্তে উম্মে সালামা (রা), উম্মে আয়মান (রা), উম্মে ইউসুফ (রা), গামিদিয়া (রা) প্রমুখ মহিলা সাহাবীগণও অন্তর্ভুক্ত আছেন।[৩] জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান পাওয়ার জন্য ছোট ও বড় নারী ও পুরুষ এবং কাছের ও দূরের সব রকমের লোকই মহিলা সাহাবীগণের শরণাপন্ন হয়েছেন।

মুসলিম উম্মাহ্র এসব মহীয়সী নারীগণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে সকল সমস্যার সমাধান দিয়েছেন। নিজের জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে হযরত আয়শা (রা)-এর কাছে কত লোক যে আসা-যাওয়া করত আয়েশা বিনতে তালহার বর্ণনা থেকে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন : "প্রত্যেক শহর ও জনপদ থেকেই হযরত আয়েশা (রা) এর কাছে লোক আসতো।"[৪] হাদীস গ্রন্থসমূহ থেকে জানা যায় যে, হযরত আয়েশা (রা), হযরত 'উমর, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমর এবং হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর মত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী সাহাবীগণের ইজতিহাদী রায়েরও সমালোচনা করে তাঁদের চিন্তা ও ধ্যান-ধারণাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন। সাহাবীগণের মধ্যে হাদীসের অনেক বড় বড় হাফিজ ছিলেন। হযরত আয়েশা (রা)-ও তাঁদের একজন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা দু'হাজার দু'শত দশটি। হযরত আবূ হুরায়রা,

---

[১০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫।
[১]. মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, ৩য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭৮।
[২]. ইবনুল কাইয়্যেম আল জাওজিয়া, *ইলামুল মুয়াককিয়ীন*, ১ম খ. (কুর্দ: মাতবা'আ ফায়জুল্লাহ আল কুর্দী, ১৩২৫ হি.), পৃ. ৯-১১।
[৩]. বুখারী, *আল আদাবুল মুফরাদ* (বৈরুত: দারুল বাশায়ের আল ইসলামিয়্যাহ, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৯ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৩৮২।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে 'উমর এবং হযরত আনাস (রা) ছাড়া আর কোন সাহাবীর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা এত অধিক নয়।[১] হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর মত পণ্ডিত ও ফিক্হবিদ সাহাবীও হযরত আয়েশা (রা)-এর জ্ঞান, পাণ্ডিত্য সম্পর্কে তাঁর নিজের এবং তাঁর মতই আরও অনেকের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেছেন : "আমরা রাসূলে করীম (সা)-এর সাহাবীরা কোন হাদীস নিয়ে সমস্যায় পড়লে সে বিষয়ে হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করতাম এবং তাঁর কাছ থেকে সে ব্যাপারে কোন না কোন জ্ঞান অবশ্যই লাভ করতাম।"[২]

মদীনার বিখ্যাত ফকীহ্ উরওয়া ইব্‌ন যুবায়ের এবং প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস কাসিম ইব্‌ন মুহম্মদ (রা) সম্পর্কে ইব্‌ন ইমাম হাম্বলী লিখেছেন - "যাঁরা হযরত আয়েশা (রা) থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর নিকট থেকে হাদীস সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করেছেন এরা দু'জনও তাদের শামিল। তারা হযরত আয়েশা (রা)-এর মত ও সিদ্ধান্ত কখনো অগ্রাহ্য করতেন না। বরং তাঁর মতামত ও সিদ্ধান্তের মধ্যে থেকে মাস'আলা উদ্ভাবন করতেন।"[৩] হাফিজ ইব্‌ন হাজার আসকালানী (র) বলেন : "হযরত আয়েশা (রা) নবী (সা) থেকে শুনে অনেক কিছু স্মৃতিতে সংরক্ষণ করেছিলেন এবং নবী (সা)-এর ইন্তিকালের পরে প্রায় পঞ্চাশ বছর জীবিত ছিলেন। মানুষ তাঁর কাছে থেকে অনেক কিছু জানতে ও শুনতে পেরেছেন এবং অনেক হুকুম-আহকাম ও আদবের কথা তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। এমনকি বলা হয়ে থাকে যে, শরী'আতের এক চতুর্থাংশ আহকাম তাঁর থেকেই বর্ণিত হয়েছে।"[৪] হাফিজ ইব্‌ন হাজার (র) অন্য এক স্থানে হযরত আয়েশা (রা) থেকে হাদীস বর্ণনাকারী আটাশিজন লোকের নাম উল্লেখ করার পর লিখেছেন যে, এসব ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও বিপুল সংখ্যক লোক তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এদের মধ্যে আছেন আমর ইবনুল 'আস (রা), আবূ মূসা আশ'আরী (রা) এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়ের (রা)-এর মত রাজনীতিবিদ এবং আবূ হুরায়রা (রা), ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও ইব্‌ন উমর (রা)-এর মত মুহাদ্দিস ও ফকীহ্। এদের সাথে আরও রয়েছেন সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যিবের মত খ্যাতনামা তাবি'য়ী এবং আলকামা ইব্‌ন কায়সের মত নামজাদা ফকীহ্। তাঁদের মধ্যে যেমন স্বাধীন মানুষ এবং ক্রীতদাস ছিলেন, তেমনি ছিলেন নারী ও পুরুষ।[৫] হযরত আয়েশা (রা)-এর অসাধারণ জ্ঞান সম্পর্কে ইমাম যুহরী (র) বলেন :"যদি সব মানুষের জ্ঞান এবং নবী করীম (সা)-এর অন্যান্য পত্নীগণের জ্ঞান একত্র করা হয়, তাহলে এককভাবে হযরত আয়েশা (রা)-এর জ্ঞান হবে তাদের সকলের জ্ঞানের তুলনায় অধিকতর প্রশস্ত ও ব্যাপক।"[৬] ইমাম যুহরী (র) অন্যত্র বলেছেন -

---

[৪] ইব্‌ন ইমাম হাম্বলী, *শাজারাতুয যাহাব*, ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।

[১] তিরমিযী, *জামিউত তিরমিযী*, ২য় খ., আবওয়াবুল মানাকিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭।

[২] ইব্‌ন ইমাম হাম্বলী, *শাজারাতুয যাহাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।

[৩] ইব্‌ন হাজার আল আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, ৭ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২-৮৩।

[৪] ইব্‌ন হাজার আল আসকালানী, *তাহযীবুত্ তাহযীব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৩।

[৫] ইব্‌ন আবদুল বার, *আল ইসতিয়াব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬; নিয়ায ফতেহপুরী, *আস সাহাবীয়াত*, অনুবাদঃ গোলাম সোবহান সিদ্দিকী, *মহিলা সাহাবী* (ঢাকাঃ আল ফালাহ্ পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

"হযরত আয়েশা (রা) সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী ছিলেন। নবী করীম (রা)-এর বড় বড় সাহাবীগণও বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করতেন।"[১]

প্রখ্যাত আলেম বদরুদ্দীন যারকাশী (র) একখানা কিতাব রচনা করেছেন, যাতে একটি বিষয়ই সন্নিবেশিত করা হয়েছে এবং তা হলো : "অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের মোকাবেলায় হযরত আয়েশা (রা)-এর ভিন্ন মতসমূহ।" কিতাবের নাম দিয়েছেন– 'আল ইজাবাহ্ লিঈরাদি মাস্তাদরাকাত্হু আয়িশা আলাস সাহাবাহ্'। তিনি এ কিতাবের ভূমিকায় বলেছেন, এ কিতাবটিতে আমি এমন সব কথা সংকলিত করেছি যে ব্যাপারে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) অন্যদের তুলানায় ব্যতিক্রম মত ব্যক্ত করেছেন বা নিজ মতের ভিত্তিতে বিরোধী মত পোষণ করেছেন অথবা সে সম্পর্কে তার জানা সুস্পষ্ট পদ্ধতি কিংবা নিশ্চিত জ্ঞান তিনি লাভ করেছিলেন। অথবা সে বিষয়ে তিনি সমকালীন আলিমগণের মতামত অগ্রাহ্য করেছেন কিংবা তাঁর মতের দিকে সমসাময়িক আলিমগণের একটা বড় অংশ ফিরে এসেছেন। অথবা ফতোয়া প্রদান করে সে বিষয়টি তিনি মুক্ত করেছেন বা স্বীয় ধারণা অনুযায়ী শক্তিশালী মতের ভিত্তিতে ইজতিহাদ করেছেন। হযরত 'উমর ইব্ন খাত্তাব, আলী ইব্ন আবূ তালিব, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আব্বাস (রা) এবং এঁদের মত ২৩ জন শীর্ষস্থানীয় সাহাবা (রা)-এর সাথে হযরত আয়েশা (রা) বিভিন্ন বিষয়ে যে ভিন্নমত পোষণ করেছেন, ইমামা যারকাশী এ কিতাবে সেগুলো উল্লেখ করেছেন। এসব মতামতের সংখ্যা ঊনপঞ্চাশ পর্যন্ত পৌঁছেছে। 'আল ইজাবাহ' কিতাবের ব্যাখ্যাতে বিশিষ্ট আলিম সাঈদ আল-আফগানী বলেছেন, "আমি কয়েক বছর যাবত হযরত আয়েশা (রা)-এর জীবন সংক্রান্ত গবেষণার কাজে নিয়োজিত ছিলাম। আমি তাঁর মধ্যে এমন অলৌকিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়েছি যা বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই। বিশেষ করে তাঁর জ্ঞান ছিল সমুদ্রতুল্য। জ্ঞানের দিগন্তে তিনি ছিলেন সমুদ্র বক্ষে উদ্বেলিত ঢেউয়ের মতো। বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত তাঁর মধ্যে যে বিষয়ের জ্ঞানেরই সন্ধান করতে চান না কেন, চাই তা ফিক্হ, হাদীস, তাফসীর, ইসলামী বিধান, সাহিত্য, কবিতা, ঘটনাপঞ্জী, বংশ তালিকা, গৌরবগাঁথা, চিকিৎসা বা ইতিহাস, যাই হোক না কেন, আপনি তাঁর মধ্যে সব বিষয়ের সমাবেশ দেখতে পাবেন। এ ব্যাপারটা আপনাকে বেশ হতবাক করে দেবে। আপনি আরও অবাক হবেন যখন দেখবেন এসব বিষয়ে তাঁর পরিপক্কতা ও পরিপূর্ণতা এমন সময়ে হয়েছিল যখন তাঁর বয়স আঠার বছর অতিক্রম করে নি।"[২] উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়া (রা)-এর জ্ঞান ভাণ্ডার হতে মুসলিম উম্মাহ্ কী পরিমাণ লাভবান হয়েছে তা মুহায়রা বিনতে হুদায়রের বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায়। তিনি বলেন : হজ্জ আদায় করার পর আমরা কয়েকজন মহিলা মদীনায় গিয়ে হযরত সাফিয়া (রা)-এর খিদমতে হাযির হলাম। সেখানে পৌঁছে আমরা দেখতে পেলাম যে, কূফার কিছুসংখ্যক মহিলা পূর্বেই তাঁর খিদমতে বসে আছে। আমরা তাঁকে দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় এবং হায়েয ও নাবীযের বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। এভাবে

---

৬. ইব্ন সা'দ, *আত্ তাবাকাত*, ২য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬; মাওলানা সাঈদ আনসারী ও মাওলানা আবদুস সালাম নদভী, *হায়াতুস সাহাবীয়াত*, অনুবাদ : মাওলানা আবদুল ওয়াহাব, *মহিলা সাহাবীদের জীবনাদর্শ* (ঢাকা: নাদিয়াতুল কুর'আন প্রকাশনী, চকবাজার, তা. বি.), পৃ. ৪৮।

১. আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ, *তাহীরুল মার'আ ফী আসরির রিসালাহ*, ১ম খ., অনুবাদ : মাওলানা আবদুল মুনয়েম, আবুল কালাম পাটওয়ারী ও মাওলানা মুনওয়ার হোসাইন (ঢাকা: ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফেডারেশন অব স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন্স ও ইন্টারন্যাশনাল অব ইসলামিক থট্স, ১৯৯৫ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৩৩০।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন জায়গার অসংখ্য মানুষ তাঁর নিকট হতে শত শত মাস'আলা জেনে নিয়েছে।[১] উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এরূপ বত্রিশজন রাবীর নাম-ধাম বর্ণনা করার পর হাফিজ ইব্ন হাজার আসকালানী (র) বলেন : এছাড়া আরও অনেক লোক তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ সব বর্ণনাকারীদের মধ্যে বিখ্যাত সাহাবী ও তাবি'ঈ উভয় শ্রেণীর লোকই রয়েছেন।[২] মারওয়ানের একটি জরুরী বিষয় জানা প্রয়োজন হয়েছিল। তিনি বলেন : "নবী করীম (সা)-এর পবিত্র পত্নীগণ আমাদের মাঝে বর্তমান থাকতে আমরা কোন বিষয় সম্পর্কে অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করতে যাব কেমন করে? তাই তিনি লোক মারফত হযরত উম্মে সালামাকে জিজ্ঞেস করে পাঠালেন। তিনি তার সে সমস্যার সমাধান করে দেন।"[৩]

সাহাবীগণের 'ইলমী মতপার্থক্য দূরীকরণে নবী করীম (সা)-এর পবিত্র স্ত্রীগণ বিরাট ও ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছেন। ইমাম ইব্ন কাইয়্যিম (র) বলেন :"সাহাবীগণের মধ্যে কোন বিষয়ে মতপার্থক্য হলে ও উম্মুল মু'মিনীনদের কেউ সে বিষয়ে নবী করীম (সা) থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করলে, তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে তা গ্রহণ করতেন এবং নিজেদের সব মতপার্থক্য পরিত্যাগ করে তা আঁকড়ে ধরতেন।"[৪] হযরত রাবী' মুআওয়ায (রা) একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মহিলা সাহাবী ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে মাস'আলা জানার জন্য হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আব্বাস (রা) এবং হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমরও কখনো কখনো তাঁর নিকট হাযির হতেন। এ থেকেই তাঁর জ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে ধারণা করা যায়।[৫] হযরত রুবায়' নবী করীম (সা) থেকে একুশটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে আয়েশা বিনতে মালিক, সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার, আবূ সালামা ইব্ন আবদুর রহমান, নাফে', উবাদা ইবনুল ওয়ালীদ, খালিদ ইব্ন যাকওয়ান, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান, মুহাম্মদ ইব্ন আকীল, আবূ উবায়দা ইব্ন মুহাম্মদ এবং আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) প্রমুখ রয়েছেন।[৬] ফাতিমা বিন্তে কায়স একজন বিশিষ্ট মহিলা সাহাবী ছিলেন। তাঁর নিকট থেকে চৌত্রিশটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাঁর হাদীসের রাবীদের মধ্যে কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ (রা) সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রা), উরওয়া ইব্ন যুবায়র (রা) এবং আবূ সালামা ইব্ন আবদুর রহমান (রা)-এর মত সহাবীগণ রয়েছেন। এছাড়া সালমান বিন ইয়াসির এবং শা'বীর মত উচ্চ মর্যাদার তাবি'ঈগণও তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে শামিল আছেন।[৭] হযরত উম্মে আতিয়া (রা) একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মহিলা সাহাবী ছিলেন। ইল্ম ও ফযীলতের দিক থেকে তিনি অতি উঁচু স্তরে সমাসীন ছিলেন। তিনি একচল্লিশটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুহাদ্দিসগণ হাদীস রিওয়ায়াতের দিক দিয়ে তাঁকে পুরুষ ও মহিলা সাহাবীগণের মধ্যে চতুর্থ স্তরের মানুষ বলে গণ্য করেছেন। মাইয়্যিতের গোসল দেয়া,

---

২. ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল, *মুসনাদ*, ৬ষ্ঠ খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০।

৩. ইব্ন হাজার আল আসকালানী, *তাহযীবুত্ তাহযীব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৬।

১. আহমদ ইব্ন হাম্বল, *মুসনাদ*, ৬ষ্ঠ খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩; ইব্ন জারীর আত্ তাবারী, *তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক*, ২য় খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭; ইব্ন হিশাম, *আস্ সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, ১ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৫।

২. ইবনুল কাইয়্যুম আল জাওজিয়া, *যাদুল মা'আদ*, ৪র্থ খ. (রিয়াদ: দারুস সালাম, তা. বি.), পৃ. ২২১।

৩. ইব্ন আবদুল বার, *আল ইসতিয়াব ফী আসমাইল আসহাব*, তাযকিরাত বারী বিন্তে মাআওয়েজ, ৪র্থ খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩৭।

৪. আল্লামা ইবনুল আসীর, *উসদুল গাবা ফী মা'রিফাতিস্ সাহাবা* (বৈরুত: দারু ইহইয়াইত্ তুরাসিল আরাবী, তা. বি.), পৃ. ৪৫২।

৫. তালিবুল হাশেমী, *মহিলা সাহাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫; ইব্ন হাজার আল আসকালানী, *তাহযিবুত্ তাহযীব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

মহিলাদের জানাযায় যাওয়া এবং ঈদের নামাযে অংশগ্রহণের ব্যাপারে তাঁর বর্ণিত হাদীস বিশেষ গুরুত্ব রাখে।[১] উম্মে আতিয়া (রা) সম্পর্কে আল্লামা ইব্ন আবদুর বার (র) লিখেছেন : "তিনি রাসূলে করীম (সা)-এর কন্যার জানাযার গোসলে শরীক ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বর্ণনা করেছেন। মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার ব্যাপারে তাঁর বর্ণিত হাদীসই মূলভিত্তি। সাহাবা এবং বসরার তাবি'ঈ আলিমগণ তাঁর নিকট থেকেই মৃতকে গোসল দেয়ার নিয়ম-কানূন শিখেছিলেন। এ ছাড়াও তাঁর থেকে আনাস ইব্ন মালেক, মুহাম্মদ ইব্ন সীরিন এবং হাফসা বিন্তে সিরীন (রা) বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন।"[২] হযরত সা'আদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাসের কন্যা আয়েশা (রা)-এর ছাত্রদের মধ্যে ইমাম মালিক, আইয়ূব সুখতিয়ানী এবং হাকাম ইব্নে উতায়বার মত ফকীহ্ ও মুহাদ্দিসগণও রয়েছেন।[৩]

ইমাম শাফে'য়ী (র) হযরত হাসান (রা)-এর নাতনী সাই'য়ীদা নাফিসা (র)-এর কাছে গিয়ে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেছেন।[৪] ইসলামের শুরু থেকে পরবর্তীতে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত নারীদের দ্বারা হাদীস সংরক্ষণ, হাদীস চর্চা, গবেষণা, শিক্ষাদান প্রভৃতি চলছে। মুসলিম ইতিহাসে সর্বদাই কিছু বিখ্যাত (Eminent) হাদীসবেত্তা নারীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। জীবন-চরিত্র সম্বন্ধীয় অভিধানে এরূপ অনেক মুসলিম নারীর সন্ধান পাওয়া যায়। মূলত নবী (সা) এর সময়ে এবং পরে অনেক মহিলা সাহাবী বিশেষ করে মহানবী (সা)-এর স্ত্রীগণ হাদীস বর্ণনা, ব্যাখ্যা ও প্রচারে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। নবী (সা)-এর স্ত্রীদের মধ্যে হযরত আয়েশা, হাফসা, উম্মে হাবীবা, মায়মুনা এবং উম্মে সালমা (রা) প্রতিটি হাদীসের ছাত্র-ছাত্রীর নিকট স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যধারী হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে পরিচিত।

তাবি'ঈদের যুগে ইব্ন সিরীনের কন্যা হাফসা, উম্মে আবূ দারদা এবং আমর বিন্তে আবদুর রহমান গুরুত্বপূর্ণ হাদীসবেত্তা হিসেবে পরিচিত। আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত হাদীসের অন্যতম বিশেষজ্ঞ হচ্ছেন 'আমরা (রা)। তাঁর এক ছাত্র হচ্ছেন আবূ বকর ইব্ন হাযম যিনি মদীনার প্রসিদ্ধ বিচারক ছিলেন, যিনি 'আমরা এর বর্ণিত সব হাদীস লিখে ফেলার জন্য তৎকালীন খলীফা উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছিলেন। এদের পরে 'আবিদা, 'আবদা বিন বিশর, উম্মে 'উমর, জয়নাব নাফিসা, খাদীজা, 'আবদা বিন্তে 'আবদুর রহমান এবং আরো অনেক নারী হাদীসের উপর বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন এবং তাঁর জনসমক্ষে (Public Lecture) হাদীসের উপর বক্তৃতা দিতেন। এসব নারীরা বিভিন্ন পরিবেশ থেকেই এসেছেন। যেমন আবিদা একজন দাসী ছিলেন এবং এ অবস্থায় থেকেই তিনি মদীনার শিক্ষকদের নিকট হাদীস চর্চা করেন। বলা হয় যে, তিনি দশ সহস্রাধিক হাদীসকে তাঁর শিক্ষকদের সাথে সম্পর্কিত করেছেন।

মহানবী (সা)-এর হাদীস চর্চায় নারীরা পুরুষের পাশাপাশি তখনই নিয়োজিত হয়েছিলেন যখন হাদীস সংগ্রহ করা হচ্ছিল। এ ব্যাপারে পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, সব গুরুত্বপূর্ণ হাদীস সংগৃহীত হয়েছে অনেক নারী থেকে। হাদীস সংগ্রহকারী হিসেবে অনেক নারীর নাম রয়েছে এবং এ সকল মহীয়সী নারী অনেক ছাত্রদের ক্লাসে হাদীসের উপর অনেক লেকচার দিয়েছেন। চতুর্থ হিজরী শতাব্দীতে ফাতিমা বিনতে আবদুর রহমান, ফাতিমা (আবূ দাঊদের নাতনী), আমাত আল-ওয়াহিদ (বিখ্যাত আইনবিদ আল-মুহামিলির কন্যা), উম্মে আল-ফাত্হ

---

[৬] তালিবুল হাশেমী, *মহিলা সাহাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬।

[৭] ইব্ন আবদুল বার, *আল ইসতিয়াব ফী আসমাইল আসহাব*, ৪র্থ খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪৭।

[১] ইব্ন হাজার আল আসকালানী, *তাহযীবুত্ তাহযীব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৬।

[২] ইব্ন খল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান*, ২য় খ. (মিশরঃ আল মাতবাআতুল আমীরিয়াহ, ১২৮৩ হি.), পৃ. ১২৯।

Dhaka University Institutional Repository

আমাত আস-সালাম (বিচারক আবূ বকর আহমদের কন্যা), জুমু'আ বিন্তে আহমদ ও আরো অনেক বিদূষীর পরিচয় পাওয়া যায় যাঁদের ক্লাসে সর্বদাই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শ্রোতা বা ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত থাক্‌ত। এ ধারা ৫ম ও ৬ষ্ঠ হিজরী সন পর্যন্ত চালু ছিল। ফাতিমা বিন আল-হাসান শুধুমাত্র তার তাকওয়া ও ক্যালিগ্রাফীর জন্যই পরিচিত ছিলেন না বরং হাদীস ও এর ইসনাদের গুণাগুণ বিচারে তাঁর দক্ষতার জন্যও পরিচিত ছিলেন। তার চেয়েও বেশি পরিচিত ছিলেন কারিমা আল-মারওয়াজিয়া। তিনি ঐ সময়ে সহীহ্ আল-বুখারীর সর্বোত্তম পৃষ্ঠপোষক(Authority) হিসেবে পরিচিত ছিলেন। আল-খতীব আল-বাগদাদী ও আল হুমাইদী তাঁর অন্যতম ছাত্র ছিলেন। শুহাদা একজন বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার, অত্যন্ত সম্মানিত ও নির্ভরযোগ্য হাদীসবিদ ছিলেন।

জীবনী লেখকগণ তাঁর পরিচয় দেন এভাবে- তিনি ক্যালিগ্রাফার, বিখ্যাত হাদীসের বর্ণনাকারী এবং নারী জগতের জন্য গর্ব ছিলেন। তার পিতা আবূ নাসর স্বীয় কন্যাকে গভীরভাবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দিয়েছেন এবং অনেক প্রসিদ্ধ হাদীস বিশারদের অধীনে শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা করেছিলেন। সহীহ্ আল-বুখারী ও অন্যান্য হাদীস হতে তার বক্তৃতামালা শুনতে অনেক ছাত্র-ছাত্রী জামায়েত হত : এমনকি কেউ কেউ তাঁর ছাত্র না হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ছাত্র হবার মিথ্যা দাবি করত। শুধু ইসলামী আইনের উপরই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন নি, তিনি 'তাঁর সময়ের মুসনিদা' হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি সহীহ্ বুখারী ও অন্যান্য হাদীস সংগ্রহের উপর দামেশ্‌ক ও মিশরে বক্তৃতা দিতেন। হিজাযের হাদীসের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত উম্মে আল-খায়ের আমাত আল-খালিকও এভাবে বিভিন্ন ক্লাস পরিচালনা করতেন। অন্যদিকে উম্মে আল-খায়ের ফাতিমা এবং ফাতিমা আল শাহরাজুরিয়া সহীহ্ মুসলিম-এর উপর লেকচার দিতেন।

ফাতিমা আল-জাওজাদানিয়া তাবরানী থেকে তাঁর ছাত্রদের পড়াতেন। যয়নাব ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বলের 'মুসনাদ' থেকে পড়াতেন। সেখানে অনেক ছাত্র আকৃষ্ট হয়ে তার বক্তৃতা শুনত। জুওয়াইরিয়া বিন্‌তে 'উমর এবং যয়নাব বিন্‌তে আহমদ ইব্‌ন 'উমর, আদ-দারিমী ও আবদ ইব্‌ন হুমাইদ এর হাদীস সংকলন হতে বর্ণনা করতেন। তাঁরা হাদীস শিক্ষার জন্য অনেক স্থান ভ্রমণ করেন ও মিশর, মদীনায় লেকচার দেন। দূর-দূরান্ত হতে অনেক ছাত্র কষ্ট স্বীকার করেও এসব ক্লাসে উপস্থি হত। বিস্ময়ের কথা হচ্ছে, পরিব্রাজক ইব্‌ন বতুতা দামেশ্‌কে থাকার সময় যয়নাব বিন্‌তে আহমদ ও অন্যান্য শিক্ষিকার নিকট হাদীসের বিদ্যা লাভ করেন। দামেশ্‌কের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইব্‌ন আসাকির বলেন, তিনি ১২০ পুরুষ ও ৮০ জন নারীর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। প্রখ্যাত জালাল আল-দীন আল-সুয়ূতী ইমাম শাফে'য়ীর 'রিসালাহ' গ্রন্থটি হাজার বিন্‌তে মাহাম্মদের কাছে অধ্যয়ন করেন। এ ছাড়াও যয়নাব বিন্‌তে আল শা'রি একাধিক প্রসিদ্ধ হাদিসবেত্তা থেকে হাদীস অধ্যয়ন করেন এবং পরে অনেক ছাত্রদেরকে শিক্ষা দেন যাদের কেউ কেউ পরে খ্যাতি লাভ করেন। যেমন সুপরিচিত জীবন চরিত সম্বন্ধীয় অভিধান 'ওয়াফাত আল-'আয়ান' এর লেখক ইব্‌ন খাল্লিকান তাঁর ছাত্র। আরেকজন হচ্ছেন কারীমা যাকে তাঁর সময়ে সিরিয়ার শ্রেষ্ঠ হাদীসবেত্তা হিসেবে ধরা হয়। ইব্‌ন হাজার তার 'আল-দুরার আল কারীমা' গ্রন্থে ৮ম শতাব্দীর ১৭০ জন প্রখ্যাত নারীর সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ করেন, যাঁদের অধিকাংশই হাদীসবিদ ছিলেন এবং যাঁদের অনেকের অধীনে তিনি নিজে পড়াশোনা করেছেন। এসব মহীয়সী নারীর কয়েকজন আবার ঐ সময়ের সবচেয়ে জ্ঞানী হাদীস বিশারদ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ জুয়াইরিয়া বিন্‌তে আহমদ-

Dhaka University Institutional Repository

এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, যিনি পুরুষ ও নারী উভয় রকমের পণ্ডিতদের নিকট থেকে হাদীস অধ্যয়ন করেছেন এবং তিনি নিজেও ঐ সময়ের বড় বড় মাদরাসায় শিক্ষকতা করেছেন। ইব্‌ন হাজার (র) এ প্রসঙ্গে বলেন, 'আমার নিজের কিছু শিক্ষক এবং সমসাময়িক অনেকেই তাঁর বক্তৃতামালা শুনতেন।' আয়েশা বিন্‌তে আব্‌দ আল-হাদী দীর্ঘদিন ইব্‌ন হাজারের শিক্ষক ছিলেন। তাঁকে তাঁর সময়ের সর্বোচ্চ মানের হাদীসবিদ হিসেবে গণ্য করা হত এবং অনেক ছাত্রীই দীর্ঘ পথ সফর করে তাঁর পদতলে ধর্মের সত্যজ্ঞান লাভ করতে ছুটে আসত।

নবম শতাব্দীতে হাদীসে নারী বিশেষজ্ঞদের সব তথ্য পাওয়া যাবে মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহমান আল-সাখাবী রচিত 'আল-য্‌'উল-লামি' গ্রন্থে। এছাড়াও আবদ আল-আযীয ইব্‌ন উমর তার 'মু'জাম আল-শুয়ূখ' গ্রন্থটিতে ১৩০ জন নারী স্কলারসহ ১১০০-এর বেশী লেখক ও শিক্ষক এর নাম উল্লেখ করেছেন। এসব মহিলাদের কেউ কেউ হাদীসবিদ্যায় বেশ পাণ্ডিত্য অর্জন করে ঐ সময়ে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং ঐ সমসাময়িক ও পরবর্তীতে যুগের অনেক ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষাকতায় নিয়োজিত হয়েছিলেন । তন্মধ্যে উম্মেহানী, মারিয়াম উল্লেখযোগ্য। যিনি তার শৈশবেই কুর'আনের হাফেজা হয়ে যান এবং ইসলামের থিওলজি, আইন, ইতিহাস ও ব্যাকরণে বিশদ জ্ঞান লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি হাদীস শাস্ত্রে গভীরতা লাভের প্রত্যাশায় কায়রো ও মক্কা শহরে গিয়ে ঐ সময়ের শ্রেষ্ঠ হাদীসবেত্তাদের থেকে জ্ঞান লাভ করেন। তিনি এতটাই ধার্মিক ছিলেন যে, তিনি ন্যূনতমপক্ষে ১৩ বার হজ্জ সম্পাদন করেন। তিনি কায়রোর একটি বিখ্যাত কলেজে শিক্ষা প্রকল্প পরিচালনা করেন। অনেক স্কলারকে 'ইজাযত্‌' (তাঁর পক্ষ থেকে হাদীস প্রচারের অনুমতি) প্রদান করেন। তাঁর সমসাময়িক সিরিয়ার হাদীস শাস্ত্রের অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকার নিকট হতে 'ইজাযত' পেয়েছিলেন। তিনি নিজেও পরবর্তীতে এ বিষয়ে সিরিয়া ও কায়রোতে অনেক বক্তব্য রাখেন। আয়েশা বিন ইবরাহীম ও মক্কার উম্মে আল-খায়র সাঈদা উভয়েই দামেশ্‌ক, কায়রোসহ অন্যান্য শহরে জ্ঞানার্জনের জন্য গমন করেন এবং পবর্তীতে তাঁরা বিভিন্ন শহরে সুনামের সাথে অন্যদেরকে শিক্ষা দেন। গবেষণায় দেখা যায় যে, হিজরী দশম শতাব্দী হতে হাদীস শাস্ত্র ও ইসলামের অন্যান্য বিষয়ে পাণ্ডিত্য লাভে নারীদের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা গ্রহণ ব্যাপকহারে কমে গেছে। দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে মাত্র ডজন খানেক প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ নারীর নাম পাওয়া যায়, যাঁরা মূলত নবম শতাব্দীর শেষের দিকে আবির্ভূত হন। আসমা বিন্‌তে কামাল আল্‌-দীন হাদীসের উপর লেকচার দিতেন। ঐ সময়ের সুলতানের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের বিষয়ে গ্রহণযোগ্য মতামত দিতেন এবং ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে নারীদেরকে প্রশিক্ষণ দিতেন। প্রখ্যাত বিচারক মুসলেহ আল-দীনের স্ত্রী আয়েশা বিন্‌তে মুহাম্মদ দামেশ্‌কের সালিহিয়া কলেজের অধ্যাপিকা ছিলেন।

আলেপ্পোর ফাতিমা বিন্‌তে ইউসুফ তাঁর সময়ের অন্যতম পণ্ডিত হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ফাতিমা আল-জুযাইলিয়া অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারিণী ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি মক্কায় অবস্থান করেন এবং সেখানে সমৃদ্ধ এক পাবলিক লাইব্রেরী গড়ে তোলেন। পবিত্র মক্কা শহরে তিনি হাদীসের উপর লেকচার দিতেন এবং অনেকেই তাতে অংশগ্রহণ শেষে তাঁর নিকট হতে সার্টিফিকেট গ্রহণ করতেন। অর্থাৎ ইতিহাস 'ঘাটলে এটা পরিষ্কার হয় যে, মুসলিম নারীরা নিজেদের কিছু ব্যাপারে বা ধর্মীয় সামান্য কিছু বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা বা প্রাইভেট কোচিং এর মত কয়েকজনকে শিক্ষা দেয়া বা শুধু নারীদের নিকট শিক্ষা নেয়া বা কেবল নারীদেরকেই শিক্ষা দেয়া প্রভৃতি

Dhaka University Institutional Repository

কাজে নিয়োজিত থেকেই ক্ষান্ত হননি, তাঁদের বিশ্বাসী ভাইদের সাথে সাথে জ্ঞানার্জনে উজ্জ্বলতম নক্ষত্র (Brightest Star) হবার চেষ্টা চালিয়েছেন। ইব্‌ন আল-বুখারীর সার্টিফিকেট ফলিওতে দেখা যায়, ৬৮৭/১২৮৮ সনে দামেশ্‌কের 'উমর মস্‌জিদে অনুষ্ঠিত ১১টি বক্তৃতার একটি নিয়মিত কোর্সে (যেখানে পাঁচ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত হত) অনেক নারী উপস্থিত থাকতো। অন্যদিকে দামেশ্‌কে (৮৩৭/১৩২২ সনে) পাঁচ লেকচারের একটি কোর্সে পঞ্চাশাধিক ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, এ কোর্সটি পরিচালিত হত প্রখ্যাত মহিলা হাদীস বিশারদ উম্মে 'আবদুল্লাহ্‌ কর্তৃক। পরিশেষে ড.যুবাইর সিদ্দিকী বলেন- "সবাইকে, বিশেষ করে বিদূষী নারী সমাজের প্রতি আহ্বাণ জানাচ্ছি জ্ঞানের পথে এগিয়ে আসতে এবং স্ব স্ব বিষয়ে সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করে ও ইসলামী বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করে ইসলামকে Uplift করতে। সবাই যেন Brightnest Star হবার চেষ্টা করি- নতুবা সাধারণ মানুষরা তো আলোকিত ভূবন হতে দূরে সরে অন্ধকারেই বাস করবে, আর আঁধারই হবে তাদের বেদনাপূর্ণ ঠিকানা।"[১] এ আলোচনা হতে সুস্পষ্ট হয়েছে যে, মহান আল্লাহ্‌ কুর'আন মজীদে শিক্ষার মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব বর্ণনা করার পর এটা অর্জন করার জন্য উৎসাহিত করেছেন এবং নির্দেশ দান করেছেন। আর রাসূলে করীম (সা) হাদীস শরীফে শিক্ষার ফযীলত ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া বিভিন্ন হাদীসে নারী শিক্ষার দৃষ্টান্ত রয়েছে।

রাসূলে করীম (সা) মহিলাদের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। সুতরাং আমাদের দেশেও শিক্ষার সর্বস্তরে মহিলাদের জন্য পৃথক শিক্ষাব্যবস্থা চালু হোক এটাই আমাদের প্রত্যাশা। মানব ইতিহাসের এমনি এক তমসাচ্ছন্ন সময়ে মানবতা যখন অন্ধকারে বন্দী খাঁচায় হাতড়ে ফিরছিল, ঠিক তখনই বিশ্বশান্তি ও মুক্তির সর্বজনীন ধর্ম ইসলাম নারীর মর্যাদা ও অধিকারের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে। বর্ণ, ভাষা, ভৌগলিক সীমারেখা, সাদা-কালোর দ্বন্দ, আরব অনারব, ইত্যাদির বাহ্যিক, আত্মিক-প্রতিবন্ধকতা বিদূরিত করে সাম্য-মৈত্রী ও সুমহান শান্তির ঘোষণা করেছে ইসলাম।

---

১. Dr. M. Zubayr Siddiqi, *Hadis Literature : Its Origins Development of Special Features*, (Cambridge : Islamic Texts Society 1993), p-109; '*হাদীস চর্চায় মহিলা স্কলারদের অবদান*' (ঢাকা: *মাসিক আশ-শাহদাহ*, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৪২০ হি., মার্চ ২০০০ খৃস্টাব্দ), পৃ. ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

PZ_ Aa¨vq

evsjv‡`‡k bvix wkÿv I M‡elYv cwiw¯wZ

চতুর্থ অধ্যায়
বাংলাদেশে নারী শিক্ষা ও গবেষণা পরিস্থিতি

মানব সমাজের ইতিহাস ও বিকাশে বিভিন্ন স্তরে নারীর অবস্থান

সামগ্রিক অর্থে নারীর অবস্থান সমাজ কাঠামোরই একটি বহিঃপ্রকাশ। তাই নারীর বর্তমান অধঃস্তন রূপ কিংবা তার পিছিয়ে পড়ার কারণ অথবা আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে তার ভূমিকা বিশ্লেষণের জন্য আমাদের জানা প্রয়োজন সমাজ বিকাশের ইতিহাস। কারণ, সমাজ বিজ্ঞানীরা মানব সমাজের সে ইতিহাস ও তার বিকাশের ধারা বিশ্লেষণ করেছেন তাতে দেখা যায় ইতিহাসের সকল স্তরে নারীর অবস্থান কিংবা ভূমিকা কখনই এক রকম ছিল না।[১] প্রাক ঐতিহাসিক যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত যে সব সমাজ চালু হয়েছে তাকে পর্যায়ক্রমে সাজালে দাঁড়ায়-

১। আদিম সাম্যবাদী সমাজ;
২। দাস সমাজ;
৩। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ;
৪। পুঁজিবাদী সমাজ; ও
৫। সমাজতান্ত্রিক সমাজ।

উপরিল্লিখিত পাঁচটি পর্যায়ে একদিকে উৎপাদন ব্যবস্থা যেমন ছিল ভিন্ন, তেমনি আর্থ-সামাজিক কাঠামোও ছিল ভিন্ন ধরনের। সমাজের ইতিহাস ও বিকাশের ভিন্ন ধারায় নারীর অবস্থানও ছিল ভিন্ন। সমাজ কাঠামোর বিকাশের বিভিন্ন ধারায় অবস্থানগত ভিন্নতার কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর ভূমিকাও পরিবর্তিত হয়ে যায়। ক্ষমতা কাঠামোয়ও তার অবস্থান হয় পরিবর্তনশীল। নিম্নে মানব সমাজ বিকাশের এ পাঁচটি স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অবস্থান এবং নারীর ক্ষমতায়নের কী চিত্র বিদ্যমান ছিল তা সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হলো-

১. আদিম সাম্যবাদী সমাজ : এ সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যে ভেদাভেদ ছিল না কোন বৈবাহিক সম্পর্কও ছিল না। তখন অনেক নারী-পুরুষ একসাথে দলবদ্ধভাবে জীবনযাপন করতো। মা তথা নারীকে ঘিরে সম্পর্ক চলতে থাকতো। আত্মীয়তার কেন্দ্রবিন্দু ছিল মা। গোত্র বা দলপতি বলতে নারীকেই বুঝানো হতো। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ছিল তাদের একক আধিপত্য। ফলে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করতো নারী সমাজ। এদিকে নারীরা গৃহস্থালী কাজের পাশাপাশি বাসস্থানের আশেপাশের জমিতে চাষাবাদ করার মাধ্যমে উদ্ভব ঘটায় কৃষিকাজের এবং ধীরে ধীরে গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক জীবন ধারায় মেয়েদের ভূমিকা বেশিমাত্রায় জোরদার ও সক্রিয় হয় এবং তারা লাভ করে নেতৃত্বের অধিকার। কিন্তু এক সময় খাদ্য সংগ্রহ ও খাদ্যের উদ্ধৃত্ত উৎপাদনকে কেন্দ্র করে নারী-পুরুষের সামাজিক অবস্থান ও সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। উদ্ধৃত্ত উৎপাদনের মালিকানাকে কেন্দ্র করে উত্তরাধিকারের প্রশ্নটি সামনে চলে আসে এবং সভ্যতার এই পর্যায়ে নারী-পুরুষ অবাধ সম্পর্কের উপর ধীরে ধীরে সামাজিক বিধি-নিষেধ আরোপিত হতে শুরু করে এবং ‘পিতার পরিচয়ে সন্তানের পরিচয়’ ধারণাটি বিকশিত হতে শুরু করে। একই সাথে নারীর ‘মাতৃত্বজনিত অসুস্থতার’ জন্য বছরের কিছু নির্দিষ্ট সময় নারী উৎপাদন প্রক্রিয়া হতে দূরে অবস্থান করে। আর এভাবে সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণে বলা যায় যে, নারীর কর্মপরিধি ধীরে ধীরে সংকুচিত হতে থাকে এবং সে হয়ে উঠে সাধারণ গৃহস্থালীর স্থায়ী কর্মী। সন্তান ধারণের সময় শারীরিক কারণেই নারী অন্যান্য কাজ থেকে পিছিয়ে থাকলেও সে তার পরোক্ষ শ্রম ঠিকই দিতে থাকে কৃষি ক্ষেত্রে। কিন্তু তা লোকচক্ষুর আড়ালে হয় বলে এসব কাজের কোন স্বীকৃতি সমাজ তাকে দেয়না; বরং সমাজের সম্পদ সৃষ্টির

---

[১] শারমিন, জায়েদা, *গ্রামীণ নারীর পারিবারিক-সামাজিক জীবন গঠন, রাজনৈতিক সচেতনতা এবং সাংস্কৃতিক মনন নির্মাণে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভূমিকা*, (থিসিস রিপোর্ট), সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, (ঢাকা : জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার ১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষ), পৃ. ২১।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থা থেকে বাদ পড়তে থাকে নারী। পুরুষেরা হয়ে উঠে পরিবারের প্রধান কর্তা। এভাবে উৎপাদন ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করেই শুরু হয় নারীর অধঃস্তনতা নারীকে বের করে দেয়া হয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া তথা ক্ষমতা কাঠামোর মধ্য থেকে। সে স্থান দখল করে নেয় পুরুষ। আর এভাবেই ভাঙ্গন দেখা দেয় আদিম সাম্যবাদী সমাজে।

২. দাস সমাজ : দাস সমাজের জন্ম যুদ্ধ কেন্দ্রিক। সাধারণতঃ দুটি গোত্রের মধ্যে পশুপালন, খাদ্য বণ্টন বা অন্যান্য নানা কারণে যুদ্ধের পরে পরাজিত গোত্রের সদস্যদের বিজয়ীগোত্র ধরে নিয়ে এসে বন্দী করে রাখতো এবং পরবর্তীতে এদের বিভিন্ন কায়িকশ্রমের মাধ্যমে উৎপাদন কাজে নিয়োজিত করা হতো। আর এরাই মূলত চিহ্নিত হতো দাস হিসেবে। এভাবেই সমাজে দাস এবং দাস মালিক সম্পর্কের উদ্ভব ঘটে।[১] এ সময় বিভিন্ন দেশে বিশেষত ভারত বর্ষে দাসদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল নারী। এসব নারী দাস মালিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবেই ব্যবহৃত হতো। এদের কোন ব্যক্তিগত জীবন ছিল না। উৎপাদন কাজ হতে শুরু করে দাসী মালিকদের মনোরঞ্জনেও ব্যবহৃত হতো। দাস প্রভুরা দাসদের উপর অত্যধিক অত্যাচার চালাতো বলে দাসদের সাথে তাদের দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে পড়ে। দেশে দেশে দেখা দেয় দাস বিদ্রোহ। মিশর, গ্রীস, রোমান সম্রাজ্য, চীন প্রভৃতি দেশের দাসরা সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে নিজেদের মুক্ত করতে সচেষ্ট হয়। হাওয়ার্ড ফাস্টের বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস ‘স্কার্টাকাস’ হতে দাস বিদ্রোহের বর্ণনা ও ইতিহাস জানা যায়। এ বিদ্রোহে নারী দাসদের সক্রিয় অংশগ্রহণের কথাও এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এ যুগে দাস তথা নারীপুরুষ নির্বিশেষে দাসপ্রভূদের অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার মাধ্যমে মূলত শ্রেণী দ্বন্দ্বের রূপটি স্পষ্ট করে তোলে। নিজেদের স্বাধীন করার এ লড়াইয়ে নারী দাসরাও তাদের নিজেদের অবস্থান থেকে সচেতন ভাবে বিদ্রোহী হয়ে উঠে। অর্থাৎ দাস যুগে নারী উৎপাদনের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকা সত্ত্বেও আত্ম-মর্যাদাহীন ও পরাধীন ছিল। তাই সে হয়ে উঠে মুক্তিকামী বিদ্রোহী যোদ্ধা তথা অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ের অন্যতম সৈনিক।[২] এভাবে দেখা যায়, দাস সমাজে আপামর নারী সমাজ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার বাইরে ছিল এবং দাস প্রভুদের ক্ষমতার নিস্পেষণে নিস্পেষিত হয়েছিল দাস নারীরা।

৩. সামন্ততান্ত্রিক সমাজ : মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণের ভিত্তিতে উদ্ভুত দ্বিতীয় ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হলো সামন্ততন্ত্র। এই ব্যবস্থা বহু দেশে প্রচলিত ছিল এবং কয়েক শতাব্দী ধরে তা স্থায়ী ছিল। ভূমিকে কেন্দ্র করে ভূস্বামী বা সামন্তপ্রভু এবং ভূমিদাস সম্পর্কের বিন্যাস গড়ে উঠেছিল এই ব্যবস্থায়। ভূমি ছিল সামন্ত প্রভূদের একচেটিয়া সম্পত্তি, কৃষকদের অধিকার প্রাপ্ত দায়মুক্ত জমি প্রায় ছিল না বললেই চলে। ফলে সামন্ত প্রভূদের জমিতেই শ্রম প্রদান করে কৃষকরা নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করত।[৩] দাস যুগ হতেই লক্ষ্য করা যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার বাইরে ছিল নারী এবং পুরুষ ছিল ক্ষমতার কেন্দ্রে। নারী ছিল শুধুমাত্র ভোগের অংশীদার, মালিক হিসেবে অংশীদার সে কখনই ছিল না। অতীতে যে কারণে গৃহকর্মের জন্য নারী সংসারে সর্বেসর্বা ছিল, ঠিক সে কারণেই পুরুষের আধিপত্য হয় সুনিশ্চিত। ধীরে ধীরে পুরুষ নারীকে পরিণত করে নিজের দাসী, শৃঙ্খলিত ও প্রয়োজনে সন্তান (বিশেষত পুত্র) উৎপাদনের যন্ত্র। এ যুগে নারীর অবস্থান আরো নীচু পর্যায়ে চলে যায়। নানা বিধি-নিষেধের বেড়াজালে নারীকে গৃহকোণে আবদ্ধ করে ঠেলে দেওয়া হয় পৃথক এক জগতে। নারীর প্রতি সামন্তবাদী সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত নীচু ও ঘৃণ্য।[৪]

এছাড়া সপ্তম শতকের মাঝামাঝি থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের আবির্ভাব ঘটে। এশিয়ার দেশগুলোতে এ সময় নারী সমাজের জন্য কঠিন অবরোধ প্রথা চালু হয়। এমনকি গত শতকেও ভারতবর্ষে

---

[১] *নারী জাগরন ও মুক্তি* (ঢাকা : বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, জুন ১৯৮৬ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৫।

[২] শারমিন, জায়েদা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

[৩] শারমিন, জায়েদা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

[৪] *নারী জাগরন ও মুক্তি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

Dhaka University Institutional Repository

প্রচলিত সতীদাহ প্রথা, সহমরণ প্রথা, বিধবা নারীদের কঠিন শর্তযুক্ত জীবন সমাজে নারীর অবদমিত অবস্থারই প্রমাণ দেয়। সভ্যতার ব্যাপক বিকাশ হওয়া সত্ত্বেও নারীর প্রতি সমাজের তথা পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গির কোন পরিবর্তন হয়নি এ পর্যায়ে। শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রভৃতি বিকাশে নারীকে কোন অবদান রাখারই সুযোগ দেয়া হয়নি। যদিও কোন কোন নারীর একান্ত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়, দু-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটে। তবে তা কোন ক্রমেই সমগ্র নারী জাতির প্রতিনিধিত্ব করেনা। তাই বলা যায়, সামন্তযুগেও নারীর অধঃস্তন রূপের কোথাও কোন পরিবর্তন ঘটেনি। যা তাকে সত্যিকার মর্যাদায় মানুষ হিসেবে মর্যাদার আসনে আসীন করতে পারতো। এভাবে নারীকে এ যুগে রাখা হয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও ক্ষমতায়নের বাইরে।

৪. পুঁজিবাদী সমাজ : সামন্তযুগের তুলনায় পুঁজিবাদে শিল্প বিপ্লবের ফলে বৃহৎ যন্ত্র কলকারখানা স্থাপন, দেশে দেশে যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে পুরুষদের দলে দলে যুদ্ধে গমন এবং বিশ্বব্যাপী ক্রমাগত অভাব অনটন লক্ষ লক্ষ নারীকে গৃহকোন থেকে বের করে টেনে নিয়ে আসে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে। কিন্তু নারী বাঁচার তাগিদে ঘর হতে বের হয়ে এলেও আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই মূলত পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী ও লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের কারণেই সে ব্যর্থ হয় পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে।

৫. সমাজতান্ত্রিক সমাজ : ধনতান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক সংকট, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যের চরম অবস্থা ও প্রবল শ্রেণী দ্বন্দ্ব পুঁজিবাদী উৎপাদন কাঠামোকে ভেঙ্গে নতুন শোষণহীন সমাজ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে আবির্ভাব ঘটে সমাজতান্ত্রিক সমাজের। তৈরী হয় শোষণহীন, নারী পুরুষ বৈষম্যহীন এক নতুন সমাজ। এই সমাজে নারীর অবস্থানও ভিন্নভাবে নির্ণীত হবে। এই ব্যবস্থায় কেউ সুবিধাভোগী, কেউ সর্বহারা হবে না। আর তাই নারীরাও পাবে স্বাধীনতা। কোন নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘটবে না কোন কিছুই। সকল প্রকার সিদ্ধান্তে নারীদের থাকবে অংশগ্রহণ। নারীকে টেনে আনা হবে ক্ষমতা কাঠামোতে।

পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যে নারীর অবস্থান

ইউরোপে গণতান্ত্রিক চিন্তা বিস্তার ও নারী মুক্তির ধারণা বিকাশের ক্ষেত্রে ফরাসী বিপ্লব অনেক বড় ভূমিকা নিলেও পরবর্তীতে অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো সামাজিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান ও সম্ভাবনার ক্ষেত্রেও পশ্চাদপসারণ ঘটে। তারপরও ১৮৭১ সালে সভ্যতার ইতিহাস 'প্যারী কমিউন' নামে প্রথম শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে বড় ঘটনা ঘটে সেখানেও নারীদের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ দেখা যায়।[১] বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, যে ফ্রান্সে ফরাসী বিপ্লবের মতো গণতান্ত্রিক স্ফুরণ ঘটলো, 'সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব' তথা সাম্যবাদী চিন্তার ক্ষেত্রেও যে ফরাসী অগ্রণী ভূমিকায় রইলো, যে ফ্রান্স উপহার দিলো 'জোয়ান অব আর্ক' থেকে শুরু করে অনেক নারী ব্যক্তিত্বের, সেই ফ্রান্সে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত নারীদের নিজেদের আয়ের উপর কোন আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। জার্মান ফ্যাসিবাদের হাত থেকে ১৯৪৪ সালে মুক্ত হবার পরই ফরাসী নারীরা প্রথম পূর্ণ ভোটাধিকার লাভ করেন। গণতন্ত্রের পীঠস্থান বলে কথিত যুক্তরাজ্যে নারীরা পুরুষের সমান বয়সে ভোটাধিকার লাভ করেন ১৯২৮ সালে। ইটালীতে নারীরা ভোটাধিকার পান ১৯৪৭ সালে। ১৯৭০'র পূর্ব পর্যন্ত এসব দেশে বিবাহ বিচ্ছেদ আইনগত স্বীকৃতি পায়নি। মজুরীতে নারী-পুরুষের সমান অধিকার অধিকাংশ ইউরোপীয় দেশে পাশ হয় ১৯৬০ ও ১৯৭০'র দশকে। পাশ্চাত্যের দেশগুলোর মধ্যে নারীর আইনগত অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে সবচাইতে অগ্রসর দেশগুলো হলো স্ক্যানডেনেভিয়ান দেশসমূহ। আইসল্যান্ড, সুইডেন, ডেনমার্ক এর মত সে সব দেশেও ১৯৩০'র দশকে এসে গর্ভপাতকে আইনগত অধিকার দেয়া হয়। ব্রিটেন এক্ষেত্রে আইন সংস্কার করে ১৯৬৭ সালে, ফ্রান্স ১৯৭৪ সালে, অস্ট্রিয়া ১৯৭৫ সালে, জার্মানী ১৯৭৬ সালে এবং ইটালী ১৯৭৮ সালে। শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর মধ্যে আবার গড়পড়তা হিসেবে পশ্চিম ইউরোপ যুক্তরাষ্ট্র থেকে এগিয়ে। তবে পাশ্চাত্যে নারী মুক্তির ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত পর্যালোচনা করে দেখা যায় ১৬৬২ সালে ওলন্দাজ নারী মার্গারেট লুকাস সর্বপ্রথম নারী

[১]. মুহাম্মদ আনু,*নারী, পুরুষ ও সমাজ* (ঢাকা : সন্দেশ প্রকাশনী, ১৯৯৭ খৃস্টাব্দ), পৃ. ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

তার ভাষণে পরাধীনতা ও অসম অধিকারের বিষয়ে উল্লেখ করেন। মূলত এসময় থেকেই বিক্ষিপ্ত ও নিরবিচ্ছিন্নভাবে পাশ্চাত্যের নারীরা নিজেদের পরাধীনতা এবং অধিকারহীনতার বিষয়ে মত প্রকাশ করেছিলেন। তবে সুসংগঠিত ও সুস্পষ্ট আকারে ইংল্যান্ডের মেরি ওলস্টোন ক্রাফট-ই "Vindication of Rights at Women (1972)" গ্রন্থে প্রথম উল্লেখ করেন যে, নারীরা কোন ভোগের সামগ্রী বা যৌনজীবি নয়, তারাও বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ; তাই তাদেরও অধিকার দিতে হবে। সমসাময়িক কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জুডিথ সার্জেন্ট মুরে 'On the Inequalties of the Sex' শিরোনামে কতকগুলো প্রবন্ধ রচনা করে দেখান যে, নারীরা কখনই জন্মগত কারণে পুরুষের চাইতে কম দক্ষ নয়।[১] পরবর্তীতে বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীতে নারী অধিকার ও স্বাধীনতার পথ আরও বিকশিত হয়। ১৮৪৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম 'দাস প্রথা বিরোধী নারী সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। যার মাধ্যমে মার্কিন নারীরা রাজনীতি করার অধিকার ও সুযোগ পায়। ১৯৪৮ সালের ১৯-২০ জুলাই নারীবাদীদের উদ্যোগে নিউইয়র্কের 'সেনেকা ফলস্' এ বিশ্বের প্রথম নারী অধিকার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে আমেরিকার ঘোষণা পত্রের অনুরূপ 'Declaration of Sentiment' ঘোষণা করা হয়। এদিকে ১৮৫৭ সালে নিউইয়র্কের সেলাই কারখানার নারী শ্রমিকরা উন্নত ভোটাধিকার, উন্নত কর্ম পরিবেশ, শ্রম দিবস হ্রাস ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের দাবিতে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সূচনা করে। ফলে ১৮৬০ সালের ৮ মার্চ নিউইয়র্ক শহরে সেলাই কারখানার নারী শ্রমিকরা তাদের দাবী আদায়ের লক্ষ্যে নিজস্ব ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে সমর্থ হয়। ১৯১০ সালে জার্মান কমিউনিস্ট নেত্রী ক্লারা জেডকিন আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী সম্মেলনে উত্থাপিত প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯১৪ সাল হতে প্রতিবছর ৮ মার্চ 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৮৫ সালে জাতিসংঘ ৮ মার্চকে 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ায় বর্তমান এ দিবসটি সর্বজনীনভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে পালিত হচ্ছে।[২] বস্তুতঃ বিশ্বজুড়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত নারী বাদী আন্দোলন ও শ্রমজীবী নারী আন্দোলন সমন্বিতভাবে চলেছে। নারীদের সমস্বার্থ ও সমঅধিকারের দাবী একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে। ভোটাধিকার, বিবাহ্ ও বিবাহ্ বিচ্ছেদ অধিকার, নারীর উত্তরাধিকার ও সম্পত্তির দাবীকে, নারী শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি ও সুরক্ষা, উন্নত কর্ম পরিবেশ, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার প্রভৃতি দাবিকেও সমর্থন করেছে নারীবাদী সংগঠনগুলো। একজন মানুষ হিসেবে নারীর পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যে কেবল নারীরাই সামিল হয়েছেন তা নয়, দেশে দেশে উদার যুক্তিবাদী গণতান্ত্রিক মানসিকতাসম্পন্ন মহৎ পুরুষরাও এতে যুক্ত হয়েছেন। যেমন- দার্শনিক ও আইনজ্ঞ John Stwert Mill বৃটিশ পার্লামেন্ট ১৮৬৬ সালে নারীদের ভোটাধিকারের পক্ষে জোড়ালো বক্তব্য দেন, ১৮৬৯ সালে ভোটাধিকারসহ নারীর অধিকারের পক্ষে 'The Subjection of Women' রচনা করেন। তাছাড়া ১৮২৫ সালে William Thompson এর নারীর অধিকারের পক্ষে 'The Half Portion of Mankind Women's Appeal to the Rest Portion Against Male Chauvinism' প্রকাশিত হয়। এছাড়াও মার্কস এঙ্গেলস এর বিশ্বখ্যাত 'Communist Manifesto' প্রকাশিত হয় ১৮৪৮ সালে। ১৮৭৯ সালে নাট্যকার হেনরি ইবসেন রচিত কালজয়ী নাটক 'The Dolls House' এ নারী মুক্তির চেতনা ফুটে উঠেছে।[৩] আর এভাবেই পাশ্চাত্যে নারী অধিকার আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে এবং নারী নানা ক্ষেত্রে তার অধিকার অর্জনেও সমর্থ হয়েছে। আর দেশে দেশে নারীর এ অধিকার আদায়ের সংগ্রাম এদেশের নারী সমাজকেও করেছে নিজ নিজ অধিকার সম্পর্কে সচেতন। তাই নারী উন্নয়নে যুগে যুগে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যারা অবদান রেখেছেন তাদের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করাও উইমিন্স্ স্টাডিজের পরিধিভুক্ত।

---

১. শাহীন রহমান, *নারীবাদ (Feminism) একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা* (ঢাকা : উন্নয়ন পদক্ষেপ, স্টেপস্ টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, বর্ষ-৪, সংখ্যা-১২, এপ্রিল-জুন, ১৯৯৮ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৩৪।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ ও প্রাচীন বাংলায় নারী

ঐতিহাসিক বিকাশের ধারা, সমাজকাঠামোর পরিবর্তন অনুযায়ী বিভিন্ন যুগে নারীর অবস্থানের ভিন্নতা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে নারীর অধিকার আন্দোলন প্রভৃতির বিভিন্ন দিক আলোচনার পাশাপাশি বাংলাদেশের নারীদেরও সাম্প্রতিক বা বর্তমান পর্যায়ে আসতে যেসব চড়াই-উৎরাই পাড়ি দিতে হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে অবশ্যই প্রাচীন বাংলার নারীদের সম্পর্কেও কিছুটা আলোচনা করতে হবে। বাংলা মূলত রাঢ়, পুন্ড্র, বঙ্গ, সমতট প্রভৃতি অঞ্চল নিয়ে গড়ে উঠেছিল। এখানে বাইরের রাজবংশের আগমন ঘটেছে বহুবার। এছাড়া রাজকুমারেরা অন্য দেশের রাজকুমারীদের বিয়ে করে আনতো। আবার এমন রাজবংশেরও ইতিহাসে রয়েছে যারা বাংলায় এসে এখানেই বংশানুক্রমে থেকে গেছে। এভাবেই শতাব্দী থেকে শতাব্দী ধরে এদেশে ঘটে চলেছিল জাতি সমন্বয়। এ সমন্বয় কাহিনীই মূলত ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতি এবং ক্ষেত্র বিশেষে ভারতীয় মুসলমান সংস্কৃতিরও ইতিহাস হিসেবে পরিচিত।[১] আর্যদের পূর্বে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষীদের বসবাস ছিল বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে। এসময় জাতিভেদ ছিল না। বিয়ের ক্ষেত্রে জাত মানা হতো না এবং সামাজিক ব্যবস্থাতে নারীই ছিল প্রধান।[২] দারিদ্রের মধ্যে নারী প্রভুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব প্রচলিত ছিল। এদের সমাজও ছিল মাতৃতান্ত্রিক। নারী তার পুরুষসঙ্গী নিজেই নির্বাচন করতো। আর নারীর এ রকম প্রাধান্যের কারণেই সেসময় বংশ ও অধিকার ছিল কন্যাগত।[৩]

এরপর ক্রমেই আর্যদের আগমন ঘটতে থাকে এদেশে। বৈদিক যুগে নারীর স্থান প্রথম অবস্থায় কিছুটা উঁচু ছিল এবং নারীর মাতৃত্বও ছিল শ্রদ্ধার বিষয়। এ সময়ে সমাজে নারীদের সম অধিকার মর্যাদা সম্পর্কিত অনেক তথ্য প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়। আবার, লক্ষণীয় বিষয় এটাও যে, মহাভারতে নারীদের অন্তপুরবাসীনী ও অবরোধ প্রথাধীন করারও উল্লেখ রয়েছে।[৪] ঋকবেদের যুগে নারী-পুরুষের সমমর্যাদার কথা জানা যায়। গোষ্ঠীবদ্ধতা থেকে বৃহত্তর সমাজ চেতনার দিকে যাত্রাকালে পুরুষ যুদ্ধ ক্ষেত্রে ব্যস্ত থাকায় নারী কৃষিকাজ, পশুপালন, গৃহকাজ এবং যুদ্ধের প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরী করতো। অর্থাৎ গ্রাম বাংলার উৎপাদন কাঠামোতে নারীই ছিল মূল শক্তি।[৫] নারীর অবরোধের কথা আবার বেদ সাহিত্যে দেখা যায় না। সমাজে তারা নির্বিঘ্নে চলাফেরা করতেন। ক্রমে আর্যরা এদেশে আসে, অর্থবেদেও এ সময় সামাজিক পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যায়। এ যুগে আর্যদের দুটি প্রধান পেশা ছিল : ১. কৃষিকাজ ২. পশুপালন।

এ ছাড়াও এ সময় ক্রীতদাস প্রথা চালু থাকায় কৃষিকাজে নানা ধরনের সাহায্যের জন্য নারীদেরকেও ক্রীতদাসী হিসেবে নিয়োগ করা হতো। সমাজতাত্ত্বিকরা প্রমাণ করেছেন যে, নারীদের দাসত্বের মাধ্যমেই দাস প্রথার সূত্রপাত হয়।[৬] বংশ রক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হলো পিতৃশাসিত যৌথ পরিবার। পরিবার ও সমাজ নারীকে সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে লাগলো। এভাবেই মূলত মাতৃধারার পরিবর্তন ঘটে এবং পিতৃধারার বংশ ও উত্তরাধিকার নির্ণয়ের ব্যবস্থা চালু হলো। সম্পত্তি পিতৃধারার পুরুষানুক্রমে হস্তান্তরিত হতে থাকলো। ঘর-সংসারের মৌলিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মতো গুরুত্বপূর্ণ সকল ব্যাপারের কর্তৃত্ব ও বাইরের যাবতীয় কর্তৃত্ব সবই পুরুষ নিজের হাতে তুলে নিল। বাংলার নারী হারালো তার অধিকার, স্বাধীনতা, মর্যাদা তথা ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের যাবতীয় অধিকার।

---

১. রায়, নীহাররঞ্জন, *বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব* সংক্ষিপ্ত সংস্করন (কলকাতা : লেখক সমবায় সমিতি ভারত, ফাল্গুন ১৩৭৩ বাং, পৃ. ১২৭।

২. মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন* (ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৯ খৃস্টাব্দ), পৃ. ১।

৩. ক্ষিতিমোহন সেন, *প্রাচীন ভারতে নারী* (কলিকাতা : বিশ্ব ভারতী গবেষণা গ্রন্থমালা, ভারত, ১৩৫৭ বাং), পৃ. ৮২-৮৫।

৪. বেগম মালেকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২।

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২

৬. অগাস্ট বেবেল, *নারীর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ* (অনুবাদ করেছেন কনক মুখার্জী) (কলিকাতা : এন বি এ প্রকাশনী, ভারত, ১৯৮৩ খৃস্টাব্দ), পৃ. ১২।

Dhaka University Institutional Repository

নারী শিক্ষা বা উইমিন্‌স্ স্টাডিজ ধারণার উৎপত্তি

১) নারী আন্দোলন থেকেই উইমিন্‌স্ স্টাডিজের জন্ম। বিশ্বজুড়ে নারী আন্দোলন, নারীগোষ্ঠী, নারী সংগঠনগুলোর সংগ্রামকে যুগপৎ সমর্থন ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিকল্প পদ্ধতি, নীতি ও কৌশল উদ্ভাবন ও তাদের তুলণামূলক কার্যকারিতা নিয়ে গবেষণা থেকেই উইমিন্‌স্ স্টাডিজের উৎপত্তি। জ্ঞানের এই শাখা সব ঐতিহ্য, সংস্কার ও প্রচলনকে প্রশ্নের মুখোমুখি করে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, তাদের মতাদর্শিক ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপগুলোকে পরিবর্তনের প্রয়াস চালায়।

(২) উইমিন্‌স্ স্টাডিজ অদৃশ্য নারীকে দৃশ্যমান করে নারীকে অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে আসে; সামাজিক প্রক্রিয়ায় তার অবদান, নিজস্ব জীবন, সংগ্রাম ও আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে; সামাজিক কর্মকাণ্ডে এবং বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধানে নারীকে বাদ দিয়ে রাখার যে অপচেষ্টা সে বিষয়ে গবেষণা করে উইমিন্‌স্ স্টাডিজ জ্ঞানের সকল দিগন্তকে সমৃদ্ধ করে। এই প্রসঙ্গে নারীর অধস্তন অবস্থার সকল দিক এবং সকল রূপ বিশ্লেষণ করে উইমিন্‌স্ স্টাডিজ জেণ্ডার বৈষম্যের ভিত ধরে নাড়া দেয়।[১]

(৪) অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক তথা মানবজীবনের সকল কর্মকাণ্ডে নারী ও পুরুষের তুলণামূলক অংশগ্রহণ কেমন হবে, তা নির্ধারণে জেণ্ডারের মূল ভূমিকা বিশ্লেষণ উইমিন্‌স্ স্টাডিজের পরিধিভুক্ত। সকল ক্ষেত্রে জেণ্ডার বৈষম্যের কারণ, গতি প্রকৃতি, ব্যাপকতা এবং বিভিন্নরূপ পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে এগুলোর যুক্তিহীনতা, অসারতা ও অস্বাভাবিকতা নির্দেশ করে।

(৫) উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জেণ্ডার অসমতা উইমিন্‌স্ স্টাডিজ-এ প্রেরণা যুগিয়েছে। কাজেই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় জেণ্ডারের ভূমিকা জ্ঞানের এই শাখার গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। উইমিন্‌স্ স্টাডিজ বিভিন্ন শ্রেণীর নারীর উপর উন্নয়ন কৌশল, নীতি এবং বাস্তবায়নের উপকরণগুলোর প্রতিফলন বিশ্লেষণ এবং উন্নয়নে জেণ্ডার সমতা প্রতিষ্ঠার উপায় উদ্ভাবন করে।

(৬) উইমিন্‌স্ স্টাডিজ শিল্পায়ন, প্রযুক্তি হস্তান্তর, রপ্তানীনির্ভর অর্থনীতি, জাতীয় শ্রম শক্তি, শ্রম বিভাগ প্রভৃতি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জেণ্ডারের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত ভূমিকা পর্যালোচনা করে।

(৭) উইমিন্‌স স্টাডিজ যৌনতাকে আলোচনার বিষয়বস্তু করে নিয়েছে। সাহিত্য, বিজ্ঞাপন, গণমাধ্যম, সিনেমা ও টেলিভিশনে নারী-পুরুষের পৃথক ভাবমূর্তি জ্ঞানের এই শাখার আলোচ্য বিষয়।

(৮) আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জেণ্ডারের ভূমিকা ও অবস্থান উইমিন্‌স্ স্টাডিজ -এর আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। বিশ্বায়ন, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ক্ষমতার মেরুকরণ, বৃহৎ শক্তিগুলোর ক্ষমতার বলয় সৃষ্টি, পরাশক্তির খবরদারি, যুদ্ধ, আন্তর্জাতিক সংঘাত ও সন্ত্রাস বিশ্বজুড়ে যে সমস্যার সৃষ্টি করে চলেছে জ্ঞানের এই শাখা তার জেন্ডার চরিত্র বিশ্লেষণ করে।

(৯) সর্বোপরি পুরুষ প্রাধান্য ও নারীর ক্ষমতাহীন অধস্তন অবস্থা বিশ্বজুড়ে নারী নির্যাতন প্রকট ও মারাত্মক করে তুলেছে। নারীর নির্যাতনের মূলে রয়েছে নারীর ক্ষমতাহীনতা। নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী নির্যাতনের মূলোচ্ছেদ উইমিন্‌স্ স্টাডিজ -এর সর্বপ্রধান অভীষ্ট লক্ষ্য। স্বাধীন বাংলাদেশে নারী নেতৃত্বে অনেক সাড়া জাগানো আন্দোলন হলেও দীর্ঘস্থায়ী কোন নারী আন্দোলন দানা বাঁধেনি। যুদ্ধাপরাধ বিরোধী আন্দোলনে জাহানারা ইমাম এবং সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনে বেগম খালেদা জিয়া, শেখ হাসিনা ও মতিয়া চৌধুরী প্রমূখ দৃঢ় ভূমিকা রাখেন। তাদের রাজনৈতিক ক্যারিয়ার বাংলাদেশের নারীদের জন্য বিশেষ অনুপ্রেরণার কারণ হলেও নারীদের মুক্তি আন্দোলন তথা ক্ষমতায়নে এর কোন সরাসরি প্রভাব দৃশ্যগোচর হয় না।[২] তবে সাম্প্রতিক বাংলাদেশে নারীদের অধিকার রক্ষা, সচেতনতা সৃষ্টি, উল্লেখযোগ্য একটি সাংগঠনিক সাফল্য হলো ‘সম্মিলিত নারী সমাজ’ নামে একটি ঐক্যবদ্ধ নারী ফ্রন্টের বিকাশ। এর মধ্যে রক্ষণশীল, মধ্যপন্থী ও নারীবাদীসহ সকল

---

১. মাহমুদা ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

২. আলতাফ পারভেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

ধারার নারী সংগঠনের উপস্থিতি রয়েছে। যদিও এদের তৎপরতা একান্তই নগরকেন্দ্রিক। চলতি সময়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রাণীর বিরুদ্ধে ছাত্রীদের সাহসী অগ্রযাত্রা নারী অধিকার আন্দোলনের এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ১৯৯৬ ও ২০০১ এর জাতীয় সংসদ নির্বাচন কালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টামণ্ডলীতে নারীর অন্তর্ভুক্তি নারী সচেতনতা, ক্ষমতায়ন ও আন্দোলনের একটি অর্জন বলে স্বীকৃত হয়েছে বিভিন্ন মহলে। যদিও ১৯৯০'র তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টামণ্ডলীতে 'ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজ' দাবি জানিয়েও নারী উপদেষ্টার মনোনয়ন অর্জনে সফল হয়নি।

বাংলাদেশের নারী ইস্যুকে উজ্জীবিত করেছে এমন কয়েকটি উল্লেখ্যযোগ্য সংগঠন হলো, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মহিলা দল, নারীপক্ষ, নারী প্রগতি সংঘ, নিজেরা করি, সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, উইমেন ফর উইমেন, গণ সাহায্য সংস্থা, কর্মজীবি নারী, নারী মুক্তি আন্দোলন, জাতীয় মহিলা আইনজীবি সমিতি, প্রভৃতি। তবে নারী ইস্যুকে উজ্জীবিত করতে গিয়ে কারো কারো মাঝে 'ফেমিনিজম' হওয়ার ঝোক প্রবল এবং মুসলিম প্রধান একটি সমাজে ঘোমটা হটিয়ে মেয়েদের কিছুটা পশ্চিমা মূল্যবোধে গড়ে তোলাকে তারা কাজের মূল প্রবণতা করে তুলেছেন। তাদের আন্দোলনের মতাদর্শ জন সমাজে কখনও কখনও বিরূপ প্রতিক্রিয়ারও জন্ম দিচ্ছে।[১] তসলিমা নাসরিন ও হুমায়ুন আজাদের ভূমিকা এখানে উল্লেখ করা যায়। সামগ্রিক আলোচনায় আমরা বলতে পারি, দেশে বিদেশে বিভিন্ন নারী আন্দোলন, নারী শিক্ষার প্রসার, নারী অধিকার সচেতনতা ও জাতিসংঘসহ বিভিন্ন নারী সংস্থার উদ্যোগ বাংলাদেশের নারীদের জীবনে পরিবর্তনের সূচনা করেছে। নারী প্রত্যয়টি (Concept) বিশ্লেষিত হচ্ছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে, নতুন মানদণ্ডে। পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গিও পাল্টাচ্ছে। পরিবর্তিত এ পরিস্থিতি নারীর নতুন অবস্থা ও তার জীবনকেও নানাভাবে প্রভাবিত করছে।

নারী শিক্ষা বা উইমিন্স্ স্টাডিজ ও জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা

"উইমিন্স্ স্টাডিজ ইংরেজি শব্দ। সহজ বাংলায় বলা যেতে পারে নারী বিষয়ক গবেষণা ও অধ্যয়ন। ইউমিন্স্ স্টাডিজ নারীর প্রতি বৈষম্য এবং সমাজে নারীর অধস্তন অবস্থানকে চিহ্নিত করে, বৈষম্য ও অধস্তন অবস্থানের কারণ নির্ণয় করে এবং নারী-পুরুষের মধ্যে সুস্থ ও সফল সমন্বয় ও সহযোগিতার মাধ্যমে সমাজের অগ্রযাত্রাকে সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও সমতাভিত্তিক করার উপায় ও কর্মপন্থা নির্দেশ করে। নারীর জীবন ও কর্মধারা, তার মন-মানসিকতা, তার চিন্তাভাবনা এবং সমাজ জীবনে, রাষ্ট্রে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে, শিল্প ও সংস্কৃতিতে অর্থাৎ জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর স্থান ও ভূমিকা উইমিন্স্ স্টাডিসের আলোচনা অন্তর্ভুক্ত। যদিও নারীর সামাজিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে, তবে তা গতি পায় বিংশ শতাব্দীতে; মূলত বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পাশ্চাত্যে নারীর সার্বিক অবস্থা নিয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনা দ্রুত এগিয়ে চলে। ইতোমধ্যে পাশ্চাত্যের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে উইমিন্স্ স্টাডিজ একটি সুনির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম হিসেব গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উইমিন্স্ স্টাডিজ অনার্সের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অধুনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উইমিন্স্ স্টাডিজ নামে একটি পূর্ণাঙ্গ এবং স্বতন্ত্র বিভাগ খোলা হয়েছে; এই বিভাগ থেকে বি.এ. অনার্স এবং এম.এ. ডিগ্রী প্রদান শুরু হয়েছে।

জ্ঞানের শাখা (academic discipline) হিসেবে উইমিন্স্ স্টাডিজ এর সংজ্ঞা প্রদান কঠিন। বস্তুত জ্ঞানের কোন শাখার সর্বসম্মত সংজ্ঞা নেই। কারণ, জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিভিন্ন নাম দেওয়া হলেও, তারা একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অর্থনীতি বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে যোগসূত্র গভীর। সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞান পরস্পরে জড়িত। সমাজবিজ্ঞান সমাজ নিয়ে এবং নৃবিজ্ঞান মানুষ নিয়ে গবেষণা করে। কাজেই সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানের পরিধি সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা দুষ্কর। অপরপক্ষে, উইমিন্স্ স্টাডিজ মানুষ তথা নারী-পুরুষ এবং

---

[১]. সুরাইয়া বেগম, *বাংলাদেশী নারী অধঃস্তনতা : মতাদর্শের বিভিন্ন দিক* (ঢাকা: সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, সংখ্যা-৩০, ১৯৮৮ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

নারী-পুরুষ নিয়ে গঠিত সমাজ বিশ্লেষণ করে; নারীর ভোটাধিকার ও রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং কর্মকাণ্ডে নারীর অবদান উইমিন্স্ স্টাডিজ -এর আলোচ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে অর্থনীতি বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, ইতিহাস, এক কথায়, জ্ঞানের সকল শাখার সঙ্গে উইমিন্স্ স্টাডিজ ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। এই সম্পৃক্ততার জন্য উইমিন্স্ স্টাডিজ -এর সীমারেখা পরিষ্কারভাবে টানা দুরূহ।

নারী শিক্ষা বা উইমিন্স্ স্টাডিজ এর গুরুত্ব ও আবশ্যকতা

নারী ও পুরুষ নিয়ে মানবজাতি। কাজেই নারী ও পুরুষ জ্ঞানের সকল শাখার সঙ্গে জড়িত। উইমিন্স্ স্টাডিজ নামে জ্ঞানের পৃথক শাখা খোলা হলে মানবজাতির দুই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গের মধ্যে বিভেদ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হবে; উইমিন্স্ স্টাডিজ বস্তুত বিভেদাত্মক এবং নারী নিয়ে পৃথকভাবে গবেষণা সংকীর্ণমনা দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক, যা একটি পাঠ্য বিষয়ের উপজীব্য হতে পারে না। তাই উইমিন্স্ স্টাডিজ জ্ঞানের পৃথক শাখা হিসেবে নিষ্প্রয়োজন বলে কেউ কেউ মনে করেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন নারী-পুরুষ নিয়ে মানবজাতি; মানবজাতির অর্ধেক নারী। কিন্তু মানবজাতির অর্ধেক অংশ বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ে, জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়নি বিধায় প্রাক শাখা হিসেবে এর আলোচনা প্রয়োজন।

ইতিহাস, অর্থনীতি বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, এমন কি, সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানে নারীর উল্লেখ নেই বললেই চলে। এ সকল বিষয় অধ্যয়ন করলে মনে হয়, মানবজাতি একমাত্র পুরুষকে নিয়ে গঠিত; জ্ঞানচর্চার সকল ক্ষেত্রে নারী অবহেলিত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখা থেকে নারী নির্বাসিত; স্কুল-কলেজের পাঠ্য বইগুলোতে নারীর উল্লেখ নেই বললেই চলে। ইংরেজি ভাষায় পুরুষ ও নারী যথাক্রমে Man এবং Woman; সর্বনামে he ও she; ইংরেজী ভাষায় প্রণীত সকল গ্রন্থে একচেটিয়াভাবে man এবং he ব্যবহৃত হয়েছে। woman এবং she সামান্যই চোখে পড়ে। বিদগ্ধ সমাজের দৃশ্যমান জগতে নারী সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য (invisible); নারীকে লোকচক্ষুর আড়ালে রেখে পুরুষ তার একাধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে জীবনের সর্বত্র। জীবনের সকল স্তরে পুরুষ সমাজ-সভ্যতার ধারক-বাহক; নারী অদৃশ্য ও অনুপস্থিত। কাজেই বিদ্যাচর্চার বিদ্যমান পরিস্থিতি বিভেদাত্মক। জ্ঞানের সকল শাখায় নারী ও পুরুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে জিইয়ে রাখা হয়েছে। মানবজাতির অর্ধাংশ নারীকে অদৃশ্য থেকে দৃশ্যমানে টেনে তুলতে, তাকে অন্তরাল থেকে বাইরে এনে সামাজিক স্বীকৃতি প্রদান করতে উইমিন্স্ স্টাডিজের বিকল্প নেই। এদিক থেকে বিচার করলে জ্ঞানচর্চার বিদ্যমান বিভেদাত্মক সংকীর্ণমনতা দূর করে উইমিন্স স্টাডিজ জ্ঞানের প্রসারতা ঘটায়।

পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এথেনীয়ান গণতন্ত্রের প্রশংসা করে থাকেন। কিন্তু সেখানে নারীর রাজনৈতিক অধিকার ছিল না; গণতন্ত্র ছিল পুরুষের গণতন্ত্র। রোমের তথাকথিত গণতান্ত্রিক পদসমূহ থেকে নারী বঞ্চিত ছিল। এমন কি, বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পশ্চিমা দেশে নারীর ভোটাধিকার ছিল না। গণতন্ত্রের দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নারী ভোটাধিকার লাভ করে ১৯২০ সালে। ১৯২০ সালে ভোটাধিকার অর্জনের পেছনের ইতিহাস নারীর কঠিন সংগ্রামের ইতিহাস। এই সংগ্রামে সংকল্প, শক্তি ও সাহস যুগিয়েছিল উইমিন্স্ স্টাডিজ -এর প্রবক্তারা।

অর্থনীতি বিজ্ঞানে নারী ছিল অবজ্ঞাত ও বৈষম্যের শিকার। অর্থনীতিবিদরা জাতীয় আয়ে নারীর অর্থনৈতিক কর্মকে স্থান দেননি। হোটেল রেস্টুরেন্টে পুরুষ বাবুর্চি রান্না করে যে বেতন পায় তা জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ঘরে স্ত্রীর রান্নাবান্নাকে অর্থনৈতিক কর্ম বিবেচনা করা হয় না এবং জাতীয় আয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। ঘরে স্ত্রী কাপড় ধুলে তার অর্থনৈতিক মূল্য নেই; একই কাপড় ধোপাকে দিয়ে ধোয়ালে তা অর্থনৈতিক কর্ম। তথাকথিত বিদগ্ধ অর্থনীতিবিদদের বিজ্ঞানে নারীর কর্মকাণ্ডের অর্থনৈতিক মূল্য নেই, একই কাজের জন্য পুরুষ ও নারীর পৃথক এবং পক্ষপাতমূলক মূল্যায়ন তাদের অর্থনীতি বিজ্ঞানের মূলমন্ত্র। এই পক্ষপাত ও বৈষম্য চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হয়েছে উইমিন্স্ স্টাডিজকে। অতীতে বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে পুরুষের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। সামান্য যে কয়েকজন নারী গবেষক ছিলেন তারাও পক্ষপাতের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন নি। কারণ নারী পুরুষ

Dhaka University Institutional Repository

নির্বিশেষে সকলেই প্রচলিত পক্ষপাতদুষ্ট সমাজ ব্যবস্থার শিকার; পুরুষের প্রতি পক্ষপাত এবং নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্যের উপর ভিত্তি করে যে সমাজ ব্যবস্থা চালু রয়েছে, সে সমাজ ব্যবস্থার গণ্ডীর মধ্যে তারা লালিত-পালিত হয়েছেন; সমাজের ছাঁচে তারা নিজেকে গড়ে তুলেছেন; ফলে সমাজের সংস্কার তাদের মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে গেছে। জ্ঞানের সকল শাখায় এ যাবৎকাল পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে পুরুষকে নিয়ে; পর্যবেক্ষণ ও পরিসংখ্যানের লক্ষ্যবস্তু ছিল পুরুষ। নমুনা জরিপ, প্রশ্নমালা, সাক্ষাৎকার, ব্যক্তি তদন্ত (Case study), জীবন ইতিহাস (life history) সকল গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে পুরুষের উপর; গৃহের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ নারী বৈজ্ঞানিক গবেষণা থেকে অদৃশ্য ছিল। ফলে, পক্ষপাতদুষ্ট সমাজব্যবস্থায় আবদ্ধ পুরুষের পর্যবেক্ষণ, নিরীক্ষণ ও গবেষণা পুরুষের প্রতি পক্ষপাতমূলক উপাত্তের জন্ম দিয়েছে এবং জ্ঞান ও বিদ্যাচর্চার সকল ক্ষেত্রে হয়ে পড়েছে পক্ষপাতদুষ্ট এবং নারী হয়েছে বিবর্জিত। এই দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসতে হলে উইমিন্স্ স্টাডিজ -এর বিকল্প নেই। সমাজের পুরুষ পক্ষপাত উন্মোচিত করে উইমিন্স্ স্টাডিজ জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ ও সমদৃষ্টিসম্পন্ন বিচার বিশ্লেষণের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

যদিও নাম উইমিন্স্ স্টাডিজ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নারী ও পুরুষ উভয়েরই আলোচনা। কান টানলে যেমন মাথা আসে, তেমনি নারী নিয়ে গবেষণা করতে হলে পুরুষের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ ইতিহাসের কথা বলা যায়। নারীর বিরুদ্ধে পক্ষপাত উদ্ঘাটন করতে হলে ইতিহাস পর্যালোচনা আবশ্যক। নারীর বিরুদ্ধে পক্ষপাত; বস্তুত পুরুষের প্রতি পক্ষপাত। পুরুষের আলোচনা ছাড়া নারীর বিরুদ্ধে পক্ষপাতের ইতিহাস উদ্ঘাটন অসম্ভব। উইমিন্স্ স্টাডিজ ইতিহাসে নারী ও পুরুষের বিভেদাত্মক অবস্থান উদ্ঘাটন করে ইতিহাসকে পূর্ণতা দান করেছে। অতীতে যাঁরা ইতিহাস রচনা করেছেন তাঁরা কেবল পুরুষের কথা বলেছেন; নারীর কথা বলেননি। এ ইতিহাস স্বভাবত অসম্পূর্ণ এবং একাংশের ইতিহাস। উইমিন্স্ স্টাডিজ ইতিহাসে নারী ও পুরুষের তুলণামূলক অবস্থান বিশ্লেষণ করে এবং ইতিহাসে নারীর অনুপস্থিতির কারণ চিহ্নিত করে ইতিহাসকে সম্পূর্ণতা দান করেছে। অনুরূপভাবে জ্ঞানের অন্যান্য শাখায় নারীর অনুপস্থিতি ও নারীর প্রতি অবজ্ঞা অপনোদন করে উইমিন্স্ স্টাডিজ জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অপূর্ণতা দূর করে নারী ও পুরুষে যথাযথ মূল্যায়নের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গতা বিধান করেছে। উইমিন্স্ স্টাডিজ নারী ও পুরুষ উভয়ের আলোচনার মাধ্যমে জ্ঞানের ক্ষেত্রে অধিকতর পরিপূর্ণতা এনেছে। নারী ও পুরুষের মধ্যে যেমন বৈষম্য আছে তেমনি বিভিন্ন নরগোষ্ঠী (race), বর্ণ (caste) ও শ্রেণীর (class) মধ্যে বৈষম্য রয়েছে। নরগোষ্ঠী, বর্ণ, শ্রেণী ও নারী-পুরুষ বৈষম্য আলোচনা ছাড়া জ্ঞানচর্চা একপেশে হয়ে পড়ে। নরগোষ্ঠী, বর্ণ ও শ্রেণী বৈষম্যের পাশাপাশি নারীপুরুষ বৈষম্য সমাজের একটি গুরুতর সমস্যা যা সমাজের সুষ্ঠু বিকাশে প্রতিবন্ধক। বর্ণবৈষম্য আলোচনা যেমন উচ্চবর্ণকে বাদ দিয়ে শুধু নিম্নবর্ণে সীমাবদ্ধ রাখা চলে না; শ্রেণীবৈষম্য আলোচনা যেমন ধনিক শ্রেণীকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়, তেমনি নারী পুরুষ বৈষম্যের আলোচনা পুরুষকে বাদ দিয়ে অসম্ভব। কাজেই উইমিন্স্ স্টাডিজ শুধু নারী নিয়ে আলোচনায় সীমাবদ্ধ নয়; নারীপুরুষের মধ্যে বৈষম্য, বৈষম্যের কারণ এবং বৈষম্য দূরীকরণের উপায় ও পন্থা নিয়ে গবেষণা করে। কাজেই উইমিন্স্ স্টাডিজের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। নারী-পুরুষ পরস্পরের সম্পূরক ও পরিপূরক। উভয়কে নিয়ে সমাজ গঠিত। সমাজের অগ্রগতি, সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা, সামাজিক ন্যায়-বিচার, সামাজিক সাম্য এ সবের মূলে নারী-পুরুষ উভয়েই। উভয়ের সমবেত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সুষম (equitable) সমাজ গঠন এবং সমতাভিত্তিক (equality of men and women) উন্নয়ন সম্ভব।

নারী ও পুরুষের সম্পর্কের সমন্বয়, সমঝোতা ও সহযোগিতা সুষ্ঠু ও সুষম সামাজিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। তাই নারী পুরুষের সঠিক সম্পর্কের ভিত্তিতে সুষম ও সমতাভিত্তিক সামাজিক সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। এই প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যেতে উইমিন্স্ স্টাডিজ সাহায্য করে। নারী-পুরুষের সম্পর্ক কীভাবে সুষম সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারে, সমাজের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি করতে পারে উইমিন্স্ স্টাডিজ তা নিয়ে গবেষণা করে। জ্ঞানের এই শাখা কেবল নারীর সমস্যা, অধিকার ও দায়িত্ব, তাদের সামাজিক ও জৈবিক (biological) ভূমিকার মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

সীমাবদ্ধ নয়। বরং নারী ও পুরুষ পরস্পরের এক সমান ব্যক্তি হিসেবে জীবনধারণ, কর্মসম্পাদন ও মন আদান-প্রদানের প্রাত্যহিক, বাস্তব ও ব্যবহারিক সমস্যা নিয়ে কীভাবে একে অপরের সঙ্গে কাজ করবে, উইমিন্‌স্ স্টাডিজ সে সম্পর্কে আলোকপাত করে। নারী ও পুরুষের সামাজিক সম্পর্ককে বুঝানোর জন্য কোন পরিভাষা এতকাল ছিল না। নারী ও পুরুষে মধ্যে পার্থক্য সেক্স শব্দ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। কিন্তু নারী ও পুরুষের যে সম্পর্কের ভিত্তিতে সামাজিক সংগঠনগুলো গড়ে উঠেছে তাকে বুঝানোর কোন শব্দ ছিল না। ইদানীংকালে নারীবিষয়ক গবেষকগণ নারী-পুরুষের সামাজিক সম্পর্ককে বুঝাতে gender-জেণ্ডার শব্দটি চয়ন করেছেন। ইংরেজি gender শব্দের বাংলা পরিভাষা উদ্ভাবিত হয়নি। বাংলা ভাষায় গবেষকগণ জেণ্ডার শব্দটি ব্যবহার করছেন।

উইমিন্‌স্ স্টাডিজ ও আল্ কুর'আন

আল্ কুর'আন নারী শিক্ষা ও গবেষণা (উইমিন্‌স্ স্টাডিজ) এর ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। শুধু নারীদের জীবনমান, অধিকার, চালচলন, পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সহ সামগ্রিক জীবনকে কেন্দ্র করে আল্লাহ্ পাক সূরা 'আন-নিসা' নাযিল করেছেন। এ ছাড়াও কুর'আনের অন্যান্য সূরাতেও নারীদের জীবন সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান আলোচিত হয়েছে। যেমন ইসলামী আইনে মহিলারা মাতারুপে-স্ত্রীরুপে-কন্যারুপে এবং বোনরুপে সম্পত্তি লাভ করে। নারী অধিকার, সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে ইসলামের অবদান অস্বীকার করা কারো ক্ষমতা নেই। যে শাস্ত্রেই নারীর অধিকার নিয়ে যত লেখক গলাবাজি করুক না কেন তাদের এ বক্তব্যের মূল উৎস আল কুর'আন ও শরীআ সংশ্লিষ্ট উৎসসমূহ। মাতা স্ত্রী ও কন্যা এ তিন ধরনের মহিলা উত্তরাধিকার আইনে চিরস্থায়ী অংশীদার। কোন অবস্থাতেই তারা উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হয় না। যেমন মাতা তার সন্তানের মৃত্যুতে রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে সর্বাবস্থায়ই অংশীদার। অনুরুপভাবে স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে (সন্তান থাকাবস্থায় বা না থাকাবস্থায়) অংশীদার। এক কথায় মাতা, স্ত্রী ও কন্যার অংশ উত্তরাধিকার আইনে সুনির্দিষ্ট। এভাবে আল্ কুর'আনে[১] নারীদের কল্যাণে প্রয়োজনীয় সকল অধিকার বর্ণনা করা হয়েছে। এ সুনির্দিষ্ট অংশীদারদেরকে বাদ দিয়ে আর যে সব মহিলা আত্নীয় মৃতের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করে তারা হচ্ছে মাতার দিক থেকে উর্ধ্বগামী বংশধর মহিলাগণ এবং পিতার দিক থেকে উর্ধ্বগামী মহিলাগণ। মাতার দিক থেকে ঊর্ধ্বগামী বংশধর মহিলাগণ হচ্ছেন- মাতামহি, প্রমাতামহি, এবং তৎঊর্ধ্বের মহিলাগণ। পিতার দিক থেকে ঊর্ধ্বগামী মহিলাগণ হচ্ছেন- পিতামহি, প্রপিতামহি এবং তৎঊর্ধ্বের মহিলাগণ। এসব মহিলা কিছু বিশেষ অবস্থায় মৃতের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করে, নতুবা নয়। যেমন মৃতের মাতা বেচে থাকলে মাতামহি উত্তরাধিকারিত্ব হারায়। অনুরুপভাবে পিতার জীবিত অবস্থায় পিতার মাতা অর্থাৎ দাদী মৃতের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হয় না।[২] এছাড়াও

---

[১]. (আল-কুর'আন) শব্দটি কারাআ অথবা কারিনা (অর্থ সংযুক্ত ও একত্রিত)। শব্দমূল হতে উদ্ভূত। এ গ্রন্থখানা জগতে সর্বাধিক পঠিত অথবা এর প্রতিটি অক্ষর এবং শব্দ একে অপরের সাথে সংযুক্ত বলে কুর'আন বলা হয়ে থাকে।

এটা আল্লাহর বাণী যা জিবরা'ঈলের (আ) মাধ্যমে মহানবী মুহাম্মদ (সা) এর উপর 'আরবী ভাষায় অবতীর্ণ এবং সহীফা আকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে। অতঃপর আমাদের নিকট মুতাওয়াতির পদ্ধতিতে পৌঁছেছে, যাতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই। কেননা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা-ই উহার বিশুদ্ধতা রক্ষা ও সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, 'তাড়াতাড়ি শিখে নেবার জন্য আপনি দ্রুত ওহী আবৃত্তি করবেন না। এর সংরক্ষণ ও পাঠ আমারই দায়িত্ব। অতপর আমি যখন তা পাঠ করি, তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন।' পবিত্র কুর'আনই ইসলামী শরী'আতের সবচাইতে অকাট্য বা প্রামাণ্য উৎস। যে এর সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষ অস্বীকার করবে সে কাফির হবে। অনুরুপভাবে এ গ্রন্থের অংশ বিশেষকে উপেক্ষা করলেও তাকে গুরুতর গোনাহ্‌গার হতে হবে। প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী পবিত্র কুর'আন মাজীদে আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬টি। তন্মধ্যে ৫০০ আয়াত আহকাম বা বিধিবিধান সম্বলিত। পারা ৩০টি, রুকু ৫৪০টি, ৭ মানজিলে অবতীর্ণ। মোট সূরা ১১৪টি। মাক্কী সূরা ৯২টি আর মাদানী সূরা ২২টি। (মুহাম্মদ খুদরী বেক, *তারীখুত্-তাশরী'ইল ইসলামী* (বেনারসঃ আল-জামিআতুস্-সালাফিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৩ হিজরী/১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দ), পৃঃ ২০; *'ইলমুল উসূলিল ফিক্‌হ*, পৃঃ ২৪।

[২]. সাহিদা বেগম, *মুসলিম আইন ও পারিবারিক আদালত* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪ খৃস্টাব্দ), পৃ.৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

নারীদের কর্মক্ষেত্র, পরিবেশ ও পরিবার ব্যবস্থ্পনা থেকে শুরু করে সকল বিষয়ে আল্ কুর'আন আলোচনা করেছে।

ইসলামী আইনে পৈতৃক সম্পত্তিতে একজন পুত্রের অংশের অর্ধাংশ কন্যাকে এবং পুত্রের অংশের চেয়েও কম মাতাকে প্রদান করে নারীর প্রতি অবিচার করা হয়েছে বলে তথাকথিত আধুনিক নারীবাদীদের প্রবক্তাদের অভিযোগ উচ্চারিত হচ্ছে। আমাদেরজানা থাকা দরকার ইসলাম সর্বজনীন বাস্তব সম্মত জীবন বিধান যার বৈশিষ্ট্য ও অকাট্যতা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাই প্রকৃতপক্ষে বিচার-বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায় ইসলাম সম্পূর্ণরুপে ন্যায় সঙ্গত অধিকার নারীকে প্রদান করেছে। এ সম্পর্কে Safia Iqbal নামের জনৈক চিন্তাবিদ বলেন-" However,a closer scrutiny reveals that such an order is, in fact, the very echo of justige. the responsibility of earning a livelihood and supporting the family is not placed on woman in Islam. In case of a man's death, it is the son, and not the daughter or the widow, who is responsible for the maintenance of the family.Hence,the son's increased share in the property is meant to provide him assistance in maintaining the family. In fact, it would have been injustice if woman who was not bound to contribute anything in the way of earning towards the family upkeep, got an equal share. As it is, her net share amounts to more than that of her brother or son when her Mahr, her marriage gifts, her ornaments and personal property which belong to her solely, are considered."[১] অর্থাৎ ইসলাম জীবন-যাত্রার খরচ নির্বাহ করার জন্য আয়-উপার্জন করা এবং পরিবারকে সাহায্য-সহযোগিতা করার দায়িত্ব কোন স্ত্রীর উপর অর্পন করেনি। পিতার মৃত্যুর পর পরিবার পরিচালনা ও পারিবারিক খরচ নির্বাহের দায়িত্ব বর্তায় পুত্রের উপর; কন্যা বা বিধবার উপর নয়। আর এ কারণেই পারিবারিক দায়-দায়িত্ব ও খরচ নির্বাহের সহযোগিতার জন্য পুত্রের অংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে পারিবারিক খরচ নির্বাহের জন্য উপার্জন করা নারী বাধ্য নন। পৈতৃক সম্পত্তিতে তার অংশ যদি সমান হতো তবে তা যথাযথ ও ইনসাফপূর্ণ হতো না। তাছাড়া একজন নারীর মহর, বিবাহের উপঢৌকন, অলংকার এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিবেচনায় এনে বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তার প্রকৃত অংশ ভাই এবং পুত্রের চেয়েও বেশী। সুতরাং এ বিষয়ে বিতর্কের কিছু নেই। এভাবে ইসলাম বাস্তব প্রয়োজন ভিত্তিক নারী অধ্যয়ন ও গবেষণা পথ বাতলিয়ে দিয়েছে। এক্ষেত্রে কুর'আন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস এবং ইসলামের আনুষঙ্গিক উৎস সমূহকে মূলনীতি ধরতে হবে।

নারী ও আন্তর্জাতিকতা

দুনিয়া আজ বিশ্বায়নের পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ায় নারীকে কীভাবে সংযুক্ত করা যায়, বিশ্বায়নকে কীভাবে জেণ্ডার সমতা বৃদ্ধিতে কার্যকর করা যায়, তা উইমিন্স্ স্টাডিজের গবেষণার বিষয়বস্তু। দেশে দেশে স্নায়ুযুদ্ধ, ক্ষমতার বণ্টন, নব্য পুঁজিবাদ ও নব উপনিবেশিকতাবাদ, গৃহযুদ্ধ, আঞ্চলিক যুদ্ধ, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং অর্থনৈতিক সংগঠন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও শ্রম স্থানান্তর প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে নারীর গভীর যোগসূত্র রয়েছে। আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সম্পর্ক নারীর উপর গভীর প্রভাব ফেলে; যেমন, যুদ্ধ নারীর উপর দৈহিক, আর্থিক ও মানসিক চাপ সৃষ্টি করে; নারী ধর্ষণ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক যুদ্ধের একটি দুঃখজনক আনুষঙ্গিক বিষয়। নারী পাচার ও নারী ব্যবসা আজ আন্তর্জাতিক রূপ নিয়েছে। উন্নয়নশীল দেশের রপ্তানি-নির্ভর শিল্পায়ন নারীশ্রমের শোষণের সমস্যা সৃষ্টি করেছে। পোশাক শিল্পে নারী ও শিশুশ্রমের শোষণ আজ কারো অজানা নয়। বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক সংকট ও মন্দা, কাঠামোগত সমন্বয়

---

১. Safia Iqbal, *WOMAN AND ISLAMIC LAW,* (New Delhi : Adam Publishers & Distributors, India, 2004), pp. 176-177.

Dhaka University Institutional Repository

(structural adjustment) নীতি এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে (World Bank IMF etc.) উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিতে হস্তক্ষেপ ইত্যাদি আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সমস্যা ও পরিবেশ নারীর জীবন ও জীবিকাকে কীভাবে প্রভাবিত করে এবং কীভাবে জেণ্ডার সমতাকে এই সকল সমস্যা ও পরিবেশের সমাধানে মুখ্য লক্ষ্য নির্ধারণ করা যায়– উইমিন্স্ স্টাডিজ তা নিয়ে গবেষণা করে। এ প্রসঙ্গে পুঁজি গঠন ও পুঁজি বিনিয়োগ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরে নারীর শ্রমকে কীভাবে বিশ্ববাজার ব্যবস্থায় সংযুক্ত (integate) করা হয় তা উইমিন্স্ স্টাডিজ পর্যালোচনা করে।[১]

উইমিন্স্ স্টাডিজে গবেষণার পদ্ধতি (methodology)

অনুসন্ধানের সকল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি উইমিন্স্ স্টাডিজে স্বীকৃত এবং স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সকল পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে উপযোগিতা, বস্তুনিষ্ঠতা এবং ফলপ্রসূতার নিরিখে যে পদ্ধতিটি অধিক জনপ্রিয় সেটি হল অংশগ্রহণ পদ্ধতি অর্থাৎ যিনি গবেষণা করেন বা গবেষক এবং তার গবেষণার লক্ষ্যবস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীর পরস্পরের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ। উদাহরণস্বরূপ, পোশাক শিল্পে নারী শ্রমিকের জীবনের উপর গবেষণা করার জন্য গবেষক ঐ শিল্পের নারী শ্রমিকদের কাছে যান, তাদের সঙ্গে মেলামেশা করেন, তাদের কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করেন, তাদের সঙ্গে কথা বলেন, তাদের বাড়িতে এবং কর্মস্থলে গিয়ে তাদের জীবন সম্পর্কে সকল তথ্য সরাসরি জানেন। এভাবে স্বাভাবিক এবং বাস্তব পরিবেশে গবেষক ও সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে ভাব, ভাষা ও তথ্যের দ্বিমুখী আদান-প্রদান ঘটে। ফলে গবেষণার ফল ও সিদ্ধান্ত বস্তুনিষ্ঠ এবং জীবনের কাছাকাছি এসে যায়। তাছাড়া এমন কতকগুলো ব্যক্তিঘটিত ও ব্যক্তিগত বিষয় আছে যেগুলোতে অংশগ্রহণ ছাড়া গবেষণার অন্য কোন উপায় নেই; যথা, যৌনতা। কয়েকটি উপায়ে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় :

(১) কর্মশালা (workshop) ও দলীয় আলোচনা (group discussion)। এ প্রক্রিয়ায় গবেষক আলোচনার সূত্র ধরিয়ে দেয় এবং অংশগ্রহণকারীরা মূল আলোচনা চালিয়ে যান; যার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর মতামত ও সমস্যাগুলো বেরিয়ে আসে। আলোচকদের বিভিন্ন মতামত ও সমস্যা চিহ্নিতকরণ পর্যালোচনা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে গবেষক সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান।[২]

(২) জীবন বৃত্তান্ত (life history) বা জীবন-ইতিহাস। এই প্রক্রিয়ায় গবেষক তাঁর গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বা জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে কার্যোপযোগী প্রতিনিধি নির্বাচন করেন এবং তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করেন। অনেকক্ষেত্রে, গবেষক তাদের সঙ্গে বাস করেন; তাদের পরিবারের সদস্য হয়ে মিশে যান, তাদের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া (interact) করেন, তাদের অতীত জীবন এবং অভিজ্ঞতা জানেন এবং বর্তমান অভিজ্ঞতা অনুধাবন করেন। অবিচ্ছিন্ন মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে গবেষক ঐ প্রতিনিধিদের সমগ্র জীবনের একটি পূর্ণ চিত্র, পূর্ণ বিবরণ রচনা করেন। এক কথায় তাদের জীবনের ইতিহাস তথা জীবন কাহিনী (biography) লিপিবদ্ধ করেন। এই কাহিনী থেকে তার গবেষণার বিষয়বস্তু সম্পর্কে তথ্য ও সিদ্ধান্ত উদঘাটিত হয়।[৩]

(৩) সংশ্লিষ্ট মহিলাদের বিবৃতি ও রচনা। ব্যক্তি বিশেষের রোজনামচা (diary), পত্রাদি (letters) এবং কাব্য (poems) তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং বিশ্বাস তথা মতামতের প্রতিফলন। এ ধরনের মাধ্যম খুবই বাস্তব এবং কৃত্রিমতাবর্জিত হয়ে থাকে। রোজনামচা এবং পত্রাদিতে জীবনের যে বাস্তব চিত্র ফুটে ওঠে তা অন্যত্র পাওয়া যায় না। এগুলোর সঙ্গে কোন পরিপ্রেক্ষিত যুক্ত থাকে না ; ফলে গবেষণা হয় নির্ভেজাল ও শর্তহীন।

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ.১৭-১৮।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮-১৯।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২০।

Dhaka University Institutional Repository

অপরপক্ষে কাব্য সাধারণত রচয়িতার পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার জীবনযাত্রা প্রাণালী এবং তার শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কারের পরিচয় বহন করে। এগুলো বিশ্লেষণ করলে রচয়িতার সমকালের চিত্র পাওয়া যায়।[১]

অংশগ্রহণ পদ্ধতির কতিপয় অসুবিধা আছে। প্রথমত, বিশ্বাসযোগ্য এবং ব্যাপকভিত্তিক উপাত্ত সংগ্রহের জন্য যত সময় দেওয়া প্রয়োজন এবং যত সংখ্যক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আদান-প্রদান করা বাঞ্ছনীয় অধিকাংশ গবেষকের পক্ষে তা করা সম্ভব হয় না।

দ্বিতীয়ত, গবেষক এবং গবেষণার উদ্দীষ্ট ব্যক্তি ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে শ্রেণীগত, পরিবেশগত এবং শিক্ষাগত ব্যবধান মোচন করা দুরূহ। প্রায় সব ক্ষেত্রেই গবেষকগণ মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত শ্রেণী থেকে আসেন; উদ্দীষ্ট ব্যক্তিবর্গ দরিদ্র শ্রেণীর অংশ। গবেষকগণ শহর এলাকা থেকে এসে গ্রামে গবেষণা করেন। গবেষকগণ শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী, গবেষণার লক্ষ্য অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত গোষ্ঠী। ফলে গবেষকদের পক্ষে উদ্দীষ্ট ব্যক্তিবর্গের আস্থা অর্জন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। গবেষকের প্রতি বিশ্বাস না থাকলে সন্দেহপ্রবণ লক্ষ্যগোষ্ঠী অকপট এবং বস্তুনিষ্ঠ হতে পারেন না। অপরপক্ষে, গবেষকদের শিক্ষাদীক্ষা অধিক হওয়ায় তারা হয়তো অজ্ঞাতেই গবেষণার লক্ষ্যগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে ফেলেন এবং লক্ষ্যগোষ্ঠী গবেষকের মন যুগিয়ে কথা বলেন; সত্য ঘটনা আড়ালে পড়ে যায়। এই দুই সমস্যা ঘটলে গবেষণা বস্তুনিষ্ঠতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়। অসুবিধাগুলো দূর করার উদ্দেশ্যে কেউ কেউ অংশগ্রহণ গবেষণার সঙ্গে কার্যক্রম গবেষণার সমন্বয়ের কথা বলেন। নারী উন্নয়নে সরকার, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও বিদেশী সরকার ও প্রতিষ্ঠানের পর্যায়ে উন্নয়নশীল দেশে নানা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্পগুলোর সময়সীমা তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ এবং উদ্দীষ্ট জনগোষ্ঠীর আকার বেশ বড়। এগুলো বাস্তবায়নে সাধারণত স্থানীয়ভাবে জনগোষ্ঠী নিয়োগ করা হয়, যারা শিক্ষায় পেশাজীবী গবেষকদের চেয়ে অনেক খাঁটো। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী এই সব লোকবল উদ্দীষ্ট গোষ্ঠীর সঙ্গে গভীরভাবে মিলেমিলে কাজ করে। ফলে এদের বিশ্বাসযোগ্যতা বেশি এবং উদ্দীষ্ট গোষ্ঠীর সঙ্গে ব্যবধান কম থাকে। এদের মাধ্যমে গবেষণা চালালে এবং পেশাজীবী গবেষকগণ এদের সহায়তায় উদ্দীষ্ট গোষ্ঠীর সঙ্গে সংযোগ এবং সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করলে গবেষণা বাস্তবধর্মিতা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। কাজেই নারী উন্নয়নের প্রকল্প কার্যক্রমের একটি গবেষণা অংগ থাকা প্রয়োজন। কার্যক্রমের পাশাপাশি অংশগ্রহণ গবেষণা অন্তর্ভুক্ত করে গবেষণার মান উন্নয়ন করা বাঞ্ছনীয়।

নারীবিষয়ক গবেষণার সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক অর্থের সমস্যা। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে স্বেচ্ছামূলক নারী বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর গবেষণা চালানোর মত অর্থের অভাব প্রকট। সরকারের পক্ষেও গবেষণায় অর্থ প্রদানের ক্ষমতা অতিমাত্রায় সীমিত। তাছাড়া, সরকারী সাহায্য নিলে সরকারের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গবেষণা করতে হয়। উন্নয়নশীল দেশে গবেষণায় অর্থায়নের সবচেয়ে বড়, উৎস আন্তর্জাতিক ও দ্বিপাক্ষিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু বৈদেশিক সাহায্য এবং অনুদানের জন্য সকল আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও বিদেশী সরকারের নিজ নিজ নীতি, পন্থা ও পরিকল্পনা আছে এবং তাদের সকল সহায়তা ঐ নীতি ও পন্থার শর্তাধীন। শর্তাধীন গবেষণা কখনও নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ হতে পারে না। এ ধরণের গবেষণায় স্বভাবতঃই বিশ্বাসযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা ক্ষুণ্ন হয়ে থাকে।[২]

উইমিন্স্ স্টাডিজের আলোচ্য বিষয়

সকল সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাদের মতাদর্শিক ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপগুলোকে পরিবর্তন করা। অদৃশ্য নারীকে দৃশ্যমান করা এবং নারীকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসা সামাজিক প্রক্রিয়ায় নারীর অবদানের স্বীকৃতি, নিজস্ব জীবন, সংগ্রাম ও আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি। বিশ্বজুড়ে নারী আন্দোলন, নারীগোষ্ঠী, নারী সংগঠনগুলোর সংগ্রামকে সমর্থন ও শক্তিশালী করা। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক তথা

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

Dhaka University Institutional Repository

মানবজীবনের সব কর্মকাণ্ডে নারী ও পুরুষের তুলনামূলক অংশগ্রহণ কেমন হবে তা নির্ধারণ। জীবনের সকল ক্ষেত্রে জেণ্ডার বৈষম্যের কারণ, গতি প্রকৃতি, ব্যাপকতা এবং বিভিন্নরূপ পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা। এবং এগুলোর যুক্তিহীনতা, অসারতা ও অস্বাভাবিকতা নির্দেশ করা। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় নারীর ভূমিকা এর আলোচ্য বিষয়। বিভিন্ন শ্রেণীর নারীর উন্নয়ন কৌশল, নীতি নির্ধারণ এবং বাস্তবায়নের উপকরণগুলোর প্রতিফলন বিশ্লেষণ। শিল্পায়ন প্রযুক্তি হস্তান্তর, রপ্তানী নির্ভর অর্থনীতি, জাতীয় শ্রম শক্তি, শ্রম বিভাগ প্রভৃতি অর্থনৈতিক তৎপরতায় নারীর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত ভূমিকা পর্যালোচনা করা। সাহিত্যে, বিজ্ঞাপন, গণমাধ্যম, সিনেমা-টেলিভিশনে নারী ও পুরুষের পৃথক ভাবমূর্তি উইমিন্স্ স্টাডিজ এর আলোচ্য বিষয়। আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা ও অবস্থান। বিশ্বায়ন, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ক্ষমতার মেরুকরণ, বৃহৎ শক্তিগুলোর ক্ষমতার বলয় সৃষ্টি, পরাশক্তির খবরদারি, যুদ্ধ, আন্তর্জাতিক সংঘাত ও সন্ত্রাস বিশ্বজুড়ে যে সমস্যার সৃষ্টি করে চলেছে জ্ঞানের এই শাখা তার জেন্ডার চরিত্র বিশ্লেষণ করে। সর্বোপরি পুরুষ প্রাধান্য ও নারীর ক্ষমতাহীন অধস্তন অবস্থা বিশ্বজুড়ে নারী নির্যাতন প্রকট ও মারাত্মক করে তুলেছে। নারী নির্যাতনের মূলে রয়েছে নারীর ক্ষমতাহীনতা। নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী নির্যাতনের মূলোচ্ছেদ উইমিন্স্ স্টাডিজ-এর সর্বপ্রধান লক্ষ্য ও অভীষ্ট।

উইমিন্স্ স্টাডিজের সংজ্ঞা

উইমিন্স্ স্টাডিজ এর সংজ্ঞাকে নারী বিষয়ক গবেষণার মধ্যে সীমিত করা চলে না। জ্ঞানের এই শাখা বস্তুত নারী-পুরুষের সম্পর্ক সমাজে সমতাভিত্তিক, শান্তিপূর্ণ সংগঠন এবং উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করে। অতএব, উইমিন্স্ স্টাডিজ জ্ঞানের একটি শাখা যা জেণ্ডার নিয়ে আলোচনা করে। এই সংজ্ঞার কয়েকটি দিক আছে :[১]

(ক) জ্ঞানের যে সব শাখায় নারী সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রসঙ্গক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাদের সঙ্গে এই শাখার পার্থক্য এই যে, উইমিন্স্ স্টাডিজে সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্টভাবে জেণ্ডারের উপর আলোকপাত (specific focus on gender) করা হয়।

(খ) উইমিন্স্ স্টাডিজ এ জেণ্ডারকে জ্ঞানের একটি বিশ্লেষণধর্মী শ্রেণীবিভাগ (analytical category) হিসেবে বিবেচনা করা হয়; তবে জেণ্ডারকে বহু আলোচিত নরগোষ্ঠী (race), caste (বর্ণ) এবং অর্থনৈতিক শ্রেণী (class) প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ (category) থেকে ভিন্ন একটি অতিরিক্ত শ্রেণীবিভাগ হিসেবে গণ্য করা হয়।

(গ) নারী-পুরুষের মধ্যে বৈজ্ঞানিক, সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক পার্থক্যের রূপ ও গঠন চিহ্নিত করে উইমিন্স্ স্টাডিজ সমাজে নারী-পুরুষের পৃথক ও মিলিত অবস্থানের রূপরেখা দেয়।

(ঘ) নরগোষ্ঠী, বর্ণ ও অর্থনৈতিক শ্রেণী প্রভৃতি সামাজিক শ্রেণী বিভাগের প্রত্যকটির মধ্যে নারীকে উইমিন্স্ স্টাডিজ নির্যাতিত গোষ্ঠী গণ্য করে।

(ঙ) উইমিন্স্ স্টাডিজ জেণ্ডারের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক সম্পর্কগুলো ও সামাজিক ভেদাভেদগুলো উদ্ঘাটন করে জেণ্ডার ও সমাজের পারস্পরিক স্বভাব (reciprocal nature) অনুধাবনের পরিবেশ সৃষ্টি করে।

উইমিন্স্ স্টাডিজ -এর পরিধি

উইমিন্স্ স্টাডিজ -এর পরিধি ব্যাপক। Bina Agarwal Women Studies in Asia and the Pacific নিবন্ধে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো চিহ্নিত করেছেন–

সামাজিক মর্যাদা ও নারী : বাংলাদেশে শৈশব থেকেই নারীদের প্রতি মর্যাদা দেয়া হয় না। পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে উৎসবের আয়োজন করা হলেও কন্যা সন্তানের জন্য কোন উৎসব পালিত হয় না। এই কন্যা সন্তান যখন বড় হতে থাকে তখন সংসারের নিয়মকানুন ও পরিবেশ-পরিস্থিতি থেকে সহজেই বুঝতে পারে যে, সে পরিবারের

[১] মাহমুদা ইসলাম, *নারীবাদী চিন্তা ও নারী জীবন* (ঢাকা : জে.কে.প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স, মে ২০০৫ খৃস্টাব্দ), পৃ. ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

জন্য বোঝাস্বরূপ। ফলে তারা সামাজিক দিক থেকে পুরুষদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। বস্তুত তাদের পরনির্ভরশীলতা চলতে থাকে পর্যায়ক্রমে সারাজীবন ধরেই। যেমন, তাদেরকে জীবনের প্রথমাবস্থায় পিতা, দ্বিতীয় ও মধ্য বয়সে স্বামী এবং জীবনের শেষাংশে ছেলে সন্তানের উপর নির্ভর করতে হয়।[১] সুতরাং প্রত্যেকটি সম্পর্ক পুরুষেরাই সমাজের প্রধান ব্যক্তি এবং নারীরা তাদের অধীনস্ত তাদেরকে এ ধারণা দেয়। পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় সে শুধু ভোগের সামগ্রী হিসেবে পরিণত হয়ে এসেছে। গৃহস্থালী কর্ম-সম্পাদন, সন্তান গর্ভধারণ, জন্মদান, লালন-পালন এটাই যেন নারীর কর্মধারা। এই ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য তার চারপাশে অবরোধের জাল তৈরী করা হয়। এ জন্য পুরুষেরা ব্যবহার করে ধর্মের নামে গোড়ামী, সামাজিক কুসংস্কার, অজ্ঞতা, নারীর দুর্বলতা ও অসহায়ত্বকে।[২] এদিকে বাঙালী মুসলিম সমাজ নারীকে চিরকালই অন্দর মহলের বাসিন্দা বলে গণ্য করেছে। নারীদের একমাত্র ভূমিকা ছিল গৃহিণী ও জননী হিসেবে। নারীদের সামাজিক মর্যাদা পুরুষের মতই এ রকম স্বীকৃতি পুরুষেরা কোনো দিনও দেয়নি। এ পরিপ্রেক্ষিতে পুরুষ সমাজ ব্যবস্থায় নারীদেরকে নিম্ন মর্যাদাসম্পন্ন নাগরিক হিসেবে বসবাস করতে হত।

অর্থনৈতিক তৎপরতা ও নারী

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে নারীর অবদান অনেক। উৎপাদনের নানা শাখায় তার উপস্থিতি ব্যাপক। নারীর এই অবদান সমাজের কাছে স্বীকৃত নয়। সংকীর্ণ সামাজিক মূল্যবোধ এবং রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা নারীর অগ্রগতিকে পদে পদে বাধাগ্রস্থ করেছে। সে কারণে পুরুষের তুলনায় নারী পিছিয়ে আছে অনেক দূরে।[৩] তাছাড়া বাংলাদেশের মতো একটি পরনির্ভরশীল দেশে আত্ম-নির্ভরশীলতা অর্জনের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। শুধু জাতীয়ভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রেই নয়, সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও। তাই বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর কর্মের ব্যবস্থাকরণ ও সুযোগ-সুবিধার কথা উল্লেখ রয়েছে এভাবে- "Work is right, a duty and a matter of honour for every citizen who is capable of working and every one shall be paid for his work on the basis of the principle from each accorrding to his abilities to each according to his Work."[৪] এছাড়া অনুচ্ছেদ ২৯(১) এ বলা হয়েছে- "There shall be equality of opportunity for all citizens in respect of employment or office on the service of Bangladesh. No citizen shall on grounds only of religion, race, caste, sex or place of birth, be incligible for, or discriminated against in respect of any employment or office in the service of the Republic."[৫] যদিও বাংলাদেশের সংবিধানে নারীদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান সুযোগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সকল নাগরিক তার ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী অধিক মজুরী পাবে, কিন্তু বাস্তবে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ পরিলক্ষিত হয়। সাম্প্রতিক প্রবণতায় দেখা যাচ্ছে, বাজার অর্থনীতি বাংলাদেশের নারীরা ক্রমবর্ধমান হারে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছে। যেমন, এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৯১ সালে মোট শ্রমশক্তির অর্ধেক ছিলেন নারী (২ কোটি)। এর মধ্যে ব্যয় সাশ্রয়ী

---

১. জাহান, রওশন, *বাংলাদেশের নারী* (ঢাকা : বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ১৯৭০ খৃস্টাব্দ), পৃ. ১ ; ড. আব্দুল কুদ্দুস ও জহিরুল হক শাকিল, *বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর ক্ষমতায়নঃ সমস্যা ও সম্ভবনা* (ঢাকা : বাতায়ন প্রকাশন, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, জুন ২০০৩ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৭৫।

২. রওশন জাহান, *বাংলাদেশের নারী* (ঢাকা : বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ ১৯৭০ খৃস্টাব্দ), পৃ. ১; *বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পেক্ষাপটে নারীর ক্ষমতায়ন : সমস্যা ও সম্ভবনা*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৫।

৩. Ayesha Noman, *Status of Women and Fertility in Bangladesh* (Dhaka : University Press Limited, 1984), P.5.

৪. তাহমিনা আক্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

৫. Article-20, *The Constitution of the Peoples Republic of Bangladesh.* Ibid.

Dhaka University Institutional Repository

গৃহস্থালী কর্মকাণ্ডেও ছিল। নারী শ্রম শক্তির ৮৩ শতাংশ হচ্ছে অবৈতনিক গৃহস্থালী শ্রমিক, ১০ শতাংশ আত্মকর্মসংস্থান, ৪.৫ শতাংশ বেতনভূক্ত শ্রমিক এবং ৩ শতাংশ দিন মজুর। শহরাঞ্চলে ২৬ শতাংশ কর্মজীবি নারী ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে কর্মরত। উৎপাদন কাজের ক্ষেত্রে ৮৮ শতাংশ নারী কৃষি খাতে কর্মরত। ৫ শতাংশ উৎপাদন খাতে, ৪ শতাংশ সেবা খাতে এবং মাত্র ১.৭ শতাংশ পেশাদারী বা কারিগরি খাতে নিয়োজিত।[১]

মজুরী কাঠামো ও নারী

পুরুষ ও নারীদের শুধু কর্মক্ষেত্রেই বৈষম্য নয়; মজুরীগত বৈষম্যও প্রকট। কর্মক্ষেত্রের বৈষম্য, পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের কারণে নারীরা তাদের শ্রমের বিনিময়ে পুরুষের তুলনায় অনেক কম মজুরী পেয়ে থাকে। গ্রামীণ নারীদের সিংহভাগ মজুরীহীন, নগদ আয়শূন্য বা নগণ্য মজুরী সম্পূর্ণ। গৃহভিত্তিক ধান ও শস্য প্রক্রিয়াজাত কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত। পরিসংখ্যানগত তথ্যে দেখা যায় যে, পারিবারিক কাজে সাহায্যকারী হিসেবে (Unpaid Family Helper) নিয়োজিত রয়েছে শ্রমশক্তির ৪৫.৮%। এর মধ্যে পুরুষদের হার হচ্ছে মাত্র ১৯.৮% এবং নারীদের হার হচ্ছে ৮২.৫%।[২] উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নারীদের বিরাট ভূমিকা থাকা সত্বেও তার মূল্যায়ন করা হয় না। পুরুষদের উৎপাদিত খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে নারীরা তাদের অসমাপ্ত কাজটি সমাপ্ত করে। অথচ এই কাজ পুরুষশাসিত সমাজে উৎপাদনশীল শ্রম বলে বিবেচিত হয়না। তাছাড়া নারীদের কাজের মজুরীর হারও পুরুষদের কাজের অর্ধেক। এক নারী বিষয়ক গবেষণার রিপোর্টে দেখা যায়, নারীদের একই আর্থিক মূল্য সম উৎপাদন কাজকে জাতীয় অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। তাই নারীদের মজুরীমান এত কম যে, সারাদিন কাজের পরও তারা এক পেট ভাত ছাড়া কিছুই পায় না।[৩] তাছাড়া কর্মক্ষেত্রে নারীদের কাজের নিশ্চয়তা নেই, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে যে সময়ের ওভারটাইম দিয়ে তাদের কাজ করিয়ে নেওয়া হয় তার তুলনায় অনেক কম টাকা তাদের দেওয়া হয়। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, কম বেতনভুক্ত কর্মসংস্থানে নারীদের প্রাধান্য বেশি অথচ পুরুষদের প্রাধান্য খুবই কম। অপরদিকে বেশি মজুরী বা বেতনের কর্মে পুরুষদের প্রাধান্য বেশি কিন্তু নারীদের হার একেবারেই নগণ্য। নিচে এ সংক্রান্ত একটি সারণী তুলে ধরা হলো :[৪]

সারণী : সাপ্তাহিক আয়, জেণ্ডার ও স্থান অনুযায়ী বেতনভূক্ত কর্মচারীর শতকরা হার

সাপ্তাহিক	মোট			শহর			গ্রাম		
আয় (টাকায়)	উভয়	পুরুষ	ইারী	উভয়	পুরুষ	নারী	উভয়	পুরুষ	নারী
মোট	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
২৫০	২১.৪	১১.৯	৫১.৬	১৬.৮	৭.০	১৩.৯	২৬.৫	১৬.৮	৬১.৬
২৫০-৫০০	৩২.২	৩৩.৮	২৭.০	৩০.৬	৩০.৯	২৯.৯	৩৩.৮	৩৬.৮	২৩.১
৫০১-১৭৫	১৭.৩	১৯.৮	৯.৩	১৭.০	২০.০	৯.৫	১৭.৭	২০.০	৯.২
৭৫১-৮৫০	৫.০	৫.৭	২.৭	৪.৪	৫.০	২.৯	৫.৬	৬.৪	২.৫
৮৫১-৯৫০	২.৭	৩.০	১.৮	২.৭	৩.০	১.৯	২.৮	৩.০	১.৮
৯৫১-১০৫০	৬.০	৭.১	২.৮	৭.৬	৮.৭	৪.৭	৪.৩	৫.৪	০.৩
১০৫১-১১৫০	০.৭	০.৯	০.১	০.৮	০.৯	০.২	০.৬	০.৮	
১১৫১+	১৪.৭	১৭.৮	৪.৭	২০.১	২৪.৮	৭.১	৮.৭	১০.৭	১.৫

১. Article-29, Ibid.

২. *বাংলাদেশের নারীর অবস্থান প্রতিবেদন, (খসড়া)* (ঢাকা : বেইজিং এনজিও ফোরাম '৯৫ সংক্রান্ত জাতীয় প্রস্তুতি কমিটি, বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খৃস্টাব্দ, পৃ. ৯)।

৩. বোরহান উদ্দিন খাঁন জাহাঙ্গীর এবং খান জরিনা রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

৪. তাহমিনা আক্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

Dhaka University Institutional Repository

উৎস : Bangladesh Bureau of Statistics Report on Labour Force Survey 1995-96, December, 1996, P.53.

উপরের সারণীতে দেখা যায়, ২শ' ৫০ টাকা বেতন কাঠামোতে সবচেয়ে বেশি নারী শ্রমিক (৫১.৬%) নিয়োজিত এবং ১ হাজার ১শ' ৫০ টাকা বেতন কাঠামোতে নারীদের হার মাত্র ০.১%। অপরদিকে, বেশি বেতন কাঠামোতে পুরুষদের হারও বেশি। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নারীদের কম বেতন বা মজুরী দেওয়া হয়।

অপর একটি পরিসংখ্যানেও এই চিত্র ফুটে ওঠে। নিম্নে তা তুলে ধরা হলো :[১]

সারণী : বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত লিঙ্গভিত্তিক গড় আয়ের বিন্যাস

সাপ্তাহিক গড় আয় (টাকায়)	কৃষি শ্রমিক		কৃষি বহির্ভূত শ্রমিক	
	পুরুষ (%)	নারী (%)	পুরুষ (%)	নারী (%)
৫০ টাকার নীচে	৪৭.৯	৬৩.৫	১০.৮	৩১.৩
৫১-১০০	৪৩.৩	৩৬.৫	৩৫.৫	৬২.৫
১০১-১৫০	৬.১	---	২২.০	---
১৫১-২০০	২.১	---	১০.০	৬.৩
২০১-তদুর্ধ্ব	০.৬	---	২১.৬	---

উৎস : Bangladesh Bureau of Statistics, Statistical Year Book of Bangladesh, 1982.

উপরিউক্ত তথ্যে দেখা যায় যে, কৃষিক্ষেত্রে ১০১-তদুর্ধ্ব টাকার মধ্যে যাদের সাপ্তাহিক আয় এরূপ শ্রেণীর মধ্যে নারী নেই। ৫-১০০ টাকার মধ্যে শতকরা ১০০ জন নারীর সাপ্তাহিক আয়। অপরদিকে, কৃষি বহির্ভূত কাজে সাপ্তাহিক ২০১-তদুর্ধ্ব টাকার মধ্যে নারীর সংখ্যা নেই। তবে পুরুষদের সংখ্যা হয়েছে শতকরা ২১.৬ জন। ৫১-১০০ টাকার মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক নারীর অবস্থান, এদের হার ৬২.৫%।

তাছাড়া, পেনশন বা বৃদ্ধ বয়সে নারীর সামাজিক নিরাপত্তার সুবিধা নেই। একই পেশায় পুরুষ-নারীর মজুরীর তারতম্য একটি স্বাভাবিক ব্যাপার বলে বর্তমান সমাজে মনে করা হয়। তাছাড়া ব্যক্তি মালিকানাধীন উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলোতে দেখা যায় যে, নারীর চেয়ে পুরুষের নিয়োগকে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়। আর একই কাজের জন্য নারী পুরুষের তুলনায় কম মজুরী পেয়ে থাকেন। এমন অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে পুরুষকে যাতে বেশী মজুরী দিতে না হয় কিংবা কমসংখ্যক পুরুষের মজুরীতে যাতে বেশী সংখ্যক নারী শ্রমিককে ব্যবহার করা যায় সে ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়া নারীদেরকে পুরুষের তুলনায় অতি সহজেই কর্মচ্যুত করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, পোষাক কারখানাগুলো ব্যাপকভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে হাজার হাজার নারী কর্মহীন হলেও তারা কারখানা মালিকদের বিরুদ্ধে কোন সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের সৃষ্টি করতে পারেনি।[২] তাছাড়া তাদের প্রতি মালিক কর্তৃপক্ষের আচরণ অমানবিকই শুধু নয়; অসহনীয়ও বটে। শ্রমঘন্টা অনুযায়ী তাদের মজুরী দেয়া হয় না। যা আইএলও নীতির সুস্পষ্ট লংঘনই নয়, সকল ধরনের নিয়মনীতি বর্জিতও। এমনকি বিদেশ থেকে কাজের অর্ডার না আসলে কারখানার শ্রমিকদের মজুরি বন্ধ রাখা হয়।[৩]

আবার বাংলাদেশের নারীদের কর্মকালীন সময়কে পরিসংখ্যানগত পরিমাপে আনা অত্যন্ত কঠিন। কারণ বাংলাদেশে প্রত্যেকটি নারীকে কমবেশি আয়শূন্য গৃহজাত উৎপাদন কাজে বেশির ভাগ সময় নষ্ট করতে হয়।

---

১. *Bangladesh Bureau of Statistics on Labour Force Survey 1985-96,* (Dhaka: December 1996), P.53.; *বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর ক্ষমতায়ন : সমস্যা ও সম্ভবনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।

২. Bangladesh Bureau of Statistics, Statistical Year Book of Bangladesh, 1982. p.54; প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩)।

৩. তাহমিনা আক্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া শস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, গৃহভিত্তিক পশুপালন, রক্ষণাবেক্ষণ, শাকসব্জি উৎপাদন প্রভৃতি কাজও নারীদের করতে হয়, যা অর্থনৈতিক মানদণ্ডে মূল্যহীন এবং জাতীয়ভাবে জিডিপিতে ধরা হয় না। ফলে এসব কাজে নারীদের শ্রমের মূল্যকে মূল্যায়িত করা হচ্ছে না।[১] এক গবেষণায় দেখা যায় যে, গ্রামে ৩.২ হেক্টরের কম জমি সম্পন্ন পরিবারের নারীরা তাদের কর্মসময়ের ৭০% (প্রতিদিন ৫.৬২ ঘন্টা) নগদ আয়শূন্য গৃহজাত উৎপাদনে ব্যয় করে থাকে। ৩.২ হেক্টরের বেশি জমি সম্পন্ন পরিবারে নারীরা তাদের কর্মসময়ের ৮৮% (প্রতিদিন ৭.৫২ ঘন্টা) ব্যয় করে নগদ আয়শূন্য গৃহজাত উৎপাদনে। এ থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, নারীদের কাজের বেশির ভাগই বাজারের আওতায় আসে না এবং নগদ আয় সৃষ্টি করে না। আবশ্যিকভাবে এটা নারীদেরকে পুরুষদের উপর নির্ভরশীল করে রাখে। যদিও তাদের ব্যয়িত কর্মসময় পুরুষদের ব্যয়িত কর্মসময়ের কাছাকাছি।[২] এছাড়া যে সব নারী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সরাসরি জড়িত রয়েছে তাদেরকেও গৃহাস্থলীর স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকতে হয়। এরূপ নারীদের দৈনিক ১০ থেকে ১৬ ঘন্টা কাজ করতে হয়। কিন্তু অফিসিয়ালভাবে উল্লেখ করা হয় ৫০% নারী সপ্তাহে ৪০ ঘন্টা বা তার নিচে কাজ করে থাকে।[৩] সুতরাং নারীদের কর্মকাণ্ডের সময় দু'ভাবে ব্যয়িত হয়।

১.গৃহকেন্দ্রীক কর্মকাণ্ড : শিশু পরিচর্যা এর আওতাভুক্ত, যা উৎপাদনশীল হিসেবে বিবেচিত হয় না এবং তার জন্য কোন অফিসিয়াল রেকর্ড নেই।

২.গৃহ বহির্ভূত কর্মকাণ্ড : উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সরাসরি যেসব নারী কর্মে নিয়োজিত সেসব নারীদের কর্মকালীন সময় নীচের সারণীর মাধ্যমে উপস্থাপিত হলো :[৪]

সারণী ঃ গ্রামীণ কৃষি ও কৃষি বহির্ভূত শ্রমিকদের কাজ করার সাপ্তাহিক সময়ের বিবরণ (লিঙ্গভিত্তিক)

কর্ম ঘন্টা	কৃষি		কৃষি বহির্ভূত	
	পুরুষ (%)	নারী (%)	পুরুষ (%)	নারী (%)
২০ ঘন্টার নীচে	৪.৩	৭.৮	২.৬	১০.০
২০-৩৯	১৭.৪	৩৩.৯	১৮.৭	৫০.০
৪০-৫৯	৪২.৪	৩৬.৫	৫৮.৬	২০.০
৬০-তদুর্ধ্ব	৩৫.০	২১.৭	১০.১২	২০.০

উৎস : 1980 Manpower Survey, Statistical Pocket Book Bangladesh, Bangladesh Bureau of Statistics, 1983, Tables 4.9 and 4.11, p.169-170.

উপরের সারণীতে দেখা যায়, ২০-৩৯ ঘন্টা সপ্তাহে কাজ করে এরূপ কৃষিকাজে নিয়োজিত নারীদের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ৩৩.৯ জন। অপরদিকে, কৃষি বহির্ভূত কাজে নিযুক্তদের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ৫০ জন। সপ্তাহে ৪০-৫৯ ঘন্টা কাজ করে এরূপ কৃষি কাজে ও কৃষি বহির্ভূত কাজে নিয়োজিত নারীর সংখ্যা হচ্ছে যথাক্রমে শতকরা ৩৬.৫ জন এবং ২০ জন। এক্ষেত্রে পুরুষদের সংখ্যা হচ্ছে কৃষি কাজে এবং কৃষি বহির্ভূত কাজে যথাক্রমে ৪২.৪ জন এবং ৫৮.৬ জন। ৬০-তদুর্ধ্ব কৃষি বহির্ভূত কাজের ক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় নারী শ্রমিক প্রায় দ্বিগুণ। নারী শ্রমিকদের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ২০ জন। অপরদিকে, পুরুষের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ১০.১২ জন। তবে কৃষিকাজে নিয়োজিত ৬০ ঘন্টা বা তদুর্ধ্ব সময়ের ক্ষেত্রে পুরুষদের সংখ্যা নারীদের তুলনায় কিছুটা বেশি। উপরের পরিসংখ্যানগত চিত্রে, শুধু কৃষি এবং কৃষি বহির্ভূত কাজে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের শ্রম ঘন্টা দেখানো

---

১. গাউসুর রহমান, *নারী শ্রমিকরা কি গিনিপিগ?* (ঢাকা : ভোরের কাগজ, ২ মার্চ, ১৯৯৯ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৩।

২. তাহমিনা আক্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

৩. Akanda, Latifa and Jahan, Roushan, *Women for Women Collocted Articles,* 1982, PP. 13-14.

৪. তাহমিনা আক্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের গৃহস্থালী উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ড এবং গৃহকর্মকাণ্ড (Homestead Productivity Activities and Essential Household Tasks) এবং ব্যয়িত সময়কে আওতাভুক্ত করা হয়নি। যদি নারীদের এই সময়কে পরিসংখ্যানগতভাবে রেকর্ড করা হতো তাহলে প্রত্যেকটি নারীর কর্মকালীন সময় প্রায় পুরুষদের দ্বিগুণ হতো। উৎপাদন ব্যবহৃত শ্রম সময় (Labour Time) এবং উৎপাদন সময়ের মধ্যে যোগসূত্র ক্ষীণ, সেজন্য কিছু সময় শ্রমনিবিড় কর্মকাণ্ড পুরুষদের সঙ্গে নারীর শ্রমও দরকার পড়ে।[১] এদিকে গ্রামীণ নারীরা প্রতিদিন ১৪-১৬ ঘন্টা কাজ করে থাকে। এই কাজের একটা অংশ হচ্ছে বেতনহীন । অপর অংশ হচ্ছে নারী শ্রমের সাথে অর্থমূল্যের সংযোগহীনতা। যার কারণে গ্রামে নারীর ক্রমবর্ধমানভাবে অর্থনৈতিক সামাজিক পরিসরে প্রান্তিক অবস্থানে অবস্থান করছে।[২] সুতরাং সমাজে লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাজনবোধ বিদ্যমান, গৃহাভ্যন্তরের কাজ নারীর জন্য বরাদ্দ, যার কোন গুরুত্ব ও অর্থনৈতিক মূল্য নেই, কোন নির্দিষ্টতা নেই, নেই কোন অবসর। অপরদিকে, পুরুষের কাজ বাইরে। যার অর্থনৈতিক মূল্য থাকাতে গুরুত্বপূর্ণ। এই কাজের নির্দিষ্টতা আছে, আছে অবসর। কাজের আর্থিক মূল্য ও সুযোগ-সুবিধা থাকায় পক্ষপাতিত্ব সবই পুরুষের অনুকূলে।

সম্পত্তি ও নারী

নারী বর্তমানেও সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে অধিকার প্রয়োগের অধিকারী নয়। এমনকি নিজেদের সাংসারিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও স্বীকৃত হয় না বললেই চলে। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো অধিকারহীনতা অন্যক্ষেত্রে। আইনগতভাবে সাধারণ অধিকার কোথাও কোথাও কিছু থাকলেও নারীরা পরিবারের (পিতা বা স্বামীর) সম্পত্তির অধিকার ভোগ করতে পারে না।[৩] আর বাংলাদেশের নারীদের প্রান্তিক অবস্থানের পেছনে একটি ক্রিয়াশীল উপাদান হচ্ছে উত্তরাধিকার প্রথা বা সম্পত্তির মালিকানা। মুসলমান সমাজে কন্যা সন্তান পুরুষ সন্তানের চেয়ে পিতৃ সম্পত্তির অংশ কম পায় এবং স্ত্রী স্বামীর অবর্তমানে সন্তান সন্তুতিদের চেয়ে স্বামীর সম্পত্তি অংশ কম পায়।[৪] হিন্দু সমাজে তো পিতার সম্পত্তিতে কন্যা সন্তানের অধিকার নেই। ধর্ম স্বীকৃত এই উত্তরাধিকার প্রথা পিতৃতন্ত্রের নারীদের পদস্তর সৃষ্টি করে। তাছাড়া সামাজিক ক্ষেত্রে সম্পদ যাদের হাতে কেন্দ্রীভূত তারাই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বেশী রাখে। গ্রামীণ সমাজে ভূমির মালিকদের হাতে থাকে সমাজের ক্ষমতা এবং তারাই সমাজের যেকোন ব্যাপারে এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। বাংলাদেশে ভূমি ও এর ব্যবস্থাপনা পুরুষদের হাতে কেন্দ্রীভূত, নারীদের হাতে নয় যা পুরুষদেরকে ক্ষমতাধিকারী করে তোলে। ক্ষমতা এমনই একটি ব্যাপার, যা সব দুর্বলের উপর প্রতিনিয়তই প্রয়োগ করে থাকে।[৫] অন্যভাবে বলা যায়, আমাদের সমাজে (বিশেষতঃ পল্লী এলাকায়) যে কারও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ বা ক্ষমতায়নের পূর্বশর্ত হলো স্থাবর সম্পত্তিতে তার কতটুকু বাস্তব অধিকার আছে সেটা।[৬] আর সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অধিকার বাড়ানোর জন্য ভূমির উপর তার অধিকার প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। ঐতিহাসিকভাবে আমাদের সমাজে ভূমি অধিকার মর্যাদার প্রতীকও বটে। কোথাও কোথাও এমনও আছে, নারী ভূমির আইনগত মালিক। কিন্তু ঐ সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করছে তার স্বজন পুরুষরা। 'নিয়ন্ত্রণ' মানে এক খণ্ড ভূমি কীভাবে ব্যবহার হবে, কোন সময়ে কী উৎপাদিত হবে, প্রভৃতি সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার। বস্তুত আইন ব্যবস্থাকে যদি আমরা সাধারণ মানুষের লোকজ আইনগত চর্চা বা 'Living Law'

---

১. 1980 Manpower Survey, Statistical Pocket book of Bangladesh, Bangladesh Bureau of Statisties, 1983, Tables 4.9 and 4.11, pp. 169-170; *বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর ক্ষমতায়ন : সমস্যা ও সম্ভবনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫।

২. তাহমিনা আক্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

৩. বোরহান উদ্দিন খাঁন জাহাঙ্গীর, এবং খাঁন জরিনা রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২।

৪. *বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর ক্ষমতায়ন : সমস্যা ও সম্ভবনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬।

৫. বিনোদ দাশগুপ্ত, *নারী অধিকার আজো সম্পূর্ণ অস্বীকৃত* (ঢাকা : আজকের কাগজ, ২৬ জানুয়ারী, ১৯৯৮ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৩।

৬. আক্তার, তাহমিনা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

এবং প্রকৃত আইন বা 'Lawyers Law'-এই দু'ভাবে ভাগ করি তাহলে দেখবো বাংলাদেশের সমাজ জীবনে এখনও প্রথমোক্তটিরই দাপট লক্ষণীয়।[১] সম্পত্তির অধিকার প্রতিষ্ঠায় নারী সমাজ অনেক আন্দোলনও করেছে। তেভাগা আন্দোলন তন্মধ্যে অন্যতম। গঠন বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তেভাগার নারী বাহিনীকে 'আধা মিলিশিয়া' হিসেবে আখ্যা দেওয়া যায়। আর এ আন্দোলন নারীকে অর্থনৈতিক অধিকার লাভে এবং স্ত্রীদের নিপীড়ন থেকে মুক্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে সুফল প্রদান করে।[২] সামগ্রিক এই পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশী এক গবেষক[৩] মন্তব্য করেছেন, 'তেভাগা আন্দোলন পর্যালোচনা থেকে পাওয়া সবচেয়ে বড় শিক্ষা এবং সর্বাধিক উদ্দীপক সত্য হল, বাংলার বিপ্লব হওয়া উচিত ভূমিহীন দরিদ্র কৃষক নারীদের নেতৃত্বে। এরাই নেতৃত্ব দেওয়ার পক্ষে সবচেয়ে বেশি উপযোগী।'[৪]

দারিদ্র ও নারীর অবস্থান

বাংলাদেশে ১৯৯১ সালে মোট জনসংখ্যার ৪৮ শতাংশের অবস্থান ছিল দারিদ্র সীমার নিচে। আর এই দারিদ্রতার প্রভাব ভারসাম্যহীনভাবে পতিত হয় নারীর ওপর। তাছাড়া দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর দুই-তৃতীয়াংশই নারী।[৫] মোট পরিবারের ১৫ থেকে ২০ শতাংশের প্রধান নারী। পশ্চাৎপদ নারী প্রধান পরিবারগুলোর গড় আয় জাতীয় পারিবারিক আয়ের মাত্র ৫৫ শতাংশ। প্রায় ৯৬ শতাংশ নারী প্রধান পরিবারের বসবাস দারিদ্রসীমার নীচে। এদের মধ্যে ৩৩ শতাংশ পরিবার চরম দরিদ্র, যারা অনবরত খাদ্য সংকটে ভোগে। নারীদের দারিদ্রতা সমাজ সৃষ্ট। যেমন : সম্পদের অসম বন্টন, লিঙ্গভেদে অসম ক্ষমতা বণ্টন, নারীর ওপর অতিরিক্ত কাজের বোঝা এবং সেই কাজের স্বীকৃতি না দেওয়া, বিভিন্ন সেবা লাভে তাদের সীমিত সুযোগ, গৃহসংস্থান এবং বিনোদন ও শিক্ষাক্ষেত্রে বঞ্চিত হওয়া, মৌলিক মানবাধিকারটুকু না পাওয়া ইত্যাদি। এসব দিক থেকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে প্রবীণ নারী, অল্প বয়স্ক বালিকা, গ্রামীণ ও সংখ্যালঘু নারী। এদিকে দারিদ্রের দুষ্টচক্র থেকে নারীকে বের করে আনার লক্ষ্যে সরকারী ও বে-সরকারী পর্যায়ে গৃহীত হয়েছে বিভিন্ন কর্মসূচী।[৬] আর নারীর স্থায়ী অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য প্রয়োজন সম্পদের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং বাজার ও বিপননে নারীর প্রবেশযোগ্যতা বৃদ্ধির সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি।

শিক্ষাগত অবস্থান ও নারী

প্রখ্যাত তাত্ত্বিক পাওলো ফ্রেইর এর মতে, "শিক্ষা হচ্ছে সেই রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ যার মাধ্যমে মানুষ নিষ্ক্রিয়তার পরিবর্তে অংশগ্রহণ এবং প্রতিবিধানের নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ও অভ্যাস গড়ে তোলে।"[৭] মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ, দায়িত্ববোধ, অধিকার সংরক্ষণ, নাগরিক চেতনাবোধ সৃষ্টি ও জাতীয় উন্নয়নের অপরিহার্য মৌলিক উপাদান হচ্ছে শিক্ষা। বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে নারী-পুরুষের অসমতা দূরীকরণ এবং সব ক্ষেত্রে নারীদের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে নারী শিক্ষার গুরুত্ব সর্বাধিক। যেকোন দেশের মানব সম্পদকে পরিপূর্ণ

---

১. আলতাফ পারভেজ, *বাংলাদেশের নারী : একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ* (ঢাকা : জন অধিকার, ২০০০ খৃস্টাব্দ), পৃ. ১-১৫।

২. William Van Schendel, Kristen Westergaard (eds), *Gender and the Inheritance of Land: Living Law in Bangladesh : Bangladesh in the 1990's* (Dhaka : University Press Ltd, Dhaka, 1997.), pp. 10-66.

৩. *বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর ক্ষমতায়ন : সমস্যা ও সম্ভবনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬।

৪. আলতাফ পারভেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।

৫. *বাংলাদেশের নারীর অবস্থান প্রতিবেদন (খসড়া)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

৬. *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ১৯৯৭ এর পটভূমি* (ঢাকা : মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯৭ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৯।

৭. আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ২০০১, উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকা, *'আজকের মেয়ে, কালকের নারী'* (ঢাকা : মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ২০০০ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৮-২০।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহার এবং উন্নয়নের জন্য নারী শিক্ষা আবশ্যক।[১] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানেও শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতার কথা বলা হয়েছে। ১৯৯০ সালে থাইল্যান্ডে 'Education for All' বা 'সবার জন্য শিক্ষা' বিষয়ে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, এর ঘোষণাপত্রে বাংলাদেশ অন্যতম সাক্ষরকারী। এ শতক শেষ হওয়ার আগেই ৮০ শতাংশ ছেলেমেয়েকে মৌলিক অধিকারের কারণে শিক্ষিত সমাজ গড়ে তোলার জন্য নারী শিক্ষার প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ করা প্রয়োজন।[২] বাংলাদেশে নারী উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ একটি খাত হলো শিক্ষা।[৩] যেহেতু শিক্ষা মানুষের জন্মগত মৌলিক মানবাধিকার, যা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত এবং অর্ধেক জনগোষ্টিকে দিয়ে জাতীয় উন্নয়ন অসম্ভব সেহেতু পুরুষের পাশাপাশি নারীকেও শিক্ষিত করা অপরিহার্য। তাছাড়া বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে সমাজে নারী-পুরুষের অসমতা দূরীকরণ এবং নারীদের অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের ক্ষেত্রে নারী শিক্ষার গুরুত্ব সর্বাধিক। কিন্তু এক্ষেত্রে বৈষম্যের চেহারাই প্রকট। এই অশিক্ষার একটা পরোক্ষ ফলাফল হলো নারীর জীবন-যাপনে নিম্নমান এবং সব সুযোগে তার প্রান্তিকতা। জন্মহার ও শিশু মৃত্যুসহ অনেক বিষয়ে এর প্রত্যক্ষ প্রভাবও রয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না পাওয়ার কারণে 'মা'-ই নারীদের জন্য 'তথ্যসূত্র' হিসেবে থেকে যায়। ফলে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল পৃথিবী তার সম্মুখে আর উন্মোচিত হয় না। নিচের সারণীতে এ সংক্রান্ত কিছু তথ্য তুলে ধরা হলো-

সারণী : শিক্ষার লিঙ্গ ভিত্তিক অসামঞ্জস্যতা[৪]

	পুরুষ (%)	**নারী (%)**
শিক্ষিতের হার (১৫ বছর)	৪৫.৫	২৪.২
বিদ্যালয়ে ভর্তির হার		
প্রাথমিক	৭৭.৭	৬১.৪
মাধ্যমিক	৩২.০	১৫.০
মাধ্যমিক উত্তর	১২.২	২.৩
ঝরে পড়ার হার		
প্রাথমিক	৫৮.৩	৫৪.৩
মাধ্যমিক	৫৭.৬	৬৫.৮
শিক্ষকের হার		
প্রাথমিক	৮০.০	২০.০
মাধ্যমিক	৮৮.৭	১১.৩
মাধ্যমিক উত্তর	৮৭.৪	১২.৬

উৎস : Bangladesh Bureau of Statistics, Women and Men in Bangladesh, Facts and Figures, UNICE, 1992, Situation Analysis of Children and Women in Bangladesh, 1992.

উপরের পরিসংখ্যানে কিছু ইতিবাচক অগ্রগতি ঘটেছে বলে সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষায় জড়িত এনজিও জোট 'Campaign for Popular Education' তাদের 'Education Catch' 1999 রিপোর্টে বলেছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এখন ঝরে পড়ার হার ছেলেদের ক্ষেত্রে ২৮ শতাংশ এবং মেয়েদের

---

১. ভূইয়া আবুল হোসেইন আহমেদ, *নারী ও সমাজ : বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিত ক্ষমতায়ন* (ঢাকা : উইমেন ফর উইমেন, সংখ্যা-১, ১৯৯৬ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৩৭।

২. অনুচ্ছেদ-১৭, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*।

৩. *নারী ও সমাজ : বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

৪. *বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর ক্ষমতায়ন : সমস্যা ও সম্ভবনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

২৬.৬ শতাংশ। তবে শ্রেণীকক্ষে মেয়েদের গড় উপস্থিতি এখনো অনেক কম যা ৬২ শতাংশ।[১] এছাড়াও বাংলাদেশে প্রাপ্ত বয়স্ক সাক্ষরতার হার পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সেখানে নারী-পুরুষ চরম অসমতা বিরাজ করছে। দিন দিন সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেলেও নারীর সাক্ষরতার হার পুরুষের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়েনি। নিম্নে এ সংক্রান্ত একটি সারণী উপস্থাপন করা হলো :[২]

সারণী : প্রাপ্ত বয়স্ক সাক্ষরতার হার[৩] (১৫ বছরের উর্ধ্বে জনসংখ্যা)

বছর	জাতীয়			গ্রাম			শহর		
	উভয়	পুরুষ	নারী	উভয়	পুরুষ	নারী	উভয়	পুরুষ	নারী
১৯৭৪	২৫.৮	৩৭.২	১৩.২	--	--	--	--	--	--
১৯৮১	২৯.২	৩৯.৭	১৮.৮	২৫.৪	৩৫.৪	১৫.৩	৪৮.১	৫৮.০	৩৪.১
১৯৮৭	৩৩.৮	৪৪.০	২২.৯	২৯.৫	৩৯.৬	১৮.৭	৬১.৫	৭১.৬	৫০.৫
১৯৯০	৩৬.৯	৪৫.৫	২৪.২	৩০.৭	৩৯.৩	২০.৩	৬২.৫	৭০.০	৫০.০
১৯৯১	৩৫.৩	৪৪.৩	২৫.৮	৩০.১	৩৮.৭	২১.৫	৫৪.৪	৬২.৬	৪৪.০
১৯৯২	৩৯.৫	৪৬.৮	২৫.০	৩৩.৭	৪০.২	২৩.১	৬২.৬	৭০.০	৫১.৯
১৯৯৩	৩৯.৭	৪৮.১	৩৩.৯	৩৬.৫	৪১.৯	৩০.৬	৬২.৮	৭০.৮	৫২.১

উৎস : Report on Sample of Vital Registration in Bangladesh, 1981-1993, Bangladesh Bureau of Statistics, 1994.

উপরের সারণী থেকে দেখা যায়, ১৯৭৪ সালে যেখানে সাক্ষরতার হার ছিল ২৫.৮% ১৯৯৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৯.৭%। তবে তা গ্রামীণ এলাকার তুলনায় শহর এলাকায় এবং নারীর তুলনায় পুরুষের বেশি। অর্থাৎ নারী সাক্ষরতার হার গ্রামে ও শহরে বাড়লেও তা পুরুষের তুলনায় কম বেড়েছে। তবে শহরের মধ্যে এ পার্থক্যের হার কিছুটা কম। এদিকে ১৯৯২ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে ৪৯ হাজার ৯শ' ৬৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। যার মধ্যে শুধু মেয়েদের জন্য ছিল ৪শ' ৮১টি। জনসংখ্যার হিসাবে বিদ্যালয় কম হলেও মেয়েরা বিপুল সংখ্যায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেতে শুরু করে ঐ সময় থেকে। ১৯৯২ সালে প্রাথমিক পর্যায়ে ১ কোটি ৩৭ লাখ ১৭ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৬২ লাখ ৪৫ হাজার ছিল ছাত্রী। আর শিক্ষায় ছাত্রীদের ব্যাপক আগ্রহের কারণেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাও হঠাৎ করে বেড়েছে। ১৯৯২ সালে বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা যেখানে ছিল ৪শ' ৮১টি, ১৯৯৩ এ তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ৬শ' ৮৪টিতে।[৪] তবে আত্মতৃপ্তির সুযোগ কম। কারণ এখনও দেশের এক চতুর্থাংশ স্কুল বয়সী মেয়ে স্কুলে যায় না। এমনকি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষায়ও অংশ গ্রহণ করে না। অন্যদিকে মাধ্যমিক স্তরের ক্ষেত্রে আরো হতাশাব্যাঞ্জক। নিম্নে একটি সারণীতে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে ১৯৯১ সালের সর্বশেষ শিক্ষা পরিসংখ্যান অনুযায়ী মাধ্যমিক স্তরে নারী শিক্ষার একটি চালচিত্র তুলে ধরা হলো-

---

১. তাহমিনা আক্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

২. *বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর ক্ষমতায়ন : সমস্যা ও সম্ভবনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ.৮৯।

৪. Education Watch 1999 (Dhaka : University Press Limited 1999.) ibid. ; প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী : সন অনুযায়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শিক্ষক/শিক্ষিকা ও ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা এবং শতকরা হার (১৯৭০-১৯৯১) [১]

বছর	মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা	বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা	বালিকা বিদ্যালয়ের শতকরা হার	মোট শিক্ষক/ শিক্ষিকার হার	মোট শিক্ষিকার সংখ্যা	শিক্ষিকার শতকরা হার	মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (হাজারে)	মোট ছাত্রীর সংখ্যা (হাজারে)	ছাত্রীর শতকরা হার
১৯৭০	৫৩৯২	৬০৫	১১.৭৮	৫১৩৭৩	৫২৫১	১০.২২	১৪৬০	২৫৫	১৭.৪৭
১৯৭১	৬১৬২	৬৮৫	১১.১২	৭১৩৩০	৩৬৪৫	৭.১০	১২৬১	২৫৪	২০.১৪
১৯৭২	৬৯৭৬	৮১০	১১.৬১	৬৩৩৩৬	৫৮৪৯	৯.২০	১৫৫১	৩৭৬	২৪.২৪
১৯৭৩	৭৭৯১	৯৩৬	১২.০১	৭৫৩৪২	৮০৫৩	১০.৬৭	১৮৪১	৪১৮	২৭.০৫
১৯৭৪	৮১৯০	১০৫৩	১২.৮৫	৭৪৯২৪	৫৩৭৬	৭.১৮	১৮২৩	৩১০	২১.৩৯
১৯৭৫	৮৩২৭	১১১০	১৩.৩৩	৭৯৩৪২	৬৮৩২	৮.৬১	১৯৬৪	৪৯২	২৫.০৫
১৯৭৬	৮৭৯৪	১১৩৯	১২.১৫	৮৫৯৫৫	৬৫২৯	৭.৬০	১৯৫৯	৪৫৫	২৩.২৩
১৯৭৭	৮১৪৫	১১৫৯	১২.৯৬	৮৬৫৬৩	৬৪১৪	৭.৪১	১৮৩৩	৪৫০	২৪.৫৫
১৯৭৮	৭৯৪৬	১১১০	১৩.৮৬	৮৭৪০৪	৮৫১১	৯.৭৪	২৩৩৯	৫৯৭	২৫.৫২
১৯৭৯	৭৯৮১	১১১৫	১৩.৯৭	৮৮৩৫১	৮৭১১	৯.৮৬	২৩৬৯	৬১০	২৫.৭৫
১৯৮০	৮০২০	১১৩০	১৪.০৯	৮৮৮৭৩	৮৯৩৫	১০.০৫	২৪০৫	৬২৭	২৬.০৭
১৯৮১	৮৪৬৪	১১৭৭	১৩.৯১	৯০৭৯৪	৮৬০৩	৯.৪৮	২৪৬৭	৬১৯	২৫.০৯
১৯৮২	৮৫৪৫	১১৭৮	১৩.৭৯	৯০৭৯৪	৮৬৮৯	৯.৫৭	২৫৪৬	৬২৯	২৪.৭১
১৯৮৩	৮৬৬৪	১২৩৬	১৪.২৭	৯২৬৬৪	১০১৩১	১০.৯৩	২৫৭০	৬৭৬	২৬.৩০
১৯৮৪	৮৫৫১	১২৫৩	১৪.৬৫	৯৫২৭৫	১০২৮০	১০.৭৯	২৬০৮	৭৫৫	২৮.৯৫
১৯৮৫	৯৪৪৪	--	--	৯২২৪১	১২৯০	১০.০৭	২৫৮৩	৮৪১	৩২.৫৬
১৯৮৬	৯৮৫৭	--	--	১০২৩১১	৯৭১৮	১.৫০	২৬৬০	৮৬৮	৩২.৬৩
১৯৮৭	৯৯৫২	--	--	১১৪২৩৪	১১০২৬	৯.৬৫	২৭৪২	৮৯৩	৩২.৫৭
১৯৮৮	১০১৫৭	--	--	১১৬৮৩৫	১১৪৩২	৯.৭৮	২৮০৮	৯২৮	৩৩.০৫
১৯৮৯	১০২২০	--	--	১২২৪৭০	১১৮০২	৯.৬৪	২৯০১	৯৭২	৩৩.৫১
১৯৯০	১০৪৪৮	--	--	১২২৮৯৬	১১৮৮০	৯.৬৭	২৯৯৪	১০১৬	৩৩.৯৩
১৯৯১	১০৭১৫	১২৩০	১১.৪৮	১২৯৬১৬	১২৭১১	৯.৮১	৩১৫৬	১০৭০	৩৩.৯০

উৎস : Education Statistics of Bangladesh, 1992, Bangladesh Bureau of Educational International Statistics (BANBEIS), Ministry of Education, Dhaka, 1992.

উপরের সারণী থেকে দেখা যায়, স্বাধীনতার পর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রী ছিল ২০.১৪%। এর এক দশক পর দাঁড়ায় (১৯৮১ সালে) ২৫.০৯% এবং ১৯৯১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় মাত্র

[১]. Report on Sample Vital Registration in Bangladesh, 1981-1993, Bangladesh Bureau of Statistics, 1994, pp.10-40.; প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

৩৩.৯০%। এ থেকে বলা যায়, খুব অল্প হারে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রীর হার বাড়ছে। তবে আশার কথা হচ্ছে প্রায় প্রতিবছর তা ক্রমশ বৃদ্ধিশীল পর্যায়ে রয়েছে। এ হার খুব কমই ওঠানামা করেছে। এখানে উল্লেখ্য, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী অনুপাত থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ে এ হার হ্রাস পেয়েছে। পরবর্তীতে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে তা আরও হ্রাস পায়। নিচের সারণীতে তা তুলে ধরা হলো :[১]

সারণী : উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলিক পরিসংখ্যান ১৯৯০-৯৪[২]

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান		শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা		শিক্ষকের সংখ্যা		ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	
		মোট	মেয়েদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	মোট	শিক্ষিকা	মোট	ছাত্রী
ডিগ্রি কলেজ	১৯৯০ ১৯৯৪	৪৮১ ৬১১	৫৩ ৭৯	১২৭৮৩ ২০২৬২	১৯৮৮ ১৬৬৭৩	৬৮০৬০৮ ৯৬২৩৯৩	১৫৯৭৩৯ ৩০২৫৩১
মেডিক্যাল কলেজ	১৯৯০ ১৯৯৪	১০ ১৮	-- --	৭২৮ ১২০৬	১৫৬ ২৫৬	৭৯৮৩ ৯২৪৭	২৩৪১ ৩২৮৫
ডেন্টাল কলেজ	১৯৯০ ১৯৯৪	০১ ০১	-- --	৪১ ৪৯	১৬ ১৩	৩৩৪ ৩৩০	১৩৫ ১২৮
কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (BIT)	১৯৯০ ১৯৯৪	০৪ ০৪	-- --	২২৩ ২২৬	০৬ ০৮	২৯৮৬ ৩১০৫	৭১ ১৩৯
কৃষি কলেজ	১৯৯০ ১৯৯৪	০৩ ০৩	-- --	১৩২ ১২৮	১০ ১২	৯০০ ১১২৫	৬৬ ৯৭
ল’ কলেজ	১৯৯০ ১৯৯৪	৩৭ ২১	-- --	৫৪৫ ৩১০	৩৩ ৩০	১২১১০ ১০৫৩৭	১৫৬০ ১৭৯১
সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়	১৯৯০ ১৯৯৪	০৫ ১০	-- --	২৫৮৯ ৩১৬৫	৪৩৩ ৫৩০	৫৫৯৯৫ ৬২৬৫১	১৪৫০০ ১৪৭৬১
কৃষি বিশ্ববিদালয়	১৯৯০ ১৯৯৪	০১ ০১	-- --	৩৫২ ৩৯৩	০৮ ১২	৪০৯২ ৪৯১২	২৮১ ৫৯০
প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	১৯৯০ ১৯৯৪	০১ ০১	-- --	৩০৫ ৪৫৮	১৯ ৩৮	৩৮১৩ ৪৯৯৪	৩০১ ৫৭৯

উৎস : *Bangladesh Educational Statistics,* 1994, of Bangladesh Bureau of Educational International Statistics(BANBEIS), Ministry of Education, Dhaka, 1995.

উপরের সারণীতে দেখা যায়, উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্র-ছাত্রী অনুপাত যেমন ছাত্রীদের জন্য দুর্ভাগ্যজনকভাবে কম, তেমনি শিক্ষক-শিক্ষিকার অনুপাতেও শিক্ষিকার অংশ খুবই কম। ১৯৯০ সালের তুলনায়

---

১. আলতাফ পারভেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৪ সালে কোন অগ্রগতিই হয়নি। যদিও ছাত্রী এবং শিক্ষিকার সংখ্যা ১৯৯৪ সালে কিছু বেড়েছে। কিন্তু তা ছাত্র ও শিক্ষকের তুলনায় খুবই নগন্য। তাছাড়া শুধু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার হালচাল দেখলেও সেখানে ছাত্রী এবং শিক্ষিকার নগন্য হার পরিলক্ষিত হয়। ১৯৯৮ সাল থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের ৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাগত অবস্থান (পূর্ণকালীন) নিচের সারণীতে তুলে ধরা হলো :[১]

সারণী : রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণকালীন ছাত্র-ছাত্রীর বিবরণ

	১৯৮৮-৮৯	১৯৮৯-৯০	১৯৯০-৯১	১৯৯১-৯২	১৯৯২-৯৩
ছাত্র	৩৬৭৯৭	৩৬৯০৩	৪০৬৯৭	৪০৬৮৩	৪৮৩৮১
ছাত্রী	৯৮৬২	১০৯০০	১১৯২৩	১২০৩৯	১৪৬২৫
মোট	৪৬৬৫৯	৪৭৮০৩	৫২৬২০	৫২৭২২	৬৩০০৬

উপরের সারণীতে দেখা যায়, স্নাতক বা তদুর্ধ শিক্ষার সবচেয়ে উত্তম প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের ৭টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮৮-৮৯ সালে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রী অনুপাত ছিল ৭৮.৮৬ ঃ ২১.১৪ জন। ১৯৯০-৯১ সালে ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ অনুপাত সামান্য বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৭.৩৪ ঃ ২২.৬৬। যেখানে ছাত্রী সংখ্যা ১১,৯২৩ জন। শতকরা হারের হিসাবেও নারীর হার একেবারে নগন্য। শুধু ছাত্রী নয় শিক্ষিকার হারও কম। নিম্নে এ সংক্রান্ত অপর একটি সারণী তুলে ধরা হলো :[২]

সারণী : বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা এবং লিঙ্গ ভিত্তিক শিক্ষার্থীর অবস্থান[৩]

বছর	শিক্ষক/শিক্ষিকা			বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা	ছাত্র/ছাত্রী(%)		
	পুরুষ	নারী	মোট		পুরুষ	নারী	মোট
১৯৮১-৮২	---	---	২৪০০	৬	৮১.৪৯	১৮.৫০	১০০
১৯৮২-৮৩	---	---	২৪৮৩	৬	৮২.৪২	১৭.৫৮	১০০
১৯৮৩-৮৪	---	---	২৬২৬	৬	৮১.৩৮	১৮.৬২	১০০
১৯৮৪-৮৫	---	---	২৭০৬	৬	৭৯.৯৫	২০.০৫	১০০
১৯৮৫-৮৬	---	---	২৭৪১	৬	৭৯.৭৩	২০.৩৭	১০০
১৯৮৬-৮৭	---	---	২৭৭৬	৭	৭৯৭৩	২০.২৭	১০০
১৯৮৭-৮৮	---	---	২৮১৮	৭	৭৮.৪১	২১.৫৯	১০০
১৯৮৮-৮৯	২৫৭২	৩৭৪	২৯৪৬	৭	৭৮.৮৬	২১.১৪	১০০
১৯৮৯-৯০	২৬৯৮	৩৯০	৩০৮৮	৭	৭৭.১৯	২২.৮১	১০০
১৯৯০-৯১	২৭৩৭	৪২১	৩১৫৮	৯	৭৭.৩৪	২২.৬৬	১০০

উৎস : Statistical Year Book of Bangladesh, 1992, Bangladesh Bureau of Statistics
Educational Development in Bangladesh, 1980-85.

উপরের সারণীতে দেখা যায়, প্রথম ২/৩ বছর ছাত্রীর হার উঠানামা করলেও ১৯৮৩-৮৪ সাল থেকে তা ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাচ্ছে। ১৯৯১ সালের সর্বশেষ শিক্ষার জরিপ অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ছাত্রী ছিল ২২.৬৫%। অপরদিকে, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষিকার হার বাড়ছে। তা সত্বেও ছাত্রী ও শিক্ষার হার ছাত্র ও পুরুষ শিক্ষকের তুলনায়

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১।

Dhaka University Institutional Repository

খুবই কম। এর জন্য ছাত্রীদের প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারা বা মেধা না থাকা দায়ী নয়। এর পেছনে মূলত ছাত্রীদের ধরে রাখা একটি বড় সমস্যা হিসেবে কাজ করেছে। আর নারীদের কাংখিত লক্ষ্য অর্জনের পথে একটা বড় বাধা হলো ছাত্রীদের বেশি মাত্রায় স্কুল ত্যাগ। মেয়েদের স্কুল ত্যাগের প্রধানতম কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে পারিবারিক অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা, ঘরের কাজ, বাল্য বিবাহ, নিরাপত্তাহীনতাবোধ, পাঠ্য সূচির সঙ্গে বাস্তব জীবনের অসঙ্গতি, নারী শিক্ষকের স্বল্পতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের কমনরুম, হোস্টেলসহ অন্যান্য অবকাঠামোগত সুযোগের স্বল্পতা প্রভৃতি। তবে মেয়েদের ব্যাপারে বিয়ের সঙ্গেই শিক্ষার বিরোধ বেশি। দরিদ্র পরিবারগুলো শিক্ষার চেয়ে মেয়ের বিয়েকে অগ্রাধিকার দেয়। অনেক অভিভাবক মনে করেন, মেয়ে বেশি পড়লে বহির্মূখী হয়ে পড়বে। এছাড়া এ সমস্যাটি সামাজিক, ধর্মীয় ও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার আবর্তে আটকা পড়ে আছে।[১] যে সনাতন সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো নারীদেরকে সব ধরণের মত প্রকাশ ও সিদ্ধান্ত প্রদান থেকে বিরত রাখে, নারীর ক্ষমতায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে সে গুলোই নারীর নিরক্ষরতার জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী। তাই পঞ্চমবার্ষিকী পরিকল্পনা গুলোতে যথার্থ ভাবেই বলা হয়েছে যে, নারীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য সামাজিক উদ্দীপনার বড়ই অভাব। নারীর নিম্ন শিক্ষার হার, অপেক্ষাকৃত কম অংশগ্রহণের হার, উচ্চ ড্রপ-আউট, ইত্যাদির পিছনে যেসব সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও কারণ জড়িত তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো অন্যতম।

প্রথমত : গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় নারীকে অর্থনৈতিক ভাবে মূল্যায়ন করা হয় না। ফলে মেয়েকে শিক্ষিত করার ক্ষেত্রে পারিবারিক উৎসাহ প্রথম থেকেই তেমন একটি থাকে না। অপরদিকে, ছেলেদেরকে শিক্ষার ক্ষেত্রে বেশি মাত্রায় সুযোগ দেয়া হয়ে থাকে। UNICEF কর্তৃক প্রকাশিত এক রিপোর্টে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে "This perception of higher economic value of sons than daughters may have caused the parents to prefer higher education for the male than the female children. There is often a lack of motivation and parental apathy towards the education of daughters."[২]

দ্বিতীয়ত : শিক্ষা অর্জনের সুযোগ আসে দারিদ্র বিমোচনের পর। যেখানে শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে এবং শতকরা ৬০ ভাগ মানুষ চরম দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করছে, সেখানে বিদ্যা শিক্ষার আগ্রহ থাকে না।[৩]

তৃতীয়ত : নারীদের শিক্ষার হার সংকোচনের আরো একটি দিক হলো গ্রামীণ এলাকায় সাংসারিক কাজে নারীদেরকে সহায়ক হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। নারীরা গৃহে পুরুষরা বাইরে কাজ করার জন্য সৃষ্ট হয়েছে এ হলো গ্রামীণ সমাজের চিন্তাধারা। জনমনে এখনও বিশ্বাস এই যে, সুমাতা ও সুগৃহিনী হবার জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নিষ্প্রয়োজন।

চতুর্থত : যৌতুক সমস্যার কারণেও নারীদের শিক্ষার হারে তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। অনেক সময় দেখা যায় যে, শিক্ষিত ও যোগ্যতাসম্পন্ন মেয়েদেরকে বিয়ে দেবার ব্যাপারে বাবা-মাকে বিরাট ঝামেলার সম্মুখীন হতে হয়। কারণ, শিক্ষিত মেয়ের জন্য শিক্ষিত ও যোগ্যতাসম্পন্ন ছেলে পাওয়া যায় না। তাছাড়া শিক্ষিত বা অশিক্ষিত হোক না কেন প্রতিটি বিয়েতে বিশেষ করে শিক্ষিত মেয়েকে আধুনিক পদ্ধতিতে পরোক্ষভাবে যৌতুকের শিকার হতে হয়।[৪]

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২।

৪. Elen Sattar এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, "In the words of one village mother he (i, e, her husband) does not like higher education (i, e, Secondary Education) for their daughter because it makes if different to give (her) in marriage" (Satter,Elen, Village Womens at Work in Women for Women, Dhaka University Press, Dhaka 1975, p.39); প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

উপরিউক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে নারী জাতিকে অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও তথাকথিত রক্ষণশীলতার অন্ধকূপে ফেলে রেখে কোন জাতি কখনও উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে না। ইসলাম নারীকে সম্মানিত করার মাধ্যমে শিক্ষা-সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক সকল দিক থেকে জাতীয় সমৃদ্ধির নির্দেশ দিয়েছে বর্তমানে নারী জাতির যে সার্বিক উন্নয়ন হয়েছে তারই ফল।

পুষ্টি ও স্বাস্থ্যগত অবস্থান এবং নারী : বাংলাদেশে নারীর স্বাস্থ্য বলতে বুঝায় উৎপাদন যন্ত্র হিসেবে তার সুস্থতার দিকটি। সুতরাং তার এ সংক্রান্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুস্থতা সম্পর্কে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয় জীবনচক্রের একটি নির্দিষ্ট সময়ে। ঐ সময়ের পরের কোন অসুস্থতার দিকে আর তেমন নজর দেওয়া হয় না। ১৯৮৬ সালে উবিনীগরে নারী-স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মশালায় পঠিত প্রবন্ধে বলা হয় যে, অসুখ হওয়া নারীর জন্য হারাম এমন এক অলিখিত নিয়ম আমাদের সমাজে জারী হয়েছে। পারিবারিক কাজে যতক্ষণ তার শরীর চলে ততক্ষণ তাকে যন্ত্রের মতো চলতেই হয়। সে সময় তার কোন শারীরিক অসুস্থতার লক্ষণ দেখা দিলেও তা প্রায় সব সময় অগ্রাহ্য বলে গণ্য করা হয়। চিকিৎসাজনিত সুযোগ-সুবিধা সংসারে সে সবার পরে পায় এবং তা এমন সময় পায় যখন সে বিছানা থেকে আর উঠতে পারে না। নারীর অসুখ মানে শয্যাশায়ী হওয়া। অর্থাৎ সাধারণ অবস্থায় যা অসুস্থতা বিবেচিত হয় না।[১]

আমাদের সমাজে নারী স্বাস্থ্য বলতে সাধারণ অর্থে যা বুঝায় তা হচ্ছে তার প্রজনন ক্ষমতা।[২] শিশু জন্ম-মৃত্যুর হার, পুষ্টি গ্রহণের ধরণ, আয়ু- এগুলোকে ঘিরেই নারী স্বাস্থ্যের আলোচনা প্রচলিত। এই প্রচলিত আলোচনাতেও দেখা যায়, নারীরা পুরুষের তুলনায় পিছিয়ে। নিচে এ সংক্রান্ত একটি সারণী তুলে ধরা হলো :[৩]

সারণী : নারী-পুরুষ ভেদে দৈনিক গড় পুষ্টি গ্রহণ

পুষ্টি/প্রোটিন	পুরুষ	নারী	পার্থক্য(%)
এনার্জি (কিঃ ক্যাল)	২৬৯৭.৮৮	২০৪৫.৫	৩১.৯
প্রোটিন (গ্রাম)	৬৭.৬৩	৫০.৫৭	৩৩.৭
ক্যালসিয়াম (মিলিগ্রাম)	৩৭৩.৮৩	২৮৮.৮৯	২৯.৪
আয়রণ (মিলিগ্রাম)	৩২.৭৪	২৪.২০	৩৫.৩
ভিটামিন (আই. ইউ)	১০১০.২৩	৮২০.১৬	২৩.২
থাইসিন (মিলিগ্রাম)	১.৯১	১.৪০	৩৬.৪
রাইবোফ্লোবিন (মিলিগ্রাম)	০.৯৫	০.৬৯	৩৭.৭
নিয়াসিন (মিলিগ্রাম)	১৮.৭২	১৩.৮৪	৩৫.৩
ভিটামিন সি (মিলিগ্রাম)	১৬.৬৪	১৩.২১	২৬.০

উৎস : Ahmed, K. and Hassan, N, Nutrition Survey of Rural Bangladesh, 1981-82.

উপরের সারণীতে দেখা যায়, পুষ্টি গ্রহণের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে (ক্যালরী, প্রোটিন, আয়রণ, ভিটামিন) পুরুষেরা নারীদের তুলনায় কোন কোন ক্ষেত্রে এক-তৃতীয়াংশ, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এক-চতুর্থাংশ বেশি গ্রহণ করে থাকে। নারী-পুরুষের আয়ুর ক্ষেত্রেও পুরুষেরা গড়ে নারীদের তুলনায় বেশি বাঁচে। ১৯৭৪, ১৯৮১ এবং ১৯৯৩ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতিটি পুরুষ, নারীর তুলনায় যথাক্রমে ০.৫, ০.৯, এবং ১.০ বছর

---

১. তাহমিনা আক্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

২. Satter, Elen, *Village Women's at Work in Women for Women* (Dhaka : Dhaka University Press, 1975), P. 39.

৩. তাহমিনা আক্তার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০-২১।

Dhaka University Institutional Repository

বেশি বাঁচে।[১] এর কারণ হিসেবে বলা যায়, পুরুষের তুলনায় কম বয়সে এদেশের নারীরা বিয়ের পর স্বামীর ঘর করতে যায় এবং মা হয়। গর্ভধারণ এবং স্তন দানের সময়ও তারা প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত পুষ্টির কিছুই পায় না। সনাতন নিয়মে বাড়ীর সবার খাওয়া হলে নারীরা অবশিষ্ট খাবার খায়। ফলে তাদের অংশ সর্বদাই পরিমাণে কম এবং গুণগত মানেও নিকৃষ্ট হয়ে থাকে। এদেশের স্বল্পবিত্ত সংসারের গর্ভবতী মায়েদের গড় ওজন প্রায় সবারই ৫০ কেজির নিচে। এত ভঙ্গুর স্বাস্থ্যের নারীদেরকে সাধারণত গর্ভপাত, মৃত সন্তান প্রসব, দীর্ঘস্থায়ী প্রসব যন্ত্রণা প্রভৃতি সমস্যা ও জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। ফলে তাদের শরীর আরও ভেঙ্গে যায়, আয়ু কমে যায় স্বাভাবিক ভাবে।[২]

সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশে অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যহীনতার শিকার এবং তুলনামূলকভাবে নারীদের স্বাস্থ্যগত অবস্থা বিভিন্ন কারণে আরও শোচনীয়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষ প্রায়ই সংসারে উপার্জনের একমাত্র অথবা প্রধান অবলম্বন হওয়ায় চিকিৎসায় তারাই প্রাধান্য পেয়ে থাকেন। তারা রাষ্ট্র কর্তৃক চিকিৎসা পেলেও পুরুষেরাই এতে অগ্রাধিকার পেয়ে থাকেন। এছাড়া গ্রামে সনাতন পরিবার প্রথা প্রচলিত থাকায় নারীরা চিকিৎসার সুযোগও পান অনেক কম। ধর্ম ও সমাজের নামে প্রচলিত অনেক কুসংস্কারজনিত গোড়ামীর জন্য এবং অর্থ বিবেচনায় নারীর অসুস্থতা অগ্রাধিকার পায় না।[৩] নারীদের দূর্বল স্বাস্থ্যের পেছনে কাজ করে সামাজিক, আইনগত, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতাহীনতা। সারা জীবন ধরে নারী অপুষ্টি, স্বাস্থ্য পরিচর্যার অভাব ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাবে ভোগে। আর এর সবই হয়েছে সামাজিকভাবে নারীর নিম্ন অবস্থান, নিরক্ষরতা, অজ্ঞানতা, কুসংস্কার, দারিদ্র, অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা ধর্ম ও সমাজের নামে অত্যাচারের ফলশ্রুতিতে।[৪] বাংলাদেশে সরকারের কর্মসূচী 'Health for All' বা "সবার জন্য স্বাস্থ্য" এর লক্ষ্য অর্জনে নারীকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। আর তা বাস্তবায়নে যথার্থ আইন প্রণয়ন, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য সহায়তা দিয়ে ব্যবস্থাপনা ও উচ্চ পেশাদারী অবস্থানে নারীর ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণের উপর জোর দেয়া প্রয়োজন। তাছাড়া সমাজ ও ধর্মের সঠিক উপস্থাপন প্রয়োজন এবং স্বাস্থ্য প্রশাসনে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা জরুরী। কারণ, পুরো জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও তাদের টেকসই উন্নয়নের সঙ্গে নারীর স্বাস্থ্য, তার মর্যাদা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের অবদানের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ও নিবিড় সম্পর্ক। আর বাংলাদেশ সরকার মা ও শিশু মৃত্যুহার কমাতেও সবার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে একটি নীতি অনুসরণ করে যাচ্ছে। সরকার ইতোমধ্যে একটি স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাত কৌশল (HPSS) অনুমোদন করেছে। যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি। দরিদ্র নারী ও শিশুর মত অসহায় দুর্দশাগ্রস্থদের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। UNICEF এর সহায়তায় সরকার 'নারী বান্ধব হাসপাতাল' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যাতে নারীরা চিকিৎসা সেবা গ্রহণের সুযোগ লাভে সমর্থ হয়।[৫] গর্ভবতী মা ও তার পরিবারের জন্য শিক্ষাদান এবং স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ, সুবিধা বৃদ্ধি করে জরুরী প্রস্তুতি সেবা প্রদানের পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়েছে।

নারী নির্যাতন

---

১. *আশির দশক পরবর্তী বাংলাদেশের উন্নয়নে লিঙ্গভিত্তিক বিষয়সমূহের পর্যালোচনা, প্রবৃত্তি না স্থবিরতা? বাংলাদেশের উন্নয়ন পর্যালোচনা* (ঢাকা : সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ ও ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৬-১৯৯৭ খৃস্টাব্দ), পৃ. ২৭০।

২. ফরিদা আক্তার, *নারীর স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য নীতি ও পরিচর্যা ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে পর্যালোচনা* (ঢাকা : নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, ১৯৮৬ খৃস্টাব্দ), পৃ. ১৪-১৫।

৩. আহমেদ আবুল হোসেইন ভূঁইয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

৪. Ahmed, Kazi Kholiquzzaman et. al (eds) *Situation of Women in Bangladesh* (Dhaka : Ministry of Social and Women Affairs, 1992), P. 110.

৫. KhaliluIlah, Mohanimad, *Healh Services for Women in Bangladesh, in situation of Women in Bangladesh* (Dhaka : Ministry of Social Welfare and Women Affairs, 1988.), P. III and UNDP Report, 1994, P.48.

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজিতে oppression এবং violence দুটি শব্দ আছে। শব্দ দুটি বাংলায় নির্যাতন অর্থে ব্যবহৃত হয়। নির্যাতনে দুটি পক্ষ থাকে– একজন নির্যাতন করে; অপরজন নির্যাতন ভোগ করে। নির্যাতন দৈহিক হতে পারে; মানসিক হতে পারে। কাউকে দৈহিক কষ্ট দেওয়া– কাউকে প্রহার করা– কিংবা কাউকে মানসিক যন্ত্রণা দেওয়া– কাউকে পদে পদে খোঁটা দেওয়া– উভয়ই নির্যাতন। এক কথায়, নির্যাতন অর্থ, দৈহিক ও মানসিক লাঞ্ছনা।[১] তবে নির্যাতনের এরূপ সাদামাটা অর্থ গ্রহণ করতে অনেকে নারাজ। তারা মনে করেন নির্যাতনের রকমফের রয়েছে, বিভিন্নভাবে এটি হয়ে থাকে তাই এর অর্থ ব্যাপক। এমনি একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন Hacker; এর মতে, নির্যাতন বলতে বুঝায়, "ভীতি প্রদর্শন ও ভীতি প্রদর্শনের দ্বারা আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা।"[২] (To frighten, and, by frightening, to dominate and control- Ferederick F. Hacker, Crusaders Criminals and Crazis : Terrorism in our time.) উপরোক্ত সংজ্ঞা অনুসারে, নির্যাতন কেবলমাত্র মারধোর বা খোঁটাদানে সীমাবদ্ধ নয়; নির্যাতনের পরিধি বহু ব্যাপক। নির্যাতনের নানা রূপ। কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা শ্রেণীর বা শ্রেণীর উপর নির্যাতন সংঘঠিত হয়, যখন–

(১) ঐ ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা শ্রেণী অপরের স্বার্থে, অন্যের সুবিধা করে দেওয়ার জন্য কাজ করতে বাধ্য হয় এবং তাকে নিজের শ্রমের ফসল নিজে ভোগ করতে বা ব্যবহার ও বিতরণ করতে দেওয়া হয় না।

(২) নিজ দেহের উপর নিয়ন্ত্রণ, জীবন ও জীবিকার উপর নিয়ন্ত্রণ, নীতি নির্ধারণ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, পছন্দ-অপছন্দের স্বাধীনতা, এসব কিছুই ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা শ্রেণীর থাকে না।

(৩) ঐ ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা শ্রেণীকে অন্য ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা শ্রেণীর চেয়ে সামাজিক তথা সাংস্কৃতিকভাবে নীচ ও নিকৃষ্ট মনে করা হয়।

(৪) ঐ ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা শ্রেণীকে সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয় না।

(৫) ঐ ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা শ্রেণী শারীরিক, দৈহিক ও মানসিক আক্রমণের শিকার হয়। নির্যাতনের উপরোক্ত পাঁচটি রূপ পাঁচটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করা হয়–

(ক) মতাদর্শ (Ideology) : নির্যাতনের সমর্থনে আদর্শের যুক্তি খাড়া করা হয়। ছাত্রের ভবিষ্যৎ কল্যাণ হবে এই আদর্শের যুক্তিতে আমাদের দেশে শিক্ষক কর্তৃক ছাত্র পেটানোর ঐতিহ্য চলে আসছে।

(খ) প্রচারণা (Propaganda) : প্রচারণা প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা কথন। নির্যাতনের সপক্ষে যে আদর্শ খাড়া করা হয়, প্রচারণার মাধ্যমে তা জনগণের গ্রহণযোগ্য করে তোলা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর গোয়েব্ল্স্ প্রচারণার দ্বারা মিথ্যাকে সত্যরূপে উপস্থাপন করেছিলেন।

(গ) বাছবিচারহীনতা (Indiscriminate) এবং অ-নৈতিকতা (Amoral) : নির্যাতন সাধারণত নির্বিচারে চালানো হয়; ন্যায়-অন্যায়ের ভেদাভেদ করা হয় না। বস্তুত কোন ন্যায়বোধ থাকে না; নির্যাতন যে অন্যায় এ বোধ থাকে না। বরং মনে করা হয় যে, নির্যাতন কোন খারাপ কাজ নয়।

(ঘ) স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মান্যতা (Voluntary compliance) : নির্যাতনের মূল লক্ষ্য, নির্যাতিতকে আদেশ মানতে এবং নির্যাতনকারীর নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করতে বাধ্য করা। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, নির্যাতনের ভয়ে নির্যাতিত স্বেচ্ছায় নিজে থেকেই কথা শুনতে ও বশ্যতা স্বীকার করতে উদ্যোগী হবে। তখন আর মারপিটের অর্থাৎ নির্যাতনের দরকার হবে না। কারণ নির্যাতন নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলতে পারে না। নির্যাতন সত্বেও নির্যাতিত যদি পথে না আসে, তাহলে নির্যাতন চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়বে এবং বশে আনা সম্ভব নাও হতে পারে।

(ঙ) নির্যাতনকারী ও নির্যাতিতের প্রতি সমাজের মনোভাব : শুরুতে বলা হয়েছে নির্যাতনের দুটি পক্ষ থাকে নির্যাতনকারী ও নির্যাতিত। পক্ষ দুটিকে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়। নির্যাতিত নির্যাতন সয়ে চুপ করে থাকবে; নির্যাতনকে আত্মস্থ করে নেবে, মেনে নেবে, প্রতিবাদ করবে না। কিন্তু নির্যাতিত যদি নির্যাতন মেনে না নিয়ে

---

[১] ইসলাম, মাহমুদা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

[২] ইসলাম, মাহমুদা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিহত করে এবং প্রতি আক্রমণ করে তবে নির্যাতনের মতাদর্শ ও যুক্তি বিধ্বস্থ হয়ে পড়বে এবং নির্যাতনকারী ও নির্যাতিতকে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যাবে না। নির্যাতনের গতি প্রকৃতির আলোকে নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলো-
নারী নির্যাতন সর্বজনীন ও আন্তর্জাতিক। পিতৃতন্ত্রের মূল কথা পুরুষের আধিপত্য ও নারীর অধীনতা। নির্যাতন চালিয়ে ও নির্যাতনের ভয় দেখিয়ে পুরুষ নারীকে পুরুষ আধিপত্য মেনে নিতে এবং পুরুষের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করে। পিতৃতন্ত্র ও নারী নির্যাতন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। নারীকে নির্যাতনের ভীতি প্রদর্শন করে নারীর উপর পুরুষের আধিপত্য ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করা হয়।
নির্যাতন সংঘটনের যে রূপগুলো আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি নারী তার শিকার। পর্যায়ক্রমে আমরা রূপগুলো বিশ্লেষণ করব।

(১) নারী নিজের জন্য কাজ করে না; সে কাজ করে স্বামী, সন্তান ও পরিবার-পরিজনের জন্য। আদর্শ নারী হবে পতিগতপ্রাণা; সে স্বামী ও সন্তানের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিবে; পরিবারের জন্য আত্মত্যাগ (sacrifice) আর্দশ নারীর বৈশিষ্ট্য। নারী পরিশ্রম করবে; ফলভোগ করবে স্বামী, সন্তান ও পরিবার-পরিজন। নিজের জন্য নারী কিছু করবে না; করবার অধিকার তার নেই। সংসারের সেবায় নিবেদিত প্রাণ নারী স্বামী-সন্তানের পরিচর্যায় নিজের অস্তিত্বকে মিশিয়ে দিবে । নারীর নিজস্ব সত্তা নেই; সে কাজ করে; কিন্তু কাজের ফল উপভোগ করে অন্যরা।

(২) গৃহের চার দেওয়ালের মধ্যে নারী কঠোর পরিশ্রম করে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, নারীর দৈহিক মেহনতের পরিমাণ পুরুষ অপেক্ষা অনেক বেশি; কিন্তু তবু নারীকে নিষ্কর্মা, পরগাছা মনে করা হয়। কারণ নারীর কর্মের কোন অর্থনৈতিক মূল্যও দেওয়া হয় না। তাকে সর্বতোভাবে পুরুষের উপর নির্ভরশীল মনে করা হয় এবং তার পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। নারীর নিজের নাম-পরিচয় নেই; স্বামী বা সন্তানের নামে তার পরিচয়। পুরুষের অধীনতাপাশে আবদ্ধ নারীকে পরিবার, ঘরসংসার, আত্মীয়স্বজন বা বাইরের জগৎ, বৃহত্তর ব্রহ্মাণ্ডের কোন ব্যাপারে নীতি নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা কর্ম সম্পাদনের স্বাধীনতা দেয়া হয় না। "নারীদেহকে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার পুরুষের; এটাই হল পিতৃতন্ত্রের ভিত্তি। নারী গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসবের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এবং নারীর স্বাস্থ্য সেবা নিরূপণের প্রচেষ্টার মাধ্যমে পুরুষ এই অধিকার প্রয়োগ করে। নারীর দেহ তার নিজস্ব সম্পদ এবং তার সম্মতি ছাড়া তার দেহের উপর কারও কোন অধিকার নেই এ বাস্তবতাকে অগ্রাহ্য করার প্রয়োজনে পিতৃতন্ত্র নারী নির্যাতন তথা নির্যাতনের ভীতি প্রদর্শনের আশ্রয় নেয়।"[১]

(৩) অনেক পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীকে পুরুষের চেয়ে হীন, নীচ, নিকৃষ্ট জ্ঞান করা হয়। সমাজ-সৃষ্ট পুরুষ-সুলভ বৈশিষ্ট্যগুলোকে সদগুণ এবং নারীসুলভ বৈশিষ্ট্যগুলো চারিত্রিক ক্রুটি গণ্য করে পুরুষকে নারীর উপর স্থান দেওয়া হয়। "নির্যাতন ও তার অনুষঙ্গিক ভীতির দ্বারা নারীকে আতঙ্কিত করে রাখা হয় এবং পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর অধস্তন অবস্থানকে সুদৃঢ় করা হয়"।[২]

---

[১]. ড. আবুল হোসেন, *বাংলাদেশে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ, নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম*, প্রকাশনায়: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ডিসেম্বর, ২০১০ ইং পৃ. ৯, The right of men to control the female body is a cornerstone of patriarchy. It is expressed by their efforts to control pregnancy and childbirth and to define female health care in general. Violence and threat of violence against females represent the need of patriarchy to deny that a women's body is her own property and that no one should have access to it without her consent" Carole J. Sheffield, The body and its control. In women A Feminist perspective. [মাহমুদা ইসলাম, *নারীবাদী চিন্তা ও নারী জীবন* (ঢাকা : জে. কে. প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স, আগস্ট, ২০০৮ খৃস্টাব্দ), পৃ. ২৫; ড. আবুল হোসেন, *বাংলাদেশে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ, নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম* (ঢাকা : মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ডিসেম্বর, ২০১০ খৃস্টাব্দ), প. ৯।]

[২]. *বাংলাদেশে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

Dhaka University Institutional Repository

(৪) অনেক পিতৃতন্ত্রে নারী পুরুষের অধীনে অবরুদ্ধ জীবন যাপন করতে বাধ্য; ঘরের বাইরে পা ফেলার অধিকার নেই। সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তার অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ। বস্তুত সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি অর্থনীতি মানবজীবনের সকল ক্ষেত্র থেকে নারী অবহেলিত ও নির্বাসিত।

নারী নির্যাতনের উপরোক্ত চারটি রূপ আমাদের জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে এমনভাবে অঙ্গীভূত হয়ে গেছে ও সেগুলো নিয়ে বাস করতে আমরা এমন অভ্যস্থ হয়ে পড়েছি যে, এই নির্যাতনগুলোকে আমাদের চোখে সাধারণ ও স্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে হয়; ব্যাপক নির্যাতন হিসেবে ধরা পড়ে না। (So pervades our culture that we have learned to live with it as though it were the natural order of things.) কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই সত্য হৃদয়ঙ্গম হবে। একজনকে যদি শ্রমের মূল্য না দেওয়া হয়, শ্রমের ফসল যদি শ্রমদাতাকে ভোগ বা বিতরণের অধিকার না দেওয়া হয়, নারীর মানবাধিকার যদি ছিনিয়ে নেওয়া হয়, নিজ জীবনের উপর অধিকার, নিজ দেহের উপর নিজস্ব অধিকার, নিজস্ব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার, পছন্দ-অপছন্দের অধিকার যদি কেড়ে নেওয়া হয়, তা অবশ্যই মানবাধিকার লংঘন এবং নির্যতনের শামিল। কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা এবং সংরক্ষণের নামে যদি কাউকে হেয় ও নিকৃষ্ট আখ্যা দেওয়া হয় এবং চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ করে সকল সামাজিক, সাংস্কৃতিক তথা মানবিক কর্মকাণ্ড থেকে নির্বাসিত করা হয়, তবে তা অবশ্যই নির্যাতনের নামান্তর।

নারীকে পুরুষের অধীনতা পাশে আবদ্ধ রেখে নারীর উপর পুরুষের সর্বময় প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্য পিতৃতন্ত্রের অস্ত্র নারী নির্যাতন। ১৮৫৫ সালে Lucy Stone নাম্নী এক মহিলা তার বন্ধুকে চিঠি লেখেন, "ভোটাধিকার এবং অনুকূল আইনের জন্য আমাদের সংগ্রাম একটি বাস্তব প্রশ্নে নিঃশেষিত হয়ে যায়– নারীর কি নিজের উপর অধিকার আছে? আমার জন্য ভোটাধিকার, সম্পত্তির অধিকার অতি অকিঞ্চিৎকর, যদি আমার নিজ দেহের উপর এবং নিজ দেহ ব্যবহারের উপর আমার সর্বাত্মক অধিকার না থাকে। হাজারে একজন স্ত্রীর এ ক্ষমতা নেই।" [১]

দুঃখের বিষয় নির্যাতনের উপরোক্ত ব্যাপক রূপগুলো থেকে দৃষ্টি নির্যাতনের সংকীর্ণরূপের দিকে ফিরিয়ে রেখে কিছু কল্যাণকর কর্মকাণ্ডের দ্বারা নারী প্রগতি সাধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু ব্যাপক অর্থে নির্যাতনের রূপগুলোর মূল উৎপাটন না করলে নারী মুক্তি আসবে না; নারী ও পুরুষের জেণ্ডার সুষম ও সমতাপূর্ণ বিকাশ ঘটবে না।

নির্যাতনের যে রূপগুলো আমরা ইতোপূর্বে চিহ্নিত করেছি, তার শেষোক্ত রূপ মানসিক ও দৈহিক নির্যাতন। এই রূপটিকে সংকীর্ণ অর্থে নারী নির্যাতন বলা চলে। দৈহিক ও মানসিকভাবে নারী নির্যাতনের সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত। খবরের কাগজের পাতায় নারী ধর্ষণ, যৌন নির্যাতন [২], এসিড নিক্ষেপ, যৌতুকের জন্য নিগ্রহ, এমনকি, হত্যা ইতাদি খবর নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। বস্তুত আমাদের সমাজে প্রতিটি নারী সর্বদা নির্যাতনের আতংকে ভোগে এ পরিস্থিতি কেবল আমাদের দেশেই বিরাজমান নয়; বহির্বিশ্বও এ পরিস্থিতির শিকার। যুক্তরাষ্ট্রের সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, মার্কিন নারীরা নির্যাতনের ভয় থেকে মুক্ত নয়। গভীর রাতে বাড়িতে একা থাকার ভীতি কিংবা টেলিফোনের মাধ্যমে অশ্লীল বার্তার আতংক নারীর অজানা নয়। সে জানে যাত্রী বোঝাই বাসে চিমটি

---

১. Our little skirmishing for better laws and the right to vote will yet be swaliwed up in the real question, viz; has a woman a right to herself? It is very little to me to have the right to vote, to own property, etc, if I may not keep my body, and its uses in my absolute control. Not one wife in a thousand can do that now– Lucy Stone, letter to Antoinette Brown. July 11, 1855. (*নারীবাদী চিন্তা ও নারী জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।)

২. 'যৌন নির্যাতন' অর্থে যৌন প্রকৃতির এমন আচরণও অন্তর্ভুক্ত হইবে, যাহা দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির সম্ভ্রম, সম্মান বা সুনামের ক্ষতি হয়। (*নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।)

Dhaka University Institutional Repository

কাটা, দ্রুতগামী গাড়ি থেকে শীষ দেওয়া, কথোপকথনের সময় নারীবক্ষের দিকে তাকিয়ে কুৎসিত ইঙ্গিত করা নিত্তনৈমিত্তিক ব্যাপার।[১]

দৈহিক ও মানসিক নির্যাতনের নানা রূপ আছে। এখানে কতকগুলো উল্লেখ করা হল :

(১) ধর্ষণ বা বলাৎকার– rape
(২) স্ত্রী-নিগ্রহ– wife assault
(৩) যৌন হয়রানি– sexual harassment
(৪) গণিকা বৃত্তি– prostitution
(৫) নারী পাচার– trafficking
(৬) অশ্লীল সাহিত্য– pornography
(৭) বিজ্ঞাপনে ও সুন্দরী প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নারীকে পণ্যে পরিণত করণ (Commoditization of women in advertising and deauty contest.)
(৮) পরিবারে নারী নিগ্রহ– domestic violence
(৯) এসিড নিক্ষেপ– acid burning
(১০) যৌতুকের বলি– dowry
(১১)অপহরণ– abduction

জাতিসংঘের সংগঠন UNIFEM- নারী নির্যাতনের একটি তালিকা উপস্থাপন করেছে।

	ঈরিবার	সম্প্রদায়	রাষ্ট্র
নির্যাতনের বিভিন্ন রূপ	দৈহিক আগ্রাসন - হত্যা (যৌতুক ও অন্যান্য) - দৈহিক আঘাত ও প্রহার - যৌন অঙ্গহানি - ভ্রূণ হত্যা - শিশু হত্যা - খাদ্যে বঞ্চনা - চিকিৎসা সেবায় বঞ্চনা - প্রজননঘটিত বলপ্রয়োগ/ নিয়ন্ত্রণ যৌন অত্যাচার	সামাজিক গোষ্ঠী (সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি) গোষ্ঠীর ভিতরে বা বাইরে নারীর উপর নির্যাতন। দৈহিক অত্যাচার - দৈহিক আঘাত ও প্রহার - দৈহিক শাস্তি প্রদান - প্রজননঘটিত	রাজনৈতিক নির্যাতন (নীতি, আইন, ইত্যাদি) - বেআইনী আটক - জবরদস্তি সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা বিনষ্টকরণ - জবরদস্তি গর্ভধারণ - অ-রাষ্ট্রীয় এজেন্টদের নির্যাতন বরদাস্তকরণ।

---

[১] Every woman knows the fear of being alone at home late at night or the terror that strikes her when she receives an obscence telephone call. She knows also the pinch in the crowded bus, the wolf whistle from a passing car, the stare of a man looking at her bust during a conversation." Dianne Herman, 'The Rape Culture' in A Women : A Feminist perspective ed. Jo Freeman.; (*নারীবাদী চিন্তা ও নারী জীবন*, প্রাগুক্ত পৃ. ২৭; *নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।)

Dhaka University Institutional Repository

	- ধর্ষণ - মানসিক অত্যাচার - আটকে রাখা - বলপূর্বক বিবাহ দান - প্রতিশোধের ভীতি প্রদর্শন	বলপ্রয়োগ/ নিয়ন্ত্রণ - ডাইনী দাহ - সতীদাহ যৌন হামলা - ধর্ষণ কর্মস্থলে নির্যাতন যৌন আগ্রাসন - হয়রানি - ত্রাস / ভীতি প্রদর্শন বাণিজ্যিকৃত নির্যাতন - নারী পাচার - জবরদস্তি পতিতাবৃত্তি তথ্য মাধ্যম - অশ্লীল সাহিত্য - নারীদেহকে বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণতকরণ	হেফাজতে নির্যাতন (সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ ইত্যাদি) - ধর্ষণ - নিপীড়ন

নারী নির্যাতনের প্রক্রিয়া[১]

নারী নির্যাতনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সার্বিক নির্যাতন প্রক্রিয়ার মিল আছে। পুরুষ প্রাধান্য নারী নির্যাতনের ভিত্তি। বিচারবুদ্ধি বিবর্জিত, ভাবাবেগ তাড়িত, অস্থিরচিত্ত নারীকে নিজ ইচ্ছায় চলতে দিলে সমাজে বিপর্যয় ঘটে যাবে। কাজেই সমাজের প্রয়োজনে নারীকে বশে এনে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে ও সমাজের সার্বিক কল্যাণে নারীকে বশে এনে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রয়োজনে নারীর ওপর শারীরিক ও মানুষিক শাসন প্রয়োগ করতে হবে। 'নির্যাতন' মতাদর্শ সমাজে গ্রহণযোগ্য করেছে ধর্মহীন, অশিক্ষা ও অনাাদর্শিক পরিবারের প্রচারণার মাধ্যমে। চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, রেডিও, সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক, নোভেল, এমনকি বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞানে ও মনোবিজ্ঞানে নারীর হীনতা ও অধীনতা এবং পুরুষের আধিপত্য নানাভাবে প্রচার করা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। নির্যাতনকারী এ শ্রেণী কোন ধর্মেরই একনিষ্ঠ অনুসারী হতে পারে না এরা পথভ্রষ্ট ও বিকৃত মস্তিষ্কের দলভুক্ত। এদের কাছে বয়স, স্থান, কাল নির্বিশেষে সকল নারী বস্তুত নির্যাতনের সম্ভাব্য লক্ষ্য। নাবালিকা শিশু কন্যাকে শৈশবে নির্যাতনের শিকার হতে হয় খাদ্য ও চিকিৎসায় বৈষম্যের মাধ্যমে। চীনে কোমলমতি বালিকার পা ছোট রাখার জন্য লোহার জুতা পরানো হয়। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় স্ত্রীকে প্রহার মানবতা বিরোধী, এমন অপরাধবোধ স্বামীর সামান্যই থাকে। এমন কি, ধর্ষণের ক্ষেত্রে ধর্ষককে নিরপরাধী এবং নারীকে প্রকৃত অপরাধী সাব্যস্ত করার উদাহরণ বিরল নয়। পুলিশ, আইনজীবী, বিচারক নারী নির্যাতনকে "ক্ষমাসুন্দর" দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত।

ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা ও সংস্কার নারীর মধ্যে হীনমন্যতা সৃষ্টি করেছে, সে নির্যাতনকে মেনে নিয়েছে। সবল স্ত্রী রুগ্ন অক্ষম স্বামীর হাতে মার খেয়েও প্রতিবাদ করে না। কারণ সে মনে করে স্বামীর কাছ থেকে প্রহার তার প্রাপ্য।

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-১০।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মহীন সমাজে নারীর মধ্যে এমন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মান্যতা ঢুকিয়ে দিয়েছে যে, শ্বাশুড়ি বধূকে পীড়ন করার জন্য পুত্রকে প্ররোচিত করে। এমন পরিস্থিতি আমাদের সমাজ স্বীকৃত। পুরুষ নির্যাতন করার অধিকারী এবং নির্যাতন সহ্য করা নারীর কর্তব্য, এই বোধ জাগ্রত করে নারীকে প্রতিবাদ বা প্রতি আক্রমণ থেকে বিরত রাখা হয়েছে। পুরুষ নির্যাতনকারী এবং নারী নির্যাতনের নীরব শিকার এ যেন চিরন্তন নিয়ম। সবল স্ত্রী দুর্বল স্বামীর প্রহার খেয়ে পাল্টা প্রহার করে না; স্বামীর গঞ্জনার জবাব দেওয়া স্ত্রী বেয়াদবী মনে করে। নারী নির্যাতনের কতিপয় বিশেষত্ব আছে যা বর্ণনা করলে নারী নির্যাতনের স্বরূপ বোঝা যায়।[১] নারী নির্যাতন সর্বজনীন, কোন আর্থ-সামাজিক ও ভৌগলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়। কে নারীকে নির্যাতন করে? জবাব পরিষ্কার– "পুরুষ; বয়স, ধর্ম, বর্ণ, নরগোষ্ঠী নির্বিশেষে পুরুষ।" সকল সম্প্রদায়; উচ্চ মধ্য, নিম্ন বিত্ত; ধনী, নির্ধন; শিক্ষার সকল স্তরের পুরুষ নারী নির্যাতন করে; তারা বিবাহিত, অবিবাহিত, তালাকপ্রাপ্ত, পরিত্যক্ত। নির্যাতনকারী পুরুষের মধ্যে সরকারি কর্মচারী, সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ, ব্যবসায়ী, পুঁজিপতি, ডাক্তার, উকিল, ধর্মযাজক, পেশাজীবী, ব্যবস্থাপক, নির্বাহী কর্মকর্তা, কেরানী, বেকার সবাই আছে। New York Abused Women's Aid in Crisis প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক সাক্ষ্য দেন, "আয়, বয়স, পেশা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা নির্বিশেষে সকল স্তরে নারী নির্যাতন দেখা যায়। সম্প্রতি চারজন নির্যাতিত মহিলা এসেছিলেন তাদের স্বামীরা Ph. D ধারী; দুজন আবার দেশের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রফেসর। অপর একজন নির্যাতিতা মহিলা স্বামী লব্ধপ্রতিষ্ঠিত আইনজীবী। আমরা যে সব নির্যাতিত মহিলাদের উপদেশ দেই, তাদের স্বামীরা ডাক্তার, মনোচিকিৎসক, এমন কি ধর্মযাজক।"[২]

নারী নির্যাতনের ঘটনা সাধারণত গোপন করা হয়; জনসমক্ষে প্রচার হতে দেওয়া হয় না। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নির্যাতনের ঘটনার সংখ্যা ন্যূনতম। পিতৃতন্ত্রের ঐতিহ্যে লালিত নারী, নির্যাতনকে জীবনের বাস্তবতা (fact of Life) মনে করে এবং প্রতিবাদ না করে ঢেকে রাখে। সাম্প্রতিককালে নারী আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে কিছু কিছু ঘটনা প্রকাশ হতে শুরু হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনার তুলনায় প্রকাশিত ঘটনার সংখ্যা নগণ্য। ১৯৯৬-থেকে ১৯৯৯ এই চার বছরে বাংলাদেশে মাত্র ২৪২৬৩টি নারী নির্যাতন মামলার রুজু হয়েছে।[৩] "শত শত বছর এ ধারণা লালন করা হয়েছে যে, দৈহিক শক্তিবলে স্ত্রী শাস্তি দেওয়ার বা তাকে নিয়মানুবর্তী করার অধিকার স্বামীর আছে। প্রচলিত কথা rule of thumb তথা বৃদ্ধাঙ্গুলীর নিয়ম ইংরেজের কমন 'ল' থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এ নিয়ম অনুসারে, স্বামী বৃদ্ধাঙ্গুলীর চেয়ে বড় নয় এমন সাইজের চাবুক বা লাঠি দিয়ে স্ত্রীকে প্রহার করতে পারবে।"[৪] এমন সামাজিক ব্যবস্থায় নারী নির্যাতনের ঘটনা খবরের কাগজে ফলাও করে প্রচারের অবকাশ নেই। আর ধর্ষণ নারীকে সমাজের একেবারে নিম্নে স্তরে নিক্ষেপ করে। দক্ষিণ এশিয়ায় ধর্ষিতা নারী, স্বামী, স্বামীর পরিবার, এমন কি পিতামাতার পরিবার কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়। ধর্ষিতা রমণী সমাজে পতিতা; ধর্ষণের কথা জানাজানি হলে তার স্থান হয় পতিতালয়ে যেখানে তাকে মানবেতর জীবনযাপন করতে হয়। কাজেই ধর্ষিতা নারীর আত্মী-স্বজন,

---

১. মাহমুদা ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪; প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-১০।

২. We see abuse of women of all levels of income, age, occupation and social standing. I have had four women come in recently whose husbands are Ph. Ds– two of them professors at top universities. Another abused woman is married to a very prominent attorney. We counselled battered wives whose husbands are doctors psychiatrists, even, clergyrmen'. Roger Langley and Richard C. Leuy, Wife-Beating : The silent crisis. (মাহমুদা ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।)

৩. মাহমুদা ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

৪. For centuries, it has been assumed that a husband had the right to punish or discipline his wife with physical force. The popular expression, „rule of thumb' originated from the English Common law, which allowed a husband to beat his wife with a whip or stick no bigger than his thumb–Carole J. Sheffield, Sexual Terrorism. In women. A Feminist Perspective" Ed. J Freemen (প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।)

Dhaka University Institutional Repository

পিতামাতা ঘটনা চাপা দেন। ধর্ষিতা নারী নিজেও ঘটনা গোপন করতে চায়। বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, ১৯৯৬-৯৯ এই চার বছরে বাংলাদেশে মাত্র ৮১৩৭টি ধর্ষণের ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে।[১] নারীর নিরবতা নারী নির্যাতনের ঘটনা সাধারণ্যে প্রকাশে প্রতিবন্ধক। মেয়েদের নির্বাক ও নিষ্ক্রিয় থাকার শিক্ষায় সুশিক্ষিত করে রাখা হয়েছে। ছোটকাল থেকে ও ক্রমাগতভাবে সেক্স-ভূমিকায় সামাজিকীকরণের দ্বারা তাদের শেখানো হয়েছে যে, পুরুষের যৌন আচরণের জন্য নারী দায়ী। এ শিক্ষা নারীকে নির্যাতন সম্পর্কে নির্বাক করে দিয়েছে এবং তারা যদি অভিযোগ নিয়ে এগিয়ে আসে, তবে অন্যরা তাদের কথা বিশ্বাস করে না। তাই তারা নিষ্পেষনের কথা প্রকাশও করে না। আর প্রকাশ হলেও অপরাধী শাস্তি পায় না।[২]

নারী নির্যাতনের মামলায় শাস্তির ঘটনা বিরল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্যাতনকারী পুরুষ বে-কসুর খালাস পেয়ে যায়। ঢাকা চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, দায়েরকৃত মামলার ১২% অপরাধীর শাস্তি হয়; বাকি ৮৮% খালাস পেয়ে যায়।[৩]

সামাজিক পরিবেশ সচরাচর নারী নির্যাতনকে ঘরোয়া ব্যাপার গণ্য করে। স্ত্রী প্রহার বা স্ত্রীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার, অফিসে বা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি, ইত্যকার ঘটনাকে সমাজ বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা আমল দিতে চায় না। কর্মস্থল ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানির সঙ্গে ভবিষ্যৎ কর্মজীবন ও ছাত্রজীবন জড়িত বিধায় কোট কাচারীতে না গিয়ে মিটিয়ে ফেলা হয়। পুলিশ এ ধরনের ঘটনা নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে ফেলার পক্ষপাতী। সম্প্রতি পুলিশ বাহিনী ধর্ষণের ঘটনায় জড়িয়ে পড়ার বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে যা পুলিশের পক্ষে বিব্রতকর; তাই পারত পক্ষে পুলিশ নারীঘটিত ব্যাপারে জড়াতে চায় না। ধর্ষণ গুরুতর অপরাধ হলেও প্রমাণ করা কঠিন। ধর্ষিতাকে নিশ্চিত প্রমাণ দিতে হবে যে, ধর্ষণে তার সম্মতি ছিল না এবং সে যথাসাধ্য বাধা প্রদান করেছিল। অন্য কোন অপরাধের ক্ষেত্রে ফরিয়াদীকে প্রমাণ করতে হয় না যে, অপরাধে তার সম্মতি ছিল না এবং সে বাধা প্রদান করেছিল। রাস্তায় থামিয়ে সর্বস্ব লুট করা হলে, লুটেরাকে বাধা প্রদান না করার সমর্থনে লুণ্ঠিত ব্যক্তিকে যুক্তি প্রদর্শন করতে হয় না কিংবা লুণ্ঠনে তার অসম্মতির বা লুটেরাকে বাধা প্রদানের প্রমাণ পেশ করতে হয় না। কিন্তু ধর্ষিতা নারীকে ধর্ষণে যথা-সাধ্য বাধা দিতেই হবে, নতুবা ধরে নেওয়া হবে যে, যৌন কর্মে তার 'সম্মতি' ছিল।[৪]

আদালতের পরিবেশ নারীর প্রতিকূল। Ann Wolbert Burgess & Lynda Lyle Holmstorm তাদের Rape : Victims of Crisis গ্রন্থে ধর্ষণের শিকার মহিলার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। নির্যাতিত মহিলার জন্য আদালতে হাজিরা বাস্তব ধর্ষণের মত সংকটপূর্ণ। আমার কান্না পাচ্ছিল। আমি লাঞ্ছিত বোধ করছিলাম। আসামীর উকিলের সওয়ালগুলো আমার পছন্দ হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল আমিই যেন দোষী নিজের নির্দোষিতা

---

১. ইসলাম, মাহমুদা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

২. Females have been well-trained in silence and passivity Early and sustained sex-role socialisation teaches that women are responsible for the sexual behaviour of men and women cannot be trusted. These beliefs operate together. They function to keep women silent about their victimisation and to keep others from believing women when they do come forward. The victims fear that she will not be believed and, as a consequence, that the offender will not be punished is not unrealistic. Sex offenders are rarely punished in our) society. (ইসলাম, মাহমুদা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২)।

৩. ইসলাম, মাহমুদা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

৪. প্রাগুক্ত পৃ. ৯-১০; Proof of nonconsent and resistance is not demanded of a victim of any other crime. If one is stopped on the street and robbed, one has never to justily nonresistance or prove resistance and non consent. Females are expected to resist rape as much as passible, otherwise ۥconsent" is assumed". Carole J. Sheffield, Sexual Terrorism. In Women, A Feminist Perspective. ed. Jo Freeman. (ইসলাম, মাহমুদা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩)।

Dhaka University Institutional Repository

প্রমাণ না করা পর্যন্ত আমিই অপরাধী।[১] এমন পরিস্থিতিতে ধর্ষিতা নারীর আইনে সুবিচার আশা করা দুরাশা। ধর্ষণের মামলা তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রমাণাভাবের যুক্তি দেখিয়ে ডিসমিস করে দেওয়া হয়।[২]

নারী নির্যাতনের দোষ নারীর উপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য। নারী ধর্ষিত হলে অপরাধ হয় নারীর; সে সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়। ধর্ষক পুরুষের কিছু হয় না; সে বহাল তবিয়তে সমাজ ও পরিবারে বসবাস করে। পুরুষ প্রধান সমাজ নারীর উপর পুরুষের নির্যাতন জায়েজ করার জন্য নানা অতিকথা (myth) বানিয়েছে এবং নারী নির্যাতনের জন্য পুরুষের যেন শাস্তি না হয় তার নিশ্চিত ব্যবস্থা করে রেখেছে। নারী নির্যাতনের শিকার নারীকে সর্বদা এবং সকল ক্ষেত্রে অপরাধ সন্দেহ করা হয়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির এমন কুটিল জাল বুনে রেখেছে যে, জালে আবদ্ধ নারী পুরুষ প্রত্যেকেই ধারণা পোষণ করে যে, যৌন অপরাধের শিকার নারীদের মনে নির্যাতিত হওয়ার একটি মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা লুকায়িত থাকে। (Victims of sex crimes have a hidden psychological need to be victimised– Georgia Dullea Child Prostitution Causes are sought.) সমাজের যাঁতাকলে পিষ্ট মানুষ বিশ্বাস করতে প্রবৃত্ত হয় যে, নির্যাতিত নারী হয় স্বেচ্ছায় নির্যাতনে অংশগ্রহণ করেছে কিংবা বানিয়ে গল্প বলেছে। সমাজ আমাদের বিশ্বাস করতে শিখিয়েছে যে, নির্যাতনের শিকার নারী তার নির্যাতনের জন্য নিজেই দায়ী। পুরুষ অপরাধী সম্পর্কে বিশ্বাস এই যে, সে নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি অর্থাৎ সে জৈবিক নিয়ম দ্বারা চালিত হয়েছে কিংবা তাকে প্রলোভন দেওয়া হয়েছে। ফলে নির্যাতনের যে শিকার সে অপরাধী সাব্যস্ত হয়।[৩]
চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, নারী নির্যাতন সেক্সজনিত নয়। কিংবা যৌন হতাশা বা যৌন ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ নয়; বরং সমাজ বিনির্মিত পুরুষসুলভ বৈশিষ্ট্য বা পুরুষসুলভ সুবিধা জাহির করার ইচ্ছা থেকে নারী নির্যাতনের বাসনা জাগ্রত হয়। প্রতিটি পুরুষ এই ধারণার মধ্যে লালিত-পালিত হয় যে, তার মধ্যে এমন কিছু উপাদান থাকা উচিৎ যা নিয়ন্ত্রণে থাকবে বটে, তবে প্রয়োজনে বাঁধন খুলে ছেড়ে দিতে হবে। এ চিন্তাদ্বারাই নারীকে নির্যাতন করতে প্রেরণা যোগায়।[৪] যৌন হয়রানি নারী নির্যাতনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। যৌন হয়রানির ধরণ-ধারণ এত ব্যাপক যে, সংজ্ঞার মাধ্যমে সব কিছু উপস্থাপন করা সম্ভব নয়।

---

১. Going to court for the victim is as much of a crisis as the actual rape itself. I felt like crying. I felt abused. I did not like the questions the defence was asking. I felt guilty guilty till proven innocent.(ইসলাম, মাহমুদা, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩; ড. আবুল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১-৯।)

২. Marilyn Frye তাঁর Oppression প্রবন্ধে ধর্ষণে নারীর বিষাদময় অবস্থান বর্ণনা করেছেন, If a woman is raped, then if she has been heterosexually active, she is subject to the presumption that she liked it (since her activity is presumed to show that she likes sex and if she has not been heterosexually active, she is subject to the presumption that she liked it (since she is supposedly" repressed and frustrated.") Both heterosexual activity and heterosexual nonactivity are likely to be taken as proof that you wanted to be raped and hence, of course were not really raped at all. You cannot win." Race, Class and Gender ed. Margaret Anderson and Patricia Collins.(ইসলাম, মাহমুদা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।)

৩. The victim causes and is responsible for her victimisation. Underlying the attitudes about the male offender is the belief that he could not help himself : that is, he was ruled by his biology and/or he was seduced. The victim becomes the offender and the offender becomes the victim– Carole J Sheffield, Sexual Terrorim. In Women, A Feminist Perspective. ed Jo Freeman. (ইসলাম, মাহমুদা, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪)।

৪. ধর্ষণের আসল উদ্দেশ্য যৌন বাসনার চরিতার্থ নয়; সমাজ পুরুষের মধ্যে যে পৌরুষের প্রতিচ্ছবি এবং নারীর মধ্যে যে নারীত্বের প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করে দিয়েছে তার বহিঃপ্রকাশ ধর্ষণ। "পরীক্ষাগারে সতর্ক গবেষণায় দেখা গেছে যে, প্রকৃতপক্ষে ধর্ষণ প্রধানত

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের সামনে তিনটি সংজ্ঞা আছে–

(১) গবেষক Safrau -এর সংজ্ঞা : "যৌন আচরণ যা এক তরফা, অনভিপ্রেত কিংবা শর্তযুক্ত" (Sex that is one sided, unwelcome or comes with strings attached.)"[১]

(২) গবেষক Farley -এর সংজ্ঞা : "অযাচিত, অপরপক্ষের সাড়াবিহীন পুরুষ আচরণ বা কর্মজীবী নারীর কর্মকাণ্ডের উপর নারীর যৌন ভূমিকাকে প্রধান্য দেয়"[২]

(৩) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের House of Representatives প্রদত্ত সংজ্ঞা : "স্বেচ্ছাকৃত কিংবা বারংবার অযাচিত মৌখিক মন্তব্য, অঙ্গভঙ্গী যা যৌন ধরনের দৈহিক সংস্পর্শ যা অনভিপ্রেত।"[৩]

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলোতে নিম্নোক্ত লক্ষণগুলো পাওয়া যায় :

(ক) যৌন হয়রানি যৌন ধরনের দৈহিক বা মৌখিক আচরণ, যা নারীর সেক্সকে তার পেশাগত, বৃত্তিমূলক বা অন্যান্য মর্যাদা বা অবস্থানের উপর প্রাধান্য দেয়;

(খ) যৌন হয়রানি নারীর জন্য সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত;

(গ) প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য যৌন হয়রানি নারীর চাকরী কিংবা কর্ম সম্পাদনের সামর্থ্য বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের প্রতি হুমকি।

(ঘ) যৌন হয়রানি কর্মস্থল ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে সংঘটিত হয়ে থাকে।

Mackinnon দু'প্রকার যৌন হয়রানি চিহ্নিত করেছেন :

(১) যৌন হয়রানিতে ইতিবাচক সাড়া দিলে বিনিময়ে সুবিধা প্রদানের আশ্বাস থাকে (quid pro puo harassment)।

যৌন-সম্পর্কহীন চাহিদা পূরণ করে। ধর্ষণ ক্ষমতা ও ক্রোধের যৌন বহিঃপ্রকাশ।" (Careful clinical study of offenders reveals that rape is in fact serving primarily non-sexual needs. It is the sexual expression of power and anger – Nicholas Groth, Men Who Rape; The Psychology of the offender) অনুরূপভাবে, স্বামী কর্তৃক স্ত্রী প্রহার নিজের প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠতা প্রমাণের জন্য স্বামীর প্রয়াস। স্ত্রী প্রহার নিঃসন্দেহে ক্ষমতার অপব্যবহারের দৃষ্টান্ত। যৌন হয়রানির ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। যৌন হয়রানি সেক্সঘটিত নয়, ক্ষমতাঘটিত ব্যাপার। "কর্মস্থলে নারীর যৌন হয়রানি নারীর শ্রমের উপর নিয়ন্ত্রণ রক্ষার জন্য পুরুষের প্রচেষ্টা থেকে উদ্ভূত হয়। যৌন হয়রানি নারীকে ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে পুরুষের চেয়ে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নিকৃষ্ট করে রাখে এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পুরুষ প্রাধান্য নিশ্চিত করে।" (Sexual harassment of women at work arose from men's need to maintain control of women's labour. Sexual harassment serves to keep women (individually and collectively) economically inferior and ensures the system of male dominance – Lin Farley, Sexual Shakedown : The sexual Harassment of Women on the Job)

নারী নির্যাতনের প্রসঙ্গে যৌন হয়রানি বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। কারণ ইদানীংকালে নারীরা অধিক সংখ্যায় কর্মগ্রহণ করায়, এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসায়, যৌন হয়রানি কর্মস্থল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্প্রতিকালে ঢাকা বিশ্ববিদালয়,রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, ছাত্রছাত্রীরা হয়রানি বিরোধী আন্দোলন করতে বাধ্য হয়; বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমস্যা সুরাহার জন্য কমিটি প্রতিষ্ঠা করেন। বিষয়টি এখনও সমাধান হয়নি। (Men are brought up with the idea that there ought to be some part of them, under control until released by necessity, that thrives on violence. This capacity, even affinity, for violence, lurking beneath the siurface of every real man is supposed to represent the primal, untamed base of masculinity – Marc Feigen Fasteau, The Male Machine) (ইসলাম, মাহমুদা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪)।

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

৩. (Deliberate or repeatet unsolicited verbal comments, gestures of physical contact of a sexual nature which are unwelcome.); (প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯)।

Dhaka University Institutional Repository

(২) যৌন হয়রানি নারীর কাজের নিরবচ্ছিন্ন শর্ত (harassment as a continuing condition of work)

প্রথমটিতে প্রকাশ্যে বিনিময়ের প্রস্তাব জড়িত : যেমন নারীকে যৌন হয়রানির ইতিবাচক সাড়া দিয়ে যৌন প্রস্তাব মেনে নিতে হবে নতুবা সে চাকরী হারাবে কিংবা শিক্ষায় আশানুরূপ ফল থেকে বঞ্চিত হবে। এক্ষেত্রে হয়রানির একজন চাকুরি দাতা নিয়োগকারী, চাকুরিতে উপরওলা কিংবা শিক্ষক। কারণ পদের জোরে তারা শাস্তি দিতে কিংবা পুরস্কৃত করতে ক্ষমতা রাখে। এ ধরনের হয়রানিতে তিনটি স্তর থাকে– যৌন প্রস্তাব বা আহ্বান, সাড়া, পরিণতি। চারটি বিকল্প হতে পারে–

(১) উপরওলা বা শিক্ষক প্রস্তাব দিলে, নারী প্রত্যাখ্যান করল এবং পরিণতিতে নারী শাস্তি পেল (চাকুরি হারালো বা পরীক্ষায় খারাপ ফল পেল); (২) উপরওলা বা শিক্ষক প্রস্তাব দিল, নারী মেনে নিল; কিন্তু প্রতিশ্রুত সুবিধা পেল না। (৩) উপরওলা বা শিক্ষক প্রস্তাব দিল নারী মেনে নিল এবং প্রতিশ্রুত সুবিধা লাভ করল এবং (৪) উপরওলা বা শিক্ষক প্রস্তাব দিল, নারী প্রত্যাখ্যান করল এবং আর কিছু ঘটল না, উপরওলা বা শিক্ষক চেপে গেল।[১] প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারী অবমাননা ও অমর্যাদার শিকার।

দ্বিতীয় প্রকার হয়রানি অর্থাৎ কাজের শর্ত হিসেবে হয়রানি ততটা মারাত্মক নয়; কারণ এ ধরনের হয়রানির সঙ্গে প্রত্যক্ষ কোন চাহিদা থাকে না; হয়রানকারী তার শিকারের কাছ থেকে কোন সাড়া প্রত্যাশা করে না। নারীকে উত্যক্ত করে কিছু মজা পাওয়াই উদ্দেশ্য। যদিও এ ধরনের হয়রানির ক্ষেত্রে নারীর কিছু করার থাকে না; কিন্তু তার কাজের পরিবেশ খুব অস্বস্তিকর হয়ে পড়ে। ফলে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। তবে আলতোভাবে ঘাড়ে হাত দেওয়া, টিটকারী দেওয়া, ঠেসে দাঁড়ানো, চিমটি কাটা, পথচলতি মন্তব্য ছুঁড়ে দেওয়া ইত্যাদি আচরণের মধ্যে হয়রানি সীমাবদ্ধ থাকে; অধিক কোন কিছু চাওয়া হয় না বা প্রত্যাশা করা হয় না বলে এ সব ব্যাপারেও অভিযোগ উত্থাপন করা হয় না।

যৌন হয়রানি কর্মস্থলে হোক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হোক, মেয়েদের জন্য কুফল বয়ে আনে। কর্মস্থলে যৌন হয়রানির শিকার চাকরীজীবী মহিলা দোটানায় ভোগেন– অভিযোগ করলে চাকরী হারানোর ভয়, চেপে গেলে মানসিক অশান্তি। তাই মহিলা কর্মজীবীদের মধ্যে চাকুরী বদলের প্রবণতা পুরুষের চেয়ে বেশি এবং তাদের চাকুরী স্থলে অনুপস্থিত থাকার ঘটনাও তুলনামূলকভাবে অধিক। এর জন্য নারী কর্মীকে দোষ দেওয়া যায় না; কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয় নারীকে। কারণ চাকুরী থাকলেও মানসিক অশান্তি ও অনিরাপত্তা তথা চাকুরীতে দক্ষতা ও একাগ্রতা অর্জনে প্রতিবন্ধক হয়ে পড়ে। ফলে তারা পদোন্নতিতে পিছিয়ে পড়েন; নিজের দোষে নয়; তথাপি নারীদের পুরুষের চেয়ে কম বেতন দেওয়া হয় এবং দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেওয়া হয় না; অজুহাত; তারা চাকুরীতে টিকে থাকেন না, ঘন ঘন ছুটি নেন। ছাত্রীদের জন্য যৌন হয়রানি শিক্ষাজীবন ও কর্মজীবন উভয়ক্ষেত্রে গুরুতর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। শিক্ষকের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রী পরীক্ষায় যথাযথ গ্রেড ও ক্লাস থেকে বঞ্চিত হয়। যে ছাত্রী মেধাসম্পন্ন ও শিক্ষায় মনোযোগী তার জন্য শিক্ষকের সহায়তা ও অনুপ্রেরণা আবশ্যক। কিন্তু অশিক্ষক সুলভ আচরণকারী শিক্ষক ছাত্রীকে এর কোনটাই দেন না; বরং তার চেয়ে দুর্বল ছাত্রের নিচের গ্রেডে তাকে ফেলে দেন। ফলে ছাত্রী শিক্ষার প্রতি অনুরাগ হারিয়ে ফেলে; তার মেধার বিকাশ বিঘ্নিত হয়; সে মানসিক দিক দিয়ে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে এবং পরীক্ষায় আশানুরূপ ও যথাযোগ্য ফল লাভ করতে পারে না। শিক্ষাজীবনের কৃতিত্ব কর্মজীবনের পাথেয়। শিক্ষাজীবনে ভাল করতে না পারার জন্য মেধাবী ছাত্রী কর্মজীবনে পিছিয়ে পড়ে। তার যোগ্যতা ও মেধা অনুপাতে চাকুরী পায় না। ফলে সে বিভ্রান্তি, অনিশ্চয়তা, আস্থাহীনতা ও সন্দেহপ্রবণতায় ভোগে; জীবনে সে কাংখিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না।

[১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১-১৮।

Dhaka University Institutional Repository

জেণ্ডার বৈষম্য নারীকে ক্ষমতাহীন ও পুরুষের অধীন করে রেখেছে। প্রচলিত সমাজ নারীকে স্ত্রী, মা ও যৌন ক্রীড়নক হিসেবে দেখতে শেখায়। পুরুষ নারীর সমাজ বিনির্মিত সেক্স ভূমিকাকে কর্মস্থল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টেনে নিয়ে যায়। নারীর সঙ্গে গৃহে পুরুষ যেমন আচরণ করে, তেমনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও অনুরুপ আচরণ করতে প্রবৃত্ত হয়। পুরুষের মধ্যে এ চিন্তাধারা কাজ করে যে, নারী গৃহে যে ভূমিকা পালন করে, কর্মস্থলে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুরূপ ভূমিকা পালন করবে। তথাকথিত সেক্রেটারী বা রিসেপসনিস্ট পদে মহিলা নিয়োগের পিছনে নারীর সেক্স ভূমিকাঘটিত মনোভাব কাজ করে। অপরপক্ষে, পুরুষের মনে সমাজ ধারণা দিয়েছে যে, নারীর সঠিক স্থান গৃহ; কর্মস্থল বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তার জায়গা নয়। ফলে নারীর অর্থকরী কর্মে নিয়োগ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী গ্রহণকে পুরুষ পুরুষের ভূমিকায় চিরাচরিত কর্ম পরিধিতে হামলা মনে করে। নারীকে পুরুষের জগতে যোগ্যতা প্রদর্শন থেকে বিরত রাখতে, এমন কি, তাকে চাকুরী বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেক সরে যেতে বাধ্য করার জন্য যৌন হয়রানির আশ্রয় নেওয়া হয়। নারীর ক্ষমতায়ন ও অধস্তন অবস্থার বিলুপ্তি ব্যতিরেকে যৌন হয়রানি নির্মূল করার আর কোন পন্থা নেই বলে কেউ কেউ মনে করেন। তারা আরো মনে করেন যৌন হয়রানির মূলে জেণ্ডার বৈষম্য ও অসমতার কাঠামোই দায়ী। তাই তাদের দৃষ্টিতে কতিপয় আইনগত বিধি বা শাস্তির ব্যবস্থা করে সমাজের শুভবুদ্ধির প্রতি আহ্বান জানিয়ে নারী নির্যাতন তথা যৌন হয়রানি দূর করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশে ১৯৮০'র দশক থেকে সামাজিক ও চিন্তার জগতে নারীদের প্রতি নির্যাতন একটি সংকটময় সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এই উৎকণ্ঠা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত। সংবাদপত্র, পুলিশ, বিভিন্ন স্টাডি রিপোর্টের সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যে দেখা যায়, নারী ও কন্যা শিশুর যৌন হয়রানি, ধর্ষণ, লিঙ্গীয় অঙ্গহানী, কন্যাশিশু হত্যা, নারী হত্যা, যৌতুকের কারণে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, ক্ষেত্র বিশেষে হত্যা, এসিড নিক্ষেপ, বিকলাঙ্গকরণ, সশস্ত্র সংঘাত প্রভৃতি দ্বারা নানাভাবে নির্যাতিত ও নিপীড়িত হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে নারী নির্যাতনের মূল কারণ হলো বাংলাদেশের প্রচলিত সামাজিক কাঠামোর গভীরে নিহিত পিতৃতন্ত্রের পরিবার ও সমাজে পুরুষ শ্রেষ্ঠ এবং প্রভূ; নারী পুরুষের তুলনায় হীন মর্যাদার আবহমানকাল ধরে চলে আসা এ চিন্তাধারা। Salma Khan এ প্রসঙ্গে বলেন "By tradition and cultural norms women have a much lower status compared to men The discrimination in the tratment of male and female starts at birth and continues through the different phase of life. Gender inequality and distribution of authority and assets between sexes as determined by the family organisation and stratification of society."[১]

বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়নে নারীর অবস্থান অত্যন্ত অসংযত, অপক্ক, নিরাপদহীন নারী এবং পুরুষের অবস্থানগত পার্থক্যই পুরুষকে নারী নির্যাতনের পথে উৎসাহিত করে তুলেছে। বাংলাদেশে পুরুষের আধিপত্য ও নারীর অধঃস্তনতাভিত্তিক পুরুষতান্ত্রিক চিন্তাধারা থেকেই নারী নির্যাতনের উদ্ভব। এখানে সামাজিক, প্রথাগত ও সাংস্কৃতিক লোকাচার দ্বারা নারীদের অবস্থান নির্ণয় করা হয়ে থাকে। নারীর এই অধস্তন অবস্থান পুরুষের আধিপত্য, নিয়ন্ত্রণ ও আগ্রাসনমুখী ব্যবহারকে স্বাভাবিক হিসেবে সমাজে সমুন্নত রাখতে সহায়তা করে। রীতি মূল্যবোধ, আচার ও অপসংস্কৃতি এই আচরণকে আরও দৃঢ় করে। নারীরা সর্বদা তাদের স্বামীদের বহুবিবাহ, তালাক, যৌতুক প্রভৃতির সম্মুখীন হয় এবং পুরুষের নির্যাতনের নীরব শিকারে পরিণত হয়। ব্যক্তিগত ও গণজীবন উভয় পর্যায়েই বিভিন্ন প্রকার নির্যাতন সংগঠিত হচ্ছে এবং শ্রেণী বিভিন্ন সমপ্রদায়ের মাঝে তার বিকাশ ঘটছে। তাই নারী নির্যাতন হচ্ছে নারীর মানবাধিকারের চরম লংঘন।[২] নারীদের উপর বাংলাদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে নির্যাতন সংগঠিত হচ্ছে তার বিবরণ সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করা হলো :-

---

[১]. খাদিজা খাতুন ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *নারী ও উন্নয়ন : প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান* (ঢাকা : উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৫ খৃস্টাব্দ), পৃ. ১০৪-১২৭।

[২]. ড. আবুল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

Dhaka University Institutional Repository

ক. পারিবারিক/দাম্পত্য নির্যাতন :[১]

পুরুষ আধিপত্য সৃষ্টির জন্য সমাজে নারী বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে দৈহিক নির্যাতন, মানসিক নিপীড়ন ও পরিবারের এক সদস্য কর্তৃক অপরকে আনুগত্যে বাধ্য করা। এ ধরনের নির্যাতনে মৌখিক বিদ্রূপ, গালমন্দ ও পরিবারের সদস্যগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যান থেকে শুরু করে প্রহার, শারীরিক নির্যাতন, মানসিক উৎপীড়ন এবং শেষ পর্যায়ে মৃত্যু পর্যন্ত গড়াতে পারে। এই নির্যাতন সমগ্র আর্থ-সামাজিক শ্রেণীতে বিস্তৃত। এক্ষেত্রে দরিদ্র সুবিধাবঞ্চিত নারীরা অধিকতর অসহায় ও অরক্ষিত। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষের তুলনায় নারীর নিম্নতম মর্যাদা থেকে পারিবারিক নির্যাতনের উৎপত্তি। বিশেষত নারীর প্রতি সমাজের ধারণা ও প্রবণতার কারণে নারীকে নিকৃষ্ট ও আশ্রিত বা পোষ্য মনে করা হয়। এই কারণে সমাজ কর্তৃক নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন ছাড়া নারীর আর কোন উপায় থাকে না। বর্তমানে, যৌতুক দাবী এই নির্যাতনকে আরও বিভীষিকাময় করে তুলেছে।

খ. কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন

কর্মক্ষেত্রে নির্যাতনকে প্রধানত মানবাধিকার লংঘন ও যৌন হয়রানি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। যৌন হয়রানির মধ্যে রয়েছে যৌন অত্যাচারের হুমকী, নিয়োগকারী কর্তৃক যৌন সুবিধা লাভের চেষ্টা ও ধর্ষন। মৌল অধিকারে বঞ্চিত করা যেমন, আইন কর্তৃক গ্যারান্টিযুক্ত সুবিধা প্রদানে অস্বীকৃত ও নারীদের মানবাধিকার লংঘন এর অন্তর্ভুক্ত। রপ্তানীমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত প্রায় ১ কোটি নারী মানবাধিকার লংঘনের শিকার। গৃহস্থালীতে যারা কর্মরত তারা কোন আইন বা বিধির আওতায় আসে না। তাই তারা যৌন নির্যাতন ও মানবাধিকার লংঘন উভয়েরই শিকার হয়ে পড়ে। চাকুরীগত সুবিধার সীমাবদ্ধতা, দারিদ্র ও আইনগত অধিকার সম্পর্কে সম্যক সচেতনতার অভাবে কর্মক্ষেত্রে নারী নির্যাতনের শিকার হয়ে পড়ে।

গ. পতিতা বৃত্তি

পতিতা বৃত্তি নিয়ে কথা বলা স্পর্শকাতর। ইসলামে এ বৃত্তির কোন স্থান নেই। এটি হারাম। কিন্তু পরিতাপের বিষয় সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশ মুসলিম দেশ হয়েও এ পেশার বৈধতা দিয়েছে।[২] এ নিয়ে সরকার অনেক আইনও করেছে। সরকারের দৃষ্টিতে এটি নারী নির্যাতন নয়। কারণ এটাকে সরকার নারী নির্যাতন মনে করলে এ নিকৃষ্ট পথে নারী সমাজকে ঠেলে দিত না। আবার বাংলাদেশে সংবিধানের ১৮(২) ধারায় বলা আছে রাষ্ট্র পতিতাবৃত্তি বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে।[৩] তা সত্ত্বেও সারাদেশে এখন ১৫টি স্বীকৃত পতিতাপল্লী আছে। কিন্তু স্ববিরোধিতা হলো এই যে, রাষ্ট্রই আবার নৈতিকতা বিরোধী ঐ কর্মজীবিকাকে অনুমোদন দিচ্ছে। পতিতাপল্লীতে ব্যবসা পরিচালনার জন্য পতিতাদের সার্বক্ষণিকভাবে রাষ্ট্রের সঙ্গে বিশেষত পুলিশ, আদালত এবং স্থানীয় সরকার সংস্থাসমূহের সাথে সম্পর্ক রাখতে হয়।[৪] পরিবার কিংবা কোন প্রতিষ্ঠানে পুরুষতন্ত্রের অমানবিক আচরণেই কোন না কোন ভাবে এদের এ জীবনে আসতে বাধ্য করেছে। অনেক পতিতাই পরবর্তীতে আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে না। তাছাড়া ১৮ বছরের নিচে মেয়েদের পতিতাবৃত্তি আইনগতভাবে নিষিদ্ধ হলেও শতকরা ৯০ ভাগকেই না জানিয়ে জোরপূর্বক ১৮ বছরের কম বয়সী থাকা অবস্থায় এ পেশা গ্রহণে বাধ্য করা হয়েছে।[৫] এ পেশায় এনেও করা হয় তাদের উপর নির্যাতন। তা আসে খদ্দের, সর্দার/সর্দারিণী, এলাকার গুন্ডা-পান্ডা ও পুলিশ থেকে। ১৮০ জন পতিতার উপর এক গবেষণায় দেখা যায়, তাদের ৫২ জন বলেছে, পুলিশ তাদের কাছ থেকে

---

১. ড. আবুল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১-১৬।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪-১৮৬।

৩. *বাংলাদেশের নারীর অবস্থান প্রতিবেদন (খসড়া)* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

৪. ফাতেমা খাইরুন্নাহার ইভা ও অন্যান্য, *বেইজিং প্লাস ফাইভ : সংক্ষিপ্ত রূপরেখা* (ঢাকা : উন্নয়ন পদক্ষেপ, স্টেপ্স টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, বর্ষ-৬, সংখ্যা-১৯, জানুয়ারী-মার্চ, ২০০০ খৃস্টাব্দ), পৃ. ২০; প্রাগুক্ত, পৃ. ১-৯।

৫. হাসমত আরা বেগম, *নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সরকারী পদক্ষেপ* (ঢাকা : নারী ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, বর্ষ-২, সংখ্যা-৪, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৯৮ খৃস্টাব্দ), পৃ. ২৮।

Dhaka University Institutional Repository

জোর করে টাকা আদায় করে এবং পুলিশ কর্তৃক বিনামূল্যে জোরপূর্বক যৌন নিপীড়নের শিকার হন ৭৩ জন।[১] এছাড়া পতিতাবৃত্তি উচ্ছেদের নামেও তাদের উপর করা হচ্ছে নির্যাতন। তবে বর্তমানে দেশের অভ্যন্তরে এবং বিদেশে অবস্থিত বেশ কিছু সংখ্যক সংস্থা নারী ব্যবসার শিকারে পরিণত নারীদের আইনগত সহায়তা ও পুর্নবাসনের ব্যবস্থা নিচ্ছে। তবুও এই প্রচেষ্টাসমূহ এখনও বিচ্ছিন্ন ও অপর্যাপ্ত।

ঘ. যৌন অত্যাচার

বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের অন্যতম উপাদান যৌন অত্যাচার। দারিদ্র, অক্ষমতা, অভাব, সামাজিক ও নৈতিক রীতি ও মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রভৃতি সমষ্টিগতভাবে নারীর প্রতি যৌন অত্যাচারের জন্য দায়ী। দরিদ্র গৃহস্থালীর নারীরাই বেশি যৌন অত্যাচারের শিকারে পরিণত হন। কোন পরিবার যখন তার সদস্যদের নিরাপত্তা দানে অক্ষম হয়ে পড়ে তখনই যৌন নির্যাতন শুরু হয়।[২]

ঙ. ধর্ষণ

বাংলাদেশে ধর্ষণ এখন ভয়াবহ বিস্তার লাভ করছে। সংবাদপত্রের এক হিসাবে ১৯৯৫ সালে ধর্ষণের ঘটনা ২শ' ১৭টি। পরবর্তী দু'বছর ১৯৯৬ ও ১৯৯৭ সালে যথাক্রম ২শ' ৬২ ও ৭শ' ৫৩টি। ১৫ বছর পূর্বে ১৯৮৩ সালে ১২ মাসে সংবাদপত্রে ধর্ষণের সংবাদ ছিল ৬৭টি। এখন প্রতিমাসেই তার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। পুলিশের হিসাবে তা আরো আশংকাজনক। ১৯৯৭ সালে এদেশে নারী নির্যাতনের সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৫শ' ৭টি। তন্মধ্যে ধর্ষণ ১ হাজার ৩শ' ৩৬টি। পূর্ববর্তী বছরে এ সংখ্যা ছিল ৫শ' ২৫টি।[৩] তাছাড়া বাংলাদেশে শিশু ধর্ষণের হারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিদিনই ঘটছে এরকম অসংখ্য ঘটনা।

চ. নারী পাচার : নারী পাচারও নারী নির্যাতনের আওতায় পড়ে। যা নারী পাচার বাংলাদেশে চরম আকার ধারণ করেছে। পাচার হওয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ নারীর বয়স ১৫ থেকে ৩০ বছর।[৪] এদের সবাই গ্রামের দরিদ্র ঘরের, যৌতুকের কারণে বিয়ে না হওয়া, স্বামী পরিত্যক্তা কিংবা বিধবা। স্বামী অথবা বাবার বাড়ীতে নির্যাতন-লাঞ্ছনা সহ্য করতে না পেরে এসব মেয়ে কাজের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। পেটের ক্ষুধা এদের বেপরোয়া করে তোলে। আর তখনি দালালরা শহর কিংবা পার্শ্ববর্তী দেশে কাজ দেয়ার নামে বিদেশে এদের পাচার করে। বাংলাদেশের যশোর, রংপুর, ঢাকা, চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে নারী পাচার হচ্ছে বেশি।[৫]

নারী পাচার বিষয়ে জাতিসংঘের যেসব সনদ আছে তার অনেকগুলোতে স্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ। যেমন, The United Nations Convension of the Suppresion of the Trafficking in Persons and the Exploitation of the Prostitution of Other's 1949. ১৯৯৫ সালের ১৫ জুলাই বাংলাদেশ সরকার নারী পাচার বিষয়ে প্রথম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে Women and Children Opperssion (Special Provision) Act, 1995 জারি করে। এছাড়া রয়েছে নারী নির্যাতন দমন আইন। নেই শুধু সেগুলোর যথার্থ বাস্তবায়ন।

ছ. এসিড নিক্ষেপ : বর্তমান সময়ের অন্যতম সামাজিক বর্বতার নাম 'এসিড নিক্ষেপ'। এসিড বর্বরতার প্রধান শিকার তরুণীরা; বিশেষত সুন্দরী মেয়েরা প্রেম কিংবা যৌন সহবাস বা অন্য কোন অনৈতিক বিরোধী প্রস্তাবে রাজি না হলে এসিড দিয়ে ঝলসে দেয়া হচ্ছে বাংলাদেশের অসংখ্যা নারীর মুখ। এতে মৃত্যুর হার কম হলেও আহতের জীবন হয়ে উঠে দুর্বিসহ। কারণ, ঘাতক এসিড শরীরকে চরমভাবে বিকৃত করে দেয়। ফলে দুঃসহ শারিরীক যন্ত্রণা ও সামাজিক অবজ্ঞার এক অসহনীয় পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় একজন এসিডদগ্ধকে।

---

১. Salma Khan, *Riport of the Task Forces,* Vol. 1, Ibid, P. 329.

২. প্রাগুক্ত, পৃ.১-৯।

৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।

৪. রহমান, জরিনা ও অন্যান্য, *রাষ্ট্র ও পতিতাবৃত্তি : একটি সমীক্ষা* (ঢাকা : সমাজ নিরীক্ষণ, সংখ্যা-২৯, ১৯৮৮ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৬৮।

৫. বেবী মওদুদ, *দেহ ব্যবসায় বাধ্য কিশোরীরা* (ঢাকা : বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ঢাকা, ১৯৯২ খৃস্টাব্দ), পৃ. ১০।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় দৈনিক গুলোর সংবাদ অনুযায়ী ১৯৯৭ সালে এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়েছে ১৩০ জন নারী। এসিড নিক্ষেপের শিকার নারীদের ১১ জন পারিবারিক কলহের কারণে, প্রেমে সাড়া না দেওয়ায় ২৩ জন, যৌতুকের জন্য ১০ জন, ধর্ষণের পর ১ জন, অপহরণে ব্যর্থ হয়ে ৩ জন, স্বামীকে অন্য মেয়ের সঙ্গে মেলামেশায় বাধা দেওয়ায় ১১ জন, স্বামীকে দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি না দেওয়ায় ১ জন, দেহ ব্যবসায় রাজি না হওয়ায় ১ জন। ৫৫ জনের কোন কারণ জানা যায়নি।[১] মানুষরূপী কোন অমানুষের ছুঁড়ে দেওয়া সামান্য পরিমাণ এসিডই একটি নারীর জীবন দুর্বিসহ করে তুলতে পারে। সরকার এ ব্যাপারে তৎপর হওয়া সত্ত্বেও দিন দিন এর মাত্রা বেড়েই চলছে।

পিতৃতন্ত্র ও নারী নির্যাতন

শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়া আরও দুটি প্রতিষ্ঠান– ধর্মীয় অপসংস্কৃতি ও পরিবার–পিতৃতন্ত্রকে নির্বিচার সমর্থন দিয়েছে। ত্রিমুখী সাড়াঁশী আক্রমণে নারী পুরুষে তুলনায় নিজেকে হীন ভাবতে এবং হীনমন্য আচরণ করতে বাধ্য হয়েছে। যদি কোন নারী বিদ্রোহ করত চায়, পুরুষ তাকে ভয় দেখিয়ে ও নির্যাতন করে পথে আসতে বাধ্য করে। ভীতি প্রদর্শন ও নির্যাতন পিতৃতন্ত্রের আবশ্যক বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি নারী সহজেই উপলব্ধি করে যে, বেঁচে থাকতে হলে তাকে সমাজনির্দিষ্ট "নারীসুলভ" আচরণ করতে হবে নতুবা নিষ্ঠুরতা ও পাশবিকতার শিকার হতে হবে। অশ্লীল সাহিত্য(pornography), গণিকাবৃত্তি, যৌন হয়রানি, বলাৎকার, স্ত্রী প্রহার, চীনা মেয়েদের পা ছোট রাখার জন্য লৌহ নির্মিত পাদুকা পরিধান, ভারতের সতীদাহ, ডাইনী জ্যান্তদাহ, এমন কি আধুনিক প্রসূতি বিজ্ঞান ইত্যদি নিপীড়নমূলক বিধি ব্যবস্থার দ্বারা নারীকে হীনতা স্বীকার করে পুরুষের অধীনতা পাশে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য করা হয়েছে। ঘরে নারী বিনা-বেতনে, বিনা মজুরিতে গৃহস্থালীর সকল কর্ম করে, স্বামী সন্তানকে বিনামূল্যে সকল প্রকার সেবা দেয়; নারীর কয়টি সন্তান হবে, কখন হবে, পরিবার নিয়ন্ত্রণ করা হবে কি-না ইত্যাদি সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনেক নারীর অধিকার থাকেনা; যদিও প্রজননে নারীর মুখ্য ভূমিকা কিন্তু প্রজনন সম্পর্কে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার পুরুষের। যৌন জীবনে নারী পুরুষের ইচ্ছা ও চাহিদা দ্বারা পরিচালিত হয়; পুরুষের চারিত্রিক পদস্খলন ক্ষমার চোখে দেখা হয়; কিন্তু নারীর "পদস্খলন" গুরুতর শাস্তিযোগ্য বিবেচিত হয়। সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণের উপর পুরুষের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব; নারীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার সীমাবদ্ধ; সীমাবদ্ধ অধিকারও প্রয়োগ করার তার ক্ষমতা নেই। পুরুষ সকল সম্পদ ও সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ করে। নারীকে হীন করে পুরুষের অধীনে অধস্তন করে রাখার জন্য নারীর চলাচল (mobility) কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে এবং নারীর গতিবিধি গৃহের চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। নারীকে করা হয়েছে গৃহবন্দী। জীবনের সকল ক্ষেত্র পুরুষের কর্মক্ষেত্র। নারীর কর্মক্ষেত্র কেবল গৃহ ও সংসারের গৃহস্থালী। নারী ঘরে কাজ করবে, ঘরে থাকবে, পুরুষের বিনানুমতিতে বাইরে যাবে না। পুরুষ বাইরে, মাঠে, অফিসে, কলকারখানায় কাজ করবে।

নারীর ক্ষমতায়ন

ক্ষমতায়ন হলো ক্ষমতা এবং উন্নয়নের মধ্যকার এক ধরনের আন্তঃসম্পর্ক, যা এ দুটি বিষয় সম্পর্কে এক ধরনের নতুন দিকনির্দেশনা দেয়।[২]

---

[১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১-৯; জাহিদ রহমান, *অন্ধগলির মেয়েরা* (ঢাকা : পাক্ষিক অনন্যা, বর্ষ-৮, সংখ্যা-২০, আগস্ট ১৯৯৬ খৃস্টাব্দ), পৃ. ১০-২৫।

[২]. সেলিনা শিরীন শিকদার, *বাংলাদেশে নারী আন্দোলন ও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন*, সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান (সম্পাদিত), *নারীর ক্ষমতায়ন: রাজনীতি ও আন্দোলন* (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৩ খৃস্টাব্দ), পৃ. ২১৯; Carolin Moser এ প্রসঙ্গে বলেন, "The capacity if women to increase their own seliance and internal strenght. This is identified as the right to determine choices in life and to influence the direction of change, through the ability to gain control over crucial material and non material resources."(Carolina O.N Moser, *Gender Planning and Development: Theory Practice and Training,* Routledge, (London and New York, pp.74-75.)

Dhaka University Institutional Repository

জাতি সংঘের দৃষ্টিতে ক্ষমতায়ন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা একটি জনগোষ্ঠী প্রতিবন্ধক অপসারণের জন্য নিয়ন্ত্রণ ও কর্মকাণ্ড গ্রহণ করে (People take control and action in order to overcome obstacles)। যে কাঠামোগত অসমতা একটি নিপীড়িত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে অসুবিধাজনক অবস্থানে ঠেলে দিয়েছিল, সেই কাঠামোগত অসমতার প্রতিবন্ধক দূর করার জন্য উক্ত জনগোষ্ঠীর সমবেত কর্মকাণ্ডকে ক্ষমতায়ন বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই সংজ্ঞা অনুসারে "ক্ষমতায়ন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা নারী কল্যাণে সমতা এবং সম্পদ আহরণে সমান সুযোগ অর্জনের লক্ষ্যে জেণ্ডার বৈষম্য অনুধাবন, চিহ্নিতকরণ ও বিলোপ সাধনের জন্য একজোট হয়।" (It is the process by which women mobilise to understand, idetify and overcome gender discrimination, so as to achieve equality of welfare and equal access to resources.)

জাতিসংঘের সংজ্ঞা ক্ষমতায়নের পাঁচটি স্তর আছে। স্তরগুলো উর্ধ্বক্রম অনুসারে নিম্নরূপ :

ক্ষমতায়ন (empowerment)

↑

নিয়ন্ত্রণ (Control)

↑

অংশগ্রহণ (Participation)

↑

নারী জাগরণ (conscientisation)

↑

সম্পদ আহরণ ও নিয়ন্ত্রণে
অবাধ সুযোগ ও অধিকার (access)

↑

কল্যাণ (welfare)

(১) প্রথমে কল্যাণ : এই স্তর নারীর বস্তুগত কল্যাণ অর্থাৎ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, পুষ্টি এবং আয় উপার্জন, আর্থিক কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত। এ সব ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মধ্যকার বৈষম্য ও ব্যবধান চিহ্নিত করতে হবে। বৈষম্য চিহ্নিত করলে ক্ষমতায়ন ঘটবে না, পরবর্তী পদক্ষেপগুলো নিতে হবে।

(২) সম্পদ আহরণ : সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ, সম্পদ ব্যবহার ও সম্পদের মালিকানার অধিকার নারী-পুরুষ সকলের জন্য সমভাবে উন্মুক্ত করে দিতে হবে। এ সব ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষকে সমসুযোগ ও সমঅধিকার দিতে হবে। জমি, ঋণ, শ্রম ও সেবা, শিক্ষা, চাকুরী ও অন্যান্য কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, উৎপাদী কর্মে-নিয়োগ ও উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় নৈপুণ্য প্রশিক্ষণ ইত্যাদির দিক দিয়ে নারী বৈষম্যের শিকার। এই বৈষম্য ও ব্যবধানের কারণে নারীর অবস্থান তুলনামূলকভাবে দূর্বল। কাজেই নারী অবস্থার উন্নয়নের জন্য নারীকে গৃহ ও বাইরে বৃহত্তর পরিমণ্ডল, সকল প্রকার সম্পদে সমান ও ন্যায্য হিস্যা হাসিল করতে হবে। সম্পদ আহরণ, নিয়ন্ত্রণ, ব্যবহার ও মালিকানায় পুরুষের সমান সুযোগ ও অধিকার আদায় করতে হবে। তা করতে হলে নারীকে জেণ্ডার বৈষম্যমূলক অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হতে হবে; সমান সুযোগ ও অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে জাগ্রত হতে হবে।

(৩) নারী জাগরণ : প্রত্যেক নারীর মধ্যে এ সত্য জাগ্রত করতে হবে যে, নারীর অধস্তন অবস্থার জন্য নারীর অক্ষমতা, অপারগতা বা ত্রুটি দায়ী নয়; এ অবস্থা স্বাভাবিক বা জৈবিক নয়; বরং সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট ও লালিত ব্যবস্থা। কাজেই এই অধস্তন অবস্থান পরিবর্তনীয় এবং পরিবর্তনযোগ্য। জাগ্রত নারী এ অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে। জাগ্রত নারী সমাজ-সৃষ্ট জেণ্ডার ভূমিকা ও পুরুষের অধীনতা অগ্রাহ্য করে জেণ্ডার বৈষম্যকে জেণ্ডার সমতা ও ন্যায্যতায় রূপান্তরিত করবে; পুরুষ ও নারীকে সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবে।

Dhaka University Institutional Repository

(৪) অংশগ্রহণ : অংশগ্রহণ অর্থ সকল নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় নারী-পুরুষের সম অংশীদারত্ব। নারী সমাজের একটি অংশ সমাজের এ চিন্তাধারার পরিবর্তন করে নারী-পুরুষ পরস্পর পরিপূরক এ চিন্তাধারায় যদি উন্নীত করা যায় তবে নারীরা সম অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করার অধিকার লাভ করবে। পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে সকল কর্মকাণ্ডে নারী-পুরুষ সমতার ভিত্তিতে অংশগ্রহণ করতে পারবে। নারী শুধু নিষ্ক্রিয় ফলভোগী হবে না; সকল কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ও সমান ভূমিকা পালন করবে; নীতি নির্ধারণ এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কার্যকর অবদান রাখবে। ঘর নয়, সমগ্র জগৎ হবে নারীর কর্মক্ষেত্র।

(৫) নিয়ন্ত্রণ : অংশগ্রহণে সমঅধিকার অর্জিত হলে নারী নিজ নিজ স্বার্থ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিজ এবং সমাজের নিয়ন্ত্রণ, পরিচালন ও প্রভাবিত করার সামর্থ্য লাভ করবে। নারী যখন সম্পদ আহরণ ও মানসিক বিকাশে পুরুষের সঙ্গে সমতা অর্জন করবে, তখন নিজ ইচ্ছা, চাহিদা ও স্বার্থ বাস্তবায়নের কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ, পরিচালন ও পরিবর্তন করতে সমর্থ হবে এবং নারীর চূড়ান্ত ক্ষমতায়ন ঘটবে। নারী হবে নিজের ভাগ্য নিয়ন্তা এবং পুরুষের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে নারী-পুরুষ উভয়ে মিলে হবে সমাজের ভাগ্য নিয়ন্তা। নারী বা পুরুষ কেউ কারও অধীন থাকবে না; উভয়ে হবে সমভাবে ক্ষমতাবান। ক্ষমতার ভারসাম্যের মাধ্যমে নারী ও পুরুষ সমাজকে সমতাভিত্তিক ও ন্যায়ভিত্তিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন-সমৃদ্ধিতে নারীর ক্ষমতায়ন বর্তমান বিশ্বে সর্বাধিক আলোচিত বিষয়সমূহের একটি। মানবেতর অবস্থা থেকে নারী মুক্তি বা নারী উন্নয়নের জন্য এবং সামগ্রিক সব সমস্যার সমাধানে প্রধান ও প্রথম ধাপ হিসেবে নারীর ক্ষমতায়নকে প্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করা হয়েছে।[১] তাই গত শতকের নব্বই দশক থেকে বিশ্বে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সব সম্মেলনে নারীর ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। রিওতে ধরিত্রী সম্মেলন, ভিয়েনায় মানবাধিকার সম্মেলন, কায়রোতে জনসংখ্যা সম্মেলন, কোপেনহেগেনে সামাজিক শীর্ষ সম্মেলন এবং বেইজিং নারী সম্মেলনে উপস্থাপিত সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বার বার এ প্রসঙ্গটি এসেছে। কেবল বিশ্ব সম্মেলন নয়; বাংলাদেশেও স্থানীয় পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পরিসরে যেকোন নীতি নির্ধারণী আলোচনায় বা সমস্যা সমাধানে নারীর ক্ষমতায়নকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। কিন্তু এত সব সত্ত্বেও দেশ জুড়ে নারী হত্যা, ধর্ষণ ও নির্যাতন ক্রমশ বেড়েই চলেছে।[২] এজন্য নারীর পরিস্থিতির উন্নতি না হয়ে ক্রমশ অবনতি হচ্ছে।

ক্ষমতায়ন ধারণার উৎপত্তি

বিশ্বব্যাপী ক্ষমতায়ন শব্দটি আজ আর কারও কাছে অজানা নয়। এটি একটি বহুল ব্যবহৃত, আলোচিত এবং বিতর্কিত প্রত্যয়ও বটে। বঞ্চিত উদ্দেশ্য অর্জনই ক্ষমতায়নের লক্ষ্য। যার মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অধিক অংশগ্রহণ, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, দারিদ্র দূরীকরণ কিংবা বৈষম্য দূরীকরণ প্রভৃতি। আর ক্ষমতায়ন ধারণাটি প্রথম ব্যবহার করেন প্রখ্যাত তাত্ত্বিক Paulo Freire ১৯৭২ সালে।

১৯৫০ ও ১৯৬০ এর দশকের উন্নয়ন ডিসকোর্সের সীমাবদ্ধতা ও অসারতার কারণে এবং অভিজ্ঞতার আলোকে ১৯৭০ ও ১৯৮০'র দশকে উন্নয়ন কৌশলকে নতুনভাবে জানানোর প্রয়াস চালানো হয়। এ সময় সংযোজিত হয়

---

১. ড. আব্দুল কুদ্দুস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫, Sushama Shahay বলেন, Women's empowerment includes both a personal strengthening and enhancement of life chances, and collective participation in efforts to achieve equality of opportunity and equity between different genders, ethnic groups, social classes, and age groups. It enhances human potential at individual and social levels of expressions. Empowerment is an essential starting point and a continuing process for realizing the ideas of human liberation and freedom for all. [Sahay, Sushama, *Women and Empowerment Approaches and Stratagies,* (New Delhi : Discovery Publishing House, 1998), P.10.)]

২. শামীমা পারভীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

অনেক চিত্তাকর্ষক কৌশল, যা উন্নয়ন রিটোরিক (Rhetoric বা পন্থা) কে সমৃদ্ধ করেছে।[১] উন্নয়নকে আরও গণমূখী ও কার্যকরী করার জন্যে জনগণের অংশগ্রহণের উপর জোর দেয়া হয়। 'ক্ষমতায়ন' একটি প্রভাবশালী ধারণা হিসেবে ক্রমে ক্রমে গুরুত্ব পায়। বলা যেতে পারে যে, ক্ষমতায়ন প্রকৃত প্রস্তাবে নতুন কিছু নয়; বরং এটি সংযোজিত হয়েছে মূলধারার উন্নয়নকে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে। মূলত মূলধারা উন্নয়ন প্রবক্তাদের পুরানো কৌশল নতুন আদলে।[২]

নারীর ক্ষমতায়ন আধুনিক উদ্যোগ (Approach)।[৩] সমদর্শী উদ্যোগের ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে তৃতীয় বিশ্বের নারীবাদী সাহিত্য ও তৃণমূল সংগঠনের অভিজ্ঞতা থেকে এর উদ্ভব ঘটেছে ১৯৭৫ সাল পরবর্তী সময়ে। অবশ্য এই উদ্যোগটি এখনও একটি কার্যকরী উদ্যোগ রূপে ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি লাভ করেনি; কিংবা সেভাবে সংকলিত হয়নি। ক্ষমতায়ন উদ্যোগ মূলত নারীদের নিজেদের জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধির উপর আলোকপাত করে। এর লক্ষ্য হলো ব্যাপক আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন। আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে নিজেদের ক্ষমতায়নের প্রত্যাশী নারী গ্রুপের মধ্য থেকে এই ক্ষমতায়ন উদ্যোগ এসেছে এবং তা প্রচলিত উন্নয়ন ধারাকে বর্জন করে নতুন ধারার উন্মেষ ঘটায়।

অর্থাৎ নারীর ক্ষমতায়নের স্লোগানটি সর্বপ্রথম উচ্চারিত হয় ১৯৭৫ সালে মেক্সিকোতে বিশ্ব নারী সম্মেলনে। এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল নর-নারীর অধিকার সংরক্ষণ নীতি। এ নীতির মূখ্য বিষয় হলো নারীর ক্ষমতায়ন। এ শতাব্দীতে নারীর ক্ষমতায়ন একটা আন্তর্জাতিক বিষয়। একজন মানুষ যখন জীবিকা নির্বাহের পাশাপাশি কারো উপর নির্ভরশীল না হয়ে তার সম্পর্কিত সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে; এ অবস্থাটিই হচ্ছে ক্ষমতায়ন।[৪] তবে ক্ষমতায়ন শব্দটি ক্ষমতার সাথে বিশেষ করে ব্যক্তি ও দলের মধ্যে ক্ষমতার সম্পর্ক পরিবর্তন এবং ক্ষমতার বণ্টনের সাথে সম্পর্কিত। সহজভাবে বলা যায়, বস্তুগত, মানবিক ও বুদ্ধিভিত্তিক সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণকে ক্ষমতা বলে। একাধিক সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তি বা সামাজিক ক্ষমতার উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়। সুতরাং ক্ষমতায়নকে এমন একটি প্রক্রিয়া এবং প্রক্রিয়ার ফলাফল হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে যেখানে সমাজের

---

[১] এস এম নূরুল আলম, *ক্ষমতায়ন ঃ অর্থনীতি, রাজনীতি ও বাস্তবতা* (ঢাকা : নৃ-বিজ্ঞান পত্রিকা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সংখ্যা-৪, ১৯৯৯ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৭৫।

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।

[৩] শাহীন রহমান,, *নারী উন্নয়ন নীতিমালা : পরোক্ষ উপকার ভোগী থেকে উন্নয়নের চালিকাশক্তি* (ঢাকা : উন্নয়ন পদক্ষেপ, স্টেপ্স টুয়ার্ডস ডেভেলেপমেন্ট, বর্ষ-৬, সংখ্যা-২০, এপ্রিল-জুন, ২০০০ খৃস্টাব্দ), পৃ. ২৪।

[৪] মোহসীন লাইজু, *নারীর ক্ষমতায়ন এবং সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন প্রসঙ্গে* (ঢাকা : দৈনিক সংবাদ, ৩১ অক্টোবর, ২০০০ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৫; *United Nations Development Programme (UNDP)* এর মতে, Empowerment is a process which enables individuals or groups to change balances of power in social, economic and political re'ations in society. It refers to many dirrerent activities including but not confined to awareness of the societal forces with people and to actions which change power relationships. Empowerment redistributes power from the powerful to powerless. *United Nation Development Programme* (UNDP), 1994. (ড. কুদ্দুস আব্দুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬।)

R. R. Prasad এবং Shushama Sahay এ প্রসঙ্গে বলেন, Empowerment is more than participation in decision making; it must also include the process that lead people to perceive themselves as able and entitled to make decisions. It involves givinng scope to the full range of human abilities and potential."; (Prasad, R.R. and Sahay, Sushama, *Models for Empowering Women in Empowerement of Women in South Asia* (Edited: Sinha, Kalpana), India, 2000, P. 20; Jo. Rowlands এর মতে, Empowerment must involve undoing negative social construction, so that people come to see themselves as having the capacity and the right to act and influence decisions" (শামীমা পারভীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।)

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতাহীনরা বা কম ক্ষমতাবানরা বস্তুগত এবং মানবিক সম্পদের উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে এবং বৈষম্য ও অবস্থানতার মতাদর্শ যা এই অসম বন্টনকে গ্রহণীয় করেছে তাকে চ্যালেঞ্জ করে।

ক্ষমতায়নের সাধারণত ৩টি দিক রয়েছে :

১. ব্যক্তিগত (Personal) : মানবিক উন্নয়নের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তির ক্ষমতায়ন। জীবন নির্বাহের পাশাপাশি কারো উপর নির্ভরশীল না হয়ে স্বীয় সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা অর্জনই ক্ষমতায়ন।

২. যৌক্তিক (Rational) : সম্পর্কের প্রকৃতি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ বৃদ্ধি করাই হচ্ছে ক্ষমতায়ন।

৩. সমষ্টিগত (Collective) : একজন ব্যক্তির যখন সামাজিক প্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকার সৃষ্টি হয় এবং রাজনৈতিকভাবে (স্থানীয়/অনানুষ্ঠানিকসহ) মতামত দেয়ার অধিকার সৃষ্টি হয় তখন এ পরিস্থিতিকে বলে ক্ষমতায়ন।

এছাড়া ক্ষমতায়নের আরো কতগুলো দিক পরিলক্ষিত হয়। যথা :

১. অর্থনৈতিক দিক : পরনির্ভরশীলতা দূর করে স্বাবলম্বিতা অর্জনই ক্ষমতায়নের অর্থনৈতিক দিক।

২. সামাজিক দিক : সামাজিক প্রতিষ্ঠানে একজন মানুষের যখন প্রবেশাধিকার সৃষ্টি হয় এবং এসব প্রতিষ্ঠান থেকে সুফল ভোগ করতে পারে তখন তার সামাজিক ক্ষমতায়ন হয়।

উদাহরণস্বরূপ : ব্যক্তির সামাজিক ক্ষমতায়ন হলে সমাজে বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ব্যাংক, সালিশ প্রভৃতি নানা সামাজিক প্রতিষ্ঠান থেকে সুবিধাভোগী ও সুযোগ গ্রহণ করতে সক্ষম হবে।

৩। **রাজনৈতিক দিক :** বর্তমানে রাজনীতি ক্ষমতায়নের শক্তিশালী উৎস। রাজনৈতিকভাবে মতামত দান ভোটাধিকার প্রয়োগ ও নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার লাভই রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন।

৪। **সাংস্কৃতিক দিক :** ব্যক্তি তার নিজস্ব সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ঐতিহ্য ধারণ করে নিজস্ব মনন বিকশিত করার অধিকারই ক্ষমতায়নের সাংস্কৃতিক দিক।

উদাহরণস্বরূপ : নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নারী বস্তুগত এবং মানবিক সম্পদের উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে, পিতৃতন্ত্র ও সকল প্রতিষ্ঠান এবং সমাজের সকল কাঠামোয় নারীর বিরুদ্ধে জেণ্ডার ভিত্তিক বৈষম্যকে চ্যালেঞ্জ করে। বিভিন্ন প্রখ্যাত তাত্ত্বিক এ প্রসঙ্গে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন।[১]

নারীর ক্ষমতায়নের নির্দেশক

---

[১]. প্রখ্যাত তাত্ত্বিক Hazal Johnson এর মতে, Women Empowerment involves gaining a voice, having mobility and establishing a public presence. Although women can empower themselves by obtaining some control over different aspects of their daily lives, empowerment also suggests the need to gain some control over power structure, or to change them." ; এ প্রসঙ্গে, P.K. Garba 'র মন্তব্য হচ্ছে "Women Empowerment is the capacity to influence and participate in decision that directly or indirectly affect their lives, is a key issue in raising their rights to full participation in decision that affect them." J.K. Pillai বলেন, "Women Empowerment is an active, multi-dimensional process which enables women to realize their full identity and powers in all spheres of life" ; তবে নারীর ক্ষমতায়ন প্রত্যয়টিকে সুস্পষ্টরূপে সংজ্ঞায়িত করতে প্রখ্যাত গবেষক Kamla Bhasin এর ধারণাটি উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে, Empowerment of women means: *recognizing women's contribution, women's knowledge.* helping women fight their own fears, and feelings of inadequancy and inferiority. *women enhancing their self-respect and self-dignity. * women controlling their own bodies.*women becoming economically independent and self-reliant.* women controlling resources like land and property.* reducing women's burden of work, specially within the home. * creating and strengthening women's groups and organizations. * promoting qualities of nurturing, caring gentleness, not just in. (ড. কুদ্দুস আব্দুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬।)

Dhaka University Institutional Repository

নারীর ক্ষমতায়নের স্বরূপ ও ব্যপ্তি অনেক ধরণের হতে পারে। আর তা পরিমাপের জন্য অনেক নির্দেশক ব্যবহার করা হয়। যাকে গুণগত নির্দেশক এবং পরিমাণ নির্দেশক হিসেবে বর্ণনা করা যায়।

নির্দেশক গুলি নিম্নরূপ :

১। নারীর জীবনের গতিশীলতা;

২। নারীর আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা;

৩। নারীর ক্ষুদ্র ক্রয়ের ক্ষমতা;

৪। নারীর বড় ক্রয়ের ক্ষমতা;

৫। বড় সিদ্ধান্তে নারীর অংশগ্রহণ;

৬। পারিবারিক আধিপত্য থেকে নারীর স্বাধীনতা;

৭। রাজনৈতিক ও গণ প্রতিবাদে নারীর অংশগ্রহণ ও প্রচারণা।

আর উপরিউক্ত নির্দেশক গুলো একজন নারীর জীবনে পুরোপুরিভাবে বিরাজমান থাকলে আমরা ধরে নেব তার ক্ষমতায়ন হয়েছে।

নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্য

যেসব লক্ষ্যকে সামনে রেখে নারীর ক্ষমতায়ন ঘটানো হয় তা হলো :

১। পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ এবং নারীর অধঃস্তনতার অনুশীলনকে চ্যালেঞ্জ ও পরিবর্তন আনয়ন করা;

২। নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টিকারী কাঠামো, ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করা;

৩। বস্তুগত এবং জ্ঞান সম্পদের উপর প্রবেশাধিকার ও নিয়ন্ত্রণ;

৪। নারীর ক্ষমতায়ন পুরুষকেও ক্ষমতাবান করবে। কারণ, নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া পুরুষের বিরুদ্ধে নয়, পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং এর সকল প্রকার প্রকাশের বিরুদ্ধে।

৫। নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া পুরুষকেও নারী নির্যাতন ও শোষণকারীর ভূমিকা থেকে মুক্তি দিবে। বিদ্যমান সমাজে পুরুষের দায়িত্ব বলে যে সব কাজ আছে, তা থেকে মুক্তি পাবে। এতে পুরুষরাও গৃহকাজ এবং শিশু প্রতিপালনে অংশ নেবে। বিনিময়ে নারীরাও পুরুষের কাঁধে চাপানো সনাতন দায়িত্বপালনে অংশীদার।[১]

নারীর ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া

নারীর ক্ষমতায়ন মূলত একটি প্রক্রিয়া। যার মাধ্যমে বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়ন ঘটে।[২] মতাদর্শ হচ্ছে অন্যায় ক্ষমতা কাঠামো টিকিয়ে রাখার মূল শক্তি, তাই সচেতনতার স্তর পরিবর্তনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয় তার মনে। নারীর নিজের সম্পর্কে, তার অধিকার, সক্ষমতা ও সম্ভবনা সম্পর্কে অবগত হওয়া, জেণ্ডার ও অন্যান্য সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক শক্তিসমূহ কীভাবে নারীর উপর কাজ করছে সে বিষয়ে সচেতন হওয়া। শিশুকাল থেকে নারীর মধ্যে নীচুতার যে বোধ মুদ্রিত করা হয়েছে তা থেকে মুক্ত হওয়া। নিজের শক্তি, জ্ঞান, বুদ্ধি ও দক্ষতাকে নিজের ভেতর থেকে স্বীকৃতি দেয়া; সর্বোপরি তারও যে

---

১. শামীমা পারভীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

২. বিশিষ্ট তাত্ত্বিক M. Karl নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ার কতকগুলো স্তর উল্লেখপূর্বক একটি ছক উপস্থাপন করেছেন : Awareness Building Stage, Skills and Capacity Assessment Stage, Capacity Building and Skills Development stage, Participation and Greater Conro1 in Decision Awaking Stage, Action for Change Stage, Capacity and Skills Assessment Stage. (Karl, M. *Women and Empowrment. Participation in Decision Making* (London : 1990, P. 154), pp.13-48. ; ড. কুদ্দুস আব্দুল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬।)

Dhaka University Institutional Repository

সম্মানিত হবার অধিকার আছে তা বিশ্বাস করা এবং বুঝতে শেখা যে তাকে এবং অপর নারীদেরকে এ অধিকার আদায় করতে হবে কেননা যারা ক্ষমতাধারী তারা স্বেচ্ছায় এ ক্ষমতা দেবে না।

ক্ষমতাহীন ও নিপীড়িতদের ক্ষমতা এবং অধিকারের দাবি জানাতে হবে। কিন্তু যে অধঃস্তন অবস্থানে নারী রয়েছে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের অধিকারের দাবি করতে পারে। সামাজিকায়ন প্রক্রিয়ায় নারী-পুরুষের বিদ্যমান বৈষম্যকে নারী স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে। তাই বাইরের শক্তি দ্বারা ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়াকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এই শক্তি নানারূপ হতে পারে। এর মানে এই নয় যে, তাদেরকে নারী অধিকার কর্মী, নারী সংগঠন বা এনজিও হতে হবে। দরিদ্র নারীদের সংগঠনও ভূমিকা রাখতে পারে। শিক্ষা অন্যতম পরিবর্তনের প্রতিনিধি হতে পারে।

নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া যৌথভাবে শুরু করতে হবে। ইতিহাসে আমরা দেখি যে, একজনের অবস্থানের পরিবর্তন হলেই সকল নারীর অবস্থান পরিবর্তন হয় না। সবসময়েই এমন নারীরা ছিল যারা তাদের সময়ের বাঁধাকে অতিক্রম করে গেছেন। যেমন, রাজিয়া সুলতানা, রাণী লক্ষ্মীবাঈ, বেগম রোকেয়া এবং আরো অনেকে। কিন্তু তারা সব নারীর জন্য স্থায়ী কোন পরিবর্তন আনতে পারেননি। এছাড়া যখন একজন বা দুইজন নারী সমাজের প্রচলিত ধারা ভাঙে তখন সমাজ তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। কিন্তু যদি একসাথে অনেকে কোন পরিবর্তন দাবি করে, তবে সমাজের জন্য সে দাবি অগ্রাহ্য করা কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ গোষ্ঠীর ক্ষমতা সবসময় একজন ব্যক্তির ক্ষমতার চেয়ে বড়। ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া এমন যেখানে নারী যৌথভাবে তাদের নিজের জন্য সময় এবং স্থান তৈরী করে, যেখান থেকে তারা তাদের জীবনকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে পারে ও নতুনভাবে সচেতনতা তৈরী করতে পারে, সংসারের ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে নারীকে পুরোনো সমস্যা নতুনভাবে দেখতে, তাদের পরিবেশ ও অবস্থা বিশ্লেষণ করতে শেখায়। তারা তাদের শক্তি অনুধাবন করে, নতুন ধরণের তথ্য ও জ্ঞানে তারা প্রবেশাধিকার লাভ করে এবং বিভিন্ন ধরণের সম্পদে নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের ক্ষেত্রে উদ্যোগী হয়। নারীর ক্ষমতায়ন কোনো বৃত্তে সীমিত থাকতে পারে না। এটি গতি ও পরিবর্তনের মাধ্যমে চক্রাকারে উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়। সচেতনতা, সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও পরিবর্তনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণে সে তৎপর হয়। এই পদক্ষেপ নারীকে উচ্চ স্তরের সচেতনতা এবং কার্যকরী ও সম্পাদিত কৌশলের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এই ক্ষমতায়ন চক্র-পরিবর্তনের প্রতিনিধি, যৌথ নেতৃত্ব এবং পরিবেশকে সম মাত্রায় না হলেও প্রভাবিত করে। তাই ক্ষমতায়ন একমাত্রিক হতে পারে না। ক্ষমতায়ন কেবল মানসিক অবস্থার পরিবর্তন নয়, বরং এই পরিবর্তনের দৃশ্যমান প্রকাশও থাকতে হবে। সমাজ যাতে পরিবর্তন স্বীকার করে নেয় সে ব্যবস্থাও করতে হবে। ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ উন্নয়ন প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব আছে। কেউ নারীর তাৎক্ষণিক সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হয়, কেউ বা কাঠামোগত অসমতা-যা এ সকল সমস্যা তৈরী করেছে তার বিরুদ্ধে ক্রিয়াশীল। অনেক নারীবাদী সমাজবিদ তাই নারীর এ পরিণতিকে অবস্থা এবং অবস্থান এই দু'ভাগে ভাগ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, "অবস্থা হচ্ছে বস্তুগত, যার মধ্যে একজন দরিদ্র নারী বসবাস করে।" যেমন, নিম্ন মজুরি, অপুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবার অভাব, শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ প্রভৃতি। অন্যদিকে 'অবস্থান' হচ্ছে পুরুষের তুলনায় নারীর সামাজিক এবং অর্থনৈতিক মর্যাদা। বেশিরভাগ নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রেই নারীর অবস্থা পরিবর্তনের দিকে গুরুত্ব দেয়া হয়। কিন্তু নারীর ক্ষমতাহীনতা এবং অসমতার যে কাঠামো তা পরিবর্তনে তৎপরতা দেখা যায় না। এতে তাদের অবস্থার খানিকটা পরিবর্তন হলেও অবস্থান একই থেকে যায়। তাই নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া করতে হবে তার অবস্থা ও অবস্থান পরিবর্তনের জন্য। নারীর ক্ষমতায়ন সমাজকে কাঙ্খিত পরিবর্তন এনে দিতে পারে না, যতক্ষণ না এটি রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এর অর্থ হচ্ছে, ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া সংগঠিত গণআন্দোলনে রূপায়িত হতে হবে যা, বিদ্যমান ক্ষমতা কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করবে এবং পরিবর্তন করবে। ক্ষমতা সম্পর্কে নতুন বোধের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ক্ষমতা মানে ব্যক্তিগত স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য নিয়ন্ত্রণ বা শোষণ নয়। বরং প্রকৃত অর্থে ক্ষমতা মানে অংশগ্রহণ, আদান-প্রদান সকল মানবের সম্ভাবনার বিকাশ ও উন্নয়ন।[১]

---

[১]. শামীমা পারভীন, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে নারীর ক্ষমতায়ন

রাজনীতি ও ক্ষমতা কাঠামোয় জনগোষ্ঠীর অর্ধেক অংশ নারী। সমাজের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ছাড়া কখনোই সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ সমতার ভিত্তিতে যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারলেই কেবল মাত্র গণতন্ত্র প্রকৃত গুণগত মাত্রা অর্জন করবে। সুতরাং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীকে সম্পৃক্ত করণের মূল হাতিয়ার হলো ক্ষমতা কাঠামো ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বস্তরে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ। তাই বৈশ্বিক, ক্ষমতা কাঠামো ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ এবং পাশাপাশি বাংলাদেশের ক্ষমতা কাঠামো ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী প্রতিনিধিত্বের একটি বিশ্লেষণমূলক আলোচনা প্রয়োজন।

বিশ্বের অনেক প্রান্তে কর্মক্ষেত্রে যেমন নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে, তেমনি নারী হচ্ছে দিন দিন সচেতন এবং নিজের প্রয়োজনেই বিশ্বজুড়ে নারী সমাজ আজ ঘরের বাইরে আসছে। কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও ক্ষমতা কাঠামোতে খুব কম সংখ্যক নারীকেই দেখতে পাওয়া যায়। গত কয়েক বছরে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী পদগুলোতে নারীর অবস্থান অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে। কোথাও কোথাও অবশ্য হ্রাসেরও দৃষ্টান্ত রয়েছে। তাই UNIC (United Nations Information Centre) এর ২০০০ সালের মে মাসে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিনে বলা হয়, "Women's representation at the highest levels of national and international decision making has not changed in the five years since the 1995 Forth World Conference on Women in Beijing. Women continue to be in the minority in national parliaments, with an average of 13 percent world wide in 1999, despite the fact that women comprise the minority of the electorate in almost all countries."[১]

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত আধুনিক বিশ্বে ১৯৯৭ সালে ১৫ জন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তন্মধ্যে ৬ জন এশিয়ায়, ৫ জন ইউরোপে, ৩ জন ল্যাটিন আমেরিকায় এবং ১ জন আফ্রিকায়। এখানে দেখা যায়, বিশ্বের মধ্যে এশিয়ার দেশগুলোর সরকার বা শাসন ব্যবস্থার সর্বোচ্চ পদে নারীদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত বেশি। এছাড়া পৃথিবীর প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমাভো বন্দরনায়েক একজন শ্রীলংকান তথা এশীয়। এদিকে আধুনিক বিশ্বে তখন ৫ জন মহিলা প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এখানেও এশীয়দের সংখ্যাধিক্য। নির্বাচিত এ সকল প্রেসিডেন্ট হলেন আর্জেন্টিনার ইসাবেলা পেরন সোবেট, ফিলিপাইনের কোরাজন একুইনো, নিকারাগুয়ার ভেলিয়াটা জুলিয়াস, শ্রীলংকার চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা ও আইসল্যান্ডের ভিগদিস ফিন বুগাদাত্তিব।[২] কিন্তু বর্তমানে এ সংখ্যা কমে গেছে। যেমন- ১৯৯৯ সালের আগস্ট পর্যন্ত রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান পদে ১০ জন নারী ছিলেন। তাদের দেশসমূহ হলো- বাংলাদেশ, ঘানা, আয়ারল্যান্ড, লাটভিয়া, নিউজিল্যান্ড, পানামা, স্পেন, মেরিনো, শ্রীলংকা (প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট) এবং সুইজারল্যান্ড। তাছাড়া সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, সচিব, দপ্তর প্রধান প্রভৃতি পর্যায়ে নারীর প্রতিনিধিত্বে অগ্রগতির হার অত্যন্ত মন্থর।[৩] যেমন- সারা বিশ্বের ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের মধ্যে ১৯৯৬ সালে ৬.৮%, ১৯৯৭ সালে ৭% এবং ১৯৯৮ সালে ৭.৪% নারী ছিলেন। ১৯৯৯ সালে আইনসভার উচ্চকক্ষ গুলোতে ৫ হাজার ৬শ' ৩৯ জন পুরুষ প্রতিনিধির সাথে মাত্র ৬শ' ৭৭ জন নারী প্রতিনিধি ছিলেন। এদিকে আইন সভাগুলোতে নারীর গড়ে ৩৬.৪ ভাগ আসন নিয়ে আনুপাতিক হারের দিক থেকে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলো পুরোভাগ রয়েছে। সুইডেনে নিম্নপরিষদে নারীর হার সর্বোচ্চ শতকরা ৪০.৪ ভাগ। জাতিসংঘ সচিবালয়ে উর্ধ্বতন

---

১. United Nations, *A Monthly News Bulletin from UNIC* Vol- XII (Dhaka : May 2000), P. 3.
২. *দৈনিক ইত্তেফাক* (ঢাকা : ইত্তেফাক প্রধান কার্যালয়, আর কে মিশন রোড, ৫ জুলাই, ১৯৯৭ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৮।
৩. *The Daily Observer* (Dhaka : Head Office, June-6, 2000), p.10.

Dhaka University Institutional Repository

ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে নারীর প্রতিনিধিত্বের বৃদ্ধিতে কিছুটা অগ্রগতি হলেও ২০০০ সাল নাগাদ শতকরা ৫০ ভাগে উপনীত হবার লক্ষ্য অর্জিত হয়নি।[১]

UNIC (United Nations Information Center) এর বুলেটিনে আরো বলা হয়- "Since 1 January 1999, the percentage of women on appointment subject to geographical distribution increased from 377 percent to 38.6 percent. Although the rate of progress is improving women's overall representation remains slow head way has been made in improving the representation of women at the senior and policy making levels. Since the submission of the Secretary Generals Strategic Plan of Action for the Improvement of the Status of Women in the Secretariat (1995-2000) in November 1994. The percentage of women of the Deputy Director level and above has risen from 15.1 percent to 29.7 percent."[২] এদিকে সম্প্রতি ফিনল্যান্ডের ইতিহাসে প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন সে দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তারজা হ্যালোনেন। এর মধ্য দিয়ে ফিনল্যান্ডের রাজনীতি ও সরকারী কাজে নারীদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। ফিনিস পার্লামেন্টের ২০০ সদস্যের মধে ৭৪ জনই হচ্ছে নারী। তাছাড়া ইউরোপের মধ্যে ফিনল্যান্ডের নারীরাই সর্বপ্রথম ভোটের অধিকার লাভ করেছিলেন।

ইউরোপের প্রধান দুটি দেশ বৃটেন ও ফ্রান্স। ১৯৯৭ সালের মে মাসে দেশ দুটিতে সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। উভয় দেশের এ সংসদ নির্বাচনে নারীরা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আসন পেয়ে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছেন। পশ্চিমা বিশ্লেষকগণ এটাকে বলেছেন 'Gender Revolution'।[৩] বৃটেনের House of Commons-এর ৬৫৯ আসনের মধ্যে নারীরা লাভ করেছেন ১২০টি, যা গত বারের তুলানায় প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ইউরোপের অপর একটি অন্যতম দেশ ফ্রান্স। রাজনীতি যেখানে পুরুষের খেলা।[৪] সেখানে ৫৭৭ আসনের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে ৬২ জন নারী নির্বাচিত হয়েছেন, যা গতবারের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। মন্ত্রী পরিষদে ৬ জন নারী গুরুত্বপূর্ণ পদে যেমন, বিচার, পরিবেশ, যুব ও ক্রীড়া এবং সরকারী চাকুরী মন্ত্রণালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। শুধু মন্ত্রণালয়েই নয়; সংস্কৃতি মন্ত্রী ক্যাথরিন স্টেটম্যানকে জসপিনের মুখপাত্র নিয়োগ করা হয়। এছাড়া শ্রম মন্ত্রী মার্টিন আব্রে জসপিন না থাকলে তার ভারপ্রাপ্ত হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়। অথচ ফ্রান্সে নারী ভোটাধিকারের ইতিহাস তেমন দীর্ঘ নয়। ১৯৮৫ সালে এখানে নারীরা ভোটাধিকার লাভ করেন।[৫] নির্বাচন দুটির মধ্যে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, বৃটেন ও ফ্রান্স উভয় দেশে প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল থেকেই নারী সাংসদ অধিক হারে নির্বাচিত হয়েছেন। এ থেকে এটিই স্পষ্ট যে, অতিমাত্রায় রক্ষণশীলতা নারীর ক্ষমতায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের প্রতিবন্ধক। তবে গতিশীল সমাজে এ প্রতিবন্ধকতা ক্রমশ দূরীভূত হচ্ছে। পূর্ব ইউরোপে আবার এর বিপরীত অবস্থা বিদ্যমান। সেখানে বাজার অর্থনীতি ও অবাধ সংসদ নির্বাচনের লক্ষ্য পরিবর্তনের ফলে সংসদে নারীর হার মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে। পূর্বেকার শাসনামলে প্রবর্তিত নারী ভোটার বিলুপ্তি পার্লামেন্টে তাদের সংখ্যা নিদারুনভাবে কমিয়ে ফেলেছে। কোন কোন দেশে পরিস্থিতির ক্রমোন্নতি হলেও পূর্ব ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত বহুদলীয় গণতন্ত্র রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নর-নারীর সমান প্রতিনিধিত্বের নিশ্চয়তা দেয় নি।

---

১. আবেদা সুলতানা, *ক্ষমতা কাঠামো ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী : বৈশ্বিক ও বাংলাদেশ বিষয়ে একটি অনুসন্ধান*, ক্ষমতায়ন (ঢাকা : উইমেন ফর উইমেন, সংখ্যা-৩, ২০০০ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৪।

২. United Nations, প্রাগুক্ত, P. 4.

৩. দৈনিক ইত্তেফাক, ৫ জুলাই, ১৯৯৭, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

৪. সুলতানা, আবেদা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।

Dhaka University Institutional Repository

অপর এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, চলতি শতাব্দীতে বিশ্বের মাত্র ২৪ জন নারী রাষ্ট্র প্রধান বা সরকার প্রধান নির্বাচিত হয়েছে। এই রাষ্ট্রগুলোর অধিকাংশই উন্নয়নশীল রাষ্ট্র এবং এর মধ্যে ৪টি এশিয়ায় অবস্থিত (ফিলিপাইন, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, পাকিস্তান)। ১৯৯৬ সাল নাগাদ গোটা বিশ্বের ১০ জন নারী রাষ্ট্র প্রধান হন। এই দেশ গুলো হলো- বাংলাদেশ, ডোমিনিকা, আইসল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, নিকারাগুয়া, নরওয়ে, পাকিস্তান, তুরস্ক, শ্রীলংকা (১জন প্রেসিডেন্ট ও ১জন প্রধানমন্ত্রী)। ১৯৯০ সালে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মন্ত্রী পরিষদের মধ্যে মাত্র শতকরা ৩.৫ জন ছিলেন নারী মন্ত্রী। অধিকাংশ নারী মন্ত্রী গুরুত্বহীন বা 'সফট' মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত এবং বিশ্বের ৯৩টি দেশে কোন মহিলা মন্ত্রী ছিলেন না। বিশ্বের বিভিন্ন সরকারের মন্ত্রীসভায় নারী সদস্য (১৯৮৭ সালে) ৩.৪ থেকে দ্বিগুণ হয়ে ১৯৯৬ সালে ৬.৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।[১] বিশ্বের ৬২টি দেশে এখন পর্যন্ত কোন মহিলা মন্ত্রী নেই।

যদিও নারীরা মোট ভোটারের অর্ধেক তবুও তারা বিশ্বব্যাপী মাত্র জাতীয় সংসদের ১২% আসন লাভ করেছেন। ১৯৯৬ সালে নারী সংসদ সদস্যের অনুপাত বিশ্বজুরে আরো হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১১.৭% এ। এদিকে সুইডেন পার্লামেন্টে নারী প্রতিনিধিত্বের হার সবচেয়ে বেশি। শতকরা ৪০.৪ ভাগ। ১৯৯৫ সালের গোড়ার দিকে সমান সংখ্যক নারী-পুরুষ নিয়ে বিশ্বে সুইডেনই প্রথম মন্ত্রীসভা গঠনে করে।[২]

জাতিসংঘ

সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারীদের অগ্রগতি সাধনে জাতিসংঘের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ২০০০ সালের ১ মে জাতিসংঘের মহাসচিব ইউরোপের জাতিসংঘের অর্থনৈতিক কমিশনের নির্বাহী সচিব পদে পোল্যান্ডের দানুতা হারবাকে নিয়োগ দেন। তিনিই জাতিসংঘের কোনো আঞ্চলিক কমিশনারের নির্বাহী সচিব পদে প্রথম নারী। এছাড়া জাতিসংঘের অপর চারটি আঞ্চলিক কমিশনের তিনটিরই উপ-নির্বাহী সচিব পদে মহিলা নিযুক্ত রয়েছেন। পশ্চিম এশিয়ার জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন, এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন এবং আফ্রিকার জন্য অর্থনৈতিক কমিশন। নীতি নির্ধারণী ও নেতৃস্থানীয় পদগুলোতে বিপুল হারে মহিলা নিয়োগ করে জাতিসংঘ এমন এক মান অর্জন করেছে যা তার বেশির ভাগ সদস্য রাষ্ট্র এখনো অর্জন করতে পারেনি। আন্তঃপার্লামেন্টারী ইউনিয়নের পরিসংখ্যান অনুযায়ী মাত্র ১৬টি দেশে পার্লামেন্টের আসনে শতকরা ২৫ ভাগ বা তার বেশি নারী রয়েছেন। বিশ্বব্যাপী মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, মিনিস্টার ডেলিগেট, উপমন্ত্রী, সেক্রেটারি অব স্টেট, ডেপুটি সেক্রেটারি অব স্টেট বা সংসদ সচিব পর্যায়ে সরকারের নির্বাহী শাখার শতকরা মাত্র ১১.৭ ভাগ পদে নারী রয়েছে। এছাড়া জাতিসংঘ প্রটোকল ও লিয়াজু সার্ভিসের ২০০০ সালের ০১ মে তারিখের হিসেব অনুযায়ী বিশ্বে মাত্র কয়েক জন নারী রাষ্ট্র বা সরকার প্রধান ছিলেন।[৩] তবে জাতিসংঘ সচিবালয়ের উর্ধ্বতন ও নীতি নির্ধারণী পদগুলোতে নারীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিচালক বা তদুর্ধ্ব পর্যায়ের পদে বর্তমানে শতকরা ২৪.৫ ভাগ নারী রয়েছেন। সার্বিকভাবে ২০০০ সালের ৩০ মার্চের হিসেবে শতকরা ৩৮.৯ ভাগ পেশাদারী ও স্টাফ পর্যায়ের উচ্চতর পদে মহিলা রয়েছেন। এখানে নারীর প্রতিনিধিত্ব শতকরা বার্ষিক ১.২ ভাগ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা অত্যন্ত মন্থর হার। এই হারে ২০১২ সালের আগে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। সার্বিক অবস্থা অবলোকনে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর সরব পদচারণা ক্রমবর্ধমান বাস্তবতা হয়ে উঠলেও এখনো বিশ্বজুড়ে প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর

---

১. শাহীন রহমান, *নারী চিত্র : রাজনীতি, প্রশাসন নীতি নির্ধারণী অবস্থান* (ঢাকা : উন্নয়ন পদক্ষেপ স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, বর্ষ-৩, সংখ্যা-৮, এপ্রিল-জুন, ১৯৯৭ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৩২।

২. নূর কামরুন নাহার ও পাটোয়ারী, শাহজাহান, *রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়ন* (ঢাকা : দৈনিক যুগান্তর, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০০০ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৮।

৩. আবেদা সুলতানা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।

Dhaka University Institutional Repository

অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক সম্পদের উপর তাদের নিয়ন্ত্রন খুবই নগণ্য। আজও পৃথিবীর কোথাও নারীরা একজন পুরুষের মত পরিপূর্ণ রাজনৈতিক মর্যাদা উপভোগ করে না।[১]

দক্ষিণ এশীয়

'দক্ষিণ এশিয়া'[২] অঞ্চলে একজন নারী মানুষ হিসেবে পরিচিতি পায়না। দক্ষিণ এশিয়া পৃথিবীর সর্বাধিক বঞ্চিত অঞ্চল। এখানকার বঞ্চিত মানুষের সবচাইতে বড় বোঝা বহন করে নারীরা। অন্যান্য স্বল্প আয় অঞ্চলের মতো দক্ষিণ এশিয়ার দারিদ্র যেন একটা নারীর মুখমণ্ডলে মূর্তিমান। মৌলিক উন্নয়নের মাধ্যমে জীবনের সুযোগগুলোর সঠিক সদ্ব্যবহার করে নারীকে তাদেরকে ক্ষমতাবান করে তোলার জন্য যতটুকু বিনিয়োগ প্রয়োজন এ যাবতকালে তার সামান্যই বাস্তবায়িত হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার লিঙ্গ সম্পর্কিত উন্নয়ন সূচকের মান হচ্ছে ০.৪১ ('Gender Development Index' বা GDI গড়পড়তা মানব উন্নয়নকে লিঙ্গ বৈষম্য সম্পৃক্ত করে পরিমাপ করে)। এ সূচক উন্নয়নশীল বিশ্বের গড়ের চাইতে ২৫ শতাংশ নিচে এবং শিল্পোন্নত দেশগুলোর গড় সূচকের অর্ধেকেরও নিচে। লিঙ্গ ক্ষমতার পরিমাপে বিচার করলে দক্ষিণ এশিয়ার নারীদের করুণ অবস্থান আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ অঞ্চলের জিইএম সূচক ০.২৩, যা কিনা পৃথিবীর সব অঞ্চলের, এমন কি সাব-সাহারা আফ্রিকার চাইতেও কম ('Gender Empowerment Measure' বা GEM রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগগুলোর প্রতিফলন ঘটায়)।[৩] এ পর্যন্ত দক্ষিণ এশিয়ার নারীদের জন্য যতটুকুই সীমিত সামর্থ্যের সৃষ্টি করা হয়ে থাক না কেন, এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে গঠনমূলক অনেক কাজে তাদের অংশ গ্রহণ নেই। প্রাপ্ত সকল তথ্য-উপাত্ত থেকে নারীর প্রতি সুযোগগুলোর প্রত্যাখ্যান স্পষ্টভাবে বেরিয়ে আসে। এটা অবাক করার মতো বিষয় যে, যেখানে দক্ষিণ এশিয়ায় ৭টি দেশের প্রধানই নারী, সেখানে এ সব সুযোগগুলোতে তাদের প্রতি অবিচার খুব স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। নারীর প্রতি এ অবজ্ঞার মূলে আছে সমাজে গ্রোথিত তাদের নিম্নতর অবস্থান। যেমন, বিশ্বের সকল দেশেই বালক শিশুর প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রত্যক্ষ করা যায়। তবে, দক্ষিণ এশিয়ার সমাজগুলোতে অগ্রাভিরুচির মাত্রা অসহনীয়ভাবে বেশি। আর এ জন্য দক্ষিণ এশিয়াই একমাত্র অঞ্চল যেখানে নারীর তুলনায় পুরুষের সংখ্যা বেশি। যদিও শ্রীলংকা ও মালদ্বীপে পুরুষ ও নারী জনসংখ্যা প্রায় কাছাকাছি, নেপালে নারী-পুরুষ অনুপাত ৯৬ঃ১০০, পাকিস্তানে ৯৩ঃ১০০ এবং ভারত ও বাংলাদেশে ৯৪ঃ১০০।[৪]

দক্ষিণ এশিয়ার সর্বত্রই নারীর প্রতি এ অবজ্ঞা বহুবিস্তৃত ঘটনা। তা সত্ত্বেও, এতদঅঞ্চলের বিভিন্ন দেশের মধ্যে এ সম্পর্কিত কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। শ্রীলংকার কথা ধরা যাক। নারীর সামর্থ্য বৃদ্ধি ও তাদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি কল্পে শ্রীলংকায় যে বিনিয়োগ করা হচ্ছে তাকে অনেকটা সন্তোষজনক বলা চলে। শ্রীলংকায় নারী সাক্ষরতার হার ৮৬ শতাংশ, নারীর প্রত্যাশিত আয়ু পুরুষদের প্রত্যাশিত আয়ুর ১০৬ শতাংশ এবং নারীর অর্থনৈতিক কর্মহার ৩৬ শতাংশ। তা সত্বেও, সিদ্ধান্ত গ্রহণে এখনও শ্রীলংকার নারীরা শ্রীলংকার পুরুষদের চেয়ে অনেক পেছনে পড়ে রয়েছে। জাতীয় সংসদে তাদের অংশ মাত্র ৫ শতাংশ, মন্ত্রী পরিষদ অবস্থানগুলোতে ৩ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত স্থানগুলোতে ১৬ শতাংশ। সর্বোচ্চ প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা পদে তাদের অংশ ৩ শতাংশ এবং জাতীয় সংসদে নগন্য ১.৬ শতাংশ।[৫]

নিম্নে এ সংক্রান্ত একটি সারণী তুলে ধরা হলো :[৬]

---

১. শাহীন রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।

২. বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান শ্রীলংকা নেপাল ভুটান মালদ্বীপ মায়ানমার আফগানিস্তান। (গোলাম মোস্তফা কিরন, *আজকের বিশ্ব*, ঢাকা : প্রিমিয়ার পাবলিকেশন্স, মে ২০১৩ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৪৫৪।

৩. মাহবুবুল হক, (অনুবাদক: আব্দুল বায়েস), *দক্ষিণ এশিয়ার মানব উন্নয়ন* (ঢাকা : ইউপি এল, ১৯৯৭ খৃস্টাব্দ), পৃ. ২০।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।

৬. ILO 1994; IPU 1994; UN 1994c, 1994f, 1995b; UNDP 1996b; UNESCO 1994b, 1995a; UNICEF l995b; WHO এবং UNICEF 1996.

Dhaka University Institutional Repository

	দক্ষিণ এশিয়া	সাবহারা আফ্রিকা	পূর্ব এশিয়া (চীন ব্যাতীত)	সমস্ত উন্নয়নশীল দেশ
শিক্ষা রূপরেখা				
বয়স্ক সাক্ষরতা (%), ১৯৯৩	৩৪	৪৫	৯৪	৬০
১ম, ২য় এবং ৩য় শ্রেণীর মোট তালিকাভূক্তির অনুপাত (%), ১৯৯৩	৪৩	৩৭	৭৬	৫১
শিক্ষার গড় বছর, ১৯৯২	১.২	১.৩	৬.২	৩.০
স্বাস্থ্যের রূপরেখা				
মহিলা প্রত্যাশিত আয়ু, ১৯৯৩	৬১	৫৩	৭৫	৬৩
মাতৃ মৃত্যুহার, প্রতি ১০০,০০০ সজীব জন্মে, ১৯৯৩	৫৮৫	৯২৯	১০০	৩৮৪
মোট প্রজনন হার, ১৯৯৩	৪.২	৬.৪	১.৯	৩.৬
গর্ভ নিরোধক ব্যবহারকারী মহিলা (%)	৩৯	১৫	৭৯	৫৫
১৯৮৬-৯৩				
অর্থনৈতিক সুযোগ				
উপার্জিত আয়ের অংশ (%), ১৯৯৩	২৫	৩৬	২৭	৩১
অর্থনৈতিক কার্যক্রমের হার (বয়স ১৫+)(%), ১৯৯৪	৩০	৫২	৬২	৫০
প্রশাসক এবং ব্যবস্থাপক (%), ১৯৯০	৩	১০	৫	১০
রাজনৈতিক অংশগ্রহণ				
সংসদে মহিলাদের অংশ (%), ১৯৯৪	৭	১০	২	১১
মন্ত্রীপর্যায়ে মহিলাদের অংশ (%), ১৯৯৫	৪	৮	২	৮
মানব উন্নয়ন নির্দেশক				
মানব উন্নয়ন সূচক (HDI), ১৯৯৩	০.৪৩২	০.৩৭৯	০.৮৭৭	০.৫৬৩
লিঙ্গ উন্নয়ন সূচক (GDI), ১৯৯৩	০.৪০২	০.৩৬৬	০.৮০৮	০.৫৩০
লিঙ্গ ক্ষমতায়ন পরিমাপ (GEM), ১৯৯৩	০.২৩৩	০.২৭৯	০.২৮২	০.৩৫১

উৎস : ILO 1994; IPU 1994; UN 1994c; 1994f, 1995b, UNDP 1996b; UNESCO 1994b; 1995a; UNICEF 1995b; WHO এবং UNICEF 1996.

মুসলিম বিশ্ব

মুসলিম দেশগুলোর সর্বত্রই নারীর প্রতি অবজ্ঞা এক নিত্তনৈমিত্তিক ব্যাপার। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও ক্ষমতা কাঠামোর অবস্থান দূরের কথা এসব দেশে নারীর ন্যূনতম ক্ষমতায়ন ঘটেনি। এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশেই মূলত মুসলিম দেশগুলো অবস্থিত। তবে আশার কথা হলো মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে বেশিরভাগ রাষ্ট্রেরই সংবিধান অনুযায়ী নারীর মানবাধিকার স্বীকৃত। কিন্তু বাস্তবে নারীর মানবাধিকার বিপর্যস্ত হচ্ছে সর্বত্র।

পাকিস্তানে বিরাজমান আইনের অনেকগুলো নারী ও পুরুষের সমান অধিকারের স্থলে বৈষম্যমূলক আচরণ করে। অথচ, উভয়ের সমান অধিকার পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র দ্বারা স্বীকৃত এবং ধর্মীয় ঐতিহ্যর আলোকে সন্নিবেশিত। পৃথিবীতে পাকিস্তান একমাত্র দেশ যেখানে কোন নারী ধর্ষণের অভিযোগ করলে ব্যভিচারের দায়ে পাথর ছুঁড়ে

Dhaka University Institutional Repository

মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হয়, যদি না অভিযোগকারী আইনসিদ্ধ পাঁচ জন ধার্মিক পুরুষকে ধর্ষণ কাজের প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে হাজির করতে ব্যর্থ হয়।[১] এমনকি, অন্যান্য মুসলিম দেশের তুলনায়ও লিঙ্গ সংক্রান্ত ব্যাপারে পাকিস্তানের অবস্থান খারাপ পর্যায়ে। মানব বঞ্চনার মাত্রা এ অঞ্চলে খুবই বিস্তৃত। আর এর ভয়ানক শিকার হচ্ছে নারী ও শিশু, যারা সমাজের সেই সকল উপাদান, যাদের অব্যাহত অস্তিত্বের ওপর এ সমাজগুলোর ভবিষ্যত নির্ভরশীল।
নিম্নে এ সংক্রান্ত একটি সারণী তুলে ধরা হলো :[২]

নির্বাচিত মুসলিম দেশগুলোর লিঙ্গভিত্তিক রূপরেখা

	পাকিস্তান	বাংলাদেশ	মালয়েশিয়া	ইন্দোনেশিয়া	মরক্কো	তিউনেশিয়া
বয়স্ক স্বাক্ষরতা (%), ১৯৯৩	২৩	২৫	৭৬	৭৭	২৯	৫২
১ম, ২য় এবং ৩য় স্তরে মোট	২৪	৩৪	৬২	৫৮	৩৭	৬৩
তালিকাভূক্তির অনুপাত (%),	০.৭	০.৯	৫.২	৩.১	১.৬	১.২
১৯৯৩ শিক্ষার গড় বছর, ১৯৯২						
স্বাস্থ্য রূপরেখা						
প্রত্যাশিত আয়ু, ১৯৯৩	৬৩	৫৬	৭৩	৬৫	৬৫	৬৯
মাতৃ মৃত্যুর হার প্রতি ১০০,০০০ সজীব জন্মে, ১৯৯৩	৩৪০	৮৫০	৮০	৬৫০	৬১০	১৭০
মোট প্রজনন হার, ১৯৯৩	৬.১	৪.৭	৩.৬	৩.১	৪.৩	৩.৪
গর্ভনিরোধক ব্যবহারকারী মহিলা (%), ১৯৮৬-৯৩	১২	৪০	৪৮	৫০	৪২	৫০
অর্থনৈতিক সুযোগ						
উপার্জিত আয়ের অংশ (%), ১৯৯৩	১৯	২৩	২৯	৩২	২৭	২৪
অর্থনৈতিক কার্যক্রমের হার (বয়স ১৫+), ১৯৯৪	১৪	৬২	৪৫	৩৭	২১	২৬
প্রশাসন এবং ব্যবস্থাপক (%), ১৯৯২	৩	৫	৮	৭	২৬	৭
রাজনৈতিক অংশগ্রহণ						

---

১. মাহবুবুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

২. ILO 1994b; IPU 1994; UN 1994C, 1994f, 1995b; UNDP 1996b; UNESCO 1994b, 1995a; UNICEF 1995b; WHO এবং UNICEF 1996.

Dhaka University Institutional Repository

সংসদের মহিলাদের অংশ (%), ১৯৯৪	২	১০	১১	১২	১	৭
মন্ত্রী পর্যায়ে মহিলাদের অংশ (%), ১৯৯৫	৪	৫	৮	৪	০	৩
মানব উন্নয়ন নির্দেশনা						
মানব উন্নয়নসূচক (HDI), ১৯৯৩	০.৪৪২	০.৩৬৫	০.৮২৬	০.৬৪১	০.৫৩৪	০.৭২৭
লিঙ্গভিত্তিক উন্নয়নসূচক (GDI), ১৯৯৩	০.৩৮৩	০.৩৩৬	০.৭৭২	০.৬১৬	০.৪৮৬	০.৬৪৭
লিঙ্গ ক্ষমতায়ন পরিমাপ (GEM), ১৯৯৩	০.১৬৫	০.২৯১	০.৪২৫	০.৩৬৭	০.২৯৯	০.২৫৭

উৎস : ILO 1994b; IPU 1994; UN 1994C; 1994f, 1995b, UNDP 1996b; UNESCO 1994b, 1995a; UNICEF 1995b; WHO এবং UNICEF 1996.

বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন

ক. রাজনীতিতে : বাংলাদেশের রাজনীতির অঙ্গনে দুই নেত্রীর প্রধান্য ও প্রচণ্ড দৃশ্যমানতার পাশাপাশি বিরাজ করছে প্রায় নারী নেতৃত্ব শূন্যতা। স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়, সর্বস্তরে, বিশেষ ভাবে কাঠামোগত রাজনীতিতে নারীর অবস্থান মোটেই ব্যাপক, সংগঠিত বা সুসংহত নয়।[১] অর্থাৎ রাজনীতির অঙ্গনে নারীর অবস্থানের যে বাস্তবতা তা পরস্পর বিরোধী। উপরিকাঠামোতে যে অবস্থান তা অধিকাঠামোতে প্রতিফলিত হয়নি। বিশেষভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনেক ক্ষেত্রে নারী প্রায় সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের গুরুত্বপূর্ণ কমিটিগুলো পর্যবেক্ষণ করলে স্পষ্ট হয় যে, নারী শুধু রাজনীতিতে নয়; বরং রাজনৈতিক দলগুলো গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতেও তাদের সংখ্যা নগণ্য। নিচের সারণী বিষয়টির সত্যতা তুলে ধরে।[২]

সারণী : প্রধান রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন কমিটিতে নারীর অংশগ্রহণ

রাজনৈতিক দল	রাজনৈতিক দলের কমিটি সমূহ	মোট সদস্য	নারী সদস্য
বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ	প্রেসিডিয়াম এবং সেক্রেটারিয়েট	৩৬	৫
	কার্য নির্বাহী কমিটি	৬৪	৫
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	জাতীয় স্থায়ী কমিটি	১৪	৫
	জাতীয় কার্য নির্বাহী কমিটি	১৬৪	১১
জাতীয় পার্টি	জাতীয় স্থায়ী কমিটি	৩১	২
	জাতীয় কার্য নির্বাহী কমিটি	২০১	৬
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	মজলিশ-ই-শুরা	১৪১	০
	মজলিশ-ই-আমেলা	২৪	০
বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি	কেন্দ্রীয় কমিটি	৪২	২

১. Najma Chowdhury, *Women's Participation in Politics Marginalisation and Related Issues* in Najma Chowdhury and et. al. (eds) Women and Politics (Dhaka : Women for Women,1994), P. 16.

২. রাজনৈতিক দলসমূহের কার্যালয় হতে সংগৃহীত, ফেব্রুয়ারী, ২০০০ ইং।

Dhaka University Institutional Repository

	প্রেসিডিয়াম	১২	১

উৎসঃ রাজনৈতিক দলসমূহের কার্যালয় হতে পাওয়া , ২০০০ সালের কমিটি অনুযায়ী।

বর্তমানেও এ কমিটির তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় নি। উপরের চিত্র থেকে এটাই স্পষ্ট যে, রাজনৈতিক দলে অধিক হারে নারীর অংশগ্রহণ না থাকায় প্রক্রিয়াগতভাবে রাজনৈতিক দলের অঙ্গীকার পত্র বা ঘোষণা পত্রে নারীর সমস্যা রাজনৈতিক ইস্যুতে রূপান্তরিত হয়নি। ফলে কোন রাজনৈতিক দলই নারীর সমস্যাকে কোন ভাবে প্রাধিকারযুক্ত করে না। এ সম্পর্কে দলে কোন এজেন্ডা নেই, নেই তেমন কোন কর্ম পরিকল্পনা বা আইনগত বা নির্বাচনী সংস্কারমূলক কোন সুপারিশ। তবে নির্বাচনী ইশতেহারে এটি স্থান পেয়েছে। আওয়ামীলীগের নির্বাচনী ইশতেহারে এ প্রসঙ্গে বলা হয়, নারীর সমঅধিকার নিশ্চিতের, বিএনপি'র ইশতেহারে সব ধরনের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত, জাতীয় পার্টি সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে নারী মুক্তির ব্যাপারে উদ্যোগ এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ তাদের ইশতিহারে ইসলামের বিধান অনুযায়ী নারীদের অধিকার ও মর্যাদা সমুন্নত করার অঙ্গীকার সন্নিবেশিত হয়েছে।[১] সুতরাং নারীকে রাজনীতির মূল স্রোতধারায় (Main Stream) সম্পৃক্ত হতে হবে। রাষ্ট্রীয় জীবনে রাজনৈতিক দলই প্রধান চালিকা শক্তি। সুতরাং নারীর রাজনীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ এবং রাজনীতি পরিমণ্ডলে নারী সমস্যার প্রকৃত স্বরূপ বিশ্লেষণে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই মর্যাদার ভিত্তিতেই তারা নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অংশ নিতে পারেন এবং তার মধ্য দিয়ে লিঙ্গ বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে অবদান রাখতে পারেন। তা না হলে নারীরা যা পারেন তা পুরুষ তান্ত্রিক সমাজের দয়া দাক্ষিণ্যেরই ফলশ্রুতি।[২]

এছাড়া রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী পর্যায়ে অত্যন্ত অপ্রতুল হারে প্রতিনিধিত্বের ফলে নারীর সমতা ও ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ সম্পর্কিত সকল সিদ্ধান্ত পুরুষের ইচ্ছার অধীনে থাকে, যাদের এ ধরনের বিষয়বস্তুর প্রতি আগ্রহ নাও থাকতে পারে।[৩] ফলে রাষ্ট্রীয় নীতির মাধ্যমে নারীর অধঃস্তনতা 'Re-enforced' হচ্ছে বা জেন্ডার অসমতা দূরীকরণের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বা নীতি গৃহীত হচ্ছে না।[৪] স্বতঃসিদ্ধ যে, কোন সুবিধাভোগী শ্রেণীর অবস্থার উন্নয়নে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অত্যাবশ্যক।[৫] তাই, সার্বিক বিচারে বলা যায়, রাজনৈতিক দল ও বৃহৎ পরিসরে সমাজকে নারীর সমস্যা ও সমাধানে সম্ভাব্য পন্থা সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন করে তোলার দায়িত্ব সে সব নারীর উপর বর্তায় যারা এই পুরুষশাসিত সমাজে নেতৃত্বের অধিকার অর্জন করেছেন।

খ. আইন ও বিচার বিভাগে নারী

প্রথম সংসদ থেকে বর্তমান সপ্তম সংসদ পর্যন্ত সংরক্ষিত আসনে মোট ১৬৬ জন মহিলা সাংসদ মনোনীত হয়েছেন। তন্মধ্যে, একাধিকবার সংসদ সদস্য হয়েছেন ৮ জন। বিগত বছর গুলোর নির্বাচনী ফলাফল ও প্রাপ্ত ভোটের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নারী প্রার্থী ক্রমান্বয়ে ভোটারের কাছে তাদের রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন এবং তারা রাজনীতির অঙ্গনে জেন্ডার সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবেলা করে নিজেদের যোগ্য প্রার্থী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে নিচ্ছেন। নিচের সারণীতে জাতীয় সংসদে নারী প্রার্থীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও জয় লাভের চিত্র তুলে ধরা হলো :

---

১. বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, *রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতিয়ার*, ২০০১ ইং।

২. Menon, Rashed Khan, *Political Parties and Women's Agenda"* Najma Chowdhury and et al; (eds.) Women and Politics (Dhaka : Women for Women, 1994), P. 39.

৩. DAW*, Women 2000: Review and Appraisal 1990. Vienna :* Division for the Advancement of Women, 1990, P. 21.

৪. Chowdhury, Najma, Ibid, P. 19.

৫. Chowdhury, Dilara and Almasud Hasanuzzaman, *Political Decision Making in Bangladesh and the Role of Women,* (Asian Profile : Vol. 25, No. 1, 1997), P. 65.

Dhaka University Institutional Repository

সারণী : জাতীয় সংসদে নারী সদস্যদের চিত্র

বছর	নারী প্রার্থীর শতকরা হার	সরাসরি ভোটে নারীর জয়লাভ	উপনির্বাচনে নারীর জয়লাভ	মোট নারীর জয়লাভ	সংরক্ষিত আসন সংখ্যা	সংসদে নারী আসনের হার (%)
১৯৭৩	০.৩	০	০	০	১৫	৪.৮
১৯৭৯	০.৯	০	২	২	৩০	৯.৭
১৯৮৬	০.৩	৫	২	৭	৩০	১০.৬
১৯৮৮	০.৭	৪	০	৪	--	--
১৯৯১	১.৫	৮*	১	৫	৩০	১০.৬
১৯৯৬ (১২ জুন)	১.৩৬	১১*	২	৭	৩০	১১.২১

উৎস : নারী বার্তা, বর্ষ-১, সংখ্যা-২, উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা, ১৯৯৬ইং।

* শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়া একাধিক আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন।

উপরের সারণীতে দেখা যায়, অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান নিম্নহার লক্ষ্য করা গেলেও ১৯৭৩-১৯৯৬ সাল পর্যন্ত নির্বাচনী রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের একটি ইতিবাচক ধারা লক্ষ্যনীয়। এদিকে, সংরক্ষিত ৪৫টি আসনে নারীদের নির্বাচন মূলত নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ লাভকারী দলের সদস্যদের পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত। ফলে নারী সাংসদগণ দেশের নারী সমাজের কাছে নিজেদের দায়বদ্ধ বলে মনে করেন না।[১] তাই প্রচলিত ব্যবস্থায় নারীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ক্ষমতার অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হচ্ছে না।

গ.মন্ত্রীসভায় নারী

বাংলাদেশের ইতিহাসে মহিলা মন্ত্রীগণ ‘নরম’ বা গুরুত্বপূর্ণ বলে সচরাচর বিবেচিত নয় এমন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। তবে বিগত দুটি সরকারের আমলে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম লক্ষ্যনীয়। সুতরাং বাংলাদেশে মন্ত্রীসভার দায়িত্বের ক্ষেত্রে নারী এখন চিরাচরিত ছাঁচের বাইরে পা রেখেছে। নিচের সারণীতে ১৯৭২-২০০১ পর্যন্ত নারী মন্ত্রীদের শতকরা হার তুলে ধরা হলো :[২]

সারণী : মন্ত্রী সভায় নারী অংশগ্রহণের হার :

সময় কাল	মোট মন্ত্রী	নারী মন্ত্রী	শতকরা হার (%)
আওয়ামীলীগ সরকার, ১৯৭২-১৯৭৫ইং	৫০	২	৪
বিএনপি সরকার, ১৯৭৬-১৯৮২ইং	১০১	৬	৬
জাতীয় পার্টি সরকার, ১৯৮২-৯০ইং	১৩৩	৪	৩
বিএনপি সরকার, ১৯৯১-১৯৯৫ইং	৩৯	৩	৫
আওয়ামীলীগ সরকার, ১৯৯৬-২০০১ইং	২৪	৪	১৬

উৎস : চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন ১৯৯৫ এ পেশকৃত বাংলাদেশ সরকারের প্রতিবেদন এবং ২০০১ সালের তথ্য থেকে সংগৃহীত।

সুতরাং উপরের সারণী থেকে এটি সুস্পষ্ট হয় যে, জেন্ডার ভিত্তিক ভাবে নারী রাজনৈতিক শক্তিতে দুর্বল দল, সংসদ ও নির্বাচনী এলাকায়। এর সাথে মন্ত্রী পরিষদে তার দুর্বল অবস্থানের বিষয়টি চিহ্নিত করা যায়।

---

[১] আবেদা সুলতানা, *ক্ষমতা কাঠামো ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী ঃ বৈশ্বিক ও বাংলাদেশ বিষয়ে একটি অনুসন্ধান*, ক্ষমতায়ন (ঢাকা : উইমেন ফর উইমেন, সংখ্যা-৩, ২০০০ খৃস্টাব্দ), পৃ. ১২।

[২] চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন ১৯৯৫ এ পেশকৃত বাংলাদেশ সরকারের প্রতিবেদন ও সাম্প্রতিক তথ্য নির্বাচন কমিশন থেকে ব্যক্তিগতভাবে সংগৃহীত ২০০১ ইং।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. প্রশাসনিক পর্যায়ে নারী

আধুনিককালে নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি প্রশাসনের সাথেই বেশি জড়িত। বাংলাদেশের আমলাতন্ত্রের শীর্ষস্থানীয় পদসমূহে নারী তেমন একটা নিজেকে অধিষ্ঠিত করতে পারেনি। অথচ নারীর ক্ষমতায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ, বাস্তবায়ন, রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পরিচালনায়, রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণে নারীর দৃষ্টি উল্লেখযোগ্য মাত্রায় প্রশাসনের উচ্চ স্তরে সংযোজন হওয়া প্রয়োজন। কারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমতা নারীর ক্ষমতায়ন অর্জনে কেবল একটি অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রাই নয়; বরং একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল।[১] বাংলাদেশ সরকারের বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের উচ্চ পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তাগণ সকলেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে জড়িত।[২]
বিচার বিভাগেও নারীর অবস্থা নগণ্য। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে এখনও কোন নারী অধিষ্ঠিত হননি। তবে ইতোমধ্যে বিচারপতি হিসেবে প্রথম ১ জন নারী নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছেন। নিচের সারণীতে বিচার বিভাগীয় ক্যাডারে নারীর অংশগ্রহণের চিত্র তুলে ধরা হলো :[৩]

সারণী : বিচার বিভাগে নারীর অংশগ্রহণ

কোর্টের প্রকারভেদ	পুরুষ		নারী	
	প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী	প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী
সুপ্রিম কোর্ট	১৩	--	১	--
ট্রাইব্যুনাল কোর্ট	০৮	--	০২	--
জজ কোর্ট	৫০৫	১৬	৪০	--
ম্যাজিট্রেসি	২০০০	--	১৯৯২	--

উৎস : Morshed, S. M., Comparative Study on Status of Women Works in Bangladesh, Paper Presented in a Workshop on Women Works, Organised by ICFDU, B.C. Women Committee in Dhaka, June-22, 1998.

অতি সম্প্রতি পুলিশ বিভাগেও ৪ জন নারী, পুলিশ সুপার হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছেন। এ ব্যাপারে নারী অংশগ্রহণের হার ক্রমশ বাড়ছে।[৪]

- বর্তমান প্রশাসন কাঠামোর ৬৪ জন সচিবের মধ্যে মাত্র একজন নারী।
- প্রশাসক ও ব্যবস্থাপক স্তরে নারীর অনুপাত ৫ঃ১।
- বর্তমানে রাষ্ট্রদূত পদে ১জন নারী সম্প্রতি নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছেন।
- বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, পরিকল্পনা কমিশন ও নির্বাচন কমিশনের উচ্চপদে কোন নারী নেই।
- বাংলাদেশ সরকারী ও আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত পদের সংখ্যা ১০ লাখ ৯৭ হাজার ৩শ' ৩৪ জন। এর মধ্যে নারীর সংখ্যা ৮৩ হাজার ১শ' ৩৩ জন। অর্থাৎ শতকরা ৭.৬ ভাগ।
- বর্তমানে প্রতিরক্ষা বাহিনীর কমিশন র‍্যাংকে মেয়েদের নিয়োগ দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- জেলা প্রশাসক পদে ৪ জন নারী সম্প্রতি নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছেন।

---

১. Roushanand Jahan, *Emprowerment of Women* (Dhaka : Women for Women, Nairobi to Beijing 1985-1995, 1995). pp. 5-71.

২. অদিতি রহমান, *প্রশাসনে নারী*, *দৈনিক জনকণ্ঠ* (ঢাকা : ২৪ নভেম্বর, ১৯৯৮ খৃষ্টাব্দ), পৃ. ৬-১২।

৩. Morshed, S.M, *Comparative Study on Status of Women Works in Bangladesh,* Paper Presented in a Workshop on Women Workers, Organised by ICFDU, B.C. (Dhaka : Women Committee, June-22, 1998.), pp. 10-35.

৪. রাজনীতি ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ, *লোক প্রশাসন সাময়িকী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫-৪০।

Dhaka University Institutional Repository

- কৃষি ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক পদে ১ জন নারী কর্মরত আছেন।
- সম্প্রতি সেনা বাহিনীতে ১ জন নারীকে বিগ্রেডিয়ার পদ মর্যাদা দেয়া হয়েছে।

সার্বিক অবস্থা অবলোকনে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে নারীর উপস্থিতি এখনও নগণ্য। এদের সংখ্যা ১০ শতাংশেরও কম। অথচ বর্তমানে উচ্চ পর্যায়ে ১০ শতাংশ এবং নিম্ন পর্যায়ে ১৫ শতাংশ কোটা নারীর জন্য সংরক্ষিত আছে। এ কোটাও পূরণ হচ্ছে না।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারী

১৮৭০ সালে চৌকিদার পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়।[১] ১৩০ বছর পরে স্থানীয় সরকারের উচ্চ পদগুলো প্রধানত পুরুষদেরই কর্তৃত্বাধীন। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত নারীদের ভোটাধিকারই ছিল না। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিগত ৩০ বছরে ৬টি স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এগুলো হলো, ১৯৭৩, ১৯৭৭, ১৯৮৮,১৯৯২, ১৯৯৭ সালে। ১৯৫৯-৬৯ সাল মেয়াদে দুটি স্থানীয় সংস্থার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও এতে কোন নারী নির্বাচিত হননি। ১৯৭৩ সালের নির্বাচনেও ৪ হাজার ৩শ' ৫২টি ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে মাত্র ১ জন নারী চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৭৭ সালে ৪ হাজার ৩শ' ৫২টি ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে মাত্র ৪ জন নারী চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হন। ১৯৮৪ সালে ৪ হাজার ৪শ' ৪০টি ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে মাত্র ৪ জন এবং উপনির্বাচনে আরও ২ জন নারী চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হন। ১৯৮৮ সালের নির্বাচনে ৪ হাজার ৪শ' ১টি পদে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রার্থী সংখ্যা ছিল ১৮ হাজার ৫শ' ৬৬টি জন এবং মেম্বর প্রার্থীর সংখ্যা ১ লাখ ১৪ হাজার ৬শ' ৯৯ জন। তন্মধ্যে নারী চেয়ারম্যান প্রার্থী ছিলেন ৮৯ জন এবং মেম্বার প্রার্থী ছিলেন ৮শ' ৬৩ জন। এর মধ্যে মাত্র ১ জন নারী চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হন। ১৯৯২ সালে কেবল মাত্র ৩ হাজার ৮শ' ৯৯টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন হয়। এতে চেয়ারম্যান প্রার্থী ছিলেন ১৭ হাজার ৪শ' ৪৪ জন এবং মেম্বার প্রার্থী ছিলেন ৩৪ হাজার ৮শ' ১ জনের বিপরীতে ১ লাখ ৬৯ হাজার ৬শ' ৮৩ জন। এর মধ্যে ১শ' ১৫ জন নারী চেয়ারম্যান ও ১ হাজার ১শ' ৩৫ জন নারী মেম্বার পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এসময়কালে পৌরসভার কোন নারী চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হননি। স্থানীয় সরকারের অপর স্তর উপজেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৫ সালে। এতে ৮ জন নারী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কিন্তু কেউই নির্বাচিত হতে পারেননি।[২]

এদিকে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সর্বনিম্ন প্রশাসনিক স্তর স্থানীয় সরকার, যার মূলভিত্তি ইউনিয়ন পরিষদের নারী ও পুরুষ উভয়েরই সমান অংশগ্রহণ ও সঠিক প্রতিনিধিত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে স্থানীয় সরকার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রবর্তিত নতুন আইন অনুযায়ী নারীদের ৩টি (এক তৃতীয়াংশ) সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের বিধান করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে নারীর ক্ষমতায়নে এটি একটি বিরাট অর্জন। ১৯৯৭ সালের নির্বাচনে প্রথম নারীরা প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। বর্তমানে ২০১৩ সালে নির্বাচিত নারী চেয়ারম্যান প্রায় ২০০ জন। এছাড়া সাধারণ সদস্য পদে ৬০০ জন এবং সংরক্ষিত মহিলা আসনে ১২ হজার ৮শ' ২৮ জন নারী নির্বাচিত হয়েছেন। সুতরাং নারীর ক্ষমতায়ন ও নীতি নির্ধারণী ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত দিতে এটি একটি যুগোপযোগী ও যুগান্তকারী পদক্ষেপ। তবে বেশ কয়েকটি গবেষণা থেকে যে বিষয়টি স্পষ্ট তা হচ্ছে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে এ সকল

---

১. মোঃ মকসুদুর রহমান, *বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন* (রাজশাহী : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা বোর্ড, ১৯৯৩ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৩০।

২. সৈয়দ রওশন কাদির, *স্থানীয় পর্যায়ে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া : সমস্যা ও সম্ভাবনা, নারী ও রাজনীতি* [সম্পাদনা: নাজমা চৌধুরী, হামিদা আখ্তার বেগম, মাহমুদা ইসলাম, নাজমুন্নেছা মাহাতাব (ঢাকা : উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৪ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৬।

Dhaka University Institutional Repository

সদস্যের ভূমিকা কার্যকর ভাবে বৃদ্ধি পায়নি। অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের অবস্থান প্রান্তিক।[১] বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণের পরিমাণ জানতে গিয়ে দেখা যায় যে, প্রধানমন্ত্রী ব্যতীত অন্যান্য নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার প্রায় সর্বাংশেই পুরুষরা নিয়োজিত। তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল পর্যায়ে জেন্ডার সমতা অর্জনের লক্ষ্যে অধিক হারে নারীর উপস্থিতি আরো বৃদ্ধি প্রয়োজন।

নারীর ক্ষমতায়ন ও জাতীয় সংসদে মহিলা আসন প্রসঙ্গ

"বিশ্বে যা-কিছু মহান্ সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।"[২]
"রাজা করিতেছে রাজ্য শাসন, রাজারে শাসিছে রানী
রানী দরদে ধুইয়া গিয়াছে রাজার যত গ্লানি।"[৩]

পর্দার অন্তরাল থেকে নারীদের রাজ্যের শাসনকার্য অংশগ্রহণ করার ইতিহাস বিশ্বে সর্বত্র সর্বযুগে রয়েছে। ভারত উপমহাদেশে শিশু আকবর যখন সিংহাসনে আরোহন করেন, কথিত আছে নেপথ্যে দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন তাঁর দাইমা। ইতিহাসবিদগণ যাকে 'পেটিকোট গভর্নমেন্ট' নামে আখ্যায়িত করেছেন। রাজতন্ত্র যেমন আজ বিলুপ্তপ্রায়, অন্দর মহল থেকে রাজ্য পরিচালনার উদাহরণও তেমন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। আজ বিশ্বে সর্বত্র গণতন্ত্রের জয়জয়কার। জনপ্রতিনিধিত্ব শাসন ব্যবস্থা এখন আদর্শ ব্যবস্থা। গণতান্ত্রিক জনপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থায় নারীদের অংশগ্রহণ কোন অংশে কম নয়। বহু বাঁধাবিপত্তি ডিঙ্গিয়ে নারীরা এই জনপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসন পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করছে। তাদের এই অংশগ্রহণকে কোন কোন রাষ্ট্র রাষ্ট্রীয়ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করছে। যেমন, বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় কাজ ও শাসন ব্যবস্থায় নারীদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার জন্য একেবারে তৃণমূল পর্যায় ইউনিয়ন পরিষদ থেকে জাতীয় সংসদে রয়েছে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন। জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। নারীরা শুধু প্রত্যক্ষ ভোটে পুরুষদের পাশাপাশি নির্বাচনের মাধ্যমে আসবে? এই ৫০টি আসন সংখ্যা কি ৫০টিতেই সীমাবদ্ধ থাকবে, নাকি বৃদ্ধি করা হবে? এ সকল প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে নারী নেত্রী, বিভিন্ন সংগঠন ও সচেতন নাগরিকদের মধ্য থেকে।

রাষ্ট পরিচালনা ও একটি সংবিধান গঠন করার জন্য ১৯৭২ সালে গণপরিষদ গঠিত হয়। ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল এ পরিষদের ৩৪ সদস্যের একটি কমিটি একটি খসড়া সংবিধান তৈরী করে। সেই সংবিধানের ৬৫ থেকে ৯০ ধারা সংবিধান সংক্রান্ত। এই সংবিধানের ৬৫(৩) ধারায় লেখা আছে "এই সংবিধানের প্রবর্তন হইতে দশ বছরকাল অতিবাহিত হইবার অব্যবহিত পরবর্তীকালে সংসদ ভাঙ্গিয়া না যাওয়া পর্যন্ত ১৫টি আসন কেবল মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাঁহারা আইনানুযায়ী পূর্বোক্ত সদস্য দ্বারা নির্বাচিত হইবেন।"[৪] ঐ পূর্বোক্ত সদস্য মানে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত ৩০০ সদস্য। পাকিস্তান আমলেও নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন ছিল। ১৯৫৬ সালে তৎকালীন সংবিধানের ৪৪(২) আর্টিক্যালে জাতীয় পরিষদের দশটি আসন (৫টি পূর্ব পাকিস্তান, ৫টি পশ্চিম পাকিস্তান) নারীদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৭২ সালে মনে করা হয়েছিল দশ বছর পর এদেশের নারীদের অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে। রাজনৈতিক অঙ্গনেও তাদের অবস্থান দৃঢ় হবে। সে সময় জাতীয় সংসদের মনোনীত সংরক্ষিত আসনের ১৫ মহিলা সদস্য ছিলেন তসলিমা আবেদ, অধ্যাপিকা নাজমা

---

[১] মোহাম্মদ জহিরুল হক, *নগর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নির্বাচিত নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও ক্ষমতায়নে সমস্যা এবং সম্ভাবনা ঃ সিলেট বিভাগের উপর একটি গবেষণা* (সিলেট : এমএসএস মনোগ্রাফ রিপোর্ট, পলিটিক্যাল স্টাডিজ এন্ড পাবলিক এ্যাফেয়ার্স বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট ১৯৯৮-৯৯ খৃস্টাব্দ), পৃ. ২০-৫৬।

[২] আব্দুল মান্নান সৈয়দ(সম্পাদক), *শ্রেষ্ঠ নজরুল: নজরুল রচনাবলীর প্রকাশিত-অপ্রকাশিত সংকলন* (ঢাকা : অবসর, ১৯৯৬ খৃষ্টাব্দ), পৃ. ৬০।

[৩] ড. কুদ্দুস আব্দুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮।

[৪] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।*

Dhaka University Institutional Repository

শামীম লাইজু, জাহানারা রব, বদরুন্নেছা আহমেদ, অধ্যাপিকা ফরিদা রহমান, অধ্যাপিকা আজরা আলী, সাজেদা চৌধুরী, রাফিয়া আখতার ডলি, খুরশীদা ময়েজ উদ্দীন, নুরজাহান মুরশিদ, কনিকা বিশ্বাস, আবিদা চৌধুরী, মমতাজ বেগম, আর্জুমান্দ বানু ও সুদীপ্তা দেওয়ান। প্রথম দশ বছরের মধ্যেই সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হলো। ১৯৭৮ সালে সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ১৫ থেকে বাড়িয়ে ৩০টি করা হয় এবং বিশেষ সুবিধার মেয়াদ ১০ থেকে ১৫ বছর বাড়ানো হয়। সংবিধানের ৬৫(৩) অনুচ্ছেদ ১০ থেকে ১৫ বছর বাড়ানো হয়। সংবিধানের ৬৫(৩) অনুচ্ছেদ ১০ বছরের পরিবর্তে ১৯৮৭ সালে প্রথম ১৫ বছরের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে আবারও ১০ বছরের জন্য বাড়ানো হয়। সংবিধান (দশম সংশোধন) আইন, ১৯৯০ প্রবর্তনকালে "বিদ্যমান সংসদের অব্যবহিত পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে শুরু করিয়া দশ বছর কাল অতিবাহিত পরবর্তীকালে সংসদ ভাঙ্গিয়া না যাওয়া পর্যন্ত ত্রিশটি আসন কেবল মহিলা সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাহারা আইনানুযায়ী পূর্বোক্ত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন।"[১]

এ নীতির প্রয়োগ ১৯৯০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত ছিল। এই হিসেবে সপ্তম সংসদই নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণ এবং নির্বাচিত সংসদ সদস্য দ্বারা নির্বাচনের শেষ সংসদ ছিল। বস্তুত স্বাধীনতার পর চতুর্থ সংসদ (১৯৮৮) ব্যতীত সব ক'টি সংসদেই নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন ছিল। সংবিধানের দশম সংশোধনী অনুযায়ী দশ বছর মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই যদি বর্তমান সংসদ ভেঙ্গে যায় এবং ১০ বছর মেয়াদের মধ্যে আরেকটি সংসদ গঠিত হয় তাহলে ঐ সংসদের জন্য ত্রিশটি আসন সংরক্ষিত থাকবে। অর্থাৎ ১০ বছর শেষ হওয়ার এক বছর আগে যদি আরেকটি সংসদ (অষ্টম সংসদ), ঐ অষ্টম সংসদের জন্যও সংবিধানের দশম সংশোধনী অনুযায়ী ৩০টি মহিলা আসন সংরক্ষিত ছিল। বর্তমানে পঞ্চদশ সংশোধনী ও সংবিধানের আলোকে নারীদের জন্য সংরক্ষিত মহিলা আসন ৫০ টি।

সংরক্ষিত আসনের প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশের নারীরা আজও এক পশ্চাৎপদ শ্রেণী। নারীদের জন্য পৃথক আসন সংরক্ষণ প্রয়োজন। উন্নত দেশে নারীদের অবস্থান, শিক্ষা, সামাজিক, অর্থনৈতিক সব ক্ষেত্রেই প্রায় পুরুষদের সমকক্ষ। তা সত্ত্বেও বিশ্বে নারী সংসদ সদস্যের হার মোটেও উল্লেখযোগ্য নয়। এই হার ১১ দশমিক ৪ ভাগ। ইউরোপে এই হার শতকরা ৩৬ ভাগ। সার্ক দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশে এই হার ১১ দশমিক ২, ভারতে শতকরা ৩৭ ভাগ, পাকিস্তানে ২ দশমিক ৮ ভাগ, শ্রীলঙ্কায় ৩ দশমিক ৮ ভাগ। সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের বিধান ভারত ও শ্রীলঙ্কায় নেই। নেপালে সম্প্রতি ৩৫টি আসনের মধ্যে ৩টি নারীদের জন্য সংরক্ষণের আইন চালু হয়। পাকিস্তানে ১৯৭৩ সালে ১০টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়। ১৯৮৫ সালে পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদে নারীদের সংরক্ষিত আসন বৃদ্ধি করে বিশটিতে উন্নীত করা হয়।

---

[১] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।*

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের বর্তমান চিত্র

১৯৭২ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত ২৭ বছরে বাংলাদেশে নারীদের অবস্থার পরিবর্তন কিঞ্চিত পরিমাণ হয়েছে। পরবর্তীতে নারীদের অবস্থার পরিবর্তন ইতিবাচক হতে শুরু করেছে। আজ গ্রামীণ দেশের নারীরাও তৃণমূল পর্যায়ে নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছে। গত ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা নির্বাচনে নারীদের সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছিল। সে তুলনায় সংসদে সংরক্ষিত আসনে নারীদের নির্বাচনকে অপমানজনক বলে মনে করা হচ্ছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সরকারী সদস্যরা সংরক্ষিত আসনে নারীদের মনোনয়ন দান করেন। তাই শাসক দলের সাথে কোন না কোনভাবে সম্পর্কিত নারীদেরই সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হতে দেখা গেছে। এরশাদ আমলে এই ত্রিশ নারী সংসদ সদস্যকে ‘ত্রিশ সেট অলঙ্কার’ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। অবশ্যই এই আখ্যা ছিল বিদ্রুপাত্মক। কারণ, এই নারীদের সংসদে কোন গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান, কোন গুরুত্বপূর্ণ বিল উত্থাপন বা আনয়ন করতে দেখা যায়নি। নারী সদস্যরা যদিও নারী স্বার্থ সংরক্ষিত কোন বিল আনতে চেষ্টা করেন। দলীয় পুরুষ সদস্যদের দ্বারা তাও সম্ভব হত না। এই অবস্থা এখন আর নেই ।

বাংলাদেশের রাজনীতি অঙ্গনে এখন পুরুষদের একচ্ছত্র অধিকার আছে বলা যায় না। এখানে নারীদের যথেষ্ঠ দখল সৃষ্টি হয়েছে। অবস্থার উন্নতি হয়েছে। গত ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেখা গেছে সরাসরি নির্বাচিত নারী সদস্য ১৯ জন। আওয়ামীলীগ থেকে ১৫ জন, বি এন পি থেকে ৩ জন, জাতীয় পার্টি থেকে ১ জন (পরবর্তী উপনির্বাচনে জাতীয় পার্টির রওশন এরশাদও আওয়ামীলীগ থেকে সিমিন হোসেন রিমি জয়ী হলে নারী সাংসদ দাড়ায় ২১ জন।) সর্বশেষ ২০ জন, কারণ সুনামগঞ্জ -৪ আসনে বেগম মমতাজ ইকবাল মারা গেলে উপনির্বাচনে জয়ী হন আওয়ামীলীগের আলহাজ মতিউর রহমান। নতুন মন্ত্রী পরিষদে মহিলা মন্ত্রী ৫ জন। প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেত্রী, স্পীকার, সরকার দলীয় সংসদীয় উপনেতা সহ গুরুত্বপূর্ণ পদ গুলোতে রয়েছেন নারী।

নারী সংগঠনসমূহের দাবি

১৯টি সংগঠন দ্বারা গঠিত ‘ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজ’ ১৯৮৭ সালেই সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের দাবি জানায়। তারা ১৯৯০ সালে শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া উভয়ের সাথে সাক্ষাত করে তাদের দাবির কথা জানায়। কিন্তু খালেদা জিয়ার পাঁচ বছর ও শেখ হাসিনার শাসনামলে এর সাড়া পাওয়া যায়নি। এছাড়া পৃথক পৃথকভাবে মহিলা পরিষদ, নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, নারী প্রগতি সংঘ ইত্যাদি নারী সংগঠনগুলো সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন ও আসন সংখ্যা বৃদ্ধির দাবি জানায়। এ প্রসঙ্গে মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদিকা আয়শা খানম বলেন, মহিলা পরিষদ সর্বোচ্চ পর্যায় অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ থেকে পার্লামেন্ট পর্যন্ত সরাসরি ভোটে নারী প্রতিনিধি নির্বাচনের পক্ষে। এ দাবি ৪র্থ নারী সম্মেলনে গৃহীত বেইজিং কর্মপরিকল্পনায় গৃহীত হয়। মহিলা পরিষদের দাবি, আগামী ৩ টার্মের জন্য অর্থাৎ ১৫ বছরের জন্য সংসদে নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা এবং সাধারণ আসনের সাথে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। দুটি ব্যালট বাক্স থাকবে, একটি সাধারণ সদস্যের জন্য, অন্যটি সংরক্ষিত সদস্যদের জন্য। মহিলা পরিষদ ৬৪টি জেলা থেকে ৬৪ জন মহিলা প্রার্থী নির্বাচিত করার এবং শতকরা ১০ ভাগ মহিলা প্রার্থীদের মনোনয়ন দেয়ার দাবি জানায়।[১] তাদের এসব দাবী আজ সফল। তারা যা চেয়েছিলেন তা তারা অনেকটাই পেয়ে গেছেন। তারা আজ সিডও এর বাস্তবায়ন চাচ্ছেন।[২] বাংলাদেশের নারীরা, বিশেষ করে যারা রাজনীতি এবং নারী সমাজ সম্পর্কে সচেতন তারা মনে করেন ৯ম জাতীয় সংসদে নারীদের সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা সন্তোষজনক অবস্থানে রয়েছে। নারীরা সরাসরি অংশ গ্রহণে যেমন এগিয়েছেন ঠিক তেমনি, পেয়েছেন সংরক্ষিত আসন।

---

[১]. প্রাগুক্ত।

[২]. *দৈনিক প্রথম আলো*, অধুনা (ঢাকা : ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৩ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৩।

Dhaka University Institutional Repository

cÂg Aa¨vq

evsjv‡`‡ki bvix Dbqb : mgm¨v I m¤¢vebv

পঞ্চম অধ্যায়
বাংলাদেশের নারী উন্নয়ন : সমস্যা ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশ[১] এর নারী উন্নয়নে বহুবিধ সমস্যা বিদ্যমান যে সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারলে এদেশের অর্থনীতি সমাজনীতি ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সুখ্যাতি বৃদ্ধি পাবে এবং দেশ এগিয়ে যাবে। কারণ নারী সমাজের অর্ধেক জনগোষ্ঠী এর যথাযথ মূল্যায়ন উন্নয়ন ব্যতিত দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। বর্তমান বিশ্বে যে সকল দেশ উন্নয়নের শীর্ষস্তরে উপনীত হয়েছে সে সকল দেশের দেশজ অর্থনৈতিক সমীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে সে সকল দেশে পুরুষ নাগরিকদের পাশাপাশি নারীরাও প্রায় সমানভাবে অবদান রেখে চলেছে; ফলে তাদের এ উন্নয়ন ও অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। আমাদের বাংলাদেশেও এ ধরনের উন্নয়ন সম্ভব বলে আমরা বিশ্বাস করি। এ জন্য প্রয়োজন নারীবান্ধব একটি নীতিমালা ও তার বাস্তবায়ন যা আমাদের নারী সমাজের সমস্যাগুলো নিরুপন করে আগামীর পথ চলায় সহায়ক হবে।

সমস্যা সমূহ :

১. বাংলাদেশ মুসলিম রাষ্ট্র হওয়ায় এদেশের মুসলিম নারীদের উত্তরাধিকার হিস্যা যথাযথভাবে আদায়ের ক্ষেত্রে একশ্রেণীর লোক গরিমসি করে থাকেন এবং নারী উত্তরাধিকারদের প্রতি অবিচার করে থাকেন যা কোনভাবেই ইসলাম সমর্থন করে না। কারণ উত্তরাধিকার বিষয়টি আল কুর'আন দ্বারা নির্ধারিত।

ইরশাদ হচ্ছে :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

"পিতা-মাতা ও নিকটতর আত্নীয়দের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও নিকটতর আত্নীয়দের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে। তা অল্পই হোক বা বেশী হোক, এ অংশ নির্ধারিত ।"[২]

২. নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার এর ক্ষেত্রে এদেশের নারী সম্প্রদায় যথেষ্ট অবহেলিত, তারা তাদের স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে পরিবারের কর্তা ব্যক্তি ও সরকারের কাছ থেকে যথেষ্ট সেবা লাভ করতে পারেন না।

৩. 'নারী পোষাক শ্রমিকরা' পোষাক তৈরী মালিকদের দ্বারা ও স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনীতিবিদদের দ্বারা নানা রকম নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকেন।

৪. নারী পোষাক শ্রমিকদের বেতন বোনাস থেকে শুরু করে নানা কারণ দেখিয়ে হয়রানি করা হয়। ফলে তারা দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে খুব বেশী আগ্রহী হতে চান না।

৫. নারী কৃষি শ্রমিকদের থেকে ধনিক শ্রেণীর সস্তাশ্রম গ্রহণের প্রবণতা ও মজুরী বৈষম্য।

৬. কৃষিভিত্তিক কার্যক্রম ব্যবস্থায় নারীদের প্রশিক্ষনের অপ্রতুলতা।

৭. নারীবান্ধব কৃষি যন্ত্রপাতি না থাকা ও নারীর কৃষি শ্রমের স্বীকৃতি না থাকা।

---

১. বাংলাদেশের অভ্যুদয় প্রধানত বঙ্গ শব্দ থেকে। বঙ্গ বাংলা- পাক- ভারতের প্রাচীন জনপদ। ইহা বর্তমান দক্ষিণ বঙ্গ ও পূর্ব বাংলার অবস্থান স্থলে ছিল। ইহার সীমানা সাধারণত ছিল এইরূপ: পশ্চিমে ভাগীরথি, উত্তরে পদ্মা, পূর্বে ব্রক্ষ্মপুত্র ও মেঘনা নদী এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর; কখনো পূর্বে ব্রক্ষ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর পূর্বতীর ও পশ্চিমে কপিলা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে মনে করা হত। শিলালিপি হতে প্রাচীন বঙ্গের বিক্রমপুর ও নাব্য নামক দু'টি অংশের নাম পাওয়া যায়। বরিশাল ও ফরিদপুরের জলাভূমি এলাকা নাব্য নামে পরিচিত ছিল বলে অনুমিত হয়। চন্দ্রদ্বীপ বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রসিদ্ধ জনপদ ছিল। ইহা মধ্যযুগে 'বাকলা' (বাকেরগঞ্জ জিলা) নামে পরিচিত হয়। বর্তমানে বঙ্গ বলতে বঙ্গদেশ অর্থাৎ বাংলাদেশ (পূর্ববঙ্গ বা পূর্ববাংলা) ও পশ্চিমবঙ্গ (ভারত) সমবেতভাবে বুঝায়। (*ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৫শ খ. (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মে ১৯৯৪ খৃস্টাব্দ), পৃ. ২৭৩-২৭৪; *বাংলা বিশ্বকোষ*, ৩য় খ. প্রথম সংস্করণ (ঢাকাস্থ ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রোগ্রামস এর তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও সম্পাদিত, ১৯৭৩ খৃস্টাব্দ), পৃ.৩৪৬.

২. আল্ কুর'আন, ৪ : ৭।

Dhaka University Institutional Repository

৮. অভিবাসী নারীদের ক্ষেত্রে তাদের বিদেশ গমনের ক্ষেত্রে প্রতারনার শিকার ও আদম ব্যবসায়ীদের হয়রানি।

৯. বিদেশীদের যৌন দাসত্ব সরকারের পক্ষ থেকে কোন ব্যবস্থা না নেয়া। দুতাবাস থেকে যথাযথ সহযোগীতা না পাওয়া।

১০. বিদেশে নারী শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের উদ্যোগ না নেয়া।

১১. বিদেশে শ্রমের নামে নারী পাচার।

১২. আদিবাসী নারীদের জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নে সম্পৃক্ত না করা।

১৩. কর্মজীবি নারীদের কর্মক্ষেত্রে যথাযথ পরিবেশ না থাকা।

১৪. মেয়েদের শিক্ষায় উৎসাহিত না করা।

১৫. উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি

১৬. কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের দ্বারা হয়রানি এবং

১৭. নারীশিক্ষা অগ্রগতির সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা[১]

বিভিন্ন গবেষণা অনুসারে দেখা গেছে, পরস্পর সম্বন্ধীয় এবং পরপর ক্রিয়াশীল তিন ধরণের কারণ শিক্ষাক্ষেত্রে নারীদের অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্থ করে। এগুলো হলো :

১. আর্থ-সামাজিক সীমাবদ্ধতা (লিঙ্গ-বৈষম্যভিত্তিক পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উদ্ভূত)।
২. দারিদ্র্য।
৩. ব্যবস্থাপনার অপ্রতুলতা।

১. আর্থ সামাজিক সীমাবদ্ধতা

পরিবার লিঙ্গ-বৈষম্য, শিক্ষাসহ উন্নয়নের উৎস ও সুযোগগুলোর অসম বন্টন, বিশেষভাবে গ্রামীণ এলাকায় পরিলক্ষিত হয়। সামাজিকীকরণে লিঙ্গভিত্তিক সনাতন ধারণার প্রয়োগ, বিশেষ করে দরিদ্র্য পরিবারগুলোতে মেয়েদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার যৌক্তিকতা নেই এমন ধারণা নারীদেরকে পিছিয়ে রাখছে। গ্রামীণ অভিভাবকদের উপর অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহের ব্যবস্থা করা, যৌতুক এর জন্য বিনিয়োগ করার জন্য সামাজিক চাপ, গ্রামীণ দরিদ্র অভিভাবকদের শিক্ষা ও জ্ঞানের নিম্নমান, নিরাপত্তার অভাব (রাস্তাঘাট) যানবাহনের অপ্রতুলতা, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ও অপ্রতুলতা ইত্যাদি বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক সীমাবদ্ধতার মূল কারণ।

২. দারিদ্রতা

দারিদ্রতার ফলে মেয়েদের উপর মজুরিভিত্তিক কাজে নিয়োজিত হওয়ার চাপ, দারিদ্র্য পরিবারগুলোতে গৃহের দৈনন্দিন কাজে সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা, শিক্ষার জন্য লুক্কায়িত খরচ যেমন, নির্ধারিত পোশাক, বইপত্র, ফিস, কোচিং ইত্যাদির খরচ বহনের অপারগতা নারীদেরকে শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।[২]

---

১. *Mohammad Khalilullah, Healh Services for Women in Bangladesh, in situation of Women in Bangladesh,* Ministry of Social Welfare and Women Affairs, Dhaka, 1988, P. III and UNDP Report, 1994, P.48.; *জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদানের স্বীকৃতি চাই অধিকার প্রয়োগের নিশ্চয়তা চাই* (Acknowledge Women's Contribution in National Economy Createenabling environment for implementation of Women's right) দ্বাদশ জাতীয় সম্মেলন ২০১৩, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ৩১ অক্টোবর ২০১৩, সুফিয়া কামাল ভবন, ১০/বি/১ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০, পৃ. ৭-৭৪; *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি*, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯৯; মহিলা সমাচার, *নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮ ও নারী আন্দোলন অভিজ্ঞতা*, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, জানুয়ারী-মার্চ, ২০০৮, পৃ. ৬; *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১১; প্রফেসর ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মন, *নারী ও রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯-৪৬০।

২. *সামাজিক প্রেক্ষাপটে গ্রাম বাংলার নারী শিক্ষার অন্তরায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭; *জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদানের স্বীকৃতি চাই অধিকার প্রয়োগের নিশ্চয়তা চাই (Acknowledge Women's Contribution in National Economy*

Dhaka University Institutional Repository

৩. ব্যবস্থাপনার সীমাবদ্ধতা

দুর্গম এলাকায় গমনের সীমাবদ্ধতা কম সেবাপ্রাপ্ত এলাকাগুলোতে বিদ্যালয় ও সুযোগ-সুবিধার অপ্রতুলতা, পিটিআই দ্বারা প্রদত্ত ট্রেনিং-এর নিম্নমান, সঠিক ট্রেনিংপ্রাপ্ত মহিলা শিক্ষকের অপর্যাপ্ততা, সৌহাদ্যপূর্ণ পরিবেশের অভাব, পাঠ্যবই পেতে দেরি হওয়া, সঠিক যন্ত্রপাতি/ উপকরণের অভাব, অংশগ্রহণভিত্তিক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের দূর্বলতা, স্থানীয় পর্যায়ে তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনার দূর্বলতা ইত্যাদি ব্যবস্থাপনার সীমাবদ্ধতা নারীর অগ্রগতির অন্তরায়।[১]

সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠান (নারীর শিক্ষা উন্নয়নে সমস্যা ও সম্ভবনা)

বাংলাদেশে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হওয়ার সময় থেকেই সহশিক্ষা রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহশিক্ষার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্য সকল বিশ্ববিদ্যালয়েও একই অবস্থা। কলেজ ও স্কুল পর্যায়ে অবস্থা কিছুটা ভিন্ন। অধিকাংশ স্কুল-কলেজে সহশিক্ষা চালু থাকলেও ছাত্রীদের জন্য আলাদা স্কুল ও কলেজ খুবই কম। তবে যেখানে মেয়েদের পৃথক স্কুল ও কলেজ নেই সেখানে সহশিক্ষার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত স্কুল ও কলেজগুলোই তাদের ভরসা। মাদ্‌রাসাগুলোতে সহশিক্ষা নেই বললেই চলে। পূর্বে মেয়েদের জন্য মাদ্‌রাসা না থাকলেও বর্তমানে মেয়েদের জন্য মাদ্‌রাসা হচ্ছে। যেখানে মেয়েদের মাদ্‌রাসা নেই সেখানে কিছু কিছু মাদ্‌রাসায় বিশেষ ব্যবস্থায় ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের পড়ার সুযোগ রয়েছে।

অতীতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীরা সংখ্যায় কম ছিল বিধায় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে গভীর মেলামেশা (Free mixing) করার সুযোগ ছিল না বললেই চলে। এর ফলে তেমন কোন সমস্যাও পূর্বে দেখা দেয় নি। বর্তমানে ছাত্রী সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় ও বিশ্বায়নের যুগে অপসংস্কৃতির মাধ্যমে পরিবেশের উপর প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলো সহশিক্ষার উপর ভিত্তিশীল মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের মেলামেশা বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেই একত্রে বসে পর্দাহীনভাবে গল্প করতে দেখা যায় যেখানে সব ধরনের হাসিঠাট্টা চলে। কিছু ছাত্র-ছাত্রী আরো এগিয়ে যায়। হাত ধরাধরি করে চলে, একত্রে রিকসায় চড়ে। এর কোনটিই ইসলাম অনুমোদিত নয়।

এতে নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে, এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবৈধ সম্পর্কে পৌঁছে যাচ্ছে। এ সম্পর্কে বাংলাদেশ অবজারভার পত্রিকায় ডাঃ সাবরিনা কিউ রশীদ লিখেন- "পূর্বে কখনো আমরা ডাক্তাররা এত অধিক সংখ্যক অবিবাহিত অল্পবয়স্কা (inteens) মেয়েকে গর্ভবতী হতে দেখি নি।" তিনি এ মন্তব্য সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেয়েদের সম্পর্কে করেন। ডাঃ সাবরিনা রশীদ তাঁর প্রবন্ধে বলেন, যে ছাত্র-ছাত্রীদের পারস্পরিক কথাবার্তা শেষ পর্যন্ত সৎ (innocent) থাকে না। এগুলো পরবর্তীতে স্পর্শ পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এ বয়সের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যৌন হরমোনের নিঃসরণ হওয়ায় যে কোন স্পর্শ শরীর ও মনে আগুন ধরিয়ে দেয়। এটি ছেলেদের ক্ষেত্রে বেশি ঘটে। কেননা মেয়েরা একটু ঠাণ্ডা (Cool) হলেও ছেলেরা অনেক বেশি আবেগপ্রবণ। সুতরাং মেয়েরা ছেলেদের বন্ধু হিসেবে নিতে চাইলেও ছেলেরা তার চেয়ে অনেক বেশি ভাবে। সেজন্য উক্ত লেখিকা সহশিক্ষার উপর ভিত্তিশীল প্রতিষ্ঠানের মেয়েদের ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা না করতে বলেছেন এবং নিরাপদ দূরত্ব (Safe distance) বজায় রেখে চলতে বলেছেন। তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ যুক্তিযুক্ত। সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেলেমেয়েদের সম্পর্ক হাসিঠাট্টার (informal) হওয়া উচিত নয়। তাদের সম্পর্ক অত্যন্ত সতর্ক এবং ফর্মাল ধরনের হওয়া উচিত।

একটি অফিসে গেলে অথবা অন্যস্থানে গেলে যেভাবে লোকজনের সাথে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে কথা বলা হয়, ব্যবহার করা হয়, এটাই হচ্ছে ফর্মাল (Formal) ধরনের ব্যবহার। ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়ার প্রয়োজনেও শিক্ষকদের সঙ্গে বা ছাত্রীরা ছাত্রীদের ভাল ক্লাসমেটদের সঙ্গে এবং ছাত্ররা তাদের ভাল ক্লাসমেটদের সঙ্গে

Createenabling environment for implementation of Women's right) প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৭৪; প্রফেসর ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মন, *নারী ও রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯-৪৬০।

[১] Mohammad KhaliluIlah, ibid P. III and UNDP Report, 1994, P.48.; প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৭৪; ।

Dhaka University Institutional Repository

যোগাযোগ রাখবে এটাই স্বাভাবিক। অন্যরকম হলে শেষ পর্যন্ত (কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া) পরিস্থিতি ঐদিক চলে যেতে পারে যা ইসলাম অনুমোদন করে না। প্রাইভেট বা টিউশনির ক্ষেত্রেও একই সতর্কতা প্রয়োজন। কিশোরী মেয়েদের যুবকদের কাছে একা নিভৃতে পড়া বা পড়তে দেয়া সঙ্গত নয়। কিশোরীদের ছাত্রীদের কাছেই পড়া উচিত। এ বিষয়ে অবশ্য অনেক চিন্তাশীল লোক অন্যরকম সমাধানের কথা ভাবেন। তারা মনে করেন যে, উচ্চ পর্যায়ে সহশিক্ষা তুলে দিয়ে মেয়েদের জন্য আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় বা আলাদা ক্যাম্পাস করাই ভাল। অবশ্য এ ধরনের পদক্ষেপ নেয়া সময়ের ব্যাপার। এ সব সহজে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। তবে কয়েকটি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় বা মেডিক্যাল কলেজ তো অবশ্যই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

মালয়েশিয়া ও পাকিস্তানের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্য সহশিক্ষাই বহাল রেখেছে। কিন্তু তারা সুন্দর পোশাক বিধি (dress code) এবং অন্যান্য নির্দেশাবলী চালু করেছে যা পরিস্থিতিকে শালীন রাখে। বাংলাদেশে এ ধরনের দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া বর্তমান পরিস্থিতিতে সম্ভব না হতে পারে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছেলেমেয়েদের সে পথই অবলম্বন করা উচিত যা ডাঃ সাবরিনা রশীদ সুপারিশ করেছেন। আমরা দেশের সরকার, সকল শিক্ষাবিদ, সমাজতত্ত্ববিদ, ইসলামী চিন্তাবিদ, অন্যান্য ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এবং নৈতিকতায় বিশ্বাসী ছাত্র-ছাত্রীদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছি।[১]

বিশ্বায়নের পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে সমগ্র পৃথিবী। বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ায় নারীকে কীভাবে সংযুক্ত করা যায়, বিশ্বায়নকে কীভাবে জেণ্ডার সমতা বৃদ্ধিতে কাজে লাগানো যায়, তা নারী উন্নয়ন পদক্ষেপের মূল বিষয়বস্তু। দেশে দেশে স্নায়ুযুদ্ধ, ক্ষমতার বন্টন, পুঁজিবাদ ও উপনিবেশিকতাবাদ, গৃহযুদ্ধ, আঞ্চলিক যুদ্ধ, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক সংগঠন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও শ্রম স্থানান্তর প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে নারীর গভীর যোগসূত্র রয়েছে। আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সম্পর্ক নারীর উপর গভীর প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যুদ্ধ নারীর উপর দৈহিক, আর্থিক ও মানসিক চাপ সৃষ্টি করে; নারী ধর্ষণ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক যুদ্ধের একটি দুঃখজনক অনুষঙ্গ। বর্তমান আধুনিক যুগে নারী পাচার ও নারী ব্যবসা আন্তর্জাতিক রূপ নিয়েছে। উন্নয়নশীল দেশের রপ্তানী-নির্ভর শিল্পায়ন নারীশ্রমের শোষণের উপর নির্ভরশীল। পোশাক শিল্পে নারী ও শিশুশ্রমের শোষণ আজ সবারই জানা। বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক সংকট ও মন্দা, কাঠামোগত সমন্বয় নীতি এবং উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিতে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের (World Bank IMF etc.) হস্তক্ষেপ, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পরিবেশ নারীর জীবন ও জীবিকাকে কীভাবে প্রভাবিত করে এবং কীভাবে জেণ্ডার সমতাকে এই সকল সমস্যা ও পরিবেশের সমাধানে নিয়োজিত করা যায় বাংলাদেশের আলোকে তা গবেষণা করা প্রয়োজন।

রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নারী

প্রশাসনিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে উন্নয়নের মূলধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করে ১৯৭২ সনের নির্বাচিত সরকার। মেয়েদের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে দিয়ে চাকুরীর সকল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয় এবং তাদের জন্য শতকরা দশভাগ কোটা সংরক্ষণ করা হয়। ১৯৭২ সনে দু'জন নারীকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং ১৯৭৪ সনে একজন নারীকে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক নিয়োগ করা হয়। সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ ইতিবাচক। দেশের প্রধানমন্ত্রী নারী, বিরোধীদলীয় নেত্রী নারী, স্পীকার নারী, সংসদের উপনেতা নারী। জাতীয় সংসদে ৩৪৫ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে ১৯ জন সরাসরি নির্বাচিত ও ৪৫ জন সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত। জাতীয় সংসদ কর্তৃক তৃণমূল পর্যায়ে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বিষয়টি আজ দৃশ্যমান। ১৯৯৮ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্থানীয় সরকারে ইউনিয়ন পরিষদে ৩ জন নির্বাচিত নারী সদস্য হওয়ার বিধান প্রনয়ণ করেন। শেখ হাসিনার সরকার কর্তৃক প্রশাসনের সচিব ও জেলা প্রশাসক পদে, এবং পুলিশ, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীতে নারী

---

[১]. 'সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শালীনতার সমস্যা' *দৈনিক ইনকিলাব* (ঢাকা: শুক্রবার, ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৯৯ খৃস্টাব্দ), পৃ. ১১।

Dhaka University Institutional Repository

কর্মকর্তাদের নিয়োগ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে উপজেলা পর্যায়ে ১ জন নির্বাচিত মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদ সৃষ্টি করা হয়।[১]

বর্তমানে প্রশাসনে সচিব পর্যায়ে তিন জন এবং অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ে চার জন নারী দায়িত্ব পালন করছেন। রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি কূটনৈতিক পদে তিন জন নারী বর্তমানে নিয়োপ্রাপ্ত রয়েছেন। দেশের সর্বোচ্চ আদালত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে সর্বপ্রথম নারী বিচারপতি নিয়োগ প্রদান নারী ক্ষমতায়নের নতুন মাইলফলক যুক্ত করেছে। এছাড়াও হাইকোর্ট বিভাগে বিচারপতি পদে পাঁচ জন নারী, বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনে নারী সদস্য রয়েছেন।[২] নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার জন্য গেজেটেড পর্যায়ে শতকরা ১০ ভাগ এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেনী পদ পর্যায়ে শতকরা ১৫ ভাগ কোটা নির্দিষ্ট রয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে শতকরা ৬০ ভাগ আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের সম্পূর্ণ নারী সংগঠিত পুলিশ ইউনিয়ন (ফিমেল ফর্মড পুলিশ ইউনিট, এফপিইউ) প্রথমবারের মত হাইতিতে দায়িত্ব পালন করছে। বাংলাদেশে বিভিন্ন পদে নারীদের নিয়োগ করা হলেও বিশাল জনগোষ্ঠির তুলনায় তা নিতান্তই কম।

উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে শিক্ষা ব্যবস্থায় নারীর উৎকর্ষ সাধন অতীব জরুরী। মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের সর্বোত্তম মাধ্যম হলো শিক্ষা। শিক্ষা মানুষের আত্ম বিকাশ ও উন্নয়ন আনয়ন করে থাকে। মহানবী (সা) এর প্রতি আল্লাহ্‌র সর্বপ্রথম বাণী 'পড়ুন' অথ্যাৎ জ্ঞান-ভূবনের রাজ্যে প্রবেশ করুন। তাই জ্ঞানান্বেষণ বা বিদ্যাকে বলা হয় ইসলামের মেরুদণ্ড। মেরুদণ্ডহীন মানুষ যেমন কর্মহীন ও অকর্মন্য থাকে তেমনি বিদ্যাহীন থেকে প্রকৃত মুসলমান হওয়া অস্বাভাবিক ও অসম্ভব।

আর এ শিক্ষা নারী-পুরুষের সমান অধিকার। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় নারী সমাজ যথেষ্ট পিছিয়ে। বাংলাদেশের উন্নয়ন ও খ্যাতি অর্জনে নারী শিক্ষার ওপর যথাযথ গুরুত্বারোপ প্রয়োজন। বিশ্ব দরবারে নিজেদের সম্মানজনক অবস্থান তুলে ধরতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষার মাধ্যমে সকলকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার বিকল্প নেই। সে ক্ষেত্রে নারী-পুরুষকে সমান হারে দক্ষ করে তুলতে এটিই একমাত্র উপায়। বিশ্বজুড়ে অগ্রগতির যে প্রতিযোগিতা চলছে এর সংগে তালমিলিয়ে চলতে হলে আমাদের দেশের প্রত্যেক নারী-পুরুষকে উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে হবে। এসব বিবেচনায় নারীর ক্ষমতায়ন ও শিক্ষা ক্ষেত্রে সম্মানজনক অবস্থান তৈরীর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বহুমূখী পদক্ষেপ নিতে হবে। বাংলাদেশের জনসংখ্যার তুলনায় উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অপ্রতুল। তাই মেয়েদের জন্য পৃথক আরো কারিগরি, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা দরকার, যাতে করে সম্ভবনাময়ী একজন মেধাবী তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবস্থান তৈরী করতে না পেরে যেন হতাশ না হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হলো- বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আশা-আকঙ্খা, ইতিহাস-ঐতিহ্যে বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে জাতীয় পরিচয় তুলে ধরা।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। তাদের অবস্থা ঐতিহ্যগতভাবেই দূর্ভাগ্যজনক। বিভিন্ন সূচক অনুসারে দেখা যায়, বাংলাদেশের নারীদের সামাজিক মর্যাদা পুরুষদের চেয়ে অনেক নিচে। ঐতিহ্যগত, সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ ও চর্চাগুলো সমাজ দ্বারা আরোপিত নারীর অধোপতিত অবস্থানকে আরো দৃঢ় করেছে এবং শিক্ষা, কারিগরী ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, চাকুরী ও সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণের সুযোগকেও সীমিত করেছে। ভূমির মালিকানা ও দারিদ্র্যের ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনের জন্ম দেয় নারীদের জীবনে তা গুরুত্বপূর্ণ অভিঘাতের সৃষ্টি করে। স্বাধীনাত্তোরকালে বাংলাদেশ নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ এবং ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা লাভের পর নারী সমাজের জন্য এক নব দিগন্তের সূচনা হয়।[৩] ১৯৭২ সালে রচিত সংবিধানে নারী পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।[১] শুধু সংবিধান নয়

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯-৪৬০।

২. ড. মুস্‌তাফা আস্‌ সিবায়ী, *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ডিসেম্বর ২০০৪ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৩৬-৪৫; প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯-৪৬০।

৩. ইসলাম, তৌফিকুল, নারীর ক্ষমতায়ন, *দৈনিক ইত্তেফাক* (ঢাকা: দৈনিক ইত্তেফাক প্রকাশনা, প্রধান কার্যালয়, ১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯ খৃস্টাব্দ), পৃ. ১০।

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তব জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ ও নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বাস্তব পদক্ষেপ নিয়ে বাংলাদেশ সরকার এগিয়ে চলেছে।

নারী শিক্ষার গুরুত্ব এই জন্য বেশি যে, একজন নারীই হয়ে থাকেন মানব সন্তানের প্রথম শিক্ষক। এইভাবে আজ যারা ছাত্র আগামীদিনে তারাই হবে জাতির শিক্ষক। তাই নারী শিক্ষা তথা শিক্ষা বিস্তারের সাথে সাথে কোন আপত্তি ছাড়াই বাংলাদেশ সরকার বেইজিং চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের গৃহীত নারী উন্নয়নের বৈশ্বিক নীল নকশা 'প্লাটফরম ফর এ্যাকশন' 'Platform for Action, PFA' অনুমোদন করেছে। এই 'প্লাটফরম ফর এ্যাকশন' বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রসমূহকে ১৯৯৬ সালের মধ্যে জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়েছিল বেইজিং সম্মেলনেই। সেই অঙ্গীকার অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৭ সালের ৮ মার্চ জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা এর খসড়া প্রণয়ন করেছে।

প্লাটফরম ফর এ্যাকশন

এক আন্তর্জাতিক পরামর্শমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 'প্লাটফরম ফর এ্যাকশনের' খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। এই প্রস্তুতি প্রক্রিয়ার জন্য দুই বছরের বেশি সময় লেগেছে। এই সময়ে ধারাবাহিকভাবে, জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে নারীর ক্ষমতায়নের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে বিশ্ব জনমতের প্রতিফলন ঘটেছে। যা নারীর জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমতা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃতি দেয়। ক্ষমতায়ন এবং সর্বক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মূল ভাবনাটি সমগ্র 'বেইজিং প্লাটফরম ফর এ্যাকশন' জুড়ে সঞ্চারিত হয়েছে।

প্লাটফরম ফর এ্যাকশন বাস্তবায়নের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যসাধন পদ্ধতি

বাংলাদেশে 'প্লাটফরম ফর এ্যাকশন' এর তদারকী ও বাস্তবায়নের জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে শীর্ষ কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয় হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে মন্ত্রণালয় নিম্লোক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কার্যসাধন পদ্ধতি চালু করেছে।

- ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বরে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবকে সভাপতি করে আন্তঃমন্ত্রণালয় টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে।
- বেইজিং সম্মেলনের বিষয়াবলীকে তদারকীর জন্য মহিলা বিষয়ক অধিদফতর সরকারের বাইরের বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি কোর গ্রুপ গঠন করেছে।

'প্লাটফরম ফর এ্যাকশন' এর ভিত্তিতে একটি ব্যাপক ভিত্তিক ও অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা করার জন্য একটি প্রক্রিয়া চালু করতে মন্ত্রণালয় এবং কোর গ্রুপ ঘনিষ্টভাবে কাজ করছে।[২]

খাতওয়ারী চাহিদা নিরূপন

জাতীয় নারী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও একে কেন্দ্র করে নানা ধরণের কর্মতৎপরতা চালানোর জন্য একটি আন্তঃখাত, আন্তঃমন্ত্রণালয় ও ব্যাপক ভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। কেননা, নারীর অবস্থার উন্নয়ন গোটা সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থার সমন্বিত প্রয়াস ও সিভিল সোসাইটির সহযোগিতার মাধ্যমেই কেবল অর্জিত হতে পারে। 'প্লাটফরম ফর এ্যাকশন' এর সুপারিশ সমূহের আলোকে জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পরিচালনা করতে খাতওয়ারী চাহিদা নিরূপন টিমগুলো গঠন করা হয়। ১৯৯৬ সালের আগস্ট মাসে টিমগুলো কাজ শুরু করে এবং ১৯৯৭ সালের মে মাসে রিপোর্ট চূড়ান্ত করে।[৩] জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে পরামর্শক হিসেবে সরকারের বাইরের বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের মধ্যে রয়েছে :

নারী সংগঠনসমূহ;
মানবাধিকার গ্রুপসমূহ;

---

১. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।*

২. রঞ্জন কর্মকার, *জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা* (ঢাকা : স্টেপ্স টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, উন্নয়ন পদক্ষেপ, বর্ষ-৪, সংখ্যা-১২, এপ্রিল-জুন, ১৯৯৮ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৪৮-৪৯।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা সংস্থাসমূহ;
বে-সরকারী খাত; এবং
পেশাজীবী সংগঠন প্রভৃতি।

নারী উন্নয়নের জন্য খাতওয়ারী চাহিদা নিরূপন প্রক্রিয়া বাংলাদেশী সরকার ও সিভিল সোসাইটির অংশিদারিত্ব ভিত্তিক একটি পূর্ণাঙ্গ জাতীয় উদ্যোগকেই প্রতিফলিত করেছে। 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি' বাংলাদেশে নারী অধিকারের উপর এতো জোর দেয়া সত্বেও দুর্ভাগ্যজনক বিষয় যে, স্বাধীনতা পরবর্তী ২৬ বছর পর্যন্ত এদেশে কোন নারী উন্নয়ন নীতি ছিল না। ১৯৯৭ সালের ৮ মার্চ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ঘোষণা করেন।[১] বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ঘোষিত নারী উন্নয়ন নীতির প্রধান লক্ষ্য হলো যুগ যুগ ধরে নির্যাতিত ও অবহেলিত এদেশের বৃহত্তর নারী সমাজের ভাগ্যোন্নয়ন করে তাদের ক্ষমতায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান লিঙ্গ বৈষম্য দূর করে একটি সুষম সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।[২] নিম্নে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির লক্ষ্য, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়ন কৌশলসমূহ উপস্থাপিত হলো; জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে যাই হোক না কেন বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতেই উন্নয়ন অগ্রাধিকার নিরূপনে সরকারের মনোভাব প্রতিফলিত হয়। এখানেই দেখা যেতে পারে, সরকার কীভাবে জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর ভূমিকার বিষয়টিকে বিবেচনা করছে। নিচে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর এ পর্যন্ত ঘোষিত ৫টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারীদের অবস্থান তুলে ধরা হলো : বাংলাদেশ স্বাধীন-স্বার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার পর নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণ করেছে

জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা ও গৃহীত পদক্ষেপ

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮) : স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত, ছিন্নমূল নারীর পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কর্মসূচী গৃহীত হয়। নারী শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, সমাজকল্যাণ মূলক বিভিন্ন আর্থিক স্বাবলম্বিতা অর্জনের জন্য প্রথমবারের মত নারী উন্নয়ন বিষয়টি গুরুত্ব পায় ও নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদেশী সাহায্যের মাধ্যমে কর্মসূচী গ্রহণ ও অর্থ বরাদ্দ করা হয়। ১৯৭২ সনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক-বাহিনীর হাতে সম্ভ্রম হারানো মা-বোনদের আত্মত্যাগকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণীয় করে রাখার জন্য "বীরাঙ্গনা" উপাধিতে ভুষিত করেন। যে সব মায়েদের পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর অত্যাচারের কবল থেকে মুক্ত করা গিয়েছিল তাদের পুণর্বাসনের জন্য বঙ্গবন্ধুর সরকার ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল। শহীদ পরিবারের সদস্যদের জন্য বিশেষত শহীদের স্ত্রী ও কন্যাদের জন্য চাকুরী ও ভাতার ব্যবস্থা করেছিল বঙ্গবন্ধুর সরকার। বঙ্গবন্ধু সরকার ১৯৭২ সনে বাংলাদেশ নারী পূনর্বাসন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করে। এই বোর্ডের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ছিল- (ক) স্বাধীনতা যুদ্ধে নির্যাতিত নারী ও শিশুর সঠিক তথ্য আহরণের জন্য জরিপ কাজ পরিচালনা করা এবং তাদের পূনর্বাসনের ব্যবস্থা করা; (খ) যুদ্ধে নির্যাতিত নারীদের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা; এছাড়াও বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের প্রচেষ্টায় দশজন বীরাঙ্গনা নারীর বিয়ের ব্যবস্থা করা। পারিবারিক ও সামাজিকভাবে অধিকাংশ মেয়ের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

নারী পূনর্বাসন বোর্ডের দায়িত্ব ও কার্যপরিধি ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৭৪ সনে এই বোর্ডকে বৃহত্তর কলেবরে পুণর্গঠিত করে নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশনে রূপান্তরিত করা হয়। ফাউন্ডেশনের বহুবিধ কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম ছিল- (১) দেশের সকল জেলা ও মহকুমায় নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে ভৌত অবকাঠামো গড়ে তোলা; (২) নারীর ব্যাপক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা; (৩) নারীকে উৎপাদনমূখী কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করে প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা; (৪) উৎপাদন ও প্রশিক্ষণ কাজে নিয়োজিত নারীর জন্যে দিবাযত্ন সুবিধা প্রদান করা; (৫) যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের চিকিৎসা প্রদান করা; (৬) মুক্তিযুদ্ধে

[১] *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ৯ মার্চ, ১৯৯৭ ইং পৃ. ৫।

[২] *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি*, (ঢাকা : মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ৮ মার্চ, ১৯৯৭ খৃস্টাব্দ), পৃ. ১-১৪।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষতিগ্রস্ত নারীর ছেলে-মেয়েদের পড়া-লেখার জন্য বৃত্তিপ্রথা চালু করা যা বর্তমানে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর আওতায় "দুঃস্থ মহিলা ও শিশু কল্যাণ তহবিল" নামে পরিচালিত হচ্ছে।[১]

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারীদের অর্থকরী কাজে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম আন্তঃখাত উদ্যোগ গৃহীত হয়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নারীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী (গ্রামীণ মহিলা ক্লাব) চালু করে। স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয় গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু করে। পরবতীতে এই কর্মসূচী বিশ্বব্যাংকের সহয়তায় নারী সমবায় কর্মসূচীতে রূপান্তরিত হয়। ১৯৭৩ সনে সাভারে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ৩৩ বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত "গ্রামীন মহিলাদের জন্য কৃষিভিত্তিক কর্মসূচীর' কাজও শুরু হয়। এ ছাড়াও

সবার জন্য শিক্ষার পথ উম্মুক্ত করা। সত্তরের দশকে শতকরা ৪০ জন কন্যাশিশু বিদ্যালয়ে যেত। লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় এটিকে ৫৫% উন্নীত করা, পরিকল্পনা করা হয় যে ১৪.১ লাখ ছেলে শিশু ১১.৪ লাখ কন্যা শিশু স্কুলে ভর্তি হবে।[২]

দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৮-১৯৮০) : নারীর কর্মসংস্থান ও দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়াও সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা।গ্রাম ও শহরের মানুষের শিক্ষাগত বৈষম্য দূর করা; এবং শিক্ষাক্ষেত্রে শিশু বৈষম্য দূর করা।

৩য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৮৫-৯০)

- ১৯৯০ সালের মধ্যে বিদ্যালয়ে গমনযোগ্য ৭০% ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো এবং শতাব্দীর শেষে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে তাদেরকে প্রাথমিক শিক্ষাকাল সমাপ্ত করার জন্য বিদ্যালয়ে রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করা;
- শিক্ষা সুবিধার ক্ষেত্রে শহর ও গ্রামের বৈষম্য হ্রাস করা;
- প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কারিগরি শিক্ষার শিক্ষকগণকে চাকরীকালীন ও চাকরিপূর্ব প্রশিক্ষণ প্রদান করা; এবং
- শিক্ষা সুযোগের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য হ্রাস করা।[৩]

নারী শিক্ষাকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় প্রত্যেক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়। এর ফলে ক্রমান্বয়ে নারী-পুরুষের শিক্ষার ব্যবধান কমে আসতে থাকে।[৪]

শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবার লক্ষ্যে ড.কুদরত-এ-খুদার নেতৃত্বে ১৯৭২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। এ কমিশন নারী শিক্ষার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করে তাদের প্রতিবেদনে "নারী শিক্ষা" শীর্ষক একটি অধ্যায় সংযোজন করে। "নারী শিক্ষা" শীর্ষক অধ্যায়ের শুরুতে বলা হয়- সমাজের সব মানুষের সকল বৃত্তির পূর্ব বিকাশ, গৃহের মান ও পরিবেশ উন্নতকরণ এবং দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার জন্য নারী শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা অতীব প্রয়োজন। শিশু

---

[১] *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি* ২০১১ (ঢাকা : মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মার্চ ২০১১ খৃস্টাব্দ), পৃ. ১১।

[২] হান্নানা বেগম, *মানব সম্পদ ঃ বাংলাদেশের নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০। এই সকল পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের মধ্যে নৈতিক শিক্ষা, ধর্মীয় মূল্যবোধের বিকাশের কোন উল্লেখ ছিল না। ফলে ক্রমান্বয়ে শিক্ষার এবং স্বাক্ষরতার হার বেড়েছে। কিন্তু শিক্ষিত এই যুব সমাজ বাংলাদেশের সম্পদ না হয়ে সমস্যায় পরিণত হয়েছে। নীতিহীন উচ্ছৃঙ্খল জাতি কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। (মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১)।

[৩] স্বাধীনতা পরবর্তীকালে উল্লিখিত প্রত্যেকটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নারী পুরুষের শিক্ষার বৈষম্য দূরীকরণের জন্য প্রতিশ্রুতি রয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে নারী স্বাক্ষরতা উন্নয়নের অন্যতম অংশ বলে গণ্য করা হয়। নারী স্বাক্ষরতার হার ৭০ এর দশকে ১৬.৪৩, ৮০ এর দশকে ১৭.৫২ ছিল। ৯০ এর দশকে ২৫.৪৫ এ উন্নীত হয়। (১৯৭৪-৯৫ ব্যানবেইজ রিপোর্ট ১৯৯৭, পৃ. ১১৬, প্রি প্রভিশনাল: হান্নানা বেগম, *মানব সম্পদ ঃ বাংলাদেশের নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১-৭২)।

[৪] হান্নানা বেগম, *মানব সম্পদ ঃ বাংলাদেশের নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

Dhaka University Institutional Repository

চরিত্র অঙ্কুরিত ও বিকশিত হয় মাতৃপরিবেশে। অথচ শিক্ষার অভাবে অধিকাংশ নারী কুসংস্কার ও অজ্ঞতাকে পাথেয় করে সংসার জীবন নির্বাহ করে। অতি শিঘ্রই এ অবস্থার পরিবর্তন হওয়া উচিৎ।[১]

নারী শিক্ষার উন্নয়নে এ প্রতিবেদনে তেরটি সুপারিশ করা হয়। সুপারিশগুলোতে বলা হয়। "মেয়েদের শিক্ষা এমন হতে হবে যা তাদের দৈনন্দিন সাংসরিক কাজে লাগে। পাঠ্যসূচিতে শিক্ষার যত্ন, রোগীর সেবা, স্বাস্থ্যবিধি, খাদ্য, পুষ্টি, খাদ্য সংরক্ষণ সূচি, সূচি শিল্প পুতুল ও খেলনা তৈরি, হাঁস মুরগি পালন ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। মেয়েদের জন্য তাদের স্বভাব উপযোগী বৃত্তিমূলক শিক্ষা, নার্সিং, এবং প্যারামেডিকেল কাজ, ইত্যাদি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনে চাকুরীর ক্ষেত্রে তাদেরকে পুরুষের সমান অধিকার দিতে হবে।[২] স্বাক্ষরতা বিস্তারে উপানুষ্ঠানিক ও বয়স্ক শিক্ষা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত শিক্ষা ব্যবস্থা। ১৯৭৪ সালে নিরক্ষরতা দূরীকরণে বয়স্ক শিক্ষার কথা বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘদিন ধরে দেশে গণশিক্ষা কর্মসূচি চালু থাকলেও নানা কারণে তা সাফল্য লাভ করতে পারেনি। আশির দশকে জাতীয় পর্যায়ে সীমিত আকারে গণশিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ করা হলেও সমাজ ও গণ সম্পৃক্ততার অভাবে সেই কর্মসূচী ব্যর্থ হয়ে যায়। নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি করার ব্যাপারে জাতীয় পর্যায়ে ঘটে সচেতন কর্মপ্রচেষ্টার উন্মেষ। এর সাথে যুক্ত হয় আন্তর্জাতিক উৎসাহ, উদ্যম ও সহযোগিতা।[৩] উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন বয়সের ২৪ লাখ ৬৮ হাজার নিরক্ষরকে স্বাক্ষর করা হয়। এদেশে অর্ধেকেরও বেশি ছিল নারী। সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি প্রায় ৪ শত ৩৫ টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে এবং সরকারি উদ্যোগে গৃহিত কর্মসূচিকে এ ব্যাপারে সাহায্য সহযোগিতা করছে। ১৯৭২-১৯৯৪ সাল পর্যন্ত বেসরকারি সংস্থাগুলো ১৯ লাখ ৯৬ হাজার ৫৫৯ জন নারীকে স্বাক্ষর করেছে। পরবর্তী দশকে এ হার আরও বৃদ্ধি পায়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭১ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করত ২৩ শতাংশ ছেলেমেয়ে। এই হার ১৯৮৫ সালে প্রথম ৪০ শতাংশে উন্নীত হয়। আর ১৯৯০ সালে তা ৪৫ শতাংশ ছুঁয়ে যায়।[৪]

শিক্ষা সংক্রান্ত বিশ্ব আন্দোলন, আন্তর্জাতিক উদ্যোগ এবং দেশের সামগ্রিক চাহিদার কারণে বাংলাদেশ গত এক দশকে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধন করেছে। বাংলাদেশে গত এক দশকে নারী শিক্ষা, বিশেষ করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষার ক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। অধিকাংশ শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদের মতে, এই সাফল্য এসেছে মূলত সংখ্যাগত দিক থেকে; মানসম্মত শিক্ষা এখানে অর্জিত হয় নি।[৫] আলাহ তায়ালা মানুষ সৃষ্টির সাথে সাথে মানুষের মধ্যে ভাল ও মন্দ দুটি প্রবৃত্তি দিয়েছেন। আর তাই এমন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োজন যা এই জনগোষ্ঠীকে সৎ মানুষে পরিণত করে এবং সেই অনুযায়ী মন-মানসিকতা তৈরিতে পথ দেখায়। কিন্তু যদি শিক্ষা ব্যবস্থা বস্তুবাদী হয়। কিংবা অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর আকীদা, বিশ্বাসের, বিপরীত হয় তবে তা শিক্ষার্থীদের মন, মানসিকতা, চিন্তা ও দৃষ্টিভংগিকে বিভিন্নমুখী স্রোতে প্রবাহিত করে। বলা বাহুল্য, নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অনেক বেশি। কেননা একজন নারীই একটি জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধারকে ধারণ করে ও লালন করে। তাই তাঁরই চিন্তা-চেতনায় জাতি হতে পারে

---

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশের শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট* (ঢাকা : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৪ খৃস্টাব্দ), পৃ. ১৯৬।

২. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট* (ঢাকা : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৭৪ খৃস্টাব্দ) পৃ. ১৯৫-১৯৬।

৩. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর, *বার্ষিক প্রতিবেদন, ১৯৯৭-৯৮* (ঢাকা : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯৮ খৃস্টাব্দ), পৃ. ১৯৬।

৪. কামরুন্নেসা বেগম, *প্রাথমিক শিক্ষানীতি প্রতিবেদন* (ঢাকা : প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৯২ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৫-৩০; জাহানারা হক, ইউনেস্কো ১৯৯৫-১৯৯৮ (ঢাকা : প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯৮ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৪-৩৫।

৫. United Nations Educational, Scientific and cultural Organization (UNESCO) World Education report, 1998, Paris, 1998, pp.4-40.

Dhaka University Institutional Repository

আদর্শবান, সৎ নৈতিকমূল্যবোধ সম্পন্ন শক্তিশালী।[১] আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্যের সাথে এগুলো সম্পৃক্ত নয়। তাই আমরা শিক্ষা লাভ করে ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ হতে পারছি না। নারী শিক্ষার গুরুত্ব এই জন্য বেশি যে, একজন নারীই হয়ে থাকে মানব সন্তানের প্রথম শিক্ষক। আজ যারা ছাত্র আগামীদিনে তারাই হবে জাতির শিক্ষক। তাই নারী শিক্ষা তথা শিক্ষা বিস্তারের সাথে সাথে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পৃক্ত করতে হবে নৈতিক শিক্ষার সাথে।[২]

৪র্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯০-৯৫ইং) : রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের শাসনামলে প্রণীত হয় ৪র্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯০-৯৫ইং)। এ পরিকল্পনা প্রণয়নের কিছু দিন পরই (০৬-১২-১৯৯০ ইং) তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন। নারীদের জাতীয় উন্নয়ন কার্যক্রমের মূল ধারায় নিয়ে আসাকে কেন্দ্র করে এই পরিকল্পনাটি নারী সংগঠন, পেশাজীবি সংগঠন ও সংশ্লিষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রচুর আলোচনা-সমালোচনার জন্ম দেয়। এ সময়ে দাতা সংস্থার আর্থিক সহায়তায় ক্রমবর্ধমান হারে নারী সংক্রান্ত বিভিন্ন সমীক্ষা বাংলাদেশের নারী ইস্যুর সপক্ষে একটি শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করে এবং সরকারকে এ ব্যাপারে মনোযোগী করে তুলে। ১৯৮৯-৯০ সালে বাংলাদেশের দাতাগোষ্ঠীর প্রতি স্মারক (Memorandum to the Bangladesh Aid Group) এ বাংলাদেশ সরকার উল্লেখ করে যে, নারীদের বিষয়সমূহকে নিছক সমাজকল্যাণমূলক সমস্যা হিসেবে না দেখে উন্নয়নের মূল ধারায় পরিণত করতে হবে। এই লক্ষ্যে প্রথমবারের মত জাতীয় পরিকল্পনায় নারী বিষয়সমূহের জন্য একটি পৃথক অধ্যায় সংযোজিত হয়। এছাড়াও প্রত্যেক খাতওয়ারী অধ্যায়ে নারী বিষয়ক একটি অংশ রাখার জন্য গুরুত্বারোপ করা হয় এবং সকল উন্নয়ন প্রকল্পে প্রয়োজনে নারী প্রসঙ্গটি বিবেচনায় আনার কথা বলা হয়। এ পরিকল্পনায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প-বানিজ্য, সেবা ও অন্যান্য খাতেনারী বর্ধিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা দারিদ্র্য দূর করা, দক্ষতা বৃদ্ধি করা, স্ব-কর্মসংস্থান ও ঋণ সুবিধা সম্প্রসারণ করা, জেন্ডার সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং নারীর জন্য সহায়ক সুবিধা সম্প্রসারণ যথা, হোষ্টেল, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, আইন সহায়তা প্রদান উল্লেখযোগ্য।

ত্রিবাষিক আবর্তক পরিকল্পনা ও বাষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে স্ব-কর্মসংস্থান, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, অনানুষ্ঠানিক ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন, দুঃস্থ নারীর জন্য খাদ্য-সহায়তা কর্মসূচী, খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচী, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, পল্লী অঞ্চলে মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং টিকাদান কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

বাংলাদেশ সরকার প্রথমবারের মত এই পরিকল্পনায় সুস্পষ্ট যে লক্ষ্য নির্ধারণ করে তা হলো :

১. জাতীয় পরিকল্পনার সামষ্ঠিক অর্থনৈতিক (Macroeconomic) কাঠামোর মধ্যে নারী সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা;
২. জেন্ডার ভিত্তিক বৈষম্য হ্রাসের লক্ষ্য : *. নারী সাক্ষরতার হার উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি করা; *. নারীদের জন্য কর্ম সুযোগ বৃদ্ধি করা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্ম পরিবেশ উন্নত করা;

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২ইং) :[৩] এই পরিকল্পনায় নারীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে লিঙ্গ বৈষম্য কমিয়ে আনার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। নারীর বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরে উল্লিখিত অঙ্গীকার বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে এই পরিকল্পনায়। এতে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সনদ, বেইজিং প্লাটফরম ফর এ্যাকশন, নারী উন্নয়নের জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। কৃষি এবং পল্লী উন্নয়ন, শিল্প, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা, খনিজ, পরিবহন ও যোগাযোগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাইক্রো অধ্যায়গুলোতে জেন্ডার প্রেক্ষিত সম্পৃক্ত করা হয়।

---

১. আদুস শহীদ নাসিম, *শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি* (ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, ১ম সংস্কারণ নভেম্বর- ১৯৯৭ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৬৫-৬৬।
২. আবদুস শহীদ নাসিম, *শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত পৃ. ৭১।
৩. কর্মকার, রঞ্জন (সম্পাদনা), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮-৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ :[১] পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে।

ক) সর্বক্ষেত্রে ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণের মধ্যে সমতা স্থাপন;

খ) পরিবার, সম্প্রদায় ও সমাজে মানুষের মর্যাদা ও সমতা অর্জনের ক্ষেত্রে বাঁধাসমূহ দূর করার লক্ষ্যে দৃষ্টিভঙ্গি, কাঠামো, নীতিমালা, আইন-কানুন ও প্রথার পরিবর্তন সাধন;

গ) দক্ষতা, সম্পদ ও সুযোগ এবং তথ্যের জগতে প্রবেশসহ উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সম অধিকার নিশ্চিত করা;

ঘ) রাজনৈতিক, নাগরিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জগতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি;

ঙ) নারীর অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি এবং এমন ধরণের অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়ন করা, যা নারীর কর্মসংস্থান এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় সেক্টরে নারী শ্রমিকের আয়-উপার্জনের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে;[২]

চ) জেন্ডার সমতা ত্বরান্বিত এবং নারীর মর্যাদা উন্নয়নের লক্ষ্যে ইতিবাচক রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও রীতিনীতি প্রতিষ্ঠা ও রূপান্তর সাধন;

ছ) উন্নয়নের সকল ক্ষেত্র ও প্রেক্ষাপটে নারীর বিষয়সমূহকে মূলধারায় পরিণত করতে সকল স্তরে প্রয়োজনীয় অর্থ, মানব-সম্পদ ও ক্ষমতাসহ কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক মেকানিজম প্রতিষ্ঠা করা;

জ) সুযোগ-সুবিধা ও পরিসেবা লাভের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রুপের সদস্য, বিশেষ করে নারী সদস্যরা যেসব প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে সেগুলো চিহ্নিত করা এবং এ সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

ঝ) দরিদ্র নারী প্রধান পরিবারসমূহের সাহায্যার্থে সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক, সামাজিক, কৃষি বিষয়ক এবং সংশ্লিষ্ট অপরাপর নীতিমালা ও কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;

ঞ) বিদ্যমান বৈষম্যমূলক আইন-কানুনসমূহের পর্যালোচনা করা এবং এসব আইন বাতিলের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন করা;

ট) নারীর প্রতি সকল প্রকার ‘বৈষম্য বিলোপ সনদ’ বা ‘সিডও’ ও ‘বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর এ্যাকশন’ বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা এবং সরকারের উন্নয়নে নারী সক্ষমতার প্রাতিষ্ঠানিক পর্যালোচনার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

ঠ) কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন, শিল্প ও বাণিজ্য, মৌলিক পরিসেবা যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানীয় জল সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারীর বিষয়সমূহকে মূলধারায় পরিণত করা;

ড) শ্রমশক্তিতে নারী-পুরুষের অংশগ্রহণের হারের মধ্যকার ব্যবধান হ্রাস করা;

ঢ) কর্মজীবি নারীদের জন্য সহায়ক পরিসেবা যেমন- শিশু প্রতিপালন কেন্দ্র ও পরিবহন সুবিধাদি, বিনোদন প্রভৃতির সুযোগ বৃদ্ধি করা;

ণ) স্থানীয় সরকারের সকল স্তরসহ সরকার ও প্রশাসনে নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করা;

ত) সাক্ষরতার হার এবং উন্নয়ন দক্ষতা ও কারিগরী প্রশিক্ষণসহ শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য হ্রাস করা;

থ) ‘সবার জন্য স্বাস্থ্য’ এই লক্ষ্যের অধীনে স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পরিসেবায় সমগ্র জীবনব্যাপী নারীর পরিপূর্ণ সুযোগ বৃদ্ধি করা;[৩]

---

১. *Draft Report of Government of the People’s Republic of Bangladesh-National Action Plan for Women’s Advancement : Implementation of the Beijing Platform For Action* (PFA),pp.3-30; রঞ্জন কর্মকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮-৪৯।

২. ibid, pp. 5-30.

৩. ibid, pp. 5-30.

দ) নারী ও বালিকারা যেসব নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে সেগুলো দূর করা, সব ধরণের নারী নির্যাতন দূরা করা এবং নির্যাতিত নারীদের চিকিৎসা ও পুণর্বাসনের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

ধ) নারী ও কন্যা শিশু পাচার রোধ করা;

ন) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শান্তি আলোচনায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;

প) পরিবেশগত ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় নারীর ভূমিকা ও বিষয়সমূহকে স্বীকৃতি প্রদান করা;

ফ) গণমাধ্যমে নারী ও কন্যা শিশুর ইতিবাচক চিত্র বর্ধিত মাত্রায় তুলে ধরা; এবং

ব) উন্নয়নে নারী নীতিমালার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণের জন্য একটি জাতীয় তদারকি প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান করা।

৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১০-২০১৫)[১]

নারী পুরুষের সমতা আনয়নের লক্ষ্যে যে পদক্ষেপসমূহ পরিকল্পিত হয়েছে তা হলো :

১. সকল স্তরের সিদ্ধান্ত কাঠামো ও ক্ষমতায় নারী-পুরুষের ক্ষমতা অর্জন;
২. জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নারীর অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও অধিকার প্রতিষ্ঠা;
৩. জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারীর উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে প্রয়োজনীয় সম্পদ, প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা ও কার্যকরী কৌশল প্রতিষ্ঠা;
৪. সকলের জন্য বিশেষ করে নারীর জন্য দারিদ্র বিমোচন, খাদ্য এবং দৈনিক নূন্যতম ১৮০০ কিলোক্যালরি পুষ্টি নিশ্চিত করা;
৫. ভূমি, পুজি, প্রযুক্তিসহ সকল অর্থনৈতিক সম্পদে নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা;
৬. অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় তথ্য, দক্ষতা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বিষয়ক পার্থক্য কমিয়ে আনা এবং নারীর কাজকে দৃশ্যমান করা ও স্বীকৃতি দেয়া;
৭. পেশার ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করা;
৮. সবার জন্য স্বাস্থ্য কর্মসূচীর আওতায় নারীর পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করা;
৯. নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার সহিংসতা নির্মূল করা;
১০. নারী ও শিশু পাচার বন্ধ করা;
১১. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চুক্তিতে নারীর অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা; এবং
১২. নারী উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়ক সেবা চালু করা।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে সামাজিক অবস্থান

নারী সমাজ পৃথিবীর যে কোন জনসমষ্টিতে সমাজ গঠনে পুরুষের পাশাপাশি মৌল উৎপাদন হিসেবে পরিচিত। পরিবার ব্যবস্থাপনা, সন্তান প্রতিপালন, সেবামূলক কার্যকলাপ এবং মাতৃত্বে নারী অপার মহিমায় মহিমান্বিত। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে নারীদের প্রতি সমাজের দৃষ্টি ভঙ্গির ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে বাংলাদেশ নারীর মর্যাদার বিষয়টি বিভিন্ন পর্যায়ে অনাকাঙ্খিত কার্যকলাপের প্রেক্ষাপটে প্রশ্নাতীত হয়ে দেখা দিয়েছে। নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, পতিতাবৃত্তি, নারী পাচার, যৌতুক, আত্মহত্যা, তালাক, বাল্যবিবাহ এবং স্বামী ও পিতার সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিতকরণ এ দেশের নারী সমাজের উন্নয়ণ তথা সামাজিক নিরাপত্তার অন্তরায়। তাই নারী অধিকার ও নিরাপত্তার জন্য জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে চলেছে।[২] বাংলাদেশ সরকারসহ বিশ্ব সম্পদায় জাতিসংঘের এই সকল কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে বিশ্বব্যাপী নারীর অধিকার সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

নারীর সামাজিক নিরাপত্তা

---

১. ibid, pp. 5-30.; রঞ্জন কর্মকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮-৪৯।

২. মোঃ নুরুল ইসলাম, নারী নিরাপত্তায় বাংলাদেশে প্রচলিত সামাজিক আইন : একটি পর্যালোচনা, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা* (ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, সংখ্যা ৬৬, ২০০০ খৃস্টাব্দ), পৃ. ১০-৪০।

Dhaka University Institutional Repository

নারীর সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে আমাদের দেশে সামাজিক নিরাপত্তা বিশেষ করে নারী সমাজের নিরাপত্তা অত্যন্ত জটিল। সাম্প্রতিককালে নারী নির্যাতন ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে বিশেষ করে শিশুদের ওপর যেভাবে যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতন করা হচ্ছে তা নারীর সামাজিক নিরাপত্তা তথা গোটা সমাজের নিরাপত্তাহীনতারই শামিল। এ প্রেক্ষাপটে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বিগত দুই দশকে আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে একটি ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। জাতিগত বোধ, বিশ্বাস, ও ঐতিহ্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে আমরা ধার করা সংস্কৃতি আচার-অনুষ্ঠান পরিবার, সমাজ ও শিক্ষাঙ্গনে চর্চা করছি এবং বাস্তবায়নের আন্দোলন করছি। তারই বিষফল প্রতিটি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও শিক্ষাঙ্গনে ছড়িয়ে পড়েছে।[১] সমাজের পরিবর্তিত চিন্তা চেতনার প্রতিফলন ঘটছে তাদের কর্মকান্ডে।

আমরা নিজেদের মুসলমান এবং নিজের রাষ্ট্রকে মুসলিম রাষ্ট্র পরিচয় দিতে পারেনি বিগত দশকে। কারণ একজন মুসলিমের বোধ, বিশ্বাস, প্রকাশিত হয়নি আমাদের চলনে বা চেহারায়। এভাবে বিজাতীয় সংস্কৃতির সয়লাবে ধ্বংস হতে থাকে ক্রমান্বয়ে যুব সমাজ, পরিবার ও পরিবেশ। ফলে সমাজে নারী প্রতিনিয়ত নিগ্রহের শিকার হচ্ছে। এ অবস্থা হঠাৎ করে রাতারাতি হয়নি। দীর্ঘ দু'দশক ধরে বদলে দেয়া হয়েছে বাংলাদেশের সমাজ, সংস্কৃতি সাহিত্য এবং সামগ্রিক পরিবেশকে। বিগত দুই দশকের সঞ্চিত ফসল ভোগ করছি আমরা বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতে। আর এ কারণেই নারীর সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। সামাজিক নিরাপত্তা বিষষটি সমাজের প্রতিটি নাগরিকের সুস্থ জীবন যাপনের নিশ্চয়তাদানের ব্যবস্থাকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট।[২] নারীর নিরাপত্তা বিষয়টি রাষ্ট্র কর্তৃক সমাজের নাগরিকদের সকল প্রকার বিপদ এবং বিপর্যয়কর অবস্থা থেকে রক্ষা করার সাধে সঙ্গতিপূর্ণ ব্যবস্থাকে বোঝায়।

A.R.Wadia- এর মতে, তিন ধরনের সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার ক্ষেত্র রয়েছে। (ক) স্বেচ্ছামূলক সামজিক সেবা যেখানে সেবা গ্রহণের মাধ্যমে কোন ঝুকি গ্রহণ। যেমন N.G.O বা সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহণের মাধ্যমে সেবা গ্রহণের মাধ্যমে ঝুঁকি গ্রহণ। (খ) বাধ্যতামূলক সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা। যেমন অনিচ্ছাসত্ত্বেও দালাল বা প্রতারকের খপ্পরে পড়ে নিরাপত্তা বিঘিন্ন হওয়া। (গ) শিল্পায়নজনিত কারণে নিরাপত্তাহীনতা। যেমন গার্মেন্টস শিল্পের শ্রমিকদের নিরাপত্তাহীনতার শিকার হওয়া। যে সমাজে জনসংখ্যা অধিক এবং সম্পদের সীমাবন্ধতার কারণে আয় কম সেসব সমাজে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা থেকেই সামাজিক নিরাপত্তার জন্ম নেয়।[৩] দারিদ্রতা, জনসংখ্যার আধিক্য, এ সবকিছুই সাথে নারীর নিরাপত্তাহীনতা জড়িত। নারী নির্যাতনের সবচেয়ে বড় কারণ নারীর নৈতিক সীমা লংঘন, ধর্মহীন আচার-আচরণ এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠির ইসলামী মূল্যবোধের জলাঞ্জলি দেওয়া। শতকরা ৮৭ জন মুসলমানের আবাসভূমি এ বাংলাদেশ। হযরত শাহ জালাল (র), হয়রত শাহ শাখদুম (র), হাজী পীর হয়রত আবদুল কাদের জিলানী (র) সহ বহু পীর আউলিয়ার পূণ্যভূমি এই বাংলাদেশ। দুঃখজনক এখানে বিপুল সংখ্যক মুসলমান বাস করে যাদের জীবন-দর্শন বিভিন্ন। অথচ ধর্মীয় আচা-অনুষ্ঠানে এঁরা মুসলমান । বর্তমান বাংলাদেশের মুসলমানরাও অন্যান্য ধর্মের মত ইসলামকেও জীবনের ব্যক্তি গণ্ডির মধ্যে সীমিত করে দিয়েছে। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রবেশের অনুমতি তার নেই। অথচ ইসলাম বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠাযোগ্য একটি প্রগতিশীল পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান।

---

১. কোন জাতি তার জাতিগত পরিচয়, ধর্মীয় বোধ বিশ্বাস নিজস্ব সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে টিকে থাকতে পারে না । কেননা ধর্ম মানুষকে সুসভ্য করে, সহনশীল করে, সদাচার শিক্ষা দেয়। প্রত্যেক জাতির ধর্মই তার জাতিগত পরিচয় পেশ করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরপরই বাংলার মুসলমানদের ঐতিহ্যবাহী সংগ্রামের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অর্জিত নিজস্ব বোধ, বিশ্বাস এবং জাতিগত চেতনা ও প্রেরণার ধারাটি পাল্টে দেয়ার জন্য তাদের জীবন থেকে নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ মুছে ফেলার উদ্যোগ নেয়া হয়। [মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *আমাদের জাতিসত্তার বিকাশ ধারা* (ঢাকা : আশা প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, রমযান- ১৪১৪, ফেব্রুয়ারি- ১৯৯৪ খৃস্টাব্দ), পৃ. ১৩২]।

২. আ. ন. ম নুরুল ইসলাম ও মোঃ হাবিবুর রহমান, *সমাজ কল্যাণ নীতি ও কর্মসূচী* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭ খৃস্টাব্দ), উদ্ধৃতি, বিভারেজ রিপোর্ট, পৃ. ১০।

৩. সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, *নারী নির্যাতনের রকমফের* (ঢাকা : বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ প্রথম প্রকাশ, ৮ মার্চ-২০০১ খৃস্টাব্দ), পৃ. ১৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র কুর'আনে ইসলামকে কোথাও ধর্ম বলা হয়নি; বলা হয়েছে জীবন ব্যবস্থা। যার অর্থ This is the only way of life. বা একমাত্র জীবন বিধান।[১] একথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করা এবং মেনে চলা ঈমানের শর্ত। মানব সভ্যতার বিনির্মাণ, এর বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন নারী ও পুরুষ উভয়কেই। নারী পুরুষের পরস্পরের সযোগিতা, সহমর্মিতা, সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, আনুগত্য ও অনুসরণের মাধ্যমেই মানব সমাজের উন্নয়ন সম্ভব। সুতরাং মানব সভ্যতার উন্নতির জন্য যেমন প্রয়োজন আছে কোমলতা ও নমনীয়তার তেমনি প্রয়োজন আছে কঠোরতার। যেমনি প্রয়োজন একজন দক্ষ সেনাপতির, বিচক্ষণ শাসকের তেমনি প্রয়োজন মমতাময়ী মাতার, দায়িত্বশীল সহধর্মিনীয়, আনুগত্যশীল পরিবার পরিজনের। উভয় শ্রেণীর মধ্যে যাকেই বাদ দেয়া হবে তমদ্দুন ততই ক্ষতিগ্রস্থ হবে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাসের আলোকে এরকমই হওয়া উচিত ছিল বাংলাদেশের নারী সমাজের সামাজিক অবস্থা। কিন্তু স্বাধীনতার পর এদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম নারী ও যুব সমাজর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে।[২] এই নেতিবাচক পরিবর্তেনের ফলে নারী নির্যাতন বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিবার, সমাজ, শিক্ষাঙ্গনে নারীর সম্মান ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। একটি পরিবার মানুষ গড়ার তথা জাতি গড়ার কারখানা। এ কারখানা থেকেই বেরিয়ে আসে সমাজের ভবিষ্যত নাগরিক। এ কারখানা জিনিস তৈরির কারখান নয়। সুতরাং স্বামী, সন্তান ঘর তদারকির দায়িত্ব মায়ের।[৩] তাই সেই মাকে হতে হবে যোগ্য, শিক্ষিত, সম্মানিত সমাজ ও পরিবারের কাছে। বর্তমানে বাংলাদেশের নারী সমাজ বিভিন্ন নির্যাতনমূলক ব্যবস্থার শিকার এবং এ সকল ব্যবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষ কর্তৃক সৃষ্ট। এদেশে স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক প্রথাগুলো নারী নির্যাতনের বাহন হিসেবে অনেক সময় কাজ করে। নারী নির্যাতন বিষয়টি শহর অপেক্ষা গ্রামে অধিক হারে লক্ষ্য করা যায়। নারী-পুরুষের ভূমিকা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে কতকগুলো সামাজিক প্রথার উপর ভিত্তিশীল হওয়ায় নারী নির্যাতন অহরহ ঘটছে। যেমন : বিয়ের সময় যৌতুক প্রথান ব্যবস্থা এবং নারীর ওপর ব্যক্তি স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ ইত্যাদি।[৪] নারী নির্যাতনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র হল যৌন সংক্রান্ত (১৭.৫%) অর্থনৈতিক (৬৫.৮৩%), শারীরিক (৭৮.৩৩%) এবং মানসিক (৮১.৬৭%) ।[৫] ১৯৯৫ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রকাশিত বিশেষ প্রতিবেদনে লিঙ্গ ভিত্তিক নির্যাতনকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে-

---

১. শামসুন্নাহার নিজামী, *দ্বীন প্রতিষ্ঠায় মহিলাদের দায়িত্ব* (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশনী, তৃতীয় প্রকাশ, জামাদিউসসানী, ১৪১০, জানুয়ারি-১৯৯০ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৫।

২. বিগত দুই দশকে এদেশের নারী আন্দোলন এবং বিদেশীদের অর্থায়নে গঠিত অসংখ্য এন.জি.ও. স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে এদেশের মানুষের. দরিদ্রতা, নিরক্ষরতা, ধর্ম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাব ইত্যাদির সুযোগ নিয়ে শাসকগোষ্ঠির সহযোগিতায় মুসলিম নারী সমাজকে বিভ্রান্ত করেছে, ঐতিহ্য, ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুতি ঘটিয়েছে। দরিদ্র গৃহ বধুকে নানা আশ্বাসে রাস্তায় এনে দাঁড় করিয়েছে, নারীদের অর্থনৈতিক মুক্তি, সেক্সরোল, জেন্ডারোল, লিঙ্গ বৈষম্যের শ্লোগান তুলে হাজার হাজার পরিবার ভেঙ্গেছে। বর্তমানে নারী ক্ষমতায়নের নামে নারী আন্দোলন এবং এন.জি.ও গুলোর পক্ষে থেকে বিভিন্ন দাবিও পেশ করা হচ্ছে। যেমন- (১) নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করতে হবে। (২) নারী-পুরুষের লিঙ্গ বৈষম্য দূর করতে হবে। (৩) নারী পুরুষের সমাজ অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। (৪) সংসারে নারীদের মতামত বা সিদ্ধান্ত দেয়ার অধিকার দিতে হবে ইত্যাদি । [মাহমুদ কবীর, *বাংলাদেশের নারী* (ঢাকা: সুচীপত্র, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি-২০০৩), পৃ. ১৯-২০] ।

৩. হাফেজা আসমা খাতুন, *নারী মুক্তি আন্দোলন ও ইসলাম* (ঢাকা : সাফওয়ান পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী-২০০১ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৩৬

৪. বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ও জেরীনা রহমান খান (সম্পাদিত) *বাংলাদেশে নারী নির্যাতন* (ঢাকা : সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র ১৯৮৭ খৃস্টাব্দ), পৃ. ১৭; খাদিজা আকতার রেজায়ী, *মুসলিম নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য*, (ঢাকা : প্রীতি প্রকাশন, দ্বিতীয় প্রকাশ, রবিউল আউয়াল-১৪১৪, সেপ্টেম্বর-১৯৯৩ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৩৬।

৫. শিরিন সুলতানা, *বৈবাহিক ক্ষেত্রে নারী নির্যাতন*, এম. এস. এস মনোগ্রাফ (ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৮ খৃস্টাব্দ), পৃ. ২৭৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

Gender violence is a violence against woneb that result in physical mental. Sexual coercion or urbitrars deprivation and a violation of hunab rights.[1]

সুতরাং নারী নির্যাতনের এ অবস্থার পিছনে কতগুলো সুস্পষ্ট, দৃশ্যমান, বাস্তব, কারণ রয়েছে। বাংলাদেশে সেগুলো হল- (ক) নৈতিকতা বর্জিত অশ্লীল চলচ্চিত্র (খ) ফ্যাশন শোর নামে নগ্ননারী দেহ প্রদর্শনী (গ) সুন্দরী প্রতিযোগিতা (ঘ) বর্ষবরণ অনুষ্ঠান (ঙ) থার্টি ফার্স্ট নাইট উদ্‌যাপন (চ) অশ্লীল বিজ্ঞাপন প্রচার ইত্যাদি। সৃষ্ট এ সকল কারণের অনিবার্য পরিণতি নারীত্বের অবমাননা, নারী নির্যাতন, অপহরণ, ধর্ষণ, নারী পাচার, অবৈধ যৌনাচার, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা বিবাহ বিচ্ছেদ, এসিড নিক্ষেপ, যৌতুক চাওয়াসহ হাজারো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফল।

বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের কারণ ধর্মীয় অনুশাসন নয়; বরং ধমীয় অনুশাসনকে উপেক্ষা করে পাশ্চাত্যের অপসংস্কৃতিকে অনুসরণই এর অন্যতম কারণ। বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে পাল্লা দিয়ে বাংলাদেশেও ক্রমান্বয়ে নারী নির্যাতনের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের সমাজে আজ চারিদিকে নারী নির্যাতন, কিশোরী ধর্ষণ, ছাত্র অপহরণ, নারী পাচার, এসিড নিক্ষেপ, যৌতুক সমস্যা প্রভৃতি বিবেকবান মানুষকে আতঙ্কগ্রস্থ করে তুলছে।[২] স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অস্তিত্ব ও অবস্থান তাঁর তিনদিকে ঘিরে থাকা বৃহৎ প্রতিবেশী রাষ্ট্র দ্বারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত। তাই হিন্দু ধর্মের সাংস্কৃতিক প্রভাব পরিকল্পিতভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশ বাংলাদেশের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারই বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাই আমরা সংস্কৃতি চর্চা ও সৌন্দর্য লালনের নামে অপসংস্কৃতি মাধ্যমে ।

নারী শিক্ষার অবস্থা

সমাজে নারীর মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান অনেকগুলো বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়। দেশের শিক্ষার মান এর অন্যতম নির্দেশক। মানব সম্পদের কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন ঘটানোর ক্ষেত্রে একটি দেশের শিক্ষার মান গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। অজ্ঞতা ও শোষণের দুষ্টচক্রকে ভেঙ্গে নারীর ক্ষমতায়ন ও মেয়েদের উন্নয়নের চাবিকাঠি হলো শিক্ষা। বাংলাদেশী নারীদের শিক্ষাগত নৈপূন্য পৃথিবীর সবচেয়ে নিম্নতমদের মধ্যে অন্যতম। পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এখানে লিঙ্গ-বৈষম্য থাকায় শিক্ষায়ও বৈষম্য বিরাজমান। বাংলাদেশের পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পরিবার ছেলেদের ও মেয়েদের প্রতি সমান মূল্য আরোপ করে না। তাছাড়া পিতামাতার-নিরক্ষরতা নারী শিক্ষাকে নিরুৎসাহিত করে।

এতদসত্ত্বেও, গত ২৫ বছরে বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে সুষম শিক্ষাব্যবস্থা করা সরকারের কর্তব্য, যা জাতিসংঘের ‘সকলের জন্য সমানাধিকার এবং শিশু অধিকার’ কনভেনশনের ঘোষণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। ১৯৯০ সালে থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত সকলের জন্য শিক্ষা (Education For All)- এর বাংলাদেশ অন্যতম স্বাক্ষরকারী এবং EFA - এর ভিত্তি করে জাতীয়

---

১. ড. খালেদা সালাহ উদ্দিন, *নারী নির্যাতন ও জাতীয় অঙ্গীকার, আন্তর্জাতিক নারী দিবস স্মরণিকা*, ১৯৯৯ খৃস্টাব্দ এ সংজ্ঞানুযায়ী শারীরিক, মানসিক, লিঙ্গীয় নির্যাতন (যৌতুক আদায়ে নির্যাতন, নারীপাচার লিঙ্গীয় শোষণ, স্ত্রীকে মারধর করা, নারী, কন্যা, শিশু ধর্ষণ ও শারীরিক অত্যাচার, যৌন হয়রানী, পতিতা বৃত্তিতে নির্যাতন করা ইত্যাদি) শ্রেণীভুক্ত নারী নির্যাতনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুতর ও ঘৃণ্য হচ্ছে পারিবারিক নির্যাতন। কেননা, প্রচলিত পিতৃতান্ত্রিক সমাজ তথা পারিবারিক ব্যবস্থায় পারিবারিক নির্যাতনের শিকার কোন নারীকে আইনী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তা লাভের পক্ষে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আর এ অবস্থা সমগ্র জীবন ব্যাপী চলতে থাকে। (মোঃ নুরুল ইসলাম, *নারীর নিরাপত্তায় বাংলাদেশে প্রচলিত সামাজিক আইন ঃ একটি পর্যালোচনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫)।

২. বাংলাদেশে কী হারে, কীভাবে ধর্ষণের আধিক্য, যৌতুকের নির্যাতন বৃদ্ধি পেয়েছে তা বেশ কিছু তথ্য থেকে অনুধাবন করা যায়। আহার নিদ্রা, ভোগ, মৈথুন জীব ধর্মের এই চারটি বৈশিষ্ট্যের মুখে লাগাম এঁটে মানুষের পশুত্বের লা'নত থেকে মানুষের মর্যাদায় উন্নীত করেছিল যে ইসলম ধর্ম সেই ধর্মীয় বিধানকে মৌলবাদ আখ্যায়িত করে দূরে সরিয়ে দেয়ার ফলে আমাদের সমাজে পাশবিক প্রবণতা পাশ্চাত্যের ন্যায় ক্রমান্বয়ে আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। [সরকার শাহাবুদ্দীন আহমেদ, *নারী নির্যাতনের রকমফের* (ঢাকা : বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ৮ মার্চ-২০০১ খৃস্টাব্দ), পৃ. ১৪৩-১৪৫]।

Dhaka University Institutional Repository

কর্মপরিকল্পনাও তৈরি করা হয়েছে। তখন থেকে প্রাথমিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে লক্ষণীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। পঞ্চম পাঁচশালা পরিকল্পনার (১৯৯৭-২০০২) মাইক্রো ও ম্যাক্রো অধ্যায়ে CEDAW এবং বেইজিং পিএফএ-এর বাস্তবায়নের উপর বিশেষভাবে জোর দিয়ে লিঙ্গভিত্তিক বিষয়গুলোকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল। EFA -এর উপর ২০০০ সালে ডাকার সম্মেলনে র্কপরিকল্পনার একটি কাঠামো গ্রহণ করা হয়েছে যেখানে সবার জন্য শিক্ষার জাতীয় প্রচেষ্টা অন্যতম উপাদান হিসেবে "বালিকাদের শিক্ষার" দশক উদ্‌যাপনের আহ্বান জানানো হয়েছে। এতে বালিকাদের শিক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের অগ্রগতির চিত্রটি প্রকাশ করা হয়েছে। লিঙ্গ সমতা এবং নারীশিক্ষার সাধারণ প্রেক্ষপটের মধ্যেই মেয়েদের শিক্ষাকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ডাকার কর্মপরিকল্পনা কাঠামোর অন্যতম লক্ষ হচ্ছে ২০১৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গসমতা অর্জন করা, ভাল মানসম্মত মৌলিক শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে মেয়েদের পূর্ণ ও সমান সুযোগ পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা। বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি-২০০২ এ লিঙ্গভিত্তিক বিষয়গুলো উল্লিখিত হয়েছে এবং সাথে সাথে লিঙ্গভিত্তিক বিষয়কে নীতিমালার মূল স্রোতধারায় অগ্রাধিকার দিয়ে পদক্ষেপ প্রয়োজনীয়তা সনাক্ত করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা : প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সময়োপযোগী শিশু ভর্তির হার ৯৭ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। সাক্ষরতার হার হয়েছে ৬৩ শতাংশ। ১৯৯১ সালে ছাত্রছাত্রীর ভর্তির অনুপাত ছিল ৫৫:৪৫। বর্তমানের এ হার ৫০.৪:৪০.৯। এছাড়া প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তি উপযোগী মেয়ে শিশুর ৮৯.০৬ ভাগ স্কুলগামী। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতকরা ৬০ ভাগ পদে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ বিধি প্রবর্তন করা হয়েছে।

প্রাথমিকোত্তর শিক্ষা : বর্তমানে মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত ৪৭ঃ৫৩ নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটিয়ে নারীর ক্ষমতায়ন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত উপবৃত্তিপ্রাপ্ত মেয়েদের বেতন মওকুফ করেছে। এছাড়া বছরে প্রায় ২৫ লাক্ষ মেয়ে প্রায় ২০০ কোটি টাকার উপবৃত্তি লাভ করছে। এ আর্থিক সুবিধাগুলো নারী শিক্ষা প্রসারে ভূমিকা রাখছে।

উচ্চ শিক্ষা : উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রাথমিক পরিসংখ্যান অত্যন্ত হতাশাজনক চিত্র উম্মোচিত করেছে। গড়ে মাত্র ১৯% নারী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করছে। সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ১২% এবং কৃষি ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ১১% নারী শিক্ষার্থী রয়েছে। স্নাতক পর্যায়ে প্রায় ৩১% দন্ত মহাবিদ্যালয়ে ৩৬.৬% বিআইটিতে ৪.৪%; কৃষিকলেজে ৯% এবং আইন কলেজে ১৬%। উল্লেখ্য মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উচ্চ শিক্ষা লাভকারী নারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে এবং সকল পর্যায়েই তারা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করছে। প্রচুর সংখ্যক উচ্চ শিক্ষিত নারীর চাকুরী নেই। কারণ প্রাপ্ত পরিসংখ্যানে দেখা যায়, উচ্চ শিক্ষা গ্রহণকারী নারীদের হার তাদের চাকরির সুযোগের হারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।[১]

নারীশিক্ষার অগ্রগতিতে সরকারের উদ্যোগ

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকৌশল[২] : মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে সাফল্য অর্জনের জন্য সরকার দুই হাজার সালে শেষভাগ হতে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গৃহীত উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা/কৌশল হলো :[৩]

১. ১৯৯০ সালে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রণয়ন।

---

১. ড. গোলাম রসূল, *ইসলামের সমাজ কাঠামো* (কলিকাতাঃ মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৫ খৃস্টাব্দ), পৃ.৪৫; প্রফেসর ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মন, *নারী ও রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯-৪৬০।

২. *সামাজিক প্রেক্ষাপটে গ্রাম বাংলার নারী শিক্ষার অন্তরায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭; Mohanimad KhaliluIlah, *Healh Services for Women in Bangladesh,* in situation of Women in Bangladesh, Ministry of Social Welfare and Women Affairs, Dhaka, 1988, P. III and UNDP Report, 1994, P.48.

৩. *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১১; প্রফেসর ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মন, *নারী ও রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯-৪৬০।

Dhaka University Institutional Repository

২. বিদ্যালয়গুলোতে মেয়েদের তালিকাভূক্তি বাড়ানোর লক্ষ্যে শিক্ষিকদের জন্য ৬০% পদ সংরক্ষিত করা।
৩. পাঠ্যপুস্তক ও মনিহারী উপকরণগুলো (প্রাথমিক পর্যায়ে) বিনামূল্যে সরবরাহ করা।
৪. বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটিতে মহিলা সদেস্য অন্তর্ভূক্তিকরণ।
৫. অভিভাবকদের মধ্যে সচেনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি চালিয়া যাওয়া।
৬. ১৯৯৩ সালে দেশব্যাপী পৌর এলাকার বাইরে স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দশম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়নরত ছাত্রীদের সহায়তার লক্ষ্যে ছাত্রীবৃত্তি কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।
৭. প্রতিষ্ঠানিক বিদ্যালয় ত্যাগকারী মেয়েদের পরীক্ষামূলক ভাবে মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান অথবা কর্মসংস্থানের উপযোগী দক্ষতা অর্জনের জন্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।
৮. পৌর এলাকার বাইরে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাগ্রহণ মেয়েদের জন্য অবৈতনিক করা হয়েছে।

পৌর এলাকার বাইরে অবস্থানরত পিতামাতার একমাত্র সন্তানকে স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষালাভের সুযোগ দেয়া হয়েছে।

ছাত্রী উপবৃত্তি প্রকল্প

নারী শিক্ষা সম্প্রসারণ, নারীদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৪ সাল থেকে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করা এবং সর্বস্তরে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার ১লা আগস্ট ২০০২ উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রী উপবৃত্তি প্রকল্প চালু করে।এর ফলশ্রুতিতে প্রতি ১০০ জন ছাত্র/ছাত্রীর মধ্যে ৫২ জন মেয়ে এবং ৪৮ জন ছেলে ভর্তি হয়ে থাকে। উপবৃত্তি প্রকল্প সমূহের আওতায় প্রতি বছর প্রায় ২৫ লক্ষ ছাত্রীকে উপবৃত্তি,পরীক্ষার ফি,টিউশন ফি ইত্যাদি বাবদ প্রায় ২৫০ কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রী ভর্তি হার বৃদ্ধি এবং ঝরে পড়া রোধ কল্পে এ কর্মসূচী এক যুগান্তকারী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। এর ফলে বাল্য বিবাহ্ রোধ সহ নানাবিধ সমস্যা লাঘব হয়েছে। নারী শিক্ষা ও গবেষণায় ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। স্নাতক পর্যন্ত নারী শিক্ষাকে অবৈতনিক করার পরিকল্পনা সরকার নিয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীকে স্বাবলম্বী করার প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। নারী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও কারিগরি ক্ষেত্রে সমসুযোগ প্রদানে সরকার সচেষ্ট। নারী শিক্ষার সম্প্রসারণে সরকারের বহুমূখী পদক্ষেপের কারণে দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে নারীর অবস্থান ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটছে। নারী স্বাস্থ্যের উন্নয়নের লক্ষ্যে সারাদেশে কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান, ভাউচার স্কিমের মাধ্যমে গর্ভবতী মায়েদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে মাতৃ মৃত্যুর হার কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে সরকার সচেষ্ট। নারী স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার দশটি নারী বান্ধব হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছে।[১]

গভ. গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন সময়ে প্রতিটি জেলা শহরে এমনকিঅনেক থানা শহরে নারী শিক্ষার উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য গভ. গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছে। এর ফলে মেয়েরা ভাল প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখার সুযোগ লাভ করছে।

মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠা

মহিলাদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ আরো সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে প্রতি জেলা সদরে একটি করে মহিলা কলেজ নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে সরকার ১৮ টি জেলা সদরে ১৮টি মহিলা কলেজ জাতীয়করণ করেছে।

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন প্রতিষ্ঠা

---

১. *Bangladesh Bureau of Statistics on Labour Force Survey 1985-96,* (Dhaka : The Peoples Republic of Bangladesh, December 1996), P.53. ড. আব্দুল কুদ্দুস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

নারীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক মান অর্জনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় চট্টগ্রামে 'এশিয়ান ইউনিভর্সিটি ফর উইমেন' নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে, যার ফলে মেয়েরা বিশ্বমানের উচ্চশিক্ষার সাথে যুক্ত হওয়ার সুযোগ লাভ করেছে।

অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কৌশল[১]

১. সার্বিক স্বাক্ষরতা আন্দোলন (টিএলএম) কৌশলকে ব্যবহার করে অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের অধীনে শিক্ষা কেন্দ্রগুলোর ন্যূনতম ৫০% কেন্দ্র শুধুমাত্র নারী শিক্ষার্থীদের তালিকাভূক্তি করবে।
২. টিএলএম কার্যক্রমের জন্য নারী কেন্দ্রগুলোতে শিক্ষিকাদের স্থানীয়ভাবে নিয়োগ করা হয়।
৩. টিএলএম- এর নারী কেন্দ্রগুলোর জন্য মহিলা তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করা হয়।
৪. স্বাক্ষরতা পরবর্তী এবং চলমান শিক্ষা কেন্দ্রগুলো চালু রাখার জন্য সময়সূচিতে নমনীয়তা প্রদর্শন করা হয়।

জাতীয় কর্মপরিকল্পনার কৌশলসমূহ

১৯৯৫ সালের বেইজিং সম্মেলনে ১২ টি বিশেষ উদ্বেগজনক ক্ষেত্র চিহ্নিত হয়েছে, যার মধ্যে আছে : শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে নারীর প্রতি সমতা।[২] বেইজিং সম্মেলন (১৯৯৫) অনুসারে পরবর্তী কার্যক্রম হিসেবে বাংলাদেশ সরকার নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (NAP) গ্রহণ করেছে। NAP একটি সাধারণ কর্মপরিকল্পনা এবং ১৫ টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য ১৫ টি বিভাগীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং এসব বিভাগীয় বা সেক্টরিয়াল পরিকল্পনার একটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়। NAP এর অন্তর্ভূক্ত শিক্ষা কার্যক্রমগুলোর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো :

১. নারী শিক্ষার উন্নয়ন, সাক্ষরতার হারের বৈষম্যের অবসান, শিক্ষালাভের সুযোগগুলোর বৈষম্য এবং উন্নয়নের মূলধারায় নারীদের সম্পৃক্ত করার জন্য উদ্যোগী ও স্বচ্ছ নীতিমালা গ্রহণ করা।
২. বিশেষ করে মেয়ে ও নারী শিক্ষার উপর জোর দিয়ে আগামী ১০ বছরের মধ্যে নিরক্ষরতা সম্পূর্ণরূপে দূর করার জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা।
৩. টেকসই উন্নয়ন এবং নিরবচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রয়োজনে নারীদের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমগুলোকে আরও শক্তিশালী করা।
৪. মেয়ে শিশু ও নারীদের শিক্ষালাভের অধিকারে সমতা বিধান নিশ্চিতকরণ, সকল পর্যায়ে বৈষম্য দূরীকরণ, সকলের জন্য শিক্ষা, নিরক্ষত দূরীকরণ ও এর সাথে বিদ্যালয়গুলোতে মেয়ে শিশুদের ভর্তির হার, মানোন্নয়ন এবং সেখানে তাদের ধরে রাখার ব্যবস্থা করা।
৫. বৃত্তিমূলক, কারিগরি ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নারীদের পরিপূর্ণভাবে অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করা।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ নারী শিক্ষা[৩]

একটি উন্নত আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য, একটি সুষম সুস্থ-পরিচ্ছন্ন মানবিক সমাজ গড়ে তোলার জন্য সর্বজনীন শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। পৃথিবীর কোন উন্নয়ন অগ্রগতির ইতিহাসে কোন জাতি, দেশ, রাষ্ট্র এগুতে পারে না তার গণমানুষকে নিরক্ষর রেখে, অজ্ঞনতা, অশিক্ষা, কুশিক্ষার অন্ধকারে রেখে। এ ধ্রুব সত্যকে বিবেচনায় রেখে জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীকে প্রধান করে ৮ এপ্রিল ২০০৯ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯ কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি ২ সেপ্টেম্বর ২০০৯ শিক্ষামন্ত্রী ড. নুরুল ইসলাম নাহিদের কাছে তাদের প্রণীত শিক্ষানীতি জমা দেন। তারপর তা ৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়। প্রধানমন্ত্রী গৃহীত এ শিক্ষানীতিই 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' হিসেবে পরিচিত।

---

১. *Bangladesh Bureau of Statistics on Labour Force Survey 1985-96,* Ibid, P.53.
২. শর্মিলা রায়, *সামাজিক প্রেক্ষাপটে গ্রাম বাংলার নারী শিক্ষার অন্তরায়*, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭।
৩. *নারী ও রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯-৪৬০।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য[১]

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর মূল উদ্দেশ্য মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়নে ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান সকল ধর্মের প্রতিশ্রদ্ধাশীল কুসংস্কারমুক্ত পরমতসহিষ্ণু, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক ও কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা। পাশাপাশি, শিক্ষার মাধ্যমে জাতিকে দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা অর্জনে সক্ষম করে তোলা। এ উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও নীতিকে সামনে রেখে নিচে ধারাবাহিকভাবে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরা হলো :[২]

১. শিক্ষার সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা,সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের সচেতন করা।[৩]

২. ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।

৩. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা এবং তাদের চিন্তা চেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ, এবং চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলীর (যেমন-ন্যায়বোধ, ধর্মনিরপেক্ষতাবোধ, কর্তব্যবোধ, মানবাধিকার সচেতনতা, শৃঙ্খলা, সহ-জীবনযাপনের মানসিকতা, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি) বিকাশ ঘটানো।[৪]

৪. জাতীয় ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা বিকশিত করে প্রজন্ম পরম্পরায় সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা।

৫. দেশজ আবহ ও উপাদান সমপৃক্ততার মাধ্যমে শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর চিন্তাচেতনা ও সৃজনশীলতার উজ্জীবন এবং তার জীবনঘনিষ্ঠ বিকাশে সহায়তা করা।

৬. দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্য শিক্ষাকে সৃজনশীল, প্রয়োগমুখী ও উৎপাদন-সহায়ক করে তোলা; শিক্ষার্থীদেরকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশে সহায়তা প্রদান করা।

৭. জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে আর্থ-সামাজিক শ্রেণী বৈষম দূর করা, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, অসাম্প্রদায়িকতা, সৌহার্দ্য ও মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ গড়ে তোলা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা।

৮. বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী স্থানিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষালাভের জন্য সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা অবারিত করা।

৯. গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ বিকাশের জন্য পারস্পরিক মতাদর্শের প্রতি সহনশীল হওয়া এবং জীবনমুখী, বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশে সহায়তা করা।[৫]

১০. মুখস্ত বিদ্যার পরিবর্তে বিকশিত চিন্তাশক্তি কল্পনাশক্তি ও অনুসন্ধিৎসু মননের অধিকারী হয়ে শিক্ষার্থীদের প্রতিস্তরের প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন নিশ্চিত করা।

১১. জ্ঞানভিত্তিক তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর (ডিজিটাল) বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য (গণিত, বিজ্ঞান ও ইংরেজী) শিক্ষাকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা।

---

[১]. শর্মিলা রায়, *সামাজিক প্রেক্ষাপটে গ্রাম বাংলার নারী শিক্ষার অন্তরায়*, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭; *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি* (ঢাকা : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ২০১১ খৃস্টাব্দ), পৃ. ২-২২।

[২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২-২৩।

[৩]. *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি* (ঢাকা : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ২০১১ খৃস্টাব্দ), পৃ. ২-২২।

[৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২-২৩।

[৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২-২৩।

Dhaka University Institutional Repository

১২. শিক্ষাকে ব্যাপকভিত্তিক করার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ওপর জোর দেয়া, শ্রমের প্রতি শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী করে তোলা এবং শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা।

১৩. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিশুর বা শিক্ষার্থীর সুরক্ষা যথাযথ বিকাশের অনুকূল আনন্দময় ও সৃজনশীল পরিবেশ গড়ে তোলা এবং সেটি অব্যাহত রাখা।

১৪. শিক্ষার্থীদের মাঝে জলবায়ু পরিবর্তনসহ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ সচেতনতা এবং এতদ্বসংক্রান্ত বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা।

১৫. উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষাচর্চা এবং শিক্ষাসংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে সেই লক্ষ্যে যথাযথ আবহ ও পারিপার্শ্বিকতা নিশ্চিত করা।

১৬. দেশের পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলোতে শিক্ষার উন্নয়নে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৭. পথশিশুসহ আর্থ-সামাজিকভাবে বঞ্চিত সকল ছেলেমেয়েকে শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা।

১৮. দেশের আদিবাসীসহ সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংস্কৃতি ও ভাষার বিকাশ ঘটানো।

১৯. প্রতিবন্ধিদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা।

২০. দেশের জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা এবং সেই অর্জন ধরে রাখা।

এ ছাড়াও শিক্ষানীতির ১৭-অধ্যায়ের "নারীশিক্ষা" শিরোনামে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের নারীরা ব্যাপক বঞ্চনার শিকার। এ নীতিতে নারীদের বিরুদ্ধে সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে গৃহীত কৌশল লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে নারীদেরকে প্রাপ্য অংশটুকু দেয়া হয়েছে যাতে তাঁরা আত্মনির্ভর হতে পারে। নারীদের সামগ্রিক উন্নয়ন ও নারী শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর লক্ষ্যে নীতিমালা প্রস্তুত করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হলো :[১]

১. নারীশিক্ষার জন্য একটি বিশেষ ভান্ডার গড়ে তুলতে হবে এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগকে শক্তিশালী করতে হবে।

২. বিদ্যালয় ত্যাগের হার কমাতে হবে এবং যারা বিদ্যালয় ত্যাগ করেছে তাদের বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমূলক কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে।

৩. নারীদের জন্য অপ্রাতিষ্ঠানিক খণ্ডকালীন বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. অধিক অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার জন্য পেশাদারী ও উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত তাদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে হবে।

৫. নারীদের সামাজিক মর্যাদাকে সহায়তা দানের উপযোগী একটি ইতিবাচক এবং প্রগতিশীল সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিকে উৎসাহদানের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যসূচিগুলোর আধুনিকায়ন করতে হবে।

৬. পাঠ্যবইগুলোতে মহিয়সী নারীদের জীবনী অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। পাঠ্যসূচিতে লেখিকাদের রচনা অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

৭. নারীদের জন্য পলিটেকনিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়াতে হবে।

৮. মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রীদের জন্য পরিবহন ও আবাসন সুবিধার উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

৯. মেয়েদের প্রকৌশল, চিকিৎসাশাস্ত্র, আইন ও ব্যবসায় শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে।

১০. গরীব ও মেধাবী ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য বৃত্তি দিতে হবে এবং এছাড়াও কম সূদে ব্যাংক ঋণ সহায়তা দিতে হবে।

১১. সকল শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় নারীদের অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।[২]

---

[১] *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি*, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯৯; *মহিলা সমাচার, নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮ ও নারী আন্দোলন অভিজ্ঞতা*, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, জানুয়ারী-মার্চ, ২০০৮, পৃ. ৬; *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি*, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১১; প্রফেসর ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মন, *নারী ও রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯-৪৬০।

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

নারীশিক্ষার অগ্রগতির সম্ভাবনা সম্পর্কে পর্যালোচনার সমাপ্তিতে যে বিষয়টি জোরালোভাবে উল্লেখ্য, তা হলো ক্ষমতায়নের জন্য প্রস্তুত শিক্ষা কর্মসূচিগুলো অবশ্যই পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং সমাজে নারীর মূল্যায়নের ব্যাপারে সামগ্রিক উপলব্ধির পরিপ্রেক্ষিতের সাথে সম্পর্কিত করে তৈরি করতে হবে। এজন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সাধারণভাবে নারীশিক্ষার মূল অংশে অন্তর্ভূক্ত হওয়া উচিৎ।

* নিজের ক্ষমতায়ন।
* সমাজের বিশ্লেষণ করা।
* রাজনৈতিক সচেতনতা /শিক্ষা।
* উদ্বুদ্ধকরণ/সংগঠন করার ক্ষমতা।
* আইন সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞানার্জন।
* স্বাস্থ্য ও প্রজনন অধিকার।
* অর্থনৈতিক ও পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা অর্জন।
* বয়স্ক শিক্ষা ও মেয়েদের জন্য অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা।
* প্রাথমিক শিক্ষাসূচী এবং নারীদের জন্য সংক্ষিপ্ত শিক্ষাসূচী।
* পরিচালকের এবং ব্যবসায় পরিচালনার দক্ষতা অর্জন।

বাংলাদেশ সরকার প্রধান ভূমিকায় থাকলেও শুধুমাত্র সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় নারী শিক্ষায় সাফল্য লাভ অসম্ভব। লিঙ্গ-ভিত্তিক সমতা এবং মানসম্পন্ন শিক্ষার নিশ্চয়তা অর্জন ও নীতিমালাগুলো বাস্তবায়নের কৌশলগুলো যতই সঠিক ও কার্যকর হোক না কেন লিঙ্গভিত্তিক সমতার ব্যাপারে সচেতনতা, রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা, সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নেয়ার সাহস, সকল দল/গোষ্ঠীর মধ্যে সহযোগিতা নারীদের ক্ষেত্রে সাফল্য লাভের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর এক্ষেত্রে সরকারকেই অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। সরকারের পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেও এক্ষেত্রে সম্পৃক্ত করতে হবে।

কোন জাতির জাতিসত্তা নির্মাণে ভূল ও বিভ্রান্তি একটি জাতির অনুসরণ মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে শিক্ষা বিস্তার, ঐক্য স্থাপন, মূল্যবোধ সম্পন্ন জাতি সৃষ্টিই শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্যে স্বাধীন সার্বভৌম ও সংহত অস্তিত্বের জন্য বাংলাদেশকে তার রাষ্ট্র গঠনের কার্যক্রমের পাশাপাশি জাতি গঠনকে অগ্রাধিকার দিতে হয়। কেননা একজন নাগরিকই একটি জাতির পরিচয় বহন করে।[১] তাই নারী শিক্ষা বিস্তারেও গুনগত মান সম্পন্ন, জ্তীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে নজর দেয়া দরকার।

একটি দেশ অর্থনৈতিকভাবে উন্নত না অনুন্নত তা যাচাইয়ের অন্যতম দিক নির্দেশক এখন মানব উন্নয়সূচক। উন্নয়ন অর্থনৈতিবিদদের মতে মানব উন্নয়ন কৌশলের অন্যতম কৌশল হল শিক্ষা।[২] বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসমূহে গৃহীত শিক্ষা পরিকল্পনা বিভিন্ন উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়।

বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর অবস্থান

বাংলাদেশের সংবিধান নারী-পুরুষ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সামাজিক, অর্থনৈতিক, মানবিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করেছেন। সমাজে নারীসহ অন্যান্য দূর্বল অংশের কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা ও মর্যাদা দেয়ার অঙ্গীকারও সংবিধানে রয়েছে।[৩] প্রশাসনে নারীর

---

[১]. মোহম্মদ আব্দুল মান্নান, *আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১।

[২]. *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি*, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১১; প্রফেসর ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মন, *নারী ও রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯-৪৬০।

[৩]. *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি* ২০১১, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মার্চ-২০১১ খৃস্টাব্দ পৃ. ১৬। নারী পুরুষ নির্বিশেষে সংবিধানে দেয়া গুরুত্বপূর্ণ অধিকারগুলোর মধ্যে রয়েছে-ভোটাধিকার, চাকরিতে অধিকার, বাক ও ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার, আইনের সমান অধিকার, সভা সমিতির অধিকার, নিরপেক্ষ বিচার প্রাপ্তির অধিকার, সংঘ বা সমিতি গঠনের অধিকার, সভা-সমিতি আয়োজন করার ও সভা-সমিতিতে যোগদান করার অধিকার, পেশা গ্রহণের অধিকার, বিবাহ সম্পর্কীয় অধিকার ইত্যাদি। (*গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ, ২০১১ সালের

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চপদে চাকুরী করার সাংবিধানিক কোন বিধি-নিষেধ নেই। এমনকি সরকার প্রধান বা রাষ্ট্রপ্রধান হতেও কোন বাঁধা নেই। সংবিধানের ধারা ভিত্তিক অধিকারসমূহ নিম্নরূপ :

ধারা- ২৮ (১) : কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।[১] (২) রাষ্ট্র ও গনজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন। (৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা বাঁধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না। (৪) নারী বা শিশুদের অনূকুলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।[২]

ধারা- ১০ : সাল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।[৩]

ধারা- ১৯ (১) : সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্টা হইবেন।(২) মানুষের মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনেতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।[৪] “জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা, ইহার যেকোন স্থানে বসবাস ও বসতি স্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।[৫]

ধারা-৩২ : আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।[৬]

ধারা-১৫ (ক) : অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা। (গ) যুক্তিসংগত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার।[৭]

ধারা-১৪ : রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষের কৃষক, শ্রমিক এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তিদান।[৮]

---

৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সংশোধিত। ২০১১ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখের গৃহীত সর্বশেষ অর্থাৎ ত্রয়োদশ সংশোধনী সহ সকল সংশোধনী পকেট সাইজ সংকলন)। [এখানে উল্লেখ্য যে, সংবিধানের ধারাগুলি হুবুহু সংবিধানের ভাষার উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ সাধু ভাষার উল্লেখ করা হয়েছে।]

১. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, তৃতীয় ভাগ, মৌলিক অধিকার, ধারা- ২৮ ঃ ১, ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। (২০১১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সংশোধিত) ২০১১ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখের গৃহীত সর্বশেষ সংশোধনীসহ, সকল সংশোধনী পকেট সাইজ সংকলন।

২. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান*, তৃতীয় ভাগ, মৌলিক অধিকার, ধারা- ২৮ ঃ ২,৩,৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

৩. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, দ্বিতীয় ভাগ, ধারা-১৯ (১)।

৪. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, দ্বিতীয় ভাগ, সুযোগের সমতা, ধারা- ১৯-১, ২ প্রাগুক্ত, পৃ ১০। এই ধারা অনুযায়ী সামাজিকভাবে নারীরাও পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবেন এবং রাষ্ট্রের পরিচালক এই ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৫. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, তৃতীয় ভাগ চলাফেরার স্বাধীনতা। ধারা-৩৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০। এই আইনের আওতায় একজন নারী তার প্রয়োজনে যে কোন জায়গায় যেতে এবং আসতে এবং বসবাস করতে পারবে। যক্তিসঙ্গত কোন প্রতিবন্ধকতা ছাড়া।

৬. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, তৃতীয় ভাগ, মৌলিক প্রয়োজনের জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার রক্ষা। ধারা-৩২, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

৭. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, দ্বিতীয় ভাগ, মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা, ধারা-১৫ (ক) (গ)। এক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সকলে সমান অধিকার ভোগ করবে।

৮. দূর্ভাগ্যজনক হলেও একথা সত্যি যে, বাংলাদেশের জনগণের অনগ্রসর অংশেই নারীর অবস্থান এবং আর্থ সামাজিক দিক থেকে নারীদের স্থান সবচেয়ে দূর্বল। সুতরাং সংবিধানের ১৪ নং ধারাটি বাংলাদেশের দরিদ্রতম নারী জাতির বেলায় প্রযোজ্য।

Dhaka University Institutional Repository

ধারা-৯ : রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ দান করিবেন এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানসমূহে কৃষক, শ্রমিক এবং মহিলাদিগকে যথাসম্ভব বিশেষ প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হইবে।[১]

ধারা- ৬৬ (১) : কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হইলে এবং তাঁহার বয়স পঁচিশ বছর পূর্ণ হইলে এই অনুচ্ছেদের (২) দফার বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে তিনি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন।[২]

ধারা- ৬৫ (৩ক) : সংবিধান(পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অবশিষ্ট মেয়াদে এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত তিনশত সদস্য এবং (৩) দফার বর্ণিত পঞ্চাশ মহিলা সদস্য লইয়া সংসদ গঠিত হইবে।[৩]

ধারা-৩৭ : জনশৃঙ্খলা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা–নিষেধ সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হইবার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।[৪]

ধারা-৩৮ : জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধ-সাপেক্ষে সমিতি বা সংগঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।[৫]

ধারা-৪২ (১) : আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা নিষেধ-সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর ও অন্যভাবে বিলি ব্যবস্থা করিবার অধিকার থাকিবে এবং আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রয়াত্ত বা দখল করা যাইবে না।[৬]

ধারা-২০(১) : কর্ম হইতেছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয় এবং "প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেককে কর্মানুযায়ী" এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেক স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করিবেন।

(২) রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয়, ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক কায়িক-সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হইবে।

ধারা-১৫ (খ) : কর্মের অধিকার অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসংগত মজুরির বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার।[৭]

---

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, দ্বিতীয় ভাগ, স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের উন্নয়ন, ধারা-৯। এই ধারার স্থানীয়
প্রশাসনিক কাঠামোতে মহিলাদের সম্পৃক্ত করার বিধান উল্লেখ করা হয়েছে।

২. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, পঞ্চম ভাগ, সংসদে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা, ধারা ৬৬ (১) এই অনুচ্ছেদের দুই দফায় উল্লেখ আছে, কোন ব্যক্তি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ সদস্য থাকিবার যোগ্য না যদি (ক) কোন উপযুক্ত আদালতে তাঁহাকে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা করেন। (খ) তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দয়া হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন, (গ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন দুই বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাঁহার মুক্তি লাভের পর পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে।

৩. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, ধারা ৬৫ (৩) প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১। মহিলারা নির্বাচিত ৩০০ সদস্যের প্রতিনিধির দ্বারা তাঁদের জন্য সংরক্ষিত ৫০টি আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। এই ৫০ টি সংরক্ষিত আসন ছাড়াও মহিলারা প্রত্যক্ষ নির্বাচিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন।

৪. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, তৃতীয় ভাগ, সমাবেশের স্বাধীনতা, ধারা-৩৭, পৃ. ২০। এই ধারা বিধান অনুযায়ী একজন পুরুষের মত একজন নারীও সভা সমাবেশে যোগদানের অধিকার রাখে। (*জাতীয় মান উন্নয়ননীতি*- ২০১১, মহিলা ও শিশু শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মার্চ- ২০১১ খৃস্টাব্দ, পৃ. ২২)।

৫. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, তৃতীয় ভাগ, সমাবেশের স্বাধীনতা, ধারা-৩৮।

৬. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, তৃতীয় ভাগ, সম্পত্তির অধিকার, ধারা-৪২ (১) এই আইনে যে কোন নারী সম্পত্তির মালিক হওয়া, সম্পদ বিলি বিক্রি হস্তান্তর করার অধিকার রয়েছে। তবে অবশ্যই বৈধ পন্থায় হতে হবে।

৭. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, ধারা-২০ (১) এবং ধারা ১৫ (খ) । এই ধারা অনুযায়ী কর্মের গুণ ও পরিমান বিবেচনা করে যুক্তিসংগত মজুরি নির্ধারণের বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে নারী বা পুরুষ কোন ভেদ নাই।

Dhaka University Institutional Repository

ধারা -৪০ : আইনের দ্বারা আরোপিত বাঁধা নিষেধ সাপেক্ষে কোন পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের কিংবা কারবার বা ব্যবসায় পরিচালনার জন্য আইনের দ্বারা কোন যোগ্যতা নির্ধারিত হইয়া ধাকিলে অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক নগরিকের যে কোন আইনসঙ্গত পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের এবং যে কোন আইন সঙ্গত কারবার াবা ব্যবসায় পরিচালনার অধিকার থাকিবে।

ধারা-২৯ : (১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে। (২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী, পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।[১]

ধারা -২৯ (৩) : এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই (ক) নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ যাহাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে তাহাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রণয়ন করা হইতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।[২]

ধারা-৩৪ (১) : সকল প্রকার জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধ; এবং এই বিধান কোনভাবে লংঙ্ঘিত হইলে তাহা আইনতঃ দন্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।[৩]

ধারা ু ২৭ : সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।

ধারা- ৩১ : আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনুযায়ী ব্যবহার লাভ যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।

ধারা-৩৯ : (১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল। (ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের অধিকারের নিশ্চয়তা দান করা হইল।[৪]

ধারা-১৭ (ক) : রাষ্ট্র একই পদ্ধতিতে গণমূখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।[৫]

ধারা-১৮ (১) : জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবেন।[৬] এবং বিশেষত আরোগ্যের প্রয়োজন কিংবা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যবিধ প্রয়োজন ব্যতীত মদ্য ও অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্যহানিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

---

১. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, ধারা-৪০ এবং ২৯ (১) ও (২) এই আইনের দ্বারা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল নারী ও পুরুষ প্রজাতন্ত্রের যে কোন পদ বা অন্য যেকোন পেশা তার যোগ্যতা অনুযায়ী গ্রহণের অধিকার রাখে।

২. এই আইনের আওতায় খালেদা জিয়া সরকার (চার দলীয় ঐক্যজোটের সরকারের প্রধানমন্ত্রী মেয়েদের শিক্ষার হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণের জন্য পড়ার খরচ ও উপবৃত্তি চালু করেছে। এছাড়াও নারীরা উন্নয়ন, দারিদ্রতা বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে চারদলীয় ঐক্যজোটের সরকার নানামূখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

৩. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, ধার-৩৪ (১) জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরণ।

৪. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, ধারা-২৭, আইনের দৃষ্টিতে সমতা; ধারা-৩১, আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার; ধারা-৩৯ (১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক স্বাধীনতা।

৫. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, ধারা-১৭ (ক) অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রাইমারী শিক্ষা ছেলেমেয়ে (৬ থেকে ১০ বছর) উভয়ের জন্য বাধ্যতামূলক। নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্য গ্রাম এলাকায় দ্বদশ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক এবং উপবৃত্তি চালু করা হয়েছে।

৬. বাংলাদেশের শতকরা ৩৪ জন দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে। মেয়েরা দারিদ্রের মধ্যে দারিদ্রতম। বিশেষত অধিকাংশ মায়েরা পুষ্টিহীনতার কারণে প্রতি বছরে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে। গর্ভবতী মায়েদের প্রসবকালীন জটিলতার কারণের প্রতিবছর অসংখ্য নারীর মৃত্যু হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

ধারা-১৮ (২) : গণিকাবৃত্তি ও জুয়াখেলা নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।[১]

সংবিধানের ধারাসমূহ থেকে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, বাংলাদেশের সংবিধানের কোন ধারা বা উপধারায় নারী-পুরুষের কোন প্রকার বৈষম্য করা হয় নাই। সংবিধান ছাড়াও নারীর অধিকার রক্ষা ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ আইন প্রবর্তন করা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। ঐ সকল আইনের যথাযথ প্রয়োগ করা হলে সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের নারী সমাজ অধিকার ও মর্যাদার ক্ষেত্রে সম্মাজনজনক ও বিশ্বের বুকে উল্লেখযোগ্য অবস্থানে থাকবে।[২]

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১[৩]-তে নারীর অবস্থান ও তার বাস্তবায়ন

নারী যুগ যুগ ধরে শোষিত ও অবহেলিত হয়ে আসছে। পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয় গোঁড়ামী, সামাজিক কুসংস্কার, কুপমন্ডুকতা, নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজালে তাকে সর্বদা রাখা হয়েছে অবদমিত। গৃহস্থালী কাজে ব্যয়িত নারীর মেধা ও শ্রমকে যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়নি। নারী আন্দোলনের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া নারী জাগরণের আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন "তোমাদের কন্যাগুলিকে শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দাও, নিজেরাই নিজেদের অন্নের সংস্থান করুক"[৪] । তার এ আহ্বানে নারীর অধিকার অর্জনের পন্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা রয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এ দেশের নারী জাগরণে সাড়া পড়েছিল সাধারণত শিক্ষা গ্রহণকে কেন্দ্র করে। এছাড়া ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে নারী তার অধিকার আদায়ে সচেতন হয়ে ওঠে। বায়ান্ন- এর ভাষা আন্দোলন ও ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও স্বাধিকার আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৭১ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে একটি রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। স্বাধীনতা যুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও অসামান্য অবদান রাখে। যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়াও বিভিন্নভাবে সহায়তা প্রদান এবং স্বামী সন্তানকে মুক্তিযুদ্ধে পাঠিয়ে এ দেশের নারীরা এক বিশাল দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের নিদর্শন রেখেছেন।

মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হাতে এ দেশের লক্ষাধিক মা-বোন সম্ভ্রম হারিয়েছেন। মানবাধিকার লংঘনের এই জঘন্য অপরাধ কখনই ভুলবার নয়। মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যেক অভিজ্ঞতা থেকে নারী আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠে। শিক্ষা গ্রহণ ও কর্মসংস্থানের প্রত্যাশায় নারী সমাজের মাঝে বিপুল সাড়া জাগে। গ্রামে নিরক্ষর নারী সমাজের মাঝেও কাজের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হবার আগ্রহ জাগে। জাতীয় উৎপাদনে নারীর অংশগ্রহণ আবশ্যক হয়ে পড়ে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে নারী ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহীত হয় উন্নয়ন পরিকল্পনা। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালের ১৫ ই আগষ্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যার পর গৃহিত উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ততটা হয়নি বললেই চলে।। অবশ্য এ সময়ে

---

[১]. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, ধারা-১৮ (১) ও (২) জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা, ইসলামী শরীআহ্ হারাম জিনিসকে ও আরোগ্যের উপাদান হিসাবে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের দেশে শরীআহ্ নিষিদ্ধ মদ (হারাম) বস্তুকে হারাম হিসেবে আইন পাস করা উচিত। গণিকাবৃত্তি ও জুয়াখেলাকে সংসদে বিল পাসের মাধ্যমে আইনগতভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা উচিত। এর ফলে সামাজিক পরিবেশ উন্নত হবে এবং যুব সমাজের নৈতিকতার মান উন্নয়নের যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবে। উল্লেখ্য বাংলাদেশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান দেশ। ইসলামের দৃষ্টিতে গণিকাবৃত্তি এবং জুয়াখেলা দুটোই হারাম।

[২]. একজন মুসলিমের ব্যক্তিগত জীবন যথা বিয়ে, তালাক , অভিভাবকত্ব, মোহর, উত্তরাধিকার, ভরণপোষণ ইত্যাদি মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারে নির্ধারিত হয়। সেজন্য মুসলিম পারিবারিক আইন কিছুটা সংশোধন করে ১৯৬১ সালে মুসলিম পারিবারিক আইন অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়। যাতে বহুবিবাহ, ভরণ-পোষণ, তালাক, উত্তরাধিকার আইন, মেয়ে ও নাবালক শিশুদের অনূকূলে আনা হয়। এইসব ক্ষেত্রে মেয়েরা যেন সুষ্ঠু বিচার পেতে পারে তার জন্য সরকার ১৯৮৫ সালে পারিবারিক কোর্ট স্থাপন করেন। ১৯৮০ সালে যৌতুক বিরোধী আইন ও ১৯৮৩ সালে নারী নির্যাতন অর্ডিন্যান্স পাস হয়। জাতীয় সংসদে এসিড অপরাধ দমন আইন ২০০২, ফেব্রুয়ারি মাসে মন্ত্রীসভায় অপরাধ দমন বিল ১৪ ই মার্চ সংসদে পাস হয়। নতুন এই আইনে এসিড নিক্ষেপের ঘটনাকে আমলযোগ্য অ-আপোসযোগ্য এবং অ-জামিনযোগ্য সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার বিধান পাস করা হয়েছে। অথবা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত এক লক্ষ টাকার অর্থ দন্ড। এছাড়া এসিড দ্বারা আহত করার জন্য ৭ বছর সশ্রম কারাদন্ডসহ ৫০ হাজার টাকা জরিমানার প্রস্তাব করা হয়েছে।

[৩]. *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি* ২০১১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৬১।

[৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় নারী সংগঠনগুলির আন্দোলনের ভূমিকা ছিল অগ্রণী। বেসরকারী সাহায্য সংস্থাগুলো দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মসূচী অব্যাহত রাখে। দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে রাজনৈতিক দলগুলোর পাশাপাশি নারী সংগঠনগুলোও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে। ফলশ্রুতিতে নিজেদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁরা সচেতন হয়ে ওঠে। এতে করে দেশে নারী উন্নয়নে এক বিশাল সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়।[১]

বিশ্ব প্রেক্ষাপট ও বাংলাদেশ

সত্তর দশকের প্রথম ভাগ থেকেই তৎকালীন বঙ্গবন্ধু সরকার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নারী উন্নয়নে কার্যকর ভুমিকা পালন করে। ১৯৭৫ সনে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। ফলশ্রুতিতে দেশের বাইরে নারী উন্নয়নের যে আন্দোলন চলছিল তার মূলধারায় বাংলাদেশ যুক্ত হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে নারী সমাজ উন্নয়নের যে অবস্থানে রয়েছে তার ভিত্তি আন্দোলন। নারীর রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে লক্ষ্যে জাতিংঘ ১৯৭৫ সালকে “নারী বর্ষ” হিসাবে ঘোষণা করে। ১৯৭৫ সালে প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে ১৯৭৬-১৯৮৫ সালকে নারী দশক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। নারী দশকের লক্ষ্য ছিল সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি।[২]

১৯৮০ সালে কোপেনহেগেন অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় নারী সম্মেলন। এতে ১৯৭৬-৮৫ পর্বের নারী দশকের প্রথম পাঁচ বছরের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয় এবং নারী দশকের লক্ষ্যের আওতায় আরও তিনটি লক্ষ্য-শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান চিহ্নিত হয়। ১৯৮৫ সালে কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবীতে তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং নারী উন্নয়নের জন্য সমতা, উন্নয়ন ও শান্তির ভিত্তিতে অগ্রমূখী কৌশল গৃহীত হয়। চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে প্রস্তুতি পর্বে ১৯৯৪ সালে জাকার্তায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় নারী উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে জাকার্তা ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়। এ ঘোষণায় বলা হয় ক্ষমতা বন্টন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মাঝে তীব্র অসমতা বিদ্যমান।[৩] এই অসমতা ও সীমাবদ্ধতা নিরসনের উদ্দেশ্যে সরকারসমূহকে উদ্যোগ নিতে তাগিদ দেয়া হয়।[৪] কমনওয়েলথ ১৯৯৫ সালে জেন্ডার ও উন্নয়ন কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। সার্ক দেশসমূহও নারী উন্নয়নের জন্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

১৯৯৫ সালের ৪-১৫ সেপ্টেম্বর বেইজিং এর চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে বেইজিং ঘোষণা ও কর্ম পরিকল্পনা গৃহীত হয়। বেইজিং কর্ম পরিকল্পনা নারী উন্নয়নে ১২ টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র চিহ্নিত হয়েছে।[৫] ক্ষেত্রগুলো হলো- নারীর ক্রমবর্ধমান দারিদ্র শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অসম সুযোগ; স্বাস্থ্য সেবার অসম সুযোগ; নারী নির্যাতন; সশস্ত্র সংঘর্ষের শিকার নারী; অর্থনৈতিক সম্পদে নারী সীমিত অধিকার; সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ক্ষমতায় অংশগ্রহণে অসমতা; নারী উন্নয়নে অপর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো; নারীর মানবাধিকার লংঘন; গণমাধ্যমে নারীর নেতিবাচক প্রতিফলন এবং অপ্রতুল অংশগ্রহণ; পরিবেশ সংরক্ষেণে ও প্রাকৃতিক সম্পদে নারী সীমিত অধিকার এবং কন্যা শিশুর প্রতি বৈষম্য।[৬] সকল আন্তর্জাতিক বাস্তবায়নে বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ। ১৯৯২ সালে রিও-ডিজেনেরিওতে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী সম্মেলনে গৃহীত পরিবেশ ও উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা, ১৯৯৩ সালে ভিয়েতনাম মানবাধিকার ঘোষণা, ১৯৯৪ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গৃহীত জনসংখ্যা ও

---

[১]. জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদানের স্বীকৃতি চাই অধিকার প্রয়োগের নিশ্চয়তা চাই (Acknowledge Women’s Contribution in National Economy Createenabling environment for implementation of Women’s right), প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৭৪।

[২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩; জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১, পৃ. ২-২৫।

[৩]. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১, পৃ. ২-২৫।

[৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২-২৫।

[৫]. প্রফেসর ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মন, নারী ও রাজনীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯-৪৬০; জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১, পৃ. ২-২৫।

[৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২-২৫।

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা এবং ১৯৯৫ সালে কোপনহেগেনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সামাজিক শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা নারী ও শিশু উন্নয়ন ও তাদের অধিকারের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করা হয়। এ সকল সনদ ও কর্মপরিকল্পনায় বাংলাদেশ অনুস্বাক্ষর এবং এগুলোর বাস্তবায়নে অঙ্গীকার করেছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে শিশুদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৮৯ সালে গৃহীত শিশু অধিকার সনদে স্বাক্ষরকৃত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।[১]

বর্তমান প্রেক্ষাপট

বর্তমান সরকার ২০২১ সালের রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা, ক্ষমতায়ন এবং সার্বিক উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্তকরণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারীর দারিদ্র বিমোচন, নারী নির্যাতন বন্ধ, নারী পাচার রোধ, কর্মক্ষেত্রসহ সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা বিধান এবং আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে নারীর পূর্ণ ও সম অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। হতদরিদ্র নারীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাদের ভাতা প্রদান কর্মসূচী, শহরাঞ্চলে কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা, বিত্তহীন মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত ভিজিডি কর্মসূচী, দারিদ্র বিমোচন ঋণ প্রদান কর্মসূচী।[২] নারীদের কৃষি, সেলাই, বুটিক-বাটিক, হস্তশিল্প, বিউটিফিকেশন, কম্পিউটার ও বিভিন্ন আয়বর্ধক বিষয়ে ব্যাপক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শ্রমবাজারে ব্যাপক অংশগ্রহণ, ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে ও বিনা জামানতে ঋণ সহয়তা প্রদান ও পৃষ্ঠপোষকতার মধ্যে দিয়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।[৩]

বিশ্বায়নের এই যুগে নারীকে সামষ্টিক অর্থনীতির মূলধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র National Strategy For Accelerated Poverty Reduction (NSAPR II) তে বিভিন্ন কার্যক্রম সন্নিবেশিত হয়েছে। এই কৌশলপত্রে দারিদ্র নির্মূলের লক্ষ্যে পাঁচটি কৌশল ব্লক চিহ্নিত করা হয়েছে যেখানে দারিদ্রবান্ধব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন অন্যতম। যে পাঁচটি সহায়ক কৌশল গৃহীত হয়েছে তন্মধ্যে উন্নয়ন কর্মকান্ডের সকল জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণমূলক ক্ষমতায়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ১৯৯৮ সালে শুরু হয় বিধবা ও দুঃস্থ নারীদের ভাতা প্রদান কার্যক্রম। বর্তমানে দেশে ৯,২০,০০০ নারী এই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

প্রতি মাসে একজন বিধবা নারী ৩০০ টাকা হারে ভাতা পেয়ে থাকেন। সেই সাথে রয়েছে মাতৃত্বকালীন ভাতা। মোট ৮৮,০০০ দারিদ্র মা এই কর্মসূচীর আওতায় প্রতি মাসে ৩৫০ টাকা ভাতা প্রাপ্ত হন। এছাড়াও বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম চলমান যা থেকে নারীরা উপকৃত হন। বিত্তহীন নারীর দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী (ভিজিডি) এর আওতায় খাদ্য নিরাপত্তারূপে ৭,৫০,০০০ দরিদ্র নারীকে প্রতি মাসে ৩০ কেজি চাল বা ২৫ কেজি পুষ্টি আটা বিতরণ করা হয়। কৌশলপত্রে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান বিশেষত আয় বর্ধক প্রশিক্ষণ, কৃষি, কম্পিউটার ইত্যাদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীকে আত্মনির্ভরশীল ও স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার বিষয় সন্নিবেশিত রয়েছে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি নারী উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সহজ শর্তে স্বল্প হারে ঋণ প্রদান, বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ, আর্থিক সহায়তা প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।[৪]

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২-২৫

২. প্রফেসর ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মন, নারী ও রাজনীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯-৪৬০; জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১, পৃ. ২-২৫।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২-২৫।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২-২৫; মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯৯; মহিলা সমাচার, নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮ ও নারী আন্দোলন অভিজ্ঞতা, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, জানুয়ারী-মার্চ, ২০০৮, পৃ. ৬; জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, মহিলা ও শিশু

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষত টেক্সটাইল, হস্তশিল্প, বয়নশিল্পের বিকাশে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে 'Home Based Micro Entrprise' গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। শ্রম বাজারে নারীর অধীনে নির্যাতনের শিকার নারী ও কন্যা শিশুর সহায়তার জন্য বিভাগীয় শহরে মহিলা সহায়তা কেন্দ্র চালু রয়েছে। এ কেন্দ্রে নির্যাতনের শিকার নারীদের আশ্রয়, বিনা খরচে আইনগত পরামর্শ ও মামলা পরিচালনার জন্য সহায়তা দেয়া হয়। ছয়টি বিভাগীয় শহরে 'ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার' (ওসিসি) স্থাপন করা হয়েছে ও এর মাধ্যমে একই জায়গা থেকে সমন্বিতভাবে চিকিৎসা সেবা, আইনগত সেবা, পুলিশী সহায়তা, আশ্রয় ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হয়। সেই সাথে বিভিন্ন পেশায় প্রশিক্ষণ দান করে আত্মনির্ভর হওয়ার সুযোগ দেয়া হয়। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও জাতীয় মহিলা সংস্থায় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল ও হেল্প লাইনের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে জেলা ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। যথাক্রমে জেলা পর্যায়ে কর্মকর্তার নেতৃত্বে এবং ইউনিয়নে ইউপি চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়েছে। এইকমিটিসমূহে জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। নারী ও কন্যা শিশু নির্যাতন প্রতিরোধের লক্ষ্যে সারা দেশে ৪৪ টি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল স্থাপিত হয়েছে।[১]

দারিদ্র

দেশের শতকরা ৪০ ভাগ দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে দুই-তুতীয়াংশই নারী। এর মধ্যে নারী প্রধান পরিবারের সংখ্যা অধিক। এখনও নারীর অনেক কাজের অর্থনৈতিক মূল্যায়ন হয় নাই। গৃহস্থালী কর্মে নারীর শ্রম ও কৃষি অর্থনীতিতে নারীর অবদানের মূল্যায়ন দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। এসব ক্ষেত্রে নারীর সঠিক মূল্যায়ন নিরুপিত হয়নি। হতদরিদ্র নারীদেরকে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা করার মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।[২]

নারী উন্নয়নে সাংগাঠনিক ও প্রতিষ্ঠানিক তৎপরতা

নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার ১৯৭২ সালে নারী পুনর্বাসন বোর্ড, ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ নারী পুর্নবাসন কল্যাণ ফাউন্ডেশন, ১৯৭৬ সালে জাতীয় মহিলা সংস্থা, ১৯৭৮ সালে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করে। ১৯৮৪ সালে মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর গঠিত হয়। ১৯৯০ সাল পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়। ১৯৯৪ সালে শিশু বিষয় অন্তর্ভূক্ত করে "মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়" করা হয়। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অধীনে, জাতীয় মহিলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন একাডেমী, কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, নারীদের কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বেগম রোকেয়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। সকল জেলা ও উপজেলায় বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদান ও ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।[৩]

জাতীয় মহিলা সংস্থা ৬৪ টি জেলা ৫০ টি উপজেলায় নারী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। শিশুদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থায় নারী উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সমন্বিত করার লক্ষ্যে ৪৪ টি নারী উন্নয়ন ফোকাল পয়েন্ট মনোনীত করা হয়েছে। এছাড়া, জাতীয় পর্যায়ে নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, নীতি নির্ধারণ ও উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতি করে ৫০ সদস্য বিশিষ্ট "জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ (NCWCD) " গঠন করা হয়েছে। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে আন্তঃমন্ত্রণালয় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়,

বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১১; প্রফেসর ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মন, নারী ও রাজনীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯-৪৬০।

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২-২৫।

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৭৪।

[৩] প্রফেসর ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মন, নারী ও রাজনীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯-৪৬০।

Dhaka University Institutional Repository

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও জাতীয় মহিলা সংস্থায় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেল এবং জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়েছে। সরকারী-বেসরকারী উভয় পর্যায়ে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে একযোগ কাজ করার সমন্বিত উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে সরকার সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করছে।

সরকারী ও বেসরকারী কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতা

সরকার এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে নারী সংগঠনগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সম্পদ ও অর্থায়ন

নারী উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচী সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অর্থায়ন সংস্থাসমূহকে দেশে দেশে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে ইউএন উইমেন (UN Women) নামক একটি পৃথক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারও এ বিষয়ে অবহিত এবং আন্তর্জাতিক পরিসর ও ইউএন উইমেন (UN Women) থেকে নারী উন্নয়নে সহযোগিতা পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।[১]

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব

সরকারের 'রুলস অব বিজনেস' অনুসারে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অন্যতম দায়িত্ব নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে নীতি প্রণয়ন করা। এ দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, সংস্থা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সংবিধানে স্বীকৃত নারীর মৌলিক অধিকার, আন্তর্জাতিক সনদসমূহ যথা : সিডও, সিআরসি এবং বেইজিং ঘোষণা ও কর্ম পরিকল্পনার আলোকে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও শিশু বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন, নারী ও শিশুদের কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য কর্মসূচী গ্রহণ, নারী ও শিশুদের আইনগত ও সামাজিক অধিকার সংক্রান্ত বিষয়, কাজের সুযোগ সৃষ্টিসহ নারীর ক্ষমতায়ন, জাতীয় নারী ও শিশু উন্নয়ন, নারী সংগঠন ও সুশীল সমাজের কাজের সমন্বয়, স্বেচ্ছাসেবী নারী সংগঠনের নিবন্ধীকরণ ও নিয়ন্ত্রণ, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ক কার্যক্রম, আন্তর্জাতিক নারী দিবস, আন্তর্জাতিক শিশু দিবস, বেগম রোকেয়া দিবস উদযাপন, রোকেয়া পদক প্রদান, শিশুর উন্নয়ন বিষয়ে ইউনিসেফসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।[২]

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির লক্ষ্য

বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষিতে নারীর উন্নয়ন সময়ের দাবী। আধুনিক উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে নারীর জীবন মান ও পেশাগত মর্যাদা প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ হওয়ার কারণে এর প্রয়োজনীয়তা আরো তীব্র। নারীর মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট জাতীয় নীতিমালা প্রয়োজন । তবেই বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন সম্ভব হবে। এ দিকটি বিবেচনায় নিয়েই সরকার জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে যা নিম্নরুপ :[৩]

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ :

১. বাংলাদেশ সংবিধানের আলোকে রাষ্ট্রীয় ও গণজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা;

---

১. *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি*, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯৯; *মহিলা সমাচার, নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮ ও নারী আন্দোলন অভিজ্ঞতা*, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, জানুয়ারী-মার্চ, ২০০৮, পৃ. ৬; *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি*, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১১; প্রফেসর ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মন, *নারী ও রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯-৪৬০।

২. প্রফেসর ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মন, *নারী ও রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯-৪৬০।

৩. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১১; প্রফেসর ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মন, নারী ও রাজনীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯-৪৬০।

Dhaka University Institutional Repository

২. রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
৩. নারীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও আইনগত ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা;
৪. নারী মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা;
৫. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল ধারায় নারীর পূর্ণ ও সম অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
৬. নারীকে শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ রূপে গড়ে তোলা;
৭. নারী সমাজের দারিদ্রের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা;
৮. নারী-পুরুষের বিদ্যমান বৈষম্য নিরসন করা;
৯. সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে নারীর অবদানের যথাযথ স্বাকৃতি প্রদান করা;
১০. নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন দূর করা;
১১. নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি বৈষম্য দূর করা;
১২. রাজনীতি, প্রশাসন ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্র, আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া এবং পারিবারিক জীবনের সর্বত্র নারী পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা;
১৩. নারীর স্বার্থের অনূকুল প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও আমদানী করা এবং নারীর স্বার্থ বিরোধী প্রযুক্তির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা;
১৪. নারীর সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবহার গ্রহণ নিশ্চিত করা;
১৫. নারীর জন্য উপযুক্ত আশ্রয় এবং গৃহায়ন ব্যবস্থায় নারীর অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা;
১৬. প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও সশস্ত্র সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত নারীর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা;
১৭. প্রতিবন্ধী নারী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নারীর অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা;
১৮. বিধবা,বয়স্ক, অভিভাবকহীন, স্বামী পরিত্যাক্তা, অবিবাহিত ও সন্তানহীন নারীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা;
১৯. গণমাধ্যমে নারী ও কন্যা শিশুর ইতিবাচক ভাবমূতি তুলে ধরাসহ জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিফলিত করা;
২০. মেধাবী ও প্রতিভাময়ী নারীর সৃজনশীল ক্ষমতা বিকাশে সহায়তা করা;
২১. নারী উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা সেবা প্রদান করা এবং
২২. নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা।

নারীর মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ[১]

১. মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার সকল ক্ষেত্রে, যেমন-রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ যে সমঅধিকারী, তার স্বীকৃতি স্বরূপ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ করা।

২. নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (CEDAW) এর প্রচার ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৩. নারীর মানবাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন সংশোধন ও প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করা।

৪. বিদ্যমান সকল বৈষম্যমূলক আইন বিলোপ করা এবং আইন প্রণয়ন ও সংস্কারের লক্ষ্যে গঠিত কমিশন বা কমিটিতে নারী আইনজ্ঞদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৫. স্থায়ী বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোন ধর্মের, কোন অনুশাসনের ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে নারী স্বার্থের পরিপন্থী এবং প্রচলিত আইন বিরোধী কোন বক্তব্য প্রদান বা অনুরূপ কাজ বা কোন উদ্যোগ গ্রহণ না করা।

৬. বৈষম্যমূলক কোন আইন প্রণয়ন না করা বা বৈষম্যমূলক কোন সামাজিক প্রথার উন্মেষ ঘটতে না দেয়া।

---

[১] জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১১; প্রফেসর ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মন, নারী ও রাজনীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯-৪৬০।

Dhaka University Institutional Repository

৭. গুণগত শিক্ষার সকল পর্যায়ে, চাকুরীতে কারিগরি প্রশিক্ষণে, সমপারিতোষিকের ক্ষেত্রে কর্মরত অবস্থায় নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা।
৮. মানবাধিকার ও নারী বিষয়ক আইন সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান ও সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করা।
৯. পিতা ও মাতা উভয়ের পরিচয়ে সন্তানের পরিচিতির ব্যবস্থা করা, যেমন জন্মনিবন্ধীকরণ, সকল সনদপত্র, ভোটার তালিকা, ফরম, চাকুরীর আবেদনপত্র, পাসপোর্ট ইত্যাদিতে ব্যক্তির নাম প্রদানের সময় পিতা ও মাতার নাম উল্লেখ করা।

কন্যা শিশু উন্নয়ন[১]

১. বিবাহ, কন্যা শিশু ধর্ষণ, নিপীড়ন, পাচারের বিরুদ্ধে আইনের কঠোর প্রয়োগ করা।
২. কন্যা শিশুর চাহিদা যেমন, খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বৈষম্যহীন আচরণ করা ও বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা।
৩. কন্যা শিশু শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের যথাযথ বিকাশের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অধিকারসমূহ নিশ্চিত করা।
৪. কন্যা শিশুর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণ এবং পরিবারসহ সকল ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করা।
৫. কন্যা শিশুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা।
৬. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন রাস্তাঘাটের কন্যা শিশুরা যেন কোনরূপ যৌন হয়রানী, পর্নোগ্রাফী, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার না হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
৭. কন্যা শিশুর জন্য নিরাপদ ও মানসম্পন্ন বিনোদন, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চায় সুবিধা নিশ্চিত করা।
প্রতিবন্ধী কন্যা শিশুর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণ এবং সকল ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

নারীর প্রতি সকল নির্যাতন দূরীকরণ[২]

পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে এবং কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি শারীরিক মানসিক ও যৌন নিপীড়ন, নারী ধর্ষণ, যৌতুক, পারিবারিক নির্যাতন, এসিড নিক্ষেপসহ নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা দূর করা।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ[৩]

নারী শিক্ষা বৃদ্ধি, নারী পুরুষের মধ্যে শিক্ষার হার ও সুযোগের বৈষম্য দূর করা এবং উন্নয়নের মূল ধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে শিক্ষা নীতি ২০১০ অনুসরণ করা। নারীর নিরক্ষরতা দূর করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা, বিশেষত; কন্যা শিশু ও নারী সমাজের কারিগরি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ সকল বিষয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা। কন্যা শিশুদের শিক্ষায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপবৃত্তি প্রদান অব্যাহত রাখা। মেয়েদের জন্যে স্নাতক পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

ক্রীড়া ও সংস্কৃতি[৪]

ক্রীড়া ক্ষেত্রে নারীর বর্ণিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। স্থানীয় পর্যায়ে নারীর জন্য পৃথক ক্রীড়া কমপ্লেক্স গড়ে তোলা। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। নাটক ও চলচ্চিত্র নির্মাণে নারীকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা করা।

জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকাণ্ডে নারীর সক্রিয় ও সমঅধিকার নিশ্চিত করা[৫]

---

১. ড. আব্দুল কুদ্দুস ও জহিরুল হক শাকিল, *বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর ক্ষমতা : সমস্যা ও সম্ভবনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২-৩৫।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২-২৫।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২-২৭।
৫. *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি* ২০১১, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মার্চ ২০১১ খৃস্টাব্দ, পৃ. ৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং নারী পুরুষের মধ্যে বিরাজমান পার্থক্য দূর করা। অর্থনৈতিক নীতি (বাণিজ্যনীতি, মুদ্রানীতি, করনীতি প্রভৃতি) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা। নারী ক্ষমতায়নের প্রতি লক্ষ্য রেখে সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়ন ও কর্মসূচীতে নারীর চাহিদা ও স্বার্থ বিবেচনায় রাখা। সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতির প্রয়োগে বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রতিহত করার লক্ষ্যে নারীর অনুকুলে সামাজিক নিরাপত্তা বলয় (Safety nets) গড়ে তোলা। সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসায় নারীকে সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব দেয়া। শিক্ষা পাঠ্যক্রম, বিভিন্ন পুস্তকাদিতে নারীর অবমূল্যায়ন দুরীভূত করা এবং নারীর ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরা। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শ্রমিকদের সমান মজুরী, শ্রম বাজারে নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণ ও কর্মস্থলে সমসুযোগ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং চাকুরী ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা। প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে আর্থ-সামাজিক নারীর অবদানের স্বীকৃতি দেয়া। জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদান প্রতিফলনের জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোসহ সকল প্রতিষ্ঠানে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সরকারের জাতীয় হিসাবসমূহে, জাতীয় উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে কৃষি ও গার্হস্থ্য শ্রমসহ সকল নারী শ্রমের সঠিক প্রতিফলন ও মূল্যায়ন নিশ্চিত করা। নারী যেখানে অধিক সংখ্যায় কর্মরত আছেন, সেখানে যাতায়াত ব্যবস্থা, বাসস্থান বিশ্রামাগার, পৃথক ওয়াস রুম এবং দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।[১]

নারীর দারিদ্র দূরীকরণ

হতদরিদ্র নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ে অন্তর্ভুক্ত করা, বিধবা ও দুঃস্থ মহিলা ভাতা প্রণয়ন, বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রণয়ন ও বিত্তহীন মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচী (ভিজিডি) অব্যাহত রাখা। দারিদ্র নারী শ্রমশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে তাদের সংগঠিত করা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে নতুন এবং বিকল্প অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ সৃষ্টি করা। দারিদ্র নারীকে উৎপাদনশীল কর্মে এবং অর্থনৈতিক মূলধারায় সম্পৃক্ত করা। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষাসহ নারীর সকল চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা। জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে নারী দারিদ্র দূরীকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা দান ও অনুপ্রাণিত করা।[২]

নারীর অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নয়ন

নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জরুরী বিষয়াদি যথা :

স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রশিক্ষণ, জীবনব্যাপী শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, আয়বর্ধন প্রশিক্ষণ তথ্য ও প্রযুক্তিতে নারীকে পূর্ণ ও সমান সুযোগ প্রদান করা। উপার্জন, উত্তরাধিকার, ঋণ, ভূমি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদান করা।

নারীর কর্মসংস্থান

নারী শ্রমশক্তির শিক্ষিত ও নিরক্ষর উভয় অংশের কর্মসংস্থানের জন্যে সর্বাত্নক উদ্যোগ গ্রহণ করা। চাকুরী ক্ষেত্রে নারীর বেশী সংখ্যক নিয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রবেশ পর্যায়সহ সকল ক্ষেত্রে কোটা বৃদ্ধি এবং কার্যকর ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। সকল নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে সরকার অনুসৃত কোটা ও কর্মসংস্থান নীতির আওতায় চাকুরী ক্ষেত্রে নারীকে সকল প্রকার সমসুযোগ প্রদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করা। নারী উদ্যোক্তা শ্রেণী গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশেষ প্রশিক্ষণ ও ঋণদান কর্মসূচী গ্রহণ করা। ব্যাপক হারে নারীর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ, অবস্থান ও অগ্রসরমানতা বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিবেশ গড়ে তোলা। নারীর ব্যাপক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল আইন, বিধি ও নীতির প্রয়োজনীয় সংস্কার করা।

জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট এবং জেন্ডার বিভাজিত (Disaggregated) ডাটাবেইজ প্রণয়ন করা

নারী উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।

জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট যথাযথ ভাবে বাস্তবায়ন করা এবং মধ্য মেয়াদী বাজেট কাঠামোর আওতায় তথা রাষ্ট্রীয় বাজেট প্রণয়ন ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রক্রিয়া (Gender Responsive

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২-২৫।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

Budgeting, GRB)এর অনুসরণ অব্যাহত রাখা। বাজেটকৃত অর্থের সর্বোত্তম ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ করার কাঠামো শক্তিশালী করা।[১]

জেন্ডার ভিত্তিক পৃথক তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ সন্নিবেশ এবং নিয়মিত প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা সরকারী ও বেসরকারী গবেষণা কেন্দ্র, ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিকস এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহকারী অঙ্গসমূহ নারীর অবস্থান ও ভূমিকা সম্বলিত জেন্ডার বিভাজিত ডাটাবেইজ গড়ে তুলবে। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/দপ্তর, কর্পোরেশন, ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান সকল কাজের জন্যে জেন্ডার ভিত্তিক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ সংরক্ষণ এবং প্রকাশনার ব্যবস্থা করা।[২]

সহায়ক সেবা

সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর কার্যকর অংশগ্রহণের লক্ষ্যে সহায়ক সেবা যেমন, শিশুযত্ন সুবিধা, কর্মস্থলে শিশু দিবাযত্ন পরিচর্যা কেন্দ্র, বৃদ্ধ, অক্ষম, প্রতিবন্ধী নারীদের জন্যে গৃহায়ন, স্বাস্থ্য বিনোদনের ব্যবস্থা প্রবর্তন, সম্প্রসারণ এবং উন্নীত করা।

নারী ও প্রযুক্তি

নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, আমদানী ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিত প্রতিফলিত করা।

উদ্ভাবিত প্রযুক্তির প্রয়োগের ফলে নারীর স্বার্থ বিঘ্নিত হলে গবেষণার মাধ্যমে ঐ প্রযুক্তিকে নারীর প্রতি ক্ষতিকারক উপাদানমুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা। প্রযুক্তি ক্ষেত্রে নারীর স্বার্থের অনুকূল লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও সংস্কার করা।[৩]

নারীর খাদ্য নিরাপত্তা

দুঃস্থ নারীর চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে সরকারী খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা। খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন প্রক্রিয়ার পরিকল্পনা, তত্ত্বাবধান ও বিতরণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নারীর শ্রম, ভূমিকা, অবদান, মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি প্রদান করা।[৪]

নারী ও কৃষি

কৃষিপ্রধান অর্থনীতিতে খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে কৃষির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নারীর শ্রম ও অংশগ্রহণ বিশ্বব্যাপী সর্বজনবিদিত। জাতীয় অর্থনীতিতে নারী কৃষি শ্রমিকের শ্রমের স্বীকৃতি প্রদান করা। জলবায়ু পরিবর্তন ও দূর্যোগের কারণে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে নারী কৃষি শ্রমিকদের সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করা। কৃষিতে নারী শ্রমিকের মজুরী বৈষম্য দূরীকরণ এবং সমকাজে সমমজুরী নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা। কৃষি উপকরণ, সার, বীজ, কৃষক কার্ড, ঋণ সুবিধা ইত্যাদি প্রদানের ক্ষেত্রে নারী কৃষি শ্রমিকদের সমান সুযোগ নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

রাজনীতিতে অধিক হারে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্যে প্রচার মাধ্যমসহ রাজনৈতিক দলসমূহকে সর্বাত্নক প্রচেষ্টা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা। নারীর রাজনৈতিক অধিকার অর্জন ও প্রয়োগ এবং এর সুফল

---

১. ড. আব্দুল কুদ্দুস, *বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর ক্ষমতায়ন : সমস্যা ও সম্ভবনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩; *জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদানের স্বীকৃতি চাই অধিকার প্রয়োগের নিশ্চয়তা চাই (Acknowledge Women's Contribution in National Economy Createenabling environment for implementation of Women's right)* প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৭৪; *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি*, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯৯; *মহিলা সমাচার, নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮ ও নারী আন্দোলন অভিজ্ঞতা*, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, জানুয়ারী-মার্চ, ২০০৮, পৃ.৬; *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি*, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১১; প্রফেসর ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মন, *নারী ও রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯-৪৬০।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২-২৫; প্রফেসর ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মন, *নারী ও রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯-৪৬০।

৩. *Bangladesh Bureau of Statistics on বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর ক্ষমতায়ন : সমস্যা ও সম্ভবনা, Labour Force Survey 1985-96,* December 1996, P.53.; (ড. আব্দুল কুদ্দুস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০-৮৬)।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২-২৫; প্রফেসর ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মন, *নারী ও রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯-৪৬০।

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা। রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে পর্যায়ক্রমে ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা। নির্বাচনে অধিকহারে নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে অনুপ্রাণিত করা। নারীর রাজনৈতিক অধিকার আদায় ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভোটাধিকার প্রয়োগে সচেতন করা এবং তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা। রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের তাগিদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নারী সংগঠনসহ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রচার অভিযান গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা। জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ৩৩ শতাংশে উন্নীত করা ও বর্ধিত সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের উদ্যোগ গ্রহণ করা। স্থানীয় সরকার পদ্ধতির সকল পর্যায়ে বর্ধিত সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার উচ্চ পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী নিয়োগ করা।[১]

নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন

প্রশাসনিক কাঠামোর উচ্চ পর্যায়ে নারীর জন্য সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ সহজ করার লক্ষ্যে চুক্তিভিত্তিক এবং পার্শ্ব প্রবেশের (Lateral entry) ব্যবস্থা করা। প্রশাসনিক নীতি নির্ধারণী ও সাংবিধানিক পদে অধিকহারে নারীদের নিয়োগ প্রদান করা। জাতিসংঘের বিভিন্ন শাখা ও অঙ্গ সংগঠন এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি বা প্রার্থী হিসেবে নারীকে নিয়োগ/মনোনয়ন দেয়া। নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রবেশপর্যায় সহ সকল পর্যায়ে,গেজেটেড ও নন-গেজেটেড পদে কোটা বৃদ্ধি করা। সকল ক্ষেত্রে নারীর জন্য নির্ধারিত কোটা পূরণ সাপেক্ষে কোটা পদ্ধতি চালু রাখা। কোটার একই পদ্ধতি স্বায়ত্বশাসিত ও বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে প্রযোজ্য করা এবং বেসরকারী ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহকেও এই নীতি অনুসরণের জন্য উৎসাহিত করা। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সুপারিশ অনুসারে সরকারের নীতি নির্ধারণী পদসহ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল স্তরে নারীর সম ও পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শতকরা ৩০ ভাগ পদে নারী নিয়োগের উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা। তবে বর্তমান প্রেক্ষাপটেও বাংলাদেশের নারীদের মানগত কিঞ্চিত উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। যেমন ২০১৩ সালে প্রকাশিত প্রতিবেদনে (The Rise oF the South : Human Progress in a Diverse World) দক্ষিণের দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশও দ্রুত উল্লেখযোগ্য হারে অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। আবার মানব উন্নয়ন সূচকে দেখা গেছে ১৮৭ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৬ তম।[২] এর উন্নয়ন তরান্বিত করতে নারী-পুরুষের সমতার কথা বলা হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি

নারী জীবন চক্রের সকল পর্যায়ে যথা শৈশব, কৈশোর যৌবন, গর্ভকালীন সময় এবং বৃদ্ধ বয়সে পুষ্টি, সর্বোচ্চ মানের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য লাভের অধিকার নিশ্চিত করা। নারীর প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা শক্তিশালী করা। মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস করা। এইডস রোগসহ সকল ঘাতকব্যাধি প্রতিরোধ করা। বিশেষত গর্ভকালীন স্বাস্থ্যসহ নারী স্বাস্থ্য সম্পর্কীত গবেষণা করা এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্যের প্রচার ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা। নারী পুষ্টি বিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা। জনসংখ্যা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য ও প্রজনন অধিকারের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা। বিশুদ্ধ নিরাপদ পানীয় জল ও পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থায় নারীর প্রয়োজনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া। উল্লেখিত সকল সেবার পরিকল্পনা, বিতরণ এবং সংরক্ষণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাপরিবার পরিকল্পনা ও সন্তান গ্রহণের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা। নারীর স্বাস্থ্য, শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি, জন্ম-নিয়ন্ত্রণে সাহায্য, কর্মস্থলে মা'র কর্মক্ষমতা বাড়ানো ও মাতৃবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মায়ের বুকের দুধের উপকারিতার পক্ষে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা। মায়ের দুধ শিশুর অধিকার এই (ছয় মাস শুধুমাত্র বুকের দুধ) নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রসবের সময় থেকে পরবর্তী ৬ মাস ছুটি ভোগের জন্য আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং মাতৃত্বজনিত প্রয়োজনীয় ছুটি প্রদান করা।[৩]

---

[১]. *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি* ২০১১, প্রাগুক্ত, পৃ.৭-৬১।
[২]. *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি* ২০১১, প্রাগুক্ত, পৃ.৭-৫১।
[৩]. *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি* ২০১১, প্রাগুক্ত, পৃ.৭-৬১।

Dhaka University Institutional Repository

গৃহায়ণ ও আশ্রয়

পল্লী ও শহর এলাকার গৃহায়ন পরিকল্পনা ও আশ্রয় ব্যবস্থায় নারীর পরিপ্রেক্ষিত অন্তর্ভুক্ত করা। একজন নারী, নারী প্রধান পরিবার, শ্রমজীবী ও পেশাজীবী নারী, শিক্ষানবিশ ও প্রশিক্ষনার্থী নারীর জন্য পর্যাপ্ত নিরাপদ গৃহ ও আবাসন সুবিধা প্রদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা। নারীর জন্য বিশেষ সুবিধা যেমন, হোস্টেল, ডরমিটরী, বয়স্কদের হোম, স্বল্পকালীন আবাসস্থলের ব্যবস্থা করা এবং গৃহায়ন ও নগরায়ন পরিকল্পনায় দরিদ্র, দুঃস্থ ও শ্রমজীবী নারীর জন্য সংরক্ষিত ব্যবস্থা করা।[১]

নারী ও পরিবেশ

প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশের নিরাপত্তায় নারীর অবদান স্বীকার করে পরিবেশ সংরক্ষণের নীতি ও কর্মসূচীতে নারীর সমান অংশগ্রহণের সুযোগ ও নারী পরিপ্রক্ষিতে প্রতিফলিত করা। পরিবেশ ব্যবস্থাপনা দূষণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কর্মসূচী বাস্তবায়নে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। কৃষি, মৎস্য, গবাদি পশুপালন ও বনায়নে নারীকে উৎসাহিত করা ও সমান সুয়োগ প্রদান করা।[২]

দুর্যোগ পূর্ববর্তী, দুযোগকালীন ও দুর্যোগ পরবতী সময়ে নারী ও শিশুর সুরক্ষা

দুর্যোগ পূর্ববর্তী সময়ে নারী ও কন্যা শিশুদের সার্বিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং ব্যাপক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ও কার্যক্রমের মাধ্যমে মোকবিলার জন্য প্রস্তুত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। নদী ভাঙ্গন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ নারী ও শিশুর পূনর্বাসন করা। দুর্যোগ মোকাবেলার প্রস্তুতি গ্রহণ এবং দুর্যোগ পরবর্তী পূনর্বাসনের সময় নারীর নিরাপত্তা বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।[৩] এ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী নারীর নিরাপত্তা বিশেষভাবে বিবেচনার করা। দুর্যোগের জরুরী অবস্থায় কন্যা শিশুদের নিরাপত্তার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা। স্বাস্থ্য বিষয়ক উপকরণের প্রাপ্যতা ও পয়ঃপ্রণালি ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। দূর্যোগকালীন জরুরী অবস্থা মোকাবেলায় নারীদের বিপদ কাটিয়ে উঠার ক্ষমতার উপর গুরুত্ব দিয়ে বস্তুগত সাহায্যের পাশাপাশি নারীর প্রয়োজনীয় মনো-সামাজিক সহায়তা প্রদান করা। সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমকে নারী-বান্ধব করা এবং সুরক্ষার জন্য কর্মকৌশল প্রবর্তন করা। দুর্যোগকালীন জরুরী অবস্থায় খাদ্য বিতরণ কার্যক্রম যেন নারীর চাহিদা পূরণ করতে পারে, তা নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা। দুর্যোগ পরবর্তী জরুরী অবস্থায় খাদ্যের পাশাপাশি নারী স্বাস্থ্যের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা। গর্ভবর্তী ও প্রসূতি এবং নবজাতকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, যেমন : ব্রেষ্ট ফিডিং কর্ণার রাখা। দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে নারী যে কমিউনিটি বা সম্প্রদায়ে বসবাস করে, উক্ত কমিউনিটি বা সম্প্রদায়ের সদস্যদেরকে দুর্দশাগ্রস্ত নারীর কল্যাণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা।

অনগ্রসর ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নারীর জন্য বিশেষ কার্যক্রম

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও অনগ্রসর নারীর উন্নয়ন ও বিকাশের অধিকার নিশ্চিত করা। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নারী যাতে তার নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অক্ষুন্ন রেখে বিকাশ লাভ করেতে পারে সে লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। অনগ্রসর নারীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা।[৪]

প্রতিবন্ধী নারীর জন্য বিশেষ কার্যক্রম

---

[১]. প্রফেসর ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মন, নারী ও রাজনীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯-৪৬০; *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি* ২০১১, প্রাগুক্ত, পৃ.৭-৬১।

[২]. *সামাজিক প্রেক্ষাপটে গ্রাম বাংলার নারী শিক্ষার অন্তরায়*, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, আইবিএস জার্নাল, সংখ্যা ১৪০৪:৫, ১৯৯৮ ইং, পৃ. ৭৭; 'Acknowledge Women's Contribution in National Economy Createenabling environment for implementation of Women's right' প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৭৪।

[৩]. মহিলা সমাচার, নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮ ও নারী আন্দোলন অভিজ্ঞতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬; জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১১; প্রফেসর ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মন, নারী ও রাজনীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯-৪৬০।

[৪]. *সামাজিক প্রেক্ষাপটে গ্রাম বাংলার নারী শিক্ষার অন্তরায়*, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, আইবিএস জার্নাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭; প্রফেসর ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মন, নারী ও রাজনীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯-৪৬০।

Dhaka University Institutional Repository

জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী অধিকার সনদ অনুযায়ী সকল ধরণের প্রতিবন্ধী নারী স্বীকৃতি ও সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করা।

প্রতিবন্ধী নারীদের সমাজের মূলধারায় একীভূত রাখা এবং শিক্ষাসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার ভিন্নতার প্রতি গুরুত্বারোপ করা। যে সমস্ত নারী অনিবার্য শিক্ষার মূলধারায় অন্তর্ভূক্ত হতে পারবে না, শুধুমাত্র সেইসব নারীর জন্য বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা বিবেচনা করা। প্রতিবন্ধী নারীদের শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ ও পূনর্বাসনের জন্য যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম গ্রহণ করা।[১]

প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ ও নির্ণয়ের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ এবং পারিবারিক পরিবেশ প্রতিবন্ধী নারীদের লালন-পালন ও বিকাশের জন্য তাদের পরিবারকে বিশেষ সহযোগিতা প্রদান করা। প্রতিবন্ধিতার কারণে কোন নারী যেন জাতীয় নারী নীতির আওতায় কোন প্রকার অধিকার, সুবিধা ও সেবা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করতে সকল অবকাঠামো, সুবিধা ও সেবাসমূহ সকলের জন্য সহজলভ্য করা।[২]

নারী ও গণমাধ্যম

গনমাধ্যমে নারীর সঠিক ভুমিকা প্রচার করা, প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং অংশগ্রহণের বৈষম্য দূর করা, গণমাধ্যমে নারী ও কন্যা শিশুর বিষয়ে ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করা। নারীর প্রতি অবমাননাকর, নেতিবাচক সনাতনী প্রতিফলন এবং নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধের লক্ষ্যে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। বিভিন্ন গণমাধ্যমের ব্যবস্থাপনা ও আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে নারীর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা। প্রচার মাধ্যম নীতিমালায় জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিত সমন্বিত করা।[৩]

বিশেষ দুর্দশাগ্রস্থ নারী

যদি কোন নারী বিশেষ পরিস্থিতির কারণে দুর্দশাগ্রস্থ হন তাহলে তার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে সহায়তা প্রদানের জন্য পদক্ষেপ ও কর্মসূচী গ্রহণ করা।

নারী উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুত পরিকল্পনা সমূহ

প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও কৌশল

নারী উন্নয়ন নীতি ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব সরকারের। একটি সুসংগঠিত ও সুবিন্যস্ত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ার মাধ্যমে এ দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পাদনা করা সম্ভব। সরকারী-বেসরকারী সকল পর্যায়ের কর্মকাণ্ডে নারী উন্নয়ন পরিপ্রেক্ষিত অন্তর্ভূক্তির বিষয়ে প্রচেষ্টা নেয়া হবে। এ লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

জাতীয় পর্যায়

ক) নারী উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো : নারীর সমতা উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জাতীয় অবকাঠামো যেমন : মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর প্রশাসনিক কাঠামো শক্তিশালী করা হবে। এসব প্রতিষ্ঠানের জনবল ও সম্পদ নিশ্চিত করা হবে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কাঠামো

---

১. *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি* ২০১১, প্রাগুক্ত, পৃ.৭-৬১।

২. *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি* ২০১১, প্রাগুক্ত, পৃ.৭-৫৬।

৩. *সামাজিক প্রেক্ষাপটে গ্রাম বাংলার নারী শিক্ষার অন্তরায়*, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, আইবিএস জার্নাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭; জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদানের স্বীকৃতি চাই অধিকার প্রয়োগের নিশ্চয়তা চাই (Acknowledge Women's Contribution in National Economy Createenabling environment for implementation of Women's right) প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৭৪; জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯৯; মহিলা সমাচার, নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮ ও নারী আন্দোলন অভিজ্ঞতা, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, জানুয়ারী-মার্চ, ২০০৮, পৃ. ৬; জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১১; প্রফেসর ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মন, নারী ও রাজনীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯-৪৬০।

Dhaka University Institutional Repository

স্থাপন করা হবে। নারী উন্নয়নের যাবতীয় কর্মসূচী প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্যে এ প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।

খ) জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ (NCWCD) : নারী উন্নয়ন নীতি নির্ধারণ ও উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনার জন্যে প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতি করে ৫০ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ গঠন করা হয়েছে। এ পরিষদের কার্যপরিধি নিম্নরূপ :

(১) আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিভাগ ও সংস্থার উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন।

(২) শিশুর স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা এবং শিশু কল্যাণের জন্য সার্বিক নীতি নির্ধারণ ও অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনবোধে নতুন আইন সময়োপযোগী সংশোধন ও পরিবর্তনের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন।[১]

(৩) নারী ও শিশু উন্নয়নের জন্য প্রণীত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন।

(৪) নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডো) ও শিশু অধিকার সনদের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ।

(৫) মহিলাদের আইনগত অধিকার, মহিলা উন্নয়ন এবং মহিলাদের নির্যাতন প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিষয়াবলী সম্বন্ধে নীতি প্রণয়ন।

(৬) সকল কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের স্বার্থ সংরক্ষণ, অংশগ্রহণ ও তাদের ভাগ্যোন্নয়ন সম্পর্কে গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

(৭) পরিষদ ৬ (ছয়) মাস অন্তর সভায় মিলিত হবে।

(গ) সংসদীয় কমিটি : বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক গঠিত নারী উন্নয়ন বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি নারী উন্নয়ন কর্মসূচী পর্যালোচনা করে নারী অগ্রগতির লক্ষ্যে সরকারকে সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করার পরামর্শ প্রদান করবে।

(ঘ) নারী উন্নয়নের ফোকাল পয়েন্ট : বিভিন্ন ফোকাল পয়েন্ট/বিভাগ/সংস্থা জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির আলোকে কর্মসূচী গ্রহণ, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থায় নারী উন্নয়ন কার্যক্রম যাতে যথাযথভাবে সম্পন্ন করা যায় সে জন্যে ঐ প্রতিষ্ঠানসমূহে ন্যুনতম পক্ষে যুগ্ম-সচিব/যুগ্ম-প্রধান পদমর্যাদাসম্পন্ন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা হবে।[২] নারী উন্নয়ন কার্যক্রমের নিয়মিত মনিটরিং এর উদ্দেশ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভা ও মাসিক সমন্বয় সভায় আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হবে। তাছাড়া ফোকাল পয়েন্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার কার্যক্রমে যাতে জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিত প্রতিফলিত হয় ও তাদের বিভিন্ন প্রতিবেদন ও দলীলসমূহে জেন্ডার বিষয়ে সুস্পষ্ট ও পর্যাপ্ত তথ্য সন্নিবেশিত হয় সে লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।[৩]

(ঙ) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রীকে সভাপতি এবং নারী উন্নয়নে চিহ্নিত ফোকাল পয়েন্ট মন্ত্রণালয় ও সরকারী- বেসরকারি নারী উন্নয়নমূলক সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি নারী উন্নয়ন বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন

---

১. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯৯; মহিলা সমাচার, নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮ ও নারী আন্দোলন অভিজ্ঞতা, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, জানুয়ারী-মার্চ, ২০০৮, পৃ. ৬; জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১১।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯-৪৬০। *জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদানের স্বীকৃতি চাই অধিকার প্রয়োগের নিশ্চয়তা চাই (Acknowledge Women's Contribution in National Economy Createenabling environment for implementation of Women's right)* প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৭৪; *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি*, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯৯; মহিলা সমাচার, *নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮ ও নারী আন্দোলন অভিজ্ঞতা*, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, জানুয়ারী-মার্চ, ২০০৮, পৃ. ৬; *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি*, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১১; প্রফেসর ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মন, *নারী ও রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯-৪৬০।

৩. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১১; প্রফেসর ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মন, *নারী ও রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯-৪৬০।

Dhaka University Institutional Repository

কমিটি" গঠন করা হবে। এই কমিটি নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত কর্মসূচী পর্যালোচনা, সমন্বয় ও মূল্যায়ন করবে। কমিটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সমস্যা চিহ্নিত করে ভবিষ্যৎ কর্মসূচী দ্রুত বাস্তবায়নের জন্যে পরামর্শ প্রদান করবে।

জেলা ও উপজেলা পর্যায়

নারীর অগ্রগতি এবং ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ের প্রশাসন, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, স্থানীয় সরকার, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দপ্তর ও এনজিওদের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও নারী উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে। জেলা পর্যায়ে জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, নারী উন্নয়নকল্পে গৃহীত সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করবে।

তৃণমূল পর্যায়

তৃণমূল পর্যায়ে গ্রাম ও ইউনিয়নে নারীকে সাবলম্বী দল হিসেবে সংগঠিত করা হবে। এ দলসমূহকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারী সংস্থার আওতায় নিবন্ধীকৃত সংগঠন হিসেবে রূপ দেয়া হবে। সরকারী-বেসরকারী উৎস, ব্যাংক, অন্যান্য আর্থিক সংস্থা থেকে প্রাপ্ত সম্পদ আহরণ করে এ সংগঠনগুলোর সাথে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন সমূহের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন ও সমন্বয় সাধন করা হবে।[১]

নারী উন্নয়নে এনজিও এবং সামাজিক সংগঠনের সাথে সহযোগিতা

প্রকৃত নারী উন্নয়ন একটি ব্যাপক কাজ। এই কাজে সরকারি-বেসরকারী উদ্যোগের সমন্বয় ঘটানোর প্রয়াস নেয়া হবে যাতে করে সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। বেসরকারী ও সামাজিক সংগঠন সমূহকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেয়া হবে :[২]

ক. গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে নারী উন্নয়নের সকল স্তরে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়নে বিশেষ ভুমিকা পালনকারী স্বেচ্ছাসেবী ও সামাজিক সংগঠনগুলোকে সম্পৃক্তকরণ ও তাদের কর্মকাণ্ডের সাথে সমন্বয় সাধন করা হবে। নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সহায়ক সেবা প্রদান করা হবে। সরকারী সকল কর্মকাণ্ডে তাদের সহযোগিতা নিশ্চিত করা হবে। নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় যথোপযুক্ত ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য এনজিও ও সামাজিক সংগঠনের সহযোগীতায় কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।[৩]

খ. জাতীয় থেকে তৃণমূল পর্যায়ে নারী উন্নয়ন, নারী অধিকার সংরক্ষণ, সচেতনতা সৃষ্টি, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, আইনগত সহায়তাদান এবং এ জাতীয় কর্মসূচী বাস্তবায়নরত নারী সংগঠসমূহকে শক্তিশালী করার জন্য সহায়তা প্রদান করা হবে। উল্লেখিত ধরনের কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নারী সংগঠনসমূহের সাথে সহায়তা ও সমন্বয় করা হবে।

নারী ও জেন্ডার সমতা বিষয়ক গবেষণা

নারী উন্নয়ন ও সমতা বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা পরিচালনার জন্যে দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হবে। সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে নারী উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন এবং নারী ও শিশুদের অধিকার সম্পর্কিত বিষয়ে গবেষণা পরিচালনায় উৎসাহিত করা হবে। পৃথক জেন্ডার গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে। সেখান থেকে নীতি নির্ধারকদের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা হবে।[৪]

নারী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

ঢাকায় অবস্থিত নারী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণসহ বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। এসব কেন্দ্রে বিভিন্ন কারিগরি, বৃত্তিমূলক, নারী অধিকার এবং শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

---

১. *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি* ২০১১, প্রাগুক্ত, পৃ.৫-৪১।
২. *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি* ২০১১, প্রাগুক্ত, পৃ.৪-৫১।
৩. *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি* ২০১১, প্রাগুক্ত, পৃ.৭-৬১।
৪. *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি* ২০১১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪-৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

কর্মপরিকল্পনা ও কর্মসূচীগত কৌশল

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা এবং জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের সরকারী-বেসরকারী সংগঠনসমূহ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্যে কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করবে।

সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা নিজ নিজ কর্ম-পরিকল্পনায় জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিতের প্রতিফলন ঘটানো হবে যাতে করে সকল খাতে নারীর সুষম অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষিত হয়।[১]

সকল কর্ম-পরিকল্পনা ও কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেয়া হবে।

মনিটরিং ও মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে সকল কর্ম-পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর অগ্রগতি নির্দিষ্ট সময় অন্তর পর্যালোচনা করা হবে।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার কর্ম-পরিকল্পনা ও কর্মসূচীতে যাতে নারী পরিপ্রেক্ষিত সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় সে লক্ষ্যে কর্ম-পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়নকারী কর্মকর্তাবৃন্দকে পিএটিসি, প্ল্যান নিয়ে একাডেমী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে জেন্ডার এবং উন্নয়ন বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এ লক্ষ্যে পাঠ্যসূচীতে ও কোর্সে জেন্ডার ও উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।[২]

নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক সচেতনতা কর্মসূচীর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে।এই সচেতনতা কর্মসূচীতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইনবিধি ও দলীলাদি থেকে নারীর মর্যাদাহানির বক্তব্য ও মন্তব্য অপসারণ মন্ত্রণালয় ও সংস্থার কার্যনির্বাহী, আইন ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা নীতি নির্ধারক আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দের সচেতনতা এবং (৩) নারী-পুরুষের সম্পর্কে, অধিকার ও নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়াবলী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভূক্তকরণ ইত্যাদি বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করা হবে।

সমাজের সকল স্তরে বিশেষভাবে প্রণীত এবং সুষ্ঠু অর্থায়নের ভিত্তিতে নারী বিষয়ক সংবেদনশীল কর্মসূচী নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা হবে। এ ব্যাপারে প্রশাসন, বিশেষতঃ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিচার বিভাগ এবং সরকারী-বেসরকারী সকল উন্নয়ন সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। নারীর বিষয়ে সংবেদনশীলকরণ কর্মসূচী সরকারী ও বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রে সকল চলতি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে পর্যায়ক্রমে সমন্বিত করা হবে।[৩]

নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কর্মসূচীর উপরও বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে এ উদ্দেশ্যে সুপরিকল্পিত কর্মসূচী গ্রহণ করতে উদ্ধুদ্ধ করা হয়। সে সব কর্মসূচীতে সচেতনতা, আইনগত পরামর্শ ও শিক্ষা, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা তথা মামলা পরিচালনা করা, মামলা পরিচালনার জন্যে নিরাপদ আশ্রয় ও পুনর্বাসন, আর্থিক সহায়তা ইত্যাদি কার্যক্রম হিসেবে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেলসহ অন্যান্য নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেলের কর্মপরিধিকে বিস্তৃত ও শক্তিশালী করা হবে।

আর্থিক ব্যবস্থা

তৃণমূল পর্যায় ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থ বরাদ্দ করা হবে।

জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হবে এবং মধ্য মেয়াদী বাজেট কাঠামোর আওতায় তথা রাষ্ট্রীয় বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রক্রিয়া (জিআরবি) অনুসরণ অব্যাহত রাখা হবে। বাজেটকৃত অর্থের সর্বোত্তম ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ করার কাঠামো শক্তিশালী করা হবে।[৪]

উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীল নীতিমালা অনুসরণ করা হবে।

---

১. *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি* ২০১১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৩০।
২. *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি* ২০১১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৬১।
৩. *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি* ২০১১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪-৪৫।
৪. *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি* ২০১১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় পর্যায়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হবে। নারী উন্নয়নে নিয়োজিত মন্ত্রণালয় এবং সংস্থা যেমন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়, শ্রম ও জনশক্তি, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রভৃতি মন্ত্রণালয়ে নারী উন্নয়নের জন্য লক্ষ্যমাত্রা ও কর্মসূচী চিহ্নিত করে অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দ করা হবে।

পরিকল্পনা কমিশন সকল খাতে বিশেষ করে শিক্ষা , শিল্প, গৃহায়ন, পানিসম্পদ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, প্রশিক্ষণ, দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান এবং অন্যান্য উপখাতে নারী-পুরুষের জন্য পৃথক ভৌত ও আর্থিক সম্পদ চিহ্নিত করে অর্থ বরাদ্দ করা হবে।[১]

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ নারী উন্নয়নে আন্তর্জাতিক উৎস থেকে নতুন ও অতিরিক্ত আর্থিক সহযোগিতা প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক, বাংলাদেশ ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নারী উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহয়তা প্রদান করা হবে।

সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা

নারী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত সর্বস্তরে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্ভাব্য সহযোগিতার যোগসূত্র গড়ে তোলা হবে। সরকারের পক্ষ থেকে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথোপযুক্ত এবং সময়োপযোগী সহায়তা প্রদান করা হবে। সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ, বৈঠক/কর্মশালা ইত্যাদির মাধ্যমে এই আদান প্রদান চলবে। ক্ষেত্রে বিশেষ সরকারী বেসরকারী যৌথ উদ্যোগে নারী উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।[২]

নারী উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়ন :

- **যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০ :** এই আইনে যৌতুক প্রদান ও গ্রহণের অপরাধে শাস্তির বিধান রয়েছে।
- **নারী নির্যাতন নির্বতনমূলক আইন (শাস্তিযোগ্য) ১৯৮৪ :** অসৎ উদ্দেশ্যে নারী অপহরণ, নারী পাচার এবং যৌতুকের জন্য নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড কিংবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রবর্তন করা হয়েছে।
- **বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন (সংশোধিত অর্ডিন্যান্স ১৯৮৪) :** এই আইনে নারীর ক্ষেত্রে বিবাহের বয়স ১৬ থেকে ১৮ বছরে এবং পুরুষের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ২২ বছরে উন্নীত করা হয়েছে। অপরিণত বয়সের বালিকা বিবাহও এই আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
- **১৯৮৫ সালে সংশোধিত মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ ১৯৬১ :** সংবিধিবদ্ধ বিধান লঙ্ঘণ করে বহু বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদের অপরাধে বর্ধিত শাস্তির ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে।
- **অপরাধ দমন আইন (দ্বিতীয় সংশোধিত অধ্যাদেশ) :** এই আইনে এসিড নিক্ষেপের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে।
- **পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫ :** বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদকালীন খোরপোষ, অভিভাবকত্ব, সন্তান রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি বিষয় এই আইনের অধীন। এছাড়াও এ ধরনের মামলা কম খরচে দ্রুত নিষ্পত্তির বিধান রয়েছে। যা মূলত স্বল্প কর্ম সুবিধাভোগী গ্রামীণ দারিদ্র নারীদের সাহায্য করবে।[৩]
- **সন্ত্রাস দমন অধ্যাদেশ ১৯৯২ :** শিশু ও নারীকে বিব্রত বা অপহরণ করা সহ সব ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান রয়েছে।

---

১. *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি* ২০১১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৪৬।
২. *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি* ২০১১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৬১।
৩. *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি* ২০১১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

- **নারী ও শিশু মন্ত্রণালয় কেন্দ্রীয় সেল :** নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, নিশ্চিতকরণ ও পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে শিশু ও নারী মন্ত্রণালয়ে ১টি কেন্দ্রীয় সেল গঠন করা হয়।
- মহিলা পরিদপ্তর, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সংস্থা অনুরুপভাবে সেল গঠন করে কর্ম পরিচালনা করছে। সরকার জেলায় জেলায় এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিটি গঠন করেছে একই উদ্দেশ্যে। ১৫ সদস্য বিশিষ্ট আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠিত হয়েছে, যার প্রধান নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী।
- ১৯৯৫ সনের ১৬ ফেব্রুয়ারী আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকে নারী শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে সাহায্য করার লক্ষ্যে জেলা সদর গুলোতে একজন মহিলা পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর, একজন মহিলা সহকারী পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর এবং পাঁচজন করে মহিলা কনস্টেবল নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
- সরকার ১৯৯৫ সনের জুলাই মাসে পাচারসহ নারী ও শিশু নির্যাতন সম্পর্কিত প্রচলিত আইনের একটি সংশোধনী (বিশেষ অধ্যাদেশ) জাতীয় সংসদে পাশ করে। এই নতুন আইনে ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, যৌতুক, অপহরণ এবং নারী ও শিশু পাচার-এ ধরনের অপরাধের শাস্তির মেয়াদ বৃদ্ধি ও কঠোর করা হয়েছে। এসব অপরাধের বিরুদ্ধে ন্যূনতম ৭ বছর কারাদণ্ডসহ সর্বোচ্চ মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে।
- সরকার নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে অন্তর্ভুক্ত করে একটি ৪২ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় কাউন্সিল গঠন করেছে। এই কাউন্সিল উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
- **মহিলা তদন্ত কেন্দ্র স্থাপন**

বাংলাদেশে প্রথম এবং একমাত্র মহিলা তদন্ত কেন্দ্র স্থাপন করা হয় ঢাকার মিরপুরে। ১৯৯৬ সালের ১৬ আগস্ট এই কেন্দ্র উদ্বোধন করা হয়। নারী নির্যাতন সংক্রান্ত অভিযোগ ও মামলা তদন্ত করার দায়িত্ব পালন করবে এই মহিলা তদন্ত কেন্দ্র।[১] বর্তমানে ৪ জন মহিলা সাব ইন্সপেক্টর (SI), ২ জন মহিলা এ্যাসিসটেন্ট সাব ইন্সপেক্টর (ASI) এবং ৮ জন মহিলা কনস্টেবল এই কেন্দ্রে কর্মরত। মহিলা তদন্ত কেন্দ্র পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে ঢাকার বাকী ৩টি মেট্রোপলিটন ডিভিশনেও এই মহিলা তদন্ত কেন্দ্র খোলা হয়।[২]

নারী নির্যাতন বিলোপে সমন্বিত প্রকল্প

৭ দফা পদক্ষেপ ও সরকার নারী নির্যাতন রোধে ১৯৯৭ সালে মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তরের উদ্যোগে পাঁচ বছর মেয়াদি একটি সমন্বিত প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছিল। নারী নির্যাতন বিলোপ সমন্বিত প্রকল্প (Intregrated Project for Elemanating Violence Against Women) শিরোনামে এ প্রকল্পটির একটি খসড়া প্রস্তাব ইতিমধ্যে পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হয়েছে। পাঁচবছর মেয়াদী প্রস্তাবিত এ প্রকল্পটির সম্ভাব্য ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় দেড়শ কোটি টাকা। বাংলাদেশ সরকার, ডেনমার্কের সাহায্য সংস্থা ডানিডা এবং অন্যান্য দাতা সংস্থা এ প্রকল্পের জন্য যৌথভাবে আর্থিক সহযোগিতা দিবে বলে জানা গেছে। নারী নির্যাতন রোধে এই খসড়া প্রকল্পে সুনির্দিষ্ট ৭টি উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[৩] এগুলো হলো :

উদ্দেশ্য-১ : বিচারক, আইনজীবী, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, এনজিও প্রতিনিধিদের সচেতনতা বাড়াতে সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন এবং ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ অফিসার, ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী, সমাজসেবী, কাজী, এনজিও কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

---

[১] *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি* ২০১১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৫৫।

[২] *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি* ২০১১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৪৩।

[৩] *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি* ২০১১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

উদ্দেশ্য-২ : নারী নির্যাতন রোধে সচেতনতা বাড়াতে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈরী, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যসূচিতে এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্তকরণ। এছাড়া সরকারী-বেসরকারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তাদের নারী নির্যাতন রোধে দক্ষতা বাড়ানো এবং সেসব ইনস্টিটিউটের জন্য ট্রেনিং উপকরণ তৈরী ইত্যাদি।

উদ্দেশ্য-৩ : ধর্ষণ মামলার দ্রুত তদন্তের জন্য গবেষণা সামগ্রী প্রদান, মেডিকেল কলেজ, জেলা ও থানা হাসপাতালগুলোতে বার্ণ ইউনিট চালুকরণ এবং নির্যাতনের শিকার নারীদেরকে মানসিক চিকিৎসা প্রদানের জন্য প্রত্যেকটি মেডিকেল কলেজ, জেলা ও থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ট্রমা সেন্টার (Truma Center) স্থাপন।

উদ্দেশ্য-৪ : প্রত্যেক পুলিশ স্টেশনে মহিলাদের জন্য আলাদা বুথ স্থাপন এবং কারাগারে মহিলাদের জন্য আলাদা কাস্টডির ব্যবস্থাকরণ।

উদ্দেশ্য-৫ : প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় পদ্ধতির উন্নয়ন ও পরিবর্তন।

উদ্দেশ্য-৬ : মহিলাদেরকে আইনগত সহযোগিতা দেওয়ার বিষয়টি জোরদার ও বিস্তৃত করা।

উদ্দেশ্য-৭ : নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা রোধ করতে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। সরকারের এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মূখ্য ভূমিকা পালন করবে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। এছাড়া এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এবং সচিবদের নিয়ে একটি জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও রয়েছে একটি কেন্দ্রীয় প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (CPIU) এবং জেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (DPIU) গঠনের পরিকল্পনা।[১]

নারী উন্নয়ন পরিষদ : নারী উন্নয়ন এবং নর-নারীর সমতা বিধানের লক্ষ্যে গঠিত সরকারের জাতীয় নারী উন্নয়ন পরিষদের ১ম সভা প্রধানমন্ত্রীর সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে নতুন আইন সুপারিশ কমিটি গঠন: নারীর অধিকার নিশ্চিত করা এবং নির্যাতন প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে দেশে বর্তমানে প্রচলিত সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সেগুলিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন অথবা প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।[২]

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কার্যক্রম বৃদ্ধি ও নতুন পদ সৃষ্টি

সরকার সম্প্রতি মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কার্যক্রম বাড়ানোর জন্য ১ হাজার ৫শ' ৬৫টি নতুন পদ সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু করেছে। বর্তমানে দেশের ২২টি জেলার ১শ' ৩৬টি থানায় মহিলা অধিদপ্তর কার্যক্রম চালু রয়েছে। পর্যায়ক্রমে ৪২ জেলার আরো ২শ' ৬০টি থানায় মহিলা অধিদপ্তরের কার্যক্রম চালু করা হবে।

প্রতিটি জেলায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ আদালত গঠন

নারী ও শিশু নির্যাতনকারীদের দ্রুত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য বর্তমান সরকার দেশের সকল জেলায় বিশেষ আদালত গঠনের কাজ শুরু করেছে। উল্লেখ্য যে, ১৯৯৫ সালে প্রণীত নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইনের ১৬ ধারার আলোকে প্রত্যেক জেলা সদরে একজন জেলা ও দায়রা জজের সমন্বয়ে বিশেষ আদালত গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ পর্যন্ত ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, যশোর, রংপুর, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ এবং কুষ্টিয়া এই ১০টি জেলায় এই নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ আদালত গঠিত হয়েছে। ৩টি পার্বত্য জেলা ব্যতীত বাকী ৬১টি জেলায় ক্রমান্বয়ে এই বিশেষ আদালত গঠন করা হবে। পারিবারিক আদালতের আপীল মামলাগুলি নিস্পত্তির দায়িত্বও এই বিশেষ আদালতকে দেয়া হয়েছে।[৩]

সামারি ট্রায়াল (Summery Trial)

নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইনের ২০ ধারার ২ উপধারায় বিধান করা হয়েছে যে, বিচারের জন্য মামলা প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৯০টি কার্য দিবসের মধ্যে বিচার কাজ সম্পন্ন করতে হবে। একে সামারি ট্রায়াল বলা হয়।

লিগ্যাল এইড কমিটি (Legal Aid Commitee)

---

[১]. *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি* ২০১১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩-২৬।
[২]. *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি* ২০১১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪-২৬।
[৩]. *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি* ২০১১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪-৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

৬১টি জেলায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ আদালত গঠিত না হওয়া পর্যন্ত অন্তবর্তীকালীন সময়ে এই সব জেলার বিচার প্রার্থী নারী ও শিশুদের সাহায্যার্থে 'লিগ্যাল এইড কমিটি' গঠন করা হয়েছে।

১৪ দফা নারী উন্নয়ন নীতিমালা ঘোষণা

জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত ও নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে প্রথমবারের মত সরকার ১৪ দফা জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ঘোষণা করেছে ৮ই মার্চ, ১৯৯৭ সালে। এই জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালার আলোকে প্রণীত কর্ম-পরিকল্পনা পরবর্তী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[১]

এই জাতীয় উন্নয়ন নীতির মধ্যে রয়েছে:

১। নারীর মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার বাস্তবায়ন।
২। মেয়ে শিশুর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সাধন এবং সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করা।
৩। নারীর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন দূরীকরণ।
৫। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ।
৬। ক্রীড়া ও সংস্কৃতি।
৭। জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকাণ্ডে নারীর সক্রিয় ও সম অধিকার নিশ্চিত করণ।
    ৭.১ নারীর দারিদ্রতা দূরীকরণ
    ৭.২ নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন
    ৭.৩ নারীর কর্মসংস্থান
    ৭.৪ সহায়ক সেবা
    ৭.৫ নারী ও প্রযুক্তি
    ৭.৬ নারীর খাদ্য নিরাপত্তা
৮। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন
৯। নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন
১০। স্বাস্থ্য ও পুষ্টি
১১। গৃহায়ন এবং আশ্রয়
১২। নারী ও পরিবেশ
১৩। নারী ও গণমাধ্যম
১৪। বিশেষ দুর্দশাগ্রস্ত নারী

সরকারী পদক্ষেপ ও কতিপয় মন্তব্য[২]

আপাত দৃষ্টিতে বাংলাদেশ সরকারের এ সব গৃহীত পদক্ষেপ নারী উন্নয়ন ও সিডও (CEDAW) বাস্তবায়নে ইতিবাচক মনে হলেও তা কার্যকর করার লক্ষ্যে এসব আইনী সংস্কারসমূহের সীমাবদ্ধতাগুলো চিহ্নিত করা দরকার। কেননা ঘোষিত কর্মসূচী এবং তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে বরাবরই বিরাট ফাঁক থেকে যায়। এছাড়াও বিচার বিভাগ ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহকে খুবই তৎপর এবং জেন্ডার সংবেদনশীল (Gender Sensitized) হতে হবে। কেননা লিঙ্গীয় পক্ষপাতদুষ্ট (Gender Bias) সামাজিক কাঠামোতে এই সব ঘোষণা অনেকখানিই কাগুজে ব্যাপার হয়ে পড়ে। আমাদের স্মরণ রাখা দরকার যে, বাংলাদেশ সরকার কতগুলো সংরক্ষণ আরোপ করে সিডও (CEDAW) সনদ অনুমোদন করেছে, কিন্তু তা এখনও আইনী বাধ্যবাধকতা রূপে গ্রহণ করেনি।

সাংবিধানিকভাবে নারী পুরুষের সমতার কথা থাকলেও বাস্তবিক অর্থে কি নারী-পুরুষের সমতা আছে? বাংলাদেশের নাগরিকত্ব অর্জনের ক্ষেত্রে রয়েছে নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য। যেমন, বাংলাদেশী নারী কোন

---

[১]. *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি* ২০১১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৪০।

[২]. শিরোনাম: আজও বাস্তবায়ন হলো না সিডও, দৈনিক প্রথম আলো, ৪ সেপ্টে. ২০১৩, অধুনা ,পৃ. ৩।

Dhaka University Institutional Repository

বিদেশী পুরুষকে বিয়ে করলে শর্তসাপেক্ষে সেই বিদেশী পুরুষ বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পাবে। কিন্তু বাংলাদেশী পুরুষ কোন বিদেশী নারীকে বিয়ে করলে সেই বিদেশী নারী নিঃশর্তে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পাবে। এখানে রয়েছে নারী-পুরুষের বৈষম্য। নাগরিকত্ব আইনের জটিলতায় নারী তার সন্তানকে নাগরিকত্ব দিতে পারছে না যদি তার বাবা বাংলাদেশী নাগরিক না হন। সমঅধিকারের কথা বললে এখানে পিতা বা মাতা কেউ বাংলাদেশী হলে তার সন্তান বাংলাদেশী হবে এ বিষয়টি থাকতে পারত। সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে রয়েছে "সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।"[১] নাগরিকত্ব সংক্রান্ত আইনে নারী ও পুরুষের মধ্যে রয়েছে বৈষম্য।

সংবিধানের ২৯ অনুচ্ছেদে ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ ভেদে কাউকে বৈষম্য না করার কথা বলা হয়েছে। সাক্ষ্য আইনের ধারাতেও সাক্ষী নারী ও পুরুষের সঙ্গে কোন প্রকার বৈষম্য নেই। কিন্তু বাস্তব চিত্র ভিন্ন। ঘোষিত আইনে কোন প্রকার বৈষম্য না থাকলেও প্রয়োগগত ক্ষেত্রে নারীর প্রতি রয়েছে তীব্র বৈষম্য। যেমন, কোন প্রকার দলীল সম্পাদন করতে গেলে একজন পুরুষের বিপরীতে দুইজন নারীকে সাক্ষর দিতে হয়। অথচ সিডও সনদে আইনের ক্ষেত্রে সমতাকে একটি জরুরী বিষয় গণ্য করে এর ১৫নং ধারায় এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের কথা রাষ্ট্রসমূহকে বলা হয়েছে। সিডও সনদের ৯নং ধারায় জাতীয়তা ও নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে পুরুষের মত নারীরও সমান অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে।[২] বিবাহ ও পারিবারিক আইনে রয়েছে নারীর প্রতি বৈষম্য। হিন্দু নারীদের বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার নেই, সম্পত্তির উত্তরাধিকার তো নেই ই। হিন্দু আইনে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন হয় না। প্রয়োজনে হিন্দু নারী তার বিবাহের স্বপক্ষে কোন কাগজ পত্র দেখাতে পারেনা।

মুসলমান নারীরা তখনই তালাক দিতে পারে যখন বিবাহের রেজিস্ট্রেশনে তালাকের ক্ষমতা দেয়া হয়। বিবাহ বিচ্ছেদ, অভিভাবকত্ব, প্রতিপালকত্ব এগুলো পারিবারিক ও শরীআহ্ আইনে অধীনস্ত করায় নারীর অধিকারকে খর্ব করেছে। দত্তক, ট্রাস্টিশীপ, উত্তরাধিকার সর্বক্ষেত্রেই বিদ্যমান ধর্মীয় আইন নারীর প্রতি চরম বৈষম্যমূলক। এসব ক্ষেত্রে ধর্ম ভিত্তিক পারিবারিক আইন না করে 'সর্বজনীন পারিবারিক আইন' করা যেতে পারে। বিবাহ ও পারিবারিক আইনে নারীর সমঅধিকার সিডও সনদের ১৬নং ধারায় সংরক্ষিত আছে। বাংলাদেশ সরকার প্রথমে ১৬নং ধারার গ ও চ উপধারায় আপত্তি জানিয়ে তা সংরক্ষণ করে। পরবর্তীতে 'চ' উপধারা থেকে সংরক্ষণ প্রত্যাহার করে। কিন্তু 'গ' উপধারাতে "বিবাহ ও বিচ্ছেদে একই অধিকার ও দায়িত্ব" সংরক্ষণ বহাল রাখে।

বাংলাদেশ সংবিধানে ২৭, ২৮,ও ২৯ এর ধারা-উপধারাগুলোতে নারী-পুরুষের সমতার কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার সাংবিধানিক স্বীকৃতি সত্বেও বাস্তবে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সবক্ষেত্রেই পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করতে পারছে না নারী। নারী-পুরুষের সমঅধিকারের সাংবিধানিক ভিত্তি থাকা সত্বেও সরকার এখনও সিডও সনদের ২নং ধারার প্রতি সংরক্ষণ বহাল রাখার কারণে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় এটি বিরাট অন্তরায়। সিডও সনদে এই ধারায় নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য বিলোপের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক নারীর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। সিডও সনদের প্রাণ হচ্ছে এই ২নং ধারা। বাংলাদেশের সংবিধানের ১০নং ধারায় বলা হয়েছে, "জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।"[৩] কিন্তু অংশগ্রহণ আর সমতা এক কথা নয়। সিডও সনদের ১৩নং ধারায় সমতার ভিত্তিতে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের ১৯ ধারায় সকল নাগরিকের সুযোগের সমতার কথা বলা হয়েছে। ২৮(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।" সংবিধানে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত (১৯) (১) এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপসহ সম্পদের সুষম বণ্টন করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের জন্য সুষম সুযোগ সুবিধার (১৯) (২) কথা বলা হয়েছে। এখানে স্পষ্টভাবে নারীর কথা বলা না

---

১. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।*

২. *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি* ২০১১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫-৪০।

৩. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।*

Dhaka University Institutional Repository

হলেও জেন্ডার নিরপেক্ষভাবে সকল নাগরিক ও মানুষের কথা বলা হয়েছে। স্পষ্টভাবে নারীর মৌলিক মানবাধিকার রক্ষার কোন অনুচ্ছেদ আমাদের সংবিধানে পাওয়া যায় না। বাস্তবিক অর্থে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করতে হলে আইন সংশোধন এবং আইনের সংস্কারের প্রয়োজন আছে। সিডও সনদের পর অনেক দেশে সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে।[১] নারীর মানবাধিকার রক্ষার জন্য সংবিধানে আরো সুস্পষ্ট ধারা সংযোজনের প্রয়োজন। আইনগতভাবে নারীর প্রতি যে বৈষম্য রয়েছে তা দূর করতে হবে। মজুরী বৈষম্য ও অন্যান্য বৈষম্য দূর করার জন্য শ্রম আইন সংশোধন ও তার পরিবর্তন, পারিবারিক ও শরীআহ্ আইনের সমন্বয়ে প্রয়োজন একটি সর্বজনীন পারিবারিক আইন।

সিদ্ধান্ত গ্রহণসহ সকল ক্ষেত্রে নারীর অধিকার ও সর্বজনীন পারিবারিক আইন

বর্তমানে বাংলাদেশের সমাজ জীবনে গণতান্ত্রিক ধারা, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি, গণতান্ত্রিক জীবনাচরন ও মূল্যবোধ কিছুটা হলেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং অচিরেই তার সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন। আর একটি গণতান্ত্রিক সমাজের মূল বৈশিষ্ট্য হলো নারী ও পুরুষের মাঝে সমতা। কারণ নারী পুরুষ উভয়ে একটি সমাজের সম্পূরক সত্তা। অথচ বাংলাদেশের নারীদের জন্য বিদ্যমান অধিকাংশ আইনই অত্যন্ত প্রাচীন ও শত শত বছরের পুরানো। মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণা ও মানসিকতার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় এসব আইনের মধ্যে। বিশেষ করে সমাজের অর্ধেক অংশ নারী সমাজের জন্য যে সকল আইন ও নীতিমালা রয়েছে সেগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এগুলোর মূল দৃষ্টিভঙ্গী অমানবিক, অগণতান্ত্রিক ও বৈষম্যমূলক।[২]

প্রচলিত সামন্তযুগীয় ধ্যান-ধারণা, পুরুষ প্রাধান্য, সামাজিক পারিবারিক ব্যবস্থায় আমাদের দেশে বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, সন্তানের অভিভাবকত্ব সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে নারী সমাজ বৈষম্য ও অসম আইনের শিকার হয়ে শোষিত ও নির্যাতিত হচ্ছে। আর তা প্রকৃত অর্থে বন্ধ করা এবং সর্বোপরি নারী পুরুষের সমতা আনার লক্ষ্যে প্রচলিত বহু আইন বিশেষ করে পারিবারিক আইনের পরিমার্জন পরিবর্তনের প্রশ্ন নারী সমাজের মধ্যে দেখা দিয়েছে।

বাংলাদেশে প্রধানত ৩ ধরনের ব্যক্তিগত আইন প্রচলিত রয়েছে :

১. প্রচলিত মুসলিম পারিবারিক আইন
২. প্রচলিত হিন্দু পারিবারিক আইন
৩. প্রচলিত খৃস্টান পারিবারিক আইন

তাছাড়া বাংলাদেশে বিভিন্ন উপজাতিদের জন্য কোন পৃথক আইন নেই। ঐ সকল উপজাতি সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী ব্যক্তিগত বিষয় সম্পর্কিত কার্যাদি ও সমস্যাদির সমাধান করে। বাংলাদেশের সকল ধর্মাবলম্বী নারীদের পারিবারিক আইনের ক্ষেত্রটি পর্যালোচনা করে দেখলে বুঝা যায়, নারী নির্যাতন ও নারী অবমাননার বীজ প্রচলিত আইন গুলোর মধ্যেই অনেক পরিমাণে নিহিত রয়েছে। আর জাতিসংঘ কর্তৃক প্রকাশিত 'Law and the Status of Women' এ Helvi Sipila উল্লেখ করেছেন, একটি সমাজে নারী-পুরুষ বৈষম্য নানা কারণে হতে পারে। প্রথা, ঐতিহ্য ও দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কারণে। কারণ যাই হোক না কেন যখন তা আইন দ্বারা সমর্থিত হয় তখন তা মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। আইনগত ক্ষেত্রে নারীর দূর্বল অবস্থান দেশ ও সমাজকে পরিপূর্ণভাবে অবদান রাখা থেকে বঞ্চিত রাখে, বাধা সৃষ্টি করে।[৩]

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই তথ্য একান্ত বাস্তব সত্য। বাংলাদেশে বসবাসকারী মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টানসহ সকল ধর্মের নারীর পারিবারিক জীবনে সমতা, সমঅধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য ভয়াবহ মাত্রার নারী নির্যাতন বন্ধের জন্য সর্বজনীন পারিবারিক আইন চালু করার দাবী উঠেছে। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে,

---

[১] *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি* ২০১১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩-৩৫।

[২] *বাংলাদেশে নারী অধিকার আইন সংস্কার ও ইউনিফরম ফ্যামিলি কোড বিষয়ে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রস্তাবনাসমূহ, ইউনিফরম ফ্যামেলি কোড*, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও আইন সহায়তা কমিটি, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ঢাকা, ১৯৯৩ইং, পৃ. ১৫।

[৩] *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি* ২০১১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৬১।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর ভরণ পোষণ, বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, দাম্পত্য সম্পর্ক পুণরুদ্ধার, সন্তানের অভিভাবকত্ব পুণরুদ্ধার, সন্তানের অভিভাবকত্ব তত্ত্বাবধান ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন আইন ও রীতির সীমাবদ্ধতা, অসম্পূর্ণতা ও অকার্যকারিতা দূর করা। তাছাড়া আইনের উদ্দেশ্য যদি হয় সমাজে অগ্রগতি সাধন, নর-নারী নির্বিশেষে সকলের কল্যাণ ও মঙ্গল সাধন তাহলে সর্বজনীন পারিবারিক আইনেরও উদ্দেশ্য তা। তাছাড়া ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত মানবাধিকার সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের ধারা ৭ এর বক্তব্যের সাথেও এই আইনের দাবী সঙ্গতিপূর্ণ। ধারা ৭ এ রয়েছে আইনের কাছে সকলেই সমান এবং কোনরূপ বৈষম্য ব্যতিরেকেই সকলেরই আইনের দ্বারা সমভাবে রক্ষিত হওয়ার অধিকার। বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭নং ধারার সাথেও এটা সঙ্গতিপূর্ণ। এখানে বলা হয়ছে সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।[১]

এছাড়া নারী ও পুরুষের মাঝে বিরাজমান সকল প্রকার বৈষম্য দূর করে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতিসংঘ নারী দশকে তথা ১৯৭৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ বা 'Convention in the Elimination of All Froms of Discrimination Against Women' যা 'সিডও' নামে পরিচিত।[২] এর ২নং ধারার ক, খ, গ এবং চ উপধারা বিশেষভাবে এ দাবীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। বিশেষ করে চ. উপধারায় বলা হয়েছে, নারী সমাজের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ বলে গণ্য করা যায় এরূপ চলতি আইনসহ সকল সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতিসমূহ রোধ ও অপসারণ করার উদ্দেশ্যে নতুনভাবে আইন প্রণয়ন অথবা প্রচলিত আইন, বিধি-ব্যবস্থা প্রথা ও রেওয়াজ বিয়োজন ও সংযোজন করে প্রয়োজনে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাই বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে বর্ণিত ও ঘোষিত মৌলিক অধিকারের ঘোষণা বাস্তবায়ন প্রয়োজন। আর এ সকল ধারা নারী সমাজের সর্বজনীন পারিবারিক আইন বা 'Uniform Family Code' এর দাবী সঙ্গতিপূর্ণ। এছাড়া বর্তমান পরিস্থিতিতেও সমতা ভিত্তিক পারিবারিক আইন এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এ নিরিখে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ এ দেশের নারীদেরকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কেন্দ্রে নিয়ে আসতে এবং প্রকৃত ক্ষমতায়ন ঘটাতে এরকম একটি আইনের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করতে ব্যাপক গবেষণা, মতবিনিময়, সেমিনার, সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করছে এবং ১৯৯৩ সালের ১ এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট এরকম একটি আইনের খসড়া প্রস্তাবনা জমা দিয়েছে। যার ফল স্বরূপ নারী নীতিমালা ২০১১ প্রণীত হয়েছে।

---

১. *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি* ২০১১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৬১।

২. সিডো, প্রাগুক্ত, পৃ. ১; *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি*, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১১; প্রফেসর ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মন, *নারী ও রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯-৪৬০।

Dhaka University Institutional Repository

6ô Aa¨vq

evsjv‡`‡k Bmjvgx wkÿvq bvix‡`i Ae¯'vb

Gi Dbœq‡b KiYxq

৬ষ্ঠ অধ্যায়
বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষায় নারীর অবস্থান এর উন্নয়নে করণীয়

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। অথচ পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে নারীরা প্রান্তিক অবস্থানে রয়েছে। যদিও নারীরা অধিকার ভোগ করে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা বৈষম্যমূলক। দেশের সংবিধান ও জাতিসংঘ সনদে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এই আলোকে পরিবার-সমাজ-জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরনের লক্ষ্যে একটি অভিন্ন পারিবারিক আইন প্রনয়ণের লক্ষ্যে প্রতিনিধিত্বশীল নারী সংগঠন ও সুশীল সমাজ বহু বছর ধরে আন্দোলন সংগ্রাম করে আসছে। বাংলাদেশের নারী জনগোষ্ঠী রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিকসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনগ্রসর থাকায় বাংলাদেশের সংবিধানে তাদের উন্নতিকল্পে বিশেষ সুবিধা ও অধিকার সন্নিবেশিত হয়েছে। ১৯৭২ সালে প্রণীত মূল সংবিধান এবং পরবর্তীতে কয়েকটি সংশোধনীতে নারীদেরকে বাড়তি সুযোগ-সুবিধা ও সংরক্ষিত অধিকার দেয়ার কথা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংযোজন করা হয়েছে। বাংলাদেশের সমাজে নারীরা প্রতিনিয়ত যেভাবে বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার হচ্ছে তা দেখে সংবিধানের প্রকৃত দাবির বাস্তবায়ন লক্ষ্য করা যায় না। কেননা নারী পুরুষের সমঅধিকারের কথা বলা হলেও বাস্তব জীবনে এর তেমন কোন প্রতিফলন বা কার্যকারিতা নেই।

প্রকৃত কথা হলো এ অবস্থার পরিবর্তন ইসলামের দাবিকে উপেক্ষা করে কোনক্রমেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যাবে না। এ জন্য প্রয়োজন ইসলামের বিধান ও নীতিমালার পূর্ণ অনুসরণ ও পরিপালন। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষায় নারীর অবস্থান-এর উন্নয়নে শরী'আহ সম্মত বাস্তব ভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে ১৯৭৭ সালে আন্তর্জাতিক উদ্যোগে মক্কায় একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং ইসলামী শিক্ষার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নীতিমালা প্রণীত হয়।[১] এ নীতিমালা প্রণীত হওয়ার পরও

---

১. In 1977, the first World Conference on Muslim Education was held in Makkah. Scholars from throughout the Muslim world deliberated on the status of Muslim education and issued a number of resolutions aimed at Islamizing the educational process. These resolutions included the following:

- The training imparted to a Muslim should be such that faith is infused into the whole of his personality and creates in him an emotional attachment to Islam, thus, enabling him to follow the Qur'an and the Sunnah and willfully and joyfully submitting to the Islamic system of values so that he may proceed to the realization of his status as khalifat, to whom Allah has promised the authority over the universe.
- Education should promote in man the creative impulse to rule himself and the universe as a true servant of Allah, not by opposing and coming into conflict with Nature, but by understanding its laws and harnessing its forces for the growth of a personality that is in harmony with it.
- There must be a core knowledge, obligatory for all Muslims at all levels of the educational system (from the highest to the lowest), graduated to conform to the standards of each level.
- Contemporary knowledge in the field of scientific and social development and information must be given to pupils at all levels.

Apparently from current efforts, a new attempt is being made within the ummah to reconcile moderm, secular education with the traditional, Islamic approach. This reconciliation is often discussed within the distinction between *fard* '*ayn* knowledge (the revealed sciences) and *fard*

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম দেশ সমূহে এর তেমন কোন প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। খোদ বাংলাদেশেও এর বাস্তবায়ন দেখা যায় নি। তবে এটি একটি প্রক্রিয়া হিসেবে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনায় কাজ করলে এ অবস্থার পরিবর্তন হওয়া সম্ভব বলে আমাদের বিশ্বাস।

বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষায় নারীর বর্তমান অবস্থান

ইসলামী শরী'আহ্র মৌলিক ভিত্তি আল-কুর'আন ও আল-হাদীস। এ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আদর্শই ইসলামী আদর্শ এবং এ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত দর্শনই ইসলামী শিক্ষা-দর্শন। এ পৃথিবীতে নারী ও পুরুষ মিলে জগত সংসার। শিক্ষাক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমন্বিত উন্নয়নের ফলে বিশ্বে আধুনিক সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়েছে। ইসলামের ইতিহাসে নারীদের প্রথম শিক্ষা ব্যবস্থার উৎপত্তি হয় হযরত আয়েশা (রা) এর মাধ্যমে। হাদীসশাস্ত্রের মৌলিক ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে প্রাথমিক পর্যায়ে যে ক'জন বিখ্যাত হাদীস বর্ণনাকারী, হাদীস সংরক্ষণ ও মৌলিক বর্ণনায় অবদান রেখেছেন; পরবর্তী সাহাবী ও তাবেঈনদের মাঝে হাদীস শিক্ষাদান করে চির ভাস্বর হয়ে রয়েছেন হযরত আয়েশা (রা) তাদের মধ্যে অন্যতম। তৎকালীন যুগে তিনিই সর্বপ্রথম হাদীসের উপর বিখ্যাত মহিলা সাহাবী ও শিক্ষিকা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। অনেক পুরুষ সাহাবী হযরত আয়েশা (রা) এর নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ২২১০ টি। নারী শিক্ষার এ ধারা অব্যাহত রয়েছে সে সময় থেকেই। পরবর্তী সময় থেকে নারীরা শিক্ষার প্রতি অধিক আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এরপর অতিবাহিত হতে থাকে যুগ থেকে যুগান্তর ও কাল থেকে কালান্তর এবং পরিবর্তন ঘটতে থাকে নারী জীবনের। পরিবর্তন হতে শুরু করে নারীর জীবনধারা ও পরিক্রমায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রাসূল (সা)-এর জীবদ্দশাতে হযরত আয়েশা (রা) এর সময়ে 'রুফাইদা আসলামী' নামক একজন প্রতিষ্ঠিত মহিলা চিকিৎসক বা ডাক্তার ছিলেন। যিনি সে সময়ে মেধাবী সাহাবীদের মাঝে চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। সুতরাং এখান থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে রাসূলের (সা) সময় থেকেই নারী শিক্ষার সফল সূত্রপাত।

নারীদের মাঝে এ ধারাবাহিকতা আজ তাদেরকে সফলতার স্বর্ণশিখরে উন্নীত করেছে। বিশ্বে উন্নত দেশগুলোর পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশসমূহও নারী শিক্ষার অগ্রগতিতে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে চলছে। এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের নারী সমাজও সমান গতিতে এগিয়ে চলছে সফলতার সোনালী মিশনে; প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পৃথক নারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষায় নারীর উন্নয়ন, বিকাশ ও অবস্থান সৃষ্টিতে প্রভূত অবদান রেখে চলছে বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা। এ শিক্ষাব্যবস্থা দু'ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি উপহার দিয়ে যাচ্ছে। ১. ছাত্র ও ছাত্রীদের যৌথভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা; ২. শুধুমাত্র মহিলা বা গার্লস মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা। আধুনিক ও আদর্শিক শিক্ষার প্রকৃত সমন্বয়ের ফলে নারী সমাজের মধ্যে উচ্চ নৈতিকতা সম্পন্ন যোগ্য নাগরিক তৈরী হচ্ছে। এ ধারাবাহিকতায় আরো উৎকর্ষ সাধন প্রয়োজন। কারণ সৎ, যোগ্য ও উন্নত নাগরিক তৈরীর পথে নারীর প্রকৃত উন্নয়ন-এর বিকল্প নেই। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো উন্নত নাগরিক তৈরীর ও দক্ষ মানব সম্পদ তৈরীর গুরু দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। ফলে এগিয়ে যাচ্ছে নারী, এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। বর্তমানে বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষায় নারীর প্রকৃত অবস্থান কী পরিসংখ্যানের মাধ্যমে প্রদত্ত হলো-

সারণি-১

---

kifayah knowledge (the acquired sciences). Imam al-Ghazzali made this distinction when he discussed the religious sciences (*al-'ulum al khabarivyah*) and the rational sciences (*al-'ulum al-'aqliyah'*). The revealed (religious) sciences include the Qur'an, the Sunnah, the Shari'ah, theology (*tawhid*), Islamic metaphysics (*al-tasawwuJ*), and linguistic sciences (Arabic). The acquisition of knowledge in these sciences is incumbent upon every Muslim male and female.[Syed Al-Atlas, *Aims and Objectives of Islamic Education* (Jeddah: Saudi Arabia King Abdul Aziz University, 1979), p. 4-67.]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে দাখিল থেকে কামিল পর্যায়ে ১৯৯৭ খৃস্টাব্দ - ২০১৩ খৃস্টাব্দ মহিলা/গার্লস মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ক্রমবর্ধমান চিত্র[১]। (ইসলামী শিক্ষায় নারীর অবস্থানের উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক চিত্র : ১৯৯৭-২০১৩)[২]

বছর	দাখিল		আলিম		ফাযিল		কামিল		সর্বোমোট	
	মোট	বালিকা/মহিলা	মোট	বালিকা/মহিলা	মোট	বালিকা/মহিলা	মোট	বালিকা/মহিলা	মোট	বালিকা/মহিলা
১৯৯৭	৪৭৯৫	৪৫৯	৯৮৩	৩১	৯৫৫	৯	১১৮	১	৬৮৫১	৫০০
১৯৯৮	৪৮৬৮	৫২০	৯৯৮	৪২	৯৭০	১৩	১২০(৩)	১	৬৯৫৬(৩)	৫৭৬
১৯৯৯	৪৮৯০	৬০৯	১০৪৭	৫৯	১০১৭	২১	১৪১(৩)	৩	৭১২২(৩)	৬৯২
২০০০	৫০১৫	৬২৮	১০৮৭	৬১	১০২৯	২৩	১৪৮(৩)	৪	৭৬৫১(৩)	৭৮৪
২০০১	৫৩৯১	৭০১	১০৮৭	৬১	১০২৯	২১	১৪৪	৪	৭৬৫১(৩)	৭৮৪
২০০২	৫৫৩৬	৭৩৩	১১০৫	৬৪	১০৩২	২৩	১৪৭	৪	৭৮২০(৩)	৮২১
২০০৩	৫৯৯৫	৮৪৭	১২২০	৮০	১০৩০	২০	১৬৫	৪	৮৪১০	৯৫১
২০০৪	৬৩১৫	৯২৬	১৩২০	৮৬	১০১২	২২	১৭২	৬	৮৮১৯	১০৪০
২০০৫	৬৬৮৫	১০১৭	১৩১৫	৯১	১০৩৯	২৪	১৭৫(৩)	৬	৯২১৪(৩)	১১৩৮
২০০৬	৬৭৯৮	১০৩৪	১৩৪৫	৯৮	১০৪০	২৪	১৭৮(৩)	৭	৯৩৬১(৩)	১১৬৩
২০০৮	৬৭৭৯	১০৪৬	১৪০১	১০৭	১০১৩	২৫	১৯১(৩)	৮	৯৩৮৪(৩)	১১৮৬
২০০৯	৬৭৭১	১০৫৮	১৪৮৭	১১৪	১০২২	২৪	১৯৫(৩)	৮	৯৪৭৫(৩)	১২০৪
২০১০	৬৬৬০	১০৩১	১৪৮৬	১১৪	১০২১	২৪	১৯৪(৩)	৮	৯৩৬১(৩)	১১৭৭
২০১১	৬৬৬৯	১০২৮	১৪০১	১০৭	১০৫৬	৩২	২০৪(৩)	১০	৯৩৩০(৩)	১১৭৭
২০১২	৬৭৪৫	১০২৮	১৪৪২	১০৯	১০৪৯	২৭	২০৫(৩)	১১	৯৪৪১(৩)	১১৭৫
২০১৩	৬৫৯৩	১০০৩	১৪৭০	১১২	১০৫৪	২৭	২১৯(৩)	১২	৯৩৩৬(৩)	১১৫৪

উপরোক্ত সারণিতে আমরা দেখতে পাই যে, নারীদের জন্য ১৯৯৭ সালে যথাক্রমে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল মহিলা মাদ্রাসা সমূহের সংখ্যা ছিল ৪৫৯, ৩১, ৯, ১ এবং সর্বমোট সংখ্যা ছিল ৫০০। ১৯৯৮ সালে এসে এর সংখ্যা উন্নীত হয়ে ৫৭৬ টি হয়। ১৯৯৯ সালে পেয়ে হয় ৬৯২। ২০০০ ও ২০০১ সালে এ সংখ্যা বেড়ে দ্বারায় ৭৮৪। আবার ২০০২ সালে এ অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় এবং এর সংখ্যা দ্বারায় ৮২১। এভাবে ধীরে ধীরে নারী শিক্ষার অগ্রগতিতে বিপুল সংখ্যক গার্লস স্কুল সহ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। সর্বশেষ এ সমীক্ষা সমাপ্তকালে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে সৎ, যোগ্য, উপযুক্ত নারী মানব সম্পদ উন্নয়ন ও বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার উন্নয়নে ১১৫৪ টি মহিলা/গার্লস মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও ইসলামী শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি ও পেশাগত দিক থেকে নারীদের বর্তমান অবস্থান নিম্নোরূপ :

---

১. Bangladesh Education Statistics 2013, Published August 2014, Bangladesh Bureau of Educational Information and statistics (BANBEIS), Ministry of Education (Dhaka : 1, Sonargaon Road, Palashi-Nilkhet.), PP. 209-224.
২. ibid, PP. 209-224.

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-২

শিক্ষকদের লিঙ্গভিত্তিক সংখ্যা ও তালিকা (ইসলামী শিক্ষায় নারীর অবস্থনের উন্নয়ন চিত্র : ১৯৯৭-২০১৩)[১]

বছর	দাখিল		আলিম		ফাযিল		কামিল		মোট	
	মোট	মহিলা	মোট	মহিলা	মোট	মহিলা	মোট	মহিলা	মোট	মহিলা
১৯৯৭	৫৮৩৬০	১২৫৭	১৭৪৭৮	২৭৬	১৭৮৮৫	১৩৪	২৮৯০	২৪	৯৬৬১৩	১৬৯১
১৯৯৮	৬০২১০	১৯৩৬	১৭৯৬৫	৩৪১	১৮৩৫২	২৭৭	৩০৩৪	৩২	৯৯৪৭১	২৫৮৬
১৯৯৯	৬১৩১০	২৬৩০	১৭৫৬২	৪২০	২০৮১১	৪৭১	৩৬৭৯	৪৭	১০৩৩৬২	৩৫৬৮
২০০০	৬৪২১১	২৭৩১	১৮৬৪৮	৪৬২	২১৮৪০	৫০২	৩৭৯২	৫১	১০৮৪৯১	৩৭৪৬
২০০১	৬৭০২৬	৩৬৭৭	১৮১১৭	৫৯৩	২১১৩৬	৫৬২	৩৬৩৪	৬২	১০৯৯৯৩	৪৮৯৪
২০০২	৭০২৪৭	৩৯৫৪	১৮৪২৮	৬০৫	২১৪২৩	৫৭১	৩৭১২	৬৫	১১৩৮১০	৫১৯৫
২০০৩	৭৯৮৮১	৫৯৬৭	২২১০৩	১২৪২	২১৮৬৭	৯৮৮	৪৫২৯	১৭৪	১২৮৩৮০	৮৩৭১
২০০৪	৮৬৪২২	৮২৭৭	২৩৬৮৪	১৬১৫	২২০৫৬	১১৬০	৪৬২৮	১৭৬	১৩৬৭৯০	১১২৩৮
২০০৫	৯৮১২৩	৯৯০৮	২৫৬৩৪	১৮০৩	২৩৩৩৬	১৩৪২	৪৮৭৪	১৭৭	১৫১৯৬৭	১৩২৩০
২০০৬	৯৮২১৪	৯৯২৮	২৫৯৪৪	১৮৭২	২৩৪৫৬	১৩৫২	৫০৬০	১৯৬	১৫২৬৭৪	১৩৩৪৮
২০০৮	৮৭৩৯৩	৮৯৪৪	২৪০৮৪	২৩৬৬	২৩৫২৬	১৫১৫	৪৯৬১	২৯৪	১৩৯৯৬৪	১৩১১৯
২০০৯	৮৮৩১৬	৯৬৯৭	২৬৫২৪	২২৪৬	২০৫৭৯	১৩৪৯	৪৮৪০	২৮০	১৪০২৫৯	১৩৫৭২
২০১০	৮৮৫১১	১০২৪৮	২৬৯৪৬	২৪৬৬	২০৮৮৬	১৫৬৩	৪৮৭৪	৩৫৬	১৪১২১৭	১৪৬৩৩
২০১১	৮৮২১২	১০৩২১	২৬৮৬০	২৩৯৫	২১১৯৬	১৭৭০	৫০৬১	৩৬৩	১৪১৩২৯	১৪৮৪৯
২০১২	৮৬৯২০	১০৩৬১	২৫৭২৭	২৫৮৯	২২২৮৫	১৯৩০	৪৯৪৯	৪৪১	১৩৯৮৮১	১৫৩২১
২০১৩	৮৫৪০৪	১০৪৩০	২৬৫২১	২৭৮৫	২১৮৪০	২০৪৪	৫৪০৬	৪৫৮	১৩৯১৭১	১৫৭১৭

বহু প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও বাংলাদেশের নারী সমাজের শিক্ষকতা পেশার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। উপরোক্ত সারণি-২ এ দেখা যায় ১৯৯৭ সালে দাখিল পর্যায়ে নারী শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ১২৫৭, ১৯৯৮ এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৯৩৬, ১৯৯৯ সালে হয় ২৬৩০, ২০০০ সালে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২৭৩১, ২০০১ সালে হয় ৩৬৭৭, ২০০২ সালে হয় ৩৯৫৪, ২০০৩ সালে হয় ৫৯৬৭, ২০০৪ সালে হয় ৮২৭৭, ২০০৫ সালে হয় ৯৯০৮, ২০০৬ সালে হয় ৯৯২৮, ২০০৮ সালে হয় ৮৯৪৪, ২০০৯ সালে হয় ৯৬৯৭, ২০১০ সালে হয় ১০২৪৮, ২০১১ সালে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১০৩২১, ২০১২ সালে হয় ১০৩৬১, ২০১৩ সালে এ সংখ্যা হয় : ১০৪৩০ টিতে উন্নীত হয়। আবার মাদ্‌রাসা বোর্ডের অধীনে ১৯৯৭ সালে মোট শিক্ষকের সংখ্যা ছিল : ১৬৯১ জন, ১৯৯৮ সালে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২৫৮৬ জন, ১৯৯৯ সালে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৩৫৬৮ জন, ২০০০ সালে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৩৭৪৬ জন, ২০০১ সালে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৪৮৯৪ জন ,২০০২ সালে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৫১৯৫ জন, ২০০৩ সালে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৮৩৭১ জন, ২০০৪ সালে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১১২৩ জন ৮, ২০০৫ সালে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৩২৩০ জন, ২০০৬ সালে এ

[১] Bangladesh Education Statistics 2013, ibid, PP. 208-225.

Dhaka University Institutional Repository

সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৩৩৪৮ জন, ২০০৮ সালে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৩১১৯ জন, ২০০৯ সালে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৩৫৭২ জন, ২০১০ সালে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৪৬৩৩ জন, ২০১১ সালে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৪৮৫৯ জন, ২০১২ সালে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৫৩২১ জন, ২০১৩ সালে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৫৭১৭ জন, এ ধারা বাংলাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অব্যাহত রয়েছে যা বাংলাদেশের ইসলামী শিক্ষায় নারীর অবস্থানের উন্নয়নে এক বিশাল উত্তরণ বলা যেতে পারে। তাই আমরা বলতে পারি নারীদের উন্নয়ন একটি সফল প্রক্রিয়া। বালাদেশের মাদ্‌রাসাসমূহে নারী শিক্ষকদের এত অধিক সংখ্যক অন্তর্ভুক্তি ইসলামী শিক্ষায় নারীর অবস্থানের উন্নয়নের কথাই জানান দিচ্ছে। তবে এর গতি আরো বাড়ানোর জন্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে নতুন নতুন আধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ মাদ্‌রাসা ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

সারণি-৩

সাল ভিত্তিক মোট শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্রীদের সংখ্যা (বালিকা শিক্ষার্থী বৃদ্ধির সারণি : ১৯৯৭-২০১৩)[১]

বছর	লিঙ্গ	দাখিল	আলিম	ফাযিল	কামিল	মোট
১৯৯৭	মোট	১৩৫৮৫৭৭	৩৩২৩৬৮	৩৫৮২৬২	৬০৫৫৪	২১০৯৭৬১
	বালিকা/মহিলা	৪৮৫৯৮৪	৮৭০৮৮	৬৫৪৬১	৪৯৪৬	৬৪৩৪৭৯
১৯৯৮	মোট	১১০৩৩১৮	৪২৯২২৯	৪৩৬১০৬	৭৪৮২২	২৬৪৮৪৭৫
	বালিকা/মহিলা	৭০৪২০০	১৩৫৪৩৭	৯৭৮৯৮	৯৫৩৬	৯৪৭০৭১
১৯৯৯	মোট	১৮১৭৭৭০	৫০৮২৯২	৫৮৪২১৮	১১৪৬১৩	৩০২৪৮৯৩
	বালিকা/মহিলা	৮২৯৩৮৫	১৮২৫৬৭	১৬০১৫৭	১৩৮৯৮	১১৮৬০০৭
২০০০	মোট	১৮৭৯৭০৭	৫১৮১৭৮	৫৯৬৪৫৬	১১৭৮৬৪	৩১১২২০৫
	বালিকা/মহিলা	৮৬২৮২০	১৮৬৪২৬	১৬২৬২১	১৪২৯২	১২২৬২০৯
২০০১	মোট	২০৫৮৭০০	৫২১৯৫৭	৫৯৫৫৮৮	৯০৩০৯	৩২৯৯১০৭
	বালিকা/মহিলা	১০১৬৬৯৬	২০৯৩০৩	১৯১৭৭৬	১১২১৭	১৪৩৫৬০৮
২০০২	মোট	২১৬৮৪৪১	৫৩২৬০১	৬০৫১১২	৯১৮৮৯	৩৩৯৮০৪৩
	বালিকা/মহিলা	১০৮২৮৯২	২১৬৫৭১	১৯৬৮৪৩	১১৫১৮	১৫০৭৮২৪
২০০৩	মোট	২১৯৫৪৩৮	৫৫৪৫৭৩	৫৬০০৪১	১২৮৬৫৫	৩৪৩৮৭০৭
	বালিকা/মহিলা	১১৪৪৩৫৮	২৪২৯০৮	১৯৬২০৯	২৪৭৪১	১৬০৮২১৬
২০০৪	মোট	২০৯১৭৭৮	৫৪৩৩৫৮	৫২৬৪৮৫	১২৭৬২২	৩২৮৯২৪৩
	বালিকা/মহিলা	১০৫৯৭২৯	২২৯২০৪	১৭৯২৫৮	২২৫৭৬	১৪৯০৭৬৭
২০০৬	মোট	২২৫২০৯১	৫৫৪৬৫৩	৫২৯৪৯৭	১৩৮৮০৫	৩৪৭৫০৪৬
	বালিকা/মহিলা	১০৫৯৭২৯	২৫৫৬৩৯	১৯৭২২২	২৮৬৬৭	১৬৬০৪৯৯
২০০৮	মোট	২২৩৭০১০	৬১১৬৫৪	৫৪৮২৯০	১৬২৫২৪	৩৫৫৯৪৭৮
	বালিকা/মহিলা	১১৯৪৩১৩	২৯৩২৩৯	২২৩১৬২	৩৯১১৯	১৭৪৯৮৩৩

[১] Bangladesh Education Statistics 2013, ibid, PP. 208-225.

Dhaka University Institutional Repository

২০০৯	মোট	২৩৮৬১১১৩	৬৮৫০৯২	৫৮১৮৩৯	১৬৪৭৫৩	৩৮১৭৭৯৭
	বালিকা/মহিলা	১২৭৬০২৪	৩৩২১৮৮	২৩৯০৮৪	৪১৯১৮	১৮৮৯২১৪
২০১০	মোট	২৪৪৪৫৬৮	৭১৯৩৩২	৬০৪৪৭১	১৭২৪৭০	৩৯৪০৮৪১
	বালিকা/মহিলা	১৩৪২১৪৯	৩৫৭৩৮৫	২৬৪০৯৪	৪৬৬৮৭	২০১০৩১৫
২০১১	মোট	২৪৪২২২০	৮৬২৪২৩	৬৩৪০৬৯	১৮০২১৪	৩৯৩৮৩২৬
	বালিকা/মহিলা	১৩৪৭৮০০	৩৪৫০৬৬	২৮১৪৪১	৫০৮৮৯	২০২৫১৯৬
২০১২	মোট	২৩৬৬৭৯২	৬৯০৩৫৮	৬৩৫৩৭৫	২১১৮৬৪	৩৯০৪৩৮৯
	বালিকা/মহিলা	১৩১৩২৯৭	৩৫০৮৪৮	২৮১২৪২	৬১৫৩০	২০০৭৫১৭
২০১৩	মোট	২২৪৮০৫১	৬৮৫৪৫০	৬২৪৫৪৯	২১৪২৭১	৩৭৭২৩২১
	বালিকা/মহিলা	১২৬১৯৯৮	৩৪৫৭৩০	২৮১৫২৪	৬৫৪৯৪	১৯৬৩৭৪৬

নানা সংকট ও পরিবেশের মধ্যেও বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষায় নারী সমাজের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। ইসলামী শিক্ষা চর্চার মৌলিক প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসাসমূহে ছাত্রী সংখ্যা বিপুল হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। উপরোক্ত পরিসংখ্যানে দেখা যায় ১৯৯৭ সালে দাখিল পর্যায় ব্যালিকা শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৪৮৫৯৮ জন ৪, ১৯৯৮ সালে হয় ৭০৪২০০ জন, ১৯৯৯ সালে হয় ৮২৯৩৮৫ জন, ২০০০ সালে হয় ৮৬২৮২০ জন, ২০০১ সালে হয় ১০১৬৬৯৬ জন, ২০০২ সালে হয় ১০৮২৮৯২ জন, ২০০৩ সালে হয় ১১৪৪৩৫৮ জন, ২০০৪ সালে হয় ১০৫৯৭২৯ জন, ২০০৬ সালে হয় ১০৫৯৭২৯ জন, ২০০৮ সালে হয় ১১৯৪৩১৩ জন, ২০০৯ সালে হয় ১২৭৬০২৪ জন, ২০১০ সালে হয় ১৩৪২১৪৯ জন, ২০১১ সালে হয় ১৩৪৭৮০০ জন, ২০১২ সালে হয় ১৩১৩২৯৭ জন এবং ২০১৩ সালে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১২৬১৯৯৮ জন ।[১]

মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে ১৯৯৭ সালে মোট ব্যালিকা শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৬৪৩৪৭৯ জন, ১৯৯৮ সালে হয় ৯৪৭০৭১ জন, ১৯৯৯ সালে হয় ১১৮৬০০৭ জন, ২০০০ সালে হয় ১২২৬২০৯ জন, ২০০১ সালে হয় ১৪৩৫৬০৮, ২০০২ সালে হয় ১৫০৭৮২৪ জন, ২০০৩ সালে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৬০৮২১৬ জন, ২০০৪ সালে হয় ১৪৯০৭৬৭ জন, ২০০৬ সালে হয় ১৬৬০৪৯৯ জন,[২] ২০০৮ সালে হয় ১৭৪৯৮৩৩ জন, ২০০৯ সালে হয় ১৮৮৯২১৪ জন, ২০১০ সালে হয় ২০১০৩১৫ জন, ২০১১ সালে হয় ২০২৫১৯৬ জন, ২০১২ সালে হয় ২০০৭৫১৭ জন, ২০১৩ সালে হয় ১৯৬৩৭৪৬ জন[৩], এ ধারা বাংলাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অব্যাহত রয়েছে যা বাংলাদেশের ইসলামী শিক্ষায় নারীর অবস্থানের উন্নয়নে এক বিশাল উত্তরণ বলা যেতে পারে। তাই আমরা বলতে পারি যে নারীদের উন্নয়ন একটি সফল প্রক্রিয়া। বাংলাদেশের মাদ্রাসা সমূহে ব্যালিকা শিক্ষার্থীর এত অধিক সংখ্যক অন্তর্ভুক্তি ইসলামী শিক্ষায় নারীর অবস্থানের উন্নয়নের কথাই জানান দিচ্ছে।

---

১. Bangladesh Education Statistics 2013, ibid, PP. 208-225.
২. Bangladesh Education Statistics 2013, ibid, PP. 208-225.
৩. Bangladesh Education Statistics 2013, ibid, PP. 208-225.

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৪

মাদ্‌রাসার সংখ্যা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ধরন, লিঙ্গ ও পরিচালনার ধরন ভিত্তিক সমীক্ষা, ২০১৩[১]

মাদ্‌রাসার ধরন	ব্যবস্থাপনা	মাদ্‌রাসার সংখ্যা	শিক্ষক			অন্তর্ভুক্তি			TRS	SPI	TPI
			মোট	বালিকা	% বালিকা	মোট	বালিকা	% girls			
দাখিল	প্রাইভেট	৬৫৯৩	৬৩৪৪৩	৭৫৩৯	১১.৮৮	১২৪৭৭২৬	৭৪১৫৯৩	৫৯.৪৪	১:২০	১৮৯	৯.৬২
	সাব-টোটাল	৬৫৯৩	৬৩৪৪৩	৭৫৩৯	১১.৮৮	১২৪৭৭২৬	৭৪১৫৯৩	৫৯.৪৪	১:২০	১৮৯	৯.৬২
আলিম	প্রাইভেট	১৪৭০	২১৫৩৮	২৩৮৯	১১.০৯	৪৩৮২৫৮	২৩৮২১৩	৫৪.৩৩	১:২০	২৯৮	১৪.৬৫
	সাব-টোটাল	১৪৭০	২১৫৩৮	২৩৮৯	১১.০৯	৪৩৮২৫৮	২৩৮২১৩	৫৪.৩৩	১:২০	২৯৮	১৪.৬৫
ফাযিল	প্রাইভেট	১০৫৪	১৮৩০১	১৭৮০	৯.৭৩	৪৪০৮০৫	২০৩১৮৪	৪৬.০৯	১:২৪	৪১৮	১৭.৩৬
	সাব-টোটাল	১০৫৪	১৮৩০১	১৭৮০	৯.৭৩	৪৪০৮০৫	২০৩১৮৪	৪৬.০৯	১:২৪	৪১৮	১৭.৩৬
কামিল	সরকারী	৩	৭০	০	০	৫৫৬৭	৩১৫	৫.৬৬	১:৮০	১৮৫৫	২৩.৩৩
	প্রাইভেট	২১৬	৪৬০৭	৪০২	৮.৭৩	১৬২০৬৪	৪৯০৪০	৩০.২৬	১:৩৫	৭৫০	২১.৩২
	সাব-টোটাল	২১৯	৪৬৭৭	৪০২	৮.৫৯	১৬৭৬৩১	৪৯৩৫৫	২৯.৪৪	১:৩৬	৭৬৫	২১.৩৫
মোট	সরকারী	৩	৭০	০	০	৫৫৬৭	৩১৫	৫.৬৬	১:৮০	১৮৫৫	২১.৩২
	প্রাইভেট	৯৩৩৩	১০৭৮৮৯	১২১১০	১১.২২	২২৮৮৮৫৩	১২৩২০৩০	৫৩.৮২	১:২১	২৪৫	১১.৫৫
	মোট	**৯৩৩৬**	**১০৭৯৫৯**	**১২১১০**	**১১.২২**	**২২৯৪৪২০**	**১২৩২৩৪৫**	**৫৩.৭১**	**১:২১**	**২৪৫**	**১১.৫৬**

সারণি-৫

ইবতেদায়ী মাদ্‌রাসার শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সংখ্যা ও অবস্থান, ২০১৩[২]

মাদ্‌রাসার ধরন	মাদ্‌রাসার সংখ্যা	শিক্ষক			শিক্ষার্থী			গড় শিক্ষক	গড় ছাত্র	শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত
		মোট	বালিকা	% বালিকা	মোট	বালিকা	% বালিকা			
সংযুক্ত ইবতেদায়ী	৯০৫৫	১৪৭৭৯০১	৭৩১৪০১	৪৯.৪৮	৩১২১২	৩৬০৭	১১.৫৫	৩.৪৪	১৬৩	১:৪৭
*স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী	৪৪১৬	৬৭৬৩৯৮	৩৪৪৫৮০	৫০.৯৪	১৯২১০	৩৪৮৮	১৮.১৬	৪.৩৫	১৫৩	১:৩৫

- Independent Ibtedayee data source: Estimated from Independent Ebtedaey Madrasah sample survey, 2010

[১] Bangladesh Education Statistics 2013, ibid, PP. 208-225.
[২] Bangladesh Education Statistics 2013, ibid, PP. 208-225.

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৬

ইবতেদায়ী মাদ্‌রাসার ধরন, গ্রেড ও জেন্ডার সমীক্ষা, ২০১৩[১]

মাদ্‌রাসার ধরন	গ্রেড-0 (প্রি-প্রাইমারী)		গ্রেড-১		গ্রেড-২		গ্রেড-৩		গ্রেড-৪		গ্রেড-৫		মোট	
	মোট	বালিকা	মোট	বালিকা	মোট	বালিকা	মোট	বালিকা	মোট	বালিকা	মোট	বালিকা	মোট	বালিকা
সংযুক্ত ইবতেদায়ী	৫২৩৮৫	২৬৩৬৬	২৯২৮৬৫	১৪৩৪০৪	৩০২৫১৭	১৫০৯০০	৩৩২৫১০	১৬৯২৩৪	১৪৭৭৯০১	৭৩১৪০১	২৬৯৬৪০	১৩১৩৫১	২৮০৩৬৯	১৩৬৫১২
*স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী	৪৬২৮০	২৪২৮৮	১৯১৩০১	৯৬৭১০	৯৯১৩৯	৪৮৭৫৩	৭৬৩০৮	৩৯৬৯৯	৬৭৬৩৯৮	৩৪১৭৫৩	১৪৩৮৭৩	৭১৩৬২	১১৯৪৯৭	৬০৯৪১

* Independent Ibtedayee data source: Estimated from Independent Ebtedaey Madrasah sample survey, 2010

সারণি-৭

ছাত্র-শিক্ষক (পোস্ট-প্রাইমারী) অনুপাত মাদ্‌রাসার ধরন ও ব্যবস্থাপনা সমীক্ষা,[২]

মাদ্‌রাসার ধরন	ব্যবস্থাপনা	মাদ্‌রাসার সংখ্যা	গড় শিক্ষক	গড় ছাত্র	শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত
দাখিল	বেসরকারী	৬৫৯৩	৬৩৪৪৩	১২৪৭৭২৬	১:২০
	সাব-টোটাল	৬৫৯৩	৬৩৪৪৩	১২৪৭৭২৬	১:২০
আলিম	বেসরকারী	১৪৭০	২১৫৩৮	৪৩৮২৫৮	১:২০
	সাব-টোটাল	১৪৭০	২১৫৩৮	৪৩৮২৫৮	১:২০
ফাযিল	বেসরকারী	১০৫৪	১৮৩০১	৪৪০৮০৫	১:২৪
	সাব-টোটাল	১০৫৪	১৮৩০১	৪৪০৮০৫	১:২৪
কামিল	সরকারী	৩	৭০	৫৫৬৭	১:৮০
	বেসরকারী	২১৬	৪৬০৭	১৬২০৬৪	১:৩৫
	সাব-টোটাল	২১৯	৪৬৭৭	১৬৭৬৩১	১:৩৬
মোট	সরকারী	৩	৭০	৫৫৬৭	১:৮০
	বেসরকারী	৯৩৩৩	১০৭৮৮৯	২২৮৮৮৫৩	১:২১
	মোট	**৯৩৩৬**	**১০৭৯৫৯**	**২২৯৪৪২০**	**১:২১**

সারণি-৮মাদ্‌রাসার সংখ্যা, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সংখ্যা, (এলাকা ও লিঙ্গভিত্তিক), ২০১৩[৩]

	ব্যবস্থাপনা	এলাকার পরিচয়	মোট শিক্ষা	শিক্ষক	শিক্ষার্থী

১. Bangladesh Education Statistics 2013, ibid, PP. 208-225.
২. Bangladesh Education Statistics 2013, ibid, PP. 208-225.
৩. Bangladesh Education Statistics 2013, ibid, PP. 208-225.

Dhaka University Institutional Repository

মাদ্‌রাসার ধরন			প্রতিষ্ঠান	মোট	বালিকা	মোট	বালিকা
দাখিল মাদ্‌রাসা	বেসরকারী	পল্লী	৫৯৫০	৫৭১২৬	৬৩৬০	১১৩১৭৩৫	৬৭২৯৩১
		জেলা সদর পৌরসভা	১০২	১০২৩	২১৩	১৬৬৯৮	৯৫২৪
		উপজেলা সদর পৌরসভা	২৬৮	২৬০৪	৫০৪	৪৮৫৫৮	৩১০৬৫
		উপজেলা সদর তবে পৌরসভা নয়	১৪৬	১৩৮৮	২০৩	২৯১১১	১৭৮৪১
		মেট্রোপলিটন শহর	৬৮	৭৩৫	১৬৫	১৩২৬২	৫৭৩৫
		অন্যান্য পৌর এলাকা	৫৯	৫৬৭	৯৪	৮৩৬২	৪৪৯৭
		সাব-টোটাল	**৬৫৯৩**	**৬৩৪৪৩**	**৭৫৩৯**	**১২৪৭৭২৬**	**৭৪১৫৯৩**
আলিম মাদ্‌রাসা	বেসরকারী	পল্লী	১২৩৪	১৮০১১	১৮০৫	৩৬৭৪০১	২০৪১৪৬
		জেলা সদর পৌরসভা	৩১	৪৪৮	১১০	৮৪৭৬	৩৯৫৬
		উপজেলা সদর পৌরসভা	৯৬	১৪৪৯	২১১	৩০২৫০	১৫৫৮৪
		উপজেলা সদর তবে পৌরসভা নয়	৬২	৯২৫	১০৯	১৯২৫৩	৯২৩৮
		মেট্রোপলিটন শহর	৩৭	৫৪৮	১২৩	১০২৯৪	৩৬২৩
		অন্যান্য পৌর এলাকা	১০	১৫৭	৩১	২৫৮১	১৬৬৬
		সাব-টোটাল	**১৪৭০**	**২১৫৩৮**	**২৩৮৯**	**৪৩৮২৫৮**	**২৩৮২১৩**
ফাযিল মাদ্‌রাসা	বেসরকারী	পল্লী	৮৪৬	১৪৪৯৭	১২০২	৩৪৪৬৬৮	১৬০৭৯১
		জেলা সদর পৌরসভা	২৬	৪৭৪	১০৪	১০৮০৩	৪৩১১
		উপজেলা সদর পৌরসভা	১১০	২০২০	২৮৫	৫২৮৩২	২৪৮৫৪
		উপজেলা সদর তবে পৌরসভা নয়	৪২	৭৮৫	৯২	১৯১১৬	৮৪৭৫
		মেট্রোপলিটন শহর	২০	৩২৫	৬৮	৮৩৪৫	২৬২৪
		অন্যান্য পৌর এলাকা	১০	২০০	২৯	৫০৪১	২১২৯
		সাব-টোটাল	**১০৫৪**	**১৮৩০১**	**১৭৮০**	**৪৪০৮০৫**	**২০৩১৮৪**
কামিল মাদ্‌রাসা	বেসরকারী	পল্লী	৮৯	১৮২২	১১১	৫৪২৬২	১৭৯১৮
		জেলা সদর	৩৯	৮৩৮	৮০	৩৩০৪৬	৯২৭৩

Dhaka University Institutional Repository

		পৌরসভা					
		উপজেলা সদর, পৌরসভা	৪৪	৯৪৮	৮১	৩৬৩৯৬	১৪০০১
		উপজেলা সদর তবে পৌরসভা নয়	৪	৮১	৬	৪৭৫১	১০৬৩
		মেট্রোপলিটন শহর	৩৪	৭৭৫	১০৬	২৯৫৮২	৫৩৬২
		অন্যান্য পৌর এলাকা	৬	১৪৩	১৮	৪০২৭	১৪২৩
		সাব-টোটাল	**২১৬**	**৪৬০৭**	**৪০২**	**১৬২০৬৪**	**৪৯০৪০**

মাদ্রাসার ধরন	**ব্যবস্থাপনা**	**এলাকার পরিচয়**	**মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান**	**শিক্ষক**		**শিক্ষার্থী**	
				মোট	**বালিকা**	**মোট**	**বালিকা**
কামিল মাদ্রাসা	সরকারী/পাবলিক	জেলা সদর পৌরসভা	১	১৭	০	১২৪১	২৭৭
		মেট্রোপলিটন শহর	২	৫৩	০	৪৩২৬	৩৮
		সাব-টোটাল	**৩**	**৭০**	**০**	**৫৫৬৭**	**৩১৫**
		মোট	**২১৯**	**৪৬৭৭**	**৪০২**	**১৬৭৬৩১**	**৪৯৩৫৫**
সমস্ত মাদ্রাসা শিক্ষা	বেসরকারী	পল্লী	৮১১৯	৯১৪৫৬	৯৪৭৮	১৮৯৮০৬৬	১০৫৫৭৮৬
		জেলা সদর পৌরসভা	১৯৮	২৭৮৩	৫০৭	৬৯০২৩	২৭০৬৪
		উপজেলা সদর পৌরসভা	৫১৮	৭০২১	১০৮১	১৬৮০৩৯	৮৫৫০৪
		উপজেলা সদর তবে পৌরসভা নয়	২৫৪	৩১৭৯	৪১০	৭২২৩১	৩৬৬১৭
		মেট্রোপলিটন শহর	১৫৯	২৩৮৩	৪৬২	৬৭৪৮৩	১৭৩৪৪
		অন্যান্য পৌর এলাকা	৮৫	১০৬৭	১৭২	২০০১১	৯৭১৫
		সাব-টোটাল	**৯৩৩৩**	**১০৭৮৮৯**	**১২১১০**	**২২৮৮৮৫৩**	**১২৩২০৩০**
	সরকারী/পাবলিক	জেলা সদর,পৌরসভা	১	১৭	০	১২৪১	২৭৭
		মেট্রোপলিটন শহর	২	৫৩	০	৪৩২৬	৩৮
		সাব-টোটাল	**৩**	**৭০**	**০**	**৫৫৬৭**	**৩১৫**
		সর্বোমোট	**৯৩.৩৬**	**১০৭৯৫৯**	**১২১১০**	**২২৯৪৪২০**	**১২৩২৩৪৫**

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৯

জেলাভিত্তিক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী (লিঙ্গভিত্তিক), ২০১৩[১]

জেলা	শিক্ষা স্তর	ব্যবস্থাপনার ধরন	মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	বালিকা/মহিলা প্রতিষ্ঠান	মোট শিক্ষক	মহিলা শিক্ষক	মোট ছাত্র	বালিকা শিক্ষার্থী
বরগুনা	দাখিল	প্রাইভেট	৯২	১০	৮৬১	৫৪	১৫৬২৯	৮৭৮৭
	আলিম	প্রাইভেট	২৬	৩	৩৬৪	১৫	৬২৫৪	৩৪৮১
	ফাযিল	প্রাইভেট	৯	০	১৫৬	২	৩৩৮৩	১৩৯২
	কামিল	প্রাইভেট	৩	০	৬০	০	১৮০৬	৩০৮
মোট			১৩০	১৩	১৪৪১	৭১	২৭০৭২	১৩৯৬৮
বরিশাল	দাখিল	প্রাইভেট	১৪৭	২৯	১২৯২	১৬৩	২৮৪০২	১৮৩২৯
	আলিম	প্রাইভেট	৫১	৬	৭৩৯	৯৮	১৩৬৬৫	৭৮৪৫
	ফাযিল	প্রাইভেট	৩৬	০	৫৫৯	৩৯	১৪০৭৯	৭০৫৫
	কামিল	প্রাইভেট	৪	০	১০২	১	৪২৯২	৮১৬
মোট			২৩৮	৩৫	২৬৯২	৩০১	৬০৪৩৮	৩৪০৫৪
ভোলা	দাখিল	প্রাইভেট	১৭০	৪৫	১৫৭১	১২৬	৩৬৬০১	২৫৪২১
	আলিম	প্রাইভেট	৩৩	৭	৪৩৩	৩০	১১০৪৬	৭৩৬৭
	ফাযিল	প্রাইভেট	২৯	০	৪৯২	১৭	১১৫৮২	৬২৬৩
	কামিল	প্রাইভেট	৫	১	১২৩	৮	৪১৮১	১৮৫৩
মোট			২৩৭	৫৩	২৬১৯	১৮১	৬৩৪১০	৪০৯০৪
ঝালকাঠি	দাখিল	প্রাইভেট	৮৪	১২	৭৮৯	৭৬	১৩২৭১	৭৪৩৮
	আলিম	প্রাইভেট	২১	৩	২৭৫	৩০	৫৩৭৪	২৮২০
	ফাযিল	প্রাইভেট	১৭	০	২৮০	১৩	৪৭৯০	১৩৭৯
	কামিল	প্রাইভেট	১	০	৩৩	০	১৭৪২	০
মোট			১২৩	১৫	১৩৭৭	১১৯	২৫১৭৭	১১৬৩৭
পটুয়াখালি	দাখিল	প্রাইভেট	২০৫	৪৭	১৮৫৩	১৩৭	৩৬১৫৭	২২৬১৪
	আলিম	প্রাইভেট	৪১	২	৫৮২	২৪	১১৬৭৯	৬৩২৬
	ফাযিল	প্রাইভেট	২৫	১	৪২৬	১৫	৮৮১৪	৩৯৭৪
	কামিল	প্রাইভেট	২	০	৪৩	১	১২০৪	২৮৩
মোট			২৭৩	৫০	২৯০৪	১৭৭	৫৭৮৫৪	৩৩১৯৭
পিরোজপুর	দাখিল	প্রাইভেট	১২০	২৩	১০৭৯	৯৮	১৯৪৯৩	১১৪৬৬
	আলিম	প্রাইভেট	৩১	৫	৪৪৪	৪৫	৮২৯৪	৫০৯৩
	ফাযিল	প্রাইভেট	১৭	০	২৭৯	৫	৫২১৮	২০৭১

[১] Bangladesh Education Statistics 2013, ibid, PP. 208-225.

Dhaka University Institutional Repository

জেলা	শিক্ষা স্তর	ব্যবস্থাপনার ধরন	মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	বালিকা/মহিলা প্রতিষ্ঠান	মোট শিক্ষক	মহিলা শিক্ষক	মোট ছাত্র	বালিকা শিক্ষার্থী
	কামিল	প্রাইভেট	৪	১	১০১	২	৩৫১০	১০৫৭
মোট			১৭২	২৯	১৯০৩	১৫০	৩৬৫১৫	১৯৬৮৭
বান্দরবান	দাখিল	প্রাইভেট	৯	১	৮২	১১	১৯৯৫	১২১৮
	আলিম	প্রাইভেট	১	০	১৩	২	২৩৪	৯৯
	ফাযিল	প্রাইভেট	১	০	১৮	০	৪৫২	২৩৫
মোট			১১	১	১১৩	১৩	২৬৮১	১৫৫২
বি-বাড়িয়া	দাখিল	প্রাইভেট	৬৩	৪	৫৬৬	৮২	১৪৭৪৬	৯১১৯
	আলিম	প্রাইভেট	২১	১	৩৪০	৩২	৮১১৩	৪২৭৬
	ফাযিল	প্রাইভেট	৪	০	৭১	৬	২২৭৪	১০৫৩
	কামিল	প্রাইভেট	৩	০	৪৬	৫	১৬৬৭	৬৭১
মোট			৯১	৫	৯৮৭	১২৫	২৬৮০৯	১৫১১৯
চাঁদপুর	দাখিল	প্রাইভেট	১০৬	২৩	৯০৪	৮৭	২৩৩৭৬	১৫৪৭৬
	আলিম	প্রাইভেট	৪০	২	৫৩৩	৩৯	১৩৯১০	৮১৯১
	ফাযিল	প্রাইভেট	৫০	১	৭৬৭	৩৫	২১৮২৪	১১৫২৭
	কামিল	প্রাইভেট	৬	০	১০৩	৩	৩৫৪০	৮৯৭
মোট			২০২	২৬	২৩০৭	১৬৪	৬২৬৫০	৩৬০৯১
চট্রগ্রাম	দাখিল	প্রাইভেট	২১১	২৮	১৭১৫	২০১	৪৩১৭৭	২৪২৭৬
	আলিম	প্রাইভেট	৪৭	৪	৫৯৬	৬৩	১৫০২৩	৭৩৮২
	ফাযিল	প্রাইভেট	৬২	১	৯৪৪	৪২	৩০৫০৯	১৩৬৯৯
	কামিল	প্রাইভেট	১৮	০	৩৩৪	১৩	১৪০৫৪	২০১৩
মোট			৩৪৮	৩৩	৩৫৮৯	৩১৯	১০২৭৬৩	৪৭৩৭০
কুমিল্লা	দাখিল	প্রাইভেট	২৩৬	৫৬	২০৪৪	২৬১	৫৪১৩৩	৩৭৮৩৫
	আলিম	প্রাইভেট	৭৫	৫	১০১৯	১১৯	২৮৮০৭	১৭৪৬৭
	ফাযিল	প্রাইভেট	৬৩	০	৯৪২	৬৮	৩৩৯৫৫	১৩৫১৮
	কামিল	প্রাইভেট	১০	০	১৮০	১৬	৬৭৪৭	২০৮৩
মোট			৩৮৪	৬১	৪১৮৫	৪৬৪	১২৩৬৪২	৭০৯০৩
কক্সবাজার	দাখিল	প্রাইভেট	১০৯	৩০	৯৮৪	১১৭	২৯৭২৯	২০৯১৮
	আলিম	প্রাইভেট	১৯	২	২৫৫	৬	৮৩৫০	৫১০৪
	ফাযিল	প্রাইভেট	১৩	০	২১৩	৩	১০২৪৮	৫৯০২
	কামিল	প্রাইভেট	৩	২	৬৪	১২	৩১০৪	২০৫৯
মোট			১৪৪	৩২	১৫১৬	১৩৮	৫১৪৩১	৩৩৯৮৩
ফেনী	দাখিল	প্রাইভেট	৮৪	১১	৭০৭	৭০	১৬১৫৩	৮৭১৫

Dhaka University Institutional Repository

জেলা	শিক্ষা স্তর	ব্যবস্থাপনার ধরন	মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	বালিকা/মহিলা প্রতিষ্ঠান	মোট শিক্ষক	মহিলা শিক্ষক	মোট ছাত্র	বালিকা শিক্ষার্থী
	আলিম	প্রাইভেট	২২	২	২৯৫	২১	৮৩৪২	৪৫১২
	ফাযিল	প্রাইভেট	১৪	০	২২০	৭	৮৩৮৫	৩৫১৩
	কামিল	প্রাইভেট	২	০	৪৪	০	৩৪২২	৬৯৯
মোট			১২২	১৩	১২৬৬	৯৮	৩৬৩০২	১৭৪৩৯
খাগড়াছড়ি	দাখিল	প্রাইভেট	১৫	০	৯৬	৯	১৯১৯	১০০৬
	আলিম	প্রাইভেট	৬	০	৬৯	৪	২১১৫	১১৭৭
মোট			২১	০	১৬৫	১৩	৪০৩৪	২১৮৩
লক্ষীপুর	দাখিল	প্রাইভেট	৯৩	২৩	৭৮১	৬৩	২৫৮৬৮	১৫১৯৫
	আলিম	প্রাইভেট	২৪	০	৩৩২	১৮	৯০৫০	৫৩১৩
	ফাযিল	প্রাইভেট	১৮	১	২৮০	১৩	৯৭৪০	৪৭৭২
	কামিল	প্রাইভেট	৭	১	৯৮	৭	৬৫১৯	৩৫৯৪
মোট			১৪২	২৫	১৪৯১	১০১	৫১১৭৭	২৮৮৭৪
নোয়াখালি	দাখিল	প্রাইভেট	১১৫	২৬	১০৪২	১০৩	২৯০১৬	১৯০৪২
	আলিম	প্রাইভেট	৩৫	৬	৫৬১	৩৯	১৩৭৭৬	৮৬৭০
	ফাযিল	প্রাইভেট	২৮	০	৪৫৬	১৮	১৪৬৬৮	৭২৮৬
	কামিল	প্রাইভেট	৭	০	১১৭	৩	৫৫৩১	১৮১১
মোট			১৮৫	৩২	২০৭৬	১৬৩	৬২৯৯১	৩৬৮০৯
রাঙামাটি	দাখিল	প্রাইভেট	১২	০	১১৬	১০	২১৩৪	৯৬৬
	আলিম	প্রাইভেট	২	০	১৯	১	৫৭২	২৬৭
	ফাযিল	প্রাইভেট	১	০	১৬	১	২১৯	৭৭
মোট			১৫	০	১৫১	১২	২৯২৫	১৩১০
ঢাকা	দাখিল	প্রাইভেট	৬০	৬	৬০৪	৭৪	১০৫৫৪	৪৮৯২
	আলিম	প্রাইভেট	২৯	২	৪২৮	৮৭	৭৭০৬	২৮১৮
	ফাযিল	প্রাইভেট	১১	০	১৮৪	২১	৩৫৮৩	৯৫৪
	কামিল	প্রাইভেট	১৬	৪	৩২৪	৬১	১২১৫৪	২৭৫৩
	দাখিল	প্রাইভেট	১	০	৩১	০	৩৩২৫	০
মোট		প্রাইভেট	১১৭	১২	১৫৭১	২৪৩	৩৭৩২২	১১৪১৭
ফরিদপুর	দাখিল		৫৮	২	৫৩৮	৭০	১২১২৮	৭৪৬৮
	আলিম	প্রাইভেট	১৭	০	২৫৫	২৩	৫৬৫৬	৩২৭৭
	ফাযিল	প্রাইভেট	৮	০	১৫৪	৭	৩৬০৩	১৭৭৭
	কামিল	প্রাইভেট	২	১	৪২	১০	৮৮২	৩৯২
মোট			৮৫	৩	৯৮৯	১১০	২২২৬৯	১২৯১৪

Dhaka University Institutional Repository

জেলা	শিক্ষা স্তর	ব্যবস্থাপনার ধরন	মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	বালিকা/মহিলা প্রতিষ্ঠান	মোট শিক্ষক	মহিলা শিক্ষক	মোট ছাত্র	বালিকা শিক্ষার্থী
গাজীপুর	দাখিল	প্রাইভেট	১১২	৩৮	১১১১	১৯১	১৮৯৯১	১২২২৯
	আলিম	প্রাইভেট	৩৬	৫	৫৪৯	৮৩	৮২৭৫	৪৫৩৬
	ফাযিল	প্রাইভেট	২৬	১	৪৯২	৬৫	৭৮৫৮	৩৪২১
	কামিল	প্রাইভেট	২	০	৭৯	০	৪৭৫১	৭৩৩
মোট			১৭৭	৪৪	২২৩১	৩৩৯	৩৯৮৭৫	২০৯১৯
গোপালগঞ্জ	দাখিল	প্রাইভেট	২৩	৫	২২৪	২০	৪০৪৮	২৬৭৭
	আলিম	প্রাইভেট	৯	২	১২৪	২০	২৩১০	১৪৮৮
	ফাযিল	প্রাইভেট	১১	২	১৮৮	২৬	৫৩৭৯	৩২৪৫
	কামিল	প্রাইভেট	২	০	৩৬	০	৯৮০	১৬৫
মোট			৪৫	৯	৫৭২	৬৬	১২৭১৭	৭৫৭৫
জামালপুর	দাখিল	প্রাইভেট	১৩৭	২১	১৪৪০	২১৩	২৬৪৫১	১৪৮২৫
	আলিম	প্রাইভেট	২২	১	৩৩৬	৪৪	৭২১১	৩৬৭৭
	ফাযিল	প্রাইভেট	১৩	১	২৪৭	৪৫	৫৩৬৬	২১৩৩
	কামিল	প্রাইভেট	৪	০	৯৬	৮	৩০১২	৮৫১
মোট			১৭৬	২৩	২১১৯	৩১০	৪২০৪০	২১৪৮৬
কিশোরগঞ্জ	দাখিল	প্রাইভেট	১০২	২০	৯৬৭	১৪৫	২২১৪৮	১৪৬৩৩
	আলিম	প্রাইভেট	২৬	১	৩৭৮	৫৫	৯৮৭৮	৫৬৬৪
	ফাযিল	প্রাইভেট	১৫	১	২৫০	৪৩	৬৯৬৫	৩৭১২
	কামিল	প্রাইভেট	২	০	৪৭	৩	১৫৮৯	৬০৯
মোট			১৪৫	২২	১৬৪২	২৪৬	৪০৫৮০	২৪৬১৮
মাদারীপুর	দাখিল	প্রাইভেট	৪৪	৫	৩৮৭	৩৬	৯১৭৯	৬৪০২
	আলিম	প্রাইভেট	১২	১	১৬১	১৩	৩৩৯৫	২১২০
	ফাযিল	প্রাইভেট	১১	০	১৬৭	৮	৩৮৭০	১৯৮১
	কামিল	প্রাইভেট	২	০	৩৬	৩	৫৮৪	১৫৩
মোট			৬৯	৬	৭৫১	৬০	১৭০২৮	১০৬৫৬
মানিকগঞ্জ	দাখিল	প্রাইভেট	২৩	২	২১৪	১৯	৪৩২২	২৪৮৬
	আলিম	প্রাইভেট	৫	০	৭৬	৮	১৩৬৪	৭১২
	ফাযিল	প্রাইভেট	১	০	১৮	১	৪৯৪	১৬২
মোট			২৯	২	৩০৮	২৮	৬১৮০	৩৩৬০
মুন্সিগঞ্জ	দাখিল	প্রাইভেট	২৫	১	২২১	২২	৪২৬৯	২৪৯৩
	আলিম	প্রাইভেট	১১	১	১৬০	২৪	৩২৩৫	১৬৯৫
	ফাযিল	প্রাইভেট	১	০	১৬	২	২৭৯	১২৬

Dhaka University Institutional Repository

জেলা	শিক্ষা স্তর	ব্যবস্থাপনার ধরন	মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	বালিকা/মহিলা প্রতিষ্ঠান	মোট শিক্ষক	মহিলা শিক্ষক	মোট ছাত্র	বালিকা শিক্ষার্থী
	কামিল	প্রাইভেট	১	০	২২	০	৪১৫	১২৫
মোট			৩৮	২	৪১৯	৪৮	৮১৯৮	৪৪৩৯
ময়মনসিং	দাখিল	প্রাইভেট	২৯১	৬৪	২৮৮৭	৪১৫	৬০৫৪৬	৩৮২৮৫
	আলিম	প্রাইভেট	৪১	৩	৬২৯	৯১	১৪৮২২	৮৯৫৬
	ফাযিল	প্রাইভেট	৪৯	৩	৮১৩	১২১	২৩৬০৯	১২২৯৭
	কামিল	প্রাইভেট	৫	০	১০৯	১৯	৫০৩৪	২১৭০
মোট			৩৮৬	৭০	৪৪৩৮	৬৪৬	১০৪০১১	৬১৭০৮
নারায়নগঞ্জ	দাখিল	প্রাইভেট	৩১	৫	২৮২	৪২	৫৮১৬	৩৭২৪
	আলিম	প্রাইভেট	২৫	৩	৩৬৭	৫৪	৭৩৮৫	৩৬৫৯
	ফাযিল	প্রাইভেট	১১	০	২০০	২৭	৫২৪৪	২৪৬২
	কামিল	প্রাইভেট	১	০	১৭	০	৪০৫	১৫০
মোট			৬৮	৮	৮৬৬	১২৩	১৮৮৫০	৯৯৯৫
নরসিংদি	দাখিল	প্রাইভেট	৫৮	৯	৫৬২	৯২	১২৬৭৪	৭৯৭৭
	আলিম	প্রাইভেট	১৩	১	১৮৯	২১	৩৫৪৭	২১১৫
	ফাযিল	প্রাইভেট	১৭	০	২৯০	৫৩	৫৭৬৮	২৭১৯
	কামিল	প্রাইভেট	২	১	৫০	৯	১৫৩৭	৪৮৫
মোট			৯০	১১	১০৯১	১৭৫	২৩৫২৬	১৩২৯৬
নেত্রকোনা	দাখিল	প্রাইভেট	৬১	২	৫৬৮	৬৪	১৫৫৩৪	৯০১৫
	আলিম	প্রাইভেট	১৮	১	২৬৫	৩২	৬১৮৪	৩৩১৮
	ফাযিল	প্রাইভেট	৯	০	১৩৪	১৭	৪৫৮৩	২৫৮০
	কামিল	প্রাইভেট	১	০	২৪	২	৮০১	২৮৬
মোট			৮৯	৩	৯৯১	১১৫	২৭১০২	১৫১৯৯
রাজবাড়ী	দাখিল	প্রাইভেট	৫৩	৯	৫২৪	৭৯	৯২৯	৬১৪১
	আলিম	প্রাইভেট	৭	০	১১০	১৫	২০৭৪	১৩১৯
	ফাযিল	প্রাইভেট	১১	১	১৯৭	১৭	৪০৩৮	১৯৭১
	কামিল	প্রাইভেট	৩	০	৬৪	৭	২০৬৭	৯৭৩
মোট			৭৪	১০	৮৯৫	১১৮	১৭৯০৮	১০৪০৪
শরীয়তপুর	দাখিল	প্রাইভেট	৪২	৫	৩৪০	৩০	৯৬৩৪	৬৩২৭
	আলিম	প্রাইভেট	৮	০	১১১	৫	৩৯৬৬	২৫১৮
	ফাযিল	প্রাইভেট	৭	০	১০২	৭	২৮১১	১৫৬১
	কামিল	প্রাইভেট	১	০	২২	০	৭৮২	৩০৬
মোট			৫৮	৫	৫৭৫	৪২	১৭১৯৩	১০৭১২

Dhaka University Institutional Repository

জেলা	শিক্ষা স্তর	ব্যবস্থাপনার ধরন	মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	বালিকা/মহিলা প্রতিষ্ঠান	মোট শিক্ষক	মহিলা শিক্ষক	মোট ছাত্র	বালিকা শিক্ষার্থী
শেরপুর	দাখিল	প্রাইভেট	৭৮	৫	৮১১	১১৮	১৫৪৯৯	৮৫৩৪
	আলিম	প্রাইভেট	১৪	১	১৮৪	৩১	৩৮৩৫	১৯৮৮
	ফাযিল	প্রাইভেট	৮	০	১৪১	২৪	৩৬২২	১৪৫৬
	কামিল	প্রাইভেট	১	০	২৬	৩	৭৬৬	২৯৭
মোট			১০১	৬	১১৬২	১৭৬	২৩৭২২	১২২৭৫
টাঙ্গাইল	দাখিল	প্রাইভেট	১৮৯	১২	১৭৭৭	২০৮	৩২৭২৪	১৮৩১৯
	আলিম	প্রাইভেট	২৩	২	৩৪০	৩৪	৬৩১১	৩৩০০
	ফাযিল	প্রাইভেট	২৬	০	৪৪৩	৪২	১০২৭০	৪৭৩৫
	কামিল	প্রাইভেট	৩	০	৭৩	৭	২৩৩১	৮০৪
মোট			২৩১	১৪	২৬৩৩	২৯১	৫১৬৩৬	২৭১৫৮
বাগেরহাট	দাখিল	প্রাইভেট	১১১	২০	১০৬১	১১১	১৮৫৮১	১১১৪০
	আলিম	প্রাইভেট	৩৪	০	৪৯৬	৩০	৯২৮৩	৪৩০৫
	ফাযিল	প্রাইভেট	১৬	০	২৫৬	১৭	৫৭৫৬	২৬৩৮
	কামিল	প্রাইভেট	৩	০	৫৭	৩	১২৫৯	৩৭৫
মোট			১৬৪	২০	১৮৭০	১৬১	৩৪৮৭৯	১৮৪৫৮
চুয়াডাঙ্গা	দাখিল	প্রাইভেট	৩০	৫	২৭৮	৪৬	৬৩২৬	৩৭৮৪
	আলিম	প্রাইভেট	৩	০	৪৯	৩	৮৬৫	৩১০
	ফাযিল	প্রাইভেট	৫	০	৯৮	৬	২৬২৩	৮৩৬
	কামিল	প্রাইভেট	১	০	২২	০	৫৩২	১০০
মোট			৩৯	৫	৪৪৭	৫৫	১০৩৪৬	৫০৩০
যশোর	দাখিল	প্রাইভেট	২১৮	৫০	২২২০	২৯০	৩৩০৭৪	২১৫০৭
	আলিম	প্রাইভেট	৫৭	১৫	৮৫৭	৯৯	১২৬৪২	৮১৯৯
	ফাযিল	প্রাইভেট	২৮	২	৫৪২	৫৩	৯০৬২	৪১৫৭
	কামিল	প্রাইভেট	৬	০	১২১	১১	৩৩৭৭	১১৪৪
মোট			৩০৯	৬৭	৩৭৪০	৪৫৩	৫৮১৫৫	৩৫০০৭
ঝিনাইদহ	দাখিল	প্রাইভেট	৮৮	৪	৮৯৭	৮৯	১৭৮৯৪	১০০৮৩
	আলিম	প্রাইভেট	১৬	১	২৩৫	২৫	৫১৬২	২৮৪৮
	ফাযিল	প্রাইভেট	৬	০	১০৬	১০	২৫২৫	১০২২
	কামিল	প্রাইভেট	২	০	৩৮	১২	১৪৮৯	৫১৮
মোট			১১২	৫	১২৭৬	১৩৬	২৭০৭০	১৪৪৭১
খুলনা	দাখিল	প্রাইভেট	৯৭	২১	৯২৮	১২৫	১৫০৯৩	৮৯৮৬
	আলিম	প্রাইভেট	১৯	০	২৯৪	২৩	৪৬৭৫	২১৬৬

Dhaka University Institutional Repository

জেলা	শিক্ষা স্তর	ব্যবস্থাপনার ধরন	মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	বালিকা/মহিলা প্রতিষ্ঠান	মোট শিক্ষক	মহিলা শিক্ষক	মোট ছাত্র	বালিকা শিক্ষার্থী
	ফাযিল	প্রাইভেট	১১	১	২০৩	২২	৪১১১	১৭৯৩
	কামিল	প্রাইভেট	৫	১	১১৪	২	২৯৫৬	৭৭১
মোট			১৩২	২৩	১৫৩৯	১৭৪	২৬৮৩৫	১৩৭১৬
কুষ্টিয়া	দাখিল	প্রাইভেট	৫৭	২	৫৭৭	৯১	৯৫১৪	৫১৫৫
	আলিম	প্রাইভেট	১১	২	১৫৯	১৮	২২১২	১১২২
	ফাযিল	প্রাইভেট	৬	১	১০৯	১৭	২৪৯৪	১২৬৬
	কামিল	প্রাইভেট	২	০	৪০	৯	১০৪৬	২২৭
মোট			৭৬	৫	৮৮৫	১৩৫	১৫২৬৬	৭৭৭০
মাগুরা	দাখিল	প্রাইভেট	৫৫	৬	৫৫৫	৬৮	১০২৫৬	৫৮৫৮
	আলিম	প্রাইভেট	১৩	১	২০০	২৮	৪২৩৬	২৩১৩
	ফাযিল	প্রাইভেট	৫	০	৯৫	১০	২৩০৩	১০৭৪
	কামিল	প্রাইভেট	১	০	২২	০	৯৯৭	৩১১
মোট			৭৪	৭	৮৭২	১০৬	১৭৭৯২	৯৫৫৬
মেহেরপুর	দাখিল	প্রাইভেট	২১	১	২০৫	৩৫	৩৭৩৬	১৯৭১
	আলিম	প্রাইভেট	৩	০	৪৭	৫	৭৩৭	২৭২
	ফাযিল	প্রাইভেট	২	০	৩৩	১	৮৪৫	৩৪৪
মোট			২৬	১	২৮৫	৪১	৫৩১৮	২৫৮৭
নড়াইল	দাখিল	প্রাইভেট	৩৫	৩	৩১৭	৪২	৫৬৯৪	৩০১৯
	আলিম	প্রাইভেট	৭	০	১০৮	১৫	১৭১৪	৭৪৮
	ফাযিল	প্রাইভেট	২	০	৩৭	৩	১০৪১	৩৭২
	কামিল	প্রাইভেট	১	০	২৬	০	৮৪০	২৮০
মোট			৪৫	৩	৪৮৮	৬০	৯২৮৯	৪৪১৯
সাতক্ষীরা	দাখিল	প্রাইভেট	১৬৭	২৭	১৬৩৫	১৫৩	৩৩৪৩৫	২১৫৩৯
	আলিম	প্রাইভেট	২৬	৩	৩৮৬	২৪	৮৭৮২	৫০৭৭
	ফাযিল	প্রাইভেট	১৯	০	৩৪০	১৬	৮২১৭	৩৬১০
	কামিল	প্রাইভেট	৩	০	৬৩	৪	২২৬২	৬২৭
মোট			২১৫	৪০	২৪২৪	১৯৭	৫২৬৯৬	৩০৮৫৩
বগুড়া	দাখিল	প্রাইভেট	২২০	২৯	২২৫৯	৩৫৯	৩৯৩২৫	২১৫৪১
	আলিম	প্রাইভেট	৪৪	২	৭০৩	১১৮	১২০২৬	৫৬৪৬
	ফাযিল	প্রাইভেট	৩৯	১	৭২৭	১০৮	১৪৯২৭	৬৩৫১
	কামিল	প্রাইভেট	৫	০	১০০	১১	২৭২২	১০৮৯
	কামিল	প্রাইভেট	১	০	১৭	০	১২৪১	২৭৭

Dhaka University Institutional Repository

জেলা	শিক্ষা স্তর	ব্যবস্থাপনার ধরন	মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	বালিকা/মহিলা প্রতিষ্ঠান	মোট শিক্ষক	মহিলা শিক্ষক	মোট ছাত্র	বালিকা শিক্ষার্থী
মোট			৩০৯	৩২	৩৮০৬	৫৯৬	৭০২৪১	৩৪৯০৪
জয়পুরহাট	দাখিল	প্রাইভেট	৮২	৮	৯০২	১১০	১৬১৬৮	৭০৫৪
	আলিম	প্রাইভেট	১৫	১	২৫৩	৪২	৩৬২০	১৬৬৪
	ফাযিল	প্রাইভেট	১১	১	২২৯	২৩	৩৬২৯	১৭৮৩
	কামিল	প্রাইভেট	৫	০	১২৮	১৫	৩৮৭৩	১২৭৮
মোট			১১৩	১০	১৫১২	১৯০	২৭২৯০	১১৭৭৯
নওগাঁ	দাখিল	প্রাইভেট	২০৩	১৫	২০৭৫	২০৯	৩০৮৫৬	১৭৩৪৭
	আলিম	প্রাইভেট	৪২	২	৬৬০	৭১	৮৭৮৯	৪৬৬৫
	ফাযিল	প্রাইভেট	৩২	১	৬৪৪	৭৩	৯৯৬০	৫১২১
	কামিল	প্রাইভেট	৩	০	৮৪	৭	১৯৭৯	৪৮২
মোট			২৮০	১৮	৩৪৬৩	৩৬০	৫১৫৮৪	২৭৬১৫
নাটোর	দাখিল	প্রাইভেট	৮৩	৬	৮৭৫	১৩৩	১৪১৩২	৭৭৫৯
	আলিম	প্রাইভেট	১৫	০	২৪৯	৩৯	৩২৯২	১৭৫১
	ফাযিল	প্রাইভেট	১০	০	১৯৩	২৮	৩৫১৬	১৪৬৩
	কামিল	প্রাইভেট	১	০	২৬	০	৬৮৪	২৫২
মোট			১০৯	৬	১৩৪৩	২০০	২১৬২৪	১১২২৫
নবাবগঞ্জ	দাখিল	প্রাইভেট	৯৮	১০	১০৪৫	১৩৭	২০১০৬	১২১০১
	আলিম	প্রাইভেট	২১	০	৩৪৭	৩৭	৫৬৬৯	২৮৫১
	ফাযিল	প্রাইভেট	১২	১	২৫২	৫৫	৪৬৫৯	২১৭৮
	কামিল	প্রাইভেট	৩	০	৮০	১	১৫১০	৪২১
মোট			১৩৪	১১	১৭২৪	২৩০	৩১৯৪৪	১৭৫৫২
পাবনা	দাখিল	প্রাইভেট	১৩৬	১১	১৩১৯	১৮৪	২৩৮০৯	১৪২৩২
	আলিম	প্রাইভেট	২৮	২	৪৫২	৭৯	৮৩৭৫	৪০১০
	ফাযিল	প্রাইভেট	১০	২	১৯৫	৩৯	৪০৬৯	১৯১৯
	কামিল	প্রাইভেট	৪	০	১০১	৮	৩০৮৭	১১৫০
মোট			১৭৮	১৫	২০৬৭	৩১০	৩৯৩৪০	২১৩১১
রাজশাহী	দাখিল	প্রাইভেট	১৪৮	১২	১৫৪১	২৩৪	২২০০০	১১৪৬৭
	আলিম	প্রাইভেট	৪০	১	৬৬৪	১০২	৮৯৫৮	৪৪৬২
	ফাযিল	প্রাইভেট	১২	২	২৬৬	৫৭	৩৪২৩	১৫৫২
	কামিল	প্রাইভেট	৯	০	২২৮	৩১	৪৭১৩	১৫৪৫
মোট			২০৯	১৫	২৬৯৯	৪২৪	৩৯০৯৪	১৯০২৬
সিরাজগঞ্জ	দাখিল	প্রাইভেট	১৫৪	১৮	১৫৫১	১৪৮	২৬৪৯৬	১৫১৯০

Dhaka University Institutional Repository

জেলা	শিক্ষা স্তর	ব্যবস্থাপনার ধরন	মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	বালিকা/মহিলা প্রতিষ্ঠান	মোট শিক্ষক	মহিলা শিক্ষক	মোট ছাত্র	বালিকা শিক্ষার্থী
	আলিম	প্রাইভেট	১৯	০	৩০৩	২৬	৫৫৭৫	৩০৩০
	ফাযিল	প্রাইভেট	২৬	১	৫০৭	৪২	৯৬৫০	৪৫৪৫
	কামিল	প্রাইভেট	২	০	৪৩	৪	১৪৩০	৪৮২
মোট			২০১	১৮	২৪০৪	২২০	৪৩১৫১	২৩২৪৭
দিনাজপুর	দাখিল	প্রাইভেট	২১৭	২৫	২২৮০	৩৩৪	৩১৬৩৬	১৭৯৪৬
	আলিম	প্রাইভেট	৩৭	২	৬১২	৮৩	৮২২৫	৪৫৮১
	ফাযিল	প্রাইভেট	৪০	০	৮১১	১২০	১২১১৩	৬০৯৪
	কামিল	প্রাইভেট	৭	০	১৬৪	১৭	৪৯৬০	১৯৭২
মোট			৩০১	২৭	৩৮৬৭	৫৫৪	৫৬৯৩৪	৩০৫৯৩
গাইবান্ধা	দাখিল	প্রাইভেট	১৭১	২৩	১৮১১	২০৩	২৭২২৭	১৩৯০৭
	আলিম	প্রাইভেট	২৫	১	৩৮৮	৪৯	৬৭৫৫	২৯৩৯
	ফাযিল	প্রাইভেট	২০	১	৩৭৭	৪৯	৮১০১	৩৪৮৭
	কামিল	প্রাইভেট	১	০	২৯	১	১৭০২	৩৬৬
মোট			২১৭	২৫	২৬০৫	৩০২	৪৩৭৮৫	২০৬৯৯
কুরিগ্রাম	দাখিল	প্রাইভেট	১৭৩	৩১	১৬৫৬	১৬৭	৩১৮৯৭	১৭৫১৮
	আলিম	প্রাইভেট	২২	২	৩০১	২৩	৬০৩৮	২৮৮৯
	ফাযিল	প্রাইভেট	২৩	০	৪২৫	৪৪	৯৬৩৩	৪০০৬
	কামিল	প্রাইভেট	৩	০	৫৬	১০	২৫৭৮	৫৯৭
মোট			২২১	৩৩	২৪৩৮	২৪৪	৫০১৪৬	২৫০১০
লালমনিরহাট	দাখিল	প্রাইভেট	৫৭	৫	৬০০	৫৯	৯৬৬৬	৫২১১
	আলিম	প্রাইভেট	১৩	১	২০৪	২৫	৩৮৪১	২০৬৭
	ফাযিল	প্রাইভেট	৫	০	১০২	১১	২০২১	৭৭৮
	কামিল	প্রাইভেট	২	০	৪৭	৫	৯৪৪	২৭১
মোট			৭৭	৬	৯৫৩	১০০	১৬৪৭২	৮৩২৭
নীলফামারী	দাখিল	প্রাইভেট	০১	১৫	১০৮৩	১০৬	১৬৪০৪	৯৯৩৯
	আলিম	প্রাইভেট	২৫	০	৪১৫	৪০	৬৯২০	৩৭৪৬
	ফাযিল	প্রাইভেট	১৬	০	৩০৩	১৯	৬১১৬	২৮১৫
	কামিল	প্রাইভেট	২	০	৪৭	২	১০০৬	৪৬২
মোট			১৪৪	১৫	১৮৪৮	১৬৭	৩০৪৪৬	১৬৯৬২
পঞ্চগড়	দাখিল	প্রাইভেট	৬১	৩	৫১৯	৭৭	৯৮০৪	৪৬৬১
	আলিম	প্রাইভেট	৮	১	১২১	১৬	২২৬৪	১১২২
	ফাযিল	প্রাইভেট	৬	০	৯৭	১৫	২৫০৩	৯৬৭

Dhaka University Institutional Repository

জেলা	শিক্ষা স্তর	ব্যবস্থাপনার ধরন	মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	বালিকা/মহিলা প্রতিষ্ঠান	মোট শিক্ষক	মহিলা শিক্ষক	মোট ছাত্র	বালিকা শিক্ষার্থী
	কামিল	প্রাইভেট	১	০	২৪	৩	৭৭৮	৩০৬
মোট			৭৬	৪	৮৩৩	১১১	১৫৩৫৩	৭০৫৬
রংপুর	দাখিল	প্রাইভেট	১৮৬	৩২	১৯৪৪	২২১	৩১৫৭৮	১৭৮৬৭
	আলিম	প্রাইভেট	৩০	১	৪৭৩	৬৮	৭৭১১	৩৪৭৮
	ফাযিল	প্রাইভেট	৩১	০	৫৬০	৮৩	১০৩০৬	৪২৯৪
	কামিল	প্রাইভেট	৫	০	১৩৬	১৫	৩৪৭১	৭৭০
মোট			২৫২	৩৩	৩১১৩	৩৮৭	৫৩০৬৬	২৬৪০৯
ঠাঁকুরগাও	দাখিল	প্রাইভেট	৯১	৫	৯৩৬	১১২	১২৭৩৮	৬৮৫২
	আলিম	প্রাইভেট	১৯	০	৩০৩	৩১	৪২৬৯	১৯৯২
	ফাযিল	প্রাইভেট	১১	০	২০৯	২৭	৪৯৭২	১৮৬০
	কামিল	প্রাইভেট	২	০	৪৪	৪	১১৮৮	২৯৩
মোট			১২৩	৫	১৪৯২	১৭৪	২৩১৬৭	১০৯৯৭
হবিগঞ্জ	দাখিল	প্রাইভেট	৫১	৩	৩৯৫	৪৬	১৩৪৫৫	৭১০৭
	আলিম	প্রাইভেট	৮	১	৮৯	৭	৩০৭৭	১৬৭০
	ফাযিল	প্রাইভেট	৬	০	৯৭	৯	৩২৩৬	১০৮৬
	কামিল	প্রাইভেট	১	০	১৯	৩	৮০৫	৩০৩
মোট			৬৬	৪	৬০০	৬৫	২০৫৭৩	১০১৬৬
মৌলভীবাজার	দাখিল	প্রাইভেট	৫৫	৫	৪৭৮	৫৬	১২৯৪২	৬৪৪৩
	আলিম	প্রাইভেট	১০	১	১৩২	৭	৩৯৩৮	১৯০৩
	ফাযিল	প্রাইভেট	১১	০	১৬৫	৪	৫৬৫৬	২২৪১
	কামিল	প্রাইভেট	১	০	১৫	২	৯৯৮	২৩৬
মোট			৭৭	৬	৭৯০	৬৯	২৩৫৩৪	১০৮২৩
সুনামগঞ্জ	দাখিল	প্রাইভেট	৭৩	২	৫৯২	২২	১৫৯৯৯	৮০৯২
	আলিম	প্রাইভেট	১৯	০	২৫১	১৪	৬৭৩৫	২৯৪০
	ফাযিল	প্রাইভেট	৩	০	৪৭	৫	১৬৭১	৭২৪
	কামিল	প্রাইভেট	১	০	১৮	০	৬২১	২২০
মোট			৯৬	২	৯০৮	৪১	২৫০২৬	১১৯৭৬
সিলেট	দাখিল	প্রাইভেট	১০৬	১৮	৮৯৮	৬৬	২১৮৩৬	১২০৬৮
	আলিম	প্রাইভেট	৩০	২	৩৯২	১৬	১০১১৫	৪৮৮৮
	ফাযিল	প্রাইভেট	৯	০	১৩৯	৫	৪৬৭৯	১৯৬২
	কামিল	প্রাইভেট	৯	০	১৮২	১৬	৮৩৪৫	২৬৩৪
	কামিল	পাবলিক	১	০	২২	০	১০০১	৩৮

Dhaka University Institutional Repository

জেলা	শিক্ষা স্তর	ব্যবস্থাপনার ধরন	মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	বালিকা/মহিলা প্রতিষ্ঠান	মোট শিক্ষক	মহিলা শিক্ষক	মোট ছাত্র	বালিকা শিক্ষার্থী
মোট			১৫৫	২০	১৬৩৩	১০৩	৪৫৯৭৬	২১৫৯০
বাংলাদেশ			৯৩৩৬	১১৫৪	১০৭৯৫৯	১২১১০	২২৯৪৪২০	১২৩২৩৪৫

সারণি-১১

নারীদের জেলাভিত্তিক শিক্ষাগত অবস্থান, ২০১৩[১]

ক্রমিক নং	জেলার নাম	মোট শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান	% নারী শিক্ষকের হার	অন্তর্ভুক্তি	% বালিকাদের হার	Population per Institution	Enrolment thousand population (arranged in ascending order)
১.	ঢাকা	১১৭	১৫.৪৭	৩৭৩২২	৩০.৫৯	১১২০৭৭	৩
২.	মানিকগঞ্জ	২৯	৯.০৯	৬১৮০	৫৪.৩৭	৫১৭৬৮	৪
৩.	রাঙ্গামাটি	১৫	৭.৯৫	২৯২৫	৪৪.৭৯	৪৩৪৫৭	৪
৪.	মুন্সিগঞ্জ	৩৮	১১.৪৬	৮১৯৮	৫৪.১৫	৪১৪৫৮	৫
৫.	নারায়নগঞ্জ	৬৮	১৪.২০	১৮৮৫০	৫৩.০২	৪৭৮৮৯	৬
৬.	খাগড়াছড়ি	২১	৭.৮৮	৪০৩৪	৫৪.১২	৩২০০৫	৬
৭.	বান্দরবান	১১	১১.৫০	২৬৮১	৫৭.৮৯	৩৮৩২৯	৬
৮.	কুষ্টিয়া	৭৬	১৫.২৫	১৫২৬৬	৫০.৯০	২৮২১৫	৭
৯.	মেহেরপুর	২৬	১৪.৩৯	৫৩১৮	৪৮.৬৫	২৭৩২৮	৭
১০.	চুয়াডাঙ্গ	৩৯	১২.৩০	১০৩৪৬	৪৮.৬২	৩১৪১১	৮
১১.	বাহ্মনবাড়ীয়া	৯১	১২.৬৬	২৬৮০৯	৫৬.৪০	৩৪৩৯০	৯
১২.	হবিগঞ্জ	৬৬	১০.৮৩	২০৫৭৩	৪৯.৪১	৩৫৪১৫	৯
১৩.	সুনামগঞ্জ	৯৬	৪.৫২	২৫০২৬	৪৭.৮৫	২৭৯৮৩	৯
১৪.	নরসিংদি	৯০	১৬.০৪	২৩৫২৬	৫৬.৫২	২৬৯৪৬	১০
১৫.	গোপালগঞ্জ	৪৫	১১.৫৪	১২৭১৭	৫৯.৫৭	২৮৩৯৭	১০
১৬.	খুলনা	১৩২	১১.৩১	২৬৮৩৫	৫১.১১	১৮৯৫০	১১
১৭.	ফরিদপুর	৮৫	১১.১২	২২২৬৯	৫৭.৯৯	২৪৪১৯	১১
১৮.	গাজীপুর	১৭৭	১৫.১৯	৩৯৮৭৫	৫২.৪৬	২০৯৭২	১১
১৯.	নেত্রকোনা	৮৯	১১.৬০	২৭১০২	৫৬.০৮	২৭৩২৩	১১
২০.	মৌলভীবাজার	৭৭	৮.৭৩	২৩৫৩৪	৪৫.৯৯	২৭১৩৮	১১
২১.	নাটোর	১০৯	১৪.৮৯	২১৬২৪	৫১.৯১	১৭২০৩	১২
২২.	নড়াইল	৪৫	১২.৩০	৯২৮৯	৪৭.৫৭	১৭৬৮৮	১২

[১] Bangladesh Education Statistics 2013, ibid, PP. 208-225.

Dhaka University Institutional Repository

২৩.	লালমনিরহাট	৭৭	১০.৪৯	১৬৪৭২	৫০.৫৫	১৭৮২৯	১২
২৪.	সিলেট	১৫৫	৬.৩১	৪৫৯৭৬	৪৬.৯৬	২৪০৭৮	১২
২৫.	চট্রগ্রাম	৩৩৮	৮.৮৯	১০২৭৬৩	৪৬.১০	২৪৫২৪	১২
২৬.	সিরাজগঞ্জ	২০১	৯.১৫	৪৩১৫১	৫৩.৮৭	১৬৬৩৮	১৩
২৭.	টাঙ্গাইল	২৩১	১১.০৫	৫১৬৩৬	৫২.৬০	১৭২৬১	১৩
২৮.	কিশোরগঞ্জ	১৪৫	১৪.৯৮	৪০৫৮০	৬০.৬৭	২১৫৩৪	১৩
২৯.	মাদারীপুর	৬৯	৭.৯৯	১৭০২৮	৬২.৫৮	১৮৫৩১	১৩
৩০.	শরীয়তপুর	৫৮	৭.৩০	১৭১৯৩	৬২.৩০	২১৭৬২	১৪
৩১.	ঝিনাইদহ	১১২	১০.৬৬	২৭০৭০	৫৩.৪৬	১৭২৩০	১৪
৩২.	পাবনা	১৭৮	১৫.০০	৩৯৩৪০	৫৪.১৭	১৫৫৭৭	১৪
৩৩.	পঞ্চগড়	৭৬	১৩.৩৩	১৫৩৫৩	৪৫.৯৬	১৪১৮৪	১৪
৩৪.	রাজশাহী	২০৯	১৫.৭১	৩৯০৯৪	৪৮.৬৭	১৩০৩২	১৪
৩৫.	ঠাঁকুরগাও	১২৩	১১.৬৬	২৩১৬৭	৪৭.৪৭	১২২৮৫	১৫
৩৬.	নীলফামারী	১৪৪	৯.০৪	৩০৪৪৬	৫৫.৭১	১৩৭৪০	১৫
৩৭.	রাজবাড়ী	৭৪	১৩.১৮	১৭৯০৮	৫৮.১০	১৫৪৯৩	১৬
৩৮.	শেরপুর	১০১	১৫.১৫	২৩৭২২	৫১.৭৫	১৪৭৪১	১৬
৩৯.	জামালপুর	১৭৬	১৪.৬৩	৪২০৪০	৫১.১১	১৪২৬৬	১৭
৪০.	রংপুর	২৫২	১২.৪৩	৫৩০৬৬	৪৯.৭৭	১২৫৪৩	১৭
৪১.	গাইবান্ধা	২১৭	১১.৫৯	৪৩৭৮৫	৪৭.২৭	১১৮২২	১৭
৪২.	দিনাজপুর	৩০১	১৪.৩৩	৫৬৯৩৪	৫৩.৭৩	১০৮৮৪	১৭
৪৩.	নবাবগঞ্জ	১৩৪	১৩.৩৪	৩১৯৪৪	৫৪.৯৫	১৩৬০১	১৮
৪৪.	মাগুরা	৭৪	১২.১৬	১৭৭৯২	৫৩.৭১	১৩৫৫৮	১৮
৪৫.	নওগাঁ	২৮০	১০.৪০	৫১৫৮৪	৫৩.৫৩	১০২০৩	১৮
৪৬.	ময়মনসিং	৩৮৬	১৪.৫৬	১০৪০১১	৫৯.৩৩	১৪৬০১	১৮
৪৭.	নোয়াখালি	১৮৫	৭.৮৫	৬২৯৯১	৫৮.৪৪	১৮১৭৭	১৯
৪৮.	যশোর	৩০৯	১২.১১	৫৮১৫৫	৬০.২০	৯৮৪৯	১৯
৪৯.	বগুড়া	৩০৯	১৫.৬৬	৭০২৪১	৪৯.৬৯	১১৮৮০	১৯
৫০.	কক্সবাজার	১৪৪	৯.১০	৫১৪৩১	৬৬.০৭	১৭২৩০	২১
৫১.	কুমিল্লা	৩৮৪	১১.০৯	১২৩৬৪২	৫৭.৩৫	১৫৩৯৪	২১
৫২.	বাগেরহাট	১৬৪	৮.৬১	৩৪৮৭৯	৫২.৯২	৯৭৫৯	২২
৫৩.	কুরিগ্রাম	২২১	১০.০১	৫০১৪৬	৪৯.৮৭	১০২৪৩	২২
৫৪.	ফেনী	১২২	৭.৭৪	৩৬৩০২	৪৮.০৪	১২৯৭৪	২৩
৫৫.	বরিশাল	২৩৮	১১.১৮	৬০৪৩৮	৫৬.৩৫	১০৬৬১	২৪
৫৬.	চাঁদপুর	২০২	৭.১১	৬২৬৫০	৫৭.৬১	১২৯৬৬	২৪

Dhaka University Institutional Repository

৫৭.	সাতক্ষীরা	২১৫	৮.১৩	৫২৬৯৬	৫৮.৫৫	১০০৭৭	২৪
৫৮.	লক্ষীপুর	১৪২	৬.৭৭	৫১১৭৭	৫৬.৪২	১৩৩১০	২৭
৫৯.	জয়পুরহাট	১১৩	১২.৫৭	২৭২৯০	৪৩.১৬	৮৮৪৫	২৭
৬০.	বরগুনা	১৩০	৪.৯৩	২৭০৭২	৫১.৬০	৭৪৬৯	২৮
৬১.	পিরোজপুর	১৭২	৭.৮৮	৩৬৫১৫	৫৩.৯১	৭০৮১	৩০
৬২.	ভোলা	২৩৭	৬.৯১	৬৩৪১০	৬৪.৫১	৮৩১১	৩২
৬৩.	ঝালকাঠি	১২৩	৮.৬৪	২৫১৭৭	৪৬.২২	৬০৯৫	৩৪
৬৪.	পটুয়াখালি	২৭৩	৬.১০	৫৭৮৫৪	৫৭.৩৮	৬১১৭	৩৫

সারণি-১২

মাদরাসার সংখ্যা (ইবতেদায়ী/প্রাইমারী-কামিল) প্রতিষ্ঠানের ধরন ও ক্যাটাগরি ও ব্যবস্থাপনা : ২০১৩[১]

মাদ্‌রাসার প্রকৃতি	ব্যবস্থাপনা								
	সর্বোমোট	বালিকা	%	সর্বোমোট	বালিকা	%	সর্বোমোট	বালিকা	%
দাখিল				৬৫৯৩	১০০৩	১৫.২১	৬৫৯৩	১০০৩	১৫.২১
আলিম				১৪৭০	১১২	৭.৬২	১৪৭০	১১২	৭.৬২
ফাযিল				১০৫৪	২৭	২.৫৬	১০৫৪	২৭	২.৫৬
কামিল	৩			২১৬	১২	৫.৫৬	২১৯	১২	৫.৪৮
মোট	৩			৯৩৩৩	১১৫৪	১২.৩৬	৯৩৩৬	১১৫৪	১২.৩৬

সারণি-১৩

প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনায় বালক-বালিকাদের শিক্ষার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান সমীক্ষা, ২০১৩[২]

মাদ্‌রাসার প্রকৃতি	ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি	ধরন				
		মোট প্রতিষ্ঠান	শুধু বালক	শুধু বালিকা	বালক-বালিকা যৌথ	বালক-বালিকা আলাদা
দাখিল	বেসরকারী	৬৫৯৩	২৩	১০০৩	৫৫৫৫	১২
	%	১০০	০.৩৫	১৫.২১	৮৪.২৬	০.১৮
আলিম	বেসরকারী	১৪৭০	৮.০০	১১২	১৩৪৩	৭
	%	১০০	০.৫৪	৭.৬২	৯১.৩৬	০.৪৮
ফাযিল	বেসরকারী	১০৫৪	১০	২৭	১০১০	৭
	%	১০০	০.৯৫	২.৫৬	৯৫.৮৩	০.৬৬
কামিল	বেসরকারী	২১৬	১৭	১২	১৮১	৬
	সরকারী	৩	১		২	
	সাব- টোটাল	২১৯	১৮	১২	১৮৩	৬

[১] Bangladesh Education Statistics 2013, ibid, PP. 208-225.
[২] Bangladesh Education Statistics 2013, ibid, PP. 208-225.

Dhaka University Institutional Repository

	%	১০০	৮.২২	৫.৪৮	৮৩.৫৬	২.৭৪
সর্বোমোট	সর্বোমোট	৯৩৩৬	৫৯	১১৫৪	৮০৯১	৩২
	%	১০০.০০	০.৬৩	১২.৩৬	৮৬.৬৬	০.৩৪

সারণি-১৩ তে আমরা দেখতে পাই যে, বাংলাদেশে মোট দাখিল মাদ্‌রাসার সংখ্যা ৬৫৯৩, তন্মধ্যে শুধু বালক মাদ্‌রাসার সংখ্য মাত্র ২৩ টি। অপরপক্ষে শুধু বালিকা শিক্ষার্থীর শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১০০৩ টি মাদ্‌রাসা যা মোট দাখিল মাদ্‌রাসার ১৫.২১%।[১] আবার বালক-বালিকা যৌথ অধ্যয়নের জন্য দাখিল মাদ্‌রাসা রয়েছে ৫৫৫৫ টি, আর বালক-বালিকা আলাদাভাবে অধ্যয়ন করে এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১২ টি। দাখিল মাদ্‌রাসার ক্ষেত্রে উপরোক্ত সমীক্ষায় দেখা যায় মোট দাখিল মাদ্‌রাসার মধ্যে ৯৯.৬৫১% মাদ্‌রাসাতেই নারী/বালিকা শিক্ষার্থীদের পাঠদানের সুব্যবস্থা বিদ্যমান। এতে লক্ষ্য কারা যায় বাংলাদেশের মাদ্‌রাসা বা ইসলামী শিক্ষায় নারীর অবস্থানের উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

আবার আলিম পর্যায়ে সারণি থেকে আমরা দেখতে পাই যে, বাংলাদেশে মোট আলিম মাদ্‌রাসার সংখ্যা ১৪৭০, তন্মধ্যে শুধু বালক মাদ্‌রাসার সংখ্যা মাত্র ৮ টি। অপরপক্ষে শুধু বালিকা শিক্ষার্থীর শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১১২ টি মাদ্‌রাসা যা মোট আলিম মাদ্‌রাসার ৭.৬২%। আবার বালক-বালিকা যৌথ অধ্যয়নের জন্য দাখিল মাদ্‌রাসা রয়েছে ১৩৪৩ টি, আর বালক-বালিকা আলাদাভাবে অধ্যয়ন করে এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৭ টি। আলিম মাদ্‌রাসার ক্ষেত্রে উপরোক্ত সমীক্ষায় দেখা যায় মোট আলিম মাদ্‌রাসার মধ্যে ৯৯.৪৫৫% মাদ্‌রাসাতেই নারী/বালিকা শিক্ষার্থীদের পাঠদানের সুব্যবস্থা বিদ্যমান।[২] এতে লক্ষ্য করা যায় বাংলাদেশের মাদ্‌রাসা বা ইসলামী শিক্ষায় নারীর অবস্থানের উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

আবার ফাযিল পর্যায়ে সারণি থেকে আমরা দেখতে পাই যে, বাংলাদেশে মোট ফাযিল মাদ্‌রাসার সংখ্যা ১০৫৪, তন্মধ্যে শুধু বালক মাদ্‌রাসার সংখ্যা মাত্র ১০ টি। অপরপক্ষে শুধু বালিকা শিক্ষার্থীর শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ২৭ টি মাদ্‌রাসা যা মোট ফাযিল মাদ্‌রাসার ২.৫৬১%। আবার বালক-বালিকা যৌথ অধ্যয়নের জন্য ফাযিল মাদ্‌রাসা রয়েছে ১০১০ টি, আর বালক-বালিকা আলাদাভাবে অধ্যয়ন করে এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৭ টি। ফাযিল মাদ্‌রাসার ক্ষেত্রে উপরোক্ত সমীক্ষায় দেখা যায় মোট ফাযিল মাদ্‌রাসার মধ্যে ৯৯.০৫% মাদ্‌রাসাতেই নারী/বালিকা শিক্ষার্থীদের পাঠদানের সুব্যবস্থা বিদ্যমান।[৩] এতে লক্ষ্য করা যায় বাংলাদেশের মাদ্‌রাসা বা ইসলামী শিক্ষায় নারীর অবস্থানের উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

আবার কামিল পর্যায়ে সারণি থেকে আমরা দেখতে পাই যে, বাংলাদেশে মোট কামিল (সরকারী-বেসরকারী) মাদ্‌রাসার সংখ্যা ২১৯, তন্মধ্যে শুধু পুরুষ/বালক মাদ্‌রাসার সংখ্যা মাত্র ১৮ টি। অপরপক্ষে শুধু বালিকা/নারী শিক্ষার্থীর শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১২ টি মাদ্‌রাসা যা মোট কামিল মাদ্‌রাসার ৫.৪৭%।[৪] আবার বালক-বালিকা যৌথ অধ্যয়নের জন্য কামিল মাদ্‌রাসা রয়েছে ১৮৩ টি, আর বালক-বালিকা আলাদাভাবে অধ্যয়ন করে এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৬ টি। কামিল মাদ্‌রাসার ক্ষেত্রে উপরোক্ত সমীক্ষায় দেখা যায় মোট কামিল মাদ্‌রাসার মধ্যে ৯০.৮৬% মাদ্‌রাসাতেই নারী/বালিকা শিক্ষার্থীদের পাঠ দানের সুব্যবস্থা বিদ্যমান। এতে লক্ষ্য কারা যায় বাংলাদেশের মাদ্‌রাসা বা ইসলামী শিক্ষায় নারীর অবস্থানের উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

---

১. Bangladesh Education Statistics 2013, ibid, PP. 208-225.
২. Bangladesh Education Statistics 2013, ibid, PP. 208-225.
৩. Bangladesh Education Statistics 2013, ibid, PP. 208-225.
৪. Bangladesh Education Statistics 2013, ibid, PP. 208-225.

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত সমীক্ষাতে আমরা দেখতে পাই যে, বাংলাদেশে দাখিল, আলিম, ফাযিল, ও কামিল মাদ্রাসা মোট মাদ্রাসার সংখ্যা ৯৩৩৬ টি। প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শুধু বালিকা/মহিলা শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের জন্য নিয়োজিত রয়েছে ১১৫৪ টি প্রতিষ্ঠান যা মোট প্রতিষ্ঠানের ১২.৩৬%, আর বালক-বালিকা/নারী-পুরুষের এর যৌথ শিক্ষাদানে কাজ করে যাচ্ছে ৮০৯১ টি প্রতিষ্ঠান যা মোট প্রতিষ্ঠানের ৮৬.৬৬%। এ অবস্থা আমাদের মাঝে এ বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করেছে যে বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষায় নারীর অবস্থান এর উন্নয়নে মাদ্রাসা শিক্ষার অবদান অনস্বীকার্য। মাদ্রাসা শিক্ষার উপরিউক্ত বিকাশ ও সম্প্রসারণে ইসলামী শিক্ষায় নারীর অবস্থান এর প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষায় নারীর অবস্থান এর উন্নয়নে করণীয়

বাংলাদেশ একটি মুসলিম দেশ। এ দেশের শতকরা প্রায় নব্বই ভাগ মানুষই ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে লালিত। ইসলামী আদর্শ ও দর্শনের প্রকৃত দাবির সাথে মুসলিম সমাজ সর্বদাই একাত্ম। নারী-পুরুষ সবাই ইসলামের আদর্শ দ্বারা সমানভাবে উজ্জীবিত। বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ হয়েও এদেশে নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন চোখে পড়ার মত। যে নারী জাহেলিয়াতের অমানিশায় নির্যাতন ও বর্বরতায় পিষ্ঠ হয়ে পরিচয়হীন এক প্রাণীর বেশে দিনাতিপাত করত ইসলামের সুমহান জীবন ব্যবস্থার আবির্ভাবে সেই নারীই হয়ে উঠলেন সম্মান-সম্ভ্রম, আত্মমর্যাদা ও ক্ষমতায়নে এক মহিয়ান ব্যক্তিত্ব। ইসলাম এ নারীকে সম্মান ও মর্যাদা দিতে শিখিয়েছে। নারী আমাদের মায়ের জাতি। এ জাতির সম্মান অতি উচ্চে। নারী আমাদের 'মা' আমাদের 'বোন' আমাদের 'কন্যা' ও আমাদের 'স্ত্রী'। এরা আমাদের প্রজন্ম ও উন্নত জাতি গঠনের কারিগর। আমাদের জীবনে এ মাতৃসমাজের সার্বিক উন্নয়ন একান্ত জরুরী। আর এ উন্নয়ন হতে হবে ইসলামী বুনিয়াদি আদর্শের উপর ভিত্তি করে; ইসলামী শিক্ষা ও দর্শনের অবলম্বনে। তবেই বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষায় নারীর অবস্থানের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব হবে। সে ক্ষেত্রে পরিবার থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ ও দীর্ঘমেয়াদী রূপকল্পের বাস্তবায়ন জরুরী। নিম্নে এ সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা প্রদত্ত হলো-

১. পারিবারিক কাঠামো গঠন

পরিবার কাঠামো ও নারী : পরিবার কাঠামোতে নারীর যথাযথ মূল্যায়ন আবশ্যক। কারণ পরিবারের যাবতীয় কাজ সাধারণত নারীরাই সম্পাদন করে। পরিবার তথা সমাজের পরিপোষণের দিক থেকে নারীর ভূমিকা যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন পুরুষের খাদ্য সংস্থানের কারণে তার মর্যাদা নারীর চেয়ে সর্বত্রই বেশী দেওয়া হয়ে থাকে। তার পাশাপাশি নারীর ভূমিকার গুরুত্বকেও যথাযথ স্বীকৃতি দেয়া হয় না। শুধু বাংলাদেশ নয়, পিতৃতান্ত্রিক পরিবার কাঠামো রয়েছে এমন সব দেশে গৃহই নারীর নির্দিষ্ট স্থান, বাইরের কর্মক্ষেত্র পুরুষের রাজ্য।[১] বাংলাদেশে নারীদের নিম্ন সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে দুটি কাঠামোকে দায়ী করা যায়।[২] একটি হচ্ছে পিতৃতন্ত্র (Patriarchy), অপরটি হচ্ছে সামাজিক অসমতা (Social Inequality)। প্রথমটি ক্রিয়াশীল পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে, দ্বিতীয়টি ক্রিয়াশীল অধঃস্তন ধনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে। প্রথমটি তৈরী করেছে পুরুষের মর্যাদাবোধ এবং পারিবারিক পদস্তবোধ। দ্বিতীয়টির ক্রিয়াশীলতা নারীদেরকে করে তুলেছে সমাজের ক্ষেত্রে প্রান্তিক অবস্থান (Marginalized)। এই দুটি কাঠামো বাংলাদেশের নারীদের গৃহাভিমুখী (Domisticated) করে তুলেছে।

বাংলাদেশে নারীদের দূরাবস্থার পেছনে ক্রিয়াশীল আরেকটি সাংস্কৃতিক উপাদান হলো বিবাহ প্রথা বা বৈবাহিক সম্পর্ক। এর পরিধি সংকীর্ণ হলেও এর প্রভাব সুদূর প্রসারী। আর এই প্রথা চালু রাখার ব্যাপারে সহায়তা করে

---

১. রওশন জাহান, *বাংলাদেশের নারী* (ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি:, ১৯৭০ খৃস্টাব্দ), পৃ. ১-২০।

২. বোরহান উদ্দিন খাঁন জাহাঙ্গীর এবং জরিনা রহমান খাঁন, *বাংলাদেশে নারী নির্যাতন* (ঢাকা : সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৭ খৃস্টাব্দ), পৃ. ২-১২।

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রীয় আইন, সামাজিক রীতিনীতি, পারিবারিক নিয়ম, ব্যক্তি সম্পর্ক। পুরুষের তুলনায় নারীদের খুব কম বয়সে বিয়ে হয়। যেখানে পুরুষের গড় বিয়ের বয়স ২৭.৬ বছর, সেখানে নারীদের হচ্ছে ২০ বছর।[১] তাছাড়া বিয়ের সম্মতির ক্ষেত্রে নারীর অধিকার যথেষ্ঠ নেতিবাচক। এক্ষেত্রে নারীদের মতামত উপেক্ষা করেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিতা, ক্ষেত্রবিশেষে বড় ভাই বিয়ে সম্পন্ন করেন। বিয়ের মাধ্যমে উদ্ভুত নানা ধরনের সমস্যাও যেমন- তালাক, দেনমোহর, খোরপোষ, সন্তানের অভিভাবকত্ব, সম্মতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে আইনগত সহায়তার জন্য বা বিয়ের সত্যতা প্রমাণের জন্য বিবাহ রেজিস্ট্রিকরণ প্রয়োজন।[২] অন্যদিকে বিয়ে রেজিস্ট্রিকৃত না হলে আইনের চোখে সেই বিয়ে অবৈধ বা বে-আইনী বলে বিবেচিত হয় না।[৩] একই সাথে দ্বৈত ব্যবস্থা চালু থাকায় গ্রাম ও শহরের বস্তি এলাকায় বিয়ের রেজিস্ট্রিকরণ হয় না বললেই চলে। এতে বিয়ের মাধ্যমেই জটিলতার সৃষ্টি হয়, যা বিয়ে ও তালাক বিষয়ক আইন কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে না। এছাড়া ইসলামের বিয়ে চুক্তি হিসেবে গণ্য হলেও ইসলামের বিধি-বিধান না মানায় বাস্তবে দেখা যায় তা দুই অসম পক্ষের মধ্যে চুক্তি। এখানে নারীর অধিকার অসম। তালাক দেবার অধিকার, সন্তানের অভিভাবকত্বের এবং স্ত্রীর উপর পূর্ণ অধিকার (শারীরিক) রয়েছে কেবল পুরুষের। অন্য দিকে নারীর অধিকার রয়েছে শুধু মোহরানা ও ভরণপোষণ পাওয়ার। এতেও আবার নিশ্চয়তা নেই। ফলে নারী এখানে অধঃস্তন। এ অবস্থার পরিবর্তন হওয়া জরুরী। পারিবারিক ও সামাজিক আইনে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা, এর অনুসরণও পরিপালনে বাধ্যবাধকতা থাকা দরকার।

মাতৃত্বের আরোপিত মূল্যবোধ ও নারী

বাংলাদেশে নারীদের নিম্ন সামাজিক অবস্থানের আর একটি পরিপ্রেক্ষিত হচ্ছে মাতৃত্ব। বিশেষ করে লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাজন সৃষ্টির ক্ষেত্রে। সন্তান প্রতিপালনের যাবতীয় ঝামেলাপূর্ণ ও কষ্টকর দায়িত্ব নারীর উপর অর্পণ করে নারীকে গৃহাভ্যন্তরীণ করে রাখার প্রয়াস। সন্তান জন্মের ক্ষেত্রে বাবার তুলনায় মায়ের প্রত্যক্ষ সংযোগ থাকে। সে কারণে নারীর সন্তানের প্রতি স্নেহবোধ জন্মানো এবং স্বীয় সৃষ্টির আনন্দ থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, শিশু লালন-পালনের সব দায়-দায়িত্ব নারীর একার নিতে হবে; সন্তানের কারণে নারীর ব্যক্তিত্বের অবদমন করতে হবে। বাংলাদেশে প্রায়ই দেখা যায় যে, নারীর শিক্ষা ও চাকুরী জীবন ব্যাহত হচ্ছে। সন্তান জন্মদানের ফলে পিতৃত্বের সৃষ্টি করে। কিন্তু তার জন্য পুরুষকে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে হয় না এবং তার কোন কর্মতৎপরতাও ব্যাহত হয় না। সুতরাং বলা যায় যে, বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোতে মাতৃত্বের আরোপিত মূল্যবোধ নারীর পাশ্চাৎপদতার জন্যে কিছুটা দায়ী। এরপরও সন্তানের অভিভাবকত্ব পিতার; মাতার নয়।[৪] কিন্তু

---

১. আজাদুর রহমান চন্দন, *পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী* (ঢাকা : উন্নয়ন পদক্ষেপ, স্টেপ্স টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, বর্ষ-৪, সংখ্যা-১৪, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৯৮ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৭।

২. *১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন*, ১৯৭৪ সালের বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট এবং ১৯৮৫ সালের পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ অনুযায়ী।

৩. শহীদ আখতার, সংকলিত *মুসলিম বিবাহে আবশ্যকীয় শর্তাবলী সম্বন্ধীয় আইনের উপর প্রশ্নমালা ও উত্তরে বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা* (ঢাকা : ১৯৮৪ ইং), পৃ. ৪।

৪. এই বৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থার চিত্র ফুটিয়ে তুলতে গবেষক আয়েশা নোমান বলেন, From birth to death, from infancy to old age a female goes without consideration in all aspects of life with in or outside the family. Even the ritual of Azan (call for prayer) as a celebrations mostly not given if a girl is born, which indicates both family's and comminity's disapproval of birth of a daughter. From childhood they are mainly given training to look after household affairs, bearing and rearing of children, cooking and taking care of all the ages of 12 to 13 observing 'Purdah' by wearing 'Burqha' becomes part of their lives which restrict their free movement and cause drop out at the school." [ড. আব্দুল কুদ্দুস ও জহিরুল হক শাকিল, *বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর ক্ষমতায় : সমস্যা ও সম্ভবনা* (ঢাকা : বাতায়ন প্রকাশন, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, জুন ২০০৩ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৭৭।]

Dhaka University Institutional Repository

পরিবার কাঠামোর মৌল উপাদান হলো মা। সমাজের প্রাণকেন্দ্র হলো পরিবার। ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার শুধু একটি উত্তম সামাজিক প্রতিষ্ঠানই নয়, বরং একটি পবিত্র সংস্থা। সুসন্তান গড়ে তোলার জন্য পরিবার ছাড়া অন্য কোন বিকল্প ক্ষেত্র থাকতে পারে না। নৈতিক চরিত্র গঠনের প্রকৃষ্ঠ ক্ষেত্র হলো পরিবার। এ ক্ষেত্রে মা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে থাকেন। মায়ের প্রতিটি পদক্ষেপ শিশু অনুকরণ করার চেষ্টা করে থাকে। মায়ের চারিত্রিক গুণাবলী দ্বারা শিশুর চারিত্রিক বিকাশ শুরু হয়। কন্যা সন্তান বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মায়ের আচার-আচরণ রপ্ত করে থাকে। সুতরাং মাকে হতে হবে আদর্শবান। একজন মা হলেন একটি শিশুর জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। মা ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী ও দৈনন্দিন জীবনে ইসলামী অনুশাসন পরিপালনে প্রত্যয়ী হয়ে থাকলে তার প্রজন্মও সে আদর্শে উজ্জীবিত হওয়ার কথা। তাই আমরা বলতে পারি ইসলামী শিক্ষায় নারীর অবস্থান এর উন্নয়নে মা-এর ভূমিকা অপরিসীম। তবে 'মা' এর কষ্ট ও সাধনার স্বীকৃতি শুধু স্বামী নয় রাষ্ট্রকেও দিতে হবে, যাতে করে বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষায় নারীর অবস্থান এর উন্নয়নে তারা আশাতীত অবদান রাখতে উদ্যমী হয়।

পরিবারে দ্বীনি ইল্‌ম চর্চা

আল্লাহ্ তা'আলা নারী-পুরুষ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ইসলামের জ্ঞানার্জন ফরয করেছেন। বস্তুত ইসলামকে না জানলে সঠিকভাবে ইসলাম অনুযায়ী চলা সম্ভব নয়। গোটা জীবনই আসলে জ্ঞান অর্জনের সময়। ইসলামী পরিবারের সদস্যদের ঈমান-আকীদা, ইবাদাত, নৈতিক চরিত্র ও পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে ইসলামের মৌলিক জ্ঞান হাসিল করতে হবে। আর ইসলামের মৌলিক ও প্রাথমিক জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্র হচ্ছে পরিবার। পরিবারের শিশু কিশোরদেরকে কুর'আন, সূরা-কিরআত, দু'আ-দরূদ এবং নামায-রোযা ইত্যাদি ইবাদতের নিয়ম কানুন পরিবারেই শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা থাকা দরকার। আর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও প্রতিদিন কিছু ইসলামী জ্ঞানার্জন করা উচিৎ। আর এর মাধ্যমে পরিবারেই মুসলিম শিশু এবং বয়স্করা পেয়ে থাকেন নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা। সকলের চেষ্টা করা উচিৎ কোন দিনই যেন কুর'আন অধ্যয়ন করা বাদ না যায়। পুত্র সন্তান-কন্যা সন্তান সহ পিতা-মাতা সকলেরই উচিৎ প্রতিদিন কুর'আন তেলাওয়াত ও কুর'আনের কমপক্ষে তিনটি আয়াত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে অধ্যয়ন করা। ইসলামী পরিবারের সদস্যদেরকে প্রতিদিনই কিছু না কিছু ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করা উচিৎ। এভাবে গোটা পরিবারকে ইসলামী জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রে পরিণত করা উচিৎ। এ উদ্দেশ্যে প্রত্যেক ইসলামী পরিবারে কুর'আন, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্যের একটি ছোট-খাটো লাইব্রেরী গড়ে তোলা কর্তব্য।

সালাত কায়েম

সালাত বা নামায হলো মুসলমানদের মৌলিক ইবাদত গুলোর প্রথম ফরয ইবাদত। ঈমানের পরই সালাতের স্থান। ঈমান আনার পর কোন মানুষকে সর্বপ্রথম সালাত আদায় করতে হয়। কাফির ও মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে নামায। অর্থাৎ মুসলমান নামায পড়ে আর কাফির নামায পড়ে না। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায পরিত্যাগ করে সে কাফির। এজন্যই কুর'আনে বার বার বলা হয়েছে, তোমরা নামায কায়েম করো। এ সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে :

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

'তোমার পরিবার-পরিজনকে নামাযের নির্দেশ দাও। নামায শিক্ষা দাও, আর তুমি নিজেও তা দৃঢ়তার সাথে পালন করতে থাক।'[১] অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে :

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সালাত কায়েমকারী কর এবং আমাদের বংশধরদের মধ্য হতেও, হে আমাদের প্রতিপালক আমাদের প্রার্থনা কবূল কর।'[১] কুর'আন মজীদে নিজ সন্তানদের প্রতি লোকমান হাকিমের উপদেশাবলী উদ্ধৃত হয়েছে। তিনিও সন্তানদের নামায কায়েমের অসীয়ত করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে :

---

১. আল-কুর'আন, ২০ : ১৩২।

Dhaka University Institutional Repository

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ

'হে আমার সন্তান! নামায কায়েম করবে।'[২]

আল্লাহ্ পাক নির্দেশিত অন্যান্য ইবাদাত পালন

নামায হলো অন্যান্য ইবাদতের শিরোমনি। নামায কায়েম ছাড়া কোন পরিবারকে ইসলামী পরিবার বলা যাবে না। ইসলামী পরিবারে নামায কায়েমের সাথে অন্যান্য ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল ইবাদতসমূহ প্রতিপালিত হওয়া দরকার। প্রত্যেক ইবাদত তার গুরুত্ব অনুযায়ী পালন করতে হবে। ফরযকে ফরযের গুরুত্ব দিয়ে , ওয়াজিবকে ওয়াজিবের তাৎপর্য অনুসারে, আর নফলকে নফলের গুরুত্ব দিয়ে পালন করতে হবে। নামাযের পরই যাকাতের স্থান। বছরের শেষে নিসাব পরিমাণ অর্থ-সম্পদ থাকলে মুসলমানদের জন্য যাকাত[৩] পরিশোধ করা অপরিহার্য। যাকাত ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ। এর উপরই ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত। আল-কুর'আনে সালাত কায়িমের সাথে সাথে যাকাত প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল-কুর'আনের মোট ১৯ টি সূরার ২৯ টি আয়াতে 'যাকাত' শব্দটির উল্লেখ দেখা যায়।[৪] এর মধ্যে ৯ টি মাক্কী এবং ৯ টি মাদানী সূরা। মাক্কী সূরায় যাকাতকে মু'মিনদের একটি মহৎ গুণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সমাজ সমষ্টির কোন দায়িত্বের কথা তাতে বলা হয়নি। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যাকাত সম্পর্কিত দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে মাদানী সূরাসমূহে। নবী করীম (সা) তাঁর বহু সংখ্যক হাদীসের মাধ্যমে যাকাতের স্থান ও গুরুত্ব স্পষ্ট করেছেন। তিনি তা আদায় করার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন তাঁর উম্মাহকে এবং যারা তা দিতে অস্বীকার করে তাদের জন্য সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন। সহীহুল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত প্রসিদ্ধ হাদীসসমূহে যাকাতকে ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে।[৫] তাই নবী করীম (সা) বিভিন্ন স্থানে প্রশাসক প্রেরণের সময় তাদেরকে যাকাত সম্পর্কিত কুর'আনী গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দিতেন। যেমন তিনি হযরত মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) কে ইয়ামানে প্রেরণকালে বলেছিলেন, যখন তুমি ইয়ামানে আহলে কিতাবদের নিকট আগমন করবে, তাদের তুমি দা'ওয়াত দিবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এ সাক্ষ্যদানের জন্য। তারা যদি তা মেনে নেয়, তাহলে তাদের জানাবে যে, আল্লাহ্ তাদের উপর ফরয করেছেন দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত। তারা তা মেনে নিলে তাদের জানাবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর 'সাদাকাহ' (যাকাত) ফরয করে দিয়েছেন, যা তাদের ধনীদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদেরই গরীবদের মধ্যে বণ্টণ করা হবে। তারা এ কথা মেনে নিলে তারপর তোমাকে সতর্কতা অবলম্বন করতে

---

১. আল-কুর'আন, ১৪ : ৪০।

২. আল-কুর'আন, ৩১ : ১৭।

৩. যাকাত শব্দের অর্থ হলো, পবিত্রতা, ক্রমবৃদ্ধি ও আধিক্য। কেননা, যাকাত আদায়ের মাধ্যমে বাহ্যিকভাবে সম্পদ কমলেও প্রকারন্তরে এর পরিবর্তন ঘটে। এছাড়া এর মাধ্যমে সম্পদ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয় এবং আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি থেকে সমাজ হয় মুক্ত ও পবিত্র। ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায়- জীবন-যাত্রার অপরিহার্য প্রয়োজন পূরণের পর সম্পদে পূর্ণ এক বছরকাল অতিক্রম করলে ঐ সম্পদ থেকে নির্দিষ্ট এক অংশ আল্লাহ্ নির্ধারিত খাতে ব্যয় করাকে যাকাত বলা হয়। সুতরাং যাকাত হচ্ছে, বিত্তবানদের ধন-সম্পদের সেই অপরিহার্য অংশ যা সম্পদ ও আত্মার পবিত্রতা বিধান, সম্পদের ক্রমবৃদ্ধি সাধন এবং সর্বোপরি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভের আশায় নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করা হয়। ইমাম ইব্‌ন তাইমিয়া বলেন, যাকাত প্রদানের মাধ্যমে যাকাত আদায়কারীর মন ও আত্মা পবিত্র হয়, বৃদ্ধি পায় তার ধন ও সম্পদ। এই ক্রমবৃদ্ধি ও পবিত্রতা কেবল ধন-মালের মধ্যেই সীমিত থাকে না, বরং তা যাকাত প্রদানকারীর মন-মানসিকতা ও ধ্যান-ধারণাও সম্প্রসারিত হয়। সম্ভবত এ দিক লক্ষ্য করেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا 'আপনি তাদের ধন-সম্পদ থেকে সাদাকাহ্ (যাকাত) গ্রহণ করুন, আপনি এর দ্বারা তাদেরকে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করবেন।' সুতরাং দারিদ্র বিমোচনের জন্য সমাজের সামর্থবান লোকদের উপর তার সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ দরিদ্র ও অসহায় লোকদের মাঝে দান করা অপরিহার্য।

৪. ফুয়াদ 'আবদুল বাকী, *আল-মু'জামূল মুফাহারাস লি আলফাযিল কুর'আনিল-কারীম* (কায়রো: দারুল হাদীস, ১৯৮৮ খৃস্টাব্দ), পৃ: ৪২০-৪২১।

৫. ইমাম বুখারী, *সহীহুল-বুখারী* (রিয়াদ: দারুস-সালাম, ১৯৯৯ খৃস্টাব্দ), পৃ: ৫; ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ* (রিয়াদ: দারুস-সালাম, ১৯৯৮ খৃস্টাব্দ), প্রাগুক্ত, পৃ: ২৯।

Dhaka University Institutional Repository

হবে যে, তাদের ধন-মালের উত্তম অংশ যেন তুমি নিয়ে না নাও, আর মাযলুমের ফরিয়াদকে অবশ্যই ভয় করবে। কেননা তার ও আল্লাহ্র মাঝে কোন আবরণ থাকে না।[১] এ হাদীসে সালাত এবং যাকাত আদায়ের জন্য নবী করীম (সা) বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ঈমানের সাক্ষ্য দেওয়ার পর সালাত এবং যাকাতকে ভ্রাতৃত্ববোধের সেতুবন্ধন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

যাকাতের গুরুত্ব

যাকাতের গুরুত্ব ও মর্যাদা এত অপরিসীম যে, আরবের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে যে সব প্রতিনিধি দল নবী করীম (সা)-এর নিকট সাক্ষাতের জন্য আগমন করত তিনি তাদের প্রত্যেককেই সালাত কায়িমের পাশাপাশি যাকাত প্রদানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতেন। এ প্রসঙ্গে জারির ইব্ন আব্দুল্লাহ্র বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন,[২] 'আমি রাসূলের (সা) হাতে সালাত কায়িম, যাকাত প্রদান ও প্রত্যেক মুসলিমকে উপদেশ দেওয়ার জন্য বায়'আত করেছি।' নবী করীম (সা) যাকাতের গুরুত্ব অনুধাবন করানোর জন্য এর অনাদায়কে যুদ্ধের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে সতর্কবাণী উচ্চরণ করেছেন এভাবে,[৩] 'আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল, নামায কায়িম করবে এবং যাকাত আদায় করবে।' যাকাত শুধু এই উম্মতের উপর ফরয নয় বরং পূর্ববর্তী সকল নবীর উম্মতের উপরও এটি ধর্মীয় ফরয রূপে প্রচলিত ছিল। সম্পদের কিয়দংশ আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয়ের রীতি সুদূর অতীতে সকল উম্মতের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। এমন কোন উম্মতই অতিবাহিত হয়নি যাদের প্রতি দরিদ্রকে সাহায্য ও স্বজাতির সেবা করার আদেশ দেয়া হয়নি। কিন্তু এ বিষয়ে ইসলামের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, ইসলাম কেবলমাত্র সাহায্য-সেবার আদেশ প্রদান করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং প্রতিটি ধনবান মুসলিমের উপর যাকাত ফরয করে সকল আয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব করতঃ প্রতি বছর তা আদায় করা অবশ্য কর্তব্যরূপে ঘোষণা দিয়েছে।[৪] এ ছাড়া ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় সাম্য অর্জনের অন্যতম মৌলিক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসেবে যাকাতকে গণ্য করা হয়েছে। সমাজে আয় ও সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে বিরাজমান পার্থক্য হ্রাসের জন্য যাকাত একটি অত্যন্ত উপযোগী হাতিয়ার। কিন্তু যাকাত কোন সেচ্ছামূলক দান নয় যা দরিদ্র ও অভাবগ্রস্থদের দয়া করে দেয়া হয়। যাকাত হলো, ধন-সম্পদ থেকে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্থদের জন্য আল্লাহ্ নির্ধারিত বাধ্যতামূলক প্রদেয় নির্দিষ্ট অংশ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

'আর তাদের সম্পদে রয়েছে নিঃস্ব ও বঞ্চিতদের অধিকার।'[৫]

যাকাত ছাড়াও মুসলমান নারী-পুরুষের জন্যে সব সময় দান-সদকা করা কর্তব্য। ইসলামে দানের বড়ই মর্যাদা রয়েছে। একটি বীজ থেকে যেমন অগণিত ফসল জন্ম নেয়, তেমনি একটি দানের জন্যও আল্লাহ্র নিকট রয়েছে অগণিত প্রতিফল। রোযাও ইসলামী ইবাদতের একটি মৌলিক স্তম্ভ। রমজান মাসের রোযা রাখা প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে ফরয। এ মাসে ইসলামী পরিবারে তাকওয়া ও রহমতের পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যায়। সামর্থবান ব্যক্তিদের জন্যে হজ্জ করা ফরয। আর্থিক সামর্থ থাকলে প্রত্যেক নারী-পুরুষের ওপর হজ্জ করা আবশ্যক। এটাকে কোন মুসলিম এড়িয়ে যেতে পারবে না। হজ্জের মাধ্যমে বিশ্ব মুসলিমের মধ্যে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হয়।

---

১. *সহীহুল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪।

২. *সহীহুল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৫।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

৪. আব্দুল খালেক, "অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যাকাত", *ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৬৮।

৫. আল-কুর'আন, ৫১ : ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও ইবাদতের আরো অনেক পন্থা রয়েছে। প্রত্যেক মুসলমানেরই সেসব জানা ও মেনে চলা কর্তব্য। এ ক্ষেত্রে কন্যা সন্তানদেরকে পুত্র সন্তানদের সমহারে সম্পৃক্ত করতে হবে।

পরিবারে ইসলামী আদব আচারের পরিবেশ সৃষ্টি

ইসলামী পরিবারের যাবতীয় কাজ-কর্ম ও আচার-অনুষ্ঠান ইসলামী আদর্শ ও নীতি অনুযায়ী সম্পন্ন হতে হবে। পরিবারের সকল সদস্যেরই কর্তব্য হলো তারা তাদের জীবনের সব সময়ে ইসলামের নমুনা পেশ করবেন। তাদের গোটা নৈতিক চরিত্রের মাধ্যমে মানুষ যেন ইসলাম ও মুসলমানদের প্রকৃত আদর্শের পরিচয় পেতে পারে। তাদের চিন্তা ভাবনা, কথা বার্তা ও আমল আখলাক হতে হবে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ পরিচয়বাহী। তাদেরকে এমন ভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে করে তাদের আশপাশের লোকেরা এ আদর্শে উজ্জীবিত হয় এবং ইসলামকে উপলব্ধি করতে পারে। ইসলামী আদর্শের দাবি ও তাদের জীবনধারার মাঝে তেমন কোন পার্থক্য থাকবে না; এবং ইসলামী পরিবারের সদস্যদের নিম্নোক্ত দোষক্রুটি থেকে মুক্ত থাকতে হবে।

(১). ফরয, ওয়াজিব ইবাদতসমূহে গাফিলতি। এ কাজ মানুষকে ইসলামী জিন্দেগী থেকে দূরে সরিয়ে দেয়; (২). এমন সব রসম-রেওয়াজ ও আচার-অনুষ্ঠান পালন করা যা গুণাহ্, এমনকি শির্কের পর্যায়ে পড়ে; (৩). অপরের দোষ খুজে বেড়ানো; (৪). কারো পিছনে তার দোষ চর্চা করা; (৫). কারো প্রতি মিথ্যা বা অপবাদ আরোপ করা;(৬). আমানতের খেয়ানত করা; (৭). কারো প্রতি হিংসা বা বিদ্বেষ পোষণ করা; (৮). কাউকে গালাগালি করা; (৯). কারো প্রতি যুলম ও অন্যায় আচরণ করা; (১০). কাউকে লজ্জা দেয়া; (১১). কাউকে উপহাস করা; (১২). কারো মনোকষ্ট দেয়া; (১৩). ইনসাফ না করা; (১৪). ধোকা দেয়া প্রতারণা করা; (১৫). কারো ক্ষতি সাধন করা; (১৬). আদান প্রদানে হেরফের করা; (১৭). ওয়াদা ভঙ্গ করা; (১৮). স্বার্থপরতা; (১৯). মিথ্যা কথা বলা;(২০). কুধারনা; (২১). সংকীর্ণতা ও (২২). সন্দেহ পরায়ণতা।

এসব অসৎগুণ থেকে পিতা-মাতা নিজেদেরকে ও সন্তানদের দূরে রাখতে হবে। আর সকল কাজ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যে করতে হবে। দুনিয়ার তুলনায় পরকাল গড়ার কাজে বেশী ব্যস্ত থাকতে হবে। নিজের ও সকলের কল্যাণ কামনা করতে হবে। সত্যবাদী হতে হবে। পরস্পরকে ভাল কাজে উৎসাহিত করতে হবে। অপরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। উদার ও প্রশস্ত মনের অধিকারী হতে হবে। মানুষকে ক্ষমা করে দিতে হবে। সৎ কাজে আন্তরিকতা থাকতে হবে। মানুষের সাথে হাসিমুখে কথা বলতে হবে। পরস্পরের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি থাকতে হবে। পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসা শিখতে হবে। মুত্তাকী হতে হবে। মানুষের কল্যাণে কাজ করার মানুসিক অনুভুতি তৈরী করতে হবে। সকল ক্ষেত্রে কন্যা সন্তানের সুষ্ঠু মানবিক বিকাশের পরিবেশ তৈরী করতে হবে।

পারিবারিক বৈঠক

ইসলামী শিক্ষায় নারীর অবস্থানের উন্নয়নে পারিবারিক কাঠামোতে পারিবারিক বৈঠক অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ বৈঠক ইসলামী পরিবার গঠনের একটি বড় উপায়। প্রতি সপ্তাহে অন্তত একদিন এ বৈঠকের আয়োজন করা প্রয়োজন। এ বৈঠকে দ্বীনের আলোচনা হবে এবং পারস্পরিক পারিবারিক সৌহার্দ্য সৃষ্টিতে ব্যাপক কার্যকর ভূমিকা রাখবে। বৈঠকের ধরন এরূপ হতে পারে-

১. যে কোন একজন বৈঠকের প্রারম্ভে কালামে পাক থেকে ছোট্র একটি মুখস্ত সূরা অনুবাদ সহ তেলাওয়াত করবেন।
২. দরসে কুর'আন বা কুর'আনের ব্যাখ্যা পেশ। সদস্যদের যে কোন একজন ১ অথবা ২টি আয়াতের দারস এর পাশাপাশি ফিকহ[১]-এর বিভিন্ন মাসয়ালা-মাসায়েল পেশ করবেন।

---

[১]. আল্ ফিক্হ শব্দটির ফা অক্ষর যের এবং কাফ অক্ষরে সুকূন দিয়ে পঠিত। আভিধানিক দৃষ্টিতে শব্দটি আইন, বুঝ, সঠিক জ্ঞান, সূক্ষ্মদর্শিতা, গভীর জ্ঞান, গবেষণার মাধ্যমে ধর্মীয় বিষয়াদিতে দূরদৃষ্টি লাভ এবং উপস্থিত জ্ঞানের সাহায্যে অনুপস্থিত জ্ঞান অর্জন ইত্যাদি অর্থে এসে থাকে। এক কথায় ধর্মতত্ত্ব এবং এতদসংক্রান্ত ব্যাপক, গভীর এবং সূক্ষ্মজ্ঞানকেই ফিক্হ বলা হয়। যেমন আরবদের পরিভাষায় বলা হয়ে থাকে, 'অমুক ব্যক্তিকে দীন বিষয়ে বোধশক্তিদান করা হয়েছে।' পরিভাষায় শরী'আতের মৌলিক

৩. হাদীস অধ্যয়ন হতে পারে। পরিবারের অপর কোন সদস্য হাদীস পাঠ করে এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবেন।

দলীল সমূহের ভিত্তিতে বাস্তব জীবনের কাজ কর্ম সংক্রান্ত আহকাম সমূহের জ্ঞানকেই ফিক্হ বলা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় আখিরাতের জ্ঞান এবং আত্মার সূক্ষাতিসূক্ষ্ম বিপদাপদ ইত্যাদি বিষয়ে অবগত হওয়াকে বলা হতো। এ সময় ফকীহ বলতে জাগতিক মোহ পরিত্যাগকারী, আখিরাতের প্রতি আকর্ষণ পোষণকারী, পাপ সম্পর্কে সজাগ, 'ইবাদতে সদামগ্ন এবং মুসলিম সমাজের সম্মান ও মর্যাদা সংরক্ষণকারী ব্যক্তিকে বুঝানো হতো। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে ফিক্হ হচ্ছে 'মানুষের জন্য কল্যাণকর বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত হওয়া।' ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর মতে 'ফিক্হ হচ্ছে বিশদ দলীল প্রমাণ হতে আহরিত শরী'য়াতের ব্যবহারিক বিধান সম্পর্কিত জ্ঞান'। ইব্ন খালদূনের (মৃত ৮০৮ হজরী/১৪০৬ খ্রীষ্টাব্দ) মতে 'আল্লাহ্র পক্ষ হতে আদিষ্ট অবশ্য পালনীয়, নিষিদ্ধ অনুমোদিত, অপছন্দনীয়, বৈধ প্রভৃতি বিষয়ে আল্-কুর'আন, সুন্নাহ ও ধর্ম প্রবর্তক কর্তৃক অনুমোদিত প্রমাণাদির মাধ্যমে নির্ধারিত আহকাম বা বিধি বিধানকে ফিক্হ বলে।'
ফিক্হ-ই ইসলামীর বিষয় বস্তু হচ্ছে মুকাল্লাফ, তথা বালিগ, ও সুস্থ জ্ঞানের অধিকারী মানুষের আমাল বা কার্যাদি, ইসলামী শরী'আতের বিধান মতে মানুষের, যাবতীয় কাজ দুভাগে বিভক্ত। যথা শরী'আত সম্মত এবং শরী'আত পরিপন্থী। শরী'আত সম্মত কাজ গুলি ৬ ভাগে বিভক্ত। যথা ফরয,ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব, নফল, এবং মুবাহ। গায়র মাশরু বা শরী'আত পরিপন্থী কাজগুলোও দু'প্রকার। যথা (১) হারাম, ও (২) মাকরুহ। ফিক্হ ইসলামীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে 'দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানে কামিয়াবী ও সফলতা লাভ করা।' আল্লাহ্র সাথে সংশ্লিষ্ট হক বা কর্তব্য সমূহ এবং বান্দার সাথে সংশ্লিষ্ট হক বা কর্তব্য সমূহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করতঃ সে অনুযায়ী 'আমল করাই দুনিয়ার সফলতা। আর এগুলি পালন করার দ্বারা আল্লাহ্র দীদার ও রেযামন্দি তথা জান্নাত লাভ করাই পরকালীন সফলতা। ইসলামী জিন্দেগীতে পবিত্র কুর'আন এবং সুন্নাহর পরেই ফিক্হ এর স্থান। এ জন্য ফিক্হের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। পবিত্র কুর'আনের যথার্থ জ্ঞান যেমন হাদীসে দক্ষতার্জনের উপর নির্ভরশীল;হাদীস অনুধাবন তেমনি ফিক্হ অনুধাবনের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ ফিক্হের জ্ঞান না থাকলে কুরআন-হাদীস বুঝা সম্ভব নয়। এ জন্যই আল্লাহ্ পাক কুর'আনুল করীমে 'ইলমে ফিক্হ শিক্ষার উপরে তাগিদ দিয়ে ঘোষণা করেন, 'সমস্ত মুমিনেরই অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়। তাই তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হলনা যাতে তারা দ্বীন অনুধাবনের জন্য কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তাতে দক্ষতা হাসিল করে এবং সংবাদ দান করে (অবহিত করে) স্বজাতিকে যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, যেন তারা বাঁচতে পারে।' রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'একজন ফকীহ শয়তানের উপর হাজার আবিদ অপেক্ষা কঠোর। রাসূলুল্লাহ (সা) আরও বলেন, 'প্রতেক বস্তুরই স্তম্ভ আছে; দীন-ইসলামের স্তম্ভ হলো ফিক্হ।' রাসূলুল্লাহ (সা) আরও বলেন, 'ফিক্হ সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য কিছু সময় বসা, ষাট বছর নফল 'ইবাদত করার চেয়েও উত্তম।' 'ওমর (রা) বলেছেন, 'নেতৃত্ব হাসিল করার পূর্বে তোমরা ফিক্হ হাসিল কর।' ফিক্হ-এর উৎস হচ্ছে, কর'আন, সুন্নাহ, ইজমা' এবং কিয়াস। এ চারটি উৎসের সাথে আরও কয়েকটি আনুষঙ্গিক উৎস হচ্ছে, আল-ইসতিহ্সান, ইসতিস্হাব ও 'উরফ। তবে মূল উৎস পূর্বোক্ত চারটিই। [ড. মুহাম্মদ রাওয়াস ও ড. মুহাম্মদ হামেদ সাদেক, *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা* (করাচী: ইদারাতুল-কুর'আন ওয়াল 'উলূমিল ইসলামিয়্যাহ, তা. বি.), পৃঃ ৩৪৮; *আল-কামূস আল-ফিক্হ* (পাকিস্তান: ইদারাতুল কুর'আন ওয়াল 'উলূমিল ইসলামিয়্যাহ, ১৩৯৭ হিজরী/১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দ), পৃঃ ২৮৯; *Encyclopeadia of Religion and Ethics*, Vol-7 (Great Brilani: Morrison and Gibb, Limited, ১৯৫৯), পৃ. ৮৫৮.; 'আব্দুল্লাহ আল-বুস্তানী আল-লিবনানী, *আল-বুসতান*, ২য় খ. (বৈরুতঃ মাতবাআত আল-আমীরকানিয়্যহ, ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ), পৃঃ ১৮৩৯; স্যার 'আব্দুর রহীম, অনুবাদঃ গাজী শামছুর রহমান, *ইসলামী আইন তত্ত্ব* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৪), পৃঃ ১; লুইস মা'লূফ, আল-মুনজিদ ফীল লুগাহ ওয়াল আ'লাম, ২য় খ. (বৈরুতঃ মাকতাবাতুশ শারকিয়্যাহ, ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দ), পৃঃ ৫৯১] ; যামাখশারী (র) বলেন, 'ফিকহের মূল কথা হল, অনুসন্ধান করা ও খুলে দেয়া', [মাওলানা মুহাম্মদ ইস্হাক ফরিদী ও অন্যান্য, *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, ১ম খ. (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪১৭ হিজরী/১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দ), পৃঃ ১২; সাইয়েদ মুশতাক 'আলী শাহ, তা'আরুফে ফিক্হ, ১ম খ. (লাহোরঃ মাকতাবায়ে হানাফিয়্যাহ, তা. বি.), পৃঃ ৪; ড. ইবরাহীম আনাসী, *আল-মু'জামুল ওয়াসিত* (দেওবন্দঃ হুসাইনিয়্যাহ কুতুব খানা, ২য় সংস্করণ, ১৪১৭ হিজরী/১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ), পৃঃ ৬৯৮; গাজী শামছুর রহমান, *ইসলামী আইন তত্ত্ব*, পৃঃ ১; ইব্ন মানযুর, *লিসানুল-'আরব*, ১০ম খ. (বৈরুতঃ দারু ইয়াহইয়া আত্-তুরাসুল 'আরবী, ৩য় সংস্করণ, ১৪১৩ হিজরী/১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দ), পৃঃ ৩০৫]; রাগীব ইস্পাহানী (র) বলেন, উপস্থিত জ্ঞানের সহায়তায় অনুপস্থিত জ্ঞান অর্জন করা। [*ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৫শ খ. (ঢাকাঃ ইসলামি ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দ), পৃঃ ৬৯] ; আনওয়ার-রিফা'ঈ বলেন, 'কোন বিষয়ে জানা, বোঝা, অনুধাবন করা এবং তাতে সূক্ষ্মদৃষ্টি, দক্ষতা ও পারদর্শীতা অর্জন'। [*আল-ইসলাম ফী হাযারাতিহি ওয়া নায্মিহি* (বৈরুতঃ দারুল ফিক্র, ১৪১৭/১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ), পৃঃ ৫৬১।]

Dhaka University Institutional Repository

৪. পারিবারিক পরামর্শ। সংসারের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মুক্ত আলোচনা ও প্রয়োজনীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
৫. সংশোধনের উদ্দেশ্যে সমালোচনা। পরিবারের কোন সদস্যের মধ্যে কোন ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা বৈঠকে উপস্থাপন করে তাকে শুধরে নেয়ার জন্যে পরামর্শ প্রদান করা।
৬. পুত্র ও কন্যা সন্তানদের ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের অনুসারী করতঃ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপর অধিকতর গুরুত্বারোপ।
৭. পরবর্তী বৈঠকের সময় নির্ধারণ।

এভাবে বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষায় নারীর অবস্থানের উন্নয়নে পারিবারিক কাঠামোর আলোকে কাজ করে গেলে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হবে বলে আশা করা যায়।

ইসলামী আদর্শের বাস্তবায়ন

ইসলাম হলো আল্লাহ্‌র দ্বীন তথা আল্লাহ্‌ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা। এ দ্বীনকে বিজয়ী করার লক্ষ্যেই আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন। রাসূল পাক (সা) তাঁর গোটা জীবনকে এ দ্বীন প্রচারে অতিবাহিত করেন। আমাদের দেশ একটি মুসলিম দেশ। দেশে কোন ইসলামী আইন চালু নেই, আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠিত নেই। অথচ আল্লাহ্‌র মনোনীত জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্যেই এসেছে। রাসূল (সা)-এর অবর্তমানে এ দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব তাঁর উম্মতের ওপর ন্যস্ত। বাংলাদেশে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অবস্থা একই ধরনের। এ দেশের নারীর অবস্থানের উন্নয়নে ইসলামী আদর্শের বাস্তবায়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। তাই পারিবারিক কাঠামা থেকেই ইসলামী আদর্শের বাস্তবায়নের সূচনা হওয়া দরকার। ইসলামকে ব্যক্তি জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে প্রয়োজন অবিরাম সাধনা। এর জন্য দরকার অব্যাহত প্রচেষ্টা। এ সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

'হে ঈমানদার লোকেরা, আমি তোমাদের এমন একটি ব্যবসায়ের সংবাদ দিব কি, যা তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে নিষ্কৃতি দিবে? তা হচ্ছে এই যে, তোমরা আল্লাহ্‌ ও রাসূলের প্রতি প্রত্যয়শীল হবে আর তোমাদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করে যাবে। এটাই হচ্ছে তোমাদের জন্যে কল্যাণকর পন্থা, যদি তোমরা জ্ঞান রাখো।'[১]

আল্লাহ্‌ অন্যত্র ইরশাদ করেন :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ

'আল্লাহ্‌ সেসব লোকদের ভালোবাসেন, যারা সীসাঢালা প্রাচীরের মত কাতারবন্দী হয়ে তাঁর পথে লড়াই করে।'[২]

সর্বপরি ইসলাম নারীর অবস্থানের উন্নয়নে নানারূপ ত্যাগ-তিতীক্ষা নিয়ে ইসলামী অনুশাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক হতে হবে।

ইরশাদ হচ্ছে :

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

'জেনে রেখো তোমাদের সম্পদ ও সন্তানাদি পরীক্ষার সামগ্রী বিশেষ। আর আল্লাহ্‌র নিকট প্রতিফল হিসেবে অনেক কিছুই রয়েছে।'[৩]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে :

---

১. আল-কুর'আন, ৬১ : ১০।
২. আল-কুর'আন, ৬১ : ৪।
৩. আল-কুর'আন, ৮ : ২৮।

Dhaka University Institutional Repository

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

'সন্তান ও সম্পদ তো দুনিয়ার জীবনের এক সাময়িক চাকচিক্য মাত্র। বস্তুতপক্ষে টিকে থাকা নেক আমলই তোমার রবের নিকট পরিণামের দৃষ্টিতে অনেক উত্তম। আর এর প্রতিই উত্তম প্রত্যাশা করা যেতে পারে।'[১]

আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

'মানুষের জন্য তাদের মনঃপূত জিনিস নারী, সন্তান, স্বর্ণ রৌপ্যের স্তূপ, বাছাই করা ঘোড়া, গৃহপালিত পশু এবং ক্ষেত-খামার বড়ই আনন্দদায়ক ও লালসার বস্তু বানিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এগুলো দুনিয়ার একেবারেই ক্ষণস্থায়ী জীবনের সামগ্রী মাত্র। আর সর্বোত্তম আশ্রয় তো রয়েছে আল্লাহ্‌র হাতে।'[২]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে :

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

'হে নবী বলে দিন! তোমাদের পিতা-মাতা, তোমাদের সন্তান-সন্ততি, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়স্বজন, তোমাদের উপার্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা বাণিজ্য যার মন্দ হওয়াকে তোমরা ভয় করো, আর তোমাদের ঘরবাড়ী যা তোমরা খুবই পছন্দ করো- এগুলো যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় হয়, তবে তোমরা অপেক্ষা করো যতক্ষণ না আল্লাহ্ তাঁর চূড়ান্ত ফায়সালা তোমাদের সামনে পেশ করেন, বস্তুত আল্লাহ্, ফাসেক লোকদের হেদায়েত করেন না।'[৩]

মোটকথা ইসলামী আদর্শের বাস্তবায়নে মু'মিনের জীবন হবে আল্লাহ্‌র বিধান মুতাবিক। তাতেই হবে সফলতা ও কল্যাণ।

ইসলামী ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে সন্তান পরিপালন করা

বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষায় নারীর অবস্থান এর উন্নয়নে পরিবারে ইসলাম ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে সন্তান পরিপালন করার পরিবেশ তৈরী করতে হবে। সেখানে কন্যা সন্তান পুত্র সন্তান কোন ভেদাভেদ থাকবে না। ছাত্র জীবনে মেয়ে শিক্ষার্থীরা ইসলামী ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে। পারিবারিক গণ্ডিতেই কন্যা সন্তানদেরকে ইসলামী শিক্ষার প্রতি উৎসাহিত করতে হবে। সামাজিক জীবনের দায়িত্ব পালনের জন্যে আত্মগঠনের সময়কালকে বলা হয় ছাত্র জীবন। বিশেষ করে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবনই হলো ছাত্র জীবন। ছাত্ররাই ভবিষ্যতে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করে। তারাই হয় জাতির কর্ণধার। আদর্শ সমাজ গড়ার দায়িত্ব ছাত্রদেরকেই পালন করতে হয়। ছাত্র জীবনের আদর্শ সামাজিক জীবনকেও করে তোলে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত। ইসলামী শিক্ষা ও নারী শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরতে হবে তাদেরকেই। তাদেরকেই সমাজের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে দায়িত্ব নিতে হবে। ইসলামী ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ের জন্য অভিভাবক ও ছাত্রদের নিম্নলিখিত দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করতে হবে।

১. ছাত্রদের পড়ালেখার উদ্দেশ্য হবে জ্ঞানার্জন;

২. জ্ঞানার্জনের লক্ষ্য হবে মানুষ হিসেবে এবং আল্লাহ্‌র খলীফা হিসেবে দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্জন;

৩. শিক্ষার মাধ্যমে মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও শারীরিক যোগ্যতা অর্জনে প্রয়াস চালাতে হবে;

৪. জ্ঞান ও শিক্ষার আলোকে জীবন গড়ে তুলতে হবে; ইসলামী শিক্ষার উন্নয়নে প্রচেষ্টা চালাতে হবে;

[১] আল-কুর'আন, ১৮ : ৪৬।

[২] আল-কুর'আন, ৩ : ১৪।

[৩] আল-কুর'আন, ৯ : ২৪।

Dhaka University Institutional Repository

৫. পিতা-মাতা সন্তানদেরকে পড়া বুঝে পড়ার তাগিদ করবেন এবং সঠিক অধ্যয়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;
৬. শিক্ষার্থীরা শিক্ষককে সম্মান ও শ্রদ্ধা করবে। শিক্ষক এর কোন মত ও বক্তব্য মেনে নিতে না পারলে শ্রদ্ধার সাথে নিজ মত প্রকাশ করবে। যুক্তি সহকারে দ্বিমত পোষণ করবে;
৭. সন্তান নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত হচ্ছে কি না সন্তানের সময়ানুবর্তিতা ও নিয়মানুবর্তিতার প্রতি অভিভাবককে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে;
৮. শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের বক্তব্য মনযোগ সহকারে শুনবে এবং অধ্যয়নের সময় মনযোগ সহকারে করবে। হাতের লেখা সুন্দর করবে;
৯. নিষ্কলুষ চরিত্র গড়ে তুলতে হবে এবং
১০. ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা শিক্ষক ও অভিভাবককে চালাতে হবে।

২. সামাজিক কাঠামো গঠন

সামাজিক সংস্কার

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। নানা প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও বন্য প্রাণীর আক্রমণ থেকে নিজেদের জীবন রক্ষার ও দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণের জন্য মানুষ সুদূর অতীতকাল থেকেই শ্রেণী ও সংঘবদ্ধ হয়ে বসবাস করে আসছে। সংঘ ও শ্রেণীবদ্ধ সমাজকে যুগে যুগে গতিশীল ও নতুন আঙ্গিকে প্রাণবন্তু ও আলোর পথ দেখিয়েছেন মহাপুরুষ ও নবী-রাসূলগণ। অতীতে নবী-রাসূল মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী সমাজকে নীতি-নৈতিকতার আলোকে সাজিয়ে মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বর্তমানে নবী-রাসূল আগমনের ধারা বন্ধ। তাই নবী-রাসূল-এর প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলীর দায়িত্ব বর্তায় সমকালীন আলিম সমাজ ও সমাজ সংস্কারক ধর্মচিন্তাবিদ ও সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায় বা জাতির রাষ্ট্র প্রধানের উপর। এ সংস্কার নারী-পুরুষ সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। বিশেষ করে যখন সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি, মূল্যবোধ, দর্শন, প্রথা-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সমাজস্থ লোকের জন্য ক্ষতির কারণ হিসেবে দেখা দেয় তখন সামাজিক ইতিবাচক পরিবর্তন সকলের কাম্য হয়ে যায়। এ পরিবর্তনকে বলা হয় সমাজ সংস্কার।[১] তাই বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষায় নারীদের অবস্থান-এর উন্নয়নে সর্বপ্রথম সামাজিক সংস্কার জরুরী।

আদর্শ পরিবারের দায়িত্ব আদর্শ সমাজ কাঠামো গঠন

পরিবার হলো সমাজের উপাদান। আদর্শ পরিবার ব্যতীত আদর্শ সমাজ গঠন করা অসম্ভব। এ পরিবার যখন সমাজে দায়িত্ব পালন করবে তখনই সমাজ হয়ে উঠবে আদর্শ; সমাজ কাঠামো সকল দিকই হয়ে উঠবে গঠনমূলক। স্বাভাবিকভাবেই নারী-পুরুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে; সমাজের মানুষের জীবন হয়ে উঠবে সুন্দর ও আলোকজ্জল। মানবতার কল্যাণ ও আলো ছড়িয়ে পড়বে সর্বত্র। আধুনিক সভ্যতা স্ববিরোধী সভ্যতা। এ সভ্যতা শিল্পের চূড়ান্ত শিখর দখল করেছে। বিজ্ঞানে অসাধারণ বিজয় এনেছে, গবেষণায় গৌরব অর্জন করেছে। কিন্তু উন্নত রুচি, মনুষত্ব ও শালীন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরিচয় দিয়েছে দারিদ্রের এবং প্রচণ্ড দৈন্যের। এ সংস্কৃতি গ্রহণ করার পর একজন মুসলমান এর পক্ষে পবিত্র নির্মল লজ্জাশীল শালীন ও সাধারণ জীবন-যাপন সর্বপরি হযরত মুহাম্মদ (সা) এর প্রদর্শিত পথে থাকা সম্ভব নয়। আর এ সমস্যা কেবল পরিপূর্ণ ও সংস্কৃতি গ্রহণ করলেই হয়না; বরং আংশিকভাবে কিংবা সাময়িকভাবে এ সংস্কৃতির আলোকে গড়া সমাজে অবস্থান করলেও হয়। কেননা সামাজিক পরিবেশেই ব্যক্তি স্বীয় জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এক সময় ব্যক্তি মনের অজান্তে অপসংস্কৃতির কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে যায়। তাই আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় নৈতিকতা বিবর্জিত সংস্কৃতি পরিহার করে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের লালন ও মানবিক চারিত্রিক অভ্যাস গড়ে তোলার প্রতি তাকিদ দিতে হবে। সাথে সাথে স্বীয়

---

[১]. সম্পাদনা পরিষদ, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, (ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, সংখ্যা-৭৬, জুন-২০০৩ খৃস্টাব্দ), পৃ. ১৪১।

Dhaka University Institutional Repository

পরিবার ও পরিবেশে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা তথা কল্যাণময় সমাজ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পুত্র ও কন্যা সন্তানকে সমভাবে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।[১]

সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে ইসলামী চেতনার বিকাশ

আদর্শ সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে ইসলামী চেতনার বিকাশ অত্যন্ত জরুরী। সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে ইসলামের আদর্শিক দিক-নির্দেশনা রয়েছে। যার বাস্তবায়নে সমাজের মানুষের মধ্যে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা হবে। পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে। সুখ-দুঃখ নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিবে ও সর্বদা নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায়ে রাখবে। সমাজ ব্যবস্থার ভবিষ্যত নেতৃত্ব আজকের শিশু, এদের ইসলামী চেতনায় উজ্জীবিত করতে হবে এবং তাদের মাঝে ইসলামের মহিমা তুলে ধরতে হবে। কন্যা সন্তান হোক আর পুত্র সন্তান হোক তাদেরকে ইসলাম ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে জীবনমান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

কন্যা সন্তান ও পুত্র সন্তানের শিক্ষায় সমতা

সমাজে কন্যা সন্তান ও পুত্র সন্তানের শিক্ষায় সমতা রক্ষা করতে হবে। সমাজের কোন পরিবার কন্যা সন্তানের শিক্ষায় অবহেলা করলে কন্যা সন্তানের যে শিক্ষায় সমান অধিকার ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সে বিষয়ে সবাই মিলে তাকে সচেতন করে তুলতে হবে। পরিবারের পক্ষ থেকে শিক্ষা সামগ্রীর যোগান ও প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ে পুত্র ও কন্যা সন্তানের মধ্যে সর্বদা সমতা রক্ষা করতে হবে। পিতা-মাতাকে সচেতনতার সাথে কোনকিছু দেয়ার ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সমতা নিশ্চিত হয়। শিক্ষা, সংস্কৃতি, অধিকার সকল ক্ষেত্রে পুত্র ও কন্যা সন্তানের মাঝে সমতা নিশ্চিত থাকা প্রয়োজন।

সামাজিক ক্রিয়াকর্মে নারীর অংশগ্রহণের ব্যবস্থা

সামাজিক সামঞ্জস্যশীল ও সংগতিপূর্ণ ক্রিয়াকর্মে নারীর অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। সেক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত পরহেযগার নারীদেরকে সমাজের নারীবান্ধব কাজের দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে। নারীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত পাঠাগার, কুর'আন শিক্ষা কেন্দ্র, নৈতিকমান উন্নয়নে পাঠচক্র, তা'লিমে দ্বীনের ব্যবস্থার দায়িত্ব প্রদান করা। ইসলামী আদর্শের চর্চা ও প্রতিষ্ঠায় সমাজভিত্তিক যোগ্য ও নিষ্ঠাবান নারী নেতৃত্ব সৃষ্টিতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এ সকল দায়িত্বশীলাদের মাধ্যমে ইসলামী ভাবধারায় সংস্কৃতি চর্চা ও বিনোদনের আয়োজন করা যেতে পারে। আবার পরিবেশগত কারণে নারী-পুরুষের যৌথ অনুষ্ঠানেও ইসলামের বিধানের আলোকে তাদের সম্পৃক্ত করতে কোন বাধা নেই। এভাবে সামাজিক পর্যায়ে নারী সমাজের উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার।

সামাজিক অবক্ষয় রোধ

সাধারণত কোন সমাজের অবক্ষয়ের জন্য মানুষ কোন একক ব্যক্তি বা কতিপয় ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠীকে দায়ী করে থাকে। কোন কোন সমাজ চিন্তাবিদ মানুষের এ চিন্তা-চেতনার সাথে একমত পোষণ করেন না।[২] তাদের মতে সত্যিকার অর্থে একজন মানুষ সমাজে অবক্ষয় সৃষ্টি করতে পারে না। কেননা ভালো সমাজে কোন মন্দ লোকের সমাজ নষ্ট করার বা সমাজ নষ্ট করে সেখান থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোন সুযোগ থাকে না। যে সমাজ ও সংস্কৃতি মন্দ কাজে উদ্বুদ্ধ করে না সে সমাজ মন্দ লালিত হওয়ারও পরিবেশ দিতে নারাজ। মন্দলোক ঐ সমাজে পরিবেশগত প্রতিকূলতা মনে করে সেখানে তার আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না এবং সমাজ বিধ্বংসী কোন কাজ করার সাহস পায় না। প্রতিটি যুগেই ভাল মন্দের, সৎ-অসতের অবস্থান ছিল। তাই বলে সকল মন্দ কাজের জন্য মন্দ লোকদের দায়ী করা এবং সকল মন্দের দায়ভার তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া সঠিক নয়। সমাজে কিছু

---

১. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, *ইসলামী জীবন বিধান*, অনুবাদ- মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, (ঢাকা: মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০০৪ খৃস্টাব্দ), পৃ. ২৩।

২. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, *নতুন পৃথিবীর জন্য দিবস*, অনুবাদ: আব্দু রাযযাক নাদভী (ঢাকা: মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০০৪ খৃস্টাব্দ),পৃ. ১৮১।

Dhaka University Institutional Repository

মন্দলোকের প্রকাশ হলেও এর অর্থ এই নয় যে, সম্পূর্ণ জীবনাচারের কর্তৃত্ব তাদের হাতেই ছিল, তারা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে সমাজ পরিচালনা করত। প্রকৃত কথা হলো, যে সমাজের ভিত তথা মানুষের আত্মায় পচন ধরে সে সমাজের অবক্ষয় প্রতিরোধ করা মানুষের বাহ্যিক প্রতিরোধ দ্বারা সম্ভব নয়। তাই কোন একক ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠীকে সে সমাজের অবক্ষয়ের জন্য দায়ী করাও সঠিক নয়। সে সমাজের অবক্ষয় প্রতিরোধ করা আত্মিক পরিবর্তন ছাড়া সম্ভব নয়। মোটকথা এ পর্যায়ে আত্মার পবিত্রতার অনুশীলন প্রয়োজন।[১] এ পরিবেশ পারিবারিক ও সামাজিক উদ্যোগের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। তবেই বাংলার এ মাটিতে ইসলামী শিক্ষায় নারীর অবস্থান এর উন্নয়ন সম্ভব।

সমাজের সর্বক্ষেত্রে ইসলামী মূল্যবোধ সৃষ্টি

সমাজে যেভাবে উন্মুক্ত আকাশ সংস্কৃতি, ইন্টারনেট, ফেইসবুক, টুইটার ও যত্রতত্র পর্ণোগ্রাফির অপসংস্কৃতির ব্যবহার চলছে, তা যদি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে নেয়া না হয় তাহলে উচ্চতর পর্যায়ে গৃহিত নীতি শিক্ষাদান ব্যবস্থা কোন ফল বয়ে আনবে না। সম্প্রতি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী নির্যাতন বিরোধী আন্দোলনের ফলে বাংলাদেশ সরকার ও মহামান্য আদালত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট সকলের উপর একটি নির্দেশনা জারি করেন। এই নির্দেশনা বা প্রজ্ঞাপন 'বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে'র মাধ্যমে দেশের সব পাবলিক ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য পাঠানো হয়েছে। সেখানে যৌন অভিযোগের সাথে জড়িত যে কোন ব্যক্তির শাস্তির সুপারিশ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক আইনে ছাত্র-ছাত্রীদের চলা-ফেরার ক্ষেত্রে যে ধরনের আইন রয়েছে সেখানে যৌন কেলেঙ্কারী বন্ধে কোন নির্দেশনা বা প্রজ্ঞাপনে কাজ হবে বলে আশা করা কঠিন। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের এ সংস্কৃতি তাদের সমাজ সংস্কৃতির ধারায় পরিণত করেছে। এখানে মনুষত্বের বিকাশে নৈতিক মূল্যবোধের চর্চা নেই, প্রাতিষ্ঠানিক কোন বাধ্যবাধকতাও নেই। অথচ মনুষত্বের বিকাশের জন্য প্রয়োজন ইসলামী মূল্যবোধ। এখানে নৈতিক মূল্যবোধকে প্রধান হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। মনুষত্বের বিকাশ যেমনিভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে, তেমনি আংশিকভাবে সমাজ ব্যবস্থার ওপরও নির্ভর করে। সমাজ ব্যবস্থায় যদি মানবিক বৃত্তি-প্রবৃত্তির বিকাশের সুযোগ এবং প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে নৈতিক বিবেচনা বর্জিত শিক্ষায় মানুষ মনুষত্বের পথ থেকে বিচ্যুত হবেই। বর্তমানে বাংলাদেশে সে অবস্থাই বিরাজ করছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাস্তব সম্মত উন্নত নীতি শিক্ষা দিলে তা ব্যবহারিক জীবনে কার্যকর হবে, যদি সেগুলোকে কার্যকর করার মত সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পরিবেশ ও মানব পরিস্থিতি দেশে গড়ে তোলা যায়।[২] সুতরাং সরকারকে শুধু প্রজ্ঞাপন জারি করলেই চলবে না, সকল ক্ষেত্রে নীতি নৈতিকতার সাথে চলার উপযুক্ত পরিবেশও তৈরী করতে হবে; অপসংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে। বিদেশী অপসংস্কৃতির ধারক ও বাহক টিভি চ্যানেলসহ এ ধরনের সকল বিতর্কিত টিভি চ্যানেল, ফেইসবুকে অনৈতিক পোস্ট, ব্লগ বন্ধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তবেই ছেলে সন্তান হোক আর কন্যা সন্তান হোক তারা আদর্শ নৈতিকতাপূর্ণ সামাজিক বিকাশের পরিবেশ লাভ করবে।

ইসলামী শিক্ষায় সামাজিক পর্যায়ে নারীর অবস্থানের উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ

ইসলামী শিক্ষায় সামাজিক পর্যায়ে নারীর অবস্থানের উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সমাজের সাধারণ মানুষের মধ্যে নারী শিক্ষার প্রতি যে অনীহা রয়েছে তা দূর করতে হবে। গ্রাম কিংবা শহর সর্বত্রই অভিভাবকদের অনেকেই কন্যা সন্তানদের উচ্চ শিক্ষা নিয়ে স্বপ্ন দেখেন না। তারা মনে করে থাকেন মেয়েকে একটা মুটামুটি বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারলেই যথেষ্ঠ যা সচেতন অভিভাবকদের নিকট থেকে কাম্য হতে পারে না। বাংলাদেশের

---

১. ড. মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন, *'সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদবী ঃ ধর্ম ও সমাজ চিন্তা'* (পিএইচ. ডি থিসিস) [ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, নভেম্বর ২০০৮ খৃস্টাব্দ], পৃ. ২৩০।

২. ডা. লুৎফর রহমান, *ডা. লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র*, সম্পাদনা, হুমায়ুন কবির চৌধুরী (ঢাকাঃ চৌধুরী এন্ড সন্স, ২০০৩ খৃস্টাব্দ), পৃ. ১২-১৩।

Dhaka University Institutional Repository

নারী শিক্ষার অগ্রগতিতে এটা প্রধান অন্তরায় বলা যেতে পারে। এ অবস্থার পরিবর্তন হওয়া জরুরী। কন্যা সন্তানদের ইসলামী শিক্ষা শিশুকাল থেকেই নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি সমাজে ঘরোয়াভাবে কুর'আন শিক্ষার ব্যবস্থা করা জরুরী। এতে করে মেয়েরা সহজেই কুর'আন শিক্ষার পাশাপাশি আরবী ও ধর্মীয় শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ লাভ করবে। এ উদ্যোগের ক্ষেত্রে প্রথমত মহিলা শিক্ষিকা নিয়োগের চেষ্টা করতে হবে, যোগ্য মহিলা শিক্ষক পাওয়া না গেলে সৎ, নিষ্ঠাবান, মুত্তাকী পুরুষ শিক্ষক বিবেচনা করা যেতে পারে। সামাজিক আঙিনায় ইসলামী শিক্ষার এ পর্ব শেষে আদর্শ, ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান অথবা মাদ্‌রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে অভিভাবকদের উদ্যোগ নিতে হবে। কারণ আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আজকের ছোট্ট কন্যা সন্তানটি আগামী দিনের একজন নিষ্ঠাবান যোগ্য মা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। এক্ষেত্রে ব কর্মময় নারীকে সামাজিকভাবে উৎসাহ প্রদানের জন্য অভিভাবককে ভূমিকা রাখতে হবে।

৩. প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠন

শিক্ষার শুরু থেকেই ইসলামী শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ

একটি সমাজে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের বসবাস। দ্রুত শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটিয়ে নারীদেরকে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করার জন্য সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। সরকারী পর্যায়ে স্কুলসহ ও সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার শুরু থেকেই ইসলামী শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত মানব সম্পদের উন্নয়নে নারীদের সম্পৃক্ত করা।[১]

'মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে। তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, যার সূচনা প্রাথমিক বা প্রথম স্তরের শিক্ষা দ্বারা। যা মাধ্যমিক শিক্ষার বিভিন্ন কাঠামোর মধ্য দিয়ে এবং পরবর্তীতে মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ কারিগরি প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা অব্যাহতভাবে চলতে থাকে।'

সরকারী প্রচেষ্টার পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোও সচেষ্ট হতে থাকে। তাদের সমুদয় উন্নয়ন কার্যক্রমে এমন নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে যাতে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের জনশক্তি দ্রুত দক্ষ মানব সম্পদে উন্নীত হতে পারে এবং কর্মচারিদের মেধা ও দক্ষতা যাতে কল্যাণকর কাজে ব্যয়িত হয়। হাদীছে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করে বলা হয়েছে,[২] 'যে ব্যক্তি ইসলামে একটি ভাল কাজের প্রচলন করে এরপর অন্য ব্যক্তি ঐ কাজটি করে, তখন তার জন্য (প্রথম প্রচলনকারী) অনুরূপ পুরস্কার লেখা হয়, তবে তাদের পুরস্কার থেকে কিছু হ্রাস করা হয় না। শিক্ষার শুরু থেকেই ইসলামী শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ ব্যতীত বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষায় নারীর অবস্থানের কাঙ্খিত উন্নয়ন সম্ভব নয়।

মাদ্‌রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন

ইসলামী শিক্ষার মূল ও বুনিয়াদির ভিত্তি হলো মাদ্‌রাসা শিক্ষা। মাদ্‌রাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন ব্যতীত কোন অবস্থাতেই বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষায় নারীর অবস্থানের উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ শিক্ষাকে এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে যাতে করে এ শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষার্থীরা প্রচলিত সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিতদের সাথে যে কোন ধরনের প্রতিযোগিতায় যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়। কুর'আন, হাদীস, ফিক্‌হ-এর পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সহ জ্ঞানের সকল শাখায় যুগের চাহিদা অনুযায়ী যোগ্যতা অর্জনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

---

[১] এ প্রসঙ্গে Harbison এবং Mayers বলেন, Human resource are developed in many ways. The most obvious is by formal education, beginning with primary or first level education, continuing with various forms of secondary education, and then higher education including the colleges, universities and higher technical instituts. *(Harbison and Myers,* ibid. P. 2.)

[২] *সহীহুল মুসলিম,* ২য় খ., পৃ. ৩৪১।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণ করতে হবে। সকল মাদ্‌রাসাতেই মানবিক ও বিজ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবসা-ব্যবস্থাপনা ও ভকেশনাল শাখা চালু করতে হবে। বিজ্ঞানের সমৃদ্ধ ল্যাব-এর ব্যবস্থা থাকতে হবে। অপরদিকে আধুনিক ও মান সম্মত স্কুল-কলেজের মত সম মানের অবকাঠামোগত নির্মাণ ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে 'ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা' পাঠ্যক্রমের বাস্তবায়ন

বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষায় নারীর অবস্থান-এর উন্নয়নের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে 'ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা' সিলেবাসে যে সব বিষয় সম্পর্কে পাঠদান করা হয় শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবনে তার কোন প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় না। এ ধরনের সিলেবাস বা বিষয় দ্বারা সর্বজনীন কোন উন্নয়ন আশা করা যায় না। বর্তমান সিলেবাসে কোন বিষয়েরই কোন বিস্তর আলোচনা উপস্থাপন করা হয়নি; বরং সকল বিষয়েরই শুধুমাত্র ধারণা দেয়া হয়েছে। এটা কোন মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য সমৃদ্ধ সিলেবাস বলা যায় না। কুর'আন, হাদীসের ব্যাপক ভিত্তিক সিলেবাস প্রণয়ন করে বাংলা ইংরেজীর মত সম্পূর্ণ বাধ্যতামূলক করতে হবে। ছেলে-মেয়ে সকল শিক্ষার্থীর নৈতিক ও উন্নত চরিত্র গঠন করেত সৎ ও নিষ্ঠাবান জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগাতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যাতে করে শিক্ষার্থীরা বাস্তবে ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী হয় সেজন্য সরকারকে ও উদ্যোগ গ্রহণে তৎপর হতে হবে।

উচ্চতর পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক হিসেবে অন্তর্ভুক্তিকরণ

উচ্চশিক্ষায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের জন্য ইসলামী শিক্ষার অন্তত একটি কোর্স সিলেবাসভুক্ত করতে হবে। এ উদ্যোগ গ্রহণ করলে উন্নত ও আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার পথ আমাদের সামনে উন্মুক্ত হতে পারে; যা মনীষীগণ আশা পোষণ করেছেন। "বিজ্ঞানের বই, উন্নত কবিতা, কাব্য, ভালো উপন্যাস, জীবনী, ইতিহাস, উন্নত চিন্তা, ধর্মীয় গ্রন্থ, এসব নিত্র পাঠ করলে মানুষের প্রভূত কল্যাণ হয়- দিন দিন মানুষ উন্নত হয়। যে সমস্ত যুবকের সৎ সাহিত্যের সাথে সংস্রব নেই, যারা অনুন্নত নিম্ন সমাজে সদা মেশে, কথা বলে, আলাপ করে, ভদ্র সমাজে উঠা বসা করেনা তাদের রুচি, চরিত্র, ব্যবহার দিন দিন জঘন্য ও কদর্য হতে থাকে। অহঙ্কার, অশিক্ষা, মন্দভাব, সংকীর্ণতা তাদের জীবন ও মনকে অজ্ঞাতসারে দুর্গন্ধময় করে, যা তারা নিজেরা বুঝতে পারে না।"[১] নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা যদি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় না থাকে তাহলে আমাদের শিক্ষার্থীরা তা শিখবে কোথা থেকে। পেশাগত জীবনে নীতি নৈতিকতার একটা বড় প্রশ্ন দেখা দেয়। আর নৈতিকতার উপর গভীর জ্ঞানই একজন মানুষকে নীতির উপর অটল থাকতে সহযোগিতা করে। " তবে সমাজের মানুষের মানবিকীকরণের তথা মনুষ্যত্ব বিকাশের লক্ষ্যেও শিক্ষা হতে পারে, পৃথিবীর অনেক দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সে লক্ষে পরিকল্পিত। মনুষ্যত্ব উদবোধক শিক্ষার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষা অপরিহার্য। মনোবৃত্তির কিংবা মানস-প্রবণতার অপরিহার্য বাঞ্ছনীয় পরিবর্তন ঘটানোর ক্ষেত্রে আমাদের দেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অবদান সামান্য। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় মানুষের সামাজিক গুণাবলী বিকাশের কিংবা মানবিকীকরণের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার কোন সুযোগ শিক্ষক, অভিভাবক, কিংবা ছাত্র কারও জন্যই রাখা হয় নি। এ জন্যই দেখা যায় যারা সার্টিফিকেটের বিচারে সবচেয়ে শিক্ষিত ও কীর্তিমান, অনেক ক্ষেত্রে নিচতা, হীনতা মনুষত্যে ও অবমাননায়ও তারা সবচেয়ে নিপুণ ও কীর্তিমান। এ লোকগুলো শিক্ষিত হয়ে খারাপ কাজগুলো এমনই নেপুন্যের সাথে করে যে, সাধারণ মানুষ তা বুঝে উঠতে পারে না।"[২] তাই উচ্চতর পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষাকে সিলেবাসভুক্ত করে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে সৎ ও নিষ্ঠাবান নাগরিক ও ইসলামী আদর্শেও অনুসারী করে গড়ে তুলে বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষায় নারীর অবস্থানের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টিতে উদ্যোগ গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন।

---

১. লুৎফর রহমান, *ডা. লুৎফর রহমান রচনা সমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০।
২. আবুল কাশেম ফজলুল হক, *'শিক্ষা মনুষ্যত্ব-উদবোদক হয় না কেন'?*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার্থীদের মাঝে ইসলামী মূল্যবোধ ও নৈতিকতার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর লক্ষ্য জাতীয় পর্যায়ে অবদান রাখার ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি তৈরী। দক্ষ জনশক্তিই দক্ষ মানব সম্পদ। নৈতিক শিক্ষা মানব সম্পদ উন্নয়নে সহায়ক, মনস্তাত্ত্বিক উন্মেষের ক্ষেত্রে কার্যকর এবং কল্যাণকর মানসিকতা রূপায়ণ অদ্বিতীয়, কর্মে প্রেরণা সৃষ্টিকারী বিষয় হিসেবে অতুলনীয়। মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের উন্মেষ শুধু প্রয়োজনীয় নয়, অপরিহার্যও বটে। হাদীসে বলা হয়েছে,[১] 'মানুষকে কল্যাণকর যা কিছু দেয়া হয়েছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে উত্তম চরিত্র।' নৈতিকমান এমন একটি বিষয় যা মানুষকে কোন রকম বাহ্যিক চাপ ব্যতিরেকেই দক্ষতা, আন্তরিকতা ও সততার সাথে কাজ করার উৎসাহ দান করে।[২] ইসলামের আলোকে নৈতিক দর্শন বলতে যা বুঝায় তা হলো কুর'আন-সুন্নাহ ভিত্তিক নৈতিকতা। অর্থাৎ পবিত্র কুর'আন ও সুন্নাহ যে নির্দেশনা দিয়েছে তা চরিত্রে অনুরূপ রূপায়ণ করা এবং এর বিধি-নিষেধ অনুসরণ করার মাধ্যমেই চরিত্রে নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব। ইসলামে নৈতিক চরিত্রের ব্যাপারে যে নীতি ও নির্দেশনা দেয়া হয়েছে তার পরিধি অনেক বিস্তৃত। ইসলামের নৈতিক শিক্ষা শুধু দার্শনিক তত্ত্ব বা পুঁথিগত বিদ্যা হয়েই রয়ে যায়নি বরং এই নৈতিক দর্শনকে সারা বিশ্বের মানুষের জন্য নিদর্শন হিসেবে উপস্থাপনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবীর (সা) জীবনে বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়ে প্রত্যয়ন পূর্বক ঘোষণা করেন,[৩] 'আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।' অনুরূপভাবে রাসূল (সা) নিজেই বলেছেন,[৪] 'মহান নৈতিক গুণাবলী পরিপূর্ণ করার উদ্দেশ্যেই আমি প্রেরীত হয়েছি।' মহানবীর (সা) জীবনে সকল নৈতিক গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছিল। তাঁর মধ্যে ন্যায় পরায়ণতা, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, আমানতদারি, প্রতিশ্রুতি পালন, সততা, নিষ্ঠা, উদারতা ও কর্তব্য পরায়ণতা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। যার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে মানব জাতির অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

'তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূলের (সা) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।'[৫]

অথচ বর্তমান বিশ্বের মানব সমাজ উত্তম জীবনাদর্শকে পরিহার করে পাপাচার, অশ্লীলতা প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং পার্থিব ক্ষণস্থায়ী ভোগ-বিলাসের মোহে নৈতিক গুণাবলী হারিয়ে অনৈতিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়েছে। এই অনৈতিক কাজগুলোর মধ্যে বর্তমান সময়ে যে কাজগুলো মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে বিশ্ববাসীকে হতবাক করে দিয়েছে তা হলো সন্ত্রাস, এইডস, দূর্নীতি ও মাদকাসক্তি। ইসলামী আচরণ বিধির একটি গুরুত্বপূর্ণ মর্মার্থ হচ্ছে, সম্ভাব্য সর্বাধিক দক্ষতা, সততা ও নিষ্ঠার সাথে কর্ম সম্পাদনের জন্য ব্যক্তির নৈতিক শক্তি বা মানকে জোরদার করা। নির্ধারিত কর্মের ব্যাপারে একজন মুসলিম ব্যক্তিকে নিম্নোক্ত বিবেচ্য বিষয়গুলো দ্বারা চালিত হতে হবে। প্রথমতঃ কর্মচুক্তি হচ্ছে ওয়াদা বা অঙ্গীকার, শরী'আহ সম্মত কোন কারণ ব্যতীত, ছোট খাটো কোন কারণে তা ভঙ্গ করা যেতে পারে না। কুর'আনুল কারীমে বলা হয়েছে :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

'অঙ্গীকার পূর্ণ কর, নিশ্চই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।'[৬]

---

১. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, ৪র্থ খ., (বৈরুত: দারুল ফিকর, তা. বি.), পৃ. ২৭৮।

২. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক, *ইসলামি অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি, ইসলামি ব্যাংকিং জার্নাল*, জুলাই-ডিসেম্বর (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ১৯৯৯ খৃস্টাব্দ) পৃ. ১৪।

৩. আল-কুর'আন, ৬৮ : ৪।

৪. 'আলাউদ্দীন আলী আ-মুত্তাকি, *কানযুল উম্মাল ফী সুনানিল আকওয়াল আফ'আল*, ৩য় খ. (হায়দারাবাদ: দায়িরাতুল মা'আরিফ আল-উছমানীয়্যা, ১৯৫১ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৯।

৫. আল-কুর'আন, ৩৩ : ২১।

৬. আল-কুর'আন, ১৭ : ৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

কাজের চুক্তিনামা ও নির্ধারিত শর্তাবলী অনুযায়ী কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে এটি একটি নৈতিক বাধ্যবাধকতা। ইসলাম এভাবেই সকল কাজকেই নিয়োগকারী ও নিয়োজিতদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে। এতদ্ব্যতীত, একজন স্বনিয়োজিত ব্যক্তিও আল্লাহ্‌র সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ, যদি তার নিজের জন্যও হয়। সুতরাং প্রত্যেককেই আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে কর্ম-সম্পাদনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। আল্লাহ্ স্পষ্টতই সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন :

وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

'তোমাদের কাজ সম্পর্কে তোমাদের নিকটে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।'[১]

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। কাজেই প্রত্যেকেই তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।'[২] দ্বিতীয়তঃ আল-কুর'আনে জোরালোভাবে আদেশ দেয়া হয়েছে যে, কেউ পুরো পারিশ্রমিক গ্রহণ করলে তার বিপরীতে পুরো কাজও করে দিতে হবে। যেমন, আল্লাহ্‌র বাণী :

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

'দূর্ভোগ তাদের জন্য, যারা লোকের কাছ থেকে মেপে নেয়, তখন পূর্ণমাত্রায় নেয় এবং লোকদেরকে মেপে দেয় কিংবা ওজন করে দেয়, তখন কম করে দেয়।'[৩]

তৃতীয়তঃ একজন ইসলামী ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত কাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য আরেকটি তাকিদ বিদ্যমান এই কারণে যে, তিনি তার কাজকে ইবাদত বলে গণ্য করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌র বাণী :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

'আমার ইবাদত করার জন্য মানব ও জ্বীন জাতি সৃষ্টি করেছি।'[৪]

ইসলাম প্রতিটি কাজকে যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্নভাবে নৈতিকতার উন্মেষ ঘটানোর প্রয়াস চালিয়েছে। মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও পরকালীন জীবন ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া কখনও সুন্দর ও সুখময় হতে পারে না। কেননা মানুষের মধ্যে এমন কিছু দিক রয়েছে যা শুধুমাত্র ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, অন্য কোন শিক্ষায় নয়। জীবন চলার পথে যে সকল ভুল-ভ্রান্তি মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে তা থেকে রক্ষা করাই ধর্মীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য। ধর্মীয় শিক্ষা উপেক্ষা করে প্রফেশনাল নলেজের উপর গুরুত্ব দিলে মানুষের মধ্যে প্রকৃত মনুষত্ববোধ সৃষ্টি হয় না। যা মণীষীদের উক্তিতে ধ্বনিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ড. কাজী দ্বীন মুহাম্মদ জে. বি. হালের একটি উক্তি উদ্ধৃতি করে বলেন,[৫]

'If you give your children three Rs. Reading, Writing and Arithmatic and do not give them 4th R, Religion they will become R, Rascal.'

'তোমরা যদি তোমাদের সন্তানদের তিন 'আর' তথা পড়া, লেখা ও অংক শিখাও এবং চতুর্থ 'আর' ধর্ম না শিখাও, তাহলে তারা পঞ্চম 'আর' অর্থাৎ বদমাশ হয়ে পড়বে।'

মওলানা আব্দুর রহীম বলেন,[৬] 'নিছক বিদ্যা শিক্ষা দু'ধারি তরবারির মত। তা যেমন ভাঙতে ও ধবংস করতে সক্ষম, তেমনি গঠন ও প্রতিষ্ঠার যোগ্যতাও তার রয়েছে। তার সঙ্গে নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা যোগ না হলে এবং সমস্ত শিক্ষার মূল নিয়ামক ও মৌল ভাবধারা নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা না হলে প্রকৃত কল্যাণমূলক ও সমাজ গঠন

---

১. আল-কুর'আন, ১৬ : ৯৩।

২. *সহীহুল বুখারী*, ২য় খ., পৃ. ১০৫৭।

৩. আল-কুর'আন, ৮৩ : ১-৩।

৪. আল-কুর'আন, ৫১ : ৫৬।

৫. ড. কাজী দ্বীন মুহাম্মদ, *শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার পৃষ্ঠপোষক হযরত মুহাম্মদ (স:), ছাত্র সংবাদ*, (ঢাকা: কেন্দ্রীয় দাওয়াতী কার্যক্রম বিভাগ বিআইসিএস), পৃ. ১৫।

৬. মওলানা আব্দুর রহিম, *আল-কুর'আনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৩ খৃস্টাব্দ), পৃ. ২৪০।

Dhaka University Institutional Repository

সম্ভবপর হয় না।' ধর্মীয় শিক্ষা শুধুমাত্র নৈতিক চরিত্র গ্রহণের আহ্বানই জানায় না, বরং নৈতিক চরিত্রের বিধি-বিধান, রীতি-নীতি ও মৌল আদর্শ নির্ধারণ করে দেয়। আচার-আচরণের খুটিনাটিও বলে দেয় এবং তার উপর সুদৃঢ় ও অবিচল হয়ে থাকার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। এজন্য প্রকৃত ও দক্ষ মানব সম্পদ গঠনে নৈতিক মানোন্নয়ন ও ধর্মীয় শিক্ষা আবশ্যক। তাই শিক্ষার্থীদের মাঝে ইসলামী মূল্যবোধ ও নৈতিকতার প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা একান্ত জরুরী।

পর্দা পালন ও ইসলামী জীবন-যাপন

নারীর জীবনের নিরাপত্তা ও নারীর অবস্থানের উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যক্তি জীবনে ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠা ও পরিপালনের ক্ষেত্রে পর্দার গুরুত্ব অপরিসীম। পর্দা নারীর ভূষণ। পর্দা ব্যতিত পবিত্র জীবন সম্ভব নয়। পর্দা শিক্ষা জীবনে বালক-বালিকা, নারী-পুরুষ সবার জন্য উন্নত চরিত্র ও ভবিষ্যত গঠনের সোপান। এজন্য সকল অভিভাবক ও প্রতিষ্ঠান প্রধান সহ সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতন হতে হবে। যাতে সহপাঠীদের সাথে অবাধ মেলামেশা করে বর্তমান তথাকথিত আধুনিক সংস্কৃতির জোয়ারে গা ভাসিয়ে নিজেদের নৈতিকমান নিয়ন্ত্রনে বিপর্যয় ডেকে না আনে। ইসলাম পর্দা শুধু যে নারীর জন্য ফরয করেছেন এমনটি নয়; পুরুষের উপরও পর্দা ফরয। এজন্য আমরা বলতে পারি সকল মুসলমানের উপর পর্দা ফরয। মোহাররম স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে পর্দার ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশনা হলো : পুরুষের ছতর (আচ্ছাদনীয় অংশ) নাভী থেকে হাটুর নীচ পর্যন্ত, আর নারীর ছতর হলো মুখমন্ডল, হাতের কব্জি ও পায়ের গোড়ালী বাদে বাকী শরীর। তবে নারীরা মোহাররম ব্যক্তির সামনে তাদের সৌন্দর্য্য অর্থাৎ চেহারা ও অলংকারাদি(ছতরের বাইরের) প্রকাশ করতে পারে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ

'(মু'মিন নারীরা) তাদের সৌন্দর্য্য যেন প্রকাশ না করে তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, ছেলে, সৎ ছেলে, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, স্ত্রীলোক অথবা তাদের মালিকানাধীন দাস-দাসী অথবা ঐ সব পুরুষ যাদের নারীদের গুপ্ত বিষয়ে জানার আগ্রহ প্রকাশ পায় নি তাদের ছাড়া।'[১] ইরশাদ হচ্ছে :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

'হে নবী, আপনার স্ত্রীগণকে, কন্যাদেরকে ও মু'মিন নারীদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের চাদরকে(মাথার উপর থেকে) নিচের দিকে ঝুলিয়ে দেয় এত শিগগীরই তাদের পরিচিতির ব্যবস্থা হবে এবং তারা নির্যাতিত হবে না, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।'[২]

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

'যখন তোমরা নারীদেও নিকট কিছু চাও, তখন তা পর্দার আড়াল থেকে চাও, এটা তোমাদেও অন্তরের জন্য ও তাদেও অন্তরের জন্য অধিক পবিত্রতর।'[৩]

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى*فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

---

[১]. আল-কুর'আন, ২৪ : ৩১।
[২]. আল-কুর'আন, ৩৩ : ৫৯।
[৩]. আল-কুর'আন, ৩৩ : ৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

'অতএব, তোমরা পুরুষদের সাথে কোমলভাবে কথা বলো না, যাতে যাদের অন্তরে রোগ আছে তাদের লালসার সৃষ্টি হয়। বরং কথা বলো স্পষ্টভাবে। তোমরা তোমাদের ঘরেই তোমাদের মর্যাদার সাথে অবস্থান করো এবং পূর্ববর্তী জাহেলী যুগের প্রদর্শনী করে বেড়িও না।'[১]

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ () وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

'মু'মিনদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে; এ হলো তাদের জন্য পবিত্রতম, তারা যা কিছু করে আল্লাহ্ তার খবর রাখেন। আর মু'মিন নারীদেরকে বলে দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে, তাদের সৌন্দর্য্যকে যেন প্রকাশ করে না বেড়ায়; তবে যা স্বতই প্রকাশ হয়ে পড়ে, আর তাদের চাদর যেন বক্ষের উপর জড়িয়ে রাখে আর তাদের রসৌন্দর্য্য যেন প্রকাশ হতে না দেয়। তাদের স্বামীদের তাদের পিতাদের, তাদের স্বামীর পিতাদের, তাদের পুত্রদের, তাদের স্ত্রীদের পুত্রদের তাদের স্ত্রীদের অথবা তাদের মালিকানাধীন দাসদের অথবা ঐসব পুরুষদের যাদের নারীর ব্যাপারে কোন আকর্ষণ নেই অথবা ঐসব শিশু যারা নারীর গোপনীয় বিষয়ে অনভিজ্ঞ তাদের ছাড়া(অন্যদের), আর তারা যেন সজোরে পা ফেলে না চলে যাতে তাদের গোপন সৌন্দর্য্য শোনা যায়; হে মু'মিনগণ তোমরা সকলের নিকট তাওবা করো যাতে করে যেন তোমরা সফলকাম হও।'[২]

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ () يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

'হে বনী আদম, নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের জন্য পোষাক পাঠিয়েছি যা দ্বারা তোমরা তোমাদে নগ্ন দেহকে আচ্ছাদিত কর এবং সৌন্দর্য্যও প্রকাশ করো। আর তাকওয়ার পোষাকই সর্বাধিক উত্তম, এ হলো আল্লাহ্ও নিদর্শনের অন্যতম যেন তোমরা স্মরণ করো। হে বনী আদম শয়তান যেন তোমাদেরকে কোন মন্দ কাজের পরীক্ষায় না ফেলে, যেমনিভাবে তোমাদেও আদি পিতা-মাতাকে এবাবে বেহেশত থেকে বের করে এনেছিলেন যে,তাদেও পোষাক তাদেও দেহ থেকে চ্যুত কওে দিয়েছিলেন যেন তারা দু'জনেই তারা নিজেদের নগ্ন দেহ দেখতে পায়, সে এবং তার দলবল তোমাদেরকে এমনভাবে দেখে যেভাবে তোমরা দেখতে পাও না। নিশ্চয়ই যারা ইমান আনেনি' আল্লাহ্ তাদেরকে শয়তানের বন্ধু বানিয়ে দিয়েছেন।'[৩]

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ () وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ () فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا

---

১. আল-কুর'আন, ৩৩ : ৩২-৩৩।
২. আল-কুর'আন, ৩৩ : ৩০-৩১।
৩. আল-কুর'আন, ৩৩ : ২৬-২৭।

Dhaka University Institutional Repository

يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ (قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

'অতপর শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করল যেন তাদের লজ্জা স্থানসমূহ যা তাদের পরস্পরের নিকট গোপনীয় করল, তা তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ে। সে তাদেরকে বলল, তোমাদের রব তোমাদেরকে ঐ গাছের নিকট যেতে নিষেধ করেছেন এ জন্য যে, তোমরা যাতে ফেরেস্তা হয়ে না যাও অথবা এখানে তোমরা চিরস্থায়ী হয়ে না যাও। এবং সে কসম করে বলল যে, আমি অবশ্যই তোমাদের কল্যাণকামী। এভাবে তারা দু'জনই ঐ গাছের ফলের স্বাদ গ্রহণ করল, তখন তাদের গোপনীয় স্থান তাদের নিকট উন্মুক্ত হয়ে গেল এবং তারা জান্নাতের পাতা দিয়ে নিজেদের লজ্জাস্থান ঢাকতে শুরু করল। তখন আল্লাহ্ তাদের ডেকে বললেন, আমি কি তোমাদের ঐ গাছের ব্যাপারে নিষেধ করিনি আর তোমাদেরকে আমি কি একথা বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন? তখন তারা বলল, হে আমাদের রব, আমরা আমাদের নিজেদের ওপর জুলুম করেছি, এখন যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না করো, আর আমাদের প্রতি রহম না করো তবে অবশ্যি আমরা ক্ষতিগ্রস্থদের দলভুক্ত হয়ে পড়ব।'[১]

একটি সুন্দর সুষ্ঠু সমাজ গড়ে তোলার জন্যে বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আসা সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত পর্দার প্রকৃতরূপ অজানা থাকার কারণেই এর বাস্তবতা উপলব্ধি করতে আমরা ব্যর্থ হচ্ছি। একদল যেমন শুধু কাপড়-চোপড়ে সর্বাঙ্গ মুড়ে থাকাকে পর্দা মনে করেছেন, তেমনি আর একদল মনের পর্দাকেই আসল পর্দা বলে ধরে নিয়েছেন। বস্তুত: উভয় দলই চরম ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত রয়েছেন। শুধু বাহ্যিক পর্দা রক্ষার ব্যাপারটাও অবাস্তব। আল্লাহ্ নারী এবং পুরুষকে তৈরী করেছেন। আর তাদের মধ্যে দিয়ে দিয়েছেন পরস্পরকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা। বিশেষ করে নারীকে কমনীয় সুন্দর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে আল্লাহ তৈরী করেছেন। একটি নারী যখন সুন্দর সাজ-পোশাকে সজ্জিত হয়ে বাইরে বের হয় তখন স্বভাবতই অন্যের মুগ্ধদৃষ্টি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। সেখানে মনের পর্দা রক্ষা হয় কিভাবে? মানুষকে তো আল্লাহ্ অনুভূতিহীন জড় পদার্থ বা দোষ-ক্রুটির ঊর্ধে ফেরেশতা করে তৈরী করেননি। কামনা-বাসনা উদ্রেককারী উপায়-উপাদান দিনরাত সামনে থাকার পর মানুষ নির্লিপ্ত থাকবে এটা সম্ভব নয়।

এজন্যেই নবুওয়তের দ্বাদশ বর্ষে হিজরতের প্রাক্কালে ইসলামী রাষ্ট্র গড়ার মূলনীতি পেশ করতে যেয়ে সূরা বনী ইসরাঈলে আল্লাহ্ পাক যে ১৪টি মূলনীতি পেশ করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মূলনীতি হলো, "তোমরা যেনার কাছেও যেও না।" এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক যেনা করনা বলে যেনার কাছেও যেও না বলে এমন এক সমাজ গড়ার ইঙ্গিত করছেন যেখানে পুরুষ এবং নারী মিলে পূত-পবিত্র পরিচ্ছন্ন এক সমাজ গড়ে তুলবে। যেনা-ব্যভিচার সংঘটিত হওয়ার কোন পরিবেশই সেখানে থাকবে না। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার ফলে এবং আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস এবং পরকালের জবাবদিহির অনুভূতি তাদের মনে অবর্তমান থাকলে স্বাভাবিকভাবেই একজন অন্যজনের প্রতি আকৃষ্ট হবে। এই আকর্ষণ যদি বিবাহ ছাড়াই হয় তবে সেটাই কুরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিতে ব্যভিচার। আর ব্যভিচার নির্ভর সমাজের কোন মৌলিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে নারীর অবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে পর্দার বিধান মেনে চলা আবশ্যক।

শিক্ষকদের নৈতিক মান উন্নয়নে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরন।

বিশ্বের প্রতিটি দেশে এখন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তথা উচ্চ শিক্ষার সংস্কার চলছে। একটি হচ্ছে, 'একবিংশ শতাব্দীর অর্থনীতিতে অবস্থান' করে নেয়ার সক্ষমতাসম্পন্ন শিক্ষায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার তাগিদ। আর একটি হলো 'সাংস্কৃতিক পরিচিতির চেতনা' এ সংস্কৃতির কথা উঠলেই নৈতিকতার প্রশ্ন চলে আসে। নৈতিকতা মানব জীবনের অমূল্য সম্পদ। নৈতিকতাহীন ব্যক্তি পশুর সমতুল্য, বরং পশুর চেয়েও অধম ও নিকৃষ্ট।

[১] আল-কুর'আন, ৭ : ২০-২৩।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষক এর নৈতিকমান দ্বারা শিক্ষার্থীরা প্রভাবিত হয়। বর্তমান সময়ে শিক্ষার্থীরা নৈতিকমানের দিক থেকে অনেকটাই দূর্বল। শিক্ষার্থীদের এ বিপর্যস্ত অবস্থার জন্য শুধুমাত্র শিক্ষার্থীরাই দায়ী নয় বরং শিক্ষকরাও এ জন্য অনেকাংশে দায়ী। সম্প্রতি সময়ে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে আমরা এর ভয়াবহতা লক্ষ্য করছি। রাজধানী ঢাকা ও বিভাগীয় শহরের নামী-দামী স্কুলের শিক্ষার্থীরাও কতিপয় শিক্ষক নামধারী নর পশুদের যৌন লোলুপ পশুত্ব থেকে রেহাই পায় নি। এ ধরনের অনাকাঙ্খিত ঘটনার কারণেও নারী শিক্ষার উত্তরাত্তর উন্নয়ন যে ব্যাহত হচ্ছে না তা বলা যায় না। অনেক অভিভাবক রয়েছেন যারা কন্যা সন্তানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রেরণে অনেক দুশ্চিন্তা করে থাকেন। তাই আমরা বল্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নৈতিকতা সম্পন্ন শিক্ষকদের নিয়োগ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে; এবং নিয়োগ প্রাপ্ত শিক্ষকদের নৈতিকমান উন্নয়নের লক্ষে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি কোচিং সেন্টারের নামে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের থেকে অর্থোপার্জন এর সুযোগ বন্ধ করে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মান বৃদ্ধি সহ মেয়ে শিক্ষার্থীদের পরিবেশগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। যার ফলে ছাত্রীদের শিক্ষার্জনের অনুকূল পরিবেশ তৈরী হয়।

৪. জাতীয় কাঠামো গঠন

ইসলামে নারী জাতির মর্যাদা অতি উচ্চে। শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। এ শিক্ষাকে অন্তত প্রাথমিক পর্যায় থেকে নিষ্ঠাবান নারী শিক্ষিকাদের দ্বারা দেয়া হলে শিক্ষার্থীরা অধিক আগ্রহের সাথে গ্রহণ করবে বলে আশা করা যায়। এজন্য শিক্ষকতায় ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত নারীদের অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন। যদিও বর্তমান সময়ে বাংলাদেশ সরকার প্রাথমিক পর্যায়ে নারী শিক্ষিকাকে অগ্রাধিকার দিয়ে নারীদের জন্য ৬০% কোটা নির্ধারণ করে দিয়েছে। এ অবস্থা শুধু সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নয় বরং স্কুল মাদ্‌রাসা সহ সরকারী বেসরকারী সকল প্রতিষ্ঠানেই এ বিধানের বাস্তবায়ন প্রয়োজন। এর ফলে সর্বত্র মেয়ে শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যৎ স্বপ্ন বুনতে উৎসাহিত হবে।

জাতীয় পর্যায়ে নারীর প্রতি সম্মান ও মূল্যবোধ সৃষ্টিতে সরকারী উদ্যোগ গ্রহণ

জাতীয় পর্যায়ে নারীর প্রতি সম্মান ও মূল্যবোধ সৃষ্টিতে সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে। নারীর কর্মের স্বীকৃতি দিতে হবে। কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি সম্মান ও মূল্যবোধ সৃষ্টির পরিবেশ তৈরী করতে হবে। কর্মজীবি নারীদের অফিস টাইম/কর্ম সময় নির্ধারনের ক্ষেত্রে শিথিলতা আরোপ করা প্রয়োজন। কর্মক্ষেত্রে নারী যেন সাচ্ছন্দবোধ করেন সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ঠ কর্তৃপক্ষের জন্য নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করলে বেসরকারী, অ-সরকারী, প্রাইভেট কোম্পানী সর্বত্রই এ পরিবেশ সৃষ্টি হতে থাকবে। এখানে একটি বিষয় আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে এর ফল সর্বশেষে পুরুষ সমাজেরই সংসার জীবনে শান্তিময় পরিবেশ গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

কর্মক্ষেত্রে নৈতিকতা সম্পন্ন সফল নারীদের রাষ্ট্রীয় সম্মাননা প্রদান

কর্মক্ষেত্রে নৈতিকতা সম্পন্ন সফল নারীদের রাষ্ট্রীয় সম্মাননা প্রদান করতে হবে। বর্তমান সময়ে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় সফল নারীদের নিয়ে দেখা যায় অভাবনীয় সফলতার ইতিহাস। এটা আমাদের সমাজ ব্যবস্থার জন্য আশীর্বাদই বলা যায়। এ ইতিহাসকে আরো সমৃদ্ধ করতে আমাদের অগ্রনী হতে হবে। রাষ্ট্রীয়ভাবে এদের প্রণোদনা যোগাতে হবে। কর্মক্ষেত্রে সফল নারীদের রাষ্ট্রীয় সম্মাননার ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তা নারী সমাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে। এক্ষেত্রে ইসলামের বিধান স্পষ্ট।

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Dhaka University Institutional Repository

'মুমিন হয়ে পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকর্ম করবে, তাকে আমি নিশ্চয়ই আনন্দময় জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব।'[১] অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন :

أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ

'আমি তোমাদের মধ্যে কোন কর্মনিষ্ঠ পুরুষ অথবা নারীর সৎকর্মকে বিফল করি না, তোমরা একে অপরের অংশ।'[২]

জাতীয় পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের আলোকে নারীর অবস্থানের সর্বজনীন উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ

নারী ও পুরুষের সমন্বয়ে মানবজাতির ইতিহাস সংগঠিত হয়েছে। এ দু'টি শ্রেণীর কোন একটিকে বাদ দিয়ে সুন্দর এ পৃথিবী কল্পনা করা যায় না। উন্নয়ন অগ্রগতিতে নারী-পুরুষ উভয়ের পারস্পরিক সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। তাই জাতীয় পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের আলোকে নারীর অবস্থানের সর্বজনীন উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। নারী-পুরুষ দু'টি আলাদা সত্ত্বা এবং তাদের কর্মপদ্ধতিও আলাদা। স্বাভাবিকভাবে সংসার পরিচালনার সমূদয় দায়িত্ব পুরুষের উপর ন্যস্ত থাকে। কিন্তু নারী সমাজ যে কোন কাজই করতে পারবে না; কোন চাকুরী বা কর্ম বা ব্যবসায়িক উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারবে না এমনটি নয়। ইসলামের বিধান ও অনুমিত নিরাপদ নারীবান্ধব ব্যবসায়িক উদ্যোগ গ্রহণ করতে কোন রকম বাধা ইসলামে নেই। বাস্তব ভিত্তিক ও সময়ের চাহিদা অনুযায়ী ইসলামের পরিসীমার মধ্যে অবস্থান করে নারী তার কর্মদ্যোগ বা ব্যবসায়িক উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। রাসূল (সা) এর সময়ে অনেক বিদূষী নারী ব্যবসায়িক উদ্যোক্তা ছিলেন। তারা নিজেরাই ব্যবসা শুরু করে উদ্যোক্তা হিসেবে পরিচিতি লাভ ও খ্যাতি অর্জন করেছেন। তারা বিভিন্ন সময়ে পরামর্শের জন্য রাসূল (সা) এর দরবারে আসতেন। তবে এ ব্যবসার জন্য নারী তার সম্ভ্রম রক্ষায় নিরাপদ হতে হবে। কারণ ইসলাম নারীর নিরাপত্তা বিধানে বদ্ধপরিকর। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা লাভে অগ্রসর হতে পারবে, তেমনি কৃষি ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অংশ নেয়ারও তারা পূর্ণ অধিকারী। জীবিকার জন্য বিভিন্ন কাজ কারবার, শিল্পকারখানা স্থাপন, মূল উদ্যোক্তা, পরিচালনা বা তাতে কাজ করারও অধিকার রয়েছে নারীদের।[৩] সেই সাথে সমাজ ও জাতির বহুবিধ সামষ্টিক কাজ আনজাম দেয়া তাদের জন্য নিষিদ্ধ নয়। তার মানে এই নয় যে নারীদেরকে এসব কাজে নেমে যেতে হবে। এখানে একটি বিষয় পরিস্কার যে, এগুলো জীবনের প্রয়োজন ও তাগিদে অনুমিত বিষয় মাত্র। নারী প্রয়োজন মনে করলে বা জীবিকার প্রয়োজনে এগুলো গ্রহণ করতে পারবে। এ অনুমতির চর্চা কেবলমাত্র প্রয়োজনের খাতিরেই প্রযোজ্য।[৪] ইসলাম যদিও নারীর সব অধিকার প্রদান করেছে এবং যদিও তার আইনগত ও অর্থনৈতিক যোগ্যতা পুরুষের সমান নির্ধারণ করেছে। কিন্তু ইসলাম মনে করে নারীর নিজের, তার পরিবারের ও গোটা সমাজের এটাই অধিকতর কল্যাণকর যে, সে পুরোপুরিভাবে কেবল পরিবারের কল্যাণ সাধনে আত্মনিয়োগ করবে। এ জন্যই ইসলাম তাকে সব অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছে এবং তার ভরণপোষণের ভার তার স্বামীর ওপর অর্পণ করেছে। অথচ সে ক্রয়-বিক্রয় এবং অর্থোপার্জনের যাবতীয় কাজের যোগ্য। ইসলাম নারীর ভরণপোষণের দায়িত্ব বিয়ের পূর্বে পিতার ওপর এবং বিয়ের পর স্বামীর ওপর ন্যস্ত করেছে। উদ্দেশ্য সে তার মায়ের তদারকিতে যাবতীয় ঘরকন্নার কাজে প্রশিক্ষণ লাভ করতে পারে। এরুপ প্রাজ্ঞ ও কল্যাণময় পন্থায় ইসলাম নারীর মর্যাদা রক্ষা ও সমুন্নত করে এবং তার একটি অধিকারও ক্ষুন্ন করে না। এভাবে পরিবারের সুখ শান্তিও সে সংরক্ষণ করে। স্ত্রীকে বাড়ীর বাইরে ভিন্ন কোন কাজে যেমন :

---

[১] আল-কুর'আন, ১৬ : ৯৭।

[২] আল-কুর'আন, ৩ : ১৯৫।

[৩] অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন, *ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর সম্মান ও মর্যাদা* (ঢাকা: বাংলাদেশ হাদীস সোসাইটি, এপ্রিল ২০১৪ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৪০।

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ.৪০।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবসা-বাণিজ্যে, ব্যবসায়িক উদ্যোক্তায় ইত্যাদিতে নিয়োজিত হতে সে বাধ্য করে না। সুতরাং এটা স্পষ্ট হলো যে, নারী ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসায়িক উদ্যোক্তা ইসলামে আইনগতভাবে কোন শর'ঈ কোন বাধা নিষেধ নেই।

রাসূল (সা) এর যুগে নারীর পেশাদারিত্ব

রাসূল (সা) এর যুগ ও পরবর্তী সাহাবীদের সময়ে নারীরা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ শুরু করে বর্তমান সময়ে এসে তা সমৃদ্ধ ও ব্যাপকতা লাভ করেছে। জীবনের প্রয়োজনে নারী তার বৈধ পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারবে। এ ব্যাপারে ইসলামের পূর্ণ অনুমোদন রয়েছে। সাংসারিক জীবনের প্রয়োজনে স্বামীর সংসার পরিচালনার ক্ষেত্রে সহযোগিতা দানের উদ্দেশ্যে পেশাগত কাজে কিংবা কল্যাণমূলক কাজে ব্যয়ের জন্য অর্থোপার্জন অথবা আমাদের সমকালীন সমাজে নারীদের ওপর বর্তানো কিছু অত্যাবশ্যকীয় কাজ আঞ্জাম দেয়া, যেমন মুমিন নারী ও তাদের কন্যাদের শিক্ষা ও চিকিৎসার জন্য বাইরে যাওয়া পুরুষের সাথে নারীর মেলামেশার অন্যতম কারণ। এসব অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে গিয়ে বহু ক্ষেত্রে মেয়েদেরকে এমন সব পুরুষের সাথে কিছুটা আদান-প্রদান ও ওঠা বসা করতে হয় যারা হয় মেয়েদের ব্যাপারে দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি কিংবা তাদের স্বামী কিংবা তাদের ভাই অথবা তাদের আত্মীয়-স্বজন। পেশাগত কাজের আঞ্জাম দিতে গিয়ে যেন স্বামী ও সন্তানদের অধিকার ক্ষুন্ন না হয়। কারণ পরিবারের তত্বাবধানই নারীর মৌলিক দায়িত্ব। নিম্নে রাসূল (সা) এর যুগে নারীদের পেশাদারিত্ব বা পেশাগত কাজে সম্পৃক্ততার দৃষ্টান্ত পেশ করা হলো।

"হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত রাসূল (সা) উম্মে মুবাশ্শির আনসারীর খেজুর বাগানে প্রবেশ করে তাকে বললেন, কে এ খেজুর বাগান তৈরী করেছে। মুসলিম না কাফের? উম্মে মুবাশ্শির বললেন, মুসলিম তৈরী করেছে। তিনি বললেন কোন মুসলমান যদি বৃক্ষ রোপন করে কিংবা ফসল উৎপন্ন করে আর কোন মানুষ, পশু বা অন্য কিছু তার ফল খায় তাহলে তাও তার জন্য সাদকা হিসেবে গণ্য হবে।"[১] অপর একজন মহিলা পশু চারণের কাজ করত। "সা'দ ইব্ন মু'আয থেকে বর্ণিত। কা'ব ইব্ন মালিকের একটি মেয়ে সালা' পর্বতের পাদদেশে বকরী চরাচ্ছিল। একটি বকরী আঘাত প্রাপ্ত হলে সে সেটিকে পাথর দ্বারা জবাই করে। পরে নবী (সা) কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন এর গোস্ত খাও।"[২] তৃতীয় অপর একজন মহিলা কুটির শিল্পের কাজ করতো। হযরত সা'দ ইব্ন সাহল (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন এক মহিলা একখানা 'বুরদা' নিয়ে আসলো। সা'দ জিজ্ঞেস করলেন বুরদা কি জানো? বলা হলো হ্যাঁ, প্রান্তভাগে নকশা করা বড় চাদর। সে মহিলা বললো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) ! আমি আপনাকে পরিধান করার জন্য নিজ হাতে এ চাদর বুনেছি। নবী (সা) সাগ্রহে তার নিকট থেকে সেটি নিলেন। পরে তিনি তা পরিধান করে আমাদের নিকট আসলেন।[৩]

চতুর্থ আরেকজন মহিলা নার্সিং ও চিকিৎসার কাজ করেছেন।

"হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন খন্দক যুদ্ধের সময় সা'দ আহত হলে নবী (সা) নিকটে থেকেই যাতে তার সেবা যত্ন করতে পারেন সে উদ্দেশ্যে তার জন্য মসজিদে তাঁবু খাটিয়ে দিলেন।"[৪]

"হাফেজ ইব্ন হাজার বলেছেন, ইব্ন ইসহাক উল্লেখ করেছেন যে, তাঁবুটি রুফাইদা আসলামিয়ার উদ্দেশ্যে খাটানো হয়েছিল। তিনি একজন মহিলা চিকিৎসক ছিলেন। তিনি আহতদের চিকিৎসা করতেন। নবী (সা) বলেছিলেন, তাকে (সা'দ) রুফাইদার তাঁবুতে রাখো, যাতে আমি নিকটে অবস্থান করে তার সেবা-শুশ্রূষা করতে পারি।"[৫]

---

[১]. *সহীহ মুসলিম*, পানি সেচ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : বৃক্ষ রোপন ও ফসল উৎপাদন, ৫ম খ., পৃ. ২৭।
[২]. *সহীহুল বুখারী*, যবেহ ও শিকার অধ্যায়, অনুচ্ছেদ : নারী ও দাসীর যবেহ করা জন্তু, ১২ খ., পৃ. ৫১।
[৩]. *সহীহুল বুখারী*, ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ বয়নকারী, ৫ম খ., পৃ. ২২২।
[৪]. *সহীহু বুখারী*, যুদ্ধ বিগ্রহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ আহযাব যুদ্ধ থেকে নবী (সা) এর প্রত্যাবর্তন, ৮ম খ., পৃ. ৪১৬।
[৫]. *ফাতহুল বারী*, ৮ম খ., পৃ. ৪১৯।

Dhaka University Institutional Repository

পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দুধপান করানো ও লালন পালন করা

ইরশাদ হচ্ছে :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى

"তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী নিজেরা যে স্থানে বাস করো তাদেরকেও সেখানে বাস করতে দাও। অসুবিধায় ফেলার জন্য তাদেরকে কষ্ট দিয়ো না। তারা গর্ভবর্তী হয়ে থাকলে সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত তাদের জন্য খরচ করতে থাক। তারা যদি তোমাদের সন্তানদের স্তন্যদান করে থাকে তাহলে তাদেরকে পারিশ্রমিক প্রদান করো এবং সন্তানের কল্যাণের জন্য নিজেদের মধ্যে উত্তম পন্থায় পরামর্শ করো। আর তোমরা নিজ নিজ দাবীতে অনড় থাকলে অন্য স্ত্রীলোক স্তন্য দান করবে।"[১]

"হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূল (সা) বললেন, আজ রাতে আমার একটি পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করেছে। আমার পিতার নাম অনুসারে তার নাম রেখেছি ইবরাহীম। তারপর তাকে আবূ ইউসুফ নামের এক কর্মকারের স্ত্রী উম্মে সাইফের কাছে স্তন্যদানের জন্য অর্পণ করলেন। আনাস ইব্‌ন মালেক থেকে বর্ণিত অপর একটি রেওয়ায়েতে আছে। তিনি বলেছেন, আমি নিজের সন্তান সন্ততির প্রতি রাসূল (সা) এর চেয়ে অধিক দয়ালু ও স্নেহাশীল লোক আর দেখিনি। তিনি বলেছেন, মদীনার আওয়ালী তথা পার্শ্ববর্তী এলাকায় ইবরাহীম স্তন্য দানের জন্য ধাত্রী মাতার কাছে ছিলেন। নবী (সা) তাকে দেখতে যেতেন। আমরাও তার সাথে যেতাম। তিনি তার বাড়ীতে প্রবেশ করতেন। তিনি সেখানে আগুন জ্বালতেন। তার স্বামী ছিল কর্মকার। নবী (সা) তাঁকে (ইবরাহীম) কোলে নিয়ে চুমু খেতেন এবং তার পর ফিরে আসতেন।"[২]

"জাবের ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত এক আনসারী মহিলা রাসূল (সা) কে বললো, আমার একজন কাঠমিস্ত্রী ক্রীতদাস আছে, অন্য এক বর্ণনায় আছে[৩] সে তার ক্রীতদাসকে আদেশ করলে সে তারাফা জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে এনে একটি মিম্বর তৈরী করে দিল।"[৪] অফিস/ প্রাতিষ্ঠানিক পেশাদারিত্বের দৃষ্টান্ত পেতে পারি বিশিষ্ট মহিলা সাহাবী উম্মে শারীকের এর মাধ্যমে। তিনি মেহমানদের জন্য তার ঘরের দরজা খুলে রাখতেন। প্রথম যুগের মুহাজিরগণ তাঁর বাড়ীতে অবস্থান করতেন। এটা মেহমানদের মিলন কেন্দ্র হিসেবে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ কিন্তু সেচ্ছামূলক।

আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল (সা) কোন এক আনসার কে তার পরিবার-পরিজনকে বিষাক্ত প্রাণী দংশনের কারণে এবং কানের ব্যথায় ঝাড়-ফুঁক করার অনুমতি দিয়েছিলেন।[৫] সিলসিলাতিল আহাদীসিস্ সহীহ্ গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে : "কোন এক আনসার সাহাবীর পাজরে ঘা হলে তাকে জানানো হলো যে, শিফা বিন্‌তে 'আব্দুল্লাহ্ ঘা উপশমের জন্য ঝাড়-ফুঁক করে থাকেন। সে আনসার সাহাবী লোকটি শিফা

---

১. আল-কুর'আন, ৬৫ : ৬।

২. *সহীহুল মুসলিম*, মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ শিশু ও পরিবার পরিজনের প্রতি রাসূল (সা) এর দয়া ও বিনম্র আচরণ এবং তাঁর মর্যাদা,৭ম খ., পৃ. ২৬; [আব্দুল হলীম আবু শুক্কাহ, *রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা*, ২য় খ. (ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বি.আই.আই.টি) ২০০২ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৩৬৮।]

৩. *সহীহুল বুখারী*, হিবা ও তার মর্যাদা অধ্যায়, অনুচ্ছেদ বন্ধুর কাছে কিছু চাওয়া, ৬ষ্ঠ খ. পৃ. ১২৭; ; [আব্দুল হলীম আবু শুক্কাহ, *রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা*, ২য় খ. (ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বি.আই.আই.টি) ২০০২ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৩৭১।]

৪. *সহীহুল বুখারী*, ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ কাঠমিস্ত্রী, ৫ম খ., পৃ.২২২; ; [আব্দুল হলীম আবু শুক্কাহ, *রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা*, ২য় খ. (ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বি.আই.আই.টি) ২০০২ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৩৭২।]

৫. *সহীহুল বুখারী*, চিকিৎসা অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ ফুসফুসের আবরক ঝিল্লির প্রদাহ, ১২ খ., পৃ. ২৮১; ; [আব্দুল হলীম আবু শুক্কাহ, *রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা*, ২য় খ. (ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বি.আই.আই.টি) ২০০২ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৩৭০-৭২।]

Dhaka University Institutional Repository

বিন্‌তে 'আব্দুল্লাহ্‌র কাছে গিয়ে তাকে ঝাড়-ফুঁক করতে বললে তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আমি আর ঝাড়-ফুঁক করি না। এতে আনসারী লোকটি রাসূল (সা) এর নিকট গিয়ে শিফা বিনতে 'আব্দুল্লাহ্‌ এর কথাগুলো জানালেন। তখন রাসূল (সা) শিফাকে ডেকে এনে বললেন তুমি যা পড়ে ঝাড়-ফুঁক করো তা আমাকে শুনাও । তিনি তাঁকে তা শুনালে তিনি বললেন, এ দিয়ে তুমি ঝাড়-ফুঁক করতে থাকো আর হাফসাকে যেমন লেখা শিখিয়েছো তেমনি এই ঝাড়-ফুঁক ও তাকে শিখিয়ে দাও।"[১]

বাংলাদেশে পেশাজীবী নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও মূল্যায়ন সমীক্ষা

নারী মানব সমাজে এক অনগ্রসর জনগোষ্ঠী। সর্বজনীন জীবন ব্যবস্থা ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য সকল ধর্মে জন্মের পর থেকে বৈষম্যের শিকার এ নারী সমাজ। নারীকে অন্যান্য ধর্মে কিভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে তা ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। একজন পূর্ণাঙ্গ বুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ মানুষ হওয়া সত্ত্বেও কেবলমাত্র নারী হওয়ার কারণে তাকে সকল প্রকার উন্নয়ন কর্মকান্ড থেকে এক প্রকার জোর করেই সরিয়ে রাখা হয়। বাংলাদেশ একটি মুসলিম দেশ এ দেশে নারীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সুশৃংখল কর্মপরিবেশের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন আয়মূলক কর্মকান্ডে তথা পেশা বা কর্মক্ষেত্র দখল করে নিয়েছে। তারা বিভিন্ন পেশাগত দায়িত্ব পালন করছেন সততা, দক্ষতা ও কর্মক্ষমতার সাথে। তবে এ চিত্র কিছুদিন পূর্বেও ছিল না। নারীকে যথাযথ মূল্যায়ন করা হতো না।[২] সেই সমাজে আজ নারীরা ব্যবসায়িক উদ্যোক্তা, কর্মক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সচিব থেকে শুরু করে বিচারপতি, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, ব্যাংকার, প্রভৃতি পেশায় অবস্থান তৈরী করে নিয়েছে। আর এ কারণে তাদের সামাজিক অবস্থান ও মূল্যায়ন সুসংহত হচ্ছে। তবে এসব পেশাজীবী নারীর হার খুবই কম। ফলে সমাজের প্রত্যেক ক্ষেত্রে তারা এখনো পুরুষের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে।[৩] পিছিয়ে আছে পেশায় নিযুক্তির ক্ষেত্রেও। এক্ষেত্রে অনেক সময় যোগ্যতার প্রশ্ন তুলা হলেও প্রকৃত অর্থে তা নয়, একটি পরিবর্তনের জন্য সময়ও প্রয়োজন। তবে সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে সরকারি চাকুরীর বিভিন্ন স্তরে কোটা সংরক্ষণ করায় এবং পাশাপাশি নারী শিক্ষার হার বাড়ায় এবং নারীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সচেতন ও দক্ষ হয়ে গড়ে ওঠায় সরকারি প্রশাসনে নারীদের ভাল একটা উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বে-সরকারী ক্ষেত্রেও নারীদের উপস্থিতি কম নয়।

তবে কর্মক্ষেত্রে এদেশের নারী সমাজ যদিও প্রয়োজনীয় শ্রমশক্তি হিসেবে নিজেদের অবস্থান এখনও সুদৃঢ় করতে পারেনি তথাপি সম্প্রতি বাংলাদেশের নারীদের ভূমিকায় বিরাট পরিবর্তন এসেছে। ঘরের বাইরে, রাজনীতিতে, সরকার পরিচালনায়, পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে সমাজের সর্বত্র নারীর পদচারনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, ডাক্তার, নার্স, আইনজীবি হচ্ছেন। নিজেরাই প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছেন তারা। যেমন- রাজধানী ঢাকা, বিভাগীয় ও জেলা শহর গুলোতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন স্কুল কলেজ ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শো-রুম সহ ফ্যামিলি শপ ও ফ্যাশান হাউস। এছাড়া বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান, বিসিএস ক্যাডার, ব্যাংক, বীমা, এনজিও, প্রাইভেট প্রভৃতি কর্ম প্রতিষ্ঠানে ব্যাংকার, একাউন্টট্যান্ট, করণিক, রিসেপসনিস্ট, কম্পিউটার অপারেটর পদে নিযুক্ত হচ্ছেন।[৪] যদিও অধিকাংশ নারী এখনও শুধুমাত্র গৃহীনী বা গৃহাভ্যন্তরীণ কর্মকান্ডে নিয়োজিত আছেন তবুও শহর এবং গ্রামীণ সমাজে নারীদের কাজের প্রতি অনুকূল মনোভাব দেখা যাচ্ছে।[৫] তবে গ্রামীণ এলাকায় তা কম। শহর এলাকায় শিক্ষিত

---

১. *সিলসিলাতিল আহাদিসিস সহীহা*, হাদীস নং- ১৭৮।

২. হক, নাসিমা, *নারীর পদচারণায় মুখরিত হোক রাজপথ*, (ঢাকা: *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২ মার্চ, ১৯৯৮ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৮ ।

৩. সিরাজউদ্দিন আহমেদ, *সরকারী ও বে-সরকারী চাকুরীজীবি নারীদের অবস্থান* (ঢাকা: *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২ মার্চ, ১৯৯৮ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৮।

৪. বেগম, হামিদা আক্তার ও আকন্দ, শাহরিয়ার সুস্মিতা, *পেশা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থাভেদে নারীর মানসিক সুস্থতাবোধ*, *ক্ষমতায়ন*, সংখ্যা-৩ (ঢাকা: উইমেন ফর উইমেন, ২০০০ খৃস্টাব্দ), পৃ. ১৮।

৫. Zaman, S.S. Haq, P.and Ilyas, Q.S.M., *Attitude Towards Work Among Women in Bangladesh : A Pilot Study,* Bangladesh Journal of Psychology, Vol-6, 1980, pp. 140.

Dhaka University Institutional Repository

এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারীদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় অপেক্ষাকৃত বেশি সংখ্যক নারী বিভিন্ন পেশায় নিযুক্তি লাভ করছেন। এ বিষয়ে নমুনা স্বরুপ পাবনা পৌর এলাকায় **২০০** জন নারীর উপর গবেষণা কর্ম পরিচালনা করে প্রাপ্ত নমুনা থেকে দেখা যায় ৫২ জন নারী সরকারী ও বে-সরকারী কর্মে এবং বিভিন্ন পেশায় জড়িত রয়েছেন। যারা মোট নারীর ২৬.০%। নিচের সারণিতে পাবনা পৌর এলাকায় নারীদের বিভিন্ন পেশায় জড়িত থাকার ভিত্তিতে একটি অবস্থানগত চিত্র তুলে ধরা হলো : সারণি : পৌর এলাকায় পেশাজীবী নারী

পেশার নাম	গণসংখ্যা	শতকরা
শিক্ষকতা(সরকারী/বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়+কলেজ+স্কুল ও মাদ্রাসা)	২০	৩৮.৪৭
সরকারী চাকুরী (সরকারী বিভিন্ন অফিস)	০৮	১৫.৩৮
ঔষধ ফ্যাক্টরী (স্কয়ার+ ইউনিভার্সাল+এডরুক)	০৮	১৫.৩৮
এনজিও	০৭	১৩.৪৬
ব্যাংকার	০২	৩.৮৫
ডাক্তার	০২	৩.৮৫
সেবিকা	০২	৩.৮৫
আইনজীবি	০১	১.৯২
হোসিয়ারী/দর্জি	০১	১.৯২
কম্পিউটার অপারেটর	০১	১.৯২
মোট	৫২	১০০.০০

উৎস : পাবনা পৌর এলাকা হতে সংগৃহীত তথ্য, মে, ২০১৪ ইং

উপরের সারণিতে দেখা যায়, পেশাজীবী নারীদের ৩৮.৪৭% (মোট নারীর ১০.০%) শিক্ষকতা, ১৫.৩৮% (মোট নারীর ৪.০%) সরকারী চাকুরী, ১৫.৩৮% (মোট নারীর ৪.০%) ঔষধ ফ্যাক্টরী, ১৩.৪৬% (মোট নারীর ৩.৫%) এনজিও, ৩.৮৫% (মোট নারীর ১.০%) ব্যাংকার, ৩.৮৫ (মোট নারীর ১.০%) ডাক্তার, ৩.৮৫ (মোট নারীর ১.০%) সেবিকা, ১.৯২% (মোট নারীর ০.৫%) আইনজীবী, ১.৯২% (মোট নারীর ০.৫%) হোসিয়ারী, ১.৯২% (মোট নারীর ০.৫%) কম্পিউটার অপারেটর পেশায় নিয়োজিত। এ সকল নারীদের সাথে কথা বলে জানা যায় যে, এক্ষেত্রে ইসলামই যে নারীর সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেছে তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে তারা এগিয়ে চলছে। আজ বিশ্বব্যাপী নারীদের যে অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি তা শুধুই যে ইসলামের অবদান এটা সর্বজনীন স্বীকৃত।

সরেজমিনে দেখা যায়, যে সকল পেশায় তীব্র প্রতিযোগিতা এবং নারীদের জন্য পৃথক কোটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই, সে সকল পেশায় নারীদের হার কম। নারীদের উচ্চ শিক্ষার হার কম থাকা এবং সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে প্রান্তিক অবস্থায় থাকার কারণে তাদের এসব পদে তীব্র প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কঠিন। অপরদিকে, সরকার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলোতে শিক্ষক নিয়োগ ৬০% কোটা সংরক্ষণ এবং পুরুষের তুলনায় নারীর শিক্ষাগত যোগ্যতাকে শিথিল করায় এ পেশায় ব্যাপক সংখ্যক নারীর সন্নিবেশ ঘটেছে।

বর্তমান বাংলাদেশে যে পেশাটিতে সর্বাধিক নারী জড়িত তা হলো গার্মেন্টস শিল্প। তবে পাবনা জেলায় তা ঔষধ ও কনজুমার শিল্পে। কম পারিশ্রমিক তথা কম বেতনে বেশি কাজ আদায় করে নেয়া যায় বলেই এক্ষেত্রে নারীদের প্রাধান্য। সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশে এনজিও'র বিকাশ ঘটেছে উল্লেখযোগ্য মাত্রায়। এখাত সাধারণতঃ শিক্ষিত, দক্ষ, কর্মক্ষম প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়। আর তাতে দেখা যায়, নারীদেরকে বেশি অগ্রাধিকার দিতে। আলোচ্য গবেষণায়ও অন্যান্য খাতের চেয়ে এনজিও খাতে একটি বিশেষ নারীর অংশ জড়িত থাকতে দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া সমাজের এমন কতগুলো পেশা রয়েছে যা খুব চ্যালেঞ্জিং। এসব পেশায়ও পৌর এলাকার নারীরা জড়িত রয়েছেন।
সুতরাং বলা যায়, উচ্চতর পর্যায়ের পেশায় জড়িত নারীদের সংখ্যা সাম্প্রতিক সময়ে বাড়ছে পেশাজীবী নারীদের হার বৃদ্ধির সাথে পাল্লা দিয়ে।

পেশাজীবি নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

পেশাজীবি নারীরা একটি সমাজে বসবাস করছেন এবং তাদেরও পেশার বাইরে একটি আর্থ-সামাজিক অবস্থান রয়েছে। এগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো :

পেশাজীবি নারীর বয়সভিত্তিক অবস্থান : একজন পেশাজীবি নারীর বয়স দ্বারা তার কাজে নিয়ুক্তির সময়কাল, পেশাগত কাজে সক্ষমতা, তার শারিরীক ও স্নায়ুবিক শক্তির চিত্র ফুটে ওঠে।
আলোচ্য গবেষণায় পেশাজীবি নারীদের বয়সগত চিত্র নিচের সারণিতে তুলে ধরা হলো :
সারণি : পেশাজীবি নারীদের বয়সগত অবস্থান

বয়সের শ্রেণী ব্যবধান	বয়স	শতকরা
২০-৩০	২৬	৫০.০০
৩০-৪০	১৫	২৮.৮৫
৪০-৫০	১০	১৯.২৩
৫০ +	০১	১.৯২
মোট	৫২	১০০.০০

উৎস : পাবনা পৌর এলাকা হতে সংগৃহীত তথ্য, মে ২০১৪ ইং

উপরের সারণিতে দেখা যায়, ২০-৩০, ৩০-৪০, ৪০-৫০, ৫০+ বছর বয়স্ক পেশাজীবি নারীদের হার যথাক্রমে ৫০.০% (মোট নারীর ১৩.০%), ২৮.৮৫% (মোট নারীর ৭.৫%), ১৯.২৩% (মোট নারীর ৫.০%), ১.৯২% (মোট নারীর ০.৫%)। এখানে দেখা যায়, ২০-৩০ বছর বয়স্ক নারীদের হার বেশি। যা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বিভিন্ন পেশায় নারীদের অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি তেমন বেশি দিন পূর্বের ইতিহাস নয়। তাছাড়া পেশাজীবি নারীদের সার্বিক বয়সগত অবস্থানের চিত্র থেকে বলা যায়, এসব নারীরা শারীরিকভাবে সক্ষম, কর্মক্ষমতাসম্পন্ন ও উদ্যমী। এর মাধ্যমে পেশাগত দায়িত্বও দক্ষতার সাথে পালন সম্ভব।

পেশাজীবি নারীদের বৈবাহিক অবস্থা :
বাংলাদেশে শহর এলাকায় সাধারণতঃ ২০ হতে ২৫ বছরের নারীরা বিবাহিত থাকেন। যেহেতু এ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হতে পেশায় জড়িত সকল নারীর বয়সই ২০ বছরের অধিক সেহেতু ধরে নেয়া যায় তাদের সকলেই বিবাহিত বা বিবাহের বয়স উপযোগী। নিচের সারণিতে পেশাজীবি নারীদের বৈবাহিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরা হলো- সারণি : পেশাজীবি নারীদের বৈবাহিক অবস্থা

পেশা	গণসংখ্যা	শতকরা
বিবাহিত	৩৬	৬৯.২৩
অবিবাহিত	১০	১৯.২৩
বিধবা	০৪	৭.৭০
তালাকপ্রাপ্ত	০২	৩.৮৪
মোট	৫২	১০০.০০

উৎস :পাবনা পৌর এলাকা হতে সংগৃহীত তথ্য, মে ২০১৪ইং

Dhaka University Institutional Repository

উপরের সারণিতে দেখা যায়, গবেষণা কাজে নমুনা হিসেবে ব্যবহৃত ৫২ জন পেশাজীবি নারীর মধ্যে ৩৬ জন (৬৯.২৩%) বিবাহিত, ১০ জন (১৯.২৩%) অবিবাহিত, ৪ জন (৭.৭০%) বিধবা, ২ জন (৩.৮৪%) তালাকপ্রাপ্ত।

পেশাজীবি নারীদের স্বামীর পেশা : পৌর এলাকার ৫২ জন পেশাজীবি নারীর ৩৬ জন বিবাহিত। সুতরাং তাদের স্বামীর অবস্থা জানার মাধ্যমে তাদের পারিবারিক ঐতিহ্য ও সামগ্রিকতা সম্পর্কে অবগত হওয়া যাবে। নিচের সারণিতে তা তুরে ধরা হলো :

সারণি : পেশাজীবি নারীদের স্বামীর পেশা

স্বামীর পেশা	গণসংখ্যা	শতকরা
চাকুরী	২৬	৭২.২২
ব্যবসা	০৩	৮.৩৩
কৃষি	০১	২.৭৮
দিন মজুর	০৫	১৩.৮৯
বেকার	০১	১.৭৮
মোট	৩৬	১০০.০০

উৎস : পাবনা পৌর এলাকা হতে সংগৃহীত তথ্য, মে ২০১৪ইং

উপরের সারণিতে দেখা যায়, বিবাহিত পেশাজীবি নারীদের স্বামীর পেশা হচ্ছে, ৭২.২২% চাকুরীজীবি, ৮.৩৩% ব্যবসা, ২.৭৮ % কৃষি, ১৩.৮৯ দিনমজুর এবং ১.৭৮% বেকার। এ থেকে বলা যায়, চাকুরীজীবি পুরুষের স্ত্রীরা পেশায় বেশী মাত্রায় সম্পৃক্ত হন বা চাকুরীজীবি পুরুষেরা নারীরা যে গৃহকোণে আবদ্ধ না থেকে বাইরের কাজ করতে পারে এ ব্যাপারে সচেতন। তবে এখানে দেখা গেছে, চাকুরীজীবিদের স্ত্রীরা সাধারণতঃ শিক্ষিত হয়ে থাকে এবং অনেক সময় স্বামীর উপার্জিত আয়ে সংসার চলে না আবার অনেকক্ষেত্রে স্বামী কর্মস্থলে চলে গেলে স্ত্রী একা বাসায় সময় কাটাতে সমস্যা প্রভৃতি উপাদান চাকরীজীবি পুরুষের স্ত্রীরা কোন চাকরীতে যোগদানের ব্যাপারে বেশী আগ্রহী।

পেশাজীবি নারীদের পরিবারের ধরণগত অবস্থা : সমাজের ক্ষুদ্রতম একক পরিবার নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও ক্ষমতায়ন সম্পর্কে নির্দেশ করে। পৌর এলাকায় পেশাজীবি নারীদের পরিবারের ধরণগত অবস্থা নিচের সারণিতে দেয়া হলো :

সারণি : পেশাজীবি নারীদের পরিবারে ধরণগত অবস্থা

পরিবারের ধরণ	গণসংখ্যা	শতকরা
একক	৩৪	৯৪.৪৪
যৌথ	০২	৫.৫৬
মোট	৩৬	১০০.০০

উৎস : পাবনা পৌর এলাকা হতে সংগৃহীত তথ্য, মে ২০১৪ ইং

উপরের সারণিতে দেখা যায়, ৯৪.৪৪% পেশাজীবি নারীর পরিবার একক এবং বাকী ৫.৫৬ এর পরিবারের ধরণ যৌথ। এ থেকে বলা যায়, পেশাজীবি নারীদের পরিবার কাঠামোয় আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। কারণ, একক ছোট পরিবার হলো আধুনিক কালের পরিবার।

Dhaka University Institutional Repository

পেশাগত নারীদের সন্তান গ্রহণে চিত্র : পেশাজীবি নারীরা সবসময় চান পরিবারকে ছোট রাখতে। আর এজন্য তারা সন্তানও কম নেন।

সারণি : পেশাজীবি নারীদের সন্তান-সন্ততি

সন্তানের সংখ্যা	গণসংখ্যা	শতকরা
০০	০৫	১৩.৮৯
০১	০৮	২২.২২
০২	১৫	৪১.৬৭
০৩	০৭	১৯.৪৯
০৪	০১	২.৭৮
মোট	৩৬	১০০.০

উৎস : পাবনা পৌর এলাকা হতে সংগৃহীত তথ্য, মে ২০১৪ ইং

উপরের সারণিতে দেখা যায়, বিবাহিত নারীদের ১৩.৮৯% এর সন্তান নেই, ২২.২২% এর ১টি সন্তান, ৪১.৬৭% এর ২টি সন্তান, ১৯.৪৫% এর ৩টি সন্তান এবং ২.৭৮% এর একটি সর্বোচ্চ ৪ জন সন্তান রয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পেশাজীবি নারীরা সংসার ছোট রাখতে বদ্ধপরিকর। যার জন্য অধিক সন্তান গ্রহণে তাদের আগ্রহ নেই। পেশাজীবি নারীরা সবসময় পেশাগত কাজে ব্যস্ত থাকেন এবং কাজের অতিরিক্ত চাপ সামলাতে বেশি সন্তান গ্রহণ ও তা লালন পালনে খুবই কষ্টকর দয়ে দাঁড়াবে। সেজন্য তারা বেশি সন্তান নিতে চান না।

পেশা লাভে নারীর অনুপ্রেরণা : পেশাজীবি নারীদের স্ব স্ব পেশা লাভে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করেছে বিভিন্ন উপাদান। কোন কোন নারীর বিভিন্ন উৎস হতে পেশা লাভে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন বা পেশাগত দায়িত্ব পালনে অনুপ্রেরণা পেয়ে যাচ্ছেন এবং কোন কোন নারী এক্ষেত্রে কোন অনুপ্রেরণাই কোথাও হতে পাচ্ছেন না। নিচের সারণিতে তা তুলে ধরা হলো- সারণি : নারীর পেশা লাভে অনুপ্রেরণার উৎস

পেশা লাভে অনুপ্রেরণার উৎস	গণসংখ্যা	শতকরা
স্বামী	১৬	৩০.৭৬
শ্বশুর-শ্বাশুরী	০৬	১১.৫৩
পিতা-মাতা	১২	২৩.০৭
সন্তান	০১	১.৯২
অন্যান্য	০৮	১৫.৩৮
পাননি	০৮	১৫.৩৮
মোট	৫২	১০০.০

উৎস : পাবনা পৌর এলাকা হতে সংগৃহীত তথ্য, মে ২০১৪ ইং

উপরের সারণি হতে দেখা যায়, ৩০.৭৬% নারীর স্বামী, ১১.৫৩% নারী শ্বশুর-শ্বাশুরী, ২৩.০৭% নারীর পিতা-মাতা, ১.৯২% নারী সন্তানের কাছ থেকে তাদের পেশায় নিযুক্ত হতে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন এবং বর্তমানে পেশাগত দায়িত্ব পালনে সহায়তা পাচ্ছেন। মাত্র ১৫.৩৮% নারী কারো কাছ থেকে কোন উৎসাহ বা সহায়তা পাননি। এ থেকে বলা যায়, বেশির ভাগ নারীর পেশা লাভে অনুপ্রেরণার উৎস তাদের স্বামী। এরপর পেশা লাভে অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন তাদের পিতা-মাতার দ্বারা। এর পর পারিবারিক কাঠামোয় আছেন শ্বশুর-শ্বাশুরী। এ

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা ও পর্যালোচনার ফলাফল থেকে স্পষ্ট যে নারীর পেশা লাভের ক্ষেত্রে অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। এক দশক পূর্বেও এর চিত্র লক্ষ্য করা যেত উল্টো। সে অবস্থার আজ বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এ ব্যাপারে পরিবারের পুরুষ সদস্যদের উৎসাহ উদ্দীপনাই বড় শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। এর ফলে নারীরা পেশায় নিযুক্তি লাভ করে অর্থনৈতিক ভাবে নিজেরা সাবলম্বী হয়েছে, পরিবারে এবং সমাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করছে তথা ক্ষমতা কাঠামোয় উঠে এসেছে। সামাজিক জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। জীবন মান উন্নত হয়েছে।

পেশাগত দায়িত্ব পালনে সমস্যা : আলোচ্য গবেষণায় দেখা যায়, প্রবল প্রতিযোগিতা এবং প্রতিকুলতা মোকাবেলা করে তারা এতে প্রবেশ করলেও পরবর্তীতে তাদের চাকুরীকালীন অবস্থা মোটেই কুসমাস্তীর্ণ নয়; বরং কষ্ট সংকুল। দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত। সরেজমিনে পেশাজীবি নারীদের সার্বিক বিষয়কে কেন্দ্র তাদের সাক্ষাতকার নিলে তারা প্রায় একই ধরনের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। নিম্নে একটি নমুনা সাক্ষাতকার তুলে ধরা হলো :

সাক্ষাৎকার :

গবেষক : মিসেস্ শাকিলা[১] আমাকে আপনার মূল্যবান সময় দানের জন্য অনেক কৃতজ্ঞ। আপনার কর্মক্ষেত্রে আপনি কেমন আছেন এবং একজন নারী পেশাজীবি হিসেবে আপনি কি ধরনের সমস্যার সম্মূখীন হয়ে থাকেন? একজন পেশাজীবি নারীর কর্ম পরিবেশকে ঘিরে ইসলামী মূল্যবোধের কোন কোন দিকগুলোর বাস্তবায়ন আশা করেন?

পেশাজীবি নারী : কর্মক্ষেত্রে আমি ভাল আছি। সমস্যা যে নেই তা নয়। অনেক সমস্যা রয়েছে। আমি মেয়ে মানুষ এটাই বড় সমস্যা। আমার সহকর্মীদের মাঝে এ ধারনাই বদ্ধমূল যে, আমি মেয়ে মানুষ আমি এ কাজ ও কাজ পারব না। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মেয়ে হওয়ার কারণে কোন মতামত এর মূল্যায়ন হয় না। কাস্টমারদের মাঝেও এ ধরনের মানুষিকতা লক্ষ্য করা যায়। যে কোন বিষয়ে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। বসের অনেক অনাকাঙ্খিত আচরণের শিকার হতে হয়। নিজের ব্যক্তিত্ব নিয়ে চললে খারাপ ব্যবহার করে। ভালমূখে কথা বলে না। এর ফলে নিম্ন পদস্থ কর্মচারীরাও অনেক সময় খারাপ ব্যবহার করে থাকে। মেয়েদের কোন আলাদা টয়লেট নেই, বসের টয়লেট ব্যবহার করতে হয়।

গবেষক : তাহলে এ অবস্থায় আপনি কি অনুভব করেন।

পেশাজীবি নারী : আমি মনে করি এ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। 'মেয়ে মানুষ' এ পরিভাষা ব্যবহার না করে 'মানুষ' হিসেবে মূল্যায়ন করা উচিৎ।

গবেষক : একজন পেশাজীবি নারীর কর্ম পরিবেশকে ঘিরে ইসলামী মূল্যবোধের কোন কোন দিকগুলোর বাস্তবায়ন আশা করেন?

পেশাজীবি নারী : সমস্যা অনেক তো এতো সমাধান কি করে হবে? মেয়েদের নামাযের ব্যবস্থা থাকা দরকার। আলাদা বাথরুম থাকা দরকার। সহকর্মীদের মাঝে ইসলামী মূল্যবোধ এর চর্চা থাকা দরকার, যাতে মেয়ে সহকর্মী মানুষিক নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পান।

গবেষক : আপনাকে অনেক ধন্যবাদ!

পেশাজীবি : আপনাকেও ধন্যবাদ!

নিচের সারণিতে এ সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরা হলো :

সারণি : পেশাজীবি নারীদের দায়িত্ব পালনে সমস্যা

---

[১]. উপ-সহকারী প্রকৌশলী, বিক্রয় বিতরণ বিভাগ-১, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, পাবনা, ৬ জুন ২০১৪, সময়: ১০.৩০।

Dhaka University Institutional Repository

পেশাগত দায়িত্ব পালনে সমস্যার প্রকৃতি	গণসংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	৩৩	৬৩.৪৬
মোটামুটি	১২	২৩.০৮
না	০৭	১৩.৪৬
মোট	৫২	১০০.০

উৎস : পাবনা পৌর এলাকার বিভিন্ন ব্যাংক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারী অফিস হতে সংগৃহীত তথ্য, মে ২০১৪ ইং

উপরের সারণিতে দেখা যায়, পেশাজীবি নারীদের ৬৩.৪৬% এর পেশাগত দায়িত্ব পালনে সমস্যা দেখা দেয় এবং ২৩.০৮% নারীর এক্ষেত্রে মোটামুটি বা মাঝে মাঝে সমস্যা পোহাতে হয়। মাত্র ১৩.৪৬% নারীকে এক্ষেত্রে তেমন কোন সমস্যা বা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয় না। এ তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পেশাজীবি নারীদের বেশির ভাগই তাদের দায়িত্ব স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে পালন করতে পারছেন না। অফিসের উদ্দেশ্যে ঘর হতে বের হলেই তাকে পড়তে হয় নানা অনাকাংখিত পরিস্থিতির সামনে। অফিসে যাওয়ার জন্য যানবাহন থেকে শুরু করে সকল ক্ষেত্রে পুরুষদের লুলুপ দৃষ্টি পড়ে নারীদের উপর, ছোড়া হয় আজেবাজে মন্তব্য। অনেক সময় গায়ে স্পর্শের ঘটনাও ঘটে। তারপর অফিসে গেলে অনেক ক্ষেত্রে পুরুষ সহকর্মী বা উর্ধতন পুরুষ কর্মকর্তার দ্বারা যৌন হয়রানির ঘটনাও ঘটে। তবে বর্তমানে এ পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে বলে জানালেন পাবনা পৌর এলাকার পেশাজীবি নারীরা।

সহকর্মী ও উর্ধতন পুরুষ কর্মকর্তাদের সাথে সম্পর্ক : দার্শনিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এরিস্টটল এর দৃষ্টিতে মানুষ সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে সমাজে একত্রে বসবাস করতে গিয়ে একে অন্যের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পেশাজীবি নারীরা দৈনন্দিন দাপ্তরিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সহকর্মী ও উর্ধতন পুরুষ কর্মকর্তাদের সাথে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যা কারো ক্ষেত্রে ভালো, কারো ক্ষেত্রে মোটামুটি এবং কারো ক্ষেত্রে খারাপ। নিচের সারণিতে তা তুলে ধরা হলো :

সারণিঃ সহকর্মী ও উর্ধতন পুরুষ সহকর্মীদের সাথে সম্পর্ক

সম্পর্কের প্রকৃতি	গণসংখ্যা	শতকরা
ভাল	২০	৩৮.৪৬
মোটামুটি ভাল	২৮	৫৩.৮৪
খারাপ	০৪	৭.৬৯
মোট	৫২	১০০.০

উৎস ঃ পাবনা পৌর এলাকা হতে সংগৃহীত তথ্য, মে ২০১৪ ইং

উপরের সারণিতে দেখা যায়, সহকর্মী ও উর্ধতন পুরুষ কর্মকর্তাদের সাথে ৩৮.৪৬% নারীর ভাল, ৫৩.৮৪% নারীর মোটামুটি ভাল এবং বাকী ৭.৬৯% নারীর খারাপ সম্পর্ক বিদ্যমান। এখানে বেশিরভাগ নারীরই সহকর্মী ও উর্ধতন পুরুষ কর্মকর্তাদের সাথে ভাল এবং মোটামুটি ভাল সম্পর্ক বিদ্যমান থাকায় ধরে নেয়া যায় এসব নারীরা স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে দায়িত্ব পালন করে দক্ষতা, কর্মদক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন। আর যেসব নারীরা এক্ষেত্রে খারাপ সম্পর্ক বিদ্যমান তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে বিভিন্ন সমস্যা দেখা যায় স্বাভাবিক। এসব নারীর সহকর্মী ও উর্ধতন পুরুষ কর্মকর্তাদের সাথে সম্পর্ক খারাপ হওয়ার পেছনে তাদের বিভিন্ন আচার-আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি ও যৌন উৎপীড়ন প্রভৃতিকেই দায়ী করেন।

Dhaka University Institutional Repository

পেশাগত ও পারিবারিক দায়িত্ব পালন : কর্ম প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন উপাদান নারীকে প্রভাবিত করে। বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় সাধারণত পরিবারের ভরণ-পোষণ করেন পুরুষ এবং নারী তা রক্ষণাবেক্ষণ, পারিবারিক যাবতীয় কাজ সম্পাদন, সন্তান লালন-পালন এবং রান্না-বান্না থেকে শুরু করে যাবতীয় কাজ করে থাকেন। এটি আজ একটি অলিখিত আইন বা প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে পেশাজীবি নারীদেরও দাপ্তরিক কাজ সম্পাদন করে পরিবারের গৃহস্থালী কাজ সম্পাদন করতে হয়। এ দ্বৈত ভূমিকা পালন করতে গিয়ে নারীকে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়। অনেকগুলো গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, পেশাজীবি নারীদের এ দ্বৈত ভূমিকা পালন করা কঠিন এবং এ ধরণের পরিস্থিতিতে তারা পীড়ন বা চাপ অনুভব করেন।[১] অনেক ক্ষেত্রে এই কর্মপীড়ন বা চাপ মানসিক পীড়ার কারণ হতে পারে।[২] যারা অবিরাম কাজ করেন তাদের মধ্যে বিষন্নতা, উদ্বিগ্নতা ও ব্যক্তিত্বের বৈকল্য দেখা যায়।[৩] এদিকে কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বৈষম্যজনিত বঞ্চনা, অন্যদিকে পুরুষের তুলনায় অধিকতর ঘরের দায়িত্ব তাদের কর্মজীবন বা ক্যারিয়ারের অগ্রগতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ফলে তারা মানসিক পীড়ন অনুভব করেন।[৪]

আলোচ্য গবেষণায় দেখা যায়, পেশাজীবি নারীরা তার পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি পরিবারের যাবতীয় কাজ সম্পাদন করে থাকেন। অর্থাৎ তাকে দ্বৈত ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। প্রকৃত সমাজের চিত্র হলো পরিবারের যাবতীয় কাজ, সন্তান লালন-পালন, ঘরদোর গোছানো, রান্না-বান্না সহ সংশ্লিষ্ট কাজ সমূহের প্রতি পুরুষের কোন দায়িত্বই নেই। সনাতন বা প্রথাগতভাবে যেসব পারিবারিক কাজ নারীর উপর বর্তেছে, সে আজ বাইরে পেশায় পুরুষের ন্যায় প্রবেশ করলেও সেই পারিবারিক দায়িত্ব পালন থেকে তার মুক্তি নেই। আলোচ্য গবেষণায় নমুনা হিসেবে গৃহীত সকল পেশাজীবি নারীই কম-বেশি পারিবারিক বা গৃহস্থালী কাজ সম্পদন করে থাকেন। তবে সারাদিনের দাপ্তরিক কাজ শেষে গৃহস্থালী কাজ সম্পাদনে অনেক নারী সক্ষম নাও হতে পারে। এক্ষেত্রে স্বামীর পক্ষ থেকে সহযোগিতা থাকা আবশ্যক। স্বামী-স্ত্রী পরস্পর সহযোগী হয়ে সংসার পরিচালনা করলে কর্মময় নারী-পুরুষ উভয়ের জীবনই সূখে সমৃদ্ধিতে ভরে উঠবে। নিচের সারণিতে পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি গৃহস্থালী কর্ম সম্পাদনে নারীর সক্ষমতার চিত্র তুলে ধরা হলো : সারণি : পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি গৃহস্থালী কর্ম সম্পাদনে নারীর সক্ষমতা

গৃহস্থালী কর্ম সম্পাদনে	গণসংখ্যা	শতকরা
সক্ষমতা	১৪	২৬.৯২
স্বামীর সহযোগীতায় সক্ষমতা	৩৬	৬৯.২৩
মোটেই সক্ষম নন	০২	৩.৮৫
মোট	৫২	১০০.০

১. Rapport, R. And Raport, R.N., Dual Career Famlies, Penguin Books, London, 1971 এবং Bebbington, A. C. The Function of Stress in the Establishment of Dual Career Family. The Journal of Marriage and the Family, Vol. 35, 1973.pp.10-150.

২. Jenkins, C.D. Recent Evidene Supporting Psychological and Social Risk Factors for coronary disease. New England Journal of Mdicine, 1976 এবং Kals S. V. Mental Health and work Environment: An Examination of the Evidnece, Journal of Occupational Medicine, 15, 1973.

৩. Bronstein, P. Black, L. Pfenning J. I. R. White, A, Stepping into th Academic Ladder: Comparison of Women and Men Applicants for Junior Faculty Positions Paper Presented at the American Psychological Association Meetings, Toronto, Canada, 1984.

৪. Holland, P., Psychriatic Aspect of Occupational Medicine, In R. Mekunney (Ed.), *Handbook of Occupational Medicine*, Little Brown and Co. Boston, 1990.

Dhaka University Institutional Repository

উৎস : পাবনা পৌর এলাকা হতে সংগৃহীত তথ্য, মে ২০১৪ ইং

উপরের সারণিতে দেখা যায়, পেশাজীবি নারীদের মধ্যে (২৬.৯২%)পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি গৃহস্থালী কর্ম সম্পাদনে সক্ষম, ৬৯.২৩% স্বামীর সহযোগীতায় সক্ষম এবং মাত্র ৩.৮৫% নারী সক্ষম নন। এ থেকে স্পষ্ট : প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের পেশাজীবি নারীরা স্বামীর সহযোগীতায় সক্ষম ভূমিকা পালন করে থাকেন। পাবনা পৌর এলাকার এ চিত্র দেখে মনে হয় পেশাজীবি নারীরা সূখেই আছেন। নারীর মূল্যায়ন ও শ্রম সম্পূর্ণ প্রেরণা হয়ে উঠছে। পেশাজীবি নারীরা গৃহস্থালির কাজে শ্রম দিতে গিয়ে নানা সমস্যায়র মুখোমুখি হন। নিচের সারণিতে নারীদের দ্বৈত ভূমিকা পালনে কিছু সমস্যার প্রকৃতি তুলে ধরা হলো :

সারণি : দ্বৈত ভূমিকা পালনে নারীর সমস্যা

দ্বৈত ভূমিকা পালনে সমস্যার প্রকৃতি	গণসংখ্যা	শতকরা
সমস্যা হয়	৩৫	৬৭.৩০
মোটামুটি সমস্যা হয়	১১	২১.১৬
সমস্যা হয় না	০৪	৭.৬৯
দ্বৈত ভূমিকা পালনে সক্ষম নন	০২	৩.৮৫
মোট	৫২	১০০.০

উৎস : পাবনা পৌর এলাকা হতে সংগৃহীত তথ্য, মে ২০১৪ ইং

উপরের সারণিতে দেখা যায়, দ্বৈত ভূমিকা পালনে ৬৭.৩০% নারীর সমস্যা হয় এবং ২১.১৬% নারীর মোটামুটি সমস্যা হয় মাত্র ৭.৭৯% নারী এক্ষেত্রে কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না। এ সমস্যার প্রকৃতি ভিন্ন। সারাদিন অফিসে কাজ করে এসে শরীর চায় একটু বিশ্রাম, একটু বিনোদন, একটু প্রশান্তি। তার স্বামীও তথা পুরুষ অফিসের কাজ সেরে বাসায় ফিরে এসে বিশ্রাম, বিনোদন ও প্রশান্তি চায়। কর্মস্থল থেকে বাসায় ফিরে ঘর ঘোছানা, রাতের খাবার তৈরী, সন্তানের যত্ন, সন্তানের লেখাপড়া দেখিয়ে দেওয়া সহ যাবতীয় কাজ স্বামী-স্ত্রী সহযোগী হয়েই করতে হবে।

উপার্জিত অর্থ ব্যয়ে নারীর ভূমিকা : পেশাজীবি নারীদের উপার্জিত অর্থ ব্যয়েও অনেক সময় সেই নারীর ভূমিকা থাকে না। অনেক নারীই বেতনের অর্থ তার স্বামীর ইচ্ছানুযায়ী বা পরিবারের অন্য সদস্যের ইচ্ছানুযায়ী ব্যয় করেন। এগুলো অবশ্য তাদের পারস্পরিক বুঝা-পড়ার ব্যাপার। সূখী দম্পতিদের এ বিষয় গুলো সবই বিনোদনের মত হয়ে ওঠে। দায়িত্বশীল স্বামী সর্বদা চেষ্টা করেন স্ত্রীর উপার্জন দিয়ে তার স্থায়ী সম্পদ গড়ে দিতে। তবে পেশাজীবি নারীরা নিজে অর্থ খরচ করতে বেশী পছন্দ করেন। নিচের সারণিতে তা তুলে ধরা হলো :

সারণি : উপার্জিত অর্থ ব্যয়ে নারীর মতামতের কার্যকারিতা

উপার্জিত অর্থ ব্যয়ে নারীর মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা
কার্যকর হয়	৪৫	৮৬.৫৪
মোটামুটি কার্যকর হয়	০৫	৯.৬১
মোটেই কার্যকর হয় না	০২	৩.৮৫
মোট	৫২	১০০.০০

উৎস : পাবনা পৌর এলাকা হতে সংগৃহীত তথ্য, মে ২০১৪ইং

Dhaka University Institutional Repository

উপরের সারণিতে দেখা যায়, উপাজিত অর্থ বয়ে ৮৬.৫৪% নারীর মতামত কার্যকর হয়, ৯.৬১% নারীর মতামত মোটামুটি কার্যকর হয় এবং ৩.৮৫% নারীর মতামত মোটেই কার্যকর হয় না। সরেজমিনে কথা বলে দেখা যায় একদশক পূর্বেও বাংলাদেশে পারিবারিক ব্যয় নির্বাহ ও যাবতীয় অর্থ ব্যয়ে নারীদের কোন ভূমিকাই সাধারণত ছিল না। কিন্তু বর্তমান সময়ে পূর্ববর্তী সে চিত্র পাল্টে গেছে। পেশাজীবি নারীদের উপার্জিত অর্থ ব্যয়ের পাশাপাশি পারিবারিক অন্যান্য ব্যয় নির্বাহে তার মতামতকে গুরুত্ব দেয়া পুরোপুরিভাবে। পাবনা পৌর এলাকার বাসিন্দা একজন স্কুল শিক্ষিকা[১] এর সাক্ষাতকারে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অর্থাৎ নারী অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী হলে ব্যয় নির্বাহে তথা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তার ভূমিকা নিশ্চিত হয় এবং তাতে পাবনা পৌর এলাকার বাস্তব চিত্রে ফুটে উঠেছে।

পেশাগত দায়িত্ব পালনে নারীর সফলতা : পেশাজীবি সকল নারীই পেশাগত দায়িত্ব পালনে সফল নন। তবে বেশির ভাগ নারীই কর্মক্ষেত্রে সফল ও প্রতিষ্ঠানে তথা কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হয়েছেন। নিচের সারণিতে তা তুলে ধরা হলো :

সারণি : নারীর পেশাগত ভূমিকায় কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টির প্রকৃতি

সন্তুষ্টির প্রকৃতি	গণসংখ্যা	শতকরা
সন্তুষ্ট	৩৮	৭৩.০৮
মোটামুটি সন্তুষ্ট	২২	২৩.০৮
মোটেই সন্তুষ্ট নন	০২	৩.৮৪
মোট	৫২	১০০.০০

উৎস : পাবনা পৌর এলাকা হতে সংগৃহীত তথ্য, মে ২০১৪ ইং

উপরের সারণিতে দেখা যায়, ৭৩.০৮% নারীর কাজের প্রতি সন্তুষ্ট এবং ২৩.০৮% নারীর কাজের প্রতি মোটামুটি সন্তুষ্ট এবং মাত্র ৩.৮৪% নারীর কাজের প্রতি কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট নন। আর যেসব নারীর কাজের প্রতি কর্তৃপক্ষ মোটামুটি সন্তুষ্ট বা সন্তুষ্ট নন এর পেছনে নারীর যোগ্যতাহীনতা বা অদক্ষতা- এরকম কিছু কোন বিষয় ভূমিকা পালন করে না; বরং তার পেছনে অন্য সূক্ষ্ম কারণ কাজ করে। যা নারীর প্রতি অবিচার এবং অবমূল্যায়নেরই শামিল। তবে নারীর অদক্ষতাও যে এখানে কারণ হতে পারে না তাও নয়। নারীকেও তাদের পেশাগত দক্ষতা অর্জনে আরো বেশী আন্তরিক হতে হবে। কাজের মধ্যে দক্ষতা- যোগ্যতার পরিস্ফুটন ঘটলে বাস্তব কারণেই নিজের অবস্থান সুসংহত হবে। নিচের সারণিতে কর্তৃপক্ষের এরূপ মনোভাবের চিত্র তুলে ধরা হলো :

সারণি : নারীর পেশাগত ভূমিকায় কর্তৃপক্ষের অসন্তুষ্টির নেপথ্যে

কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টির কারণ	গণসংখ্যা	শতকরা
প্রত্যাশা বেশি	০৩	২৭.২৭
নারী বলে কাজের স্বীকৃতি নেই	০৭	৬৩.৬৪
নারীর নিজের যোগ্যতার অভাব	০১	৯.০৯
মোট	১১	১০০.০০

উৎস : পাবনা পৌর এলাকা হতে সংগৃহীত তথ্য, মে ২০১৪ ইং

[১]. মাহবুবা ইয়াসমিন, ইয়াকুবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ডাকঘর: পাবনা ক্যাডেট কলেজ, পাবনা, সাক্ষাতকার তারিখ:২৪-৫-২০১৪ ইং।

Dhaka University Institutional Repository

উপরের সারণিতে দেখা যায়, ৬৩.৬৪% নারীর ভূমিকা নারী বলে এবং ২৭.২৭% নারীর কাজের কর্তৃপক্ষের বেশি প্রত্যাশা থাকায় তারা পুরুষ সহকর্মী অপেক্ষা বেশি দক্ষতা, মেধার পরিচয় দিলেও এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ তার প্রতি এবং তার কাজের প্রতি সন্তুষ্ট নন। ফলে নারী পেশাগত দায়িত্ব পালনে নিজেকে সফল বলে মনে করলেও কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টির বা স্বীকৃতির অভাবে তারা তা করতে পারছেন না। এ থেকে বলা যায়, কর্মক্ষেত্রে পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব বিদ্যমান থাকার দরুণই নারীরা পুরুষদের তুলনায় বেশি কর্মক্ষমতা ও দক্ষতার পরিচয় দিলেও তাদের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেয়া হয় না। তাছাড়া নারীদের একটি অংশ যারা নিজেদের সক্ষম মনে করেন না এর পেছনেও পুরুষতান্ত্রিকতার আধিপত্য কাজ করে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বেড়ে ওঠা এসব নারীর মনমানসিকতা ও আত্মবিশ্বাসকে দুর্বল করে দেয়া হয়েছে। আর এতে তারা নিজেকে তার স্বপদে অবস্থানের যোগ্য হয়েও তার ভূমিকার প্রতি স্বয়ং নিজেই সন্তুষ্ট হতে পারছেন না। যদিও তারা কোন ক্রমেই একজন পুরুষের চেয়ে কম দক্ষতা ও কর্মক্ষমতার পরিচয় দেন না।

পেশাগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ :

যেকোন পেশাগত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সকল কর্মীদের অন্তর্ভূক্ত করলে তা বেশি উত্তম সিদ্ধান্ত হয় এবং তা বেশি কার্যকর ফল দিয়ে সক্ষম হয়। অনেক দপ্তরে দেখা যায়, সিদ্ধান্ত গ্রহণে কর্মীদের মতামত নেয়া হলেও নারী কর্মীদের মতামত নেয়া হয় না। আলোচ্য গবেষণায় দেখা যায়, পেশাজীবি নারীদের বেশির ভাগই তার-দপ্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোন ভূমিকা রাখতে পারেন না এবং এসব নারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সম্পৃক্ততা করেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। নিচের সারণিতে তা তুলে ধরা হলো :

সারণি : পেশাগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ

সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ	গণসংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	৩৪	৬৫.৩৮
না	১৮	৩৪.৬২
মোট	৫২	১০০.০০

উৎস : পাবনা পৌর এলাকা হতে সংগৃহীত তথ্য, মে ২০১৪ ইং

উপরের সারণিতে দেখা যায়, পেশাগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে ৬৫.৩৮% নারী অংশগ্রহণ করতে পারে ৩৪.৬২% নারী এক্ষেত্রে কোন ভূমিকা পালন করতে পারেন না। এ অবস্থার পরিবর্তন হওয়া জরুরী। এ মানুষিক দৈন্যতার বলয় থেকে আমাদের সবাইকে বের হয়ে আসতে হবে। উপরিউক্ত নমুনা ও গবেষণার আলোকে জানতে পারলাম যে, বর্তমান পরিস্থিতিতেও বাংলাদেশে নারীদের কর্মস্থলে কাজ করার যথেষ্ট পরিবেশ বিরাজমান। পেশাগত কাজে নারীর যতটুকু সমস্যা রয়েছে তা একান্তই বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি। ইসলামী মুল্যবোধের অনুসৃতির অভাব, ধর্মীয় অনুশাসন এর চর্চা না থাকাই এর মূল কারণ। পাবনা পৌর এলাকার এ চিত্রের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশেও যে একইরূপ চিত্র তা অনুমেয়।

নারীর পেশাগত উন্নয়নে ইসলামের বিধান

নারীর পেশাগত কাজ চাকুরী, ব্যবসা ও ব্যবসায়িক উদ্যোক্তা হওয়া নিয়ে মানুষের মাঝে নানা রকম ধারণার রেওয়াজ প্রচলিত। গবেষণা কর্ম পরিচালনা করতে গিয়ে আমরা পেশাগত কারণে অনেক দম্পতিদের হতাশার গল্প শুনেছি। দাম্পত্যে বহুবিধ সংকটের কথা শুনেছি। কেউ কেউ বলেন মেয়েদের চাকুরী করা হারাম। আবার কেউ কেউ মনে করেন নারীদের ঘরের বাইরে কাজ করা ইসলামে জায়েয নেই। এ সকল সমস্যার সকল সমাধান ও উত্তর নিয়ে নিম্নে শরীয়তের বস্তুনিষ্ঠ বিধান আলোচনার প্রয়াস পাব। আমি এ বিষয়ে দু'টি দিক নিয়ে আলোচনা করতে চাই।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম দিক : এ দিকটি আমাদের যুগে প্রচলিত কিছু ভ্রান্ত দাবীর সাথে সম্পর্কিত। পাশ্চাত্যবাদীরা নারীর পেশাদারিত্ব নিয়ে যে ভ্রান্ত দাবী বার বার করে থাকে তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে। যেমন তারা বলে থাকে, বিবাহিতা নারী যাতে তার স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগ করতে পারে সে জন্য তাকে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হওয়া প্রয়োজন। আমরা বল্‌ব পরিবার ব্যবস্থা যে ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত সেই ভিত্তিকে ধ্বংস করার জন্য এ দাবীই যথেষ্ট। পরিবারের মত কল্যাণময় প্রতিষ্ঠানটি এর সদস্যদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও নিজেদের মধ্যে যথাযথভাবে দায়িত্ব বণ্টনের ওপর নির্ভরশীল। তাই পরিবার নামক এ প্রতিষ্ঠানটি এর সদস্যদের বিচ্ছিন্নতা ও পরস্পর সংঘাতমুখর হওয়ার ওপরে টিকে থাকতে পারে না। অনুরূপভাবে তারা এ দাবীও করে যে, নারী যাতে তার ব্যক্তিসত্তা তথা অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে পারে সেজন্য পেশাগত কাজ করা তার জন্য অত্যাবশ্যকীয়। এ ধরনের দাবীকারীরা ভ্রান্তির মধ্যে ডুবে আছে। ঘরের রাণী হয়ে থেকেও নারী ঘরের কাজ আঞ্জাম দেয়ার সাথে সাথে কিছুটা অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক তৎপরতায় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে নিজেকে পূর্ণরুপে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। এটা পেশাদারিত্বের মাধ্যমে নিজেকে জীবন্ত ও কল্যাণকর অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করার পরিপন্থী নয়।

চরমপন্থীদের এ দাবীও প্রত্যাখ্যান করা উচিৎ যে, নারীর জন্য পেশাগত কাজ চরম প্রয়োজন ছাড়া নিষিদ্ধ নয়। প্রয়োজন নিষিদ্ধ বিষয়কেও সিদ্ধ করে দেয় এবং প্রয়োজনের আলোকেই তা নির্ধারিত হয়। এভাবে নারীর পেশাগত কাজ না খেয়ে মৃত্যুর ভয়ে মৃত বস্তু খাওয়ার পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে। নাউযুবিল্লাহ! আমরা জানিনা এই নিষেধাজ্ঞা কেথা থেকে এসেছে। গৃহের সাথে নারীর সম্পৃক্ততার মাত্রা এমন একটি সামাজিক বিষয় সমাজ ও নারীর অবস্থা অনুসারে যার রূপ ও আকৃতি বিভিন্ন হয়ে থাকে। এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অকাট্য কোন ধর্মীয় নির্দেশ নয়।

দ্বিতীয় দিক : নারীর পেশাগত কাজের ব্যাপারে দিক নির্দেশনার জন্য সঠিকরুপে বাস্তবভিত্তিক গবেষণা প্রয়োজন। এ সম্পর্কে বক্তব্য হলো- বর্তমান সময়ে শরী'আতের কাঠামোর মধ্যে অবস্থান করে নারীর পেশাগত কাজকে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে বিবেচনা করা যায় এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের বহুক্ষেত্রে বিশেষ করে যে পরিবার সমাজের মৌলিক ভিত্তি সে পরিবার গঠনের ক্ষেত্রে এর প্রভাব প্রসারিত হয়। এই অগ্রগতি যাতে সঠিক কাঠামোর মধ্যে পূর্ণতা লাভ করতে পারে এবং আমরা যাতে এর সুফল ভোগ করতে এবং ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারি সেজন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংগঠনিক এবং প্রশিক্ষণগত উন্নয়ন ও অগ্রগতি এর সহগামী হওয়া উচিৎ। কারণ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র অনেক জটিল এবং তার মধ্যে প্রতিক্রিয়া হয় ও প্রভাব গ্রহণ করে।

আমরা আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন নিষ্ঠাবান গবেষকদের নারী ও পুরুষের মধ্যে বয়সের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন দিক দিয়ে যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে তা থেকে শুরু করে তাদের শিক্ষা ও উপযুক্ত পেশাগত কাজের পার্থক্যসমূহ সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণার তাওফিক দান করেন। কারণ এই গবেষণা কর্মই জীবনের সবক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য জরুরী এবং এর মাধ্যমেই আসবে স্বাভাবিক দিক নির্দেশনা। এগুলো নিশ্চিত করার মাধ্যমেই আমরা আল্লাহ্ প্রদত্ত হেদায়াত ও আলোর ওপর নির্ভর করে আমাদের সমাজের উত্থান আশা করতে পারি।

ইসলামের বিধান ও দিকনির্দেশনা

১. নারীকে উপযুক্ত শিক্ষা দেয়া উচিত যাতে ইসলামী প্রশিক্ষণের সাধারণ লক্ষ্য সমূহ অর্জিত হওয়ার পাশাপাশি দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্জিত হয়। প্রথম বিষয়টি হলো নারী যেন সর্বোত্তমরূপে গৃহ ও সন্তনাদির তত্ত্বাবধানে সক্ষম হয়। রাসূল (সা) এর বাণীর তাৎপর্য অনুসারে বিয়ের পর নারী তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের যোগ্য হয়ে

গড়ে ওঠে। রাসূল (সা) বলেছেন-المراة راعية على اهل بيت زوجها وهى مسؤلة عنه "নারী তার স্বামীর পরিবারের সবার তত্ত্বাবধায়িকা। সেই তাদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল।"[১]
আর দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, উপযুক্ত পেশাগত কাজের জন্য নারীকে দক্ষ করে গড়ে তোলা, যাতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক অথবা সামাজিক যে কোন প্রয়োজনের মুহূর্তে তার যথাযথ সেবা গ্রহণ করা যায়।
২. নারীর কর্তব্য সময়কে পূর্ণরুপে ব্যবহার করে সমাজের জন্য উৎপাদক ও কল্যাণকর উপাদান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং যৌবন, প্রৌঢ়তা ও বার্ধক্য কোন পর্যায়ে কন্যা, স্ত্রী, তালাকপ্রাপ্তা, বা বিধবা কোন অবস্থাতেই কর্মহীনা বা বেকার না থাকা। গৃহকর্ম সম্পাদনের পর যে বারতি সময় থাকবে তা পেশাগত বা অপেশাগত কোন কল্যাণপ্রসূ কাজে ব্যয় করা। ইরশাদ হচ্ছে :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"পুরুষ বা নারী যে-ই ভাল কাজ করবে, সে যদি মুমিন হয়, তাহলে তাকে আমি দুনিয়ায় পবিত্র পরিচ্ছন্ন জীবন দান করবো এবং আখেরাতে প্রতিদান দেবো তাদের সর্বোত্তম কাজ অনুসারে।"[২]
মানুষ সে নারী হোক আর পুরুষ হোক কিয়ামতের দিন তার সৎ কাজের প্রতিদান সম্পর্কে আয়াতটিতে কতই না উত্তম কথা বলা হয়েছে।

১. পুরুষ পরিবারের ব্যবস্থাপক বা প্রধান। তাই পেশাগত কাজের জন্য স্ত্রী বা কন্যার তার নিকট অনুমতি গ্রহণ প্রয়োজন। ইরশাদ হচ্ছে : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

"পুরুষ নারীর ব্যবস্থাপক।"[৩]

এ কথা সবারই জানা যে, শরী'আত এবং প্রথাগত বিধান উভয়ই পুরুষকে পরিবারের নেতৃত্ব ও পেশাগত কাজে স্ত্রী বা কন্যাকে অনুমতি দানের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা প্রদান করেছে। তাই ইসলামের কোন বিধান বা বৈধতা ছাড়া সে নারীর বা সমাজের জন্য কল্যাণকর কোন কাজে সেচ্ছাচারিতামূলকভাবে বাধা দিতে পারে না, যেমন পারে না বিনা প্রয়োজনে বৃত্তিমূলক কোন কাজ গ্রহণে বাধ্য করতে।
৪. নারী তার ঘর ও সন্তানাদির উত্তমরুপে দেখাশোনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য দায়ী। বিবাহিতা নারীর জন্য এটি প্রাথমিক মৌলিক দায়িত্ব। এই দায়িত্বের জন্য পেশাগত কাজ পরিত্যাগ করা সংগত নয়।
ইরশাদ হচ্ছে :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

"তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে এ বিষয়টি যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের জাতি থেকে সৃষ্টি করেছেন স্ত্রীগণকে, যাতে তোমরা তার কাছে প্রশান্তি লাভ করো এবং তোমাদের মধ্যে দয়া ও ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন।"[৪]
"হযরত 'আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন, উটের পিঠে আরোহণকারিণী আরব মহিলাদের মধ্যে কুরাইশ মহিলারাই উত্তম, যারা নিজেদের ছোট ছোট বাচ্চার প্রতি অধিকতর স্নেহাশীলা ও স্বামীর সম্পদের হিফাজতকারিনী।"[৫]

---

১. *সহীহুল বুখারী*, আহকাম অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ মহান আল্লাহ্র বাণী, তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর, রাসূল এর আনুগত্য করো ও তোমাদের 'উলুল আমর' বা কর্তৃত্বের অধিকারী লোকদের আনুগত্য করো, ১৬ খ., পৃ. ২২৯।

২ আল-কুর'আন, ১৬ : ৯৭।

৩. আল-কুর'আন, ৪ : ৩৪।

৪. আল-কুর'আন, ৩০ : ২১।

৫. *সহীহুল বুখারী*, ভরণ পোষণ ব্যয় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর অর্থ সম্পদ সংরক্ষণ এবং সাংসারিক ব্যয়, ১১ খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪০।

Dhaka University Institutional Repository

সহানুভূতি ছাড়াও নিজের শান্ত-নিরিবিলি সুন্দর কুটীরে নারী, পুরুষ ও শিশু সবারই শান্তি, স্বস্তি ও প্রীতিপূর্ণ পরিবেশ লাভের পূর্ণ অধিকার রয়েছে।

৫. দু'টি অবস্থায় পেশাগত কাজ করা নারীর জন্য অত্যাবশ্যক। এক. পরিবারের জন্য উপার্জনশীল ব্যক্তির (পিতা, স্বামী অথবা রাষ্ট্র) অবর্তমানে বা তার অক্ষমতার কারণে নিজের ও পরিবারের জীবিকার জন্য। দুই. মুসলিম সমাজের কাঠামো ও সংহতি সংরক্ষণের নিমিত্ত নারীদের জন্য ফরজে কিফায়া পর্যায়ভুক্ত কাজ সমূহ আদায় করার সময়। এ অবস্থায় পরিবার ও সন্তান-সন্ততির প্রতি দায়িত্ব বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে এসব অত্যাবশ্যকীয় কাজ যথা সম্ভব আঞ্জাম দেয়ার জন্য নারী চেষ্টা করবে।

৬. নারীর বৃত্তিমূলক কাজের ব্যাপারে মুসলিম সরকার দু'টি মৌলিক বিষয়ে দায়িত্বশীল। ক. সরকারী কাজে নিয়োজিত বিবাহিত পুরুষদেরকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান করতে হবে। যাতে কোন পেশাগত কাজে নারীর অংশ গ্রহণ ছাড়াই সে সংসার পরিচালনা করতে পারে। খ. সরকারের অধীনে কোন বৃত্তিমূলক কাজে নারী অংশ গ্রহণ করলে সেখানে তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করে দিতে হবে।

ইরশাদ হচ্ছে-"'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা সবাই তত্ত্বাবধায়ক। তাই নিজের অধীনস্তদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। শাসক সব মানুষের তত্ত্বাবধায়ক। সেও তার অধীনস্তদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।"[১]

কর্মজীবি মহিলাদের জন্য মুসলিম সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য

১. সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহে বিভিন্ন কাজে নিয়োগের সময় নারী ও পুরুষের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কথা বিবেচনা করা দরকার। এ বিষয়টি গভীর মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক গবেষণার ওপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত।
২. জরুরী পরিস্থিতিতে নারী যেন তার শিশুর দেখাশোনা ও তত্ত্বাবধান করতে পারে সেজন্য উপযুক্ত স্থান গুলোতে শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ছাড়াও সরকারী প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে।
৩. নারী ও পুরুষের সাক্ষাতের নিয়মাবলী যথাযথভাবে পালনের নিমিত্তে কর্মক্ষেত্র অথবা সাধারণ পরিবহন সর্বত্র নির্দিষ্ট পরিবহন মাধ্যমের নিশ্চয়তা বিধান করা দরকার।
৪. নারী যাতে তার গৃহ ও সন্তান এবং তার পেশাগত কাজের তত্ত্বাবধানে সক্ষম হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে হবে। যেমন সন্তান প্রসব ও লালন পালনের জন্য পূর্ণ বেতনে বা অর্ধ বেতনে উপযুক্ত ছুটির ব্যবস্থা করতে হবে (যা তিন বছর সময়কাল পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে)। কর্মজীবি মহিলাদের শিশু পালনের সময় পূর্ণ বা অর্ধবেতনে অর্ধসময় কাজের অনুমতি প্রদান করতে হবে। অথবা তাদের জন্য প্রতিদিন রিপোর্টিং সময় ও প্রত্যাবর্তন সময় ১+১ অর্থাৎ ২ ঘন্টা হ্রাস করতে হবে, যাতে তাদের গমন ও প্রত্যাবর্তনকালে যানজটে বা পরিবহন সংকট অথবা ভীড়ের মধ্যে না পড়ে, এবং সংসারে একটু হলেও সময় দিতে পারে।

বাংলাদেশের নারীর অবস্থার উন্নয়নে নারী উদ্যোক্তা প্রসঙ্গ

উদ্যোক্তা একটি বহুমাত্রিক ধারণা। এর ইংরেজী প্রতিশব্দ : Entrepreneur. 'A person who makes money by starting or running businesses, especially when this involves taking financial risks.'[২]

---

[১] *সহীহুল বুখারী*, দায়মুক্তি অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: দাস-দাসীর গায়ে হাত তোলা ভাল কাজ নয়, ৬ষ্ঠ খ., প্রাগুক্ত, পৃ.১০৬। *সহীহ মুসলিম*, নেতৃত্ব অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: ন্যায় বিচারক শাসকের মর্যাদাও জালেমকে শাস্তি দান, ৬ খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

[২] *BANGLAPEDIA,* National Encyclopedia of Bangladesh, Asiatic Society of Bangladesh, 5 Old Secretareat Road, Nimtali, Dhaka 1000, Bangladesh, March 2003, pp. 494-496. *Oxford*

Dhaka University Institutional Repository

উদ্যোক্তা : 'One who takes the initiative or makes necessary preperations for doing something.'[১]
অতএব উদ্যোক্তা হচ্ছেন ঐ ব্যক্তি যিনি আর্থিক ঝুঁকি নিয়ে কোন ব্যবসায়িক উদ্যোগ গ্রহণ করে ব্যবসা পরিচালনা করেন।
একজন উদ্যোক্তা পারেন সমাজকে পাল্টে দিতে। অব্যবহৃত জনশক্তি, প্রাকৃতিক শক্তি, আর নিজের উদ্ভাবনী ক্ষমতা, সব কিছু একত্রিত করে উদ্যোক্তা আমাদের জীবন মানের পরিবর্তন ও উন্নয়ন ঘটান। বিশ্বায়নের এ যুগ ও সময়টাই হলো উদ্যোক্তাদের, কর্মীদের, উদ্ভাবকদের। নতুন নতুন উদ্ভাবন দিয়ে এ সমাজকে সমৃদ্ধ করা জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে অবদান রাখার সময় আজ। ভবিষ্যত নেতা হিসেবে, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে এ ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়ে কেউ নিজের অবস্থান তৈরী করতে চাইলে তাকে হতে হবে সফল উদ্যোক্তা।
একটি ব্যবসায়ের মালিক যে কেউ হতে পারে। কিন্তু একটি সফল প্রতিষ্ঠান তৈরী করা এবং চালানো সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। নতুন নতুন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আমাদের দরকার, তবে ব্যবসায়ের মালিকানা সবার জন্য না। উদোক্তা হওয়ার স্বপ্ন কিংবা আকাঙ্খা যদি কারো থাকে তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কিছু বিষয় ভেবে দেখতে হবে। উদ্যোক্তাদের আত্মবিশ্বাস তৈরীর জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজের একটি।
কি করা উচিত এবং কি করা উচিত না, এই ভাবনার পেছনে সময় নষ্ট করা এড়ানোর জন্য উদ্যোক্তা হওয়ার সঠিক সিদ্ধান্ত কিভাবে গ্রহণ করতে হয়, সেটা শেখা জরুরী। তাতে দক্ষ উদ্যোক্তা হিসেবে যেমন পরিচিতি আসবে তেমনিভাবে সামগ্রিক ফলাফলও ভালো হবে। একটি নতুন ব্যবসা শুরু করা অনেকটা মা হওয়ার মতোই। শুধুমাত্র মানসিক এবং আর্থিকভাবে প্রস্তুতি এখানে যথেষ্ট না, ব্যবসা যথেষ্ট বড় হওয়ার আগ পর্যন্ত এর প্রতিনিয়ত যত্নআত্তি করার মতো ধৈর্যশক্তি থাকতে হবে।

নারী উদ্যোক্তার পরিচয়

যখন কোন নারী ব্যক্তি আর্থিক ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসায়িক উদ্যোগ গ্রহণ করে ব্যবসা পরিচালনা করেন তাকে নারী উদ্যেক্তা বলা হয়। ব্যবসায়িক নিরাপত্তা ও সফলতার জন্য একজন নারী ও পুরুষ উদ্যোক্তার পালনীয় শর্ত ও কার্যাবলী একই। রাসূল (সা) এর সময় থেকেই নারী উদ্যোক্তার ব্যবসা ব্যবস্থাপনা পরিচালিত। আজ সে নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে সারা বিশ্বে এক বিশাল অংশ দখল করে নিয়েছে। বিশ্বায়নের এ যুগে মানব সমাজের সুখ ও সমৃদ্ধিতে তাদের অবদান অনস্বীকার্য। জাতীয় অর্থনীতি ও আয়ে তাদের অবদান বেড়ে চলেছে আশানুরুপ ভাবে। এ কথা সত্য যে, আজকে থেকে বিশ বছর আগে একজন নারী ব্যবসায়ীকে সমাজ, সংসার নানা দিক দিয়ে বাধার সম্মুখীন হতে হত। অথচ আজ সামাজিক ভাবে তারা উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত।

রাসূল (সা) এর যুগে নারী উদ্যোক্তা

ইসলাম মহান আল্লাহ্ পাক প্রদত্ত মানব জাতির সর্বশেষ পরিপূর্ণ জীবন বিধান। মহানবী (সা) এর অর্থব্যবস্থা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ। তাঁর অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য মানব কল্যাণ। রাসূল (সা) এর অর্থ ব্যবস্থা শুধু বস্তুবাদী লক্ষ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এখানে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধের উপকরণ সমভাবে মূল্যায়িত। সে মূল্যবোধ নারী-পুরুষ সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। ইসলাম নারীর প্রকৃত স্বাধীনতা, তার মর্যাদা ও ন্যায্য অধিকার দিয়েছে। রাসূল (সা) নারী মুক্তির অগ্রদূত। ইসলামী সমাজ কায়িম হওয়ার আগে ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান ও হিন্দু সমাজে নারীদের প্রতি যে বৈষম্য প্রচলিত ছিল তা বর্ণনাতীত।

Advanced Learner's Dictionary, Chief editor Sally Wehmeier, Seventh edition, Oxford University Press, pp.10.

১. *Bengali-English Dictionary,* Bangala Academy,first edition: 1994, pp.80. *BANGLAPEDIA,* National Encyclopedia of Bangladesh, Asiatic Society of Bangladesh, 5 Old Secretareat Road, Nimtali, Dhaka 1000, Bangladesh, March 2003, pp. 494-496.

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা আবির্ভূত হওয়ার পর সব অনাচারের বিরুদ্ধে শান্তির স্লোগান মূখরিত হলো। রাসূল (সা) নারীর প্রকৃত মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করলেন। প্রিয় নবী (সা) তাদের জন্য রচনা করলেন মহামুক্তির উজ্জল দিগন্ত। ইরশাদ হচ্ছে : 'নিশ্চয় মায়ের পায়ের কাছে জান্নাত রয়েছে।'[১]

ধাপে ধাপে নারী পেল তার প্রাপ্ত প্রকৃত মর্যাদা, অধিকার ও স্বাধীনতা এবং ঘোষণা হলো-তোমরা সংযমী হও, নিজেদেরকে আড়াল করে রাখো। ঘরে ও বাইরে তোমাদের যাবতীয় কর্মকান্ডকে পর্দাপ্রথার মাধ্যমে সমাধান করো। এভাবে নারীর কর্মস্থলে কাজ করার এবং নিজেই উদ্যোক্তা হয়ে ব্যবসা পরিচালনা করার মত বিধানও নাযিল হলো- নারীদের প্রয়োজনে কর্মস্থলে কাজ করার এবং নিজেই উদ্যোক্তা হয়ে ব্যবসা করার অনুমতি প্রসঙ্গে প্রয়োজনে নারীদের বাড়ীর বাইরে যাওয়ার অনুমতি বিধান প্রসঙ্গে ইরশাদ হচ্ছে :

'হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পর সাওদাহ (রা) প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গেলেন। সাওদাহ এমন স্থুল শরীরের অধিকারিনী ছিলেন যে, পরিচিত লোকদের থেকে তিনি নিজেকে গোপন রাখতে পারতেন না। 'উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) তাঁকে দেখে বললেন, হে সাওদাহ জেনে রাখো, মহান আল্লাহ্‌র কসম! আমাদের নযর থেকে গোপন থাকতে পারবে না। এখন দেখো তো কিভাবে বাইরে যাবে? আয়িশা বলেন সাওদাহ ফিরে এলেন। আর এ সময় রাসূল (সা) আমার ঘরে রাতের খাবার খাচ্ছিলেন। তাঁর হাতে ছিল টুকরো হাড়। সাওদাহ ঘরে প্রবেশ করে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! আমি প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গিয়েছিলাম। তখন 'উমার আমাকে এমন এমন কথা বলেছে। আয়িশা বলেন এ সময় আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর নিকট ওহী অবতীর্ণ করেছেন। ওহী অবতীর্ণ হওয়া শেষ হলো, হারের টুকরা তখনও তাঁর হাতেই ছিল, তিনি তা রেখে দেন নি। রাসূল (সা) বললেন, অবশ্য দরকার হলে তোমাদেরকে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে।'[২]

"আবূ হুমাইদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা নবী (সা) এর সাথে তাবুকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। তিনি ওয়াদিউল কুরা নামক স্থানে পৌঁছে এক মহিলাকে তার খেজুর বাগানে দেখতে পেলেন। রাসূল (সা) তাঁর সাহাবাদের বললেন, তোমরা এই বাগানে খেজুরের পরিমাণ অনুমান করো। রাসূল (সা) নিজে দশ ওয়াসাক পরিমাণ অনুমান করলেন। তিনি বাগানের মালিক মহিলাকে বললেন, বাগানে কি পরিমাণ খেজুর উৎপন্ন হয় তার হিসাব রেখো। আমরা তাবুকে পৌছলে তিনি বললেন, আজ রাতে প্রচণ্ড ঝড় প্রবাহিত হবে। কাজেই রাতের বেলা কেউ যেন ওঠে না দাঁড়ায় এবং যার সাথে উট আছে সে যেন তা বেঁধে রাখে। তাই আমরা উট গুলো বেঁধে রাখলাম। রাতে প্রচন্ড ঝড় প্রবাহিত হলো। সেই সময় এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালে বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে 'তাই' পাহাড়ে নিক্ষেপ করলো। সেই সময় আইলার শাসক রাসূল (সা) কে একটি সাদা খচ্চর উপহার দিয়েছিলেন। রাসূল (সা) ও তার জন্য একখানা চাদর পাঠালেন এবং তাকে ঐ এলাকার শাসক হিসেবে বহাল রেখে ফরমান লিখে দিলেন। ফেরার পথে ওয়াদিউল কুরায় পৌঁছলে সেই মহিলাকে তার বাগানে উৎপন্ন খেজুরের পরিমাণ জিজ্ঞাসা করলেন। সে বললো দশ ওয়াসাক, যা রাসূল (সা) অনুমান করেছিলেন।"[৩] এ বাগানটি তার নিজের তৈরী ছিল। উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী হিসেবে তিনিই এর ব্যবস্থাপনা ও পরিচর্যার দায়িত্ব পালন করতেন।

আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) : আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) ঘোড়া পালতেন। তিনি এগুলো ব্যবসায়িক ভাবে পালতেন। তৎকালীন সময়ে ঘোড়া অত্যন্ত মূল্যবান প্রাণী হিসেবে বিবেচিত হতো। তিনি একজন উদ্যোক্তা হয়েও নিজেই এগুলোকে খাবার দিতেন ও পানি পান করাতেন। তাঁর একটি খেজুরের বাগান ছিল। তাঁর বাড়ী

---

[১] *মিশকাতুল মাসাবীহ*, হাদীস নং- ৪৯২৮।

[২] *সহীহুল বুখারী*, হাদীস নং- ৪৭৯৫।

[৩] *সহীহুল বুখারী*, যাকাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: খেজুরের পরিমাণ অনুমান করা, ৪ খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭। সহীহ মুসলিম, মর্যাদাবলী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: নবী (সা) এর মু'জিযা, ৭ম খ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১; আব্দুল হালীম আবূ শুক্কাহ্, *রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা*, ২য় খ. (ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ১৪৫, গ্রীণ রোড, নভেম্বর ২০০২ খৃস্টাব্দ), পৃ. ৩৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

থেকে খেজুর বাগানের দূরত্ব ছিল দুই মাইল। তিনি সেখান থেকে নিয়মিত খেজুর বীজ সংগ্রহ করতেন।[১] যাতায়াতের সময় প্রায়ই রাসূল (সা) এর সাথে দেখা হতো। রাসূল (সা) এর কাছে অনেক মাসআলা-মাসায়েল জিজ্ঞাসা করতেন। আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) এর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অনেক কর্মচারী কাজ করতেন। তারাও ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী কাজ করতেন। প্রতিষ্ঠানের মালিক আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) এর নির্দেশনা মেনে চলতেন তারা।

কিলাহ্ : রাসূল (সা) এর সময়ে আরেক জন বিখ্যাত ব্যবসায়ী নারী উদ্যোক্তা কিলাহ্। তিনি নিজেই রাসূল (সা) এর নিকট এসে ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচয় দিয়ে দেখা করতেন।[২] কিলাহ মাঝে মধ্যেই রাসূল (সা) এর দরবারে আসতেন এবং ব্যবসা সংক্রান্ত মাসআলা জেনে যেতেন।[৩] যেহেতু এ সকল বিদূষী নারী ব্যবসা সংক্রান্ত মাসআলা জানতে মুহাম্মদ (সা) এর নিকট আসতেন; সুতরাং এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই যে তারা ইসলামের পরিপূর্ণ বিধান মেনে ব্যবসা পরিচালনা করতেন। কিলাহ ছিলেন মক্কা-মদীনার বড় বড় নারী উদ্যোক্তাদের অন্যতম। রাসূল (সা) ও তাঁর সাহাবীগণের নিকট বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হিসেবেই কিলার পরিচিতি ছিল।

উম্মুল মু'মিনীন খাদীজা (রা)[৪]**:** ঐতিহাসিকদের মতে আরবের সে তৎকালীন সময়ে সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী-উদ্যোক্তা ছিলেন হযরত খাদীজা (রা)। জানা যায় তাঁর বাণিজ্য বহর নিয়ে যখন সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হতো তকন দেখা যেত খাদীজার একার পণ্য সামগ্রী কুরাইশদের সমগ্র পণ্য সামগ্রীর সমান। তাঁর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের শাখা প্রশাখা বা ইউনিট ছিল অনেক। সেখানে বহু লোক কাজ করতেন।

সফল উদ্যোক্তা হওয়ার শর্তাবলী

একজন ব্যক্তির ব্যবসা শুরু করার আগে অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টিকে কারো হালকাভাবে নেয়া উচিত নয়। মূলত, যে কোন সফল উদ্যোক্তাদের সাফল্যের পেছনে থাকে দক্ষ ব্যবসায়িক

---

১. অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন, *ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর সম্মান ও মর্যাদা* (ঢাকা : প্রকাশনায়: বাংলাদেশ হাদীস সোসাইটি, এপ্রিল ২০১৪ খৃস্টাব্দ), পৃ.৪০; প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

৪. নাম ও উপনাম: তাঁর নাম 'খাদীজা'। ডাক নাম 'উম্মুল হিন্দ'। তাঁর প্রথম স্বামী আবুল হালার ঔরসে হিন্দ নামক তার এক পুত্র ছিল তার নাম অনুসারে খাদীজা (রা) এর উপনাম হয় উম্মুল হিন্দ। নবী করীম (সা) এর প্রথমা স্ত্রী হযরত খাদীজা (রা)। প্রথম মুসলমান উম্মুল মু'মিনীনদের প্রধান খাদীজাতুল কুবরা (রা) ৫৫৫ খ্রিষ্টাব্দে অর্থাৎ হস্তী বছরের ১৫ বছর পূর্বে মক্কার সম্মানিত গোত্র আসাদ ইব্ন আব্দিল উযযায় জন্ম গ্রহণ করেন। সে হিসেবে তিনি রাসূল (সা) এর ১৫ বছরের বড় ছিলেন।পিতার নাম খুয়াইলিদ ইব্ন আসাদ ইব্ন আব্দুল ওযযা ইব্ন কুসাই, মায়ের নাম ফাতিমা বিনতে যায়িদাহ্। আর নানা ছিলেন আসাম ইব্ন হারাম ইব্ন ওয়াহাব ইব্ন হাজার ইব্ন আবদ ইব্ন মাহীস ইব্ন আমের। তাঁর নানীর ন্ম হালাহ্ বিনতে আবদ মানাফ। উল্লেখ্য যে, কয়েক পুরুষ উপরে গিয়ে খাদীজা (রা) এর মাতৃ ও পিতৃকুল একই ছিল। অর্থাৎ তাঁর উর্ধ্বতন পঞ্চম পুরুষ এবং রাসূল (সা) এর পঞ্চম পুরুষ একই ব্যক্তি ছিলেন। এ ব্যক্তির নাম ছিল কুসাই। পৈতৃক বংশের দিক থেকে খাদীজা রাসূল (সা) এর ফুফু হতেন।উপাধী তাহিরা (طاهرة) পবিত্রা নারী । খাদীজা (রা) তৎকালীন আরবে অত্যন্ত মর্যাদা সম্পন্না ও সম্মানিতা একজন মহিলা ছিলেন। জাহেলী যুগেও তিনি তাহিরা বা পূত পবিত্রা নারী উপাধীতে ভূষিতা ছিলেন। তিনিই রাসূল (সা) এর প্রথম স্ত্রী, নবী নন্দিনী ফাতিমাতুজ জোহরার মা, তিনিই হাসান ও হোসাইন (রা) এর নানী এবং তৎকালীন আরবের ধনাঢ্য ব্যবসায়ী। খাদীজা (রা) এর বাল্যকাল সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তবে রাসূল (সা) এর সাথে বিয়ে হবার পূর্বে তাঁর আরো দু'বার বিয়ে হয়েছিল। এরও পূর্বে খাদীজা (রা) এর পিতা খুয়াইলিদ তাঁকে বিযে দেয়ার জন্য সে সময়ের বিশিষ্ট ব্যক্তি তাওরাত ও ইঞ্জিল বিশেষজ্ঞ ইব্ন নাওফিলের সাথে সম্বন্ধ ঠিক করেন। ওরাকা খাদীজার চাচাত ভাই ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঐ বিয়ে সম্পাদন হয় নি। তবে তাঁর এসব যত পরিচয়ই থাক না কেন তিনি মুহাম্মাদ রাসূল (সা) এর স্ত্রী এটাই তার সবচেয়ে বড় ও সম্মানজনক পরিচয় । (মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম, কুর'আন ও হাদীসের আলোকে রাসূল (সা) এর স্ত্রীগণ কেমন ছিলেন, পিস পাবলিকেশন্স, ৩৮/৩,বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০১১ ইং, পৃ. ১২।)

Dhaka University Institutional Repository

সিদ্ধান্ত। গবেষণা ও পরিকল্পনা করে কোন ব্যবসায়ের ধারণাকে যদি বাস্তবায়নযোগ্য মনে হয় তবে উদ্যোক্তার উচিত একটি ব্যবসায় পরিকল্পনা লিখে ফেলা। ব্যবসায় পরিকল্পনায় নিচের বিষয়গুলো থাকা উচিত :[১]

- পরবর্তী তিন থেকে পাঁচ বছরে ব্যবসায়ের লক্ষ
- ব্যবসায়ের লক্ষ্য কিভাবে অর্জন করা হবে
- কখন এই লক্ষ্য অর্জন করা হবে
- ব্যবসায়ের দৈনন্দিন কার্যক্রম কিভাবে সম্পাদিত হবে এবং কিভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

সারাজীবনের সঞ্চয় ব্যবসায়ে ঢেলে দেয়ার আগে একজন উদ্যোক্তার নিজেকে নিচের এই প্রশ্নগুলি করা জরুরী।

- আপনার ব্যবসায় কি এমন কিছু আছে যা বিনিয়োগকারীদের এই উদ্যোগ সম্পর্কে উৎসাহিত করে তুলতে পারে?
- নিজের কি পরিমাণ পুজি আপনি এই ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক অথবা সমর্থ।
- আপনার ব্যবসায়ের ট্র্যাক রেকর্ড কেমন এবং সেটা আর্থিক সাহায্য প্রাপ্তিতে আপনার সহায়ক হবে নাকি বাধা হয়ে দাড়াবে?

ব্যবসায়ের মালিক হিসেবে উদ্যোক্তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো এমন গ্রাহক তৈরী করা যারা নিয়মিত তার ব্যবসায় হতে পণ্য কিংবা সেবা কিনবে। কাজেই আপনি কিভাবে বিক্রি করবেন এবং কার কাছে বিক্রি করবেন? কোন ব্যবসায় ঝাপিয়ে পড়ার আগে ব্যবসায় সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান একজন উদ্যোক্তার সবচেয়ে বড় সম্বল।
উদ্যোক্তা হওয়া অনেকের কাছেই স্বপ্ন। কিন্তু উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য অসংখ্য বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করতে হয়। একজন উদ্যোক্তাকে নিতে হয় অনেক ঝুঁকি, তার কোনটাতে তিনি সফল হন, কোনটাতে নেমে আসে ব্যর্থতা। এক্ষেত্রে একটি সাফল্য কিংবা ব্যর্থতাতেই একজন উদ্যোক্তার থেমে যাওয়া উচিত নয়, এই অর্জনগুলো হতে পারে তা আরো বড় সাফল্যের সোপান।

উদ্ভাবনী চিন্তা বা সৃষ্টিশীলতা

উদ্যোক্তার জন্য উদ্ভাবনী ধ্যান-ধারণা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তবে উদ্ভাবনী ধারণা বলতেই যে সম্পূর্ণ নতুন হতে হবে তা নয়, সেকেলে প্রচলিত রীতি ভেঙ্গে নতুন ভাবে চিন্তা করাও সৃষ্টিশীল কাজ।[২]

- উদ্ভাবনী চিন্তা উদ্যোক্তা সৃষ্টি করতে সক্ষম;
- উদ্ভাবনী সৃষ্টি বাস্তবায়নের জন্য অন্যকে দেয়া যেতে পারে;
- উদ্ভাবনী ধারণা নতুন অংশীদার এবং বিনিয়োগ নিয়ে আসতে সক্ষম;

উদ্ভাবনী চিন্তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তা কাজে পরিণত করা। চিন্তাকে কর্মে পরিণত করার জন্য নিচের পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করা উচিত :

১. উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপটি হচ্ছে একটি নতুন ধারণার জন্ম দেয়। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বেশী সম্ভব মানুষকে এতে সম্পৃক্ত করা। ব্যবসায়ের কর্মচারী, অংশীদার, গ্রাহক, বিনিয়োগকারী, এমনকি প্রতিযোগী সবার সাথে এই ধারণাগুলো নিয়ে আলোচনা করা উচিত। পরবর্তীতে এর সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করে একেকটি ধারণাকে প্রাধিকার দেয়া উচিত।

---

[১] *বাংলাদেশ ব্যাংক নারী উদ্যোক্তা সম্মেলন ও পণ্য প্রদর্শনী- ২০১৪* (স্মারক) (ঢাকা : প্রকাশনায় বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রকাশকাল, ২৪ মার্চ ২০১৪ খৃস্টাব্দ), পৃ. ১২।

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২; *BANGLAPEDIA,* National Encyclopedia of Bangladesh, Asiatic Society of Bangladesh, 5 Old Secretareat Road, Nimtali, Dhaka 1000, Bangladesh, March 2003, pp. 494-496.

Dhaka University Institutional Repository

২. সবচেয়ে ভালো ধারণাগুলোকে আরো বড় করার জন্য এরপর উদ্ভাবনী একটি লিখিত রূপ দিয়ে এর ব্যাপারে পরামর্শকদের সাথে আলোচনা করা যায়।
৩. সবচেয়ে ভালো ধারণাগুলোকে উদ্ভাবনীর মাধ্যমে আরো বড় করে তা থেকে কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয় অথবা সমাধানকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সামনে এগোতে হবে।
৪. উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ার সর্বশেষ ধাপটি হচ্ছে প্রকল্পটি চালিয়ে যাওয়া কিংবা গুটিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। সিদ্ধান্ত যাই হোক না কেন তার জন্য একটি পরিকল্পনা করা উচিত যাতে কিভাবে প্রকল্পের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে কিংবা কিভাবে প্রকল্পটি গুটিয়ে নেয়া হবে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা থাকবে।

উদ্যোক্তা হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলে করণীয়

উদ্যোক্তা হতে দৃঢ়সংকল্প হলে নিচের বিষয়গুলোর দিকে খেয়াল রাখতে হবে-

প্রথমত আপনার জ্ঞান, অভিজ্ঞতা কিংবা আগ্রহ আছে এখন একটি ব্যবসায়ের ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করতে হবে।

যদি কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের প্রতি আগ্রহ, জ্ঞান কিংবা অভিজ্ঞতা না থাকে তবে নিচের পদ্ধতি ক্রম অনুযায়ী অনুসরণ করা যায়।[১]

১. আগ্রহ আছে এমন একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত থেকে যতদূর সম্ভব অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করতে হবে।
২. নিজের বিশ্বাসযোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে প্রতিযোগিতামূলক পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে চাকুরীর চেষ্টা করা যায়। যেমন- কমিশন ভিত্তিক সেল্‌স এজেন্ট। এর ফলে ওই খাত সম্পর্কে একটি পূর্ণ ধারণা পাওয়া যাবে এবং সেই সাথে পারিশ্রমিক প্রতিযোগিতামূলক হওয়ার কারণে উদ্যোক্তার পরিশ্রম থাকবে অনেক বেশী।
৩. নিজের উদ্যোগটি শুরু করার আগে আপনার নির্দিষ্ট খাত, প্রতিষ্ঠান, সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের সাথে একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক তৈরীর চেষ্টা করা উচিত। এর মাধ্যমে আপনি যেই ব্যবসায়টি শুরু করতে চাচ্ছেন তার ধরন সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা পাবেন।
৪. নতুন ব্যবসা খুব ছোট থেকেও শুরু করা সম্ভব। এর ফলে যেকোন ধরনের সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা আসলে, তার শিক্ষা নিয়ে ব্যবসায়ে কৌশলগত পরিবর্তন আনা সম্ভব।

উদ্যোক্তার সক্ষমতার উন্নয়ন

জীবনযাপনের নানা পর্যায়ে সামর্থ্যের উন্নয়ন করতে হবে। **উদ্যোক্তা** যখন বন্ধু কিংবা পরিবারের সদস্যদের সাথে কাজ করবে তখন সে নিজেকে যাচাই করে দেখবে নিজের কাজের ধরন কি আপনার চারপাশের মানুষদের চেয়ে আলাদা কিছু? সে কি তাদের চেয়ে দ্রুততার সাথে কিংবা দক্ষতার সাথে কাজটি করতে পারেন? নথিকরণ, উপস্থাপন, প্রযুক্তির ব্যবহার, আচরণ এসবক্ষেত্রে আপনাকে এগিয়ে যেতে হবে অনেক বেশী। নিজের দৃষ্টিভঙ্গি, আত্মবিশ্বাস থেকে নিজেকে ধরে নিতে হবে নিজে অন্যদের চেয়ে উচ্চতর অবস্থানে আছেন এবং একজন উদ্যোক্তা হবার সকল উপকরণ তার আছে।

পারিবারিক সমর্থন

পারিবারিক সমর্থন একজন উদ্যোক্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সফল উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য এটি খুবই জরুরী। **উদ্যোক্তা** পরিবারের সদস্যদের নিজের উদ্যোগ, উদ্দেশ্য বোঝাতে হবে। অন্যথায় পরিবার উদ্যোগের সামনে একটি বাধা হয়ে দাড়াতে পারে। সে যদি নিজের পরিবারকে ব্যবসায়ের কৌশল বোঝাতে ব্যর্থ হয় তাহলে নিজের উদ্যোগের সফলতা সম্পর্কে নিজের প্রশ্ন করা উচিত। কারণ পরিবার তাকে ব্যবসায়ের সফলতা সম্পর্কে

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২; *BANGLAPEDIA,* National Encyclopedia of Bangladesh, Asiatic Society of Bangladesh, 5 Old Secretareat Road, Nimtali, Dhaka 1000, Bangladesh, March 2003, pp. 494-496.

Dhaka University Institutional Repository

আত্মবিশ্বাস দিতে সক্ষম। পারিবারিক সমর্থন না থাকলে যেকোন উদ্যোগের সফলতা সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে।

বিনিয়োগ বা অর্থায়ন

যথাযথভাবে পরিকল্পনা করার পাশাপাশি অর্থায়ন জরুরী। অর্থায়নের সমস্যা এড়াতে চাইলে নিচের বিষয়গুলো অনুসরণ করতে হবে :

১. উদ্যোক্তা হবার চিন্তা করার পর থেকেই আপনার অর্থ জমা করা শুরু করতে হবে।
২. অর্থ যোগান দিতে সক্ষম এমন বিভিন্ন উৎস খুজে বের করতে হবে।
৩. ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকেও অনেক সময় স্বল্পমেয়াদী পুজি সংস্থান করা যায়, এবং ব্যবসায়ের সফলতার উপর ভিত্তি করে এটি বাড়ানো সম্ভব।
৪. ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়ার আগে ব্যাংকে কি পরিমাণ ঋণ শোধ করার সামর্থ্য নিজের আছে তা প্রথমে যাচাই করে নিতে হবে।

বিজ্ঞাপন বা প্রচার

সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবসায় প্রচারের ক্ষেত্রে মূলধারার মাধ্যম হয়ে উঠেছে। এটি খুব স্বল্প খরচে এবং দ্রুততম সময়ে বিশাল জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাতে পারে যা অন্য কোন মাধ্যমে সম্ভব নয়। নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্র উদ্যোক্তাকে হতে হবে উদার। অন্যথায় তার প্রতিযোগীর কাছ থেকে তিনি পিছিয়ে পড়বেন। এছাড়া শেখার এবং শোনার মানসিকতা উদ্যোক্তার জন্য খুবই প্রয়োজন। বাস্তব জীবনের সকল অভিজ্ঞতা থেকে উদ্যোক্তাকে শিখতে হবে এবং এই অভিজ্ঞতাই তাকে সামনে নিয়ে যাবে।

তথ্য ও প্রযুক্তি নেটওয়ার্কিং

আমাদের দেশে উদ্যোক্তারা আন্তর্জাতিক উদ্যোক্তাদের থেকে অনেকাংশেই পিছিয়ে পড়ছেন প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাবে। ব্যবসায়ে প্রযুক্তির ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি প্রতিষ্ঠানের কর্মদক্ষতাকে বাড়িয়ে দিতে পারে অনেক গুণ। প্রতিষ্ঠানের হিসাবরক্ষণ, গ্রাহকদের সাথে যোগাযোগ, দক্ষ পরিচালনা সব ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার একটি উদ্যোগকে সফল করে তুলতে পারে।[১]

অপরদিকে গ্রাহক, প্রতিযোগী, বিক্রেতা সবার সাথে চমৎকার যোগাযোগ উদ্যোক্তাকে এনে দিতে পারে তুলনামূলক সুবিধা যা দীর্ঘমেয়াদে প্রতিষ্ঠানের জন্য দরকারী। একজন উদ্যোক্তার উচিত প্রতিনিয়ত এই নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি করা যাতে নতুন নতুন গ্রাহক, বাজারের সাথে তিনি পরিচিত হতে পারেন।

বর্তমান সময়ে বাংলাদেশে নারী উদ্যোক্তা

প্রায় ষোল কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত বাংলাদেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী। অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি এ বিশাল জনসম্পদের সামান্য অংশই স্বীকৃত অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত। বাস্তবিকপক্ষে, এ বৃহৎ মানব সম্পদকে কর্মযজ্ঞে নিয়োজিত করা না গেলে কিংবা ব্যবসায়ে সম্পৃক্ত করা না গেলে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভবপর নয়। বৃহৎ পরিসরে নারীদেরকে বাংলাদেশ গঠনের সুযোগ বিগত বছরগুলোতে দেশী-বিদেশী বোদ্ধাদের মধ্যে ব্যাপক গবেষণার দ্বার উম্মোচন করে। কাগজে-কলমের ধারণাচিত্র এবং নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নের বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নিয়ে সরকারের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক কটেজ, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা উন্নয়ন এর উপর বিশেষ জোর দিয়েছে। বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশ ব্যাংক নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে বেশ কিছু পদক্ষেপ ও কর্মসূচী গ্রহণ করেছে, যা দেশে বিদেশে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে। এ

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২; *BANGLAPEDIA,* National Encyclopedia of Bangladesh, Asiatic Society of Bangladesh, 5 Old Secretareat Road, Nimtali, Dhaka 1000, Bangladesh, March 2003, pp. 494-496.

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবেদনে বাংলাদেশ ব্যাংক গৃহীত নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপসমূহ এবং এর ফলে অর্জিত সাফল্য তুলে ধরা হলো।

ইহা সর্বজনবিদিত যে, আর্থিক অন্তর্ভূক্তি, প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র বিমোচন এর মধ্যে একটি যোগসূত্র রয়েছে। উপরন্তু, ২০০৬ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক গঠিত অন্তর্ভূক্তিমূলক আর্থিক খাত গঠন সংক্রান্ত কমিটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকেও তাদের সনাতন লক্ষ্য প্রুডেনশিয়াল রেগুলেশন এবং আর্থিক খাতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এর সাথে অন্তর্ভূক্তিমূলক আর্থিক খাত সৃষ্টির উপর বিশেষ জোর দিয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ব্যাংক একটি কল্যাণমূখী, জনদরদীমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতি আর্থিক সেবা বহির্ভূত জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সেবায় অন্তর্ভুক্তিকরণ বিশেষতঃ কটেজ, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা এবং নারী উদ্যোক্তাদেরকে পর্যাপ্ত অর্থায়ন নিশ্চিত করে উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনয়নের প্রতি জোর দেয়।

টেকসই অর্থনীতি উন্নয়নে এসএমই খাত এবং নারী পরিচালিত ব্যবসায়ের পরিবর্ধিত ভূমিকাকে গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকে ৩১ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে "এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ" নামে একটি নতুন বিভাগ খোলা হয়। পৃথক এসএমই বিভাগ খোলার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে লৈঙ্গিক সমতা নিশ্চিতকরণ ও নারীর ক্ষমতায়ন এর মাধ্যমে সার্বিক ও অভীষ্ট অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করা।[১] এসএমই বিভাগ খোলার পরপরই এটি অনুধাবন করা হয় যে, নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নের মাধ্যমে কেবল নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা সম্ভব; এবং তৎপরবর্তীকাল হতে বাংলাদেশ ব্যাংকের নেতৃত্বে সকল ব্যাংক, নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, উইমেন চেম্বার ও অন্যান্য স্টক হোল্ডারদের সহযোগিতায় বাংলাদেশে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন কার্যক্রম গতি লাভ করে।

বর্তমানে, বিশ্বের অধিকাংশ বাজার ব্যবস্থায় নারীরা ৮০% ভোগ্যপণ্য ক্রয়ের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে (মার্তি বালেত্তা বিপণন সিদ্ধান্ত)। নারীরা আজ বৃহদাংশ প্রতিভার প্রতিনিধিত্বকারী- ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার প্রায় ৬০% বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রিধারী হচ্ছে নারী (ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শিক্ষা বিভাগ)।[২] বাংলাদেশেও এ হার ৪০-৪৫% এর মধ্যে হবে মর্মে প্রত্যাশা করা যায়। অধিকন্তু, গবেষণালব্ধ ফলাফলে দেখা যায় যে নারী নেতৃত্বাধীন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান অধিকতর মুনাফা অর্জন করে থাকে (ক্যাটালিস্ট, ম্যাককিনসে)। অর্থাৎ, নারীর প্রতিভার যথেষ্ট মূল্যায়ন না হওয়ায় অর্থনীতিতে একটি বিরূপ প্রভাব রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক তাই এসএমই উদ্যোগে অর্থায়ন ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নের উপর বিশেষ নজর দিয়েছে।[৩]

বর্তমানে অধিক হারে নারীরা এসএমই উদ্যোগে সম্পৃক্ত হচ্ছেন। এটি সম্ভব হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের জন্মলগ্ন ২০১০ সাল হতে নারী উদ্যোক্তা বান্ধব নানামূখী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে। সাধরণভাবে নারীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনা করে থাকেন। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কটেজ ও মাইক্রো শিল্পকেও সকল ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের এসএমই অর্থায়ন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্তকরণের ব্যবস্থা করা হয় (এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০১ তারিখ ১৯ জুন ২০১১)। একই সাথে কটেজ ও মাইক্রো শিল্পকেও বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালিত পুনঃঅর্থায়ন তহবিল হতে অর্থায়ন গ্রহণের জন্য যোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে (এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০২, তারিখ ৪ সেপ্টেম্বর ২০১১)। নারীদেরকে অর্থনৈতিক মূলধারায় অধিকহারে সম্পৃক্তকরণের উদ্দেশ্যে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সহজশর্তে আর্থিক

---

[১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

[২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

[৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

সুবিধা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগামস্ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত প্রধান প্রধান ব্যবস্থাদি নিম্নরূপ :[১]

- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের সমুদয় অর্থের ন্যূনতম ১৫% মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে এসএমই ঋণের সুদের হার হ্রাসকৃত রেটে, ১০% (ব্যাংক রেট + ৫%), নির্ধারণের জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- প্রতিটি ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আবশ্যিকভাবে স্বতন্ত্র "Women Entrepreneur's Dedicated Desk" স্থাপন ও তাতে প্রয়োজনীয় উপযুক্ত জনবল নিয়োগ করে তাদেরকে এসএমই খাতে অর্থায়ন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
- ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের বিপরীতে ঋণ গ্রহীতা 'নারী শিল্প উদ্যোক্তা' হলে সহায়ক জামানত হিসেবে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত গ্যারান্টির বিপরীতে সর্বোচ্চ ২৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জামানতবিহীন ঋণ সুবিধা প্রদান করতে পারে।
- মাইক্রো নারী উদ্যোক্তা কর্তৃক এসএমই ঋণ গ্রহণের সুবিধার্থে গ্রুপভিত্তিক ৫০ হাজার টাকা ও তদুর্ধ্ব ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের নীতিমালা প্রবর্তন করা হয়েছে। যার সুফল পল্লী অঞ্চলের মাইক্রো নারী উদ্যোক্তারা গ্রহণ করতে পারছে।

অধিকন্তু, বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই বিভাগ বিভিন্ন নারী চেম্বার যথা বিডব্লিউসিসিআই, এফডব্লিউবিডব্লিউ এর যৌথ উদ্যোগ এবং সকল ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় অসংখ্য উন্নয়নমূলক কর্মসূচী পরিচালনা করেছে। ওয়ার্কশপ আয়োজন, নারী উদ্যোক্তা সংগঠনের সাথে সভা, নারী এসএমই উদ্যোক্তাদের মাঝে সরাসরি ঋণ বিতরণ, নারী উদ্যোক্তা মেলা ও পণ্য প্রদর্শণী তাদের মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই বিভাগের এরূপ উদ্যোগের ফলে নারীরা অধিকহারে ব্যবসায়ে আগ্রহী হচ্ছেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের এরূপ উদ্যোগের ফলে বিগত বছরগুলোতে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিশেষ সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ২০১৩ সালে সকল ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ৪১,৬৯৫ জন নারী উদোক্তার অনুকূলে সর্বমোট ৩,৩৪৬.৫৫ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, ২০১০ সালে ১৩,৮৩১ জন নারী উদ্যোক্তাকে ১,৮০৪.৯৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছিল (সারণি-১)।

সারণি-১ : এসএমই উদ্যোগ ও নারী উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ

বছর	এসএমই উদ্যোগে ঋণ বিতরণ		এসএমই নারী উদ্যোক্তাকে ঋণ বিতরণ	
	উদ্যোক্তার সংখ্যা	পরিমাণ (কোটি টাকায়)	উদ্যোক্তার সংখ্যা	পরিমাণ (কোটি টাকায়)
২০১০	৩০৮,৯৫০	৫৩,৫৪৩.৯৩	১৩,৮৩১	১,৮০৪.৯৮
২০১১	৩১৯,৩৪০	৫৩,৭১৯.৪৪	১৬,৬৯৬	২,০৪৮.৪৫
২০১২	৪৬২,৫১৩	৬৯,৭৫৩.৪২	১৭,৩৬২	২,২৪৪.০১
২০১৩	৭৪৪,২২৮	৮৫,৩২৩.২৫	৪১,৬৯৫	৩,৩৪৬.৫৫

- বিগত ২০১২ সালে ১৭,৩৬২ জন নারী উদ্যোক্তাকে ২২৪৪.০১ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ, ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৩ সালে নারী উদ্যোক্তা খাতে ৫০.৪৭% এসএমই ঋণ বিতরণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩; *BANGLAPEDIA,* National Encyclopedia of Bangladesh, Asiatic Society of Bangladesh (Dhaka : 5 Old Secretareat Road, Nimtali, Dhaka 1000, Bangladesh, March 2003), pp. 494-496.

Dhaka University Institutional Repository

- ২০১০ সাল হতে ২০১৩ সাল পর্যন্ত নারী উদ্যোক্তা খাতে ঋণ বিতরণের তথ্য লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, মোট এসএমই উদ্যোগে ঋণ বিতরণের মধ্যে নারী উদ্যোক্তা খাতে ঋণ বিতরণের হার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১০ সালে এ হার ছিল ৩.২২%; পক্ষান্তরে ২০১৩ সালে এ হার ৩.৯২% এর উন্নীত হয়েছে।

ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক অর্থায়নের পাশাপাশি এসএমই উদ্যোগে অর্থায়ন প্রবাহ গতিশীল রাখতে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং নিজস্ব অর্থায়ন এর মাধ্যমে পুনঃ অর্থায়ন প্রদান করে যাচ্ছে। চুক্তিবদ্ধ ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন প্রদানের ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তাদের প্রাধান্য দেওয়া হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল "বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল" এর ১৫% শুধুমাত্র নারীদের জন্য বরাদ্দ রেখে স্বতন্ত্র "বাংলাদেশ ব্যাংক নারী উদ্যোক্তা তহবিল গঠন" করা হয়। এ তহবিল হতে ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তারা স্বল্প সুদে (ব্যাংক রেট + ৫%) ঋণ গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। ২০১২ সালে 'দি অর্গানাইজেশন অব ইকোনোমিক কো-অপারেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (ওইসিডি)' প্রকাশিত "উইমেন ইন বিজনেস্" প্রতিবেদনে এটিকে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম পন্থা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।[১]

সারণি-২ : বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালিত বিভিন্ন তহবিলের মাধ্যমে এসএমই খাতে বিতরণকৃত বছরওয়ারী পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ

বছর	পুনঃঅর্থায়ন সুবিধাভোগীর সংখ্যা			পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)		
	সাধরণ	নারী উদ্যোক্তা	মোট	সাধরণ	নারী উদ্যোক্তা	মোট
২০১০	৩০২৮	১৩১৪	৪৩৪২	২০৬.১৬	১১৬.০০	৩২২.১৬
২০১১	২০৫৭	২৭৪৯	৪৮০৬	১২৩.১৬	১৭১.২২	২৯৪.৩৮
২০১২	৮৭৫৯	২৪৯৮	১১২৫৭	৫৪১.৭১	১৫৭.৩৬	৬৯৯.০৭
২০১৩	৪৮২০	২৪২৩	২৪২৩	৪৩৮.১৩	২৫৭.৭৮	৬৯৫.৯১

অধিকন্তু, উল্লেখ করা যায় যে, এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক অর্থায়নপুষ্ট এডিবি-২ তহবিল হতে সেপ্টেম্বর ২০১২ এর পূর্বে বাজারভিত্তিক সুদহারে নারী উদ্যোক্তাদেরকে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়ে আসছিল। কিন্তু, বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগের ফলে এডিবি উক্ত তহবিল হতে নারীদেরকে বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিলের ন্যায় সেপ্টেম্বর ২০১২ হতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদানের বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত প্রদান করে। ফলশ্রুতিতে, তৎপরবর্তীতে, এডিবি-২ তহবিল হতেও নারী উদ্যোক্তাদেরকে পুনঃঅর্থায়ন প্রদান গতি লাভ করে। সেপ্টেম্বর ২০১২ পর্যন্ত এডিবি-২ তহবিল হতে মাত্র ৬১ জন নারী উদ্যোক্তার অনুকূলে ৬.৫১ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু, ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধাভোগী নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা ও পরিমাণ ৪৫৩ এবং ৪৮.২১ কোটি-তে উন্নীত হয়েছে।[২]

- ২০১৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯,৬১২ জন নারী উদ্যোক্তাকে অর্থায়নের অনুকূলে ৭৫৪.২৫ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হয়েছে। অন্যদিকে, একই সময়কাল পর্যন্ত ৩২,৩৪০ জন নারী উদ্যোক্তার অনুকূলে সর্বমোট ২,৭০১.৪২ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হয়েছে।
- বছরওয়ারী পুনঃঅর্থায়নের তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে প্রতিবছর পুরুষদের তুলনায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধাভোগী নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা অধিকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৩ সারে মোট ৭২৪৩ জন উদ্যোক্তাকে

[১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।
[২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থায়নের বিপরীতে ৬৯৫.৯১ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হয়েছে; যার মধ্যে ২,৪২৩ জন নারী উদ্যোক্তার বিপরীতে ২৫৭.৭৮ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হয়েছিল।

- ২০১২ সালে মোট পুনঃঅর্থায়নের ২৩% নারী উদ্যোক্তাদের অনুকূলে প্রদান করা হয়েছিল। পক্ষান্তরে, ২০১৩ সালে মোট পুনঃঅর্থায়নের ৩৭% নারী উদ্যোক্তা খাতে প্রাদন করা হয়েছে।
- ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক এসএমই উদ্যোগে মোট অর্থায়নের মধ্যে পুনঃঅর্থায়নের হার ০.৮১%। অন্যদিকে, নারী উদ্যোক্তাদেরকে প্রদানকৃত মোট অর্থায়নের মধ্যে পুনঃঅর্থায়নের হার ৭.৭০%।

বাংলাদেশে নারীরা আজ রাষ্ট্রের উচ্চ ক্ষমতা এবং ব্যবসায়ে অধিষ্ঠিত। কিন্তু, ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশের নারীরা ধর্ম, সংস্কৃতি ও নৃতাত্ত্বিকতার প্রভাবে বহির্মূখী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত ছিল না। এছাড়াও, অদ্যবধি বেশ কিছু সামাজিক ও আর্থিক কারণ বলবৎ রয়েছে যা নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও নারী বান্ধব ব্যবসা সম্প্রসারণে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করছে।[১]

- নিকট অতীতেও নারীরা নিজেদেরকে ব্যবসায়ে সম্পৃক্ত করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত না। মুসলিম প্রধান দেশ হিসেবে বাংলাদেশের নারীদেরকে সমাজ একান্তভাবে গৃহিণী হিসেবেই দেখতে অভ্যস্ত ছিল।
- ব্যবসা পরিচালনা বিষয়ে পুরুষদের তুলনায় নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা অপেক্ষাকৃত কম।
- নারী উদ্যোক্তার সামাজিক ও ধর্মীয় রীতি নীতির কারণে সহায়ক জামানত প্রদানের পর্যাপ্ত সক্ষমতা নেই। ঐতিহ্যগতভাবে, নারীরা পৈতৃক সম্পদ এমনকি স্বামীর সম্পদের উত্তরাধিকারী স্বত্ব গ্রহণ করে থাকে না।
- আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সাধারণভাবে অবিবাহিত নারী উদোক্তাদের অর্থায়নে অনাগ্রহী থাকেন; কেননা ব্যাংকাররা মনে করেন যে, অবিবাহিত মহিলাদের বিবাহের পরে স্থায়ী ঠিকানা পরিবর্তনের ফলে ঋণ অপরিশোধিত থাকার সম্ভাবনা তৈরী হতে পারে।
- পরিবারের পক্ষ থেকেও নারীদেরকে ব্যবসায়ে উৎসাহিত করা হয় না; যদিও অফিসিয়াল চাকুরীতে খুব একটা বাধা নেই।
- অতীতে নারীরা মানিলেন্ডার কিংবা স্থানীয় এনজিও হতে উচ্চ সুদহারে ঋণ গ্রহণ করত, যা তাদের উৎপাদিত পণ্যকে মূল্যের বিচারে অপেক্ষাকৃত কম প্রতিযোগিতামূলক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।
- তাছাড়া, কারিগরী জ্ঞান এর স্বল্পতার কারণে পণ্যের গুণাগুণ এর সাপেক্ষেও নারী উদ্যোক্তাদের পণ্য অপেক্ষাকৃত কম প্রতিযোগিতামূলক।
- আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পর্যাপ্ত প্রচারের অভাবে নারী উদ্যোক্তারা ব্যাংকিং প্রোডাক্ট বিষয়ে যথেষ্ট অবগত নয় মর্মেও প্রতীয়মান হয়েছে।

নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ডেডিকেটেডডেস্ক/এসএমই হল্প ডেস্ক ঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে প্রতিটি ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে স্বতন্ত্র “Women Enterpreneur’s Dedicated Desk” কার্যকরী রয়েছে। তাছাড়া, প্রতিটি ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে SME Help Desk স্থাপন করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই বিভাগ কর্তৃক ডেস্ক প্রধানদের নাম ও মোবাইল নম্বর সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ডেস্ক এর মাধ্যমে উদ্যোক্তারা ব্যাংকে এসে সহজেই যাবতীয় তথ্য ও পরামর্শ গ্রহণ করতে পারছেন।

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪; *BANGLAPEDIA,* National Encyclopedia of Bangladesh, Asiatic Society of Bangladesh (Dhaka : 5 Old Secretareat Road, Nimtali, Dhaka 1000, Bangladesh, March 2003), pp. 494-496.

Dhaka University Institutional Repository

নারী উদ্যোক্তা খাতে ঋণ বিতরণ

দেশের শিল্প উন্নয়নকে সুষম ও সুসংগঠিত করা তথা টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্যে অর্থনীতির মূলস্রোতে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ খুবই প্রয়োজন। এ জন্যে নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক উদ্যোগ পরিচালনায় ঋণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক এসএমই ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার দিয়েছে। সহজ শর্তে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধা নিশ্চিত করতে এসএমই খাতের পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের ১৫ শতাংশ অর্থ কেবলমাত্র নারী উদ্যোক্তাদের জন্যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এর আওতায় সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ সুদহারে নারী উদ্যোক্তাগণ ব্যাংক থেকে ঋণ সুবিধা পাচ্ছেন। ক্ষুদ্র ও নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত গ্যারান্টিকে জামানত হিসেবে বিবেচনা করে ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। নারী উদ্যোক্তাদের জন্যে গ্রুপভিত্তিক ৫০ হাজার টাকা ও তধোর্দ্ধ অঙ্কের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের নীতিমালা জারি করা হয়েছে।[১] ২০১০, ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ সালে যথাক্রমে ১৩,৮৩১, ১৬,৬৯৬,১৭,৩৬২ ও ৪১,৬৯৫ জন এসএমই নারী উদ্যোক্তাদের অনুকূলে যথাক্রমে ১,৮০৫ কোটি টাকা, ২,০৪৮ কোটি টাকা, ২,২৪৪ কোটি টাকা এবং ৩,৩৪৭ কোটি টাকাঋণ বিতরণ করা হয়েছে। নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা ও ঋণ বিতরণের পরিমাণ উভয় ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধির হার অব্যাহত রয়েছে। নিম্নের সারণি-৩ এ নারী উদ্যোক্তাদেরকে ঋণ বিতরণের চিত্র প্রদর্শিত হ'ল-

সারণি-৩ : নারী উদ্যোক্তাদেরকে ঋণ বিতরণ চিত্র-৬ঃ নারী উদ্যোক্তা খাতে ঋণ বিতরণ

বছর	মোট বিতরণ	নারী উদ্যোক্তাখাতে ঋণ বিতরণ	মোট ঋণের মধ্যে নারী উদ্যোক্তা খাতে বিতরণের হার	নারী উদ্যোক্তা খাতে ঋণ বিতরণের প্রবৃদ্ধি
২০১০	৫৩,৫৪৪	১,৮০৫	৩.৩৭%	–
২০১১	৫৩,৭১৯	২,০৪৮	৩.৮১%	১৩%
২০১২	৬৯,৭৫৩	২,২৪৪	৩.২২%	৯%
২০১৩	৮৫,৩২৩	৩,৩৪৭	৩.৯২%	৪৯%

এসএমই উদ্যোক্তা ও নারী উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ

বিভিন্ন ব্যাংক ও নন-ব্যাংক কর্তৃক আয়োজিত উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তা সহ এসএমই উদ্যোক্তাকে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে এসএমই বিভাগের পক্ষ থেকে সরাসরি অংশগ্রহণ করা হয়। বিগত বছরে জাইকা[২] ও আইএফসি[৩] এর সহায়তায় এসএমই বিভাগের সার্বিক তত্বাবধানে উইন্ডমিল (Windmill) এর মাধ্যমে সারাদেশের প্রায় পাঁচ শতাধিক উদ্যোক্তা ও নারী উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান নারী উদ্যোক্তাদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে, যারা এখনও এ ধরণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেননি তাদেরকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য অত্র বিভাগের পক্ষ থেকে সময়ে সময়ে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।[৪]

উদ্যোক্তা হওয়া/ব্যবসা শুরু করার নিয়ম

ব্যবসায় পরিকল্পনা

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

২. জাইকা হলো জাপানের আন্তর্জাতিক আর্থিক সাহায্য সংস্থা।

৩. আন্তর্জাতিক পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা, প্রতিষ্ঠা ২০ জুলাই ১৯৫৬। বর্তমান সদস্য ১৮৪। এ র সর্বশেষ সদস্য দেশ দক্ষিণ সুদান।

৪. বাংলাদেশ ব্যাংক নারী উদ্যোক্তা সম্মেলন ও পণ্য প্রদর্শনী- ২০১৪(স্মারক) (ঢাকা : প্রকাশনায় বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রকাশকাল, ২৪ মার্চ ২০১৪ খৃস্টাব্দ), পৃ. ১২।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবসায় চালানোর জন্য পরিকল্পনা একটি অবিচ্ছেদ্য ব্যাপার। একটি ভালো পরিকল্পনা ব্যবসায়কে নিয়ে যেতে পারে অনেকদূর। ব্যবসায়ের বর্তমান অবস্থান এবং ভবিষ্যত সাফল্যের মাঝে যোগসূত্র স্থাপন করে একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা। পরিকল্পনা হতে পারে স্বল্প বা দীর্ঘ-মেয়াদী কিংবা প্রায়োগিক বা কৌশলগত। পরিকল্পনার প্রক্রিয়াটি শুরু হয় গোল তৈরী এবং কিভাবে কার্যসম্পাদন করা হবে তার উপর ভিত্তি করে।

ব্যবসা শুরুর ধাপসমূহ

ব্যবসায় সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষেরই ভুল ধারণা রয়েছে। তারা মনে করে একটি উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া খুবই সহজ এবং যথেষ্ট পরিমাণ ব্যবসায়িক জ্ঞান ছাড়াই এটি করা সম্ভব। অবশ্য অনেকেই ব্যবসায়কে একটি কঠিন কাজ হিসেবে নিয়ে থাকে। একেক উদ্যোক্তা একেক ধরনের ব্যবসায়ের প্রতি আগ্রহ পোষন করেন। কেউ হয়তো ট্রেডিং ভালো লাগতে পারে, কারো কাছে ভালো লাগতে পারে সেবামূলক কিংবা উৎপাদনমুখী ব্যবসা।[১] ব্যবসায় সাফল্য অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ব্যবসায়িক কৌশল, নীতি ও প্রচলিত ধারা। ব্যবসায় শুরু করার আগে আমাদের এগুলো সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। একজন ব্যক্তির ব্যবসায় শুরু করার জন্য মানসিক প্রস্তুতি থাকতে হবে। এরপর দরকার হবে যথাযথ সহায়তা ও নির্দেশনা আর পুজি এবং সম্পদের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা। পুজি এবং সম্পদ ব্যবসায় শুরু করার জন্য খুবই জরুরী হতে পারে কিন্তু এগুলোই সব কিছু নয়। যথাযথ পথ নির্দেশনা ছাড়া কেউ ব্যবসা শুরু করলে তা পুঁজির জন্য যথেষ্ট ঝুঁকি তৈরী করে। একজন নতুন উদ্যোক্তার জানা উচিত তিনি কিভাবে ব্যবসায় শুরু করবেন। ট্রেড লাইসেন্স, ব্যাংক হিসাব, কোম্পানী রেজিস্ট্রেশন, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন, এলসি ওপেনিং, মেশিনারী ও যন্ত্রপাতি আমদানী এবং স্থাপন, প্রোজেক্ট প্রোফাইল, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, টেলিযোগযোগ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে।[২] এছাড়াও উদ্যোক্তার পণ্য উৎপাদন, বিপণন, রপ্তানী, ট্যাক্স প্রদান ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জানতে হবে।

ধাপ-১ : সিদ্ধান্ত গ্রহণ
একজন ব্যক্তির পেশা যাই হোক না কেন তিনি যদি ব্যবসায় করার ব্যাপারে মনস্থির করেন, তাহলে গুরুত্বের সাথে তার ব্যাপারটি ভেবে দেখা উচিত এবং এই ব্যাপারে মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে। কাজেই, এক্ষেত্রে দৃঢ় সিদ্ধান্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার কারণ এটি ছাড়া নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন সম্ভব না।

ধাপ-২ : ব্যবসায় ধরন
এটি সব ব্যবসায়ীদের জন্যই আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। ব্যবসায় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর কি ধরনের ব্যবসায় আপনার আগ্রহ আছে তার উপর ভিত্তি করে আপনার ব্যবসায়ের ধরন বাছাই করতে হবে। সেটা হতে পারে ট্রেডিং, উৎপাদন, সেবা কিংবা আমদানী-রপ্তানী। যেই ব্যবসায়টি আপনি শুরু করতে যাচ্ছেন তার জন্য বাজারে যথেষ্ট চাহিদা থাকতে হবে।

ধাপ-৩ : একক মালিকানা/যৌথ উদ্যোগ/কোম্পানী
ব্যবসায় শুরু করার আগে চিন্তা করতে হবে আপনি একা এই ব্যবসায়টি চালাতে পারবেন কিনা। যদি সেটা সম্ভব হয় তবে এক-মালিকানা হিসেবে আপনি ব্যবসায় চালাতে পারেন। তবে একা একা ব্যবসায় জটিলতা সামলানো

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬; *BANGLAPEDIA,* National Encyclopedia of Bangladesh, Asiatic Society of Bangladesh (Dhaka : 5 Old Secretareat Road, Nimtali, Dhaka 1000, Bangladesh, March 2003), pp. 494-496.

Dhaka University Institutional Repository

অনেকের পক্ষেই কঠিন, এসব ক্ষেত্রে একজন কিংবা তার চেয়ে বেশী সফল ও সৎ কাউকে ব্যবসায়ের অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করে অংশীদারী ব্যবসায় করা যেতে পারে। এরপরে ব্যবসায় আরো সম্প্রসারিত হলে তাকে প্রাইভেট লিমিটেড কিংবা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর আকার দেয়া যেতে পারে।

ধাপ-৪ : নাম বাছাই

ব্যবসায় যেমনই হোক না কেন, তার একটি নির্দিষ্ট নাম প্রয়োজন। একটি চমৎকার নাম একটি পণ্য অথবা ব্যবসায়কে অনেকদূর নিয়ে যেতে পারে। অংশীদারী ব্যবসায় হলে অংশীদারদের সাথে আলোচনা করে নাম বাছাই করা উচিত।

ধাপ-৫ : ব্যবসায়ের স্থান

একজন দক্ষ ব্যবসায়ী সবসময় উপযুক্ত স্থানের উপর জোর দেন। উপযুক্ত স্থান, নির্দিষ্ট গ্রাহক, শ্রমের সহজলভ্যতা এ সবই স্থান নির্বাচনের সাথে সম্পৃক্ত। পরিসংখ্যান মতে, গ্রাহক সম্পর্কিত ব্যবসায়গুলো সবসময় জনবহুল এলাকায় বিকাশ লাভ করেছে।

ধাপ-৬ : ট্রেড-লাইসেন্স এবং অন্যান্য দলিলাদি

ট্রেড লাইসেন্স ব্যবসায়কে বৈধতা দেয়। এটি ছাড়া সকল প্রকার ব্যবসায় কার্যক্রম অবৈধ। ট্রেড লাইসেন্স এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় অনুমতিপত্র সংগ্রহ করা ব্যবসায় শুরু করার প্রাথমিক শর্ত।

ধাপ-৭ : ব্যাংক হিসাব ও ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (টিন)

ব্যাংক হিসাব ও ব্যবসায়ের টিন আরও দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেকোন ব্যাংকে গিয়ে উদ্যোক্তা ব্যাংক হিসাব খুলতে পারেন আর জাতীয় রাজস্ব বিভাগের নির্দিষ্ট অফিসে গিয়ে সংগ্রহ করতে পারেন ব্যবসায়ের টিন।

উদ্যোক্তার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের তালিকা

১. ট্রেড লাইসেন্স (সিটি কর্পোরেশন, মিউনিসিপাল) ২. সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন (আরজেএসসি) ৩. টিন সার্টিফিকেট (এনবিআর) ৪. ভ্যাট/রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (এনবিআর) ৫. আইআরসি (সিসিআই অ্যান্ড ই) ৬. ইআরসি (সিসিআই অ্যান্ড ই) ৭. পরিবেশ মন্ত্রণালয় এর সনদ ৮. ফায়ার লাইসেন্স (ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স) ৯. বিওআই রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (বোর্ড অব ইনভেস্টমেন্ট) ফ্যাক্টরী সেট আর রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (বোর্ড অব ইনভেস্টমেন্ট)	১০. লিস্টিং অ্যান্ড রিন্যুয়াল অব আরএমজি ইউনিট (ইপিবি) ১১. বিসিক রেজিস্টেশন (বিসিক) ১২. জিএসপি সার্টিফিকেট (ইপিবি) ১৩. কোয়ালিটি সার্টিফিকেট মার্কস (বিএসটিআই) ১৪. বন্ডেড ওয়্যারহাউজ লাইসেন্স (এনবিআর) ১৫. সার্টিফিকেট অব অরিজিন (ডিসিসিআই, এমসিসিআই, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ) ১৬. প্যাটেন্ট রেজিস্ট্রেশন (পেটেন্ট ডিজাইন ও ট্রেড মার্কস অধিদপ্তর) ১৭. ডিজাইন রেজিস্ট্রেশন (পেটেন্ট ডিজাইন ও ট্রেড মার্কস অধিদপ্তর) ১৮. ট্রেড মার্কস (পেটেন্ট ডিজাইন ও ট্রেড মার্কস অধিদপ্তর)

Dhaka University Institutional Repository

এসএমই ব্যবসা স্থাপনের ফ্লো-চার্ট[১]

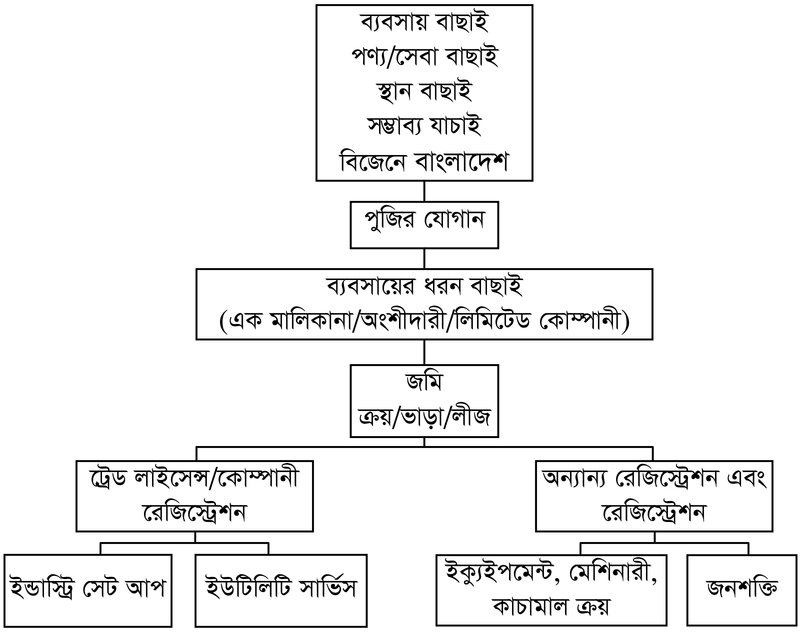

ট্রেড-লাইসেন্স গ্রহণ

যথাযথ কর্তৃপক্ষ যেমন, সিটি কর্পোরেশন, মিউনিসিপাল/ইউনিয়ন কাউন্সিল হতে ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করে আপনি আপনার ব্যবসা শুরু করতে পারেন। এর জন্য আপনাকে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবেঃ

ট্রেড লাইসেন্সের কর্তৃপক্ষ নির্বাচন

- আপনার ব্যবসায়ের স্থানের উপর ভিত্তি করে আপনার ঠিক করতে হবে সিটি কর্পোরেশন, মিউনিসিপাল অফিস কিংবা স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ, এদের মধ্যে কার কাছে আপনার ট্রেড লাইসেন্সের জন্য আবেদন জানাতে হবে।
- আপনার ব্যবসায়ের এলাকা যদি ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট এবং বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে যথাযথ সিটি কর্পোরেশনের কাছে আপনার ট্রেড লাইসেন্সের জন্য আবেদন জানাতে হবে।
- ব্যবসায়ের এলাকা মিউনিসিপাল এলাকায় হলে মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষের কাছে ট্রেড লাইসেন্সের জন্য আবেদন জানাতে হবে।
- সিটি কর্পোরেশন কিংবা মিউনিসিপাল এলাকার বাইরে হলে টেড্র লইসেন্সের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ অথবা উপজেলা পরিষদের কাছে আবেদন জানাতে হবে

আরজেএসসিতে নিবন্ধন প্রক্রিয়া

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-২০।

Dhaka University Institutional Repository

১.	আবেদন ফর্ম পূরণ
২	অফিস/ফ্যাক্টরী লে-আউট জমাদান
২	অনাপত্তি পত্র/বাড়ী ভাড়ার রশিদ/চুক্তিনামা জমাদান
২	মেমোরেন্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশন, আর্টিকেল্স অব অ্যাসোসিয়েশন, সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন জমাদান

নামের ছাড়পত্র গ্রহণ করার নিয়ম

১. প্রথমে অফিস অব দি রেজিস্টার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মস এর ওয়েব সাইট www.roc.gov.bd এ Account Creat (General User) ভিজিট করতে হবে। (পূর্বে ইউজার না হয়ে থাকলে)।

২. www.roc.gov.bd এ বিদ্যমান নামসমূহ "Search Entity" অপশন ব্যবহার করে পরীক্ষা পূর্বক নিজেদের জন্য একটি নাম পছন্দ করতে হবে।

৩. একই ওয়বেসাইটের 'Apply for Name Clearance' অপশনে গিয়ে অনলাইনের নামে ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করুন এবং আবেদনপত্রে প্রিন্ট নিয়ে ব্র্যাক ব্যাংকের যেকোন শাখায় পত্রে উল্লেখিত ফি জমা দিতে হবে।

৪. টাকা জমা দেয়ার ১/২ দিনের মধ্যেই নামের ছাড়পত্র অন-লাইনে 'My Account' অপশনে পাওয়া যাবে।

কোম্পানী নিবন্ধন করার নিয়ম

১. ওয়েব সাইটে দেয়া নমুনা সংঘস্মারক ও সংঘবিধি Download করে Modify করে সহজেই নিজেদের সংঘস্মারক ও সংঘবিধি তৈরি করতে পারবেন।

২. সংঘস্মারক ও সংবিধিতে প্রস্তাবিত কোম্পানীর মূলধন কাঠামো, উদ্যোক্তাদের নাম ও ঠিকানা এবং কোম্পানীর মূল ব্যবসার ধরণ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে ।

৩. কোম্পানীর নামের ছাড়পত্র প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে একই ওয়েবসাইটের 'Apply for Registration' অপশনে গিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি Entry করে এবং সংঘস্মারক ও সংঘবিধি এর সফটকপি আপলোড করে রেজিস্ট্রেশনের Online Submission সম্পূর্ণ করতে হবে ।

৪. উদ্যোক্তা পরিচালকগণ বাংলাদেশী নাগরিক হলে টিআইন সার্টিফিকেট ও জাতীয় আইডি নম্বর অন্তর্ভূক্ত করুন।

৫. উদ্যোক্তা পরিচালকগণের মধ্যে কেহ বিদেশী নাগরিক হলে বিনিয়োগের এনক্যাশমেন্ট সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে ।

Dhaka University Institutional Repository

৬. সংঘস্মারক ও সংঘবিধির নির্ধারিত সাক্ষীর স্থানে দুইজন সাক্ষীর স্মারকসহ পৃষ্ঠাটি এবং স্বাক্ষরকৃত ফর্ম IX স্ক্যান করে দাখিল করতে হবে ।
৭. টাকা জমা করার রিসিট প্রিন্ট করুন। নিবন্ধন ফিস ও স্ট্যাম্প মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ পে-অর্ডার করে ব্র্যাক ব্যাংকের যেকোন শাখায় নির্ধারিত একাউন্টে জমা করতে হবে ।
৮. সমস্ত তথ্যাদি ঠিক থাকলে আপনার প্রস্তাবিত কোম্পানীটি নিবন্ধন হবে এবং নিবন্ধন ফিসের ‘Acknowledgement’, ব্যাংকের প্রদত্ত মানি রিসিট, ফর্মসমূহ স্বাক্ষরিত হার্ড কপি, স্বাক্ষরিত উদ্যোক্তা পৃষ্ঠার হার্ডকপি RJSC কাউন্টারে প্রদান করুন এবং সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে হবে ।
৯. নিবন্ধনের সাথে সাথে নির্ধারিত ফিস প্রদান করে সংঘস্মারক ও সংঘবিধির সার্টিফাইড কপি সংগ্রহ করে রাখা ভাল।

ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণের প্রক্রিয়া

আমাদের দেশে ব্যাংক ঋণ গ্রহণ নিয়ে উদ্যোক্তাদের মধ্যে বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও নারী উদ্যোক্তাদের মধ্যে একধরণের ভুল বুঝাবুঝি বা অবিশ্বাস রয়েছে। এ ভুল বুঝাবুঝি বা অবিশ্বাসে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা উদ্যোক্তা কোনো পক্ষকেই এককভাবে দায়ী বলা যায় না। অনেক ক্ষেত্রেই ঋণ গ্রহণ কিংবা প্রদান প্রক্রিয়া বিষয়ে উদ্যোক্তাদের স্বচ্ছ ধারণার অভাব এ ধরণের ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করে থাকে। ক্ষুদ্র ও নারী উদ্যোক্তাদের সুবিধার্থে আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ প্রক্রিয়ার ধারণাসমূহ নিম্নে বিস্তারিত উল্লেখ করা হ’ল।[১]

ধাপ-১ : ব্যবসায়িক তথ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং চিহ্নিতকরণ

আপনার প্রতিষ্ঠানকে ঋণদেবার আগে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর আপনার প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে তথ্য প্রয়োজন হবে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রমকে সহায়তা করতে আপনার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করাটা জরুরী। আপনার ঋণ আবেদনের প্রক্রিয়াকে দ্রুত ও ঝামেলাহীন রাখতেই এটা প্রয়োজন।

১. অত্যাবশ্যকীয় কাগজপত্রের একটি নথি সবসময় প্রস্তুত রাখুন, যেমন- ট্রেড লাইসেন্স, ইনকরপোরেশন সার্টিফিকেট এবং অন্যান্য জরুরী কাগজ যেমন- ভাড়ার চুক্তিপত্র।
২. দৈনিক বিক্রির লিখিত বিবরণ।
৩. মজুদকৃত পণ্যের জন্য রেজিষ্টার।
৪. সরবরাহকারীদের তথ্য, ক্রয়ের পরিমাণ, প্রদেয় হিসাবের রেজিষ্টার সংরক্ষণ করতে হবে।
৫. একটি ব্যাংক হিসাব খুলে তাতে দৈনিক বিক্রির অর্থ জমা রাখুন। সরবরাহকারী ও ক্রেতার সাথে ওই ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমের লেনদেন করুন।

ধাপ-২ : আবেদনের প্রক্রিয়া

আবেদনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে আপনার উচিত ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানের চাহিদামাফিক যথাযথভাবে পূরণকৃত ঋণ আবেদনের ফর্ম এবং সকল প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেয়া। যদিও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ভিন্ন ভিন্ন ঋণ আবেদন ফর্ম ব্যবহার করে, তবে চেকলিস্ট অনুযায়ী দরকারী কাগজপত্র এবং দলিলাদি একই ধরণের হয়ে থাকে। নিচে ঋণ আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও দলিলাদির একটি তালিকা দেয়া হলো :[২]

---

১. *BANGLAPEDIA,* National Encyclopedia of Bangladesh, Asiatic Society of Bangladesh (Dhaka : 5 Old Secretareat Road, Nimtali, Dhaka 1000, Bangladesh, March 2003), pp. 494-496. ;প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-২২।

২. *BANGLAPEDIA,* National Encyclopedia of Bangladesh, Asiatic Society of Bangladesh (Dhaka : 5 Old Secretareat Road, Nimtali, Dhaka 1000, Bangladesh, March 2003), pp. 494-496.; প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-২৩।

Dhaka University Institutional Repository

১. ট্রেড লাইসেন্স;
২. প্রতিষ্ঠানের নামে ব্যাংকে চলতি হিসাব;
৩. জাতীয় পরিচয় পত্র;
৪. ঔষধ লাইসেন্স (ঔষধের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে);
৫. বিএসটিআই সার্টিফিকেট (খাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে);
৬. ডিসি'র অনুমতিপত্র (ডিজেল এবং এসিড ব্যবসার ক্ষেত্রে);
৭. পেট্রোবাংলার সার্টিফিকেট (ডিজেল এবং অকটেন ব্যবসার ক্ষেত্রে);
৮. পূর্বের ১-৩ বছরের ব্যাংক বিবরণী;
৯. দোকানঘরের চুক্তিনামা;
১০. পজিশনের কাগজ পত্র;
১১. টিন সার্টিফিকেট;
১২. ভ্যাট সার্টিফিকেট;
১৩. বিদ্যুৎ বিল;
১৪. টেলিফোন বিল;
১৫. শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ;
১৬. কর্মচারীদের তালিকা, পোস্ট ও মাসিক বেতন রেজিষ্টার;
১৭. ইমপোর্ট রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট (আইআরসি) এবং আইআরই সার্টিফিকেট (এক্সপোর্ট ও ইমপোর্ট ব্যবসায়ের জন্য);
১৮. মজুদকৃত পণ্যের তালিকা ও তার বাজারমূল্য;
১৯. স্থায়ী সম্পদের তালিকা ও মূল্য;
২০. পাওনাদারদের তালিকা;
২১. দেনাদারদের তালিকা;
২২. বাংলাদেশ ব্যাংকের সিআইবি (ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো) রিপোর্ট। ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত সিআইবি ফর্ম পূরণ করে দিলে ব্যাংক তা নিজ দায়িত্বে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে সংগ্রহ করবে;
২৩. ঋণ আবেদনকারী ও জামিনদারের পাসপোর্ট সাইজের ছবি;
২৪. জামিনদার ব্যবসায়ী হলে তার সিআইবি রিপোর্ট ও ব্যবসায়ের ট্রেড লাইসেন্স;
২৫. এক বছরের বিক্রি ও মূনাফার হিসাব;
২৬. ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেট ও মেমোরেন্ডাম অব আর্টিক্যালস (প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর জন্য);
২৭. নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন (লিমিটেড কোম্পানীর জন্য);
২৮. বর্তমান গ্রাহকদের তালিকা (প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর জন্য);
২৯. জয়েন্ট স্টক কোম্পানীতে রেজিস্টার্ড এবং নোটারাইজ্‌ড অংশীদারী চুক্তিনামা (অংশীদারী ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে);
৩০. ঋণ নেওয়ার ব্যাপারে অংশীদারদের সম্মতিপত্র;

এই কাগজ এবং দলিলসমূহ সাধারণত নিচের ব্যাপারগুলো মূল্যায়ন করার জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হয়।

১. কোম্পানী/ব্যবসায়ের এবং এর পরিচালক/মালিকদের অস্তিত্ব আছে কিনা এবং তদের ধার নেয়ার ক্ষমতা আছে কিনা;

Dhaka University Institutional Repository

২. ব্যবসায়ের মোট মূল্য ও ঋণগ্রহীতার লভ্যাংশ প্রাপ্যতা;
৩. প্রস্তাবিত পরিকল্পনাগুলো ঋণগ্রহীতার প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা;

ঋণ আবেদনের সময়ে নিজের সম্পর্কে সকল আর্থিক তথ্য সঠিকভাবে প্রকাশ করতে হবে। তথ্যের নির্ভুলতা সময়মত ঋণ আবেদন যাচাই নিশ্চিত করে। অধিকাংশ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের তালিকার একটি চেকলিস্ট থাকে। আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে চেকলিস্ট চেয়ে নিতে পারেন।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শন ও সাক্ষাৎকার

ব্যবসায়ের ধরন বোঝার জন্য এবং অন্যান্য বিষয় যাচাই করার জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান আপনার ব্যবসায় পরিদর্শনের আসতে পারে। সাক্ষাৎকার পর্বে এবং পরিদর্শনের সময় সাধারণত ব্যবসায়ের ধরন, পরিচালনগত কাঠামো, মার্কেট শেয়ার, প্রতিযোগী কারা, বাজারের গতিধারা, এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। পরিদর্শনের সময় আপনাকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের এতদসংক্রান্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

ধাপ-৩ : ঋণ আবেদনের মূল্যায়ন

সকল চাহিদাকৃত ডকুমেন্টস সরবরাহ করার পর আর্থিক প্রতিষ্ঠান আপনার ঋণ আবেদন যাচাই করবে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে আপনি ঋণ আবেদন যাচাইয়ের জন্য কত দিন প্রয়োজন সে সম্পর্কে তথ্য পাবেন। ঋণ আবেদন যাচাইয়ের সময় আর্থিক প্রতিষ্ঠান কিছু মূল বিষয় যাচাই করে থাকে যা নিম্নরূপ :[১]

১. আপনার ব্যবসায়ের বাস্তবায়নযোগ্যতা;
২. আলোচ্য ঋণ আপনার ব্যবসায়ের উন্নয়নের জন্য কিনা;
৩. আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে আপনার পূর্বে নেয়া ঋণের ঘটনা-বিবরণ;
৪. ব্যবসায় পরিচালনার ধরন- রক্ষণশীল, আক্রমণাত্মক, এবং দূরদর্শী কিনা;
৫. ব্যবসায়ের উত্তরাধিকার পরিকল্পনা, বয়স এবং শারীরিক অবস্থা;
৬. মূলধনের উৎস;
৭. ব্যবসায়ের নগদপ্রবাহ ঋণ ফেরত দেয়ার জন্য যথেষ্ট কিনা। ঋণের টাকা ফেরত দেয়ার জন্য মুনাফার উপর নির্ভর করা যথাযথ নয়, কারণ মুনাফা একটি নির্দিষ্ট সময় শেষ হওয়ার পর পাওয়া যায়। ঋণ পরিশোধের পরিকল্পনা এমন হতে হবে যা ব্যবসায়ের উপর অতিরিক্ত চাপ তৈরী করবে না।
৮. ব্যবসায়ের বিভিন্ন দুর্বলতা কাটিয়ে উঠার জন্য আপনার গৃহীত ব্যবস্থা ও জামানত।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণত ব্যবসায়ের পূর্ববর্তী ঋণের ঘটনা-বিবরণ, চলতি হিসাব, ঋণ পরিশোধের বিবরণী এবং প্রাপ্ত ব্যবসায়িক সুবিধাগুলো পরীক্ষা করে থাকে।

ঋণ আবেদনের অনুমোদন

উপরোক্ত ধাপসমূহ ব্যাংকের বিবেচনায় আপনার ঋণ আবেদন গ্রহণযোগ্য হলে আপনার ঋণ অনুমোদনের পরে আর্থিক প্রতিষ্ঠান একটি চিঠি ইস্যু করবে যাতে ঋণের শর্তাবলী এবং প্রাপ্য সুবিধা উল্লেখ করা থাকে। ওই অনুমোদন চিঠিটি ভালো করে পড়ে বুঝতে হবে যাতে পরবর্তীতে কোন ভুল বোঝাবুঝি না হয়। ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ নেয়ার সামগ্রিক চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-২৩।

Dhaka University Institutional Repository

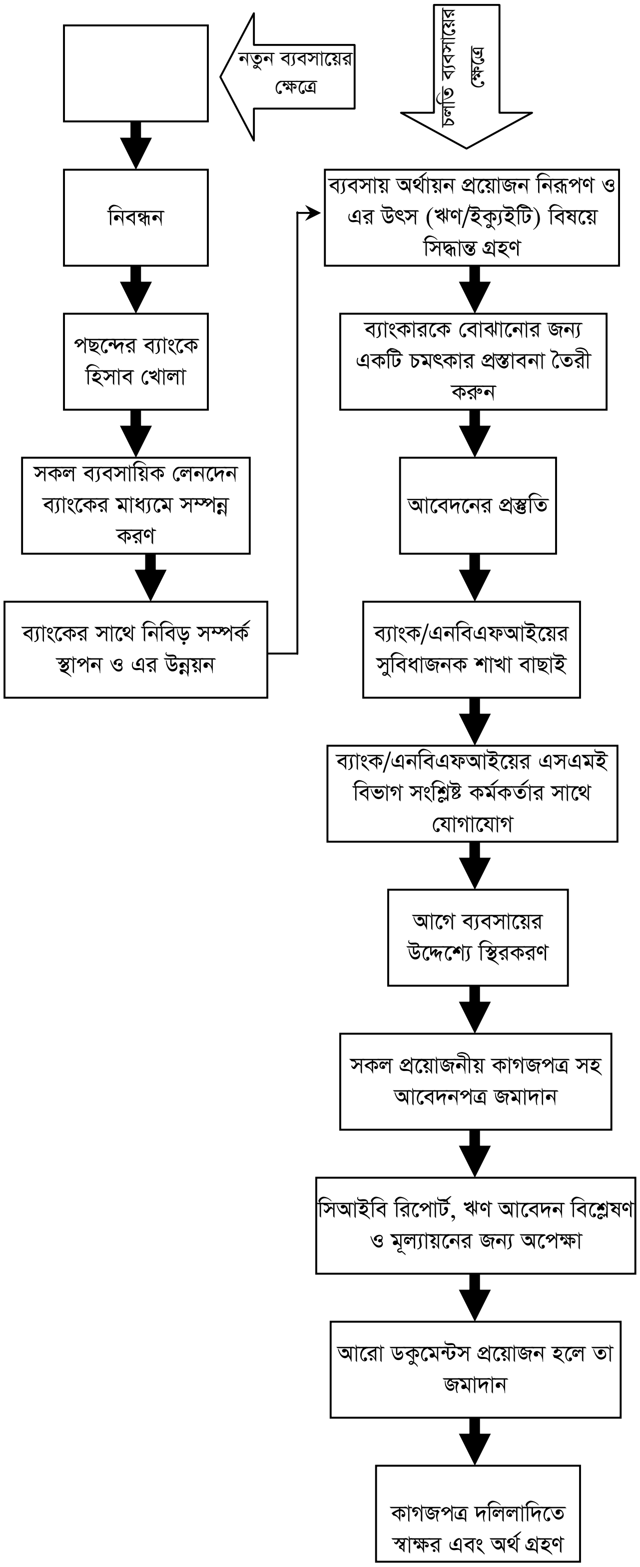
নতুন ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে
চলতি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে
নিবন্ধন
পছন্দের ব্যাংকে হিসাব খোলা
সকল ব্যবসায়িক লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে সম্পন্ন করণ
ব্যাংকের সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন ও এর উন্নয়ন
ব্যবসায় অর্থায়ন প্রয়োজন নিরূপণ ও এর উৎস (ঋণ/ইক্যুইটি) বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ
ব্যাংকারকে বোঝানোর জন্য একটি চমৎকার প্রস্তাবনা তৈরী করুন
আবেদনের প্রস্তুতি
ব্যাংক/এনবিএফআইয়ের সুবিধাজনক শাখা বাছাই
ব্যাংক/এনবিএফআইয়ের এসএমই বিভাগ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ
আগে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে স্থিরকরণ
সকল প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ আবেদনপত্র জমাদান
সিআইবি রিপোর্ট, ঋণ আবেদন বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের জন্য অপেক্ষা
আরো ডকুমেন্টস প্রয়োজন হলে তা জমাদান
কাগজপত্র দলিলাদিতে স্বাক্ষর এবং অর্থ গ্রহণ

নারীর উত্তরাধিকারগত অবস্থান এর উন্নয়নে করণীয়

ইসলাম নারী জাতিকে সম্মান দান করেছে। নারীদের প্রকৃত অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করেছে। ইসলাম আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে নাজিলকৃত দ্বীন ও জীবন ব্যবস্থা। ইসলামের সকল বিধান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে ঘিরে। ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিধানের মধ্যে অন্যতম হলো উত্তরাধিকার অংশ বণ্টন। মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে জীবিত স্বজনদের কার হিস্যা কতটুকু তা আল্ কুর'আন দ্বারা নির্ধারিত। কোন ব্যক্তি যদি নিজেকে একজন মুসলিম বলে দাবী করে থাকেন তাহলে এই মীরাছ নিয়ে তার বিতর্কিত কথা বলার কোন সুযোগ নেই। কারণ মুসলিম হলে তাকে তো আল্লাহ্‌র বিধানকেই মেনে নিতে হবে। অথবা সে যদি কোন একান্ত কারণে এ বিধান মেনে চলতে না পারে সেটা একান্ত ভিন্ন বিষয়; কিন্তু সে বলতে পারবেনা যে আল-কুর'আন ভুল মীরাছ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে বা নারী পুরুষের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করেছে। ইসলামের বিধান অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন। এতে পুরুষের অংশ যেমন আছে তেমনি আছে নারীর অংশ।বণ্টন বণ্টন
ইরশাদ হচ্ছে-

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

"পিতা-মাতা ও নিকটতর আত্নীয়দের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও নিকটতর আত্নীয়দের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে। তা অল্পই হোক বা বেশী হোক, এ অংশ নির্ধারিত ।"[১]

আল কুর'আনের ব্যাখ্যা গ্রন্থ হলো আল-হাদীস। কুর'আনে শুধুমাত্র আহকাম ও বিধান সম্পর্কে মূল কথাটি বলা থাকে। অর্থাৎ উসূল ও মূলনীতি থাকে। তাই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষন সূক্ষাতিসূক্ষ দিক, মাসআলা মাসায়েল এর জন্য হাদীসের ওপর নির্ভর করতে হয়। যেমন কুর'আন হাদীসে নামাজের আদেশে বলা হয়েছে 'নামায কায়েম করো', 'যাকাত প্রদান করো' নামায আদায়ের পদ্ধতি, রাকাত সংখ্যা, সময়, আবার যাকাত কারা আদায় করবে এর শর্ত কি, কিভাবে আদায় করবে ইত্যকার বিষয়ের বিস্তারিত মাসয়ালা মাসায়েল এসেছে হাদীস থেকে।
আর উত্তরাধিকারের বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রত্যেক ওয়ারিস এর অংশ এক এক করে কুর'আন মজীদে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর নিশ্চয়ই কারণ রয়েছে। এর কারণ উল্লেখ করে পুত্র-কন্যা, পিতা-মাতার অংশ উল্লেখ করার পর আল্লাহ্ পাক বলেন :

وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

"তোমাদের পিতা ও সন্তানদের মধ্যে তোমাদের জন্য কে অধিক উপকারী তোমরা তা জানো না। নিশ্চয় এটা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"[২]
যাদের ইসলামের প্রতি আস্থা কম, নামে মাত্র মুসলমান, ও ক্ষেত্র বিশেষে অমুসলিম, ইসলামের বিধি বিধান সম্পর্কে তেমন কোন ধারণা নেই কেবলমাত্র তারাই আল্লাহ্ পাক নির্ধারিত মীরাসের নির্ধারিত হিস্যার ওপর প্রশ্ন ও আপত্তি তোলে। জুলুম ও বৈষম্যের অভিযোগ করে সরাসরি আল্লাহ্ পাক কে দায়ী করে।
আল্লাহ্ পাক মীরাছের বিধান সম্পর্কে ইরশাদ করেন :

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

" আর যে আল্লাহ্ ও তার রাসূলের অবাধ্য হবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমাকে লঙ্ঘন করে তিনি তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবেন। সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং তার জন্য রয়েছে লাঞ্চনাকর শাস্তি। এইসব আল্লাহ্‌র নির্ধারিত

[১] আল্ কুর'আন, ৪ : ৭।
[২] আল্ কুর'আন, ৪ : ১১১।

Dhaka University Institutional Repository

সীমা যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করবেন আল্লাহ্ তাকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং এটা মহা সাফল্য।"[১]

নিম্নে নারীর হিস্যা বিষয়ে তথাকথিত বুদ্ধিজীবিদের সৃষ্ট বিভ্রান্তি ও ইসলামের বিধানাবলীর আলোকে আলোচনার প্রয়াস পাব।

১. ইসলামের মীরাছ ব্যবস্থায় নারীর হিস্যা সুসংরক্ষিত। এজন্য কোন ধর্ম, মতবাদ বা জীবন ব্যবস্থায় এর তুলনা বা দৃষ্টান্ত দেখানোর কোন সুযোগ নেই।
২. পুরুষকে নারীর দ্বিগুন হিস্যা দেয়া হয়েছে এবং নারীদেরকে ঠকানো হয়েছে বলে যারা প্রচার করেন তারা প্রকৃত পক্ষে এ বিষয়টির আংশিক উপস্থাপন করে এর প্রকৃত বিধান জানার চেষ্টা করেন না।
৩. যেসব কারণে একজন পুরুষকে দু'জন নারীর সমান হিস্যা দেয়া হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে যৌক্তিক বাস্তব সম্মত ও স্বাভাবিক নীতিমালার কারণেই দেয়া হয়েছে। যেমন
    - নারী মা হিসেবে কখনো পুরো সম্পত্তির তিনভাগের একভাগ পায়, কখনো পায় ছয় ভাগের একভাগ।
    - নারী দাদী ও নানী হিসেবে পুরো সম্পত্তির ছয়ভাগের একভাগ পায়।
    - নারী কন্যা হিসেবে কখনো পুরো সম্পত্তির অর্ধেক পায়, দুই বা ততোধিক কন্যা হলে সকলে মিলে তিনভাগের দুই ভাগ পাবে। আর ভাইয়ের সাথে থাকলে ভাইয়ের অর্ধেক পাবে।
৪. নারী পৌত্রী হিসেবে দাদার সম্পদ থেকে কখনো অর্ধেক পায়, কখনো ছয়ভাগের একভাগ এবং পৌত্রের সাথে হলে পৌত্রের অর্ধেক পায়।
৫. নারী সহোদরা বোন হিসেবে কখনো অর্ধেক পায়। দুই বা ততোধিক হলে তিন ভাগের দুই ভাগ পায়। এবং সহোদর ভাই সাথে থাকলে ভাইয়ের অর্ধেক পায়।
৬. নারী বৈমাত্রেয় বোন হিসেবে কখনো অর্ধেক পায়,কখনো ছয়ভাগের এক ভাগ এবং একাধিক থাকলে তিন ভাগের দুই বাগ পায়। ভাই সাথে থাকলে ভাইয়ের অর্ধেক পায়।
৭. নারী বৈপিত্রেয় বোন হিসেবে কখনো ছয় ভাগের এক ভাগ পায়, একাধিক থাকলে তিন ভাগের এক ভাগ পায়।
৮. নারী স্ত্রী হিসেবে কখনো চার ভাগের এক ভাগ, কখনো আট ভাগের এক ভাগ পায়।

শরীয়তে নারীর নির্ধারিত অংশ অন্যভাবেও দেখানো যেতে পারে

ক.স্থায়ী ওয়ারিসদের মাঝে নারী ও পুরুষের সংখ্যা সমান, ওয়ারিসদের মধ্যে নিকটবর্তীদের কারণে দূরবর্তীগণ কখনো অংশ কম পায়। কখনো সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়। কিন্তু ছয় প্রকারের ওয়ারিস এমন আছে যারা কখনো বঞ্চিত হয় না। তাদের তিন প্রকার পুরুষ : পিতা, পুত্র ও স্বামী। আর তিন প্রকার নারী : মাতা, কন্যা ও স্ত্রী। এরা সকলেই স্থায়ী ওয়ারিস।

খ. কুর'আন শরীফে যে সকল ওয়ারিসের অংশ নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তাদেরকে যাবিল ফুরুয বলে। যাবিল ফুরুযের মধ্যে নারীর সংখ্যা পুরুষের দ্বিগুণ। মোট ১২ প্রকার ওয়ারিস যাবিল ফুরুযের অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে ৪ প্রকার পুরুষ এবং ৮ প্রকার নারী।

যাবিল ফুরুয পুরুষগণ হচ্ছে : ১. স্বামী ২. পিতা ৩. দাদা, দাদার পিতা ৪. বৈপিত্রেয় ভাই।

---

[১]. আল্ কুর'আন, ৪ : ১৩-১৪।

Dhaka University Institutional Repository

যাবিল ফুরুয নারীগণ হচ্ছে :১. স্ত্রী ২. মাতা ৩. দাদী, নানী, দাদির মাতা, দাদার মাতা ৪. কন্যা ৫. পুত্রের কন্যা, পুত্রের পুত্রের কন্যা ৬. সহোদরা বোন ৭. বৈমাত্রেয় বোন ৮. বৈপিত্রেয় বোন।

গ. আসাবাতেও নারী বেশী। যাবিল ফুরুযগণ তাদের অংশ নেয়ার পর অবশিষ্টাংশ যারা পায় তাদেরকে আসাবা বলে। আসাবা তিন স্তরের। প্রথম স্তরে চার প্রকারের পুরুষ, দ্বিতীয় স্তরে চার প্রকারের নারী, এবং তৃতীয়স্তরে শুধু এক প্রকারের নারী।

ঘ. কুর'আন শরীফে উল্লেখিত মীরাছের নির্ধারিত হিস্যা সর্বমোট ৬টি। আর তা হলো দুই ভাগের এক ভাগ, চার ভাগের এক ভাগ, আট ভাগের এক ভাগ এবং তিন ভাগের দুই ভাগ, তিন ভাগের এক ভাগ ও ছয় ভাগের এক ভাগ। এই অংশগুলো যাদের জন্য নির্ধারিত তাদের মধ্যেও নারীর সংখ্যা বেশী। নিম্নে এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হলো।

দুই ভাগের এক ভাগ : বিভিন্ন অবস্থায় মোট পাঁচ প্রকারের ওয়ারিস এই অংশ পায়। তারা হচ্ছে ১. স্বামী ২. কন্যা ৩. পুত্রের কন্যা ৪. সহোদরা বোন ৫. বৈমাত্রেয় বোন। লক্ষ্য করতে হবে এদের চার প্রকারই নারী, পুরুষ মাত্র একজন।

চার ভাগের এক ভাগ : এটি পায় দুই প্রকারের ওয়ারিছ। ১. স্ত্রী ২. স্বামী।

আট ভাগের এক ভাগ : এটি স্ত্রীর অংশ।

তিন ভাগের দুই ভাগ : মোট চার প্রকার ওয়ারিছের জন্য এই অংশ নির্ধারিত। এরা সকলেই নারী। ১. দুই বা ততোধিক কন্যা ২. দুই বা ততোধিক পৌত্রী ৩. দুই বা ততোধিক সহোদরা বোন ৪.দুই বা ততোধিক বৈমাত্রেয় বোন।

তিন ভাগের এক ভাগ : মোট তিন প্রকার ওয়ারিছের জন্য এই অংশ নির্ধারিত। তার মধ্যে দুই জন-ই নারী। ১. মাতা ২. বৈপিত্রেয় বোন একাধিক হলে।

ছয় ভাগের এক ভাগ : মোট সাত প্রকার ওয়ারিছের জন্য এই অংশ নির্ধারিত। তন্মধ্য দুই প্রকার পুরুষ ও পাঁচ প্রকার নারী : ১. পিতা ২. দাদা ৩. মাতা ৪. পৌত্রী (একজন হলে) ৫. বৈমাত্রেয় বোন ৬. দাদী, নানী, দাদার মাতা ৭. বৈপিত্রেয় ভাই ও বোন।

নারীর অংশ নির্ধারিত থাকার সুফল

প্রকৃত কথা হলো ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় নারীর হিস্যা সুসংরক্ষিত, নিশ্চিত, সুসংহত ও সম্মানজনক। আর নারীর অংশ নির্ধারিত হওয়ার কারণে সর্বাবস্থায় সে তার নির্ধারিত অংশ পায়। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে একই স্তরের পুরুষের নির্দিষ্ট না থাকার কারণে সে কোন অংশ পায় না। এ ক্ষেত্রে আমরা নিচের দুটি উদাহরণ লক্ষ্য করতে পারি।

১. রোকেয়া সুলতানা নিঃসন্তান অবস্থায় ইন্তিকাল করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী, একজন আপন বোন ও একজন বৈমাত্রেয় বোন রেখে গেছেন।

পক্ষান্তরে শামীমা আক্তারও একজন নিঃসন্তান ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী, একজন সহোদর বোন ও এক বৈমাত্রেয় ভাই রেখে গেছেন। তাদের মীরাছের হিস্যা হবে এরূপ : তাহলে দেখা যাচ্ছে , রোকেয়া সুলতানার বৈমাত্রেয় বোন সাত ভাগের এক ভাগ তথা শতকরা ১৪.২৮৫% অংশ পেলেও ঐ আত্নীয়দের উপস্থিতিতেই শামীমা আক্তার এর বৈমাত্রেয় ভাই কিছুই পায় নি।

নিকটতর ওয়ারিছ থাকার কারণে সে সকল দূরবর্তী ওয়ারিছ সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয় তাদের মধ্যেও পুরুষ বেশী এবং নারী কম। অর্থাৎ বঞ্চিত হওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষের সংখ্যা ১১ এবং নারীর সংখ্যা ৫ জন। নিম্নে এদের বর্ণনা দেয়া হলো :

১. দাদা : পিতা থাকলে তেমনি পরদাদা বঞ্চিত হয় দাদা থাকলে।
২. সহোদর ভাই : পিতা, পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রের কোন একজন থাকলে।

Dhaka University Institutional Repository

৩. বৈমাত্রেয় ভাই : পিতা, পুত্র, পৌত্র বা সহোদর ভাইয়ের কেউ থাকলে, তেমনি সহোদর বোন থাকলে (যদি কন্যার কারণে বোন আসাবা হয়)।
৪. বৈপিত্রেয় ভাই : পিতা, দাদা বা পরদাদা, তেমনি ছেলে কিংবা মেয়ে থাকলে।
৫. পৌত্র : পুত্র থাকলে। ঠিক তেমনি প্রপৌত্র বঞ্চিত হয় পৌত্র থাকলে।
৬. ভাতিজা : (সহোদর ভাইয়ের পুত্র) পিতা দাদা পুত্র কিংবা পৌত্র অথবা প্রপৌত্র কোন একজনের উপস্থিতিতে, তেমনি সহোদর ভাই ও বৈমাত্রেয় ভাইয়ের উপস্থিতিতে।
৭. বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র : পিতা দাদা পুত্র, পৌত্র বা প্রপৌত্রের উপস্থিতিতে। তেমনি সহোদর ভাই, বৈমাত্রেয় ভাই, কিংবা সহোদর ভাইয়ের পুত্র থাকলে।
৮. চাচা(পিতার সহোদর ভাই) : বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র থাকলে, কিংবা বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র, যাদের কারণে বঞ্চিত হয় তারা কেউ থাকলে।
৯. চাচা(পিতার বৈমাত্রেয় ভাই) : আপন চাচা থাকলে কিংবা আপন চাচা যাদের কারণে বঞ্চিত হয় তারা কেউ থাকলে।

১০. চাচাত ভাই (পিতার সহোদর ভাইয়ের পুত্র) : চাচা পিতার বৈমাত্রেয় ভাই থাকলে, কিংবা এই চাচা যাদের কারণে বঞ্চিত হয় তারা কেউ থাকলে।

১১. চাচাত ভাই (পিতার বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র) : আপন চাচার পুত্র থাকলে কিংবা ঐ চাচাত ভাই যাদের কারণে বঞ্চিত তারা কেউ থাকলে।

নারীদের মধ্যে ৫ জন :

১. দাদী, নানী : মা থাকলে।
২. পৌত্রী : পুত্র থাকলে, কিংবা একাধিক কন্যা থাকলে। (যদি পৌত্রী আসাবা না হয়)।
৩. সহোদরা বোন : পিতা, পুত্র, পৌত্র কেউ থাকলে।
৪. বৈমাত্রেয় বোন : সহোদরা বোন (যখন আসাবা হয়) পিতা, পুত্র, পৌত্র কেউ থাকলে। তেমনি দুই বা ততোধিক সহোদরা বোন থাকলে (যদি তারা আসাবা না হয়)
৫. বৈপিত্রেয় বোন : পিতা পুত্র কন্যা কোন একজন থাকরে তেমনি পৌত্র বা পৌত্রী থাকলে।

এক পুরুষ দুই নারীর অংশ পায় এটা ইসলামী উত্তরাধিকারের সর্বক্ষেত্রের নীতি নয়। ইসলামের সম্পূর্ণ মীরাছ ব্যবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয় যে, ইসলামে পুরুষকে নারীর দ্বিগুণ হিস্যা দেয়া হয়েছে। অপপ্রচার ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে ধারনা দেয়া হয় যে ‘এটা মূলত নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্যমূলক চেতনারই প্রতিফলন। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলে নেয়া প্রয়োজন যে, মীরাসের হিস্যা স্বয়ং আল্লাহ্ পাক নির্ধারিত। কুর’আন শরীফে তা স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে। যারা বৈষম্যের কথা বলেছেন তাদের জন্য এ বিষয়ে আরো গভীরভাবে গবেষণা ও অধ্যয়ন প্রয়োজন। এর জন্য কুর’আনের বিধানের আলোকে অধ্যবসায় প্রয়োজন। বিভ্রান্তিতে সারা দেয়া যাবে না। বৈষম্যের কথা বলাই বিভ্রান্তি। এটা অসত্য ও মিথ্যা প্রচারনা। কারণ গোটা মীরাছ ব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে তিনটি অবস্থা দেখা যায় :

১. নারী কখনো পুরুষের সমান অংশ পেয়ে থাকে।
২. কখনো পুরুষের চেয়ে বেশী অংশ পেয়ে থাকে।
৩. কখনো পুরুষ বেশী অংশ পেয়ে থাকে।

নিচে কিছু দৃষ্টান্ত দেয়া হলো :

নারীর অংশ পুরুষের সমান

ক. দাদা-দাদীর দু’জনের হিস্যা ছয় ভাগের একভাগ। যদি মৃতের পুত্র বা পৌত্র থাকে। অর্থাৎ পুত্র ৫৪.১৬৬%, দাদী ১৬.৬৬%, দাদা ১৬.৬৬%, স্ত্রী ১২.৫%।

Dhaka University Institutional Repository

খ. পিতা মাতা দু'জনেরই হিস্যা ছয় ভাগের এক ভাগ। যদি মৃতের পুত্র বা পৌত্র থাকে। অর্থাৎ পিতা ১৬.৬৬%, মাতা ১৬.৬৬%, স্ত্রী ১২.৫% ও পুত্র ৫৪.১৬৬%। এটা আল্লাহ্র বিধান। ইরশাদ হয়েছে- প্রথম উদাহরণে মৃতের কন্যার হিস্যা মৃতের স্বামীর চেয়ে এবং দ্বিতীয় উদাহরণে কন্যার হিস্যা মৃতের পিতার চেয়ে বেশী।
গ. বৈপিত্রেয় ভাই বোন একত্রে থাকলে তিন ভাগের এক ভাগ সম্পত্তি উভয়ে সমান ভাগে ভাগ করে নিবে। অর্থাৎ বৈপিত্রেয় এক ভাই এক বোন ৩৩.৩৩% সহোদর দুই বোন ৬৬.৬৬% পাবে। এই বিধানটিও কুর'আন শরীফের।
ইরশাদ হচ্ছে :

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

"যদি পিতা ও সন্তানহীন কোন পুরুষ অথবা নারীর কোন উত্তরাধিকারী থাকে অথবা যদি তার থাকে এক বৈপিত্রেয় ভাই বা ভগ্নী তাহলে প্রত্যেকের জন্য এক ষষ্ঠাংশ। তারা এর অধিক হলে সকলে সম অংশীদার হবে এক তৃতীয়াংশ।"[১]

এসব উদাহরণে দেখা যাচ্ছে একই মৃত ব্যক্তির মীরাছে বিশেষ কিছু নারী ও পুরুষকে সমান হিস্যা দেয়া হয়েছে।

নারীর অংশ পুরুষের চেয়ে বেশী

মীরাছে পুত্র ও ভাইয়ের অংশ যেহেতু নির্ধারিত নয় তাই ভাই ও পুত্র কখনো বোন ও কন্যা থেকে কম পেয়ে থাকে। যেমন মৃতের পিতা, মাতা, ও স্বামী বা স্ত্রীর সাথে শুধু দুই কন্যা থাকলে কন্যা যতটুকু পায় শুধু দুই পুত্র থাকলে তারা তার চেয়ে কম পেয়ে থাকে।
প্রথম ক্ষেত্রে মীরাছের অংশ হবে নিম্নরুপ : ১১.১১%, পিতা ১৪. ৮১%, মাতা ১৪.৮১ এবং প্রত্যেক কন্যা ২৯.৬২৯% করে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মীরাছের অংশ হবে নিম্নরূপ : স্ত্রী ১২.৫% পিতা ১৬.৬৬% মাতা ১৬.৬৬% এবং প্রত্যেক পুত্র ২৭.০৮% করে পাবে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, প্রথম ক্ষেত্রে প্রত্যেক কন্যা ২৯.৬২৯% পাচ্ছে, অথচ ঐ আত্মীয়দের সাথে পুত্র পাচ্ছে ২৭.০৮%।
আরেকটি উদাহরণ : মাইয়্যেতের স্বামী, পিতা ও মাতার সাথে শুধু দুই কন্যা থাকলে কন্যারা যে অংশ পায় শুধু দুই পুত্র থাকলে পুত্ররা তার চেয়ে কম পায়। কারণ প্রথম ক্ষেত্রে মীরাছের অংশ হবে নিম্নরূপ : স্বামী ১৯.৯৯%, পিতা ১৩.৩৩%, মাতা ১৩.৩৩ এবং প্রত্যেক কন্যা ২৬.৬৬% করে পাবে। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মীরাছের অংশ হবে নিম্নরূপ : স্বামী ২৫% পিতা ১৬.৬৬ মাতা ১৬.৬৬ এবং প্রত্যেক পুত্র ২০.৮৩ করে পাবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রত্যেক কন্যা ২৬.৬৬% সম্পদ পেয়েছে অথচ ঐ আত্মীয়দের সাথেই প্রত্যেক পুত্র পাচ্ছে ২০.৮৩%।
তেমনি কখনো বোন ভাই অপেক্ষা বেশী পায়। নিচের ছকটি লক্ষ্যণীয় : মাইয়্যেতের স্বামী, মাতা, বৈপিত্রেয় বোন, বৈমাত্রেয় বোন থাকলে প্রত্যেকের মীরাছের হিস্যা হয় নিম্নরূপ : স্বামী ৩৭.৫ মাতা ১২.৫ বৈপিত্রেয় বোন ১২.৫ বৈমাত্রেয় বোন ৩৭.৫%। পক্ষান্তরে স্বামী মাতা বৈপিত্রেয় বোনের সাথে যদি বৈমাত্রেয় ভাই থাকে তাহলে প্রত্যেকের হিস্যা হয় নিম্নরূপ : স্বামী ৫০%, মাতা ১৬.৬৬%, বৈপিত্রেয় বোন ১৬.৬৬% ও বৈমাত্রেয় ভাই ১৬.৬৬% তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রথম ক্ষেত্রে যে আত্মীয়দের সাথে বৈমাত্রেয় বোন শতকরা ৩৭.৫% পেয়েছে তাদের সাথেই বৈমাত্রেয় ভাই পেয়েছে তার অর্ধেকেরও কম। এই উদাহরণ গুলোর সার কথা হলো, একই ধরনের আত্মীয় রেখে দু'জন ব্যক্তি মারা গেছে কিন্তু আত্মীয়তার ক্ষেত্রে ভিন্ন হয়েও এক মাইয়্যেতের নারী ওয়ারিছরা অপর মাইয়্যেতের পুরুষ আত্মীয়দের চেয়ে বেশী সম্পদ পেয়েছে।
আর একই মাইয়্যেতের পুরুষ ওয়ারিছের চেয়ে নারী ওয়ারিছ বেশী পাওয়ার দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে গিয়েছে। যেখানে মৃতের কন্যাকে মৃতের স্বামীর চেয়ে এবং মৃতের কন্যা মৃতের পিতার চেয়ে বেশী পেয়েছে।

---

১. আল্ কুর'আন, ৪ : ১২।

Dhaka University Institutional Repository

সমপর্যায়ের পুরুষ মীরাছ পায়না কিন্তু নারী পায়

১.নানী ছয়ভাগের এক ভাগ পায়, কিন্তু নানা কিছুই পায় না। ২. মৃতের স্বামী এবং সহোদরা বোনের সাথে বৈমাত্রেয় বোন থাকলে বৈমাত্রেয় বোন অংশ পায় কিন্তু এ ক্ষেত্রে বৈমাত্রেয় ভাই অংশ পায় না।

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পুরুষকে সর্বক্ষেত্রে অধিক হিস্যা দেয়া হয় নি। কোন ক্ষেত্রে নারী পুরুষের হিস্যা সমান। কোন ক্ষেত্রে বেশী। আর দুই মাইয়্যেতের মীরাছ তুলনা করলে যেমন পাওয়া যায় তেমনি এক মাইয়্যেতের মীরাছেও পাওয়া যায়। সুতরাং ইসলামে পুরুষের হিস্যা নারীর দ্বিগুণ- এটি মীরাছ ব্যবস্থার একটি খন্ডিত উপস্থাপনা। যা প্রগতিশীল নারীবাদীরা ভুল ধারনা প্রসূত উপস্থাপন করে থাকেন।

এক পুরুষ পায় দুই নারীর সমান অংশ

তৃতীয় অবস্থাটি হচ্ছে, কোন কোন ক্ষেত্রে একজন পুরুষ দুই জন নারীর সমান অংশ পেয়ে থাকে। এটা আল্ কুর'আনেরই বিধান। আল্ কুর'আনে এর সুস্পষ্ট বিধান বর্ণিত।

ইরশাদ হচ্ছে :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ

"আল্লাহ্ তা'য়ালা তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে নির্দেশ দান করেছেন এক পুত্র পাবে দু কন্যার সমান। আর যদি শুধু কন্যাই দুইজন বা দুই এর বেশী হয়, তাহলে তারা পরিত্যক্ত মোট সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ পাবে। আর শুধুমাত্র একজন কন্যা থাকলে সে অর্ধেক সম্পত্তি পাবে।"[১] মৃতের পুত্র কন্যা দুটোই যদি থাকে তাহলে পুত্র পাবে কন্যার দ্বিগুণ। তেমনি পৌত্র এবং পৌত্রী থাকলে পৌত্র পাবে পৌত্রীর দ্বিগুণ।

অন্য আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে-

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

"(হে রাসূল!) তারা আপনার কাছে ফতোয়া জানতে চাইছে। আপনি বলে দিন, কালালা সম্পর্কে আল্লাহ্ বিধান দিচ্ছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায়, আর তার মাত্র একজন বোন জীবিত থাকে তাহলে সে মৃত ব্যক্তির মোট সম্পত্তির অর্ধাংশ পাবে। আর দুই বোন থাকলে তারা মোট সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। আর যদি ভাই ও বোন এক সাথেই থাকে, তাহলে একজন ভাই দুইজন বোনের সমান অংশ পাবে।"[২]

এই আয়াতের বিধান হলো মাইয়্যেতের সহদর ভাই-বোন দুজনই যদি থাকে তাহলে ভাই পাবে বোনের দ্বিগুণ। একই কথা বৈমাত্রেয় ভাই-বোনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

উপরের দীর্ঘ আলোচনার সারকথা হলো উদাহরণের মাধ্যমে মীরাছ সংক্রান্ত শরীয়তের বিধি-বিধান আলোচনা করা হয়েছে। কোন পাঠক, গবেষক, ছাত্র বা উৎসুক মনোযোগের সাথে পাঠ করলে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, ইসলামের মীরাছ বণ্টনের মূলভিত্তি কখনো এই নয় যে, কাউকে শুধু পুরুষ হওয়ার কারণে অধিক দেয়া হবে আর কাউকে শুধু নারী হওয়ার কারণে কম দেয়া হবে বা বঞ্চিত করা হবে। এ কারণেই উপরে আমরা দেখেছি যে, সর্বক্ষেত্রে না পুরুষকে না নারীকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। বরং কোথাও পুরুষকে অগ্রাধিকার আবার কোথাও নারীকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এ সবই আল্লাহ্র বিধান। তিনি সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী। সুতরাং একজন মুসলমান এর কাজ হলো আল্লাহ্র বিধানের সামনে সমর্পিত হওয়া। কারণ এ ই আসমানী বিধানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

[১]. আল-কুর'আন, ৪ : ১১।

[২]. আল-কুর'আন, ৪ : ১৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

একমাত্র আল্লাহ্‌রই জানা। একজন মুসলমান হয়ে এ আসমানী বিধান নিয়ে কোন বিতর্কের সুযোগ বা কারণ কোনটিই নেই।

একজন পুরুষ দুইজন নারীর সমান অংশ পাওয়ার কারণ

এ কথা সুস্পষ্ট যে, কম-বেশী শুধু নারী বা পুরুষ হওয়ার কারণে নয়; বরং দায়িত্ব খরচ ও মৃতের সাথে সম্পর্কের মতো গভীর ও মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। যারা দায়িত্ব ও কর্তব্যের ভিন্নতা সত্বেয় প্রাপ্তি ও অধিকারের অভিন্নতার দাবি করেন তাদের বক্তব্যের অসারতা বোঝার জন্য অনেক বেশী গভীর বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। তাদের দর্শন মেনে নিলে গোটা পৃথিবী অচল হয়ে যাবে।

এ পৃথিবী একটি নিয়মে চলে। সে নিয়মও আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। মানুষের জীবন চলার জন্যও সর্বজনীন জীবন বিধান রয়েছে। মীরাছের ক্ষেত্রে সর্বস্বীকৃত নীতি হলো "দায় অনুযায়ী প্রাপ্তি"। অর্থাৎ যার দায় বেশী তার প্রাপ্তি বেশী। যার দায় কম তার প্রাপ্তি কম। পরিবার সন্তান-সন্তুতি ও ধন সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব পুরুষের উপর। শত্রুর মোকাবিলা করার দায়িত্বও পুরুষের। পরিবার সন্তান-সন্তুতির ভরণপোষণ, তাদের চিকিৎসা ও বাসস্থানের দায়িত্বও পুরুষের উপর। নারীর উপর এমন কোন দায়িত্বও অর্পন করা হয় নি। বরং সকল খরচ পুরুষের বহন করতে হবে। এখানেই শেষ নয়, যদি কোন কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে তাহলেও ইদ্দত চলাকালীন ভরণ-পোষণ ও থাকার ব্যবস্থা পুরুষের দায়িত্বে থাকবে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى

"তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেরূপ গৃহে বাস কর, তাদেরকেও বসবাসের জন্য সেরূপ গৃহ দাও। তাদের কষ্ট দিয়ে সংকটাপন্ন করো না। যদি তারা গর্ভবর্তী হয় তবে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের ব্যয়ভার বহন করবে। যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্যদান করে, তবে তাদেরকে প্রাপ্য পারিশ্রমিক দিবে। এবং এ সম্পর্কে পরস্পর সংযতভাবে পরামর্শ করবে। তোমরা যদি পরস্পর জেদ করো তবে অন্য নারী স্তন্য দান করবে।"[১]

সন্তান এবং সন্তানের মাতার খরচের দায়িত্ব পিতার পিতার উপর।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"আর সন্তানবতী নারীরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ খাওয়াবে, যদি দুধ খাওয়াবার পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করতে চায়। আর সন্তানের পিতার উপর দায়িত্ব নিয়ম অনুযায়ী মাতার খোর-পোষের (খাওয়া-পরার) ব্যবস্থা করা। কাউকে তার সামর্থাতিরিক্ত চাপের সম্মুখীন করা হয় না। আর মাকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্থ করা যাবে না। আর ওয়ারিসদের উপরও দায়িত্ব এই। তারপর যদি পিতামাতা ইচ্ছা করে তাহলে উভয়ে পরামর্শ করে দু'বছরের ভিতরেই দুধ ছাড়িয়ে দিতে পারে, তাতে তাদের কোন পাপ নেই, আর যদি তোমরা কোন ধাত্রীর দ্বারা নিজের সন্তানকে দুধ খাওয়াতে চাও, তাহলে যদি তোমরা সাব্যস্তকৃত প্রচলিত বিনিময় দিয়ে দাও তাতেও কোন

[১]. আল-কুর'আন, ৬৫ : ৬।

Dhaka University Institutional Repository

পাপ নেই। আর আল্লাহ্ কে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ তোমাদের যাবতীয় কাজ ভাল করেই দেখেন।"[১]

মোহর আদায়ের দায়িত্ব পুরুষের উপর। এ সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে :

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

"আর তোমরা স্ত্রীদেরকে খুশিমনে তাদের মোহর দিয়ে দাও।"[২]

যারা নারীর মীরাস হিস্যা বণ্টন নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করে থাকেন তাদের নিকট প্রশ্ন! বলুন তো পুরুষের পক্ষ থেকে কেন মোহর আদায় করতে হবে? দাম্পত্য জীবনের সুখ-দূঃখের অংশীদার তো নারী-পুরুষ উভয়ই। তারা এ বিষয়ে কোন উত্তর দিতে পারবে না। এর ব্যাখ্যা ইসলাম দিয়েছে। সুতরাং আল কুর'আনের কোন বিধান নিয়ে বাড়াবাড়ি না করে আমাদের কুর'আন পড়তে হবে বুঝতে হবে সে অনুযায়ী আমল করতে হবে। তবেই কল্যাণ।

কোন কারণে দাম্পত্য বিচ্ছেদ হয়ে গেলে প্রদেয় মোহর ও অন্যান্য সম্পদ থেকে কিঞ্চিত পরিমাণও ফেরত নেয়া নিষেধ।

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন :

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

"যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চাও (সঙ্গত কারণে শরীয়ত সম্মত পন্থায় তালাক ও নিকাহ্র মাধ্যমে) এবং তাদের একজনকে প্রচুর ধন সম্পদ প্রদান করে থাক তবে তা থেকে কিছুই ফেরত নিও না।"[৩]

বর্তমান সময়ে যারা নারীর সমঅধিকার ও নারীর মীরাস হিস্যা বণ্টন নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করে থাকেন তারা তো এ বিষয়েও কোন কথা বলেন না। আবার যখন কোন নারীর পক্ষ থেকে (সঙ্গত কারণে হোক বা নৈতিক পদস্খলনের কারণে হোক) দাম্পত্য বিচ্ছেদ ঘটে তখনো তো ক্ষেত্র বিশেষে নিরাপরাধ পুরুষটির ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার দিক বিবেচনায়ও আনা হয়না। অথচ এমনও হয় তার সারা জীবনের অর্জন সবই ঐ স্ত্রীকে দিয়েছিল। এ স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেও আবারও মোহর পাবে। কিন্তু পুরুষ আবার বিবাহ করলে সেখানেও দিতে হবে। মোট কথা পুরুষের উপর খরচের দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে নারীর উপরে নয়।

এ ছাড়াও যেটা আমার ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি, তা হলো আল্লাহ্ পাক প্রজ্ঞাময় মহাজ্ঞানী হিস্যার বিধানটি এজন্যই এরূপ করেছেন যে, আজ যিনি পিতার ঘরে কুমারী কন্যা আগামীতেই তিনি স্বামীর ঘরের সফল গৃহ বধূ, তার সূখী সংসার প্রতিষ্ঠার জন্য স্বামীকে অর্থনৈতিকভাবে অধিক শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন; কেননা স্বামীর সংসারে এসে সে সরাসরি স্বামীর সম্পদের তত্বাবধায়িকা ও অধিকারিনী হয়ে যায়। কিন্তু এরূপ না হয়ে যদি তথাকথিত বর্তমান প্রগতিবাদীদের দাবীর অনুরূপ হতো তাহলে স্বামীর সংসার এর দায়িত্বশীলা হয়ে পিতার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি থেকে হিস্যা গ্রহণ কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে দাড়াত। কারণ বর্তমান পরিস্থিতিতে সমাজে নারীদের হিস্যা বুঝে পাওয়ার বাস্তব চিত্র আমাদের এ চিন্তারই জন্ম দেয়। এ ছাড়াও

*. নারী যখন কন্যা তখন তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পিতার জিম্মায়। তার বিয়ের পূর্ব সময় পর্যন্ত তার সকল দায়-দায়িত্ব পিতার উপর ন্যস্ত।

*. বিয়ের সময় থেকে মোহর সহ সকল মৌলিক অধিকার ও জীবনের সকল চাহিদা স্বামীর কাছ থেকে লাভ করবে।

---

[১] আল-কুর'আন, ০২ : ২৩৩।

[২] আল-কুর'আন, ০৪ : ৪।

[৩] আল-কুর'আন, ০৪ : ২০।

Dhaka University Institutional Repository

*. নারী বিধবা হলে তার দায়িত্ব, পিতা, পুত্র ও ভাইয়ের উপর।
*. নারী যখন মা, দাদী ও নানী তখন তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামী, পুত্র, পৌত্রদের উপর। মোট কথা নারী সকল স্তরেই পুরুষের দায়িত্বে পরিবেষ্টিত। ফলে পুরুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং খরচও অনেক বেশী। তাই দায় অনুযায়ী তার প্রাপ্তিও বেশী হওয়াটাই সাম্য ও ইনসাফের দাবি। এ ধরনের দায়িত্ব নারীদের উপরে নেই। এক কথায় তারা দায় মুক্ত। আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী নারীরা যা পেয়েছে, সে পরিমাণ সম্পদ আসলে তাদের প্রয়োজন হয় না। অপরদিকে পুরুষ যেটুকুই পেল তার দ্বারা নিজের সংসার ও সংশ্লিষ্টদের ভরণ-পোষণ চালাতে হিমশিম খায়। এ দিক থেকে বিচার করলে পুরুষের প্রাপ্তি বেশী নয়। পুরুষ সর্বদাই দায়িত্বশীল। মুসলমানের জন্য প্রথম ও প্রধান শর্ত হলো আল্লাহ্‌র হুকুম সম্পর্কে জানা। যখন কুর'আন ও হাদীসের অধ্যয়ন ও গবেষণার মাধ্যমে বিধি-বিধান জানা হয়ে গেল তখন নিজে আমল করতে হবে এবং অন্যদেরকে উৎসাহিত করতে হবে।

নারীর উত্তরাধিকারগত অবস্থান সর্বজনীন কিন্তু এ বিষয়টির সফল বাস্তবায়ন নিয়ে বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় চরম বৈষম্য লক্ষণীয়। নারী সমাজ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার নিকটাত্মীয়দের দ্বারা চরম বৈষম্যের শিকার। সরেজমিনে বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থার বিষয়ে নারী সমাজের কতিপয় নারীদের সাথে কথা বলে তার বাস্তব চিত্র ফুটে ওঠে। ষাট বছর বয়সী নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক (ছদ্মনাম : রহিমা বেওয়া) বলেন, "আমি এখনো আমার বাবা-মায়ের সম্পদ আমার ভাইদের নিকট থেকে গ্রহণ করতে পারিনি, বরং আমার ভাইদেরকে এ সম্পদ প্রাপ্তির কথা জানালে আমার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছে।"[১] আবার ৪০ বছর বয়সী (ছদ্মনাম : আফরোজা বলেন, "আমার পিতা মারা গেছেন ৫ বছর আগে ভাইদের কাছে প্রাপ্য সম্পদের দাবি করলে আমার সাথে কথা বলাই বন্ধ করে দিয়েছে।"[২] অপর একজন নারী (ছদ্মনাম : মালেকা আকতার) বলেন, "আমি বাবা-মায়ের যে পরিমাণ সম্পদের অধিকারী তার বর্তমান বাজার মূল্য ন্যূনতম ৩০ লক্ষ টাকা; কিন্তু আমার ভাইয়েরা সে সম্পদ অন্যত্র বিক্রি করতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। অপরপক্ষে তারা এ সম্পদ সর্বসাকুল্যে ৫ লক্ষ টাকা দিয়ে নিজেদের নামে দলিল করে দিতে এক পর্যায়ে বাধ্য করেছে।"[৩]

প্রকৃতপক্ষে উপরোক্ত সামাজিক চিত্র বাংলাদেশের নারীদের উত্তরাধিকার সম্পদ প্রাপ্তির বাস্তব অবস্থা। যা সত্যিই অনভিপ্রেত, মুসলিম সভ্যতা সংস্কৃতি ঐতিহ্য ও আল-কুর'আন দ্বারা নির্ধারিত বিধি-বিধানের পরিপন্থি ও গর্হিত কাজ। এ সংকীর্ণতা ও হীনকর্মের বলয় থেকে আমাদের সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন হওয়া জরুরী। এ অবস্থার ফলে ভাই-বোন ও নিকটাত্মীয়দের মাঝে সম্পর্কের চরম অবনতি সৃষ্টি হয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও ভালবাসার নজির বিহীন বিপর্যয়। এক্ষেত্রে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে নারী সমাজ চরমভাবে অধিকারহীনতা এবং বঞ্চিত ও বৈষম্যের শিকার। নারী তার আপনজনদের দ্বারাই নির্যাতন, হয়রানিতে অসহায় হয়ে পড়েছে। এটা মুসলমানদের নৈতিক অবক্ষয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

তাদের মীরাছ হিস্যার ব্যাপারে আরো মনোযোগী ও যত্নশীল হতে হবে। হিস্যা বুঝে নিতে প্রয়োজনে আইনের আশ্রয় নিতে হবে। আর রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতি আমাদের আহ্বান যে সকল নাগরিক নারীর হিস্যা প্রদানে অস্বীকৃতি জানায় ও হয়রানি করে তাদের অপরাধী সাব্যস্থ করে আইনের আওতায় এনে শাস্তির বিধান নিশ্চিত করতে হবে। এ সকল বিষয়ে সফলভাবে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা হলে বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষায় নারীর অবস্থানের উন্নয়ন সাধিত হবে, নারীর জীবনে সামগ্রিক উন্নয়ন হবে ইনশায়াল্লাহ।

---

১. সরেজমিন সাক্ষাতকার, গ্রাম : চকলক্ষীপুর, ডাকঘর : পুষপপাড়া, পাবনা সদর, পাবনা। তাং- ১৫.০১.২০১৪।
২. সরেজমিন সাক্ষাতকার, গ্রাম : চকলক্ষীপুর, ডাকঘর : পুষপপাড়া, পাবনা সদর, পাবনা। তাং- ১৭.০১.২০১৪।
৩. সরেজমিন সাক্ষাতকার, গ্রাম : ধোপাঘাটা, ডাকঘর : পুষপপাড়া, পাবনা সদর, পাবনা। তাং- ১৮.০১.২০১৪।

Dhaka University Institutional Repository

Dcmsnvi

উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনা হতে জানা যায় যে, ইসলামী শিক্ষা-দর্শন হলো ইসলাম ও মুসলিম জাতির চিন্তাধারার দর্শন। এটি মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত ও রাসূল (সা) প্রদর্শিত জীবন ও জগতের সামগ্রিক ব্যাখ্যা ও মূল্যায়নের প্রয়াস। এ দর্শনে মানুষের জ্ঞান, আত্মা, বৈষয়িক ও নৈতিক বিষয়াদিসহ সর্বদিক অন্তর্ভুক্ত। আর তাই আল্লাহ্ প্রদত্ত ও রাসূল (সা) প্রদর্শিত বিধান অনুযায়ী সঠিক পথে মানুষ পরিচালিত হওয়ার জন্য ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। আল্লাহ্ পাকের সর্বপ্রথম সৃষ্টি মানুষ ও নবী হযরত আদম (আ)-কে তিনি সর্বপ্রথম জ্ঞানদানে ধন্য করেন। এ থেকেই শিক্ষার সূত্রপাত। ইসলামী শিক্ষা-দর্শন মানুষের প্রাণশক্তি, জাতির মেরুদন্ড, উত্থান-পতনের মানদন্ড। ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো ইসলাম নির্দেশিত পথে মানুষের সহজাত বর্ধনশীল সম্ভবনার বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন; জ্ঞানার্জন এবং তা সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ ও ব্যবহারের কৌশল।

ইসলাম নারী-পুরুষ সবার উপর জ্ঞান অর্জন ফরয করে দিয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সা) নারী-পুরুষ উভয়কেই শিক্ষার মাধ্যমে সঠিক মানবতা ও মর্যাদার উঁচু চূড়ায় পৌঁছিয়ে দিয়েছেন; এবং রাসূল (সা) এর যুগে ইসলামের সুমহান শিক্ষার মাধ্যমে তারা এত উচ্চ আসনে আসীন হয়েছেন যে, অনেক সম্মানিত ব্যক্তিরাও তাঁদের নিকট হতে দীনী শিক্ষা গ্রহণের মুখাপেক্ষী হয়েছেন। ইসলামের শিক্ষার আলোকে পুরুষ সাহাবীদের ন্যায় হযরত আয়েশা, হযরত হাফসা, হযরত শিফা বিন্‌তে আবদুল্লাহ্, হযরত কারীমা বিন্‌তে মিকদাদ, হযরত উম্মে কুলসুম (রা) এবং হযরত রাবে'য়া বসরী (র)-এর মত মহিয়সী নারীও আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।

বাংলাদেশে নারী শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি হচ্ছে। এ উন্নতির সাথে বিপর্যয়ও দেখা দিয়েছে। এর জন্য দায়ী আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা। সহশিক্ষাই এ শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিতর্কিত ও কলুষিত করেছে। সহশিক্ষা ব্যবস্থা গোটা মানবজাতিকে অকল্যাণ, অবক্ষয় এবং অশান্তি দান করেছে। যেমন নৈতিক চরিত্রের অবনতি, দাম্পত্য জীবনে চরম অশান্তি, অসামাজিক ক্রিয়াকর্ম, যৌতুক প্রথা, তালাক, নারী ধর্ষণ, নারী হত্যা, মাদকদ্রব্যের অবাধ ব্যবহার, অযোগ্য সন্তানের প্রাদুর্ভাব, সামাজিক বিশৃংখলা ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ বলয় থেকে আমাদের বেড়িয়ে আসতে হবে। অবশ্য আমাদের দেশে এ অবস্থার চিত্র দিন দিন পরিবর্তিত হচ্ছে। জাতির বিবেকে উপলব্ধির উন্মেষ ঘটছে। গার্লস মাদ্‌রাসা, গার্লস স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। আবার অনেক প্রতিষ্ঠানে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের পৃথক শাখা চালু করে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিপর্যয় থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অতঃপর বিভিন্ন যুগে নারী ও ইসলামী শিক্ষায় নারীর অবস্থান ও বর্তমান প্রেক্ষাপটে তার বাস্তবায়ন সম্পর্কিত আলোচনা পেশ করা হয়েছে। ইসলাম পূর্ব আরবে নারীদের অবস্থা ছিল করুণ ও শোচনীয়। পুত্র সন্তান জন্ম হলে তারা নিজেদেরকে সুখী ও গৌরবান্বিত মনে করত। কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে তাদের মান-সম্মান ও গৌরবের মস্তকটি অবনমিত হয়ে যেত। কন্যা সন্তান জন্মকে আরবেরা কুলক্ষণ ও অপমানজনক মনে করত। তাই নবজাতক কন্যাকে জীবন্ত হত্যা ও প্রোথিত করার রীতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। কায়েস বিন আছেম নামক জৈনক ব্যক্তি জাহেলী যুগে স্বীয় ঔরসজাত আট-দশটি কন্যা সন্তানকে কবর দিয়েছিল।

অতঃপর ইসলাম পূর্ব বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারীদের অবস্থান আলোচনা করা হয়েছে। ইয়াহুদী সভ্যতায় নারী একটি অভিশপ্ত জীব। তাই পিতা বা স্বামীর সম্পত্তিতে তার অধিকার নেই। তাছাড়া বিবাহ ছিল তাদের নিকট ব্যক্তিগত ব্যাপার। এইজন্য রাষ্ট্র ও ধর্মের অনুমতির প্রয়োজন ছিল না। খৃষ্ট সভ্যতায় নারীরাই পৃথিবীর সকল অশুভ কার্যের উৎস বলে বিবেচিত। গ্রীক সভ্যতায় নারী হল সব ভাঙ্গন ও বিশৃঙ্খলার উৎস। পৃথিবীতে চীন দেশেই নারীদের মর্যাদা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল। চীনের ধর্ম গ্রন্থে নারীকে 'দুঃখের প্রস্রবণ' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা সকল সৌভাগ্য ভাসিয়ে নিয়ে যায়। গ্রীক সভ্যতায় সংস্কৃতি, তাহযীব-তমুদ্দুন, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পকলার উন্নয়ন ঘটলেও নারীর সামাজিক অবস্থান ছিল খুবই নিম্ন। নারীকে মানবতার কলঙ্ক টিকা মনে করা হত। নারী জগতে বিশৃঙ্খল ও ভাঙ্গনের সর্বশ্রেষ্ট উৎস। এ সব অবস্থার অবসান হলো ইসলামের আগমনের পর। নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলো রাসূলুল্লাহ্ হযরত মুহাম্মদ (সা) এর মাধ্যমে।

বর্তমান সময়ে নারীর প্রগতি ও স্বাধীনতা সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়, তার মধ্যে সত্যের উপাদান অনেক কম এবং মিথ্যাই বেশী। মুসলিম সমাজের নারীদের স্বাধীনতার কোন কমতি নেই। ইসলাম তাদের স্বাধীন ও সম্মানিত করেছে। সমস্যা আসলে মুসলমানদের নয়, সমস্যা পাশ্চাত্য বাসীর এবং আমাদের দেশের কোন কোন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মাত্র। এ সমস্যা তাদের সমাধানের নয়। নারীর কাছে ইসলাম যে লজ্জা, শালীনতা, বিনয় এবং তার বৃহত্তর সামাজিক দায়িত্ব পালন করার সুবিধার্থে তার যে একাগ্রতা ও গৃহমুখীনতার দাবী জানায়, সেটা তার ক্ষমতা ও যোগ্যতাকে নষ্ট করা ও দমন করার জন্য নয়, বরং সুশৃংখল ও পরিশীলিত করার জন্য। কোন জিনিষকে শৃংখলিত ও পরিশিলিত করার অর্থ তাকে যথোপযুক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাকে তার সীমালঙ্ঘন থেকে বিরত রাখা। এর দ্বারা তাকে নৈরাজ্য ও বিশৃংখলা থেকে রক্ষা করা হয় এবং পরিবার ও সমাজের অধিকার নিশ্চিত করা হয়। এটা আমরা সবাই জানি যে, দমন করা ও শৃংখলা রক্ষা করার মধ্যে ততটাই ব্যবধান, যতটা ব্যবধান 'ভাংগা ও গড়ার' মধ্যে এবং আইনানুগতা ও অরাজকতার মধ্যে।

আশির দশক থেকে এদেশে তৈরি করা হয় অশ্লীল নাচ, গানসহ বিদেশী ছবির অনুকরণে নৈতিকতা বিবর্জিত অশ্লীল ছায়াছবি। এসব ছবি দেখার ফলে সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা, ধর্ষণ, অপহরণ, পরকীয়া প্রেম, অবৈধ গর্ভপাতের আধিক্য সহ চাঁদাবাজি, ছিনতাই, মাদকাসক্তির মত নানা চরিত্র হননকারী কর্ম সমগ্র দেশে ছেয়ে যাচ্ছে। যাদের পাথেয় হচ্ছে ইয়াবা। বাংলাদেশের প্রায় প্রত্যেকটি প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হয় অপসংস্কৃতিতে ভরপুর কুৎসিত বিষয়বস্তু সম্বলিত অশ্লীল ছায়াছবি। কিন্তু এ বিষয়ে প্রশাসন উদাসীন। এ ছবির ৯০ ভাগ দর্শক আমাদের কিশোর ও যুব সমাজ। এই সব অশ্লীল ছায়াছবির অনুসরণ করছে বাংলাদেশের তরুণ-তরুণীরা। এছাড়া রয়েছে ভারতীয় চ্যানেল স্টার জলসা, জি বাংলা, স্টার প্লাস এর মত শতাধিক টিভি চ্যানেল। যেখানে স্যাটেলাইট চ্যানেল গুলোর বাধ্যবাধকতার কোন তোয়াক্কা করা হয় না। এসব চ্যানেল হয় বন্ধ করা হোক নতুবা সৃজনশীল প্রচারনার ব্যবস্থা করা হোক।

ফ্যাশন শো এর মাধ্যমে যুবক শ্রেণীর সামনে যুবতীদের দেহ প্রদর্শনী হয়। তার ফলে নারী ধর্ষণ এসিড নিক্ষেপ, গণধর্ষণ অতঃপর হত্যার মত বহু ঘটনা ঘটে। এ সব উৎস বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত মায়ের জাতির অবমাননা বন্ধ হবে না। তীব্র প্রতিবাদ সত্বেও "মিস বাংলাদেশ" এর নামে সুন্দরী প্রতিযোগিতার জন্য নারী দেহ প্রদর্শনীর আরেক প্রক্রিয়া ধীরলয়ে এদেশে প্রবেশ করেছে তা হচ্ছে ফ্যাশন শো। বর্তমান রাজধানীর অভিজাত হোটেল-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে "ফ্যাশন শো" এর আয়োজন করা হচ্ছে। এসব ফ্যাশন শোতে শুধু ঘোড়শী তরুণীদেরই ব্যবহার করা হচ্ছে না স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরও এর সাথে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে বিস্কুট,চানাচুর, চকলেট, ঢেউটিন থেকে শুরু করে রড সিমেন্টের বিজ্ঞাপনেও নারীর দেহ অঙ্গভঙ্গি জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ সবই নারীর প্রতি অবমাননা।

নারী দেহকে আল্লাহ্ ঢেকে রাখতে বলেছে। তবে সেই নারীর দেহকে যদি উলঙ্গ করে প্রচার-প্রদর্শন করা হয় তাহলে সে সমাজে নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের কালচার বাড়বেই। টেলিভিশন পত্র পত্রিকায় নারী জাতিকে ভোগ্যপণ্য ও আপত্তিকর অঙ্গভঙ্গি সহকারে প্রচার করা হচ্ছে। নারীর উলঙ্গ দেহকে বাংলাদেশের বিজ্ঞাপনের মডেল হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। পয়সার বিনিময়ে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের হাতের পুতুল হয়ে যা বলছে তাই করে চলছে, নারী নির্যাতনের অপর প্রক্রিয়া হলো পতিতাবৃত্তির অনুমোদন; ১৯৮১ সালে সরকারী হিসাবে দেখা যায় যে, গোটা বাংলাদেশে মোট ৪৩টি পতিতালয় আছে। এগুলোতে ৬ হাজার ৪২ জন পতিতা রয়েছে। এরা সবাই লাইসেন্সধারী। ১৯৮৫ সালে এ সংখ্যা বেড়ে হয় ৭ হাজার। ১৯৮৮ সালে রাজধানীতে পতিতার সংখ্যা হলো ২০ হাজার এবং সারা দেশে কয়েক লক্ষ হবে। এছাড়াও সমাজে ভাসমান লাইসেন্সবিহীন পতিতার

Dhaka University Institutional Repository

সংখ্যাও অনেক। নারী নির্যাতনের সর্ব নিকৃষ্ঠ এ অবস্থা চলতে দেয়া যায় না। এদের পুনর্বাসন করে মানবতার মুক্তি দেয়া হোক।
উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো এখন উন্মুক্ত, অবাধ, অপসংস্কৃতরি চর্চা কেন্দ্র। উৎসবের নাম করে নববর্ষ, বর্ষবরণের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বিজাতীয় অশ্লীল অনুষ্ঠানাদি পালন করা হয়। বর্ষবরণের নামে চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে তরুণ তরুণীরা পরস্পরের মাথায় সিঁদুর, মুখে চন্দনের তিলক পরিয়ে, হাতে বুকে উল্কি একে নানা রঙে সেজে রাস্তায় বাদ্য বাজনাসহ নৃত্য পরিবেশন করছে। আধুনিকতার নামে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে চলছে এ ধরনের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন; যা আমাদের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের সুনাম নষ্ট করছে। মেধাবী প্রতিভাবান ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা বিকাশের পথে বাঁধার সৃষ্টি করছে। এ পরিবেশ আমাদের জাতীয় মেধা বিকাশে অন্যতম বাধা। এর পরিবর্তন জরুরী। মুসলিম সরকারের দায়িত্ব এ ধরনের অপসংস্কৃতি বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ইসলাম তার যথাযথ শৃংখলার মধ্যে নারী সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের অনুমোদন প্রদান করেছে। যার ফলে নারী তার পেশা গ্রহণে চাকুরী অথবা ব্যবসায়িক উদ্যোক্তা হতেও ইসলামে কোন বাধা নেই। ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে এ সকল বিষয়ে বিস্তর আলোচনা করা হয়েছে। ঐতিহাসিকদের মতে আরবের সে তৎকালীন সময়ে সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী-উদ্যোক্তা ছিলেন হযরত খাদীজা (রা)। জানা যায় তাঁর বাণিজ্য বহর নিয়ে যখন সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হতো তখন দেখা যেত খাদীজার একার পণ্য সামগ্রী কুরাইশদের সমগ্র পণ্য সামগ্রীর সমান। তাই প্রয়োজনে নারীদের ব্যবসা বাণিজ্যেও সম্পৃক্ত হতে কোন দোষ নেই।

প্রায় ষোল কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত বাংলাদেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী। অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি এ বিশাল জনসম্পদের সামান্য অংশই স্বীকৃত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত। বাস্তবিকপক্ষে, এ বৃহৎ মানব সম্পদকে কর্মযজ্ঞে নিয়োজিত করা না গেলে কিংবা ব্যবসায়ে সম্পৃক্ত করা না গেলে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভবপর নয়।

সর্বজনীন জীবন ব্যবস্থা ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য সকল ধর্মে জন্মের পর থেকে বৈষম্যের শিকার এ নারী সমাজ। বাংলাদেশ একটি মুসলিম দেশ এ দেশে নারীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সুশৃংখল কর্ম পরিবেশের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন আয়মূলক কর্মকাণ্ডে তথা পেশা বা কর্মক্ষেত্র দখল করে নিয়েছে। তারা বিভিন্ন পেশাগত দায়িত্ব পালন করছেন সততা, দক্ষতা ও কর্মক্ষমতার সাথে। তবে এ চিত্র কিছুদিন পূর্বেও ছিল না। নারীকে যথাযথ মূল্যায়ন করা হতো না। সেই সমাজে আজ নারীরা ব্যবসায়িক উদ্যোক্তা, কর্মক্ষেত্রে সচিব থেকে শুরু করে বিচারপতি, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, ব্যাংকার, প্রভৃতি পেশায় অবস্থান তৈরী করে নিয়েছে। আর এ কারণে তাদের সামাজিক অবস্থান ও মূল্যায়ন সুসংহত হচ্ছে। তবে কর্মক্ষেত্রে এদেশের নারী সমাজ যদিও প্রয়োজনীয় শ্রমশক্তি হিসেবে নিজেদের অবস্থা এখনও সুদৃঢ় করতে পারেনি তথাপি সম্প্রতি বাংলাদেশের নারীদের ভূমিকায় বিরাট পরিবর্তন এসেছে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, ব্যাংকার, ডাক্তার, নার্স, আইনজীবি হচ্ছেন। নিজেরাই প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছেন তারা যেমন- রাজধানী ঢাকা,বিভাগীয় ও জেলা শহর গুলোতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন স্কুল কলেজ ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শো-রুম সহ ফ্যামিলি শপ ও ফ্যাশান হাউজের মত প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছেন তারা। এছাড়া বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, বীমা, এনজিও, প্রাইভেট প্রভৃতি কর্ম প্রতিষ্ঠানে ব্যাংকার, একাউন্টট্যান্ট, করনিক, রিসেপসনিস্ট, কম্পিউটার অপারেটর পদে নিযুক্ত হচ্ছেন। যদিও অধিকাংশ নারী এখনও শুধুমাত্র গৃহিনী বা গৃহাভ্যন্তরীণ কর্মকান্ডে নিয়োজিত আছেন তবুও শহর এবং গ্রামীণ সমাজে নারীদের কাজের প্রতি অনুকূল মনোভাব দেখা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে ইসলামই যে নারীর সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেছে তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে তারা এগিয়ে চলছে। ইসলামের দেয়া অধিকারই তাদের এ অবস্থানে নিতে অনুপ্রাণিত করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

দিন দিন নারী সমাজের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। গবেষণায় পরিচালিত একটি বিশেষ অঞ্চলের সরেজমিন সমীক্ষায় দেখা গেছে যে সকল প্রতিষ্ঠানে নারীর কর্ম পরিবেশের ক্ষেত্রে ইসলামের বিধানকে পরিপালনের চেষ্টা করা হয়েছে, সেখানে নারী কর্মকর্তারা অধিক সাচ্ছন্দ্যে দায়িত্ব পালন করছেন। অপর পক্ষে যেখানে ইসলামের এ অনুসৃতি নেই সেখানে তারা তাদের সমস্যা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। অতএব রাষ্ট্রীয়ভাবে নারীদের জন্য ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠিত হলে পেশাগত জীবন সহ সামগ্রিক জীবনে উন্নত জাতি গঠনে অবদান রাখতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস ও প্রত্যাশা। এ অভিসন্দর্ভের উপসংহারে নিম্নোক্ত বিষয়ে সংক্ষিপ্তাকারে সারনির্যাস তুলে ধরা হলো।

১. বাংলাদেশে নারী সমাজ এখনো নানাবিধ হয়রানির শিকার। স্বামী-পরিবার-পরিজন ও কর্মক্ষেত্রেই এ নির্যাতন হয়ে থাকে। এ নির্যাতনের ধরন ও প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। এ অবস্থা অতীতে আরো ভয়াবহ ছিল। বর্তমান সময়ে অনেকটাই উন্নতি হয়েছে। এক্ষেত্রে সফলতা ও অগ্রগতির জন্য সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন জরুরী। পরিবর্তনের লক্ষ্যে নারীকে শিক্ষিত করে তোলা অপরিহার্য। তবে তার পাঠ্যসূচী পুরুষের চেয়ে কিছুটা আলাদা হওয়া প্রয়োজন। যাতে ভবিষ্যতে সে দক্ষ নাগরিক হওয়ার পাশাপাশি একজন উপযুক্ত 'মা' হতে পারে। যার দ্বারা রাষ্ট্র অধিকতর লাভবান হতে পারে, উপযুক্ত জাতি গঠন হতে পারে।

২. ইসলাম নির্ধারিত যাবতীয় অধিকার নারীকে প্রদান করতে হবে। কোন ভাই বা সংশ্লিষ্ট আত্নীয় যদি নারীর হক প্রদান না করে কৌশলে বা জোর পূর্বক ভোগ দখল করে খায় তাহলে ঐ ভাই বা আত্নীয় হারাম খাওয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে এবং সে অপরাধী হিসেবে গণ্য হবে ও শাস্তি ভোগ করতে হবে। সুতরাং নারীদের অধিকার আদায় ও বাস্তবায়নে আইন প্রণয়ন করতে হবে। সমাজ ও রাষ্ট্রকে দায়িত্বশীল হতে হবে।

৩. সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে তার কর্মসীমা এমনভাবে নির্দিষ্ট করে দিতে হবে যাতে করে তার স্বভাব ও মূল পারিবারিক দায়িত্বের সাথে মানানসই হয়। স্ত্রী ও প্রসূতি চিকিৎসায়, গাইনী চিকিৎসায় ও শিশু চিকিৎসায় ও শিক্ষকতায় বিশেষ করে প্রাইমারী স্কুল, গভ./নন গভ. গার্লস স্কুল, মহিলা কলেজ, উইমেন্স ইউনিভার্সিটিতেও ইসলামের বিধান অনুসরণ করে নারীদেরকে নিয়োগের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এছাড়াও সরকারী বেসরকারী প্রশাসনিক পদগুলোতে এবং ব্যাংকিং পেশা সহ যে কোন সম্মানজনক পেশায় নারীর উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। নারীর জন্য পৃথক ওয়াসরুম, নামায ঘর, বিশ্রাম কক্ষ বা শিশু পরিচর্যার সুযোগ রাখতে হবে।

৪. নারীকে তার পবিত্র সামাজিক দায়িত্ব পালনে অধিকতর যোগ্য করে তুলতে হবে। কারণ এ নারীই শৃঙ্খলিত সমাজের প্রধান কারিগর। তার উত্তম অবদান ছাড়া কাঙ্খিত সমাজ গঠন সম্ভব নয়।

৫. ইসলামে নারী-পুরুষের সম্পর্ক শৃঙ্খলিত। নিষিদ্ধ বেগানা পুরুষদের সাথে ইসলামী নৈতিকতার সীমার মধ্যে যতটুকু একেবারেই অনিবার্য হিসেবে অনুমোদিত তার অতিরিক্ত কোন মেলামেশা করতে দেয়া যাবে না। মসজিদে নামায পড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করা, সরকারী/বেসরকারী প্রশাসনিক ও কর্পোরেট অফিস গুলোতে পাশাপাশি ডেস্কে কাজ করা হচ্ছে অনুমোদিত ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত।

৬. সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদানের মাধ্যমে নারীর সুখ শান্তি যাতে ক্ষুন্ন না হয় এবং মতভেদের উর্ধ্বে থেকে সে পরিবার ও সমাজের মূল দায়িত্ব যাতে পালনে তৎপর থাকে, সে জন্য নারীকে সক্রিয় রাজনীতি থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। তবে ইসলাম নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী তাদের প্রাপ্য অধিকার বুঝে পেতে সংগঠিত হয়ে সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় দাবী তুলে ধরতে পারবে।

৭. নারীর সৌন্দর্য এবং দেহ ও সাজসজ্জা প্রদর্শন যতটা আল্লাহর আইনে নিষিদ্ধ, তা আবৃত রাখার জন্য সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে এবং সচেতনতা সৃষ্টির জন্য দায়িত্ব নিতে হবে। আর যে সকল মেয়েরা ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

নির্ধারিত পর্দা মেনে নিতে রাজি নয় বরং যুব সমাজের চরিত্র ধংসের কাজে ব্যস্ত ও অশ্লীলতায় উস্কে দেয়ার কাজে ব্যস্ত তাদের এ অপরাধের মাত্রানুযায়ী শাস্তি হওয়া অপরিহার্য।

৮. বাংলাদেশে বর্তমানে অশ্লীল ছায়াছবি যুব সমাজ ও তরুণ তরুণীদের চারিত্রিক পদস্খলন ঘটিয়ে মাদকাসক্ত করে পথে বসিয়েছে। দেশ আজ পার্শ্ববতী রাষ্ট্র ও বহির্বিশ্বের প্রভাবিত সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের শিকার। এছাড়াও রয়েছে অশ্লীল যৌন সাহিত্যের বিপজ্জনক বিস্তৃতি। এ জাতীয় প্রকাশনা বন্ধে নারীদের তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, ধিক্কার জানাতে হবে এবং সুস্পষ্ট নিন্দা জানাতে হবে এবং যে কোন পন্থায় এগুলো প্রতিহত করতে হবে। পেক্ষাগৃহের উপর প্রয়োজনীয় নজরদারি বাড়াতে হবে। এর প্রতিরোধে সরকারের জনসম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে। জনগণের সাহায্য নিতে হবে। ফলে সামগ্রিকভাবে উপরিউক্ত বিষয়গুলোর বাস্তবায়ন সম্ভব হলে বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের আলোকে নারীর অবস্থান ও তার বাস্তবায়নের পথ সুসংহত ও সুগম হবে।

এজন্য বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ও পরিবেশের আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। সহশিক্ষা নয়, ছেলে এবং মেয়েদের নিম্নশ্রেণী থেকে সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত সর্বস্তরে স্বতন্ত্র শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। নারী ও পুরুষের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে হবে। শিক্ষার সর্বস্তরে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষা আবশ্যিক পাঠ্যসূচী থাকতে হবে। রাসূলে করীম (সা) মহিলাদের পৃথকভাবে শিক্ষাদানের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে ভিন্ন মজলিশের ব্যবস্থা করতেন। এ আদর্শের আলোকেই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা কায়েম করতে হবে। ফলে ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে।

বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার উন্নয়নে পরিবার, সমাজ, প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আল্লাহ্ তা’আলা আমাদের এ অভিসন্দর্ভটিকে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্যতা ও সফলতা দান করুন। আমীন!

MšcÄx

গ্রন্থপঞ্জী

	: আল-কুর'আন
আল্লামা জারুল্লাহ্ যামাখ্শারী	: আল-কাশশাফু আন হাকায়িকিত তানযীল, তাফসীরে কাশ্শাফ, বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাত, তা.বি।
আবূল ফিদা ইসমাঈল ইব্ন কাসীর	:তাফসীরুল কুর'আনুল আজীম তাফসীরে ইব্ন কাসীর, পেশাওয়ার, মাকতাবাতু হাক্কানীয়া, ১৯৯২।
আল্লামা মাহমূদ আল আলুসী	: তাফসীরে রুহুল মা'আনী, বৈরুত : আলামুল কুতুব, তা.বি।
অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন	: ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর সম্মান ও মর্যাদা, ঢাকা, বাংলাদেশ হাদীস সোসাইটি।
আব্দুল হালিম আবু শুক্কাহ	: রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থ্যট।
আইন,বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ৩য় ভাগ, মৌলিক অধিকার, ধারা-২৮ : ১, ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
	: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ৩য় ভাগ, মৌলিক অধিকার, ধারা – ২৮ : ২, ৩, ৪
	: ২য় ভাগ, জাতীয় জীবনে মহিলাদের অংশ গ্রহণ, ধারা-১০।
	: ৩য় ভাগ, সুযোগের সমতা, ধারা-১৯ : ১, ২।
	: ৩য় ভাগ, চলাফেরার স্বাধীনতা, ধারা-৩৬।
	: ৩য় ভাগ, মৌলিক অধিকার জীবনও ব্যক্তি, স্বাধীনতার মৌলিক অধিকার, ধারা-৩২।
	: ২য় ভাগ, মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা, ধারা-১(ক) (গ)
আনোয়ারা বাহার চৌধুরী	: শামসুন্নাহার মাহমুদ, ঢাকাঃ বাংলা একডেমী, ১৯৮৭।
এস আনিসুজ্জামান	: ক্রান্তিকালের নেত্রী শেখ হাসিনা, ঢাকা : কাকলি প্রকাশনী। ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭ ইং।
আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ্ পানিপতী	: তাফসীরে মাযহারী, কোয়েটা : মাকতাবাতু রাশীদিয়া, তা.বি।
আফলাতুন কায়সার	: আসমাউর রিজাল, প্রথম মুদ্রণ, ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৫ইং।
আত-তাবারী, আল্লামা	: তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক, মিসর : দারুল মা'আরিফ, ১৯৬৭, ৬ষ্ঠ খ.।
	: উয়ূনুল আখবার
আবূ মুহাম্মদ আব্দুল মালিক ইব্ন হিশাম আলহুমায়রী	: আস্সীরাতুন নববিয়্যা, বৈরুত : উলুমুল কুর'আন ফাউন্ডেশন, ১৯৮৯, ২য় খ.।
আবূ 'আব্দির রহমান আহমদ ইব্ন	: সুনানুন্নাসায়ী, লাহোর : মাকতাবা সালাফিয়া, ১৯৮৯, ২য় খ.।

Dhaka University Institutional Repository

শু‘আয়ব আন্ নাসায়ী

আবূ ‘ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ‘ঈসা আত্তিরমিযী : জামিউত তিরমিযী, দিল্লী : মাকতাবা রশীদিয়া ১৯৫০, ৪র্থ খ.।

: আস্-সীরাতুন নবুবিয়্যা, কায়রো : ঈমান বাবিল হলবী,১৯৬৪,১ম খণ্ড।

আবূ জা‘ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর আত-তাবারী : জামি‘উল বয়ান ফী তাফসীরিল কুর’আন, কায়রো : মাকতবা দারু ‘আরুবা ১৯৭২, ৫ম খ.।

আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্ন আশআস সিজিসতানী : সুনান আবূ দাউদ, কানপুর : আল-মাতবা ‘আল মাজীদী ১৩৭৫ হি., ২য় খ.।

আবূ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্দুর রহমান আদ্ দারিমী : সুনানুদ দারিমী, ২য় খ.।

: মুসনাদ দারিমী, মিসর : দারু ইহইয়াইস সুন্নাতিন নববিয়্যা, তা.বি।

আবূ মহামেদ হাবিবুল্লাহ্ : আল বেরুনীর “ভারত তত্ত্ব”, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮২।

সাইয়্যেদ আবূল আ’লা মওদূদী : মুসলিম নারীর নিকট ইসলামের দাবী, ১ম প্রকাশ, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৪২১ হি./২০০০ ইং।

: পর্দা ও ইসলাম, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, আধুনিক প্রকাশনী, ১৪২৩হি/১৪০৮ বাং/২০০২ ইং

: ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান, ঢাকা : সাইয়্যেদ আবূল আ’লা মওদূদী রিসার্স একাডেমী ১ম সংস্করণ ১৯৯৭।

: ইসলাম পরিচিতি, ৮ম সংস্করণ, ঢাকা আধুনিক প্রকাশনী ১৪০৯ হি/১৩৯৬বা/১৯৮৯ ইং।

: স্বামী স্ত্রীর অধিকার, ৪র্থ সংস্করণ, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী ১৪১৭ হিঃ/১৯৯ ইং।

: তাফহীমুল কুর’আন, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৩ সাল, ১৪১৪ হি/১২শ খ.।

: নারী, ২য় প্রকাশ, ঢাকা : দীনী পাবলিকেশন্স, ১৪০/১৯৯৯।

মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান : ইসলামের দৃষ্টিতে নিকাব, ঢাকা :বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৭ ইং।

: আমাদের জাতি সত্তার বিকাশ ধারা, ঢাকা আশা প্রকাশন, ১ম প্রকাশ, ১৪১৪হি/১৯৯৪ খৃস্টাব্দ।

আবূ বকর আল জাস্সাস : আহকামুল কুরআন, লাহোর : সুহায়েল একাডেমী, ১৯৯১ ইং।

সৈয়দ আব্দুল মান্নান : বেগম রোকেয়া, ১৯৮৩।

আব্দুল মওদুদ : মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ, সংস্কৃতির রূপান্তর।

সৈয়দ আব্দাল আহমদ : নন্দিত নেত্রী বেগম খালেদাজিয়া, ঢাকা : দিব্য প্রকাশ, ২০০২ ইং।

আব্বাস আলী খান : বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১ম ও ২য় ভাগ, ১৪১৪/১৯৯৪ ইং।

মুহাম্মদ আব্দুল মা’বুদ : আসহাবে রাসূলের জীবন কথা, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা : বাংলাদেশ

ইসলামিক সেন্টার ১৯৯৯ খৃস্টাব্দ/রমাজান ১৪২০ হি.।

মাওলানা আব্দুর রউফ দানাপুরী : আসাহহুসসিয়ার, ঢাকা কুতুব খানা রশীদিয়া, ১৯৯০ ইং।

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম : নারী, তৃতীয় প্রকাশ, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৪১৫ হি/১৪০১ বা/১৯৯৪ ইং।

: পরিবার ও পারিবারিক জীবন, ৯ম সংস্করণ, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী ১৪২৯ হি/২০০০ ইং।

আবূল হাসান আলী নদবী : আস্সীরাতুন নববিয়্যা, বৈরুত : দারুল শরুক, ১৯৮৩।

শেখ মুহাম্মদ আব্দুল হাই : নারী অধিকার, ঢাকা : মাহবুব প্রকাশনী, ২০০০ ইং।

আব্দুস শহীদ নাসিম : শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ঢাকা : শতাব্দী প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৭ ইং।

সৈয়দ আমীর আলী : দ্যা স্পিরিট অব ইসলাম, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা : মল্লিক ব্রাদার্স, ১৩৯৪/১৯৮৭ ইং।

মুহাম্মদ আলী আস্-সাবুনী : ইসলামে উত্তরাধিকার আইন, প্রথম সংস্করণ, ঢাকা : প্রকাশক কাজী গিয়াস উদ্দীন আহমদ, ১৯৮৭ ইং।

আল-বালাজুরী : আনসাবুল আশরাফ, মিসর : দারুল মাআরিফ, তা.বি।

আসমা খাতুন হাফেজা : নারী মুক্তি আন্দোলন ও ইসলাম, ঢাকা : সাফওয়ান পাবলিকেশন্স, ১ম প্রকাশ, ২০০১ ইং।

আসগার হোসেন : অভিশপ্ত এন জি ও এবং আমাদের ধর্ম স্বাধীনতা ও নারী, ঢাকা : প্রীতি প্রকাশন, ১৯৯৭ ইং।

আহ্মদ ইব্ন আলী হাজার আল-আসকালানী : আল-ইসাবা ফী তামযীযিস সাহাবা, মিসর : মাতবা সা'আদাহ্, ১ম খণ্ড, তা.বি।

আহমদ ইবন আলী হাজার আল-আসকালানী : ফাতহুল বারী, বৈরুত : দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, ২য় সংস্করণ, ১৪০২ হিঃ।

: তাহযীবুল আসমা ওয়াস সিফাত।

আহম্মদ মনসূর : বহুবিবাহ ইসলাম : মুহাম্মদ (সা), ঢাকাঃ তাসনিম পাবলিকেশন্স।

আহমদ মুল্লা জীওন : নূরুল আনওয়ার, ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৮২।

আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী :: : মাতা পিতা ও সন্তানের অধিকার, ৪র্থ খ., ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৪২০ হি/১৪০৬ বা/২০০০ ইং।

ইউসুফ আল-কানধালুবী : হায়াতুস সাহাবা, দিমাশকঃ দারুল কালাম, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৩ ইং, ২য় খ.।

ইব্ন আব্দুল বার : আল ইসতিআব, বৈরুত :দারুল জেল, ২য় খ., ১৯৫৩, তা.বি।

ইবনুল আসীর : উসদুল গাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা, বৈরুত : দারু ইহইয়া আত তুরাস আল-আরাবী,তা.বি,৫ম খণ্ড।

ইব্ন কায়্যিম আল-জাওজিয়্যা : যাদুল মা'আদ, মিসর : মাত্বাআ মুসতফাল বাবিল হলবী, ১৯০৫ ইং, ১ম খ.।

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এণ্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার : ইসলামী আইন ও বিচার, ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা, সংখ্যা : ৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

ইব্‌ন কায়্যিম	: আত তারীকুল হুকমিয়্যা ফিস সিয়ামাতিশ শারইয়য়া।
ইব্‌ন কাসীর	: আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, বৈরুত : বৈরুত : দারু ইহইয়া আত তুরাস আল-আরাবী, ১ম সংস্করণ, ১৪১৭ হি/১৯৯৭ ইং।
	: আস-সিরাতুন নবুবিয়্যা, মিসর : ইসাল বাবিল হালবী, ১৯৬৪ ইং, ৩য় থ.।
	: তাফসীরুল কুর'আনুল কারীম, বৈরুত : দারুল উন্দুলুস, তা.বি, ৪র্থ খ.।
ইব্‌ন সায়্যিদুন্নাস	: উয়ূনুল আসর,বৈরুত : দারুল জেল, ২য় খণ্ড,১৯৭৪ ইং।
ইব্‌ন মানযুর	: লিসানুল 'আরব, বৈরুত : দারু ইহইয়া আত তুরাস আল-আরাবী, তা.বি, ১ম খ.।
ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী	: আল-আসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা, বৈরুত : দার-আল-ফিকর, ১৯৭৮, ৪র্থ খ.।
ইসহাক ওবায়দী	: যুগে যুগে নারী,দ্বিতীয় প্রকাশ, ঢাকা : শান্তিধারা প্রকাশনী, ১৯৯৭ ইং।
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ	: ইসলামী বিশ্বকোষ, একাদশ খ., সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ, ২য় খ.।
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ	: বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন
ইব্‌ন হিশাম,অনুবাদ-আকরাম ফারুক	: সীরাতে ইব্‌ন হিশাম, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, অষ্টম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০১ ইং।
এ এফ এম আব্দুল মজিদ রুশদী	: হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা), ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, মার্চ ১৯৮৭ ইং।
ওয়ালী আবু আব্দুল্লাহ্ আল খাতবী শায়খ আল্লামা	: আসমাউর রিজাল, ঢাকা এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৫ ইং।
কাওকাব সিদ্দিক	: মুসলিম নারী সংগ্রাম, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা : ২০০০ইং।
মুহাম্মদ কুতুব	: ইসলাম ও নারী, ঢাকা : স্মৃতি প্রকাশনী, ১৯৯৭ ইং।
কানিজ মুস্তফা সাইয়্যেদা	: ইসলামে নারীর অধিকার, কলকাতা বাণী প্রকাশ, ১৯৮৯ ইং।
কনক মুখোপাধ্যায়	: উনবিংশ শতাব্দীর নারী প্রগতি ও রামমোহেন বিদ্যাসাগর।
খোকা রায়	: সংগ্রামের তিন দশক (১৯৩৮-১৯৮৬), ঢাকা : জাতীয় প্রকাশনী, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
শায়খ মুহাম্মদ খাদরী বিক	: মুহাদারাতু তারীখিল উমামিল ইসলামিয়্যা, মিসরঃ আলমাকতাবাতু তিযারিয়াতিল কুবরা, ১৩৮২ হি, ১ম খ.।
সৈয়দা খালেদা জাহান	: জেব-উন-নেসা জামাল, ঢাকা বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, জুন ১৯৯৯ ইং।
অধ্যাপক গোলাম আজম	: জীবনে যা দেখলাম, ঢাকা : কামিয়াব প্রকাশন, ২য় খ., ২০০২ ইং।
	: স্টাডি সার্কেল, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ৩য় সংস্করণ, ১৩২৩ হি/২০০৩ ইং।
গোলাম কিবরিয়া পিনু	: দৌলতুন্নেসা খাতুন, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, জুন ১৯৯৯ ইং।

Dhaka University Institutional Repository

গোলাম মুরশিদ : রাস সুন্দরী থেকে রোকেয়া নারী প্রগতির একশো বছর, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬ ইং।

চিত্রাদেব : অন্তপুরের আত্নকথা, কলিকাতা আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৪ খৃস্টাব্দ।

জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান আস-সুয়ূতী : আল-ইতকান ফি 'উলূমিল কুর'আন, ২য় মুদ্রণ, মিসর : মুস্তফা আলবাবী, ১৩৭০ হি/১৯৫১ ইং।

জালালুদ্দীন সাইয়েদ আনসার উমরী : ইসলামী সমাজে নারী, ১ম প্রকাশ, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৪১২ হি/১৯৯১ ইং।

জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান আস-সুয়ূতী : আল কানযুল মদফুন, মিসর : মুসতাফাল বাবিল হালবী, ১৯৩৯ খৃস্টাব্দ, ৫ম খ.।

ড. জ্ঞানেশ মৈত্র : নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য, কলিকাতা : ন্যাশনাল পাবলিশার্স, ১৯৮৭।

আল্লামা জামাল আল-বাদাবী : ইসলামের সামাজিক বিধান, ঢাকা : পাইওনিয়ার ও উইটনেস।

: মুসলিম নারী পুরুষের পোষাক, ১ম প্রকাশ, ঢাকা : বি আই আইটি,১৪১৮/১৯৯৭ ইং।

জহুরী (সালাউদ্দীন আহমদ) : অপসংস্কৃতির বিভীষিকা, ঢাকা : উতলু প্রকাশন, ৪র্থ প্রকাশ, ১৯৯৯ ইং।

তানযীলুর রহমান : মাজমুআহ কাওয়ানীনে ইসলাম, ১ম খ.।

কাযী নাসির উদ্দীন আবূ সাঈদ : আন্‌ওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তা'বীল

আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন ওমর আল বয়যাভী : বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যা ১৯৯৮ ইং, ১ম খ.।

প্রদীপ রায় : বিদ্যাসাগরঃ সামাজিক ব্যক্তিত্ব, কলিকাতা বুক ট্রাষ্ট, ১৯৮৬।

ফখরুদ্দীন রাযী : আত্‌তাফসীরুল কবীর, করাচী : মাকতাবা ইসহাকিয়া, ৩য় সংস্করণ, ২য় খ.।

মাওলানা ফজলুর রহমান আশরাফী : ইসলামী উত্তরাধিকার াাইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা : আর আই, এস পাবলিকেশন্স। ১৪১৬ হি/ ১৪০২ বাংলা/১৯৯৫ ইং।

বিমান বাহিনী মজুমদার : হিষ্ট্রি অব ইন্ডিয়ান সোস্যাল এন্ড পলিটিক্যাল আইডিয়াল ফ্রম রামমোহন টু দয়ানন্দ।

বায়হাকী : আস্‌-সুনানুল কুবরা।

বোরহানুদ্দীন খান জাহাঙ্গীর ও জেরিনা রহমান খান(সম্পাদিত) : বাংলাদেশে নারী নির্যাতন, ঢাকা : সমাজ নিরীক্ষণ, ১৯৮৭।

মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম : কুর'আন ও হাদীসের আলোকে রাসূল (সা) এর স্ত্রীগণ যেমন ছিলেন, ঢাকা : পিস পাবলিকেশন্স।

ড. এ এইচ এম মুজতবা হোসাইন : হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা : ইসলামিক রিসার্চ ইন্সটিটিউট, ১৪১৯ হি./১৪০৫ বা/১৯৯৮ ইং।

মজদুদ্দীন মোল্লা : সীরাতে মুস্তফা, দিল্লী : মাকতাবা 'উসমানিয়া, ১৯৫৭ ইং।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ মজির উদ্দীন মিয়া	: বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মহিলা, ঢাকা : দিদার পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৭ ইং।
মুনতাসীর মামুন	: পূর্ব বাংলার ব্রাহ্ম সমাজ (১৮৫৭-১৯০৫), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র।
মাহমুদা ইসলাম	: নারীবাদী চিন্তা ও নারী জীবন, ঢাকা : জে.কে প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স।
মেবোশ্বের আলীর স্মরণিকা	: নবাব ফয়জুন্নেসা এবং রুপজালাল, রূপজালাল শত বার্ষিকী স্মরণী ১৯৭৬, পশ্চিমগাঁও, কুমিল্লা।
মাযহারুল ইসলাম অধ্যাপক	: পর্দা প্রগতির সোপান, ১ম প্রকাশ, ঢাকাঃ ১৪১৩/১৯৯৩ ইং।
মালেকা বেগম	: বাংলার নারী আন্দোলন, ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ।
মাহমুদ শফিক	: খালেদা জিয়ার উত্থান, ঢাকা : সূচিপত্র প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ, ২০০২ ইং।
মালিক রাম	: নারী সমাজ ও ইসলামী শিক্ষা, ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪০৭ হি/১৩৯৩ বা/১৯৮৭ ইং।
ড. মুস্তফা আস সিবায়ী	: ইসলামী পাশ্চাত্য সমাজে নারী, প্রথম সংস্করণ, ঢাকা বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার।
মুসলিম ইব্ন আল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী	: সহীহ্ মুসলিম, দিল্লী : আল-মাকতাবা রশিদীয়া ১৩৭৬ হি. ১ম ও ২য় খ.।
মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা‘ঈল আল্-বুখারী	: আল আদাবুল মুফরাদ।
	: তারিখুত তুরাসিল আরাবী।
	: মুজুমুল মাতবু’আহ।
	: সহীহ আল-বুখারী (বঙ্গানুবাদ) ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১ম খ.।
অল্লামা মুহাম্মদ ইবন জারীর আবু জাফর আত তাবারী	: তারিখুল উমাম ওয়ার মুলুক, মিসর : দারুল মা’রিফ, ১৯৬৭ খৃস্টাব্দ ৬ষ্ঠ খ.।
মুহাম্মদ ইবন সা‘আদ	: তাবাকাতে ইবন সা‘আদ, মিসর : তা.বি, ৮ম খ.।
মুহাম্মদ ইব্ন মাযাহ	: সুনানু ইব্ন মাযাহ, ঢাকা : কুতুবখানা রাশিদীয়া, তা.বি।
মুহাম্মদ সায়্যিদ আস সাফ্তী	: মুসলিম নারী প্রসংগ, ১ম সংস্করণ, ঢাকা : দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০ ইং।
মুহাম্মদ রেজা শেখ	: মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ, মিসর, তা.বি।
মহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী ইমাম	: রিয়াদুস সালেহীন,একাদশ প্রকাশ, ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৪২২ হি/২০০১ ইং।
মাহমুদ কবীর	: বাংলাদেশের নারী, ঢাকা : সূচীপত্র, ১ম প্রকাশ, ২০০৩ ইং।
ড.মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান	: আস সিহাহ আস সিত্তাহ পরিচিতি ও পর্যালোচনা, রাজশাহীঃ আল মাকতাবুশ শাফিয়া, ১৪২৩ হি/ ২০০২ ইং।
ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান	: ইসলামের ইতিহাস, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ঢাকা : গ্লোব লাইব্রেরী (প্রা) লিমিটেড, ১৯৮৫ ইং।
ড. মরিস বুকাইলী	: বাইবেল কুর’আন ও বিজ্ঞান, ঢাকা : প্রীতি প্রকাশন।

Dhaka University Institutional Repository

মোঃ শফিকুল ইসলাম, এনায়েত উল্লাহ, মোঃ সিরাজুল ইসলাম	: ডিগ্রী ইসলামিক স্টাডিজ, ঢাকা : হাসান বুক হাউস, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ ইং।
যাকী উদ্দীন আব্দিল আযীম	: আত্ তারগীব ওয়াত তাহরীব, সৌদী আরব : দারুল হাদীস, তা.বি।
রওশন আরা বেগম	: নবাব ফয়জুন্নেসা ও পূর্ব বঙ্গের মুসলিম সমাজ, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৩ ইং।
রুহুল আমিন	: বেগম খালেদা জিয়াঃ সৈরাচার বিরোধী আন্দোলন ও মু্ল ধারার নেতৃত্ব, ঢাকা : হীরা বুক মার্ট, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬ ইং।
রওশন কাদির সৈয়দা	: স্থানীয় পর্যায়ে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সমস্যা ও সম্ভবনা, নারী ও রাজনীতি, উইমেন ফর উইমেন গবেষণা ও স্টাডি গ্রুপ, দক্ষিণ ধানমন্ডি, ঢাকা, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৪ ইং।
নূর হোসেন মজিদী	: নারী নেতৃত্ব যুগে যুগে, ঢাকা কনফিডেন্ট পাবলিকেশন্স, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৯ ইং।
শিবলী নু‘মানী	: সীরাতুন্নবী, আযমগড়ঃ মাতবা মা‘আরিফ, ২য় খ., ১৩৯৬ ইং।
শামীমা ইসলাম	: বেগম রোকেয়া অর্জনের ইতিহাস, ঢাকা : নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, ১৯৯১ ইং।
শিরীন সুলতানা	: বৈবাহিক ক্ষেত্রে নারী নির্যাতন এম এস এস মনোগ্রাফ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৮ খৃস্টাব্দ।
শামসুন্নাহার নিজামী	: পর্দা একটি বাস্তব প্রয়োজন, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৩শ প্রকাশ, জুলাই, ২০১১ ইং।
	: নারী নির্যাতনের কারণ ও প্রতিকার, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৪২২ হি./২০০২ ইং।
	: নারী মুক্তি আন্দোলন, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, ১৪১২ হিঃ/১৯৯৯ ইং।
	: দ্বীন প্রতিষ্ঠায় মহিলাদের দায়িত্ব, ৪র্থ প্রকাশ, ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশনী, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ ইং।
শামসুদ্দীন আজ-জাহাবী আল ইমাম	: সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, বৈরুত : আল-মুওয়াস্সাসাতু রিসালা, ৭ম সংস্করণ, ১৯৯০ ইং, ৪র্থ।
	: তাযকিরাতুল হুফফাজ, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা,তা.বি।
শামসুন্নাহার মাহমুদ	: রোকেয়া জীবনী, কলিকাতা, বুলবুল পাবলিশিং হাউস পুণমুদ্রণ, ১৯৩৭, ঢাকা।
শাহাবুদ্দীন আহমেদ সরকার	: নারী নির্যাতনের রকমফের, ঢাকা : বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ ২০০১ ইং।
সাঈদা জামান	: সৈয়দা মোতাহেরা বানু, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, ২০০০ ইং।
সুফিয়া কামাল	: একাত্তরের ডায়েরী, ঢাকা : জ্ঞান প্রকাশনী, ১৯৮৯ ইং।
ড. সুবহী সালেহ	: মাবাহিছ ফি উলূমিল কুর'আন, বৈরুত : দারুল ইলম, ১৯৮৫ ইং।

Dhaka University Institutional Repository

সোনিয়া নিশাত আমিন অনুবাদ:পাপড়ী নাহার	: বাঙালী মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, ২০০২ ইং ।
সম্পাদনা : সীমা দাস সীমু, ফরিদা আখতার, সাইদা আখতার	: শত বছরের বাংলাদেশের নারী, ঢাকা : নারী গ্রন্হ প্রবর্তনা, ২০০৩ ।
সম্পাদনা : তাহাসিনা তাকিয়া	: রোকেয়া সন্ধানে, পত্রিকা : দি উইটনেস, ডিসেম্বর ১৯৯৯ ।
সম্পাদনা : নাজমা চৌধুরী, হামিদা আখতার বেগম, মাহমুদা ইসলাম, নাজমুন্নেছা মাহতাব	: নারী ও রাজনীতি, ঢাক া: উইমেন ফর উইমেন, প্রথম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ ।
সুলতানা মোস্তফা খান	: বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন : মীথ এবং বাস্তবতা উইমেন ফর উইমেন, গবেষণা পাঠচক্র ২০০২, ঢাকা: শুক্রাবাদ, সংখ্যা : ৪,৩ ।
যোগেশচন্দ্র বাগল	: বাংলার স্ত্রী শিক্ষা (১৮০০-১৮৫৬), কলিকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫১ বাংলা।
আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নদভী	: সীরাতুন্নবী, আ'যমগড়: মাতবা' মা আরিফ, ১৯৫২ ইং।
হান্নানা বেগম	: মানব সম্পদ: বাংলাদেশে নারী, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, ২০০২ ইং।
	: বাংলাদেশ স্ট্র্যাটেজিস ফর ইনহ্যান্সিং দ্যা রোল অব, উইমেন ইন ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট, ওয়াশিংটন ডি.সি. ১৯৯০ খৃস্টাব্দ।
	: স্ট্যাটিকাল ইয়ার বুক অব বাংলাদেশ, ১৯৮১ ইং।
	: ইন্সপেক্টর অব ফ্যাক্টরিস মিনিস্ট্রি অব লেবার এন্ড ম্যান পাওয়ার বাংলাদেশ, ১৯৮১ ইং।
সাইয়্যেদ হামেদ আলী	: একাধিক বিবাহ, ১ম প্রকাশ, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৪১২/১৯৯২ ইং।
A.S. Altekar	: Education in Ancient India, Bananas: India Book Shop. 1951.
Sayyid Ameer Ali	: The Influence of women in Islam, The Nineteenth Century.1899.
Artical : M.K.U. Mollah	: The New Province of eastern Bengal and Assam Journal of institute of Bangladesh Studies, Rajshahi. 1934.
Joshi K.L.Shukia P.D	: Women and education in Indian society, In women and education UNESCO. Paris: 1953.
Jawherlal Nehru Patndit Khawz Mumtaz and Rashida Shaheed	: Women of Pakistan, London. Second Published. 1987.
	: Bengal Educationconsultation, 1878.
	: A study in Urban History and Development.

Dhaka University Institutional Repository

Khawar Mumtaz and Farida Shaheed (EDS)	: Woman of Pakistan, London, Zed Books Ltd, U.S.A. 1987.
Khawar Mumtaz and Mahubul Haq	: Human Development in South Asia, 1998, Oxford, Kharachi 1998.
	: UNESCO World Report, 1998, Paris,
N. C Chaudhury	: The Autobiography of an unknown Indian.
Rasida Shaheed	: Women of Pakistan, London: Second Publishars, 1987. Gender Demention in Devolopment, Ministry of woman and children Appear Govt of the People Republic.
Krishneala Ray	: Education in Medieval India, Delhi: BR Publishing Lorporation, 1984.
A.R Mallick	: British Policy & the Muslim of Belegal.
Prosila Teherman(tchepman)	: Hindu Female Education London. 1839.
Thompsow . EW. W Hunter	: The life of Charlds Lord Matcalfe.
W. W. Hunter	:The Indian Musselmans, Bangladesh edition, 1975.
A. R Wad.	: History and Philosophy of social work in India, Allied Publisher private limited, 1961.
	: Grender Dimention in Development, Ministry of woman and children Appears Govt. of the peoples republic.
	: UNDP Human Development report. 1993.
Father DE Vox	: The Ancient History of Israil. Paris 1971.
Syed Al-Atlas	: Aims and Objectives of Islamic Education, Jeddah: Saudi Arabia King Abdul Aziz University, 1979.
International Institute of Islamic Thought,	: Islamization of Knowledge, A Workplan, Herndon: VA: Author, 1989.
Milton Mayer	: Humanistic Education and Western Civilization, New York: Holt, Reinhart and Winston, 1964
‘Abd al-Rahaman ‘Azzam,	: The Eternal Message of Muhammed, Toronto: The New American Library of Canada, 1964.
Rudolph Peters	:
Syed All Ashraf,	: New Horizons in Muslim Education,

Dhaka University Institutional Repository

	Chippenham: Hodder & Stroughton, 1985
Syed Sajjad Husain and Syed All Ashraf	: Crisis in Muslim Education, Kent: Hodder & Stoughton, 1979), p. ix.
Kenneth Cragg and R. Marston Speight	: The House of Islam, Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1988.
প্রবন্ধ : বেগম রোকেয়া	: "গৃহ", মতিচুর, প্রথম খ. প্রবন্ধ ।
প্রবন্ধ : বেগম রোকেয়া	: "বোরকা", মতিচুর, প্রথম খ. প্রবন্ধ নবনূর ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯০৪ খৃস্টাব্দ ।
প্রবন্ধ : মুজীবুর রহমান	: তরুণের কাজ, সওগাত, ৫ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, কার্ত্তিক ১৩৩৪, ১৯২৭ খৃস্টাব্দ ।
প্রবন্ধ : মিস ফজিলাতুন্নেছা এম. এ	: মুসলিম নারী মুক্তি, সওগাত, ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৩৬, ১৯২৯ খৃস্টাব্দ।
প্রবন্ধ : শাহেদ আলী	: দৌলতুননেছা খাতুন : অন্তরঙ্গ আলোকে, দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ১৫ আগষ্ট ১৯৯৭ খৃস্টাব্দ ।
প্রবন্ধ : এবনে সামাদ গোলাম	: প্রসঙ্গ : দৌলতুননেছা খাতুন, দৈনিক ইনকিলাব, ১৯৯৭ খৃস্টাব্দ।
পত্রিকা	
পত্রিকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা	: গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, জানুয়ারী - মার্চ ২০১৪।
পত্রিকা : লেডি ব্রোর্বোণ কলেজ পত্রিকা	: J. A Salic Muslim Girls' College, The Purdah, সম্পাদনা : মায়া দত্ত, ১৯৮৯ খৃস্টাব্দ ।
পত্রিকা : ঐতিহাসিক	: শীলা বোস, রাজনৈতিক পটভূমিকায় বাংলায় মুসলিম নারী শিক্ষার বিকাশ, ২ এপ্রিল ১৯৮৮ খৃস্টাব্দ ।
পত্রিকা : দৈনিক দিনকাল	: হাসমত আরা, ইতিহাসের বন্ধুর পথ পেরিয়ে দ্বীপালী হলো কামরুন্নেছা, জুন ২১, ১৯৮৯ খৃস্টাব্দ ।
পত্রিকা : বামাবোধিনী পত্রিকা	: আগষ্ট, ১৮৭০, সংখ্যা- ১২০ । আগষ্ট, ১৮৮০, সংখ্যা-১৮২ । আগষ্ট, ১৮৮২, সংখ্যা-২০৪ ।
পত্রিকা : ছাত্রী বার্তা-৯০	: বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রী সংস্থা, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ঢাকা, বড় মগবাজার ১৯৮৮ খৃস্টাব্দ/১৪০৯ হি. ।
পত্রিকা : সম্মেলন স্মারক	: বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রী সংস্থা, ১৯৯১ খৃস্টাব্দ ।
পত্রিকা : দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন স্মরণিকা	: বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রী সংস্থা, ১৯৮০ খৃস্টাব্দ ।
পত্রিকা : ছাত্রী বার্তা-৮৮	: বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রী সংস্থা, নভেম্বর-১৯৮৮ ।
পত্রিকা : সাপ্তাহিক দেশ	: মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়, নারী মুক্তির সেকাল একাল, কলিকাতা, সাপ্তাহিক দেশ ৫৫ বর্ষ, ২০ সংখ্যা ।
পত্রিকা : দৈনিক দেশ	: গৌতম নিয়োগী, শারদীয়া, কলকাতা, ১৩৩৯ খৃস্টাব্দ ।
পত্রিকা : সমাচার দর্পণ	ডিসেম্বর- সংখ্যা, ১৮২০ খৃস্টাব্দ ।

Dhaka University Institutional Repository

পত্রিকা : মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী সাহিত্যিক	: ঢাকা, ১৪শ বর্ষ, বসন্ত সংখ্যা, ১৩৮৪ খৃস্টাব্দ ।
পত্রিকা : সওগাত	: আর, এস, হোসেন, বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সমিতি, ৪র্থ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, চৈত্র- ১৩৩৩/১৯২৭ ।
পত্রিকা : মাসিক আদর্শ নারী	: ২০তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল ২০১৪ খৃস্টাব্দ ।
পত্রিকা :দৈনিক প্রথম আলো	: সম্পাদক : মতিউর রহমান, মিডিয়াস্টার লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক মতিউর রহমান কর্তৃক ৫২ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ ।
পত্রিকা : দৈনিক নয়াদিগন্ত	: সম্পাদক : আলমগীর মহিউদ্দিন । প্রকাশক : শামসুল হুদা কর্তৃক ১৬৭/২-ই, ইনার সার্কুলার রোড, ইডেন কমপ্লেক্স, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০ ।
পত্রিকা : দৈনিক যুগান্তর	: সম্পাদক: এ্যাডভোকেট সালমা ইসলাম, বসুন্ধরা বারিধারা, ঢাকা।
পত্রিকা : দৈনিক সংগ্রাম	: সম্পাদক আবুল আসাদ। বাংলাদেশ পাবলিকেশন্স লিঃ এর পক্ষে আবুল আসাদ কর্তৃক আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ৪২৩, এলিফেন্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত।
পত্রিকা : দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ	: প্রধান সম্পাদক : শাহজাহান সরদার, সম্পাদক ও প্রকাশক : কাজী রফিকুল আলম । সম্পাদক ও প্রকাশক কর্তৃক আলোকিত মিডিয়া লিমিটেডের পক্ষে ১৫১/৭, গ্রীন রোড (৪র্থ-৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা-১২০৫ ।
পত্রিকা : দৈনিক ইত্তেফাক	: ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : তাসমিমা হোসেন । উপদেষ্টা সম্পাদক : হাবিবুর রহমান মিলন । ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে আনোয়ার হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
পত্রিকা : দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন	: সম্পাদক : নঈম নিজাম, ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেডের পক্ষে ময়নাল হোসেন চৌধুরী কর্তৃক প্লট নং-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, বারিধারা, ঢাকা ।
পত্রিকা : দৈনিক আমাদের সময়	: সম্পাদক : আবু হাসান শাহরিয়ার, উপদেষ্টা সম্পাদক : আবুল মোমেন । নতুন ভিশন লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক এস. এম. বকস কল্লোল কর্তৃক ৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন ঢাকা-১০০০ ।
স্মারক প্রকাশনা: বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ,	: জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদানের স্বীকৃতি চাই অধিকার প্রয়োগের নিশ্চয়তা চাই, দ্বাদশজাতীয় সম্মেলন ২০১৩,প্রকাশনায় কেন্দ্রীয় কমিটি বাঙলাদেশ মহিলা পরিষদ,সুফিয়া কামাল ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০।
পত্রিকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা	: সম্পাদনা পরিষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা-৭৬, জুন-২০১৩ খৃষ্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository